

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

তৃতীয় খণ্ড



ত্রয়োদশ হইতে অষ্টাদশ অধ্যায়ের
মূল শ্লোক, অন্নয়, শ্রীধরস্বামি-কৃত টীকা, তাহার বঙ্গানুবাদ ও
যেগিরাজ শ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের 'আধ্যাত্মিক-দীপিকা' সম্বলিত

শ্রী ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল

কর্তৃক 'আধ্যাত্মিক-দীপিকা' বিশদভাবে ব্যাখ্যাত।



কাশী গভর্নমেন্ট সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ, এম.এ.,

লিখিত ভূমিকা সহিত

চতুর্থ সংস্করণ

প্রকাশক :
গুরুধাম প্রকাশন সমিতি
গুরুধাম মন্দার
পো : বাঁসী (মন্দার হীল)
জি : ভাগলপুর, বিহার

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

তৃতীয় খন্ড

চতুর্থ সংস্করণ সন ১৪০৭

—সূচীপত্র—

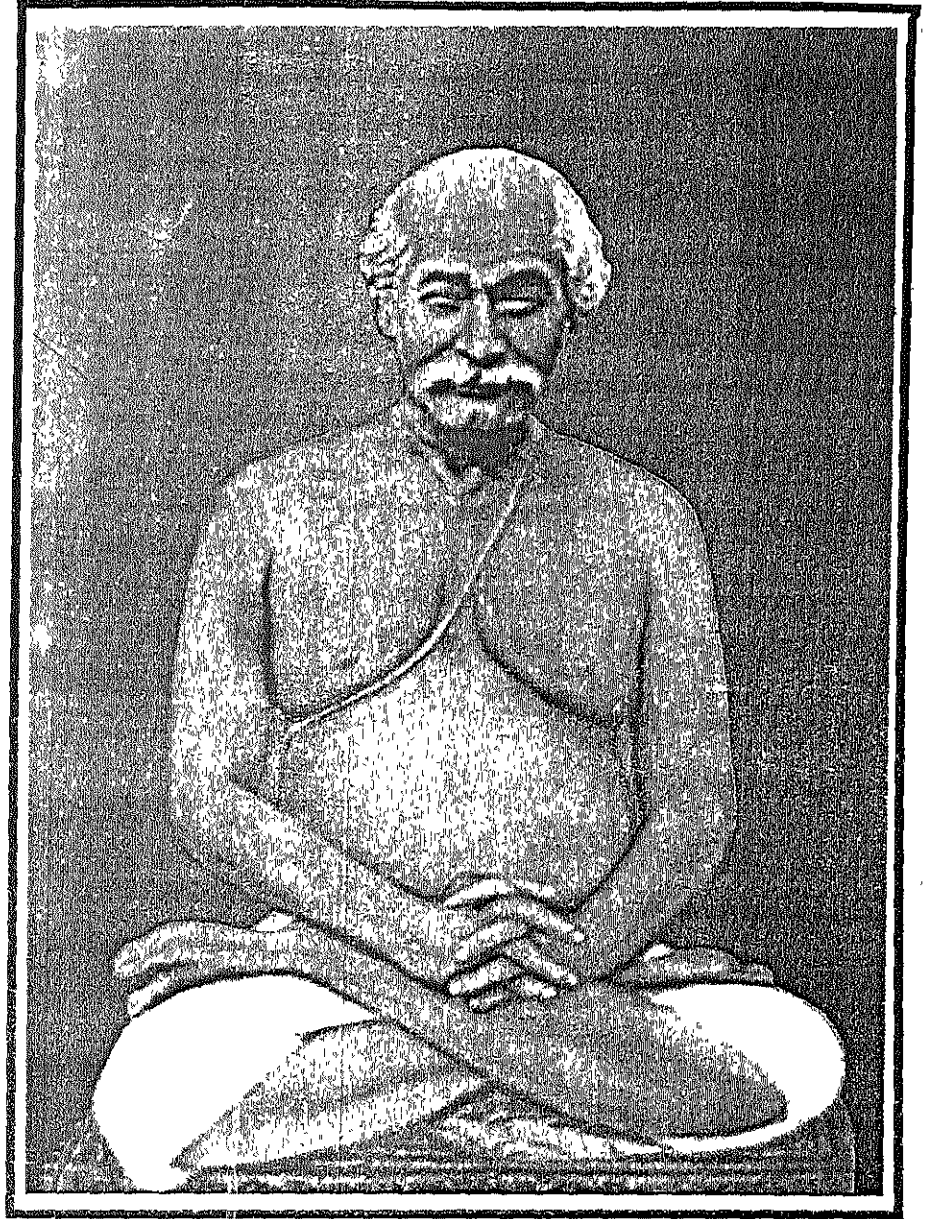
সম্পাদক —
অধ্যাপক অবনীভূষণ দাস,
অধ্যাপক নারায়ণ দাস বন্দ্যোপাধ্যায়
© গ্রন্থস্বত্ত্ব গ্রন্থকার কর্তৃক সংরক্ষিত

মূল্য : ৯০ টাকা মাত্র

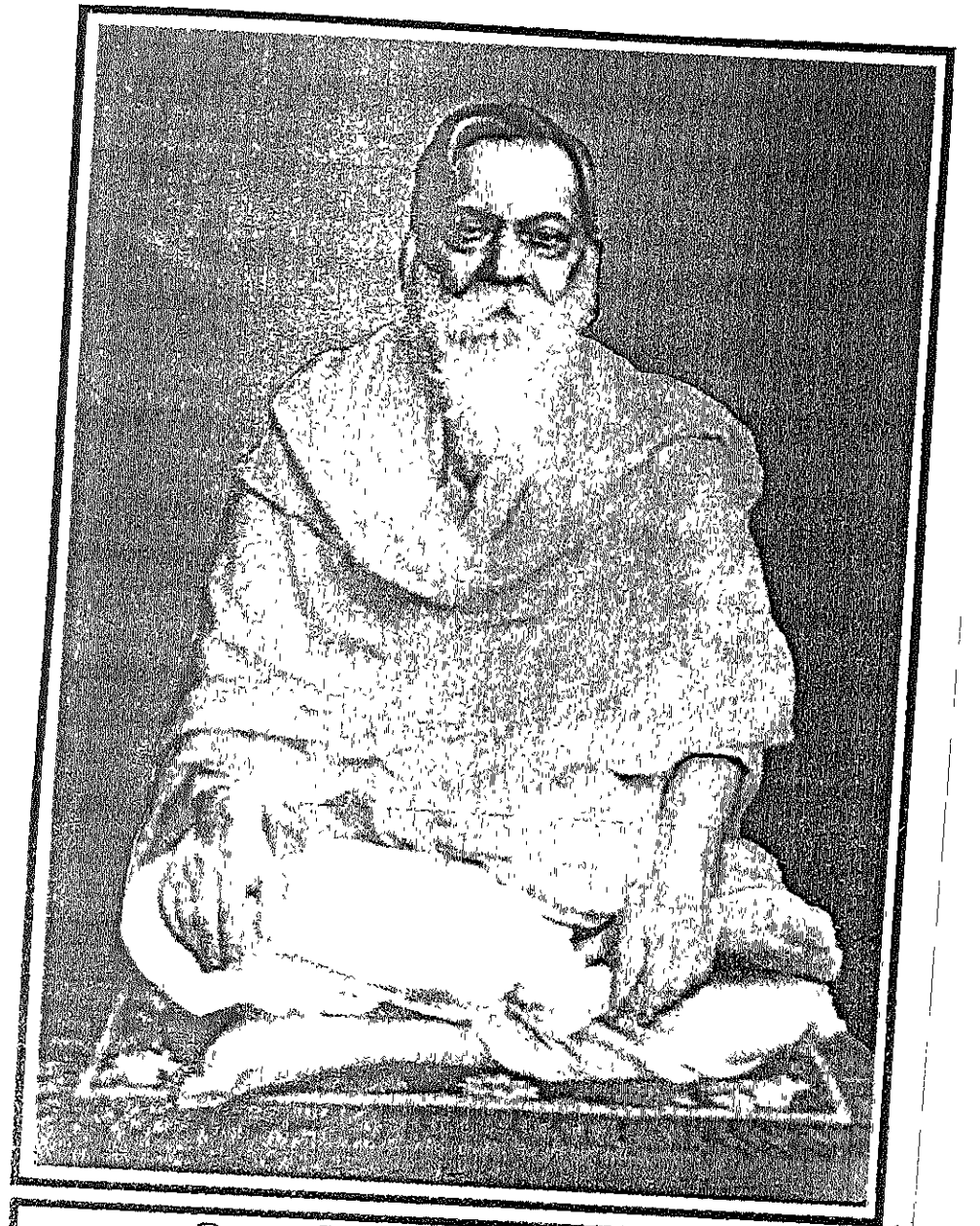
বিবরণ	পৃষ্ঠা
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	১—৪৭২
অয়োদশ অধ্যায় (প্রকৃতিপুরুষবিবেক যোগ)	১—১১৪
চতুর্দশ অধ্যায় (গুণত্রয়বিভাগ যোগ)	১১৫—১৬৭
পঞ্চদশ অধ্যায় (পুরুষোত্তম যোগ)	১৬৮—২১২
ষোড়শ অধ্যায় (বৈবাহরসম্পদবিভাগ যোগ)	২১৩—২৪৮
সপ্তদশ অধ্যায় (শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগ যোগ)	২৪৯—২৮৮
অষ্টাদশ অধ্যায় (মোক্ষ যোগ)	২৮৯—৩৩৬
অষ্টাদশ অধ্যায় ও সমস্ত গীতার সারাংশ	৩৩৭—৪৬২
পরিশিষ্ট	৪৭৩—৪৭২
শ্রীশ্রীগীতামাহাত্ম্যম্	৪৭৩—৪৮২
যোগিবাহু ভ্রামাচরণ নাহিড়ী মহাপ্রবন্ধ সংক্ষিপ্ত জীবনী	৪৮৩—৪৯৪
শ্লোক-সূচী	৪৯৫—৫০৪
বিবরণ-সূচী	৫০৫—৫১২



মুদ্রক :
পবন প্রিন্টার্স (কলিকাতা)
দূরভাষ : ২৩৯-১৩১০



যোগিরাজ শ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়



যোগিরাজ শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল মহাশয়

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রয়োদশোঃধ্যায়ঃ

(প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক যোগঃ)

অৰ্জুন উবাচ ।

[প্রকৃতিং পুরুষং চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজমেব চ ।

এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ কেশব ॥]

অর্থঃ । অৰ্জুন উবাচ (অৰ্জুন বলিলেন) । কেশব ! (হে কেশব) প্রকৃতিং-পুরুষং চ
এব (প্রকৃতি ও পুরুষ) ক্ষেত্রং-ক্ষেত্রজং চ এব (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ) জ্ঞানং-জ্ঞেয়ং চ (জ্ঞান ও
জ্ঞেয়) এতদ্বেদিতুম্ (ইহা জানিতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি) ॥

বঙ্গাশুবাদ । অৰ্জুন বলিলেন—হে কেশব, প্রকৃতি ও পুরুষ, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ এবং
জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই সকল তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করি ॥

[শ্রীশ্রী স্বামী এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা করেন নাই । শুধু শ্রীশ্রী স্বামী কেন আচার্য্য শঙ্কর
ও প্রাচীন টীকাকারগণের মধ্যেও অনেকেই এই শ্লোকটি গীতার অন্তর্গত বলিয়া গ্রহণ করেন
নাই, সুতরাং ব্যাখ্যাও করেন নাই । পৃথ্যপাঠ লাহিড়ী মহাশয়ের ব্যাখ্যাত গীতাতেও এই
শ্লোকটি নাই । এই অধ্যায়ে যে তত্ত্বগুলি ব্যাখ্যাত হইবে তাহাই অৰ্জুনের যুগ দিয়া এই
শ্লোকটিতে প্রসঙ্গপে বলা নো হইয়াছে । ভগবান কেন এ তত্ত্বগুলি এখানে আলোচনা
আবশ্য করিলেন, কাহারও কাহারও নিকট ইহা একটু আকস্মিক মনে হইতে পারে, তাই
এ শ্লোকটি হয়তো কেহ পবে রচনা করিয়া দিয়া থাকিবেন । যখন প্রসিদ্ধ প্রাচীন ব্যাখ্যাতাদের
মধ্যে কেহই এ শ্লোকটির ভাষ্য বা টীকা লিখেন নাই, তখন এ শ্লোকটিকে গীতার
অন্তর্গত বলিয়া মনে করিতে দিবা আসে । প্রকৃত প্রস্তাবে এইরূপ আলোচনার অবতারণাও
আকস্মিক নহে । প্রকৃতি সম্বন্ধে ভগবান পূর্বে সপ্তম অধ্যায়ে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছেন,
একটু বিস্তৃত ভাবে ইহার আলোচনার আবশ্যকতা আছে । সুতরাং এরূপ আলোচনা
আকস্মিক নহে । ইহা অপ্রাসঙ্গিকও নহে, কারণ ভগবান পূর্বেই বলিয়াছেন যে তিনি
তত্ত্বদ্বিগকে শীঘ্রই কল্পমরণরূপ-সংসার হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন, এক্ষণে তত্ত্বজ্ঞান
ব্যতিরেকে এই উদ্ধার সম্ভবপর নহে, তাই প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকরূপ তত্ত্বজ্ঞানের
উপদেশ এই অধ্যায়ে আরম্ভ করিলেন ।]

ইদং শরীরং কোন্ত্যে ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে ।

এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ ॥১

অনুব্র। শ্রীভগবানু উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন) । কোন্ত্যে। (হে কোন্ত্যে) ইদং শরীরং (এই শরীরকে) ক্ষেত্রম্ ইতি (ক্ষেত্র বলিয়া, অভিধীয়তে (অভিহিত করা হয়) । যঃ (যিনি) এতৎ (ইহাকে) বেত্তি (অনুভব করেন) তং (তাঁহাকে) তদ্বিদঃ (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্ববেত্তগণ) ক্ষেত্রজ্ঞঃ (ক্ষেত্রজ্ঞ) ইতি প্রাহঃ (এইরূপ বলিয়া থাকেন) ॥১

শ্রীধর। ভক্তানামহনুজ্ঞাতা সংসারাহিত্যবাদি যঃ ।

ত্রয়োদশেঃ তৎসিদ্ধৌ তত্ত্বজ্ঞানযুগ্মীযাতে ॥

‘ভেদামহং সমুজ্ঞাতা মুখ্যসংসারসাগরাং । ভবামি ন চিরাৎ পার্শ্ব’—ইতি পূর্বকং প্রতিজ্ঞাতং । তন্ন চ আত্মজ্ঞানং বিনা সংসারাহনরূপং সম্ভবতীতি তত্ত্বজ্ঞানোপদেশার্থং প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকাদ্যায় আরভ্যতে । তত্র যৎ সপ্তমেধ্যায়েরে অপরা পরা চেতি প্রকৃতিদ্বয়মুক্তং তন্নোঃ অবিবেকাৎ জীবভাবম্ আপন্নস্ত চিৎশস্ত অয়ং সংসারঃ । যাত্য্যং চ জীবোপভোগার্থম্ দৈশ্বর্যঃ সৃষ্টাদিষু প্রবর্ততে । তদেব প্রকৃতিদ্বয়ম্ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞপদবাচ্যং পরস্পরং বিবিজ্যং তদ্বতো নিরুপরিচ্ছিন্ন শ্রীভগবানুবাচ—ইদমিতি । ইদং ভোগায়তনং শরীরং ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে, সংসারস্ত প্রয়োহভূমিত্যং । এতদ্ যো বেত্তি অহং মমেতি মন্ততে, তং ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি প্রাহঃ, কৃষিবলবন্তং ফলভোক্তব্যং । তদ্বিদঃ—ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ বিবেকজ্ঞাঃ ॥ ১

বঙ্গানুবাদ। “আমি ভক্তদিগকে সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি” এই কথা যিনি (দ্বাদশাধ্যায়ে) বলিয়াছেন, এখন তৎসিদ্ধার্থ (অর্থাৎ ভক্তগণ কি ভাবে উদ্ধার হয়) সেই তত্ত্বজ্ঞান এই ত্রয়োদশাধ্যায়ে কথিত হইতেছে ।

[‘জন্মমরণ রূপ সংসার হইতে তাহাদিগকে আমি শীঘ্রই উদ্ধার করিয়া থাকি’—ভগবানের প্রতিজ্ঞাত এই সংসারোদ্ধারণ আত্মজ্ঞান ব্যতিরেকে সম্ভবপর নহে, তাই তত্ত্বজ্ঞান উপদেশার্থ এই প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকাদ্যায় আরভ করিলেন । তাহাতে সপ্তমাধ্যায়ে অপরা ও পরারূপ প্রকৃতিদ্বয় বাহা উক্ত হইয়াছে এবং যে প্রকৃতিদ্বয়ের বিবেকাত্মক হইলে জীবভাব প্রাপ্ত চিৎশেষের এই সংসার প্রাপ্তি হয়; আর যে প্রকৃতিদ্বয় দ্বারা জীবের উপভোগার্থ দৈশ্বর্য সৃষ্টাদিতে প্রবৃত্ত হন, সেই পরস্পর বিভিন্ন ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ-পদবাচ্য প্রকৃতিদ্বয়ের স্বরূপ নির্ণয় করিবার জন্য]—শ্রীভগবান বলিলেন, হে কোন্ত্যে, এই ভোগায়তন শরীরকে ক্ষেত্র বলা হইয়া থাকে, যেহেতু ইহা সংসারের প্রয়োহভূমি অর্থাৎ সংসাররূপ শস্ত্রের উৎপত্তির ভূমি । এই শরীরকে যিনি জানেন অর্থাৎ আমি ও আমার মনে করেন, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিবেকগণ তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলেন । কারণ কৃষকের স্তায় এই ক্ষেত্রজ্ঞই সেই ক্ষেত্রের ফলভোক্তা । তদ্বিদঃ শব্দের অর্থ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের বিবেকজ্ঞগণ ॥১

[এই শ্লোকের শব্দের ভাষ্য :—“সপ্তমে অধ্যায়ে স্মৃতিতে যে প্রকৃতী দৈশ্বর্যস্ত । ত্রিগুণাত্মিকা অষ্টাভি ভিন্না অপরা সংসার হেতুত্বাৎ, পরা চাত্মা জীবভূতা ক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণেঃ স্বাভাবিকা চ । যাত্য্যং

প্রকৃতিভ্যাং দৈবোঃ অগত্বপত্তিস্থিতিলয়হেতুত্বং প্রতিপদ্যতে । তত্র ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণ—প্রকৃতিদ্বয়নিরূপণদ্বায়েণ তদ্বত দৈশ্বর্যস্ত তবনির্দ্ধারণার্থং ক্ষেত্রাদ্যায় আরভ্যতে । অতীতান-স্তরাধ্যায়ে চ—“অদ্বৈতা সর্বভূতানাম্” ইত্যাদিনা যাবদধ্যায়পরিমাণিঃ তাবৎ তত্ত্বজ্ঞানিনাং সন্ন্যাসিনাং নিষ্ঠা যথা তে বর্তন্তে ইত্যোক্তত্বং, কেন পুনস্তে তত্ত্বজ্ঞানেন যুক্তা যথোক্ত স্বর্গাচরণাং ভগবতঃ প্রিয়া ভবন্তি, ইত্যেবমর্থস্যায়মধ্যায় আরভ্যতে ।”—সপ্তমাধ্যায়ে দৈশ্বরের দুইটি প্রকৃতির কথা বলা হইয়াছে । সংসারের হেতুত্বাৎ ত্রিগুণাত্মিকা অষ্টাভি বিতজ্ঞা যে প্রকৃতি তাহাই “অপরা” এবং অট্ট “পরা প্রকৃতি”—যিনি জীবরূপা এবং ক্ষেত্রজ্ঞ-লক্ষণাবিতা দৈশ্বর্যরূপা । এই দুইটি প্রকৃতির সাহায্যে দৈশ্বর্য ভগবতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণ হইয়া থাকেন । এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণ প্রকৃতিদ্বয়ের তবনিরূপণ দ্বারা সেই প্রকৃতি-দ্বয়সম্পন্ন দৈশ্বরের তত্ত্বনির্দ্ধারণার্থ এই ক্ষেত্রাদ্যায়ের আরভ করা হইতেছে । অতীতান্স্তরাধ্যায়ে অর্থাৎ দ্বাদশাধ্যায়ে—“অদ্বৈতা সর্বভূতানাম্” ইত্যাদি শ্লোক হইতে এই অধ্যায়ের পরিমাণি পর্যন্ত তত্ত্বজ্ঞানী সন্ন্যাসিগণের নিষ্ঠা অর্থাৎ যেভাবে তাঁহারা থাকেন বা আচরণ করেন তাহা বলা হইয়াছে । পুনরায় কিরূপ তত্ত্বজ্ঞানযুক্ত হইয়া যথোক্ত স্বর্গসমূহের আচরণ দ্বারা তাঁহারা ভগবানের প্রিয় হইয়া থাকেন ইহাও বুঝাইবার জন্য এই অধ্যায়ের আরভ হইয়াছে ।

“প্রকৃতিঃ ত্রিগুণাত্মিকা—সর্বকার্য্যকরণবিষয়াকারেণ পরিণতা পুরুষস্ত ভোগোপবর্গার্থ-কর্তব্যভার্য্য দেহদ্বিগুণাত্মাকারেণ সংহততে সৌহর্যং সংঘাতঃ ইদং শরীরম্ । তদেতৎ”—প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিক । প্রকৃতি সর্বকার্য্য, করণ ও বিষয়াকারে পরিণত হইয়া পুরুষের ভোগ ও অপবর্গসিদ্ধি । জন্ত দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির আকারে সংহত হইয়া থাকে—সেই সংঘাতই এই শরীর, তাহাই বুঝাইবার জন্য ভগবান বলিতেছেন “ইদং শরীরং কোন্ত্যে ।” “ইদমিতি সর্বান্যায়োক্তং বিশিনতি পরীমিতি । হে কোন্ত্যে ক্ষতজ্ঞাণাং সন্ন্যাস ক্ষরণাং ক্ষেত্রবদ্ বা অগ্নিম্ কর্ণফলনিরূতঃ ক্ষেত্রমিতি । ইতি শব্দঃ এবং শব্দপদার্থকঃ । ক্ষেত্রম্ ইত্যেবম্ অভিধীয়ন্তে কথ্যতে । এতৎ শরীরং ক্ষেত্রং যো বেত্তি বিজ্ঞানান্তি—আপাদতলমন্তকং জ্ঞানেন বিবরীকরোতি—স্বাভাবিকেন ঔপদেশিকেন বা বেদনেন বিবরীকরোতি বিভাগশঃ তং বেদিতারং প্রাহঃ কথয়ন্তি ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি । ক্ষেত্রজ্ঞ ইত্যেবমাহঃ । কে ? তদ্বিদঃ তৌ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞৌ যে বিদন্তি তে তদ্বিদঃ”—“ইদং” এই সর্বনাম পদেব দ্বারা বাহা উক্ত হইয়াছে তাহাই বিশেষ করিয়া বলা হইতেছে যে উহা শরীর । হে কোন্ত্যে, এই শরীরকে ক্ষেত্র বলা হয় কেন ? কারণ ইহা ক্ষত হইতে জ্ঞান করে, অথবা ইহার ক্ষয় হয় কিংবা ক্ষেত্রবৎ (ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে যেরূপ ফল লাভ হয়) এই দেহকৃত কর্মেরও ফলভোগ হয়—এই ক্ষত ও এই দেহকে ক্ষেত্র বলা হইয়া থাকে । ইতি শব্দের অর্থ “এবং” অর্থাৎ এই প্রকার—এই শরীরকে ক্ষেত্র এই প্রকারে নির্দেশ করা হইয়া থাকে ।

এই শরীররূপ ক্ষেত্রকে যিনি জানেন—অর্থাৎ পদতল হইতে মস্তক পর্যন্ত জ্ঞানের বিষয় যিনি করিয়া থাকেন, স্বাভাবিক অথবা উপদেশজনিত অনুভবের বিষয় করিয়া থাকেন, দেহ হইতে পৃথক সেই দেহবেত্তাকে “ক্ষেত্রজ্ঞ” বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন । কাহারো এই কথা বলিয়া থাকেন ? কাহারো ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এই দুইটি পরার্থকেই জানেন, তাহারাই “তদ্বিদঃ” ॥

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—কুটস্থ স্বাভাবিক অনুরোধ হইতেছে:—এই শরীর ক্ষেত্রের স্বরূপ ইহাতে যিনি চাষ করেন, তাহার নাম ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ ক্রিয়ান।—শরীরকে ক্ষেত্র বলা হয় কেন? আচার্য্য শঙ্করের মতে ইহার তিন প্রকার কারণ হইতে পারে।

(১) প্রথমতঃ ইহা ক্ষত হইতে জ্ঞান করে; (২) যেহেতু ইহার ক্ষয় হয় এইজন্যও ইহাকে ক্ষেত্র বলা হইতে পারে; (৩) ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে যেসকল ফল লাভ হয়, এই যেসকল কর্ণের ফল ভোগও সেইরূপ জীবকে করিতে হয়।

সংসারের চিন্তায় জীব ক্ষত-বিক্ষত হইয়া পড়ে, বিনা সাধনে সে ক্ষত শুকায় না, সুতরাং জ্ঞানান্তর নিবৃত্তি হয় না। এই শরীর না থাকিলেও সাধনা হয় না, সাধন না করিতে পারিলে বার বার জন্ম বাতায়ান্ত নিবৃত্তি হয় না। কর্মায়তন এই যেমন কর্ম দ্বারা জীবকে সুখে দুঃখে আবদ্ধ করে, তদ্রূপ বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া অপবর্গ প্রদানেও কৃতার্ক করে।

ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে যেসকল ফলোৎপত্তি হয়, এবং ক্ষেত্রকর্ত্তা সেই ফলভোগ করেন, এই শরীররূপ ক্ষেত্রে সুকর্ম বা কুকর্ম করিয়া জীবকেও সেইরূপ নিম্নকর্মের ফলভোগ করিতে হয়। কিন্তু ভাল চাষী হইতে পারিলে জীবকে আর কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হইতে হয় না। ভাল চাষী কিরূপে হওয়া যায় শুনিবে? (১) চাষীকে ভাল করিয়া ক্ষেত্র কর্ণ করিতে হইবে। (২) উত্তম বীজ সংগ্রহ করিতে হইবে, এবং (৩) শস্তোৎপত্তির বিষয় সকলকে দূর করিতে হইবে। চাষী যদি ভাল করিয়া ক্ষেত্র কর্ণ না করে বা তাহাতে অমনোযোগী হয় বা অবহেলা করে তবে ভাল বীজ বপন করিলেও সুফল হয় না। এতদ্ব্যতীত দৈবাহুৎস্পাত প্রয়োজন, কারণ সময়মত বৃষ্টি না হইলে ফসল ভাল হয় না, যদি বা সুবৃষ্টি হয়, কিন্তু ভাল করিয়া পানাহার দিতে না পারিলে, শস্তের বহুভাগ কীট-পতঙ্গ, পশুপক্ষী খাইয়া ফেলে।

ক্ষেত্রকর্ষণের জন্য তিনটি বস্তুর প্রয়োজন—ক্ষেত্র, কর্ণযন্ত্র ও পশু। আধ্যাত্মিক চাষে আমাদের এই শরীর হইল ক্ষেত্র, কর্ণযন্ত্র হল হইল প্রাণক্রিয়া বা ধ্যান-প্রদান, এবং এই ধ্যান-প্রদানরূপ হলকে চালনা করিবে মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-পুঞ্জ। এইরূপ প্রাণায়ামাদি প্রাণক্রিয়া করিয়াই জনক রাজা সীতা নারী যজ্ঞ-দেবতা বা সাধনের ফলস্বরূপ সাধনলক্ষী ব্রহ্মবিজ্ঞাকে লাভ করিয়াছিলেন।

বাহারী উত্তম সাধন প্রণালী পাইয়াও সাধনে অবহেলা করেন বা মন দিয়া সাধন না করেন তাহার সাধনার সুমিষ্ট ফল যে শাস্তি তাহা লাভ করিতে পারেন না। দৈবাহুৎস্পাত প্রয়োজন, অর্থাৎ বাহ্যের পূর্ক জন্ম হইতেই সাধন সাধা আছে, বর্তমান জন্মে তাহার পরিশ্রম করিলেই উপযুক্ত ফল পাইয়া থাকেন। কিন্তু তবুও সাধককে সতর্ক থাকিতে হয়, বৈরাগ্য-বান হইতে হয়, নচেৎ বহু তপস্তার ফল ইন্দ্রিয়-বৃত্তিরূপ চোরেয়া অপহরণ করিয়া লয়। সাধকের তীব্র সাধনা ও তাহার ফল দেখিয়া বহুলোকে তাহাকে সম্মান করে, তাহার খ্যাতি দেশ বিদেশে প্রচারিত হইয়া যায়, তাহার ফলে যদি ঐ সকল প্রতিষ্ঠার প্রতি সাধকের লোভ আসে, তাহা হইলে ক্ষেত্রে ভাল ফল জন্মিলেও, সে ফল অভিমানরূপ পশু, পক্ষী, কীটেরা নষ্ট করিয়া দেয়, তাহা অপদেবতার ভোগ্য হয়—দেবতার ভোগে আসে না।

ক্ষেত্রজ্ঞ চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োজ্ঞানং যত্তজ্ঞজ্ঞানং মতং মম ॥ ২

এই ক্রিয়া করেন কে? ক্ষেত্রজ্ঞ জীব বা ক্রিয়াবান সাধক। বদ্ধজীবও ক্ষেত্রজ্ঞ, কারণ এই যেসকল ক্ষেত্র যে তাহার তাহা জীবের জন্য আছে। এইজন্য যেসকল সাধন-পুঞ্জ এবং যেসকল সুখ ও দুঃখ করিবার ইচ্ছা জীবের স্বভাব হইয়া থাকে, কিন্তু যেহেতু সৌষ্টব্য বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য না করিয়া যিনি আপনাকে দেহপাশ হইতে মুক্ত করিতে প্রয়াস করেন তিনি সর্বভাপহর দেহাতীত (বিদেহ) অবস্থা লাভ করিয়া কৃতার্ক হন। এই দেহাতীত ভাবই দেহী ব নিম্নভাব। এইভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলেই জীবের জীবন মোচন হয়। যিনি এই দুই ভাবকেই (দেহবদ্ধ ও বিদেহ) অবগত আছেন তিনিই “ক্ষেত্রজ্ঞ” ॥ ১

অর্থ। ভারত! (যে ভারত) সর্বক্ষেত্রেই অপি (সমস্ত ক্ষেত্রেই) মাং চ (আমাকেই) ক্ষেত্রজ্ঞং বিদ্ধি (ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিও); ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের) যৎ জ্ঞানং (যে বিদেহ জ্ঞান) তৎ জ্ঞানং (তাহাই জ্ঞান) মম মতং (ইহাই আমার অভিমত) ॥ ২

শ্রীধর। তবেই সংসারিণঃ স্বরূপ উক্তম্। ইহানীং তন্ত্ৰৈব পারমার্থিকং অসংসারিণঃ স্বরূপম্।—ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি। তৎ চ ক্ষেত্রজ্ঞং সংসারিণঃ জীবং বস্ততঃ সর্বক্ষেত্রেই অধুগতং মামেব বিদ্ধি, “তত্ত্বমসি” ইতি শ্রুত্বাপলক্ষিতেন চিত্তশেন মজপস্ত উক্তম্। আদ্যবর্মণেব তত্ত্বজ্ঞানং জৌতি। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ যৎ বৈলক্ষণ্যেন জ্ঞানং তদেব মোক্ষহেতুত্বং মম জ্ঞানং মতম্। অস্তৎ তু ব্রহ্মা পাণ্ডিত্যম্। বদ্ধহেতুত্বং ইত্যর্থঃ। তদুক্তং—

‘তৎকর্ম যদ্বন্ধায় সা বিদ্যা বা বিমুক্তয়ে।

আত্মসায়াপবং কর্ম বিজ্ঞাতা শিরনৈনপুণম্’ ॥ ইতি ॥ ২

বদ্যানুবাদ। [এইরূপে ক্ষেত্রজ্ঞের সংসারী স্বরূপ কথিত হইল, সম্প্রতি সেই ক্ষেত্রজ্ঞের অসংসারি স্বরূপের বিষয় বলিতেছেন, অর্থাৎ জীবের ব্যবহারিক স্বরূপ সংসারী হইলেও পরমার্থতঃ তিনি যে অসংসারী সেই বিষয় এইবার বলিতেছেন]—সেই যে ক্ষেত্রজ্ঞ সংসারী জীব বস্ততঃ আমাকেই জানিবে, আমিই সমুদয় ক্ষেত্রে অধুগত অর্থাৎ অধুপ্রবিষ্ট হইয়া আছি, কারণ “তত্ত্বমসি” এই শ্রুতিবাক্যের উপলক্ষিত যে চিত্তশেন তদ্বারা মনরূপের বিষয়ই বলা হইয়াছে। আদ্যবর্মণ এই জ্ঞানের প্রশংসা করিতেছেন যে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যে বিলক্ষণ (বা পৃথক) জ্ঞান, তাহা মুক্তির হেতু বলিয়া আমার মতে উহাই প্রকৃত জ্ঞান। আর অজ্ঞ জ্ঞান বাহা তাহা ব্রহ্মা পাণ্ডিত্য মাত্র, কারণ তাহা বন্ধের হেতু। তাহাতেই বলা হইয়া থাকে—“তাহাই কর্ম দ্বারা বন্ধনের হেতু, তাহাই বিদ্যা দ্বারা মুক্তির হেতু; অজ্ঞাত কর্ম কেবল পরিশ্রমের নিমিত্ত এবং অজ্ঞরূপ বিদ্যা শিরনৈনপুণ্য মাত্র” ॥ ২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ক্ষেত্রজ্ঞ যিনি লাভিদেশেতে আছেন তিনি আমারই স্বরূপ—শুভ্র বাক্যের দ্বারা লভ্য—তিনি সব শরীরে আছেন।—যিনি যেহে অহং-মম অভিমানযুক্ত হইয়া দেহের সুখ দুঃখকে আমার বলিয়া অভিমান করেন তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ,

কিন্তু ঐটুকু মাত্র জানিলেই ক্ষেত্রজ সত্ত্বের সব জানা হইল না। সকল ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ যিনি তিনিই ভগবান তাহা বুঝিতে হইবে। এখন যাহাকে দুঃখ শোকগ্রস্ত জীব বলিয়া মনে হইতেছে সেই জীব পরমাশ্রা হইতে পৃথক বস্তু নহে। যে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরমাশ্রা, জীবেরও স্বরূপ তাই। কিন্তু এই জীব কত অজ্ঞ এবং দৈব সর্গজ সূতবাং জীব ও দৈব যে বিরাট ভেদ রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করিব কিরূপে? ভেদ রহিয়াছে সত্য, কিন্তু এ ভেদ ঔপাধিক, নিত্য সত্য নহে। ঐতি বলিতেছেন—“নেহ নানান্তি কিঞ্চন”—নানা নাই, সূতবাং ক্ষেত্রজ বহিঃ পরমাশ্রা না হন তাহা হইলে সকল ক্ষেত্রেই পৃথক পৃথক ক্ষেত্রজ হওয়ার ক্ষেত্রজের বহু স্বীকার করিতে হয়, তাহা কিন্তু বেদান্তি-শাস্ত্রসম্মত হয় না এবং অসম্ভবেরও বিরুদ্ধ হয়। সনৎসুহৃদাত্মীয় অধ্যাত্মশাস্ত্রে তাই সনৎসুহার বলিতেছেন—

“দোষো মহানত্র বিভেদ যোগে

হনাদিযোগেন ভবন্তি নিত্যঃ।

তথাত্ম নাথিক্যমপৈতি কিঞ্চি-

হনাদি যোগেন ভবন্তি পুংসঃ ॥”

বিভেদযোগে অত্যন্ত দোষ আছে; কারণ মায়াপ্রভাবে তিনি জীবরূপে নিত্য অবস্থান করিতেছেন। সেই এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বর মায়া হেতু বহুত্বের পরিণত হইলেও তাহার আধিক্য কিছুমাত্র ক্ষুদ্র হয় না (শ্রীকৃষ্ণপদ্য দ্বাদশমায় কৃত অমুবাচ)। তবে জীব কেন ও কিরূপে অজ্ঞ হইলেন এবং কিরূপেই বা জীব বর্তমান অবস্থা হইতে নিজ স্বরূপে পৌছিতে পারেন সেই সম্বন্ধেই কিছু বলিতেছি। অবিজ্ঞা উপাধিবশতঃ জীব দেহের সহিত তাহাশ্রা ভাবে মিলিত হইয়া নিজের স্বরূপকে বিস্মৃত হয়। প্রাণের বহির্গুণা গতি দ্বারাই জীবের আত্মবিশ্বাস ঘটে। তখনই তাহার বাহ্য চৃষ্টি স্মরণ হয়। কঠোপনিষৎ বলিতেছেন—“যা প্রাণেন সম্ভবতি অদ্বিত্যৈর্বৈবতাময়ী, তথাং প্রবিশ্ত তিষ্ঠতীং বা ভূতেভির্ব্যভারত। এতদৈবতং।” সর্গ দেবতারূপী যে অদ্বিত্য (অর্থাৎ বিষয়ভোক্তা ক্ষেত্রজ) প্রাণেন অর্থাৎ প্রাণ শক্তির সহিত প্রকাশিত হন এবং যিনি ভূতগণের সহিত অর্থাৎ পঞ্চভূত-সমমিত হইয়া উৎপন্ন হ'ন তিনিই জীবের স্বয়ং-গুহায় (কূটস্থের অভ্যন্তরে) অবস্থিত, সেই চিন্মতিকে যিনি দর্শন করেন তিনি ব্রহ্মকে দর্শন করিয়া থাকেন।

“পরাক্রি যানি ব্যতৃণং স্বয়ংসুত্ত্বাং পরাজ্ পশুতি নাস্তরাশ্চন।” পরমেশ্বর ইন্দ্রিয়-নকলকে বাহ্য পরার্থধর্মা করিয়া নির্মাণ করিয়াছেন সেইজন্য জীব স্বাধি বাহ্য পরার্থ জানিতে পারে, অন্তরাত্মাকে জানিতে পারে না।

বাহ্যজ্ঞান স্মরণের সহিত জীব নিজেকে দেহমাত্র (প্রকৃতি) মনে করে এবং দেহ স্বরূপ ছাড় সেইরূপ তাহার বুদ্ধিও অড়ভাবাপন্ন হইয়া অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হয়। আবার এই বহির্গুণা গতি রুদ্ধ হইলেই জীব যে শিব ছিল সেই শিবই হইয়া যায়।

“উর্দ্ধং প্রাণয়ুগ্ময়ত্য়ানং প্রত্যগত্য়তি।

মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বদেবা উপাসতে ॥”—কঠ

তিনি এই প্রাণের উর্দ্ধগতি ও অপানের অধোদিকের গতি “অত্য়তি” নিষ্কোপ করেন (অর্থাৎ তাহাকে অবলম্বন করিয়াই প্রাণাপানের গতি চলিতেছে); এই প্রাণাপানের সন্ধি-স্থলে অর্থাৎ প্রাণায়াম দ্বারা চুই বায়ু হৃদয়ে স্থির হইলে, সেই স্থিতির মধ্যে বামন দেবকে বুঝিতে পারা যায়, এবং বুঝিতে পারা যায় ইহাকেই বিশ্বের সমস্ত দেবতা উপাসনা করিতে-ছেন। “স উ প্রাণজ প্রাণঃ—তিনিই প্রাণের প্রাণ অর্থাৎ এই প্রাণ যাহা হইতে শক্তিনাভ করিতেছে। সেই স্থির প্রাণকে উপাসনা করিতে করিতেই সাধক ব্রহ্মে সীন হইয়া যান। ঐতি বলিতেছেন—“ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি”। এইরূপে নিজেকে নিজে জানিতে পারিলেই অজ্ঞান কাটিয়া যায়, সব ধাঁধা মিটিয়া যায়। ব্রহ্মকে ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিলে আর তাহাতে সর্পভ্রম হইবার আশঙ্কা থাকে না, তজ্জপ আপনাকে আপনি চিনিতে পারিলে আর এই কল্পিত অজ্ঞানের (জীবতাব) দ্বন্দ্ব বিড়ম্বিত হইতে হয় না।

প্রাণের যে বহির্গুণগতি দ্বারা এই মহা অনর্ঘ উৎপন্ন হইয়াছে, নিজের স্বরূপাবস্থায় ফিরিতে হইলে যে পদ দিয়া বাহিরে আসা হইয়াছে আবার সেই পদ দিয়াই ঘরে প্রবেশ করিতে হইবে। গীতা ব্যাখ্যায় বহুস্থানেই আলোচিত হইয়াছে যে ইড়া-পিঙ্গলায় যতদিন খাস বহিতে থাকে ততদিন এই জগদর্শন নিবৃত্ত হয় না এবং ভগবানের ঘোর রূপ দর্শনও বন্ধ হয় না। সেইজন্যই আমাদিগকে প্রতিনিয়ত সাধনায় সচেতন থাকিতে হইবে। তৃতীয় পাদ সুসুয়ার ক্রিয়া করিতে করিতে উর্দ্ধে মস্তকে স্থিতিরূপ এক অবস্থা বা পুরুষের উদয় হইয়া থাকে। সেই স্থিতি পদে থাকিতে থাকিতেই বিশ্বদর্শন লোপ পায়। স্বভাবতঃ বিক্ষিপ্ত মন ক্রিয়ার দ্বারায় ক্রিয়ার পর অবস্থায় যত দীর্ঘ স্থিতি লাভ করিবে ততই বহু একের মধ্যে প্রবেশ করিবে এবং এই বিশ্ব ব্রহ্মময় হইয়া যাইবে। যখন সব এক হইয়া যায় তখনই পুরুষোত্তম জীব। এই পুরুষোত্তমকে দেখিবার উপায়ই হইল ক্রিয়া। এই পুরুষোত্তম অবস্থায় যিনি ব্রহ্মানন্দরূপ, জীবরূপে তিনিই আবার বিষয়ানন্দে বিভোর হইয়া আছেন।

যিনি বিশ্বাতীত তিনিই আবার বিশ্ব। পুরুষ স্তম্ভে আছে—“তাবানশ্চ মহিমা ভতো জ্যায়াংচ পুরুষঃ, পাদশ্চ বিশ্বভূতানি ত্রিপাদশ্চমৃতং দ্বিবি।” প্রাণরূপী নারায়ণের ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্নাই তিনটি পদ। এই তিন পদ যখন সুসুয়ার এক হইয়া যায় তখনই স্থির পদ বা ক্রিয়ার পর অবস্থায় অসুভব হয়। ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিতে থাকিতে পরব্যোমের অগ্রর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারা যায় এবং তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেই ‘সর্গে ব্রহ্মময়ং জগৎ’ হইয়া যায়। সেই পরব্যোম বা ব্রহ্মই মহৎব্রহ্ম হন, তখন তিনি কূটস্থ জ্যোতিঃরূপে আপনাকে আপনি সৃষ্টি করেন। ঐ মহৎ ব্রহ্মই প্রাণরূপ স্থাবর-জঙ্গমাশ্রক বিশ্বকে প্রকাশিত করেন। সৃষ্ট বস্তু মাত্রই প্রাণের দ্বারা প্রকাশিত হয় বলিয়া তৎসমুদায়কে প্রাণী বলা হয়। এই প্রাণ সূক্ষ্ম বায়ুরূপে সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর মধ্যেই রহিয়াছেন। এই সূক্ষ্মাত্মসূক্ষ্ম বায়ুরূপই স্থূলভূতে পরিণত হইয়াছে। স্থূলভূতের এই স্থূল অণু যাহার দ্বন্দ্ব স্থূল ভাব দর্শন হয়, আবার বায়ু দ্বারাই তাহার স্থূলত্ব নশ হয়। এই জ্ঞ প্রাণক্রিয়া (বায়ুর ক্রিয়া) কবা প্রয়োজন। মন স্থূল চিন্তা করিতে করিতে একেবারে স্থূল হইয়া যায়, তখন আর সূক্ষ্ম চিন্তা

করিতেই পারে না। প্রাণক্রিয়ার দ্বারা মনের এই স্থূলতা নষ্ট হয়। এই প্রাণই ক্রমরূপে নাভিতে আছেন উহা। তেজঃস্থান, এ স্থানের শক্তি হইতে বাক্য স্মৃতিত হয়। এই বাক্যের যত বিস্তার হইবে ততই প্রাণের চক্ষুস্বা বৃদ্ধি পাইবে। প্রাণের চক্ষুস্বা অবস্থাই মন, এই চক্ষুস্বা মনই জীবকে মৃত্যুপাশে আবদ্ধ করে। যজুর্বেদে আছে—“মরুতঃ শিবঃ, মরুতঃ ব্রহ্ম”। মরুত যখন স্থির হইলেন তখন শিব এবং সেই মরুতই চক্ষুস্বা হইয়া মন রূপে সংসার রচনা করিতেছেন। তাই বেদ বলিতেছেন “নমস্তে বায়ো অমের প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি, তন্মামবতু”—হে বায়ু, তুমিই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম, তোমাকে নমস্কার, তুমি আমাকে রক্ষা কর, অর্থাৎ আমার এই সংসার-গতিবোধ কর। আমাদের মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সমস্তই আত্মার মহিমা। কিন্তু উহা সমস্তই বাহ্য মহিমা। ক্রিয়া করিয়া সাধক যত স্থির হইতে থাকেন ততই আত্মার ভিতরের মহিমা বা ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধিতে সমর্থ হন। এই স্থির পদের অমৃতত্বের সহিত আমার (আত্মার) সর্বব্যাপকত্ব, সর্বজ্ঞত্ব ও সর্বশক্তিমানতার অমৃতত্ব হইতে থাকে। এখন যে জীবকে অজ্ঞ বা অল্পজ্ঞ মনে করিতেছি সে সব তখন উন্টাইয়া যাইবে। এই ক্রিয়ার দ্বারাই তাঁহার “জ্যায়াঃ” অর্থাৎ উৎকৃষ্ট পদ অমৃতত্ব হয়। উহাই উত্তমপুরুষ তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। উহাই অমৃতত্ব পদ বা আপনাতে আপনি। এইরূপ অবস্থা যে সাধকের প্রাপ্তি হয়, তাঁহার নিকট আর ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজের পার্থক্য বোধ থাকে না। উহার নামই জ্ঞান।

সেই জ্ঞান জীব ও পরমেশ্বর বিভিন্ন একরূপ সিদ্ধান্ত শাস্ত্রে দোষযুক্ত বলিয়াছেন। কারণ জীব অন্তবস্ত্র নহে, মায়া হেতু পরমাত্মাই জীবরূপে নিত্য বর্তমান। জীব ও পরমেশ্বরে বা জীবের সহিত জীবের যে ভেদ তাহা ঐপাদিক, তাত্ত্বিক নহে। “ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুষ ইয়তঃ”—ইন্দ্র অর্থাৎ ব্রহ্ম মায়া দ্বারা বহু রূপ ধারণ করিয়া আছেন। সূত্রবাং অসংখ্য যে জীবতাব তাহা পরমাত্মারই রূপভেদ মাত্র। এই মায়া পরমেশ্বরে শক্তি রূপে নিহিত থাকে। পুরুষের যেমন আদি নাই, অন্ত নাই, প্রকৃতিও সেইরূপ আচল-রহিত। ভগবান এই অধ্যায়েরই বলিয়াছেন—“প্রকৃতিঃ পুরুষত্বৈব বিদ্যমানি উভাবপি”—প্রকৃতি পুরুষ উভয়ই অনাদি। জীবের ভোক্তৃত্ব এবং তাহার ভোগ ও ভোগ্য এ সমস্তই মায়া হেতু কল্পিত হয় মাত্র, উহা পরমার্থিক সত্য নহে। মায়া হেতু যে ভেদ দৃষ্ট হয় সেই মায়া সংযোগ ছিন্ন হইলেই ভেদজ্ঞান বিলুপ্ত হয়। অথও আকাশের ঘটাকাশ উপাধি মাত্র, ঘটোপাধি নাশের সহিত ঘটাকাশের পৃথক প্রতীতি থাকে না, তজ্জপ অথও পরমাত্মার কোন একটু অংশ মায়াচ্ছন্ন হইলে সেই অংশটুকুর জীব উপাধি হয়। এই উপাধি সর্বাবস্থায় থাকে না, উপাধি তিরোহিত হইলেই তখন তাহা পরমাত্মার সহিত অথও অভেদ রূপে প্রতীয়মান হয়। নারদপঞ্চমোক্ত উক্ত হইয়াছে—“আমুক্তেভেদ এব শ্চাং জীবন্ত চ পরন্ত চ। যুক্তস্ত তু ন ভোদোহন্তি ভেদহেতোবাবতঃ”—যুক্তি পর্যাভুতই ভেদ ব্যবহার, যুক্তির পর ভেদ হেতুর অভাববশতঃ ভেদজ্ঞান থাকে না। ক্রতিও বলিয়াছেন—“যদা নচঃ শূন্যমানাঃ সমুদ্রোহন্তঃ গচ্ছন্তি নামরূপে বিহার। তথা বিভ্রান্মরূপাদিমুক্তঃ পরাংপরঃ পুরুষমুপৈতি দিব্যম্”—নদী সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া যেমন তাহার নাম ও রূপ পরিত্যাগ করে, জীবও জ্ঞানের দ্বারা পরাংপর পুরুষে মিলিত হইয়া তাহার সমস্ত নামাদি ভেদ চিহ্ন হইতে বিমুক্ত হয়।

তৎক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।

স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু ॥ ৩

দেহ-দৃষ্টি হেতুই জীব ও ব্রহ্মে ভেদ ব্যবহার সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় দেহাদিসংঘাত হইতে জীব যখন পরম পুরুষে মিলিয়া এক হইয়া যায় তখন ভেদের কোন পারমাণ্বিকতা থাকিতে পারে না। জীব দেখিতে যদিও অসংখ্য এবং প্রত্যেক জীবই পরমাত্মার অংশ, তথাপি উহাতে পরমাত্মার পূর্ণত্ব ও একত্বের হানি হয় না, কারণ এই জীবতাব অবিচ্ছিন্ন, পারমাণ্বিক সত্য নহে। প্রতিবিম্ব অসংখ্য হইলেও প্রকৃত সূর্য্যের যেমন তাহাতে ক্ষয় বা হ্রাস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না, তজ্জপ জীব যতই অসংখ্য ও অগণ্য হউক পরমাত্মার তাহাতে হ্রাস বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। সেই জ্ঞান ভগবান দেখিয়া বা ধর্ম্মায়াতে অধিষ্ঠিত হইয়া যখন বহুরূপে আপনাকে প্রকাশিত করেন তখনও তাঁহার পূর্ণত্বের হানি হয় না। সূত্রবাং সাংখ্যের অসংখ্য পুরুষবাদের সত্ত্বেও পরম পুরুষে নানাত্ব নাই, তিনি এক অখণ্ড-জীবই চির বর্তমান। যৈতুর্ধ্ব্যবান্ ভগবান মায়া দ্বারাই জগৎপ্রপঞ্চরূপে পরিণত হন, এবং মায়া-হেতুই এই প্রপঞ্চের বোধ হয়, বাস্তবিক তাহাতে বিকার নাই। স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর জাগ্রদবস্থার যেরূপ অস্তিত্ব থাকে না, তজ্জপ মায়া নিরুত্তর হইলেই এই দৃশ্যমান জগৎসত্ত্বও কোন অস্তিত্ব থাকে না। নাভিদেশেতে সমান বায়ুর স্থান, ঐখানেই ক্ষেত্রজের অবস্থান। তিনিই এই ক্ষেত্রকে চালনা করিতেছেন, তেজঃরূপে। মৃত্যুর সময় এই তেজের যত অভাব হয় ততই শরীরের ক্রিয়াশক্তি নষ্ট হইতে থাকে। সমান বায়ু ঢিলা হইলেই আর প্রাণকে দেখে বসিয়া রাখা যায় না। নাভিঃ শক্তিই কুটুম্বের তেজঃ বা শক্তি, এইজন্য উভয়ে উভয়ের সখা। ইহাকে অবগত হইতে হইলে গুরুবাক্য-গম্য সাধনায় প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যিক ॥ ২

অন্বয়ঃ। তৎ ক্ষেত্রং (সেই ক্ষেত্র) যৎ চ (যাহা অর্থাৎ যেরূপ জড়-দৃশ্যাদি স্বভাবযুক্ত), যাদৃক্ চ (যেরূপ অর্থাৎ যেরূপ ইচ্ছাদি ধর্ম্মযুক্ত) যদ্বিকারি (যেরূপ ইন্দ্রিয়াদি বিকারযুক্ত), যতঃ (যেরূপ প্রকৃতি-পুরুষ সংযোগ হইতে উৎপন্ন), যৎ চ (স্থাবর-জঙ্গমাদি ভেদে যেরূপ বিভিন্ন), সঃ চ (এবং সেই ক্ষেত্রজ), যঃ (যৎস্বরূপ অর্থাৎ স্বরূপতঃ যাহা), যৎপ্রভাবঃ (যেরূপ অচিন্ত্য প্রভাবযুক্ত) তৎ (তাহা) মে (আমার নিকট) সমাসেন (সংক্ষেপে) শৃণু (শ্রবণ কর) ॥ ৩

তীর্থঃ। অত্র যদ্যপি চতুর্বিংশতিভেদৈঃ ভিন্না প্রকৃতিঃ ক্ষেত্রং ইত্যভিপ্রোক্তং তথাপি দেহরূপেণ পরিণতাত্ম্যমেব তত্চাং অহংভাবেন অবিবেকঃ স্মৃট ইতি। তদ্বিবেকার্থং ইদং শরীরং ক্ষেত্রমিত্যাখ্যে উক্তম্ তদেতৎ প্রপঞ্চকিয়ম্ প্রতিজানীতে—তদ্বিত্তি। যদ্বক্তং ময়া তৎ ক্ষেত্রং যৎ স্বরূপতো জড়ং দৃশ্যাদি স্বভাবং। যাদৃক্—যাদৃশং চেচ্ছাদিধর্ম্মকং। যদ্বিকারি—যৈঃ ইন্দ্রিয়াদিবিকারৈঃ যুক্তং। যতশ্চ—প্রকৃতিপুরুষসংযোগাদ্ ভবতি। যদ্বিত্তি—যৈঃ স্থাবর জঙ্গমাদিভেদৈঃ ভিন্নমিত্যর্থঃ। স চ ক্ষেত্রজো, যঃ—স্বরূপতঃ, যৎ প্রভাবশ্চ—অচিন্ত্যধর্ম্মা-যোগেন যৈঃ প্রভাবৈঃ সম্পন্নঃ। তৎসর্বং সংক্ষেপতঃ মন্তঃ শৃণু ॥ ৩

বল্লাভমুখ্য। [এখানে বহিঃ চতুর্বিংশতি প্রকার ভেদে ভেদবিশিষ্ট প্রকৃতিই ক্ষেত্র বলিয়া ভগবানের অভিপ্রেত, তথাপি হেতুস্বৰূপে পরিণত সেই প্রকৃতিতেই অহংরূপে অব্যবহৃত পৰিস্ফুট, এই নিমিত্ত সেই প্রকৃতির বিবেকার্থ এই শরীরকেই ক্ষেত্র বলিয়া নির্দেশ করিলেন। তাহাই বিস্তৃত করিয়া বুঝাইবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিতেছেন]—মৎকর্তৃক উক্ত যে ক্ষেত্র তাহা (১) “যৎ” অর্থাৎ যেরূপ ভড়-দুশ্চাৰি স্বভাবযুক্ত, এবং (২) যাদৃক্ অর্থাৎ যাদৃশ ইচ্ছাদি ধৰ্ম্মক (৩) “যদ্বিকারি” যেরূপ ইন্দ্রিয়াদি বিকারযুক্ত, এবং (৪) “যতঃ” যেরূপে প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ হইতে উৎপন্ন হয় (৫) “যৎ” যে প্রকারে স্থাবর-জঙ্গমাди ভেদে বিভিন্ন হয়। সেই ক্ষেত্রজ (৬) “যঃ” অর্থাৎ সেই ক্ষেত্রজ স্বরূপতঃ যাহা, এবং (৭) “যৎ প্রভাবঃ” অর্থাৎ অচিন্ত্য ঐখৰ্য্য যোগদ্বারা যেরূপ প্রভাবসম্পন্ন—তাহা সমস্ত সংক্ষেপে আমার নিকট শ্রবণ কর ॥ ৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সেই শরীর যাহা যেরূপ এবং তাহার বিকার হইয়া যাহা যেরূপে সংসারে—সকল লোকে আবৃত আছে, অর্থাৎ ক্রিয়া—সর্বদা আত্মাতে থাকা—ইহার নাম কার—বিকার অন্তরিক্তে আসক্তিপূর্বক দৃষ্টি করা তাহার দ্বারায় মনের বিকার ও প্রকাশ—তাহা সমুদয় শুন।—ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য ভগবান এইবার তাহা বলিবেন, এবং অজ্ঞকে উহা ভাল করিয়া শুনিয়া বুঝিয়া লইতে বলিতেছেন। শরীরটা যেরূপ ভড়দুশ্চাৰ্য্যস্বভাবযুক্ত এবং উহা যেরূপ ইচ্ছাদি ধৰ্ম্মবিশিষ্ট হইয়া সকলের জ্ঞানকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে, এবং তাহা হইতে কিরূপ বিভিন্ন কার্য্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা বিশেষরূপে জ্ঞাতব্য। আত্মা যখন আপনাতে আপনি থাকেন তখন এই দেহাদির কার্য্য কিছুই থাকে না, তখন সকল কাজই বন্ধ। নাইও কিছু এবং সেই জন্য আসক্তিও কিছুতে নাই, যেমন শূন্যগুণে হইয়া থাকে। আবার মন যেমনই ছাগিয়া উঠে, আসক্তিপূর্বক চারিদিকে দৃষ্টি করে, অমনি পঞ্চেন্দ্রিয় পঞ্চ-বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়। যাহা ছিল না সেই সংসার আবার চারিদিক হইতে দৃষ্টিয়া উঠে। অব্যক্তের মধ্যে যাহা প্রনিষ্ট ছিল তাহা যখন আবার ব্যক্ত হইতে থাকে তখন একেবারেই স্থূলতম ভাব প্রাপ্ত হয় না, আগে কাবণ পবে স্থূল, তাহার পবে স্থূলের বিকাশ হয়। এই সকল বিকার বা প্রকাশের কথাই ভগবান বলিবেন। এবং এই সকল যাহা কিছু বিকাশ তাহা সমস্তই যে অচিন্ত্য ঐখৰ্য্যযোগসম্পন্ন ক্ষেত্রজের শক্তি, সেই “ক্ষেত্রজ” বিশেষভাবে আলোচনীয়। এই দেহেন্দ্রিয়াদি মন লইয়াই সংসার এবং এই সমগ্র সংসার সেই স্বরূপাবস্থারই বিকার। তাহা হইতেই হইয়াছে, আত্মা না থাকিলে এই জগৎ প্রপঞ্চ ব্যক্ত হইতেই পারিত না। পৃথিবী বস্তু আকাশকে বেষ্টন করিয়াই উৎপন্ন হয়, আকাশ ব্যতীত তাহাদের প্রকাশ কেহই দেখিতে পাইত না, তজ্জপ এই জগৎপ্রপঞ্চ প্রকৃতির পরিণাম, এবং প্রকৃতি তাহার, হৃতরাং সবই তিনি। দেহেন্দ্রিয়াদির উপর সোয়ার হইয়া মন কত না বাহ্য চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকে, তাহার বাসনার আর অন্ত নাই। বহির্গুণ জীব একেবারে নিজ নিকেতনের কথা ভুলিয়া যায়। সংসার-তাপে ভাপিত হইয়া জীব অবিরত হাহাকাৰ করিতেছে, কিন্তু কিসে নীতল হওয়া যায়, কোথায় গেলে সে জুড়াইতে পারে সে নব কথা সে ভুলিয়া গিয়াছে। নিদ্রের ধর ছাড়িয়া পবের ধরে আশ্রয় পাইবার জন্য কাঁদিয়া বেড়াইতেছে। এ আন্তি কেন

ঋষিভির্ষজ্জ্বা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্ ।

ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমন্তির্বিবিশিষ্টতৈঃ ॥ ৪

হয় ? প্রকাশশীল স্থির আত্মায় এক দিন সমস্তের ঋটিকা উপস্থিত হইল, সেই ঋটিকাবেগ স্থির সমুদ্রকে বেন বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিল, তখন মনোরূপ তরঙ্গরাশি তাণ্ডব নৃত্য করিতে করিতে বাহিরের দিকে ছুটিয়া আসিল এবং সমস্ত দ্বিগ্দিগন্ত তরঙ্গাভিঘাত জনিত অসংখ্য জলকণায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। জলকণা আপনাকে বিস্তৃত হইল, তাহার মূল কারণকে ভুলিয়া গেল, আপনাকে অত কিছু মনে করিয়া তাহার অহং অভিমান ছাগিয়া উঠিল—

“দেহাভিমান যুক্ত হয় যবে “আমি” এই
বিশ্ব হ’তে ভিন্ন “আমি” বোধ তার হয় সেই।

নানাত্মের ধণ্ডজ্ঞান তখনই ক্ষুণ্ণিত হয়

উহাই অজ্ঞান-সিদ্ধ জীব তাহে মগ্ন রয় ॥”

তখন ক্ষুণ্ণার্ভ ক্ষিপ্ত কুক্ষেরেব চায় সমস্ত দৃশ্য বস্তুকে উপভোগ করিবার জন্য সে উন্নত হয়। কে ভোগ করিবে, কাহাকে ভোগ করিবে এবং কেন ভোগ করিবে এ সব কথা একবার আলোচনাও করে না। ইহাই বিকৃতির লক্ষণ। সর্বত্রই তখন আসক্তির সহিত দৃষ্টি করে। আবার গুরুপায় যখন নিজ নিকেতনের কথা, নিজের কথা মনে পড়ে, তখন সে ব্যাকুল হইয়া সাধনাভ্যাস করে। সাধন করিতে করিতে ভিতরের কপাট উন্মুক্ত হয়, তখন সে আপনায় স্থান ও আপনাকে চিনিয়া লইয়া আপনাতে আপনি প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন তাহার আর অত কিছুতেই আসক্তি হয় না। আত্মা ব্যতীত অত বস্তুতে আসক্ত হইলে জীবের যে কি দুর্গতি হয় তাহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। এ সমস্তই দেহাসক্তিবশতঃ হইয়া থাকে। এই দেহই প্রকৃতি, প্রকৃতিই জীবকে সংসারে টানে। যিনি ক্রিয়া করিয়া পরাবস্থায় থাকেন তাঁহাকে আর এই বিকৃত ভাবের মধ্যে পড়িতে হয় না ॥ ৩

অনুয়। ঋষিভিঃ (ঋষিগণ কর্তৃক) বহুধা গীতং (বহু প্রকারে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের স্বরূপ গীত অর্থাৎ নিরূপিত হইয়াছে), বিবিধৈঃ ছন্দোভিঃ (ঋগাধিবাদ চতুষ্টয়ে—মন্ত্রে ও ব্রাহ্মণে) পৃথক্ (ভিন্ন ভিন্ন পৃথকীয় দেবতারূপে) গীতং—এই তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে; বিবিশিষ্টতৈঃ (সংশ্লিষ্টরহিত) হেতুমন্তিঃ (যুক্তিযুক্ত) ব্রহ্মসূত্রপদৈঃ চ এব (ব্রহ্মসূত্রপদের দ্বারাও) [গীতং—ব্যাখ্যাত হইয়াছে] ॥ ৪

শ্রীধনু। কৈঃ বিস্তরেণোক্তং অয়ং সংক্ষেপঃ ? ইতি অপেক্ষায়ামাহ—ঋষিভিরিতি। ঋষিভিঃ—বিশিষ্টাধিভিঃ যোগশাস্ত্রেণ ধ্যানধারণাদিবিষয়তেন বৈবাক্যদ্বিরূপেণ বহুধা গীতং—নিরূপিতম্। বিবিধৈঃ বিচিত্রৈশ্চ নিত্যনৈমিত্তিককাম্যবিষয়ৈঃ। ছন্দোভিঃ—বৈদৈঃ। নানা যজ্ঞনীয় দেবতারূপেণ গীতম্। ব্রহ্মণঃ সূত্রেঃ পদৈশ্চ। ব্রহ্ম সূত্রেতে সূচ্যতে এভিরিতি ব্রহ্মসূত্রোশি যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে’ ইত্যাদীনি তটস্থলক্ষণপরাণি উপনিষদাভ্যন্তি। তথা চ ব্রহ্ম পণ্ডিতে গম্যতে সাক্ষাৎ জ্ঞায়তে এভিরিতি পরানি স্বরূপলক্ষণপরাণি “সত্যম্

জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদীনি তৈশ্চ বহুধা গীতম্ । কিঞ্চ হেতুমস্তি: সদেব "সৌম্যোহমগ্রঃ আসীৎ", "কথমসতঃ সজ্জায়ত" ইতি, "কো হেবাভ্যাং কঃ প্রাণ্যাং যদেব আকাশ আনন্দো ন স্তাৎ এব হেবানন্দয়তি ইত্যাদিযুক্তিমস্তি: । অস্তাৎ অপানচেষ্ঠাং কঃ কুর্যাৎ, প্রাণ্যাং প্রাণব্যাপারং বা কঃ কুর্যাদিতি প্রতিপাদকৈবিত্যর্থঃ । বিনিশ্চিত্তে:—উপক্রমোপ-সংহারৈ: একবাক্যভায়া অসন্দ্বিগ্ধার্থপ্রতিপাদকৈবিত্যর্থঃ । তদেবম্ এতৈশ্চিস্তবিশেষেভ্যঃ হু:সংগ্রহঃ সংক্ষেপত: তুভ্যং কথয়িষ্যামি তৎ শৃণু ইত্যর্থঃ । যদা "অথাভ্যো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" ইত্যাদীনি ব্রহ্মস্বরূপাণি গৃহ্যন্তে, তান্তেব ব্রহ্ম পদভেদে নিশ্চয়িত্তে এতিরিত্তি পদানি তৈ: হেতুমস্তি: বিনিশ্চিত্তার্থৈ: । শেষঃ সমানং ॥ ৪

আশুবাদ । [কোন সকল ব্যক্তি-কর্তৃক এই বিষয় বিস্তৃতভাবে উক্ত হইয়াছে, যাহার ইহাই সংক্ষেপোক্তি? এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন]—বিশিষ্টাধি ঋষিগণ-কর্তৃক যোগশাস্ত্রে বৈবৰ্ণ্যাদিপে ধ্যান-ধারণাদিবিষয় বলিয়া বহু প্রকারে যে তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে এবং বিচিত্র নিত্য-নৈমিত্তিক কাম্য কৰ্ম্মাদি বিষয় যাহা (ছন্দ:) বেদ নানা যজ্ঞনীয় দেবতারূপে নিরূপণ করিয়াছেন; এবং ব্রহ্মস্বরূপ দ্বারা (অর্থাৎ যাহা দ্বারা ব্রহ্ম সৃষ্টিত হন, যেমন—“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” অর্থাৎ যাহা হইতে ভূতগণ উৎপন্ন হয়, ইত্যাদি ব্রহ্মের তটস্থলক্ষণের উপনিষদ বাক্য দ্বারা; এবং পদ বদ্বারা ব্রহ্মকে সাক্ষ্যে জানা যায়, যেমন—“সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম—অর্থাৎ সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ ইত্যাদি স্বরূপলক্ষণের প্রতি দ্বারা তাহার যাহা নানারূপে নির্ণয় করিয়াছেন; এবং যুক্তিযুক্ত প্রতিবাক্য যেমন—“সদেব সৌম্যোহমগ্র আসীৎ”—হে সৌম্য, সৃষ্টির পূর্বে সৎ মাত্র ছিল, “কথম্ অসতঃ সৎ জায়ত”—অসৎ হইতে সত্ত্বের উৎপত্তি কিরূপে হইতে পারে? যদি এই আকাশে (ছন্দে) আনন্দস্বরূপ আত্মা না থাকিতেন, তবে অপানের কৰ্ম্ম বা প্রাণের চেষ্ঠা কে করিত, এই আত্মাই প্রাণগণকে আনন্দিত করেন ইত্যাদি হেতুম্ প্রতিপাদ্য গীত হইয়াছে । “অস্তাৎ” পদ দ্বারা অপান চেষ্ঠা কে করিত, “প্রাণ্যাং” পদ দ্বারা প্রাণ ব্যাপার কে করিত—ইহা উক্ত প্রতিমধ্যস্থ পদেরই অর্থ । “বিনিশ্চিত্ত” শব্দের অর্থ উপক্রম হইতে উপসংহার পর্যন্ত এক বাক্যে অসন্দ্বিগ্ধ প্রতিপাদক যুক্তিযুক্ত শব্দ দ্বারা যাহা বিস্তৃতভাবে নিরূপিত হইয়াছে সেই হু:সংগ্রহ (যাহার সার সংগ্রহ করা হু:সাধ্য) তত্ত্ব আমি সংক্ষেপে তোমাকে বলিতেছি তাহা শ্রবণ কর ।

অথবা “অথাভ্যো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা”—সাধন চতুষ্টিয়ের পর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করিবে ইত্যাদি বেদান্তসূত্রসমূহ “ব্রহ্মস্বরূপ” শব্দে গৃহীত হইয়াছে, আর সেই সকল সূত্র দ্বারা ব্রহ্ম ‘পদভেদে’ অর্থাৎ নিশ্চয়ীকৃত হয় বলিয়া তাহার পদ, সেই সকল হেতুম্ ও বিনিশ্চিত্তার্থক পদ দ্বারা ব্রহ্ম নিরূপিত হইয়াছে । অপর অংশের অর্থ পূর্বের মত ।

[স্বরূপ ও তটস্থ এই দুইটি লক্ষণ দ্বারা ব্রহ্ম নিরূপিত হন । যাহা নিজেই নিজের লক্ষণ অর্থাৎ প্রমাণান্তর নিরপেক্ষ—তাহাই ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ—যেমন ‘সত্যং জ্ঞানমনস্তং’—এগুলি তাঁহার সাক্ষ্যে পরিচয় । ব্রহ্ম সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের কারণ—ইহাই ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ—“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” ইত্যাদি] ॥ ৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সমুদয় কালী প্রভৃতি রূপ—ইহারা এই কূটস্থের মধ্যে দৃশ্যমান হয়েন—ইহারাই ঋষি—ইহার প্রমাণ ভগ্নেভে কালিকা ঋষি—ছন্দ নানা প্রকার কূটস্থের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়—পৃথক পৃথক ব্রহ্মের সূত্র মেরুদণ্ডে আছেন ইহার অন্তর্গত বিশ্বসংসার—ভাষাও ক্রিয়ার দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায়—যিনি মূলধার হইতে ব্রহ্মরূপ পর্যন্ত কূটস্থ স্বরূপে বিরাজমান তিনিই এই শরীরের হেতু—স্বন্দর ও নিশ্চিত-রূপ সকল শাস্ত্রেই কথিত আছে । বিশিষ্ট প্রভৃতি ঋষিরা বহু শাস্ত্রে এই ক্রোড় ও ক্রোড়জের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন । বেদের কৰ্ম্মকাণ্ডে ও জ্ঞানকাণ্ডে ইহার আলোচনা আছে, উপনিষদাদিতে ও বেদান্তসূত্রে এবং সিদ্ধান্তবাচস্পথের সিদ্ধান্তে এই অতীব সূক্ষ্ম ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে । আলোচিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু কেবল আলোচনার ব্রহ্মতত্ত্ব জানা যায় না । একত্র তপস্তার প্রয়োজন । প্রাণায়ামাদি তপস্তার দ্বারা নাড়ী শুদ্ধ হইলে তবে সত্যজ্ঞান প্রকাশিত হয় । ঐ প্রকাশ আমাদের সকলের মধ্যেই রহিয়াছে । সেই প্রকাশই কূটস্থ জ্যোতিঃ, তাহার মধ্যেই উত্তম পুরুষকে দেখা যায় । তখন এক শুদ্ধ নির্মল রশ্মির প্রকাশ হয়, যাহার মধ্যে কোন বৎ নাই, উহা দেখিতে দেখিতে সাধক ব্রহ্মময় হইয়া যান । সাধন করিতে করিতে সাধকের শরীরে এক বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হয়, ঐ শক্তিই অনির্লচনীয়া ব্রহ্মশক্তি গায়ত্রী । গায়ত্রীর প্রথমে ওঁকার ধ্বনি আপনা আপনি শুনিতে পাওয়া যায় এবং নানাপ্রকার অনাহত শব্দই শুনিতে পাওয়া যায় । তখন অল্পময় কোষও ব্রহ্মরূপ হইয়া যায়, প্রাণ অল্পব্রহ্মে মিলিত হয় । প্রাণ সমস্ত ভূতের মধ্যে আছে বলিয়াই সমস্ত ভূতাদির প্রকাশ হইয়া থাকে; সেই প্রাণ ব্রহ্মেতে মিলিলে, সমস্ত ভূতও ব্রহ্মে মিলিয়া যায়—এই জ্ঞানের নাম বেদ । ইহা জানিতে হইলে জয়ীবিজ্ঞা জানিতে হয়, অর্থাৎ প্রাণ, অপান ও ব্যানের ক্রিয়া করিতে হয় । প্রাণ অপানের ক্রিয়া দ্বারা শ্বাস স্থির হইলে তখন সত্যব্রহ্মের জ্ঞান হয়, অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থারূপ এক পরমানন্দময় অবস্থার প্রকাশ হয় । এই স্থিতিই ব্যানের ক্রিয়া, যাহাকে তৃতীয় অবস্থা বলে এবং ইহা জ্ঞানাব নামই বেদ । “ভূর্ভুবঃ” এই ত্রিবিধা গায়ত্রী, এই তিন লোক এক হইলেই ব্রহ্মপদ লাভ হয় । অর্থাৎ যখন ইড়া, পিঙ্গলা, সূক্ষ্মা এক হইয়া যায় । যখন মস্তকে বায়ু স্থির হয়, তখন প্রথম পদ, বায়ু বাহুতে স্থির হইলে দ্বিতীয় পদ, আর সর্কর ব্রহ্মদর্শন হইলেই বায়ু চরম স্থির অবস্থা লাভ করে, উহাই গায়ত্রীর তৃতীয় পদ । প্রাণায়াম দ্বারা অনিল স্থির হইলে স্থিতি পদ প্রকাশ পায় । এই স্থিতিই অমৃত পদ । এই অমৃত পান করিতে পারিলেই সাধক আনন্দ-স্বরূপ হইয়া যান ।

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে “কালিকাঋষি”—এখানে ঋষির অর্থ—“যিনি স্বয়ং উৎপন্ন হ’ন” (প্রকৃতিবাদ অভিধান), ইনিই চিদাকাশ; আত্মশক্তি বা কালিকাঋষি—“আধাররূপা জগতন্তমেকা” ইনি সর্ব বস্তুর আধাররূপে থাকিয়াও কোন পদার্থে লিপ্ত হন না । অনেক দেব-দেবী ও সিদ্ধগণ কূটস্থের মধ্যে দেখা যায় ।

“ছন্দ”—নানা প্রকার সাধা কাল বুটি কূটস্থের মধ্যে দেখা যায়, যাহা হইতে বীণার ত্য্য ধ্বনি শোনা যায়—এই আত্মশক্তি ঋষি বা চিদাকাশের বিষয় শাস্ত্রে বহুরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ।

মহাভূতানুহকারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ ।

ইন্দ্রিয়ানি দর্শকং চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ ৫

ব্রহ্মসূত্র-পদের দ্বারাই ব্রহ্মের স্বরূপ বিনিশ্চিত হয়। ব্রহ্মসূত্র মেরুদণ্ডস্থিত ব্রহ্মসূত্র, ব্রহ্মসূত্র পদ অর্থাৎ ইন্দ্ৰা পিঙ্গলা-রহিত হইয়া প্রাণ যখন কেবল সূক্ষ্মায় থাকে, অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা, যেখানে থাকিলে সূক্ষ্ম ব্রহ্মময় হয়। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে যোগীর ব্রহ্মসূত্র ধারণা সুনিশ্চিত হইয়া যায়। উহাই মুখ্যবায়ু প্রাণ স্বরূপ, প্রাণরূপা প্রকৃতি হইয়া অগৎ সৃষ্টি করিতেছেন, আবার স্থির প্রাণ হইয়া ব্রহ্মরূপ হইতেছেন, সুতরাং জীবই শিব এবং শিবই ব্রহ্ম। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে স্থিতি—তাহাই আবার—

“অমূর্তমাত্রঃ পুরুষো দ্যোতিরিবাদ্ধুমকঃ ।

দৈশানোভূতভব্যস্য স এবাশ্রয় উ খঃ ॥”—কঠ ২য় অঃ

“বুদ্ধিজুলির পরিমাণ এক নির্কীর্ণ দীপশিখার জ্বাল পুরুষ, যিনি মস্তকে ক্রমশে আছেন, তিনি দেহমধ্যে শয়ন করিয়া আছেন এবং সকল শরীরকে পালন করিতেছেন, ইনি আত্মা স্বরূপ সূর্য্য শরীরে বাস করেন। তিনিই জগতেব আদি কারণ স্বরূপ দৈশ ব্রহ্ম। (লাহিড়ী মহাশয়ের বেদান্তব্যাক্য্য)।

কুটস্থ না থাকিলে ব্রহ্মসূত্র থাকে না, এবং ব্রহ্মসূত্র ব্যতীত এই শরীর টিকিতে পারে না। যাহারা সাধনা করিয়া পরপারে উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই এই সব বহুস্ত কথার ভাল করিয়াই জানেন। যাহারা বাহিরে বাহিরে চোট দেন তাঁহাদের ভিতর খোলে না। যাহারা অন্তরে অন্তরে যা দিতে পারেন, অর্থাৎ সাধন দ্বারা মনকে অন্তর্মুখ করিতে পারেন তাঁহারা বাহিরের নামরূপে জ্বলেন না, তাঁহাদের ভিতরের আবরণ সরিয়া যায়, তাঁহারা তখন সত্য স্বরূপের নিরবরণ মুখ দর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থ হ'ন ॥ ৪

অন্থয়। মহাভূতানি (পঞ্চব্যাপকভূত অর্থাৎ সূক্ষ্মভূত সমূহ, যাহা স্থূল পঞ্চভূতের কারণ), অহঙ্কারঃ (অহঙ্কার—সূক্ষ্মভূত নিচয়ের বাহা কারণ—অহং প্রত্যয় লক্ষণ অর্থাৎ “আমি” এই প্রকার বৃত্তিই বাহার লক্ষণ—[শব্দর]), বুদ্ধিঃ (অহঙ্কারের কারণ এবং অধ্যবসায়াদ্বিকা বৃত্তিই বাহার লক্ষণ), অব্যক্তম্ এব চ (এবং মূল প্রকৃতি—বুদ্ধিরও বাহা কারণ), দশ ইন্দ্রিয়ানি (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়) একং চ (আব ও একটি ইন্দ্রিয় অর্থাৎ মন) পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচরাঃ চ (এবং শ্রোত্রাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ প্রভৃতি ভোগ্য বিষয়) ॥ ৫

শ্রীধর। তত্র ক্ষেত্রস্বরূপমাহ—মহাভূতানীতি বাভ্যাম্। মহাভূতানি ভূত্যাধীন পঞ্চ, অহঙ্কারঃ স্তব্ধকারণভূতঃ। বুদ্ধি বিজ্ঞানাত্মকং মহত্তত্বং। অব্যক্তং মূলপ্রকৃতিঃ। ইন্দ্রিয়ানি বাহানি দশ—শ্রোত্রদৃষ্ণস্পর্শ-বুদ্ধি-বাক্ মেঢ়-অঙ্গি-পায়ব ইতি। একং চ মনঃ। ইন্দ্রিয়-গোচরাশ্চ পঞ্চ তন্মাত্ররূপা এব। শব্দায় আকাশাদিবিষয়গুণতয়া ব্যক্তাঃ সন্ত ইন্দ্রিয়বিষয়াঃ পঞ্চ। তৎস্বং চতুর্বিংশতি তত্ত্বানি উক্তানি ॥ ৫

বজ্রাম্ববাদ। [দুইটি শ্লোকে সেই ক্ষেত্রের স্বরূপ বলিতেছেন]—মহাভূত অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ. তেজ, মরুৎ, আকাশ এই পঞ্চ; তাহাদের কারণ স্বরূপ অহঙ্কার এবং বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞানাত্মক মহত্তত্ব, আর অব্যক্ত অর্থাৎ মূলপ্রকৃতি; দশটি বাহ্যেন্দ্রিয় অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পাঁচ) এবং পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাদ, পায়, ও উপস্থ), আর এক হইল মন। ইন্দ্রিয়-গোচর অর্থাৎ পঞ্চ তন্মাত্ররূপ যে শব্দাদি—আকাশাদির বিশেষ গুণরূপে ব্যক্ত হইয়া ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইয়াছে—এইভাবে চতুর্বিংশতি তত্ত্ব কথিত হইল ॥ ৫

আধ্যাত্মিক ব্যাক্য—যাহা হইতে পঞ্চ মহাভূত অতি সূক্ষ্মস্বরূপ পঞ্চভূতের অনু ব্রহ্মের স্বরূপ জানিয়া “সোহং ব্রহ্ম” ইত্যাকার জ্ঞান ক্রিয়াদ্বারা অনুভব হয় তাহাতে স্থির করিয়া ক্রিয়ার দ্বারায় অব্যক্ত পদেরও অনুভব হয়। তাহা হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এই দশের দ্বারা সমুদয় বস্তু লক্ষ্য হয়।—যদিও পঞ্চ মহাভূত বিশ্বের কারণ বটে, কিন্তু ব্রহ্ম-অণু হইতেই সকল ভূতের উৎপত্তি হইয়াছে। ভূত পঞ্চকের সমষ্টিই দ্রব্যরূপে প্রকাশিত হয়; যেমন শালগ্রামে স্বর্ণরেখা মিলিত থাকে, তরুণ আত্মার সহিত ভূতপঞ্চক পৃথক পৃথকভাবে মিলিত থাকে, ইহাদের উৎপত্তির কারণ অবিজ্ঞা অর্থাৎ অজ্ঞা দিকে মন দেওয়া। আত্মা ব্যতীত অজ্ঞা দিকে মন দিলেই জগৎপ্রপঞ্চ ব্যক্ত হইয়া থাকে, আত্মাতে মন সংলীন হইলে আর প্রপঞ্চের প্রকাশ থাকে না। ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় যখন অজ্ঞা দিকে মন যায় না সেই অবস্থাই বিজ্ঞান পদ, তখন মন অজ্ঞা দিকে যায় না, সুতরাং অজ্ঞা বস্তুরও অনুভব থাকে না। সেই স্থিতিবাহাই ব্রহ্মের স্বরূপ যাহা ক্রিয়া করিলে ক্রিয়ার পর অবস্থায় পর অবস্থায় অনুভব হয়। এই অবস্থায় সকল বস্তুর মধ্যেই ব্রহ্ম দর্শন হয়। বস্তু ও অনন্ত ব্রহ্মও সেইজন্ম অনন্ত। কুটস্থের মধ্যে নক্ষত্র, তন্মধ্যে গুহা, সেই গুহায় প্রবেশ করিলে যে আকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই আকাশের অণুর মধ্যে সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মস্বরূপে বিরাজমান, সেখানে সবই আছে অথচ কিছুই নাই—এই অনুভব প্রথমে আমার হয়, শেষে আমিও থাকে না, অনুভবও থাকে না, তখন সব একাকার, ইহাই সমস্ত কারণের কারণ—অব্যক্ত অবস্থা। এই অবস্থায় থাকার নামই জ্ঞান। “স একোহবর্ণ-বহুধা শক্তি যোগাদ্ বর্ণান্ অনেকান্ নিহিতার্থো দধাতি”—ইনি এক অদ্বিতীয় ও অবর্ণ অর্থাৎ জাতিশূন্য; তাহা হইলেও তাহাতে নানা প্রকার শক্তি আছে, তিনি সেই সকল নানাধি শক্তি দ্বারা অনেক প্রকার বর্ণের বিধান করিতেছেন—কুটস্থের মধ্যে বহু শক্তি (যাহা ইচ্ছা করা যায় তাহাই দেখা যায়) ও বহু মূর্তির প্রকাশ হইতেছে। সেখানে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় সমস্তই নিরোধভাবাপন্ন হইলেও, সেই কুটস্থের শক্তিতেই সমস্ত দর্শন ও শ্রবণ হয় এবং বহুদূরে গমনাগমন করিয়া যাহা দেখা যায় তাহাও সক্ষম মাঝেই উপস্থিত হয়। যাহা কিছু দৃশ্যাদি হইতেছে বা হইবে তাহা সমস্তই কুটস্থ পটে প্রতিবিম্বিত হয়, এবং ইহার অতীত অব্যক্ত পদেরও অনুভব হয়। এই অব্যক্ত ক্রিয়ার পরাবস্থাই সকলের মূল, অথচ সেখানে কিছুই নাই, সব শূন্য। কুটস্থই ক্রিয়ার পরাবস্থার ব্যক্তরূপ—তাহাতে অনন্ত অনন্ত বস্তুর রূপ ফুটিয়া উঠিতেছে। স্বরূপ সমুদ্র হইতে বুদ্ধি উঠিতেছে এবং তাহা

ইচ্ছা দেহঃ সুখং দুঃখং সংবাতশ্চৈতন্যমুত্তমম্ ।

এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥ ৬

সমুদ্রেই লয় হইতেছে, সেইরূপ অব্যক্ত ব্রহ্ম সমুদ্রে হইতে চরাচরের উৎপত্তি হইতেছে এবং সে সকল সেই ব্রহ্ম সমুদ্রেই আবার লয় হইতেছে। পরমায়া নিষ্ক্রিয়, তিনিই ক্রিয়া-বিশিষ্ট হইয়া সমস্ত প্রকার উপাদান স্বরূপ হইতেছেন, যাহাকে কূটস্থ বলে। উহাই বৈখানর স্বরূপ “জাগ্রত” স্থান। ক্রিয়ার পর অবস্থায় এই কূটস্থকেও আর দেখা যায় না ॥ ৫

অর্থঃ । ইচ্ছা, দেহঃ, সুখং, দুঃখং (ইচ্ছা, দেহ, সুখ, দুঃখ) সংবাত (দেহেন্দ্রিয়াদির সংহতি—এক কথায় বাহাকে দেহ বা শরীর বলে), চৈতন্য (চিন্তার জ্ঞানাত্মিক বৃত্তি), ধৃতিঃ (বৈধী অর্থাৎ মনঃপ্রাণের ক্রিয়া যে শক্তি দ্বারা স্থির থাকে) এতৎ (ইহাই) সবিকারং ক্ষেত্রং (বিকারযুক্ত ক্ষেত্র) সমাসেন উদাহৃতম্ (সংক্ষেপে কথিত হইল) [অর্থাৎ ইহাই ক্ষেত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয়] ॥ ৬

শ্রীধর । ইচ্ছতি । ইচ্ছাধর্মঃ প্রসিদ্ধাঃ, সংবাতঃ শরীরঃ, চৈতন্য জ্ঞানাত্মিকা মনোবৃত্তিঃ, ধৃতি বৈধীম্ । এতে ইচ্ছাধর্মো দৃশ্যত্বং ন আত্মধর্মী, অপি তু মনোবৃত্তী এবং, অতঃ ক্ষেত্রান্তঃ-পাতিন এবং উপলক্ষণং চ এতৎ সঙ্কল্পাদীনাম্ । তথা চ শ্রুতিঃ—“কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধা ধৃতিঃ অধৃতিঃ হ্রীঃ বীঃ ভীঃ ইত্যেতৎ সর্বং মন এবং” ইতি । অনেক যাদৃগুতি প্রতিজ্ঞাতাঃ ক্ষেত্রধর্মী দর্শিতাঃ । এতৎ ক্ষেত্রং সবিকারম্ ইন্দ্রিয়াদিবিকারসহিতং সংক্ষেপেণ চুভ্যং ময়া উক্তম্ । ইতি ক্ষেত্রোপসংহারঃ ॥ ৬

বঙ্গাভিবাদ । ইচ্ছাদির অর্থ—ইচ্ছাদি অর্থাৎ ইচ্ছা, দেহ, সুখ ও দুঃখ ইহারা প্রসিদ্ধ [অর্থাৎ পরিচয় অনাবশ্যক] । সংবাত অর্থাৎ শরীর এবং চৈতন্য অর্থাৎ জ্ঞানাত্মিকা মনোবৃত্তি, ধৃতি অর্থাৎ বৈধী—ইহারা দৃশ্যত্ব হেতু মনোবৃত্তি, আত্মার ধর্ম নহে, সুতরাং ইহারা সঙ্কল্পাদির উপলক্ষণস্বরূপ অতএব ক্ষেত্রান্তঃপাতী । শ্রুতিও বলেন—কামনা, সঙ্কল্প, বিচিকিৎসা, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, বৈধী, অধৈর্য, লজ্জা, বুদ্ধি, ভয়—ইহারা সমস্তই মন । এই কথা দ্বারা এই অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে “ক্ষেত্র যাদৃক্” বলিবেন বলিয়াছিলেন, সেই প্রতিজ্ঞাত ক্ষেত্রধর্ম সকল প্রদর্শিত হইল । ইন্দ্রিয়াদির বিকার সহিত এই ক্ষেত্র বিষয়ক কথা সংক্ষেপে কথিত হইল । ইহাই ক্ষেত্র বর্ণনার উপসংহার ॥ ৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—উৎপরে কোন বস্তুতে আসক্তি পূর্বক দৃষ্টি করিলে ইচ্ছা হয়—সেই ইচ্ছা [পূর্ণ] না হইলে দেখ হয়—দেখ করিবার ইচ্ছা কেবল সুখাভিলাষের নিমিত্ত—তাহা না হইলেই দুঃখ—দুঃখেতে মৃত্যু—মৃত্যু হইলেই জন্ম—জন্ম হইলেই কিছুদিন থাকে—এই শরীরের বিকারের সহিত সমুদয় বলিলাম ।—শরীর কেন হয়, শরীর কি? শরীরের ধর্মগুলি বলিয়া ক্ষেত্রতত্ত্ব উপসংহার করিতেছেন । জগৎপ্রপঞ্চ কেন ব্যক্ত হয়? ইহাই অনাদি দৈব ইচ্ছা বা সঙ্কল্প । জগৎ-দেহের বাহ্য কারণ এই ব্যাপ্তি দেহেরও কারণ সেই ইচ্ছা । কোন বস্তু প্রতি যখন আসক্তিপূর্বক দৃষ্টি করা যায় তখনই তদ্বিষয়ক ইচ্ছা সমুদ্ভূত হয় । তখনই আত্মার

অক্ষয় (স্থিরাবস্থা) হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া যে বহির্দিকে অবতরণ উহার নামই সঙ্কল্প বা মন । তখনই যে বস্তুবিশেষকে আত্মার মনের ভাল লাগে, তাহাকে পাইবার জন্য মনের কোঁক বা বেগ হয়—উহাই ইচ্ছা । সেই স্বাভিলাষ পূর্ণ না হইলে বা তাহার সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিলে ক্রোধ বা বিদ্বেষ আসিয়া উপস্থিত হয় ।

পূর্ব সংস্কার অমূর্তরূপ বিষয়েন্দ্রিয়ের সংযোগ বশতঃ কতকগুলি বিষয় মনের অমূর্তরূপ এবং কতকগুলি বিষয় মনের প্রতিকূল রূপে বেদন হয় । অমূর্তরূপ বিষয়গুলি সুখজনক এবং প্রতিকূল বিষয়গুলি দুঃখদায়ক ভাবে মনে প্রতীত হয় । জীবের জীবন সুখ-দুঃখের কতকগুলি অমূর্তরূপ মাত্র । দীপ্তিত বস্তু পাইবার আশা ও অনভিলষিত বস্তুর ত্যাগেচ্ছা—এই দ্বন্দ্বতাব লইয়াই জীবের জীবন । এই দ্বন্দ্বতাব দ্বারাই সংসার পরিপূর্ণ—ইহারা সংসার-সিন্ধুর বিশাল তরঙ্গমালা । এই দ্বন্দ্বতাব শেষ হইতে না হইতেই জীবন সমাপ্ত হয় । জীবনের কত আশা, কত ইচ্ছা অসম্পূর্ণ থাকিতে থাকিতেই বহনিকা পড়িয়া যায় । কিন্তু এই মৃত্যুতেই জগৎ সীমা শেষ হয় না, সেই অসম্পূর্ণ ইচ্ছার পুষ্টির জন্য আবার এই জগতে জন্মগ্রহণ করিতে হয় । মৃত্যুর পরপারেও কিছুদিন ভোগনয় দেহ পাইয়া সেখানেও স্বর্গ-নরকাদির ভোগ হয়, ভোগান্তে আবার এই জগতে ফিরিয়া আসিতে হয় । আবার জন্ম আবার মৃত্যু । এ যাতায়াত আর কিছুতেই মিটিতে চায় না । এ ভ্রম কেন হয় কে বলিবে? কি আনি ফিরে পাবে জীব নিজ নিকेतন হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া বহির্গত হইয়া আসিল । সে যে আত্মা, সে যে চিরস্থির, জন্মমৃত্যুর অতীত, আসিয়াই তাহা ভুলিয়া গেল । বহির্দিকে আসিয়া দেহের সহিত মিলিয়া গিয়া নিজে যে কি তাহা ভুলিয়া গেল । দেহের ধর্মকে নিজধর্ম মনে করিয়া দেহের জন্মমৃত্যুর সহিত আপনাকে উৎপন্ন ও বিনষ্ট বোধ করিয়া হাহাকার করিতে লাগিল । দেহগ্রন্থি জন্মমৃত্যুরূপ বিকারের অধীন, সেই দেহে আবদ্ধ হইয়া জীবের আত্ম-বিস্মৃতি ঘটিল । দেহদৃষ্টি থাকিতে জন্মমৃত্যুর ভয় ঘূচিবার নহে, ভোগ-লালসার আশা মিটিবার নহে, তাই দেহের ক্ষণিক সুখের, লোভে লুপ্ত হইয়া নিজের স্বরূপ ভুলিয়া জীব অনাস্বাদ্য আত্মসমর্পণ করিল । জন্মাবধি জীব এই দেহ লইয়া অস্থির, দেহের অতিরিক্ত নিজ চিন্ময় স্বরূপের সন্ধান নাই, তাই দেহের সুখকেই সুখ মনে করিয়া সেই কলিত সুখের পিছনে পিছনে ছুটছুটি করিয়া বার বার দেহগ্রহণ ও দেহত্যাগের অভিনয় চলিতে লাগিল । দেহের ভোগ যে সুখ নহে এ কথা এখন তাহাকে কে বুঝাইবে? কে তাহাকে নিজ নিকेतনের পথ দেখাইয়া দিবে? কে তাহার মিথ্যা “আমিকে” ভুলাইয়া সত্য “আমিকে” চিনাইয়া দিবে? ওরে মূর্খ! “আমি” “আমি” করিতেছ, “আমিকে” কি কভু দেখিয়াছ? তোমার এ “দেহ-আমি” যে তোমার প্রকৃত “আমি” নয়,—সে যে দেহাতীত । দেখ দেখি দেহের উপর সোয়াইয়া হইয়া কে বসিয়া আছেন? তাহার দিকে কি একবারও নজর পড়ে না? ওরে সেই যে তোমার “আমি”—সে যে নিত্য সত্য অব্যয় বস্তু; তার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, ক্ষয় নাই । খেলিতে খেলিতে তন্ময় হইয়া অন্তঃপুর হইতে এত সরিয়া আসিয়াছি যে এখন আর মনেই পড়ে না কে আমি, কোথাকার আমি, কোথা হইতে এখানে আসিয়া পড়িয়াছি! যে জীব, তোমার নিজ গৃহ পানেই আবার তোমাকে ফিরিয়া যাইতে হইবে, যে রাস্তা ধরিয়া

আসিয়াছ ঠিক সেই রাস্তা ধরিয়াই স্বর্গে ফিরিতে হইবে,—আর অন্য পথ নাই। আমরা আসিয়াছি কোথা দিয়া জান ? সেই ব্রহ্ম স্বরূপ হইতে—সেই শিবশক্তি-সম্বরূপ ভাব হইতে হটিতে হটিতে ক্রমশঃ বাসিকার মত একেবারে ঘরের বাহিরে চলিয়া আসিয়া পথ হারাইয়া ফেলিয়াছি। ঘরের ভিতর যতটা আলোকাকীর্ণ, ঘরের বাহিরটা তেমনই ঘন অন্ধকারে ভরা। তাই বাহির হইতে ঘরের পথের কোন ঠাণ্ডা পাইতেছি না, কেবলই অন্ধকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরিতেছি। ঘরের কথা মনে হইতেছে আর চক্ষু কাটিয়া জল পড়িতেছে। পথহারা একাকী আমি এই অন্ধকারের মধ্য দিয়াই ছুটিতেছি, কিন্তু ঘরের সন্ধান পাইতেছি না। আমি একক আশ্রয়হীন, তাই দেখিয়া বহু দৃশ্য বস্তু বশে আমাকে সময়ে সময়ে আঙুলিয়া বসিয়া থাকে, পাছে তাহাদের গণ্ডী পার হইয়া যাই। পথের বার্তা আমার কে বলিয়া দিবে, কে করুণহৃদয় আমাকে আমার নিজ ঘরের পথটা ধরাইয়া দিবে, আমি সেই পথ ধরিয়া চলিতে চলিতে নিজ নিকেতনে পৌঁছিতে পারিব। ব্যথিত চিত্তে ক্লান্ত দেহে যখন তটিনীর কূলে বসিয়া বসিয়া কাঁদিতেছি, তখন আমার স্বাধার ব্যথী, আমার দরদী, আমার ভবপাবের কাণ্ডারী, আমার শ্রীগুরুদেব আসিয়া আমার হাত ধরিলেন। বলিলেন “উঠ বৎস, এই তরীধানিতে, এই পথ অমুসরণ করিয়া নিজেই বাহিয়া চল, তুমি নিজ নিকেতনে পৌঁছিতে পারিবে—“ডর নাহি কুছো ডহরা না পুছো, বাঁশবী শুনত কবীরা বাচ যাকি”। পথের কথা আর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিও না, কোন ভয় নাই, ঐ যে তিনি তোমার হৃদয়ে বসিয়া বাঁশী বাজাইতেছেন, ঐ বাঁশী শুন আর তবী বাহিয়া চল। তাঁহার স্নিগ্ধ শাস্ত মুখমণ্ডলে যে করুণার দীপ্তি ছুটিয়াছে তাহা দেখিয়া বুদ্ধিলাস স্বর্গে আবার ফিরিয়া যাইতে পারিব বোধ হয়। তিনি অভয় দান করিয়া পথের সমাচার বলিয়া দিলেন। আরও বলিয়া দিলেন পথে যাইতে যাইতে সেইখানেই পৌঁছিবে—এ রাস্তা সেইখানে গিয়াই শেষ হইয়াছে। এই রাস্তা “চলতা চলতা তাঁহা চলা যাঁহা নিরঞ্জন রায়”। আমি কত আশা করিয়া ভবনদীর সেই পথ ধরিয়া ধরিয়া মার্গ অতিক্রম করিতে লাগিলাম। কিন্তু যত সহজে যত অনায়াসে অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিয়াছিলাম, এখন আর তত সহজে তত ক্রম গৃহ পানে যাইতে সমর্থ হইতেছি না। কাহারো যেন প্রতিপাদ্যরূপে কত আমাকে বাধা দিতেছে! আর নদী ও আঁকিয়া বাঁকিয়া কত বন্ধুর পথ দিয়া চলিয়া গিয়াছে। নদীর মাঝে মাঝে কত বাঁক, কত আবর্ত; যত কাছে আসিতেছি, তত পথ যেন বিকট বলিয়া মনে হইতেছে, অগ্রসর হওয়া ক্রমে অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে। নদী যেন কত পথ ধরিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলিয়াছে, আমি এখন কোন পথ ধরিব ? একই পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া কত দিক ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার সেই একই স্থানে আসিয়া মিলিতেছে। যতবার এই বাঁকটা উত্তীর্ণ হইবার প্রয়াস করি, ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার সেই বাঁকের মুখেই আসিয়া পড়িতেছি। আমাকে ভীত সন্দিগ্ধ দেখিয়া আবার গুরু আসিয়া বলিয়া গেলেন—“পথ দেখিয়া কেন ভয় পাইতেছ ? সোজা পাড়ি দাও। সোজা পাড়ি দিতে দিতে তোমার তরঙ্গী আপনা আপনিই বাঁক অতিক্রম করিয়া ঠিক পথ দিয়া চলিয়া যাইবে, দূর হইতে যত আঁকা বাঁকা দেখিতেছ, চলিতে চলিতে তাহার সে বক্রগতি আর থাকিবে না, মার্গ সরল হইয়া আসিবে।” এইবার পাড়ি দিবার কৌশল বলিয়া

(জ্ঞানের সাধন)

অমানিষ্মদস্তিত্ত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্ ।

আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্বেদ্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৭

দিতোছি—উহাই জন্ম-প্রতিভার সাধনা ; সেই প্রাণের পথ দিয়া মনের তরী চালাইয়া যাও তাহা হইলেই সেই তে-মোহানার (সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণের—ইড়া, পিঙ্গলা, সূর্য্যার) বাঁক অতিক্রম করিতে পারিবে। এইরূপে নিম্ন হইতে (মূলধার হইতে) উর্দ্ধে (আচ্ছাদকে), তথা হইতে দক্ষিণে, দক্ষিণ হইতে উত্তরে বা (ঠোঁকর) দিয়া একবারে বেগে যথা হইতে আরও করিয়াছিলে” তথায় পৌঁছিতে পারিলেই—সেই বেগই গুরুত্বপায় জ্ঞানাপন দিয়া উপরে দিকে আপনা আপনি পৌঁছাইয়া দিবে। তখন সেখানে পৌঁছিয়া তুমি নিজ নিকেতনের চন্দ্রকেতন লক্ষ্য করিতে পারিবে। তখন তুমি কোথা দিয়া কেনন করিয়া নিজ নিকেতনে পৌঁছিয়া গিয়াছ দেখিয়া বিস্মিত হইবে। শরীরের বিকার, ইন্দ্রিয়ের বিকার, মনের ও প্রাণের বিকার সব তখন নীচে পড়িয়া থাকিবে। তখন নদীর পথ ছাড়িয়া গগন পথে চলিতে চলিতে এমন স্থানে পৌঁছিয়া গিয়াছ দেখিবে, যেখানে হইতে আর দৃশ্যগণ তোমাকে টানিয়া লইয়া যাইতে কোন কালেই সক্ষম হইবে না—“যদগত্যা ন নিবর্তন্তে”। তখন উচ্ছ্বান অধিকার করিয়া নিম্নতলের কথা আর মনে পড়িবে না—এই দেহ, ইন্দ্রিয়, মন—এব শুদ্ধ জীর্ণ কাঠের মত তলদেশে পড়িয়া আছে দেখিয়া আশ্চর্য হইবে। তখন ক্ষেত্রজ ও ক্ষেত্রের সব বিকার স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের মত অসত্য ও অলীক হইয়া যাইবে। তখন সবই যেন স্বপ্নের খেলা মত কি এক ব্যাপার হইয়া গেল মনে হইবে। এই সমস্ত দেহেন্দ্রিয়ের খেলা শেষ পর্য্যন্ত থাকে না বলিয়া ইহাধিককে শাস্ত্র অনাত্ম পদার্থ অর্থাৎ অসত্য বস্তু বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। যদিও এগুলি (ক্ষেত্র পর্যায়ে বাহ্য কিছু) সবই অলীক, শেষ পর্য্যন্ত থাকে না, তথাপি এই মিথ্যা প্রপঞ্চকে অবলম্বন করিয়াই প্রপঞ্চাতীত অবস্থায় পৌঁছিতে হয়। সেই জ্ঞান সাধকবাহ্য এগুলির প্রয়োজনীয়তা আছে। সূত্রাত্ম সংঘাত (শরীর), চেতনা (চিত্তাভাস) ও ধৃতি (প্রযত্ন বিশেষ দ্বারা যে স্থিরতা জন্মে)—এ সকলগুলিও আত্মপদার্থের নত নিত্য সত্য না হইলেও—ইহা হইয়াই আত্মজ্ঞান লাভের অবলম্বন, নিজ নিকেতনে পৌঁছিবার পথ ॥ ৬

অন্থয়। অমানিষ্ম (আত্মপ্রাধিকারহিত্য), অদস্তিত্ত্ব (দস্ত্যাহিত্য), অহিংসা (পরপীড়াবর্জন), ক্ষান্তি (ক্ষমা), আর্জবম্ (সরলতা), আচার্য্যোপাসনং (গুরু সেবা), শৌচং (পরিচ্ছন্নতা, সমাচার), স্বেদ্যম্ (স্থিরতা), আত্মবিনিগ্রহঃ (দেহেন্দ্রিয়াদির সংযম—“দেহেন্দ্রিয়াদি প্রবৃত্তি নিরুদ্ধ করিয়া সম্মার্গে প্রবৃত্তির স্থিরতা সম্পাদন”—শঙ্কর) ॥ ৭

শ্রীধর। ইদানীং উক্তলক্ষণ্য ক্ষেত্র্যন্ত অতিরিক্ততয়া জ্ঞেয়ং শুদ্ধং ক্ষেত্রজং বিস্তবেণ বর্ণয়ন্ত তৎ জ্ঞানসাধনানি আহ—অমানিষ্মমিতি পঞ্চভিঃ। অমানিষ্ম স্বগুণপ্রাধিকারহিত্যম্। অদস্তিত্ত্বং দস্ত্যাহিত্যম্। অহিংসা পরপীড়াবর্জনম্। ক্ষান্তিঃ সহিষ্ণুত্বম্। আর্জবম্ অবক্রতা। আচার্য্যোপাসনং সৎগুরুসেবনং। শৌচং বাহ্যমাত্মসুখং চ—তত্র বাহ্যং মূচ্ছলাদিদা, আভ্যন্তরিক রাগাদিমলকালনম্। তথা চ স্থিতিঃ—

“শৌচঞ্চ দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমভ্যন্তরং তথা ।

মুজ্জলাভ্যাং স্বতঃ বাহ্যং ভাবশুদ্ধিস্তথাশ্রুতম্ ॥” ইতি

স্বৈর্য্যং সন্মার্গে প্রবৃত্তস্ত তদেকনিষ্ঠতা । আত্মবিনিগ্রহঃ শরীরসংযমঃ । এতজ্ঞানমিতি
প্রোক্তং পঞ্চমেনাবয়ঃ ॥ ৭

বঙ্গানুবাদ । [ইহানীং পূরোক্তলক্ষণ ক্ষেত্র হইতে অতিরিক্ত জেব যে শুদ্ধ ক্ষেত্র
তাহা বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিবেন বলিয়া “অমানিআদি” পঞ্চশ্লোকে তৎজ্ঞানের সাধন সমূহ
বলিতেছেন]—(১) অমানি—স্বপ্নের স্লামা অর্থাৎ প্রশংসারাহিত্য, (২) অহস্তি—
দত্তরাহিত্য, (৩) অহিংসা—পরপীড়াবর্জন, (৪) ক্ষান্তি—সহিষ্ণুতা, (৫) আর্জব—অংকতা
(অর্থাৎ সরলতা), (৬) আচার্য্যোপাসন—সদগুরু সেবা, (৭) শৌচ—বাহ্য ও অভ্যন্তর
শৌচ, মুজ্জলাদির দ্বারা বাহ্য শৌচ হয় আর রাগদ্বৈষাদি মলকালন (ভাবশুদ্ধি) দ্বারা
অভ্যন্তর শুদ্ধি হইয়া থাকে । (৮) স্বৈর্য্য—সন্মার্গে প্রবৃত্ত ব্যক্তির তদেকনিষ্ঠতা,
(৯) আত্মবিনিগ্রহঃ—শরীর সংযম । “ইহার জ্ঞানের সাধন, ইহার যে বিপরীত তাহা
অজ্ঞান”—এই পঞ্চম শ্লোকের সহিত ইহার অর্থ ॥ ৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—মানরহিত ক্রিয়ার পর অবস্থায় থেকে হয়—দম্ভ অর্থাৎ
বড়াই দর্প, বুক চাড়া দিয়া চলা—অভিমান অর্থাৎ অস্ত্রের দ্বারায় শুনিয়া আপনা
আপনি মান করা, কিন্না মানের হানি হইলে আপনা আপনি অপমান বিবেচনা
করা—দম্ভরহিত—অহিংসা, হিংসা নাই—ক্ষান্তি—ঋজু অর্থাৎ সরল হওয়া—আর্জব
সরল অর্থাৎ যাহা মনে থাকে তাহাই বলে—গুরুর উপাসনা অর্থাৎ ক্রিয়া
ক’রে স্থির হওয়া, আত্মা ব্রহ্মেতে রাখা ।—শরীরদৃষ্টি হইতে (১) আত্মদ্রাব্য হ’ব, তখন
নিজেকে জ্ঞানী, মানী ধনী, বিদ্বান্ কত কি মনে হয়—নিজেকে সকলের অপেক্ষা বড়
বলিয়া মনে হয়, যিনি ক্রিয়ার পর অবস্থায় শরীরের উর্দ্ধে থাকেন তাঁহার শরীর বোধ না
থাকায় শরীরজনিত অভিমানও তাঁহার থাকে না । (২) দম্ভ অর্থাৎ সর্বদা নিজের বড়াই
করা, আমাকেই যেন একমাত্র সর্বগুণাবিত মাহুঁষ করিয়া ভগবান পাঠাইয়াছেন ; ইহাবা
নিজ নিজ শক্তির বড়াই তো কবেই, আবার নিজের কুটুঁষ কেহ বড়লোক আছে তাহারও
বড়াই করিয়া থাকে । নিজের মঙ্গলের জন্য উপাসনা করিয়া থাকে তাহারও বড়াই করিতে
ছাড়ে না—“আমি ছয়ঘণ্টা করিয়া সাধনভজন প্রত্যাহ করি” ইত্যাদি । ইহাদের এত
অভিমান যে পান থেকে চূণ খসিবার উপায় নাই । কোথায় এতটুকু মানের হানি হইল সে
লক্ষ্য ইহাদের সর্বদাই থাকে—এইরূপ দম্ভের অভাবই অহস্তি । (৩) অহিংসা—প্রাণি-
মাত্রকেই পীড়া না দিবার আগ্রহ, সর্বদাই বিপর ব্যক্তিকে নিজজন বোধে সাহায্য করিবার
চেষ্টা । সকলের সুখকেই নিজের সুখ মনে করা—ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ “খম” । এই অহিংসা
প্রতিষ্ঠিত হইলে তবে বুঝা যায় যে সাধক সর্বাত্মবোধের যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন । হিংসা
মনে থাকিতে ভগবদ্ভূতপার কণামাত্র লাভ করাও অসম্ভব । এই অহিংসা ভাব যখন নিজের
মধ্যে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন ইতর প্রাণীরাও আর তাহার হিংসা করিতে পারে না ।
আপনাকে আপনি কেহ হিংসা করে না, সেইরূপ সর্বত্র যাহাব আত্মদর্শন হইয়া থাকে তিনি

আব কাহাকেও হিংসা করিতে পারেন না । যেখানে আত্মপ্রেমের বিস্তার সেখানে হিংসা
কোথায় ? (৪) ক্ষান্তি—কেহ অপকার করিলেও যিনি তাহাকে ক্ষমা করিতে পারেন অর্থাৎ
অস্ত্র হইতে ক্রেশ পাইয়াও যিনি বিকারশূন্য হইয়া সব সহ্য করিতে পারেন । শিশুপুত্র
পিতাকে প্রহার করিলে পিতা যেন শিশু পুত্রের আচরণ দ্বিধিয়া হস্ত করেন, এইরূপ
অস্ত্রকৃত অপকার যিনি গায়েই নাখেন না, সামর্থ্য থাকিলেও তাহার অনিষ্ট করেন না—ইহাই
প্রকৃত ক্ষমা । তারপর সাধক যখন সাধনার সমস্ত ক্রেশ সহিষ্ণুতার সহিত সহ্য করেন, এত-
দিনেও কিছু হইল না বলিয়া যাহার দৈর্ঘ্যচ্যুতি ঘটে না, যিনি আপনার পূর্বাঙ্কিত কণ্ঠের
ফল ভোগের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকেন তাহার সহিষ্ণুতাই যথার্থ ক্ষান্তি । এইরূপ সহিষ্ণুতা
সহকারে যাহারা সাধন করেন তাঁহাদের চিত্ত একদিন সমাধিস্থিতে নিমজ্জিত হইবেই ।
(৫) আর্জব—ঋজুভাব, অকৌটিল্য ; যে খুব সরল—তাহার ভিতর বাহির খোলা । যাহা
মনে উদয় হয় তাহাই বলে, রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে জানে না । অন্তঃকরণ শুদ্ধ না হইলে
প্রকৃত সরল হওয়া যায় না । এই সকল লোক কাহারও মন রাখিয়া কথা বলে না, কাহারও
খাতির রাখিতে গিয়াও বক্রতা প্রকাশ করে না । লোকে তাঁহার কথা শুনিয়া কি মনে
করিবে এ চিন্তা তাঁহার মনে আর্দ্র উদয় হইতেই পারে না । এত অকুতোভয় এবং সেইজন্য
এত সরল বা অবক্র হইতে পারেন । সাধনায় মত্ত পুরুষ বাহিরের কোন বস্তুর প্রতি দৃষ্টিই
হিতে পারেন না, তাঁহার লক্ষ্য পড়িয়া থাকে একমাত্র ভগবানের পাদপদ্মে । কাহারও নিকট
কিছু পাইবার আশাও করেন না, তাই কাহারও মন রাখিবার চেষ্টা করিবার তাঁহার
প্রয়োজন হয় না । যে যত অবক্র বা সরল সে তত ভগবানের প্রিয় হয় । অসরল ব্যক্তির
পরম পদ লাভের সম্ভাবনা কোন কালেই থাকে না । (৬) আচার্য্যোপাসনা—সদগুরু ও সাধু
উপদেষ্টার তত্ত্বাবধা করা । ‘তত্ত্বিদ্ধানার্হং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ঃ ব্রহ্ম-
নিষ্ঠম্’—যুগল, ১২—মোক্ষার্থী পুরুষ পরমাত্মার সাক্ষাৎকারার্থ সমিৎপাণি হইয়া (যথাসাধ্য
উপচৌকন লইয়া) শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট যাইবে ।

যাহারা অসদ্ব্যচারী এবং অহংকারী তাহারা ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল নহে, সুতরাং
তাহারা সদগুরুর নিকট যাইবার আবশ্যকতা অনুভব করে না, যদি বা খায গুরুকে
আত্মসমর্পণ করিতে পারে না । যাহারা শাস্ত্রাভ্যাসী তাহারাও যদি গুরুর শরণাগত
না হন, তবে তাঁহারাও পরমার্থ লাভে বঞ্চিত থাকিবেন, কারণ শাস্ত্রার্থ বোধার্থ অবধারণ
করিতে পাবা সাধন ব্যতীত সম্ভব নহে । গুরু যদি ব্রহ্মনিষ্ঠ না হন, তবে তাঁহার উপদেশেও
শিষ্যের অন্তরঙ্গানি বিদূরিত হইবে না, এই জন্য সাধনশীল তত্ত্বজ্ঞ ও শাস্ত্রজ
পুরুষের নিকটেই শিষ্য স্বীকার করিতে হয় । শাস্ত্রের উপদেশ এই যে শিষ্যকে শ্রোত্রিয়
ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট সমিৎপাণি হইয়া অর্থাৎ যথাসাধ্য উপচৌকন লইয়া যাইতে হইবে ।
গুরুর নিজের প্রয়োজন না থাকিতেও পারে, কিন্তু শিষ্য যদি শাস্ত্রানু চিত্তে উপাসনা
যথাসর্বস্ব গুরুর চরণে সমর্পণ করিবার শিক্ষালাভ না করিয়া থাকেন কোনরূপ ত্যাগে
যিনি অনভ্যস্ত, তিনি সদগুরু-প্রদর্শিত পথে চলিবার অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন ।
শিষ্য শ্রদ্ধার সহিত গুরুর নিকট আপনার যাহা কিছু সমস্ত অর্পণ করিলে সেইরূপ গুরুর

ধারাই তাঁহার আত্মবিষয়িণী নির্মল বুদ্ধির বিকাশলাভ হইয়া থাকে এবং এই ভাগ বাহার যত বেশী তাঁহার পরমার্থদৃষ্টি তত পরিষ্কৃত হইয়া থাকে। আসলে গুরু উপাসনা ক্রিয়া করা, যে সাধন করিতে চাহে না তাহার গুরু-উপাসনা হয় না। গুরু বাহু বাক্যকে গ্রাহ্য করেন না, তিনি সেই শিষ্যকেই ভালবাসেন যিনি সাধননিরত। গুরুই আত্মা, এই আত্মার নিকটে কে থাকিতে পারে? যে সৰ্ব্বদা ক্রিয়া করে। সৰ্ব্বদা ক্রিয়া করিলে চিত্ত স্থির হয়, মনের সমস্ত সঙ্কল্প-বিকল্প সেই স্থিরে লয় হইয়া যায়—ইহাই বসার্থ গুরুপদে আত্মসমর্পণ। এইরূপ আত্ম-সমর্পণে যে অভ্যন্ত সে নিজগুরুকে সৰ্ব্বদা দ্বিতে পারিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

(৭) শৌচ—শরীর এবং মনের পবিত্রতাই শৌচ। বাহু এবং আভ্যন্তর ভেদে শৌচ দুই প্রকার। মৃত্তিকা, জল ও শুদ্ধ আহার দ্বারা শরীরের বাহ্যমল এবং বাগ-দেবাঙ্গি দমন দ্বারা আভ্যন্তর মল প্রক্ষালন করিতে হয়। বাহার বাহুশৌচাদিকে মনের দুর্বলতা মনে করেন তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহারা ইহার আবশ্যকতা উপলব্ধি নাও করিতে পারেন, কিন্তু আত্মহিতৈচ্ছা ব্যক্তির এরূপ শৌচাদিকে অনাবশ্যক মনে করা উচিত নহে। অসাধারণ পুরুষের পূৰ্ব্বজন্মার্জিত পুণ্যপ্রভাবে অন্তঃকরণ অভ্যন্ত বিশুদ্ধ থাকে, তাহাদের শৌচাচারের আবশ্যকতা না থাকিতে পারে, কিন্তু সাধারণ লোকে এই দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলে নিজেদের বিপন্ন ও বঞ্চিত করিবে। শুদ্ধবাস, শুদ্ধাহার, শুদ্ধকথা ও শুদ্ধসঙ্গ সকলের পক্ষেই প্রয়োজনীয়; ইহাদের অভাবে আধিবাধি দ্বারা জীবনে বহু ক্লেশ পাইতে হয়। কিন্তু বাহার পূৰ্ব্ব পুণ্যফলে সাধনভঞ্জন। সর্বাভ্যন্ত তাহার বাহু এই শুদ্ধাচারের দিকে লক্ষ্য না রাখেন তবে এই সকল মালিন্য তাঁহার সাধন বিষয়ে বহু বিঘ্ন আনয়ন করিবে ইহা বেশ মনে থাকে। তবে বাহু শৌচাচার অতিরিক্ত মাত্রায় করিতে গিয়া বাহু শৌচাচারের উদ্দেশ্য তাহা হইতে অনেক দূরিত হইয়া পড়েন। এ বিষয়ে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

(৮) হৈর্য—সম্মার্গ ও সাধনপথ যিনি গ্রহণ করিয়াছেন, সেই মার্গ হইতে কখনও বিচ্যুত না হওয়াই হৈর্য। সাধন পথে সময়ে সময়ে বহুল বিঘ্ন আসিয়া সাধনের গমন পথ অবরোধ করে। বিঘ্ন হইতে মোক্ষমাগে প্রবেশের শিথিলতা আসে—বাহাদের চিত্ত সাধন বিষয়ে একনিষ্ঠ, তাহাদের চিত্ত এই সকল বিঘ্ন দ্বারা সাধন পথ হইতে দূরিত হয় না। যে মনোভাব হইতে সাধন বিষয়ক প্রযত্নের শৈথিল্য না ঘটে—সেইরূপ মনোভাবকেই “হৈর্য” বলা যাইতে পারে। বাহিরের চেষ্টায় এই প্রকার হৈর্য কিছু কিছু লাভ হইলেও সম্পূর্ণ আয়ত্ত করা সম্ভব নহে। প্রাণায়ামাদি বোগাদ সাধন ধারাই প্রকৃত মন-প্রাণের হৈর্য লাভ ঘটে। যিনি এইরূপ প্রযত্নে সর্বাভ্যন্ত তাহার ক্রিয়ার পর অবস্থায় বুদ্ধি আপনা আপনি স্থির হয়। বাহার ক্রিয়া করে না অর্থাৎ অযুক্ত তাহাদের এই প্রকার বুদ্ধি স্থির হইবার সম্ভাবনা নাই। ক্রিয়া করিতে করিতে বাহাদের বুদ্ধি স্থির হয় তাহারা উপরাম লাভ করে; কাম, ক্রোধ, শোভ, মোহাদি আর তাহাকে বিচলিত করিয়া তাহার ব্রত ভঙ্গ করিতে পারে না, উহাই বসার্থ হৈর্য। অনেক সময় ক্রিয়া করিয়াও ক্রিয়ার পর-অবস্থায় স্থিতিলাভ হয় না। ইহাও নিজেদেরই পূৰ্ব্বকর্মে ফল আনিয়া আরও ভীতব্রত বেগে ক্রিয়াতে প্রযত্ন করা উচিত। এই প্রযত্নের ফলে ক্রিয়ার পর অবস্থায়

স্থিতি হইবে হয়, কিন্তু এই স্থিতি লাভ পর্যন্ত সাধনার লাগিয়া থাকিতে না পারাই জীবনের পরম দুর্ভাগ্য। কিন্তু এ দুর্ভাগ্য মোচন করা সাধকের নিজের হাতেই রহিয়াছে। গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা করিয়া ভাল করিয়া মন দিয়া ক্রিয়া করিলেই মন ব্রহ্মে আটকাইয়া যায়। ভাগবতে রাসলীলার সময় ভগবানের সখকে বলা হইয়াছে—“আত্মব্রহ্ম সৌরত”—স্বরত অর্থে রতি-ক্রিয়া অর্থাৎ বিষয়-বাসনা ও বিষয়াসক্তি। এই স্বরত জন্ত যে আনন্দ তাহার নাম সৌরত। সেই বিষয়ানন্দ আত্মায় নিত্যই অবরুদ্ধ থাকে অর্থাৎ প্রবেশই করিতে পারে না। বাহার মন আত্মাতে আটকাইয়া থাকে তাহার বিষয়-বাসনার উদয়ই হইতে পারে না। এইরূপ অবরুদ্ধ অবস্থা বা হৈর্যই সাধনার ঐকান্তিক লক্ষ্য।

(৯) আত্মবিনিগ্রহ—দেহেন্দ্রিয়াদির প্রবৃত্তি নিরুদ্ধ করিয়া সম্মার্গে প্রবৃত্তির স্থিতিসাধন করিতে না পারিলে সাধনমার্গে বহু বিঘ্নই আসিয়া উপস্থিত হয়। এইজন্য একদিকে অভ্যাসপটুতা ও অন্যদিকে বাহু বিষয়াদির প্রতি অনাবশ্যক আসক্ত না হওয়া সাধন-জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার।

আত্মবিনিগ্রহের অর্থ হইল “আত্মা ব্রহ্মতে রাখা”—অর্থাৎ মনকে অন্য বিষয়ে বাইতে না দিয়া কেবল আত্মায় করিয়া রাখা। শ্রীমৎ স্বামী রামানুজের ব্যাখ্যাতেও এই কথা প্রতিধ্বনি আছে—“আত্মস্বরূপব্যতিরিক্তবিষয়েভ্যো মনসো নিবর্তনং”—আত্মস্বরূপ ব্যতীত অন্য বিষয় হইতে মনকে নিবর্তিত করাই—“আত্মবিনিগ্রহ”। মধুসূদন বলিয়াছেন—“আত্মনো দেহেন্দ্রিয়সংঘাতস্ত স্বভাবপ্রাপ্তং মোক্ষপ্রতিকূলে প্রবৃত্তিঃ নিরুধ্য মোক্ষসাধনং এব ব্যবস্থাপনং”—দেহেন্দ্রিয় সংঘাতের স্বভাবপ্রাপ্ত মনের যে মোক্ষবিষয়ে প্রতিকূল প্রবৃত্তি তাহাই নিরোধ করিয়া মোক্ষসাধনে ব্যবস্থাপিত করাই “আত্মবিনিগ্রহ”। এখন দেখা যাক মনকে আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত করা বাহু কিরূপে? আপনাতে আপনি—এই ভাবের স্থিতি হইলেই আত্মবিনিগ্রহ হয়। জোর করিয়া এই মনকে নিগ্রহ করা যায় না। আত্মবিনিগ্রহ শব্দে কেহ কেহ শরীর-সংযম, কেহ কেহ বা মনঃসংযম বুঝিয়াছেন। উভয়ের কথাই আংশিক সত্য, দেহ ও ইন্দ্রিয় উভয়কেই সংযত করিতে হইবে, নচেৎ চিত্তকে আত্মাভিমুখ করা কঠিন। প্রথমতঃ বিষয়ের প্রতি চিত্তের বেগকে হ্রাস করিয়া আনিবার জন্য ভোগ্য বিষয়ের (শরীর ও ভোগ্য বস্তুর) অনিত্যতা চিন্তা করা আবশ্যক, পরে দেহেন্দ্রিয়াদির সংযমের জন্য “আসন ও প্রাণায়াম”—এই দুইটির প্রয়োজনীয়তা সর্বাঙ্গীণা অধিক। যোগীরা সেই জন্য সাধনের মধ্যে আসন ও প্রাণসংযমকে উচ্চ স্থান দিয়াছেন। হঠযোগাদিগ্রন্থে স্বস্তিক পদ্মাসনাদি বহুবিধ আসনের উল্লেখ আছে কিন্তু তাহা প্রথম শিক্ষার্থীদের জন্যই বিশেষভাবে প্রয়োজন, তথাপি তাহাদের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু প্রকৃত “আসন” যে কি তাহা ভগবান পতঞ্জলি বোগদর্শনে উল্লেখ করিয়াছেন—“স্থিরসুখমাসনম্”। এমনভাবে আসন করিতে হইবে যাহাতে দেহের কষ্ট না হয়, দেহের কষ্ট হইলেই মন চঞ্চল হইবে। শ্রীমদ্ভাচার্য্য শঙ্কর অপরোক্ষাভূতিতে বলিয়াছেন—

‘সুখেনৈব ভবেচ্ছিন্ অজস্রং ব্রহ্মচিন্মনু।

আসনঃ তদ্বিজ্ঞানীয়াং নেতরং সুখনাশনম্॥’

যে অবস্থায় সুখপূর্বক অজস্র ব্রহ্মচিন্তন হইতে থাকে, তাহাকেই একান্ত আসন বলিয়া জানিবে, অন্য-আসনাদি সুখ-নাশের ভয়।

কিন্তু এই অজস্র ব্রহ্মচিন্তন হইবে কিরূপে? একে তো মনের ছুটাছুটি আছেই, তাহার উপর দেহ ঝাঁকিয়া বসে, এই অল্প দেহটাকে ঠিক করিবার অল্প হঠযোগীরা বহুবিধ আসনের উপদেশ করিয়াছেন। তাহাতে দেহ ও দৈহিক বিকারের উভয়েরই শান্তি হইয়া থাকে। কিন্তু দেহকে ঠিক করিতে করিতে ওদিকে যে আত্ম সুখাইয়া যায়, আর অজস্র ব্রহ্মচিন্তন কিরূপে করিব? তাই কেবল আসনের দিকে লক্ষ্য না করিয়া এক আধটা আসন বাহা অভ্যাস হয় তাহার উপরই নির্ভর করিয়া মনকে স্থির করিবার প্রযত্নই সর্বাপেক্ষা অধিক করিয়া করা আবশ্যক। “স্থিরহৃৎমানসম্” স্থিরতা-জনিত যে সুখ সেই স্থিরত্বে যাহার চিত্ত উপবিষ্ট থাকে তাহারই আসন-সিদ্ধি হইয়াছে। প্রাণায়ামাদি যোগাভ্যাসের প্রভাবে চিত্ত যখন প্রাণসহ হৃদয়-দেশে অবস্থান করিতে পারে, তখন সে চিত্তে আর কোন তরঙ্গ উঠে না। এই স্থির প্রশান্ত চিত্তই ভগবানের বসিবার স্থান। নিরালম্বোপনিষদে আছে—“ব্রহ্মৈব প্রকৃতিশক্ত্যভিলেশমাপ্রিত্য লোকান্ দৃষ্টান্তর্ধ্যামিষেন প্রবিশ্ত ব্রহ্মাণীনাং বুদ্ধ্যাহীম্রিয়ন্তৃষা-দৌখরঃ”—ব্রহ্ম স্বয়ং নিছ প্রকৃতিশক্তির লেশকে আশ্রয় পূর্বক সকল লোক দৃষ্টি করিয়া অন্তর্ধ্যামী (অন্তরে-গমন করিব) এতদ্রূপ চিন্তনান্তর সকলের হৃদয়ে প্রবেশপূর্বক জগতস্থ তাবৎ ব্যক্তির বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তাই দেখর। তাই চিত্ত যাহার যত অন্তরে অর্থাৎ হৃদয়ে প্রবিষ্ট তাহার দেখর-সান্নিধ্য তত অধিক। হৃদয়দেশে চিত্তকে স্থাপিত করিতে পারিলে তবে এই চঞ্চল চিত্ত স্থিরত্বের আনন্দ ও প্রশান্ততাবের আবাদন প্রাপ্ত হয়। গীতাতেও “ভূতৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমানসাম্মনঃ” বলিয়াছেন। এই শুচিদেশই হইল হৃদয়াকাশ, সেই হৃদয়াকাশেই যোগীকে আসন পাতিতে হইবে। এই আসন যাহার যত দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত, তিনি দেখরের সহিত তত যোগযুক্ত হইতে পারিয়াছেন। এই আসনের যাহা কল, তাহা যোগদর্শনে যেক্রমে উল্লিখিত আছে তাহা বলিতেছি। ঋষি বলিয়াছেন—

“প্রযত্নশৈথিল্যানন্তসমাপত্তিভ্যাম্।”—যোগদর্শন, সাধন পাদ।

আসনসিদ্ধি তখন হইয়াছে বুঝিতে পারা যাইবে যখন “প্রযত্ন শৈথিল্য ও অনন্ত সমাপত্তি” এই দুইটি লক্ষণ পরিষ্কৃত হইয়াছে। শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির মধ্যে যে স্বাভাবিক কঠোরমুখতা দৃষ্ট হয়, তাহার শিথিলতার নামই “প্রযত্ন শৈথিল্য”, অর্থাৎ যে সময় চিত্তের একরূপ হৈর্য্য হয় যে তখন আর দেহাদি অবয়ব অথবা চক্ষু-শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়নিচয় আর কোন ব্যাপারের মধ্যে ধাবিত হইতে চাহে না, সর্বপ্রকার কর্ম্মচেষ্টা হইতে তাহাদিগকে যেন নিরস্ত করিয়া রাখে, তখনই “প্রযত্ন শৈথিল্য” অবস্থা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। “অনন্ত সমাপত্তি” তখনই হয় যখন চিত্ত অসীম ভাবে ভাবিত হয়, চিত্ত তখন আর সসীম ভাব লইয়া থাকিতে পারে না। অনন্তের ভাষা ভাষা উপলব্ধিও (বাহ্য কবিদের হয়) তাহা সম্যক প্রাপ্তি বা সমাপত্তি নহে। আমরা সঙ্ক্যাতি পূজাকালে সে আসনগুচ্ছ করিয়া থাকি, তাহার উদ্দেশ্যও এই অসীমভাব

চিত্তকে প্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া। আসন মন্ত্রের তাই সুতল ছন্দ, কুর্খ দেবতা এবং মেরুপৃষ্ঠ ঋষি। মেরুপৃষ্ঠই সেই দেবতার পীঠস্থান, তন্ন্যাস্য শক্তিই তাহার ঋষি, ইহার ছন্দ সুতল অর্থাৎ পদতল হইতে মূল্যধার ও নাভি পর্যন্ত বায়ু স্থির, তখন যে ভাব বা দেবশক্তির প্রকাশ হয়—তাহাই কুর্খ দেবতা। কুর্খ যেমন অঙ্গ সকলকে ভিতরে সঙ্কুচিত করিয়া রাখে তদ্রূপ যাহার মন প্রাণের মধ্যে এবং প্রাণ মহাপ্রাণ স্থিরতার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তাহারই একান্ত আসন সিদ্ধি হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই আসন সিদ্ধি হইলে “ততো হৃদ্বানভিধাতঃ”—অর্থাৎ শ্রীত-উচ্চ, সুখ-হৃৎখাদি বন্দ জনিত চিত্তের যে ক্রেশ তাহা আর থাকিতে পারে না। এতদবস্থায় অস্থূল বা প্রতিকূল কোন ভাবের দ্বারাই চিত্ত মগ্নিত হইতে পারে না। যে সুখস্বরূপ ব্রহ্মে স্থিত হইলে অন্য কোন চিন্তার লেশও উদয় হয় না, সেই ত্রিকালস্থায়ী ব্রহ্মই আসন, সাধকের বসিবার স্থান।

দ্বিতীয় বিষয়টী প্রাণসংযম—যাহা প্রাণায়ামাদি সাধন দ্বারা হইয়া থাকে। প্রাণের স্থিরতা না পাওয়া পর্যন্ত প্রাণের স্বরূপ অসুভব হয় না। প্রাণের সাধনান্তেই হৃদয়গ্রহি ভেদ হয়। প্রাণই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্রবাহিকার মধ্য দিয়া গিয়া নানাস্থানে গ্রহি উৎপন্ন করিয়াছে। যেমন নদীর মধ্যে আবর্ত্ত হয় সেইরূপ প্রাণধারা এই এক একটি গ্রহির মধ্যে সন্নিবদ্ধ হইয়া তথায় প্রাণ-প্রবাহকে আবর্ত্তময় করিয়া তুলিয়াছে, সেই গ্রহি ভেদ না হওয়া পর্যন্ত জীবের মুক্তি হয় না। কারণ যাহা মুক্তির পথ তাহাই আবর্ত্তবহুল হইয়া স্বাভাবিক গতিতে বোধ করিয়া রাখিয়াছে। এই আবর্ত্তকে আবর্ত্তহীন সরল করিয়া তুলিতে হইবে, তাহা হইলেই প্রাণশক্তি বা কুণ্ডলিনী শক্তি সহজ পথ পাইয়া স্বস্থানে অবিলম্বে পৌঁছিতে পারিবে। কুণ্ডলিনীর পথকে মুক্ত করিয়া যেওয়াই মুদ্রাদি সাধনের উদ্দেশ্য। প্রাণায়াম দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বিচ্ছেদ হইতেই প্রাণের নিরোধ-ভাব উপস্থিত হয়। তখন বুঝিতে পারা যায় আমার “অহং”-ভাবও প্রাণসত্তা হইতে অভিন্ন।

এই প্রাণায়ামের কল যোগদর্শনে আছে—“ধারণাহ্ যোগ্যতা মনসঃ”—যোগ ধারণা বিষয়ে মনের যোগ্যতা লাভ হয়। আমাদের সময়ে সময়ে আধ্যাত্মিক ভাবের কথাগুলি ভাল লাগে, কোন কোন সময়ে আকস্মিক অনেক আধ্যাত্মিক বিষয়ের উপলব্ধিও হইয়া থাকে, কিন্তু সে ভাবগুলিকে মনের অক্ষমতা হেতু ধারণা করিয়া রাখা যায় না। হৃতরাং সেই সকল অত্যাশ্রম ভাবনিচয়ের স্মৃতিধারা অল্প সময়ের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাই উচ্চভাবে ভাবিত হইলেও মনের সে ভাবকে স্থায়ী করিয়া রাখা শক্ত। জলের বুদ্ধবুধ যেন ক্ষণপরে জলেই মিশিয়া যায়। ইহাতে স্থায়ী কল্যাণ হয় না, স্মৃতি ধ্রুবা না হইলে চিন্তগুচ্ছের বিদ্রব করে। এই জন্য যাহা ধারণার ব্যাধাতক ও আত্মপ্রকাশের আবরণ স্বরূপ তাহার ক্ষয় হওয়া আবশ্যক। এই আবরণ ক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত সাধনার উচ্চতম অবস্থায় উপনীত হওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু ইহাতেও প্রাণায়ামের কল্যাণকারিণী শক্তির সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হইল না। অপবোদ্ধাত্বভূতিতে প্রাণায়ামের এই লক্ষণ করিয়াছেন—

“চিত্তাদি সর্বভাববু ব্রহ্মত্বেনৈব ভাবনাং।

নিরোধঃ সর্ববস্তীনাং প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে ॥”

চিত্তের সমস্ত ভাবকে ব্রহ্মময়ী করিতে পারিলেই আর তাহা অন্ধাকারে উপলব্ধি না হইলেই সর্ববৃত্তির নিরোধ হয়, উহার নামই প্রাণায়াম। এই প্রাণায়াম যতদিন সহজভাবে বোধ না হয় ততদিন দৃষ্টিকে ব্রহ্মময়ী করিয়া জগৎকে ব্রহ্মময় বোধ করা যায় না। কিন্তু প্রাণায়াম অর্থাৎ প্রাণের বিস্তৃতি হইলেই উহা সহজ বোধ্য হয়। প্রাণ এই দেহরূপ আশায়ের মধ্যে পড়িয়া সঙ্কুচিত হইয়াছে, এই দেহটার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেহটাকে প্রাণময় করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার অনন্ত বিস্তৃতি যেন থরু হইয়া গিয়াছে। প্রাণায়ামের দ্বারা প্রাণবৃত্তি রোধ হইলেই স্থিরপ্রাণের যে অনুভব হয় তাহা অনন্তব্যাপী বলিয়া মনে হয়। ব্যাপ্তির এই অসীমতাই ব্রহ্মভাব। প্রাণ তখন সর্বব্যাপী আকাশের মত হইয়া যায়—ইহাই প্রাণায়াম বা প্রাণের বিস্তার। কিন্তু মননের দ্বারা এই বিস্তার সহজ সম্পাদ্য নহে, এইজন্য দেহের মধ্যে প্রাণের যে স্পন্দন রহিয়াছে, ঐ প্রাণেতে লক্ষ্য রাখিয়া তাহা নিরুদ্ধ করিতে হইবে। প্রাণের নিরন্তর স্পন্দন হইতেই অসংখ্য মনোবৃত্তি স্পন্দিত হইতেছে, সেই প্রাণের স্পন্দন রোধ করিতে পারিলেই মনকে নিরোধ করা সহজ হইবে। বৃহদারণ্যকোপনিষদে অন্তর্ব্যামি ব্রাহ্মণের স্তোত্রপ্রস্তাবে বর্ণিত আছে—“যেহেতু প্রাণ ও মন একসঙ্গেই স্পন্দিত হয় বলিয়া প্রাণের সংযমে মনেরও সংযম হইয়া থাকে”। মনে ব্রহ্মবৃত্তি অধুগা করে প্রবাহিত করা কঠিন, কারণ মনের বৃত্তি রোধ করা সহজ নহে। সেইজন্য বিচারণ্য মুনি স্বকীয় ‘ঈশ্বরজ্ঞানবিবেক’ গ্রন্থে বলিয়াছেন—“অতি প্রবলতা হেতু যদি বাসনাসমূহকে পরিভ্রাণ করিতে পারা না যায়, তবে প্রাণস্পন্দ নিরোধই উপায়।” বঠযোগ প্রদীপিকায় আছে—

“কন্দোৰ্দ্ধং কুণ্ডলীশক্তিঃ সূপ্তা মোক্ষায় যোগিনাম্।

বন্ধনায় চ মূঢ়ানাং যন্তাং বেত্তি স যোগবিন্ ॥”

কন্দের উপরিভাগে কুণ্ডলিনী শক্তি শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। বাঁহারা সেই কুণ্ডলিনীর উত্থাপন করেন তাঁহারাষ্ট মোক্ষপ্রাপ্ত হন। আর যে যুগল তাহা করে না, তাহারা বন্ধনপ্রাপ্ত হয়। সেই কুণ্ডলিনীকে বাঁহারা জাগ্রত করিবার উপায় বিদিত আছেন তাঁহারাষ্ট প্রকৃত যোগবিন্। সুব্রা নাড়ীর দ্বার সর্পাকারা কুণ্ডলিনী শক্তির দ্বারা আবদ্ধ থাকে, এজন্য প্রাণবায়ু সুব্রা মার্গে প্রবেশ করিতে পারে না। প্রাণায়ামাদি দ্বারা কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হইলে সুব্রার অববোধ খুলিয়া যায়, তখন প্রাণবায়ু অতি সহজে সুব্রা মধ্যে প্রবেশ করে। মধ্যপথে সুব্রায় প্রাণবায়ু সঞ্চার করিলেই সাধকের উন্নয়ন অবস্থা লাভ হয়। স্থায়ীভাবে উন্নয়ন অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই ঈশ্বরজ্ঞান লাভ হয়। সুব্রায় প্রাণবায়ু প্রবাহিত হইলে মনের যে নাশ হয় তাহা সুব্রাণ্ডি অবস্থায় মনোলায়ের মত নহে। সুব্রাণ্ডিতে মন স্তব্ধ থাকে, বিলুপ্ত হয় না, কিন্তু উন্নয়ন অবস্থায় যোগীদের মন অমনে পরিণত হয় অর্থাৎ মন বলিয়া কিছু আর তখন থাকে না।

“নির্বিকারতয়া বৃত্ত্যা ব্রহ্মাকারতয়া পুনঃ।

বৃত্তি বিশ্বরণং সম্যক্ সমাধির্জানসংজ্ঞকঃ ॥”—অপরোক্ষানুভূতি

ইন্দ্রিয়ার্থেষ্ণু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।

জন্মমৃত্যুজরাব্যাদিহুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥ ৮

অন্তঃকরণে যখন কোন বৃত্তির স্ফুরণ থাকে না, তখন তাহাকে নির্বিকার অবস্থা বলে—উহাই ব্রহ্মাকারা বৃত্তি—সেই অবস্থায় বৃত্তির সম্যক্ বিশ্বরণ হয়—তাহাকেই সমাধি বলে—তাহা অজ্ঞানরূপা নহে।

প্রাণের স্পন্দনেই মনোবৃত্তি সমূহ স্পন্দিত হইয়া উঠে, যোগাভ্যাস দ্বারা সেই প্রাণ নিরুদ্ধ হইলেই মনোবৃত্তিও নিরুদ্ধ হয়। উহাকে সমাধি বলে। বুদ্ধিতে রাহু রশ্মি প্রতিবিম্বিত হইলেই বুদ্ধির একাগ্রতা নষ্ট হয়। কিন্তু যে বুদ্ধি সর্বদা সাম্যাবস্থায় থাকে, তাহাতে অজ বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়ে না, সূতরাং সে বুদ্ধি তখন আত্মাকারাকারিত হয়। এই আত্ম-কারাকারিত বুদ্ধিই ব্রহ্মাকারা বৃত্তি, উহাই মুক্তির হেতু। যোগকল্পক্রমে আছে—

“ধ্যেয় স্বরূপোপগত্যং যদা মনো, বিশ্বত্য চাত্মানমথাবতিষ্ঠতে।

সঙ্কল্পপূর্ণাপগত্যং তমস্তিমং যোগম্ সন্তোহবয়বং প্রচক্ষতে ॥”

ধ্যেয়স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া যখন মন আপনাকে তুলিয়া গিয়া আত্মাতেই অবস্থান করে তখন সকল প্রকার সঙ্কল্প অপগত হয়, সেই অবস্থাকেই সাধুবা যোগের চরম অবয়ব অর্থাৎ সমাধি বলিয়া থাকেন ॥ ৭

অন্বয়। ইন্দ্রিয়ার্থেষ্ণু বৈরাগ্যম্ (ইন্দ্রিয়াদির ভোগ্য বিষয়ে বৈরাগ্য) অনহঙ্কারঃ এব চ (এবং নিরহংকারিতা), জন্মমৃত্যুজরাব্যাদিহুঃখদোষানুদর্শনম্ (জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাদির মধ্যে হুঃখরূপ দোষের পুনঃ পুনঃ আলোচনা) ॥ ৮

শ্রীধর। কিঞ্চ—ইন্দ্রিয়ার্থেধিতি। জন্মাদিহুঃখদোষয়োঃ অনুদর্শনং—পুনঃপুনঃ আলোচনম্। হুঃখরূপস্ত দোষস্ত অনুদর্শনমিতি বা। স্পষ্টমন্ত্রঃ ॥ ৮

বঙ্গানুবাদ। জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাদিতে হুঃখ এবং দোষের অনুদর্শন অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ আলোচনা। অথবা জন্মাদিতে যে হুঃখরূপ দোষ রহিয়াছে তাহার পুনঃ পুনঃ আলোচনা। অপরোক্ষ স্পষ্ট ॥ ৮

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ইন্দ্রিয়ের নিমিত্তে কোন বিষয় ইচ্ছা না করা—মনে অহঙ্কার না করা, জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাদি, হুঃখ ও দোষের অনুসন্ধান।—(১০) ইন্দ্রিয়ে বিষয়ভোগে অস্পৃহা। ইন্দ্রিয়ের-ভোগ্য বিষয় দুই প্রকার—দৃষ্ট ও অদৃষ্ট। মন ইন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া সেই সকল দৃষ্টাদৃষ্ট বিষয় ভোগ করে এবং আসক্তিবশতঃ আবদ্ধ হয়; সূতরাং বিচার দ্বারা বিষয়ের হেয়ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিলে আর তাহাতে স্পৃহা থাকিবে না। (১১) অনহঙ্কার অর্থাৎ অহঙ্কারশূন্যতা। (১২) জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাদি, হুঃখ দোষানুদর্শন—জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতিতে যে হুঃখ রহিয়াছে তাহার আলোচনা করা। জন্ম হইলেই গর্ভবাস এবং গর্ভ হইতে যোনিদ্বার দিয়া নিঃসরণ, মৃত্যুর সময় বিবিধ ক্লেশ, মর্শ্বস্থান ছিন্ন করিয়া প্রাণের উৎক্রমণ এবং নিরাশ্রয় হেতু মনের ভয়, অত্যন্ত স্থিরাবস্থাই

অসক্তিরনভিষঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু ।

নিত্যং চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥ ৯

জরা, তাহাতে হস্ত-পদাদি ও ইঞ্জিয়াদিব শক্তি হ্রাস হইয়া যায় এবং মনেরও শক্তি কমিয়া যায়, বৃদ্ধির প্রার্থ্যেরও ব্যতিক্রম ঘটে; এ অবস্থা অত্যন্ত কষ্টকর, এ অবস্থায় বাঁচিয়া থাকা কেবল কষ্টভোগ মাত্র। ইহার উপর ব্যাধি, নানা প্রকার যন্ত্রণাদায়ক দৈহিক পীড়া—এই সকল দুঃখভোগের কথা পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিলে ঘেহ ধারণের বাসনা এবং ঘেহজনিত বিবিধ ভোগ-বাসনা ক্ষীণ হইতে থাকে। পুত্ররাং এতদালোচনা যে জ্ঞান লাভের অঙ্গুল তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাই।

[শ্রীমদাচার্য্য শঙ্কর এই শ্লোকের বুঝিতে বলিয়াছেন—“জন্ম চ মৃত্যুশ্চ জরা চ ব্যাধয়শ্চ দুঃখানি চ তেষু জন্মাদিহঃখাত্তেষু প্রত্যেকং দোষানুদর্শনম্”—জন্ম, মরণ, বার্দ্ধক্য, ব্যাধিসমূহ ও অন্ত্যস্ত দুঃখ সমূহ—এই কয়টি বস্তুর প্রত্যেকটিতেই দোষদর্শন অর্থাৎ আলোচনা করা। অথবা—“দুঃখাত্তেষু দোষঃ দুঃখদোষস্তস্মৈ জন্মাদিষু পূর্ববদনুদর্শনম্। দুঃখং জন্ম, দুঃখং মৃত্যু, দুঃখং জরা, দুঃখং ব্যাধয়ঃ, দুঃখনিমিত্তাৎ জন্মাদয়ো দুঃখং। ন পুনঃ স্বরূপেণৈব দুঃখমিতি। এবং জন্মাদিষু দুঃখ-দোষানুদর্শনাৎ দেহেন্দ্রিয়-বিষয়ভোগাদিষু বৈরাগ্যমুপজায়তে। ততঃ প্রত্যগাত্মনি প্রবৃত্তি করণানামানুদর্শনায়। এবং জ্ঞানহেতুত্বাৎ জ্ঞানযুচ্যতে জন্মাদিহঃখ-দোষানুদর্শনম্”—অথবা দুঃখ সমূহই দোষ এই অর্থে দুঃখদোষ শব্দটির প্রয়োগ করা হইয়াছে, সেই ‘দুঃখদোষ’ শব্দটি জন্মাদি শব্দগুলির সহিত জঘন্য করিতে হইবে। যথা জন্ম-দুঃখ, মৃত্যু-দুঃখ, জরা-দুঃখ, ব্যাধিসমূহও দুঃখ। জন্ম প্রভৃতি স্বরূপতঃ দুঃখ নহে, কিন্তু উহারা দুঃখের কারণ, এইজন্য দুঃখ বলিয়া কীর্ণিত হইল। এই প্রকার জন্ম প্রভৃতিতে দুঃখ দোষানুদর্শনের দ্বারা দেহেন্দ্রিয় ও বিষয়-ভোগ সমূহে বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়। তাহার পর পরমার্থদর্শনের প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়। এই প্রকার জন্মাদিতে দুঃখ-দর্শনও জ্ঞানের হেতু বলিয়া উহা জ্ঞান শব্দ দ্বারা অভিহিত হইয়াছে। এই সকল বিষয় ক্রমকর চিন্তা করিতে করিতে ভোগ-বাসনা হ্রাস হইয়া আসে এবং ঘেহ-ধারণের ক্ষমতা বলবতী লুপ্ত থাকে না—এইজন্য জন্মমৃত্যু প্রভৃতির দোষানুদর্শন আত্মজ্ঞান লাভের পরম সহায়] ॥ ৯

অনুয়। পুত্রদারগৃহাদিষু (পুত্র স্ত্রী গৃহাদিতে) অসক্তিঃ (প্রীতিবর্জন), অনভিষঙ্গঃ (তাহাদের সুখদুঃখে আপনাকে সুখী বা দুঃখী মনে না করা), ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু চ (এবং ইষ্টলাভে বা অনিষ্টলাভে) নিত্যং সমচিত্তত্বং (সর্বদা চিন্তের সমতা) ॥ ৯

শ্রীধর। কিঞ্চ—অসক্তিরিতি। পুত্রদারাদিষু অসক্তিঃ—প্রীতিত্যাগঃ। অনভিষঙ্গঃ—পুত্রাদীনাং সুখদুঃখে বা অহমেব সুখী দুঃখী ইতি অধ্যাসাতিরেকাতাভাবঃ। ইষ্টানিষ্টয়ো উপপত্তিষু—প্রাপ্তিষু, নিত্যং—সর্বদা সমচিত্তত্বম্ ॥ ৯

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন]—পুত্রাদিতে অসক্তি অর্থাৎ প্রীতিত্যাগ। অনভিষঙ্গ অর্থাৎ পুত্র প্রভৃতির সুখে বা দুঃখে আমিই সুখী বা দুঃখী এইরূপ অধ্যাসের যে আধিক্য তাহার অভাব। ইষ্ট এবং অনিষ্ট প্রাপ্তিতে সর্বদা সমচিত্ততা ॥ ৯

ময়ি চানন্তযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী ।

বিবিক্তদেশসেবিত্ত্বমরতির্জনসংসদি ॥ ১০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ইচ্ছারহিত পুত্রদারগৃহাদির সহিত সঙ্গ-সমান রকম চিন্তা ভাল মন্দ দুয়েতে।—(১৩) অসক্তি—স্রী পুত্র গৃহাদিতে জীবের মমতা স্বভাবতঃই অধিক হইয়া থাকে, এবং সেইজন্য তত্তৎ বিষয়ে কতই সঙ্কল্প-বিকল্পের চেষ্টা উঠিয়া মনকে বিক্ষিপ্ত করে। তাহাদের সুখ-দুঃখে আপনাকে সুখী দুঃখী, তাহাদের জীবন-মরণে নিজের জীবন-মরণ এইরূপ ভাবই হইল অভিধৃদ, এই সকল বিষয়ে মনোযোগের অভাবই (১৪) অনভিষঙ্গ। যাহার প্রকৃত জ্ঞান হয় তাহার স্রী পুত্র গৃহাদির প্রতি কোন আসক্তিই থাকে না। ঐ সকল বস্তুর সঙ্গলাভেও তাহার প্রীতি উৎপন্ন হয় না, তাহাদের সঙ্গের অভাবেও তাহার কোন দুঃখ বা অভাব বোধ হয় না। (১৫) সমচিত্তত্ব—তাহাদের সুখ-দুঃখাদিতেও তাহার চিন্তের সমতা নষ্ট হয় না। ক্রিয়ার পর অবস্থার নেশায় যাহারা বিতোর এসব সাংসারিক কোন কথাই তাহাদের মনে উদয় হয় না ॥ ৯

অনুয়। ময়ি চ (আর আমাতে) অনন্তযোগেন (অনন্তযোগ দ্বারা) অব্যভিচারিণী ভক্তিঃ (একান্তিক ভক্তি), বিবিক্তদেশসেবিত্বং (নির্জন স্থানে বাস), জনসংসদি (জন সঙ্গ) অবতিঃ (বিরাগ) ॥ ১০

শ্রীধর। কিঞ্চ—ময়িচেতি। ময়ি—পরমেশ্বরে। অনন্তযোগেন—সর্বাঙ্গদৃষ্টা। অব্যভিচারিণী—একান্তা ভক্তিঃ। বিবিক্তঃ—শুভঃ চিন্তাপ্রসাদকরঃ, তৎ দেশং সেবিতুং শীলং যন্ত তন্ত ভাবঃ তদ্বৎ। প্রাকৃতানাং জনানাং সংসদি—সভায়াম্, অবতিঃ—বৃত্যভাবঃ ॥ ১০

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন]—পরমেশ্বর স্বরূপ যে আমি সেই আমাতে অনন্তযোগ অর্থাৎ সর্বাঙ্গদৃষ্টি দ্বারা একান্ত ভক্তি, শুদ্ধ এবং চিন্তাপ্রসাদকর যে দেশ সেইরূপ দেশেই অবস্থান করা যাহার স্বভাব তাহার ভাবই ‘বিবিক্তদেশসেবিত্ব’ আর প্রাকৃত লোকদিগের সভায় থাকার অনিচ্ছা ॥ ১০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সকল ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিলেই আপনা আপনি হইবে—ক্রিয়াতে মন রেখে অজ্ঞানিকে আসক্তিপূর্বক দৃষ্টি না করিয়া থাকা উচিত—আসক্তিপূর্বক অর্থাৎ আত্মা ব্যতীত অজ্ঞানিকে দৃষ্টি করিলেই স্তূত্ররাং ব্যভিচারী দোষগুণ সকলেই যাহারা আত্মাতে নেই—সদা আত্মকিয়া, আত্মচিন্তা, আত্মমনন, ও আত্মজ্ঞান ও কাজে কাজেই হইলেন। সকল জ্যাংটার মধ্যে এক কাপড় পরা—সেই অগ্রাহ; নির্জন অর্থাৎ কোনদিকে আসক্তিপূর্বক মন না দেওয়া এবং কোন লোকের প্রতি আসক্তিপূর্বক না দেখা।—পরমেশ্বর স্বরূপ যে “আমি” সেই আমি বা আত্মাতে অনন্তযোগের সহিত (১৬) অব্যভিচারিণী ভক্তি হওয়া চাই। অনন্তযোগ কাহাকে বলে? একান্ত চিন্তে ভগবানে আত্মসমর্পণ। শ্রীমদাচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—“ন অস্তো ভগবতো বাসুদেবাৎ পরোহস্তি, অতঃ স এব নো গতিরিত্যেব নিশ্চিতা অব্যভিচারিণী বুদ্ধিঃ অনন্তযোগঃ, তেন ভজনং ভক্তিঃ। ন ব্যভিচারশীলা

অব্যভিচারিণী সা চ জ্ঞানং”—ভগবান বাসুদেব হইতে অল্প কেহ শ্রেষ্ঠ নাই, অতএব তিনিই আমাদের একমাত্র গতি এইরূপ নিশ্চিতবুদ্ধিকেই অনন্তযোগ বলা যায়। সেই অনন্তযোগের সহিত যে ভক্তি বা ভজন তাহাই অব্যভিচারিণী ভক্তি। সেই ভক্তিও জ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞানলাভের উপায়। আবার ক্রিয়ার পর অবস্থাই প্রকৃত “জ্ঞান,” সেই জ্ঞানলাভ হয় যদি ফল কামনারহিত হইয়া অবিলম্বিতভাবে ক্রিয়া করা যায়। এইভাবে ক্রিয়া করিতে করিতে আর অল্প বস্তুর প্রতি আসক্তির সহিত দৃষ্টি থাকে না, লক্ষ্য সর্বদা আত্মাতেই থাকে। আত্মাতে লক্ষ্য না থাকিলেই মন ব্যভিচার ঘোষে ছুট হইয়া থাকে। কিন্তু সাধক যখন অন্তত্ব করেন যে “ভগবান বাসুদেব হইতে শ্রেষ্ঠ কেহ নাই,”—সুতরাং তিনি আমার সর্বত্র, তখন তিনি তাঁহাকে ভজন না করিয়া অল্প বস্তুর প্রতি আসক্তি ঘোষাইবেন কেন? সাধকের অব্যভিচারিণী ভক্তি এখানে জ্ঞানের অত্যন্তম লক্ষণরূপে নির্দেশ করা হইল। ক্রিয়ার পর অবস্থায় অল্প কোন বোধ না থাকায়, সেই অবস্থায় যে ভজন তাহাই অনন্ত-ভক্তি।* অর্থাৎ তাহাতে স্থিতি; তাহাই প্রকৃত ভক্তি।

এই বোধ ভজন করিতে করিতেই হয় বটে, কিন্তু কখন হয়? যে বিশ্বব্যাপী আত্মা সর্বত্র ও সকলের মধ্যে অশূন্যপ্রতি হইয়া রহিয়াছেন, যখন তাঁহাকে তিনি সাক্ষাৎ করেন। এইরূপ আত্মদর্শন আমাদের সকলের হয় না কেন? কারণ আমাদের মন বহির্ভূত হইয়া নিজ কল্পনাবলে অবস্থিতে (যাহা প্রকৃত কোন বস্তু নহে) বস্তু দর্শন করে এবং তাহাই সত্য ভাবিয়া সেই সকল কল্পিত বস্তুকে ভোগার্থ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হয়। যদি সংগ্রহে সমর্থ হয় তখন তাহার আর আনন্দের সীমা থাকে না, আর যদি সংগ্রহে অসমর্থ হয় তাহা হইলে শোক দুঃখে ভাজিত হয়। কিন্তু উহা যে আকাশের গায়ে মূর্ত্তি কল্পনার ভায় অলীক তাহা বিচার করিয়া ঘেঁষিবার সামর্থ্য তখন তাহার থাকে না, তজ্জন্ত তাহাদের চিত্ত ক্ষণে ক্ষণে জ্ঞানন্দে ও নিরানন্দে ভরিয়া যায়। এই মিথ্যা কল্পনার কবল হইতে মুক্তি না পাইলে জীবের শান্তি লাভের সম্ভাবনা কোথায়? জীবের গতি-মুক্তি যে সেই চিরস্থির সধানন্দময় আত্মা। তিনি যে পরম শূন্য, কারণ সেখানে মনও নাই, কল্পনাও নাই, ভোক্তা ভোগ্য সম্বন্ধও সেখানে নাই, সুতরাং বস্তুর প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তিতে সেই সুখময়ী শান্তি-নিদ্রার কোন বিঘ্ন ঘটবার সম্ভাবনা নাই। এই সুখময় শান্তিময় অবস্থা পাওয়া যায় কিরূপে? সর্বদা আত্মক্রিয়া, আত্মচিন্তা ও আত্মমননের দ্বারা মনের নিবিড় কল্পনা-মেঘ কাটিয়া যায়, কল্পনা তিরোহিত হইলেই আত্মজ্ঞানের উবাশিষ্ক-কিরণে মন-প্রাণ ও দেহ ভরিয়া যায়। তখন কোন দিকে আসক্তি নাই, কোন বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি আসক্তি নাই—তখন মন অনশ্রুত অরণ্যের মত নিশ্চল কোলাহল শূন্য। সে কি স্বর্গের অবস্থা! এই অবস্থাই ক্রিয়ার পর অবস্থা, অল্প দিকে দৃষ্টি না দিয়া মন দিয়া কেবল ক্রিয়া করিতে পারিলে এই অপূর্ণ অবস্থাকে আয়ত্ত করা যায়। আত্মা ব্যতীত অল্প বিষয়ে আসক্তি হইলেই চিত্তের পবিত্রতা নষ্ট হয়, চিত্ত তখন ব্যভিচারঘোষপ্রাপ্ত হয়। মনের বিষয়রতি থাকিতে ঐকান্তিকভাবে আত্মায় যোগস্থাপন হয় না। সেই জন্য সর্বদা আত্মক্রিয়া ও আত্মমননে সচেষ্ট থাকিতে হইবে। যে সাধক তীব্র চেষ্টাশীল ও যাহার চিত্ত তীব্র বৈরাগ্যযুক্ত তাহার এ অবস্থা লাভ

করিতে বিলম্ব হয় না। এই অবস্থা পাইলে তাঁহার ভগৎ-বিশ্বস্তি বটে, তখন “আপনার নাম মোর নাহি পড়ে মনে” এইরূপ ভাব হয়। ইহাই মনের অব্যভিচারী ভাব। এই অবস্থাতে আত্মার সহিত অনন্তযোগ হওয়ায় ভগবানে অকপট প্রেম সংস্থাপিত হয়। ইহাই অবিলম্বিত স্থির ভাব বা ভক্তি। এই অবস্থা লাভের দ্বিতীয় (১৭) বিবিক্ত-দেশসেবিত্ব ও (১৮) জনসংসর্গি অরতি আবশ্যক। বিবিক্ত দেশ কাহাকে বলে? “বিবিক্তঃ স্বভাবতঃ সংস্কারেণ বা অন্ত্যাদিভিঃ সর্পাঘাতাদিভিঃ চ রহিতঃ, অবপ্যনদীপুলিনদেবগৃহাদি-বিবিক্তো দেশঃ”—যে স্থান স্বভাবতঃ পবিত্র অথবা যে স্থান সংস্কার দ্বারা শুদ্ধ এবং যে স্থানে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুরা বিচরণ করে না, সেই স্থানকে বিবিক্ত দেশ বলা যায়, যেমন অরণ্য, নদীপুলিন বা দেবমন্দির প্রভৃতি। নির্জন স্থানে বা বিবিক্তদেশে বাস করিলে চিত্তপ্রসাদ লাভ হয়। এই দ্বিতীয় আত্মহিতৈচ্ছা সাধকগণ মনো মনো নির্জন স্থানে বাস করিয়া দৃঢ়ভাবে সাধনায় মনোনিবেশ করিবেন। যে স্থানে লোকসমাগম হয় সেইখানে বহু কথাবার্ত্তায় কেবল বিষয়ের সংশ্রব হইতে থাকে, বিষয়-সংশ্রব হইতে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়, অবিচ্ছিন্ন ভাবে ভগবচ্ছিত্তন হইতে পারে না। অবিচ্ছিন্ন ভগবচ্ছিত্তন না হইলে মন বিক্ষেপশূন্য ও শুদ্ধ হইতে পারে না। কিন্তু প্রকৃত নির্জন স্থানও পৃথিবীতে খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন; কেহ-না থাকিলে আমার মন তো থাকিবেই। মন যে একাই একশো, সে একাই সমস্ত গুণগোল টানিয়া আনিবে। অতএব মন বাঁচিয়া থাকিতে নির্জন হইবার আশা নাই। বিষয়ের প্রতি মনের আসক্তিই বাবতীয় কোলাহলের হেতু; সেই মন যদি আসক্তিপূর্ব্বক কোন কিছু শরণ না করে তবেই মন অসদ্ব হইতে পারে, মন অসদ্ব হইলেই জনশূন্য স্থানে বাস ঠিক হয়। যাহার চিত্ত ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিতে থাকিতে অসদ্ব হইয়া গিয়াছে, তাহার আর লোককল্পিত ব্যবহারে মন যাইবে কেন? তিনি কোন লোকের সহিত আসক্তিপূর্ব্বক ব্যবহার করিতে অসমর্থ। ক্রিয়ার পর অবস্থায় তাহার মন আশানের মত শূন্য হইয়া গিয়াছে; সুতরাং তিনি আর তেমন করিয়া লোকব্যবহার করিতে না পারায় লোকেও আর তাহার নিকট ঘেঁসে না। কিন্তু বিক্ষিপ্ত মন লইয়া নির্জন হিমাদ্রিশৃঙ্গে বাস করিলেও বিষয়-সংস্কার বিদূরিত হয় না এবং বিষয়-সংস্পর্শ থাকিলেই কোন না কোন সময় বুদ্ধির বিকলতা ঘটবেই ঘটবে এবং বুদ্ধিজেশ হইলে কল্যাণমার্গ হইতে নিশ্চয়ই বিভ্রষ্ট হইতে হইবে। অবশ্য সাধনার স্থান উপদ্রববর্জিত না হইলে সাধনার ঠিক অহুকুল হয় না বটে, কিন্তু এ সব বাহিরের উপদ্রব অনায়াসে বর্জন করা যায়। কিন্তু সর্কোপেক্ষা বেশী উপদ্রব করে আমার ঘেহেন্দ্রিয় ও মন। তাহাদের সঙ্গত্যাগ সহজে হইবার নহে, এবং উহাদের সঙ্গ থাকিতে নিরুপদ্রব হওয়া অসম্ভব। উহারা থাকিতে চিত্তপ্রসন্নতা একপ্রকার অসম্ভব ব্যাপার। বাহিরের বিবিক্ত স্থানে সাময়িক ভাবে চিত্তের প্রসন্নতা হয়ত হইতে পারে, এইজন্যই সাধনার স্থানটী উপদ্রবরহিত হইয়া বাহাতে সাধনার অহুকুল হয়—এ বিষয়ে লক্ষ্য দিতেই হইবে, কিন্তু শুধু উপদ্রবশূন্য স্থান হইলেও চলিবে না। যাহারা গোলযোগ বাধায় সেই ঘেহেন্দ্রিয়াদি-মনকে নিরস্ত করিতে হইবে। তাহা কিরূপে করিতে হইবে? প্রণায়াম দ্বারা। প্রণায়াম-রূপ পরম তপস্যার দ্বারা শরীর ও ইন্দ্রিয়ের কণ্ঠশূন্যতা অবস্থা আসে।

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ ।

এতজ্ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোহন্যথা ॥ ১১

কর্ণই অজ্ঞানের প্রাণস্থানীয় সূত্রবাহ কৰ্ম্মপ্রযুক্তি ক্রীণ হইলে অজ্ঞানও ক্ষয় প্রাপ্ত হয় । অজ্ঞান ক্রীণ হইলে মনের চাক্ষুশ্য থাকিতে পারে না, মন অচঞ্চল হইলে দেহেপ্রিয়াদিকৃত কৰ্ম্মে জীবাশ্মার অভিমান আসিবে না । অতএব মন দিয়া ক্রিয়া করা আবশ্যক, মন দিয়া ক্রিয়া করিতে করিতে এক প্রকার নেশার মত বোধ হয়, তখন বাহ্য উপদ্রবদি মনকে আর বিষয়ের পানে টানিয়া আনিতে পারে না । সাধক তখন সেই নেশায় ভোর হইয়া আপনাকে ও আপনার বহিঃ বিষয়কে ভুলিয়া যান । এইজন্মই আত্মজ্ঞানলাভে সঙ্গী উদ্যোগ চাই । কূটস্থদর্শনও অধ্যাত্মজ্ঞান বটে, কিন্তু তাহাও চরম জ্ঞান নহে । চরম জ্ঞান ক্রিয়ার পরাবস্থায় উদ্ভিত হয় । তখন দৃশ্য-দর্শন লোপ পায় । ভগবানও বলিয়াছেন—“যদৃষ্টং বিশ্বরূপং মে মায়ামাত্রং তদেব হি, তেন ভ্রাত্তোহসি কোন্তেয় স্ব-স্বরূপং বিচিন্তয়” । ক্রিয়ার পর অবস্থায় এই স্ব-স্বরূপের জ্ঞান হয় । জনসমাগমে অনিচ্ছা ও কোন লোকের বা বস্তুর প্রতি আসক্তি তখন সম্ভবই হয় না । বাহিরের সঙ্গ ত্যাগ তো কঠিন নহে, কিন্তু মনের দ্বারা বিষয়া-লোচনা ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ । বাহিরের দুঃসঙ্গ ত্যাগও তত কঠিন নহে ; কিন্তু পুত্র, কলত্র, বিত্ত, গৃহাদির প্রতি যে অত্যধিক আসক্তি রহিয়াছে তাহার বন্ধনই সর্বাধিক হুঙ্মুত । এইজন্য বাহিরের ও ভিতরের সৰ্ব্ব প্রকার সঙ্গই বর্জন করিতে হইবে । কিন্তু জনসঙ্গ অপ্রয়োজনীয় হইলেও সাধুসঙ্গ সাধনার সময় বিশেষভাবেই প্রয়োজনীয় । সাধুসঙ্গ ব্যতীত সঙ্গাব পরিপুষ্ট হয় না, মনে সাধুতাবের অভাব হইলে অসং কৰ্ম্মে অপ্রযুক্তি আসিবে না ॥ ১০

১. অর্থঃ । অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং (আত্মজ্ঞানে সঙ্গী নিষ্ঠা), তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ (তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দেশ্য বা ফল সম্বন্ধে আলোচনা) এতজ্ জ্ঞানম্ ইতি প্রোক্তম্ (এই সকলকে জ্ঞান বা জ্ঞানের সাধন বলা হয়) । অতঃ (ইহা হইতে) যৎ অন্তথা (যাহা বিপরীত) অজ্ঞানম্ (তাহা অজ্ঞান) ॥ ১১

বিশয় । কিঞ্চ—অধ্যাত্মজ্ঞান । আত্মানং অধিকৃত্য বর্তমানং জ্ঞানং তস্মিন্ নিত্যত্বং নিত্যত্বাৎ । তত্ত্বং পদার্থভূতদ্বিনিষ্ঠত্বং ইত্যর্থঃ । তত্ত্বজ্ঞানস্ত অর্থঃ—প্রয়োজনং মোক্ষঃ, তত্ত্ব দর্শনম্ মোক্ষস্ত সৰ্ব্বোৎকৃষ্টতালোচনমিত্যর্থঃ । এতদ্ অমানিষ্ম অহঙ্কৰ্ম্ম ইত্যাদি বিংশতি সংখ্যকং যদৃষ্টং এতদ্ জ্ঞানমিতি প্রোক্তং জ্ঞানসাধনত্বাৎ । অতোহন্যথা—অন্যবিপরীতঃ মানিষ্যদি যৎ এতৎ অজ্ঞানমিতি প্রোক্তং বশিষ্ঠাদিভিঃ জ্ঞানবিরোধিত্বাৎ । অতঃ সৰ্ব্বথা ত্যাগ্যমিত্যর্থঃ ॥ ১১

বঙ্গাশুবাদ । [আরও বলিতেছেন] আত্মাকে অধিকার (বিষয়) করিয়া বর্তমান যে জ্ঞান সেই অধ্যাত্মজ্ঞানে নিত্যত্বাব অর্থাৎ “তৎ” ও “সং” পদার্থ ভূতের দ্ব্যর্থ নিষ্ঠব অর্থাৎ তাহাতে বিশ্বাস । তত্ত্বজ্ঞানের অর্থ বা প্রয়োজন যে মোক্ষ তাহাই যে সৰ্ব্বোৎকৃষ্ট তাহার তাহাতে বিশ্বাস । তত্ত্বজ্ঞানের অর্থ বা প্রয়োজন যে মোক্ষ তাহাই যে সৰ্ব্বোৎকৃষ্ট তাহার তাহাতে বিশ্বাস । অমানিষ্ম, অহঙ্কৰ্ম্মাদি জ্ঞানের সাধন বলিয়া বশিষ্ঠাদি এই বিংশতি সংখ্যককে

জ্ঞান বলিয়াছেন । ইহার বিপরীত মানিষ্য প্রভৃতি অজ্ঞান, কারণ ঐগুলি জ্ঞানের বিরোধী এইজন্য সৰ্ব্বথা পরিত্যাগ্য ॥ ১১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—আত্মাতেই সৰ্ব্বদা ক্রিয়া করা যাহা গুরু বাক্যের দ্বারায় লভ্য—তত্ত্বজ্ঞানের অর্থ কিনা রূপ কূটস্থের ক্রিয়ার দ্বারায় জ্ঞান দেখা—ইহারই নাম জ্ঞান—ইহা ব্যতীত অন্যদিকে আসক্তি পূর্বক দেখার নাম অজ্ঞান ।—(১০) অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং, (২০) তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্—আত্মজ্ঞান লাভে সঙ্গী উদ্যোগ । আত্মাকে অধিকৃত করিয়া যে জ্ঞান তাহাই অধ্যাত্মজ্ঞান, সেই অধ্যাত্মজ্ঞানই সত্য, আর বাহ্য কিছু সমস্ত মিথ্যা—এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া আত্মজ্ঞানের দ্ব্যর্থ ঐকান্তিক নিষ্ঠা বা চেষ্টাই “অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্ব” । আত্মাকে অধিকৃত করিয়া জ্ঞান এবং দেহকে অধিকৃত করিয়া জ্ঞান—এই দুই প্রকারেরই জ্ঞান হইয়া থাকে । দেহকে অধিকৃত করিয়া যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা নিত্য সত্য নহে । কারণ দেহাদি প্রাকৃত বস্তু হুত্বাং তাহার পঞ্চ মিত্য হইতে পারে না, আত্মবিষয়ক জ্ঞানই পবন সত্য—তাহা অশরিরভূতীয়, উহার অহঙ্করের চেষ্টার নামই আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা । গুরুপদেশ মত সৰ্ব্বদা জ্ঞান আত্মান করিতে করিতে সাধনার ফলরূপ স্থিরতা লাভ হয় । স্থিরত্বের সঙ্গ হইলেই জ্ঞান লাভ হয়, তখন বুঝিতে পারা যায় এতদপেক্ষা অল্প সঙ্গ—এই যৎসামান্য, তখন অল্প বস্তুর দ্ব্যর্থ চিত্ত লালসিত না হইয়া এই আত্মক্রিয়া করিতেই মনের একমাত্র আগ্রহ হয়, উহার নামই আত্মনিষ্ঠা । এইরূপ আত্মনিষ্ঠা হইতেই তত্ত্বজ্ঞানের যাহা বদার্থ স্বরূপ সেই কূটস্থকে দেখিতে পাওয়া যায় । কূটস্থকে যেহিঁলেই বুঝিতে পারিবে সেই কূটস্থই তোমার প্রকৃত “আমি” । আবার এই কূটস্থ যখন “অবগমগুলাকারং ব্যাণ্ডং যেন চরাচরং” রূপে সকলের মধ্যেই রহিয়াছেন দেখিতে পাইবে তখন তুমি ও অল্প ব্যক্তি যে পৃথক সেই পার্থক্য জ্ঞান তিরোহিত হইবে, তখনই তোমার জ্ঞান হইয়াছে বুঝিতে চাইবে । তখনই “তৎ” অর্থাৎ কূটস্থই যে “তুমি” এই জ্ঞান প্রকাশ পাইতে থাকিবে । এই জ্ঞান লাভের দ্ব্যর্থ সৰ্ব্বদা উদ্যোগ করিতে হইবে, তাহা হইলেই বুঝিতে পারা যাইবে তোমার আত্মজ্ঞানে নিষ্ঠা হইয়াছে । জ্ঞানের স্বভাব বস্তুকে প্রকাশ করা এবং অজ্ঞানের স্বভাব বস্তুর স্বরূপকে আচ্ছাদন করা । প্রত্যেক দেহের অভ্যন্তরেই সেই বস্তু রহিয়াছে, কিন্তু দেহাবরণ তাহা জানিতে দেয় না, এই জন্য এই দেহটাই জ্ঞানের অববোধক । যে এই দেহ ব্যতীত আর কিছুই অদৃশ্য করিতে পারে না তাহার জ্ঞানই প্রকৃত অজ্ঞান । দেহের মধ্যে যিনি সেই প্রকৃত আমার “আমি” কূটস্থ জ্যোতিঃকে দর্শন করেন, তাহার দেহাববোধরূপ যে অজ্ঞান তাহা বিনষ্ট হইয়া যায় । অজ্ঞানের স্বভাব বস্তুকে আবরণ করা এবং তাহাকে অল্প কিছু বলিয়া বোধ করাইয়া দেওয়া । চঞ্চল প্রাণের মধ্যেই সেই অবিদ্যার বীজ নিহিত থাকে । প্রাণ চঞ্চল হইয়া স্পন্দিত হইলেই কল্লনার প্রবাহ বা মনের অচ্যুত হয় এবং এই চঞ্চল মনই বিরাট সংসাররূপ কুহক রচনা করে । ক্রিয়ার পর অবস্থায় প্রাণের

(জ্ঞেয় বস্তুই ব্রহ্ম)

জ্ঞেয় যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জাত্বাহমৃতমশ্নুতে ।

অনাদিমৎপরং ব্রহ্ম ন সন্তমাসছুচ্যতে ॥ ১২

স্থিরতার সহিত মন স্থির হইলেই আর এই বিষকৌতুক পরিদৃষ্ট হয় না। স্মৃতবাৎ অজ্ঞানে বাহ্য থাকে জ্ঞানের প্রকাশে তাহা থাকে না বলিয়া ইহাকে মায়া বা অষ্টটনষ্টনপটায়সী শক্তি বলা হয়। এই মায়া এবং মায়ার অতীত যে বস্তু রহিয়াছেন তাহা জানিতে পারার নামই বেদ বা জ্ঞান। ক্রিয়ার পর অবস্থায় এই জ্ঞানার অস্ত হয়, সেই “পরাবস্থার” সাক্ষাৎ না হইলে বেদান্তের জ্ঞান ফুটিয়া উঠে না। আত্মা ব্যতীত অস্ত বস্তুতে ষত দিন আসক্তি থাকিবে ততদিন অজ্ঞান ছুটিবে না। অনাগ্রজ্ঞান তিরোহিত করিবার উপায়ই হইল ক্রিয়া, বাহার এই ক্রিয়াতে নিষ্ঠা নাই, তাহার অন্তত্ব পদ লাভ হইবার নহে ॥ ১১

অময়। যৎ জ্ঞেয়ং (যাহা জ্ঞেয়) তৎ প্রবক্ষ্যামি (তাহা বলিব), যৎ জাত্বা (যাহা জানিয়া) অমৃতম্ অশ্নুতে (অমৃত বা মোক্ষলাভ হয়), তৎ অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম (তাহাই আদিহীন পরব্রহ্ম), তৎ (তাহা) ন সৎ ন অসৎ (সৎও নহে অসৎও নহে), উচ্যতে (বলিয়া উক্ত হয়) ॥ ১২

শ্রীধর। এতি: সাধনৈ: যজ্ জ্ঞেয়ং তদ্বাহ—জ্ঞেয়মিতি বড়্ভি:। যৎ জ্ঞেয়ং তৎ প্রবক্ষ্যামি। শ্রোতু: আদরসিদ্ধয়ে জ্ঞানকল: দর্শয়তি। যদ্বক্ষ্যমাণং জাত্বা অমৃতং—মোক্ষং প্রাপ্নোতি। কিং তৎ? অনাদিমৎ—আদিমৎ ন ভবতি ইতি অনাদিমৎ। পরং—নিরতিশয়ং ব্রহ্ম। অনাদি ইতি এতাবতৈব বহুব্রীহিণা অনাদিমন্তে সিদ্ধেহপি, পুনশ্চতুপ: প্রয়োগ: ছান্দস:। যদ্বা অনাদি ইতি মৎপরং তেতি পদবয়ম্। মম বিজ্ঞা: পরং নির্বিশেষং রূপং ব্রহ্মত্বার্থ:। তদেবাহ। ন সৎ ন চাসৎ উচ্যতে। বিধিযুগেন প্রমাণস্ত বিষয়: সৎ শব্দেন উচ্যতে। নিবেশস্ত বিষয়: তু অসৎ শব্দেন উচ্যতে। ইদং তু তদ্ব্যবসিকলক্ষণম্, অবিসয়বাদিত্বার্থ: ॥ ১২

বঙ্গানুবাদ। [এই সকল সাধনার দ্বারা বাহ্য জ্ঞেয় তাহা ছয়টি স্লোকে বলিতেছেন] —যাহা জ্ঞেয় তাহা বলিতেছি। শ্রোতার আদরসিদ্ধার্থ (শ্রোতার শ্রবণে যত্নাধিক্য হয় অর্থাৎ জ্ঞেয় পদার্থকে জানিবার জন্য অধিকতর উৎসাহ হয় এই নিমিত্ত) জ্ঞান ফল যে কি তাহাই দেখাইতেছেন। যে বক্ষ্যমাণ বিষয় জানিলে অমৃত অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, তাহা কি? তিনি অনাদিমৎ অর্থাৎ আদিমৎ নহেন। তিনি পরং অর্থাৎ নিরতিশয় ব্রহ্ম স্বরূপ। অনাদি পদটোতে (নাই আদি বাহার) বহুব্রীহি সমাস কবিলেই অনাদিমৎ পদের উক্ত যে অর্থ তাহা সিদ্ধ হয়, তবে যে অনাদিমৎ (আদিমৎ যাহা নহে) এই নঞ তৎপুরুষ সমাসসিদ্ধ পদের প্রয়োগ করা হইল তাহা ছান্দস। অথবা অনাদি এবং মৎপর এইরূপ দুইটি পদ। মৎপর শব্দের অর্থ আমি যে বিজ্ঞ, আমার পর অর্থাৎ নির্বিশেষ রূপ ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্ম যে কি তাহাই বলিতেছেন—“ন সৎ ন অসৎ”—সেই ব্রহ্ম সৎও নহেন, অসৎও নহেন। বিধিযুগে যাহা প্রমাণের বিষয় তাহাই “সৎ” শব্দ বাচ্য, এবং যাহা নিবেশের বিষয়

তাহাই “অসৎ” শব্দ বাচ্য। কিন্তু জ্ঞেয় স্বরূপ যে ব্রহ্ম তিনি উভয় হইতে বিলক্ষণ, কারণ ব্রহ্ম অবিসয়। [ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু হয় “সৎ” অর্থাৎ অস্তি বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া আছে, নচেৎ “অসৎ” নাস্তি বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া থাকে; কিন্তু ব্রহ্ম অবাঙমানসগোচর, সেজন্য অস্তি কি নাস্তি এই দুইটি বুদ্ধির কোনটাকেই আশ্রয় করিয়া নাই] ॥ ১২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—জ্ঞেয় অর্থাৎ জানিবার যে বস্তু—কুটস্থ ব্রহ্ম—তাহা ভালরূপে বলিতেছি—যাহা জানিলে আমার পদকে পায়—যাহার আদি নাই অর্থাৎ কোন সময়ে নেশা—ক্রিয়ার পর অবস্থার—স্মরণ হইল তাহা অনুভব হয় না; তখন আমাতে আমি নাই, তিনি পরব্রহ্ম, সকলের পর ঐশ্বর্য নিশ্চিত—তখন সৎ অসৎ দুইই—বর্জিত অর্থাৎ দৃশ্য ও দ্রষ্টা কেইই নাই।—কুটস্থ ব্রহ্মই জ্ঞেয় বস্তু। এই কুটস্থকে জানিতে পারিলেই মৃত্যু অতিক্রম করা যায়। এই দেহটা মরিয়া যায়, কুটস্থের তো আর মৃত্যু নাই, এই কুটস্থকে জানিলেই জন্মমৃত্যুর খেলা শেষ হইয়া অমরত্ব লাভ হয়। কিন্তু জ্ঞেয় বলিলেই মনে হয় জ্ঞাতার যিনি জ্ঞানের বিষয়, তাহা হইলেই জ্ঞেয় পদার্থ সাধারণ বস্তুর মত হইয়া গেল। চক্ষুর জ্ঞেয় যেমন দৃশ্য বস্তু উহা কিন্তু সেকপ জ্ঞেয় নহে। তৈত্তিরীয় প্রকৃতি সেই জ্ঞেয় সম্বন্ধে বলিতেছেন—“বতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ”—অর্থাৎ তিনি বাক্য মনের অতীত; স্মৃতবাৎ ইন্দ্রিয়াদির জ্ঞানের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। তখন আমাতে আমি থাকে না, সে অবস্থায় দৃশ্য ও দ্রষ্টা কিছুই থাকে না। বুদ্ধির অতীত সেই পরমাত্মাকে বুদ্ধিরও জানিবার সামর্থ্য নাই। সেই জ্ঞান বলা হইল তিনি সৎ অসৎ কিছুই নহেন। ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৎ পদার্থ নহেন, তাই বলিয়া তিনি যে নাই তাহাও নহে, তাহার ঋণক বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হয়। পরে বুদ্ধিও যখন থাকে না, তখন বোদ্ধাও থাকে না, কিন্তু তিনি থাকেন, সেই যে থাকি বা অস্তিত্ব মাত্র সত্তাকেই জ্ঞেয় বলা হইয়াছে। বেদ বলিতেছেন—“নাসদাসীন্মোসদাসীতদা: নাসীজ্জ্ঞো নো ব্যোমপরো বহিতি”—(ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল)—সৃষ্টি বিকাশের পূর্বে অসৎ বা শূন্য, সৎ বা ব্যক্ত প্রভৃতি কিছুই ছিল না। যাহা দ্বারা জানা যায় সেই করণ সমূহ ব্রহ্ম চৈতন্যকে প্রকাশ করিতে পারে না। বরং মন ইন্দ্রিয়াদি সহ বুদ্ধি নিরুদ্ধ না হইলে তাহাকে জানা যায় না। অগাধ সিঙ্ঘুর তলদেশে যে অসীম আকাশ বর্তমান তাহা যেমন সলিল রাশির ভিতর হইতে দেখা যায় না, কিন্তু কল্পনা করা যায়, তজপ মনোবুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদিরূপ তরঙ্গ-ভঙ্গের মধ্যে চিরস্থির নিত্য সত্য পরমাত্মাকে অনুভব করা যায় না, কিন্তু অনুমান করা যায়। কিন্তু তবমই ঠিক ধরা যায় যখন বুদ্ধিও থাকে না, অর্থাৎ তখন জাতা, জ্ঞেয়, জ্ঞান এক হইয়া যায়। এ অবস্থায় কিছুই থাকে না, স্মৃতবাৎ সে অবস্থাকে লক্ষ্য করিবে কে? এই অবস্থা হইতে অবতরণ করিলে যখন বুদ্ধি জাগ্রত হয় তখন সেই বুদ্ধির মধ্যে আত্মার কিছু প্রকাশ অনুভব হয়, এই জ্ঞান উহাকে “বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ং” বলা হইয়াছে। ব্রহ্মের এই বুদ্ধিগ্রাহ্য ভাবটিও পরিলক্ষিত হইতে পারে না যদি বুদ্ধি স্থির ও নির্মল না হয়। এইজন্য যাহারা আত্মার পরিচয় পাইতে চাহেন তাহাদের ইন্দ্রিয়-মনোবুদ্ধিকে অসীম স্থিরতার মধ্যে লইয়া বাইতে হইবে। কিন্তু প্রাণের চাক্ষু্য তিরোহিত করিতে না পারিলে উহাদের চাক্ষু্য ধামিবে

সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোহক্ষিশিরোমুখম্ ।

সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩

না। এইজন্য সর্বাঙ্গে প্রাণকে নিরোধ করিতে হইবে। প্রাণ নিরুদ্ধ হইলে তৎসহ মনোবুদ্ধিও নিরুদ্ধ হইবে—সেই নিরুদ্ধকল্পনা স্থিরবুদ্ধির অভ্যন্তরে জ্যেষ্ঠ আত্মাকে বুঝা যাইতে পারে। উহাই কুটম্ব ব্রহ্ম অর্থাৎ বুদ্ধির অভ্যন্তরে স্থিত যে আত্মপ্রতিবিম্ব এই পর্যন্ত জ্ঞানগম্য, পরে বুদ্ধিও বিলীন হইয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে জ্যেষ্ঠ বা জ্ঞাতা বলিয়াও কিছুই থাকে না—উহাই ক্রিয়ার পর অবস্থা শব্দ দ্বারা লক্ষিত। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যেখানে আমিও নাই, আমারও নাই, অথচ যাহা পরম ধ্রু—যাহা না থাকিলে আর কিছুই থাকিতে পারিত না—তাহা নিত্য বর্তমান, কখনও তাহার অভাব হয় না—ইহাকে অমৃত্যু কবিলেই অমর পদ লাভ হয়, চিরদিনের জন্য জন্ম-মরণের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ হয়। যেমন বিশেষ বা সংজ্ঞাকে আশ্রয় করিয়াই বাবতীর বিশেষণ থাকে, তদ্রূপ সেই সদসদ-বিক্ষিত অথচ পরম ধ্রু আত্মাকে আশ্রয় করিয়াই এই ব্যক্তাব্যক্ত জগৎ প্রকটিত হইতেছে। এই ব্যক্তাব্যক্ত বা সদসদ্যাব বর্তমান থাকে ততদিন জ্ঞা-দৃশ্যও থাকে, কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন বিশেষ ভাবই থাকে না, তখন পরমাত্মা কেবল স্বমহিমায় বিরাজমান, তখন দৃশ্যও থাকে না, কেহ তাহার জ্ঞাও থাকে না। দৃশ্য পরার্থ থাকিলে জ্ঞার কল্পনা করা যায়, এবং জ্ঞা থাকিলে কিছু দৃশ্যও আছে মনে করা যাইতে পারে—কিন্তু উহা এরূপ বিচিত্র অবস্থা যে তখন জ্ঞা ও দৃশ্য সমস্তই বিলুপ্ত, কিন্তু তথাপি সেই মহান্ অস্তিত্বের তখনও কোন অভাব হয় না। ইহা যাহারা অমৃত্যু করিয়াছেন তাহারাই জানেন। তাই শ্রুতি বলিলেন—

“অন্তীতোবোপলব্ধব্যস্তব্ধাবেন চোভয়োঃ ।

অন্তীতোবোপলব্ধস্ত তত্ত্বাবঃ প্রসীদতি ॥”

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সোপাধিক ভাবে এবং ইন্দ্রিয়াতীত নিরূপাধিক ভাবে অর্থাৎ বিষয়েন্দ্রিয়াদি বর্তীত চিন্মাত্ররূপে আত্মা সত্যসত্যই রহিয়াছেন ইহা নিশ্চয় উপলব্ধি করা কর্তব্য। আত্মসত্তার এইরূপ উপলব্ধিকারীর বুদ্ধিতে আত্মার নিত্য চৈতন্ত্য ভাব প্রকাশিত হইয়া থাকে ॥ ১২

— — —

অম্বয়। তৎ (তাহা) সর্বতঃ পাণিপাদং (সর্বত্র হস্তপদবিশিষ্ট) সর্বতঃ অক্ষিশিরোমুখং (সর্বত্র চক্ষু, মস্তক ও মুখবিশিষ্ট) সর্বতঃ শ্রুতিমং (সর্বত্র শ্রবণেন্দ্রিয়বিশিষ্ট) [হইয়া] লোকে (লোকমধ্যে) সর্বম্ আবৃত্য (সমস্ত পদার্থ ব্যাপিয়া) তিষ্ঠতি (অবস্থান করিতেছে) ॥ ১৩

শ্রীধর। নযেবং ব্রহ্মণঃ সদসদ্বিলক্ষণে সতি—“সর্বং ধর্মিৎ ব্রহ্ম” “ব্রহ্মৈবেদং সর্বম্” ইত্যাদি শ্রুতিভিঃ বিরুদ্ধোত ইত্যাদ্য—“পরাস্ত শক্তিবিরোধেব শ্রুতে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ”—ইত্যাদি শ্রুতিপ্রসিদ্ধা অচিন্ত্যশক্ত্যা সর্বাশ্রুতাং তস্ত দর্শনম্ আহ—

সর্বতঃ ইতি পঞ্চভিঃ। সর্বতঃ সর্বত্র পাণয়ঃ পাদাস্ত যস্ত তৎ। সর্বতঃ অক্ষীণি শিরাসি মুখানি চ যস্ত তৎ। সর্বতঃ শ্রুতিমং শ্রবণেন্দ্রিয়যুক্তং সৎ লোকে সর্বম্ আবৃত্য ব্যাপ্য তিষ্ঠতি। সর্বপ্রাণিপ্রবৃত্তিভিঃ পাণ্যাদিভিঃ উপাধিভিঃ সর্বব্যবহারাস্পদত্বেন তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ১৩

বঙ্গাশ্রবাদ। [যদি ব্রহ্ম সৎ এবং অসৎ হইতে বিলক্ষণ হইলেন, তাহা হইলে “সর্বং ধর্মিৎ ব্রহ্ম—সমস্ত জগৎই ব্রহ্ম”, “ব্রহ্মৈবেদং সর্বম্—ব্রহ্মই এই সমস্ত জগৎ” ইত্যাদি শ্রুতির সহিত বিরোধ হইত, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন “পরাস্ত শক্তিবিরোধেব শ্রুতে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ”—এই ব্রহ্মের শক্তি বিবিধ প্রকার এবং তাহার স্বাভাবিক জ্ঞান, বল ও ক্রিয়ার কথাও শ্রুতি প্রসিদ্ধ, সুতরাং অচিন্ত্য শক্তি দ্বারা তিনি সর্বাঙ্গক, তাহাই পাঁচটা শ্লোক দ্বারা দেখাইতেছেন]—সর্বত্রই হস্তপদ যাহার তিনি, এবং সর্বত্র চক্ষু মস্তক ও মুখ যাহার এবং সর্বত্রই শ্রবণেন্দ্রিয়যুক্ত হইয়া তিনি সকল লোককে ব্যাপিয়া অবস্থিতি কারিতেছেন, অর্থাৎ সমস্ত প্রাণীর প্রবৃত্তি ও হস্ত-পদাদি উপাধি দ্বারা সকল ব্যবহারের আশ্রয় হইয়া তিনিই বর্তমান রহিয়াছেন ॥ ১৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সেই অবস্থাতেই যেখানে ইচ্ছা হয় যাইতে পারে—সূক্ষ্মশরীরে অষ্টপ্রহর নেশা থাকিতে যাহা ইচ্ছা হয় তাহা মনের দ্বারায় দেখিয়া গ্রহণ করিতে পারে অর্থাৎ চক্ষুর সম্মুখে দেখিতে পায়—অগম্যস্থানে গিয়া দেখিতে পারে—সকল অনুভব করিতে পারে—সকলের স্বাদ গ্রহণ করিতে পারে—কোন প্রবোতে কত অংশ (মিশ্রিত) আছে তাহা বুঝিতে পারে—কারণ তখন সে ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যায়—ব্রহ্ম সকল বস্তুতেই আবৃত অথচ সে একস্থানে বসিয়া থাকে।—ব্রহ্মের স্বরূপ-শক্তি বোধের বিষয় নহে। তাই তাহার তটস্থ শক্তি দ্বারা তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে হয়। তাহা বুঝিতে গিয়া দেখা যায় ব্রহ্মের ক্রিয়াশক্তি অসীম। সেই ক্রিয়াশক্তি বা শক্তির কার্য জড় হইলেও উহার মূলে কিছু চৈতন্ত্য রহিয়াছেন। চৈতন্ত্য না থাকিলে তত্তৎ বস্তুর প্রকাশ অসম্ভব হইত। তাই প্রত্যেক কাৰ্য্যশক্তি এবং কাৰ্য্যশক্তির ক্ষেত্র, পাণি, পাদ প্রভৃতির মূলে তিনিই কারণরূপে অবস্থান করিতেছেন। সর্বপ্রাণীর মধ্যে চক্ষু, কর্ণ, পাণি, পাদাদির ব্যবহার যে সিদ্ধ হইতেছে তাহা ব্রহ্মের অধিষ্ঠান বলিয়াই সম্ভব হয়, কারণ তাহার সত্তায় সত্তাবান হইয়াই মন ইন্দ্রিয়াদি বিষয়ের অনুভব করে। সকল প্রাণীর সব ইন্দ্রিয়ই তাহার অধিষ্ঠান, তাহারাই তাহার শক্তিতে কাজ করে বলিয়া সকলের চক্ষু কর্ণ দ্বারা যেন তাহারই দেহা শুনা কাজ চলিতেছে। মনসমন্বিত অহঙ্কারই কর্তা, ইন্দ্রিয়গুলি তাহার করণ, এই করণগুলি থাকিলে ক্রিয়ার বোধ থাকিবেই; এবং বোধ থাকিলেই অহঙ্কার বশতঃ তত্তৎ বিষয়ে জীবের অভিমান হইবেই; সেইজন্য করণগুলিকে অকরণ করিয়া কেলা ব্যতীত উপায় নাই। এই ক্রিয়ার অভ্যাস দ্বারা করণগুলিকে অকরণ করিয়া কেলা যায়। তখন দৃশ্যপ্রপঞ্চ থাকিলেও আর তাহার বোধ হইবে না। তখনই সব হইতে আত্মা যে পৃথক তাহার বোধ হয়। আবার এই অবস্থা হইতে নামিয়া পড়িলে আবার যে একপ্রকার “অস্তি”র বোধ হয়—সেই অস্তিত্বভাবই সর্বত্র তাহাকে

পাণিপাদনিবোধুঃ দ্বারা ব্যাপ্ত বলিয়া বোধ করাইতেছে। জেয় বস্ত্র জ্ঞান হইতে পৃথক নহে। যখন কিছুই ছিল না তখনও একটি বোধ ছিল, সেই বোধের মধ্যে সৰ্ব বস্ত্র মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছিল, আবার যখন সৰ্ব বস্ত্র বোধ ফিরিয়া আসিল তখনও বোধটাই সৰ্ববস্ত্ররূপে প্রকাশ পাইতে থাকে। যখন ব্রহ্ম কেবল জ্ঞান মাত্র তখন ক্রিয়াশক্তির প্রকাশ ও সঙ্কোচের দ্বারা অহুভবের পার্থক্য হইলেও উহা প্রকৃত পৃথক বস্ত্র নহে। যখন নানাব্যেব বোধ হয়, তখনও তাহা মন ইন্দ্রিয়ের বিলাস মাত্র, উহা নূতন কোন বস্ত্র নহে।

এই “তৎ” বস্ত্রটা যে সৰ্বত্র পাণিপাদ বস্ত্র, সৰ্বত্র চক্ষুরূপ বিশিষ্ট তাহা আরও সূক্ষ্মভাবে বুঝা যায় যোগাভ্যাসের দ্বারা যে শক্তির বিকাশ হয় তাহা হইতে। ব্রহ্ম সকলের মধ্যে রহিয়াছেন, স্থান ও কাল দ্বারা তাহা বাধিত হয় না, তাই যোগী যখন স্থিরপদ লাভ করিয়া ব্রহ্মভাবে ভাবিত হন, তখন কেবল মন বা সঙ্কল্পের দ্বারাই সকল বস্ত্রের আধান প্রদান হইয়া থাকে। যাহা তিনি ভাবিতেছেন তাহাই তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে দেখিতে পাইয়া থাকেন; মনে উদয় হইবামাত্রই বহুদূরবর্তী স্থানেও উপস্থিত হইতে পারেন বা তথাকার সমস্ত বিষয় প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। সহস্র সহস্র ক্রোশের ব্যবধান থাকিলেও তত্ত্ব স্থানে কে কি বলিতেছে ইচ্ছা করিলে শুনিতে পান, কোন্ দ্রব্যের মধ্যে কি কি গুণ রহিয়াছে তাহা ইচ্ছা করিলেই জানিতে পারেন; ব্রহ্ম দ্বারা সকল বস্তুর আবৃত, তিনি ব্রহ্মভাবাপন্ন হইয়া তাই একস্থানে বসিয়াই ব্রহ্মাণ্ডের সব সংবাহ গ্রহণ করিতে পারেন। তাঁহার নিকট এ স্থান বা অস্ত্র স্থান নাই, সকল স্থানই তাঁহার নিকট একস্থানে। কিন্তু যখন নানাব্যেব জ্ঞান হয় তখনও তাহা পরমাত্মারই অধিষ্ঠান ইহা বুঝিতে হইবে। ভাল করিয়া ক্রিয়া করিতে পারিলে ক্রিয়ার দ্বারা যে ধারণা হয় এবং ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্ত যোগী ধৈর্য্যে সংসার করেন বা যে ভাবে তিনি সংসারকে দেখেন তাহা ধারণা করিতে পারিলেই ভগবানের সৰ্বত্র বিস্তারিত কথ্য বুঝিতে পারা কঠিন হইবে না। ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকাই উপবাসরূপ-ব্রত। উপ অর্থাৎ সমীপে বাস, পরমাত্মার সান্নিধ্য লাভের অস্ত্র যে বিভ্রা সাধিত হয় তাহাই ক্রিয়া, কারণ ক্রিয়া করিলেই ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তখন ব্রহ্মের সমীপে বা তাঁহার সহিত এক হইয়া অবস্থান করা যায়। তখন খাস-প্রখাসের ক্রিয়া বাহিরে অহুভব করা যায় না, তখন উহা এত সূক্ষ্মভাবে ভিতরে ভিতরে চলে যে মনে হয় না চলিতেছে, কিন্তু খাসে মন দিলেই চলিতেছে দেখা যায়, যদি না চলিত তবে জীবন থাকিত না। ক্রিয়া দ্বারা উক্ত প্রকার যে স্থিতি হয় তাহাই যোগধারণা। লোহ যেমন চূষক পাথরের নিকটে আসিলেই লৌহের গায়ে সংলগ্ন হয়, তদ্রূপ ক্রিয়ার দ্বারা ক্রিয়ার পর অবস্থাতে আত্মা পরমাত্মাতে সংলগ্ন হইয়া যায় এবং তাহাতেই আটকাইয়া থাকে। প্রথম প্রথম এ অবস্থায় আর অস্ত্র কোন কৰ্ম করিতে পারা যায় না, কিন্তু পরে আটকাইয়া থাকিলেও যোগী সৰ্বকৰ্ম করিতে পারেন। এইজন্য প্রত্যহ এবং সৰ্বদা ক্রিয়া করা কৰ্ত্তব্য, নচেৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা লাভ হয় না এবং আত্মা (মন প্রাণ) কেমন করিয়া যে পরমাত্মাতে আটকাইয়া থাকে (অবস্থার রূপ) তাহা বুঝা যায় না। ক্রিয়া করিবার সময় মন চঞ্চল থাকে, কিন্তু পরাবস্থায় কোন সঙ্কল্প থাকে না, সুতরাং মনও থাকে না,

তখন এক প্রকার নেশার মত অবস্থা হয়। এই নেশাতে থাকার নামই ভক্তি, শ্রদ্ধা, ধ্যান বা যোগ। ইহারই নাম “উপবাস”, কারণ তখন পরমাত্মার সান্নিধ্য লাভ হয় এবং তখন খাস-প্রখাস ও তৎসহ মন আটকাইয়া থাকে বলিয়া কোন বাহ্য বস্ত্রের গ্রহণ হয় না। এই অবস্থায় সাধকের অসাধারণ জ্ঞান উৎপন্ন হয় যাহা হইতে সমস্ত হইয়াছে, তাহাতেই মন লীন হইয়া থাকে, তখনই ব্রহ্ম যে এক অদ্বিতীয় তাহার অহুভব হয়। উহা সদা একরস, কারণ নানাত্ব নাই, আনন্দধন স্বপ্রকাশ, তিনিই সৰ্বতোমুখ মহাদেব মহেশ্বর। রস শব্দের অর্থ স্বাদ, যখন একরস তখন অস্ত্র কোন স্বাদ নাই, কেবল একের অহুভব, ইহাই অব্যক্ত রস, কারণ সে রসের পরিবর্তন নাই, কিন্তু তাহা নিত্য নূতনের দ্বারা উপভোগ্য। ক্রিয়ার পর অবস্থার গাঢ় নেশাতে যে অপাধ্য গভীর আনন্দ হয়, তাই সে অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে যাইতে মনের ইচ্ছাই থাকে না। ইহাই স্বপ্রকাশ রূপ, নিজেই নিজের প্রকাশ, অস্ত্র কিছু তাহার তুলনা নাই। তখন সব ব্রহ্মতে সংলীন থাকে, তাই পৃথক অভিন্নান রূপ যে “আমি” সে “আমি”ও সেখানে থাকে না। এই অবস্থায় নিজের পৃথক সত্তার বোধ না থাকায় তখন আমি সৰ্বব্যাপক হইয়া যায়। তাহা হইলেই সৰ্বত্র মুখ্যত্ব হইল অর্থাৎ একস্থানে বসিয়াই সব শব্দের শ্রবণ, সব দৃশ্যের দর্শন, ভ্রাণ, স্বাদ ও স্পর্শ বোধ করিতে লাগিল। চেষ্টা করিয়া এ অবস্থাকে আনা যায় না, উহা আপনি আপনি হয়। তখন যোগী যে স্থানে বসিয়া আছেন তাঁহার সম্মুখে একজন লোক আসিল তাহাকে দেখিয়াই তাহার চরিত্রের বিষয় জানিতে পারিলেন, কেহ হয়ত বিপদে পড়িয়া তাঁহাকে ভক্তি পূর্বক ডাকিতেছে তাহা শুনিতে পাইলেন; কেহ ধ্যানমগ্ন হইয়া কোথায় বসিয়া আছে তাহা দেখিতে পাইলেন; কেহ অগ্গম বা পুষ্কর দ্বারা ভক্তি পূর্বক পূজা করিতেছে তাহার ভ্রাণ নাসিকায় পাইয়া থাকেন, কেহ কোন দ্রব্য ভক্তি পূর্বক দ্বিতোছে তাহার স্বাদ ক্রিয়ায় অহুভব করেন।

বায়ুস্থিরের নামই প্রাণস্থির হওয়া। বায়ুস্থির হইয়া সৰ্বগত হয়, তখন যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে সাধক স্পর্শ করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ স্পর্শ করিয়া আছে তাহা বোধ হইবে না। ব্রহ্মও সৰ্ব বস্ত্রকে স্পর্শ করিয়া সৰ্বত্র বিবাহমান কিন্তু ব্রহ্মস্পর্শ কেহ ধারণা করিতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞান বাঁহার হয়, তিনিও ব্রহ্মরূপ হইয়া যান। তখন ব্রহ্মের সূক্ষ্ম অণু সকল বস্ত্রতে প্রবেশ করতঃ সৰ্বব্যাপক মহাদেব হইয়া যান। মহৎ আকাশের মধ্যে ব্রহ্মের অণু প্রবেশ করিলেই মহেশ্ব অর্থাৎ তখন তিনি সকলের কৰ্ত্তা হন। তিনি তখন যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই হইতে পারেন, কিন্তু তাহার কিছুই ইচ্ছা থাকে না। তখন ব্রহ্ম ব্যতীত অস্ত্র কিছু নাই, নিজেও নাই, সুতরাং কেই বা ইচ্ছা করিবে এবং কোন্ বস্ত্রই বা ইচ্ছা করিবে?

এই “একমেবাদ্বিতীয়ং” ভাব বিরূপে হয়? “তদ্বিকোঃ পরমং পদং সদা পশুন্তি শ্রবঃ দ্বিবীৰ চক্ষুরাততম্”—সেই বিষ্ণুর পরমপদ অর্থাৎ কূটস্থ, বাঁহারা সূর্য (অর্থাৎ বাঁহারা সৰ্বদা ক্রিয়া করেন) তাঁহারা সৰ্বদা দেখিতে পান। আকাশের মত এক চক্ষু যাহা বোম্বুজার প্রকাশ হয় তাহা ঐ সূর্যের সৰ্বদা দেখিতে পান। সেই চক্ষুর অণুর মধ্যে

ত্রিলোক। সেই তিন লোকের মধ্যেই মর্ত্যলোক, এবং সেই মর্ত্যলোকের মধ্যে আমি এবং আমার মধ্যে সমুদয়। সমুদয়ের মধ্যে আমি ও আমার মধ্যে সমুদয়, স্তবতঃ সমুদয়ই এক ব্রহ্ম হইয়া গেল।

এইরূপে ব্রহ্ম সৰ্ব্বত্র পাণিপাত ও শিরোমুখ হইয়া এবং সকলকে আবৃত করিয়াও—এক হইয়া আছেন। এই একত্বকে যে জানে সেও ব্রহ্মরূপ হইয়া যায়। “সোহং”—আমি সেই, যে “আমি” সকল “আমির” মধ্যে এক অখণ্ড ভাবে ঘটাকাশ সমূহের মধ্যে এক মহাকাশ রূপে বিরাটমান। দেহাভিমানী জীবের যেরূপ দেহযুক্ত অহং জ্ঞান হয়, উহা কিন্তু সেরূপ নহে।

“দেহভট্ট ভো নইকো আমি দেহের ওপার পরমোয়াম।

সেই ভো আমার আসল ‘আমি’ সেই ভো আমার নিকতন ॥”

সেই “আমি” প্রপঞ্চাভীড়, তথায় মায়ার বৃহৎ সদাকালের ক্ষয় নিবৃত্ত। তাহা হওয়া যায়, কিন্তু বুঝা যায় না। বুদ্ধিতে গেলেই জ্ঞান ও জ্ঞেয় পৃথক পৃথক ভাবে প্রতীত হইতে থাকে। তাহা প্রকৃতই “অবাঙ্‌মানসগোচর”। এই পরম অহং-এর একাংশেই লীলাবশতঃ যখন সহস্র সহস্র অহং তার ফুটিয়া উঠে তখনই তাঁহার নাম হয় “মায়ার”। এই সৰ্ব্ব প্রথম অহং বোধ বা মায়ার হইতেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের বিকাশ হয়। ইহারই অপরা নাম “প্রাণশক্তি”। কঠোপনিষৎ বলিতেছেন “বদ্বিৎ কিঞ্চ অগং সৰ্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্”—এই বৃহত্তম বাহা কিছু অগতিক বস্তু ব্রহ্মসত্তার প্রাণশক্তিতে স্পন্দিত হইয়া উৎপন্ন হইতেছে। এই প্রাণশক্তি বা মহামায়ার যখন ব্রহ্মের মধ্যে বিনিমিত থাকে, তখন তাহার জিয়াশক্তি থাকে না—সেই অটল স্থিতিবাহী ব্রহ্ম বা পরমাত্মা। ব্রহ্মের মধ্যে সেই শক্তি ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিলেই “অহং অন্নি” এই বোধ ফুটিয়া উঠে। কিন্তু তখনও তাহার মধ্যে বিশ্বপ্রপঞ্চ বিকাশের কোন চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না,—তৎপরে চক্ষু হইতে নিজা সরিরা যাইলে যেমন অহং বোধ হয়, সেইরূপ স্থিরতার মধ্যে ঈষৎ চাকল্যের উদয় হইলেই বিশ্বপ্রকাশিকা মহাশক্তির গর্ভভল হইতে বেন অহং বোধ ফুটিয়া উঠে। সেই অহং বোধই হিরণ্যগর্ভ এবং তিনিই বিশ্বের জমিতা ও বিধাতা—“হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততায়ে, বিশ্বতঃ বীজং পতিবৈকরাসীৎ”। কারণ এই অহং যোধের সঙ্গে সঙ্গেই অনন্ত কোটি জীব ও ব্রহ্মাণ্ড ফুটিয়া উঠে। ইহাই “অহং” এর ব্রহ্মাণ্ডরূপে সূর্য বা বৃষ্টি। আবার বৃষ্টি লগ্নোন্মুখ হইলে অনন্তব্রহ্মাণ্ড ঐ অহং মাত্র রূপে পর্যাবসিত হইয়া বাহা বহু ছিল তাহাই আবার এক হইয়া যায়, সেইজন্য বাস্তবিক বহু নাই, এক আত্মসত্তাই রহিয়াছেন। এই “অহং”ই নাম-রূপময় অনন্ত সূর্যের মধ্যবিন্দু, তাই তিনি “অহং হি সৰ্ব্বজ্ঞানাতোভোক্তা চ প্রভুরেব চ”। এই অহংকে জানিলেই আমার শেষ হয় এবং তাহা এক হইয়াও কিরূপে “সৰ্ব্বতঃ পাণিপাতং সৰ্ব্বতোহক্শিরোমুখং” হইয়া আছেন তাহা বুদ্ধিতে পাবা যায় ॥ ১০

সৰ্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সৰ্ব্বেন্দ্রিয়বিবজ্জিতম্।

অসক্তং সৰ্ব্বভূতৈব নিগুণং গুণভোক্তৃ চ ॥ ১৪

অর্থ। [তাহা] সৰ্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসঃ (সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্ষের আভাসযুক্ত), সৰ্ব্বেন্দ্রিয়-বিবজ্জিতং (অথচ সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্জিত) অসক্তং (নিরবয়ব হেতু সকলের সহিত সংযোগ সহজ শূন্য স্তবতঃ অসক্ত) সৰ্ব্বভূতং (তথাপি সকলের আধারভূত) নিগুণং গুণভোক্তৃ চ (এবং যং গুণহীন হইয়াও সর্বাধি গুণের পালক) ॥ ১৪

ত্রীনিয়। কিঞ্চ—সৰ্ব্বেন্দ্রিয়েতি। সৰ্ব্বেন্দ্রিয়াং চক্ষুরাদীনাম্ ইন্দ্রিয়াণাং গুণেষু রূপাভাসকারাত্ম বৃত্তিণু তত্ত্বাকাংক্যেণ ভাসত ইতি তথা। সৰ্ব্বেন্দ্রিয়াণি গুণাংশ্চ তত্ত্ববিষয়ানু আভাসয়তীতি বা। সৰ্ব্বৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ বিবজ্জিতং চ। তথা চ শ্রুতিঃ—‘অপাণিপাদোদ্বনোগ্রহীতা পশুত্যাচক্ষুঃ স শৃণোত্যাকর্ণঃ’ ইত্যাদি। অসক্তং—সঙ্গশূন্যম্। তথাপি সৰ্বং বিতর্জিত ইতি সৰ্ব্বভূতং। সৰ্ব্বাত্ম আধারভূতং। তদেব নিগুণং—সর্বাধিগুণবহিতম্। গুণভোক্তৃ চ—গুণানাং সাদানং ভোক্তৃ—পালকম্ ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন]—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের গুণসমূহে অর্থাৎ তাহাদের ধর্মাদি বৃত্তিতে তত্ত্বরূপাকারে তিনি আভাসমান হন, অথবা সৰ্ব্বেন্দ্রিয় ও তাহাদের গুণ সমূহ যে ইন্দ্রিয়ের বিষয় সমূহ, সেই সকল বিষয় সমূহকে যিনি প্রকাশ করেন অথচ তিনি নাম-ইন্দ্রিয়বর্জিত। শ্রুতিতে আছে—সেই ব্রহ্ম পাদ শূন্য হইলেও গমনশীল, পাণি শূন্য হইলেও গ্রহণ করেন, চক্ষু না থাকিলেও দেখিতে পান, এবং কর্ণহীন হইয়াও শ্রবণ করেন—ইত্যাদি। ব্রহ্ম সঙ্গশূন্য হইলেও সৰ্ব্বভূত অর্থাৎ সকলকে ভরণ করেন, কিনা সকল বস্তুর আধার। তিনি সর্বাধি গুণ বহিত হইয়াও গুণ-ভোক্তা অর্থাৎ সর্বাধিগুণের পালক ॥ ১৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সকল ইন্দ্রিয়ের গুণের প্রকাশস্বরূপ—যেমন চক্ষুর দৃষ্টি, কর্ণের শব্দ, নাসিকার প্রাণ, জিহ্বার স্বাদ, হৃৎচর স্পর্শ, এই সকল গুণেতে তিনি আছেন, ইহাই তাঁহার রূপ ইহার অনুভব বোগীরা এক এক করিয়া অভ্যাস করিয়া গুরুমাক্যের দ্বারা জানিবেন। বাহা দিয়া দেখিলে, শুনিলে, গুঁকিলে, খাইলে, স্পর্শ করিলে তাহা বজ্জিত—বিশেষরূপে অর্থাৎ কিছুতেই আসক্তি পূর্বক দৃষ্টি করিবেন না—তিনি সকলকেই ভরণ পোষণ করিতেছেন অর্থাৎ আপনীর খাওয়া আপনি খাইতেছেন, খাওয়ানও তিনি খানও তিনি—আসক্তি পূর্বক গুণের বজ্জিত অর্থাৎ জিতগতীত অবস্থা বাহা বায়ু স্থির হইলে হয় এবং তিনি সমুদয় গুণের ভোক্তা—ইন্দ্রিয়েরা জানের বারস্বরূপ, নিজে নিজে কোন বস্তুকে বুদ্ধিবার তাহাদের শক্তি নাই। আত্মা দেহমধ্যে আছেন বলিয়াই ইন্দ্রিয়ের বিষয়-জ্ঞান হয়। তাঁহার অবস্থান হেতু জ্ঞানের প্রকাশবার ইন্দ্রিয় সংযুক্ত দেহটাকেই যেন তাঁহার রূপ বলিয়া মনে হয়। তাহার কারণ চেতন পূর্বা নহে কিন্তু চেতন বস্তুর আধার স্বরূপ। এক সর্বব্যাপী জ্ঞানই পৃথক পৃথক ইন্দ্রিয়-দ্বারে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধাদি রূপে অনুভূত হয়। ইন্দ্রিয়েরা এই সকল জ্ঞানকে প্রকটিত

বহিরন্তঃ চ ভূতানামচরং চরমেব চ ।

সূক্ষ্মদ্ব্যন্তদবিজ্ঞেয়ং দূরং চান্তিকে চ তৎ ॥ ১৫

করিতে পারিত না যদি আত্মা না থাকিতেন, তাই আত্মা গুণবজ্জিত হইয়াও গুণময় । আশঙ্কা হইতে পারে যে পরমাত্মা যখন ইন্দ্রিয়-বিবজ্জিত তখন আমাদের কথা, আমাদের প্রার্থনা তিনি শুনিতেন পাইবেন কেমন করিয়া ? এ শঙ্কা কবিবার প্রয়োজন নাই ; তিনি স্বয়ং ইন্দ্রিয়-বিবজ্জিত হইলেও শ্রবণ, দর্শনাদির কোন বাধা ঘটে না । সে যে কি অপূর্ণ শক্তি তাহা বাহির হইতে ধূম্রবার উপায় নাই ; কিছু সাধন দ্বারা বায়ু স্থির হইলে যোগীরা তাঁহার এই অপরূপ অত্যন্ত শক্তির আভাস পান এবং তখনই বুঝিতে পারা যায় তিনি গুণাতীত হইয়াও কিরূপে গুণভোক্তা হইয়া থাকেন । চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ঘ্রাণ ও ত্বকে যে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধের অমৃতত্ব হয় সে সমস্তই আত্মশক্তি হইতে কোন পৃথক শক্তি নহে । কিছুই নাই অথচ সবই রহিয়াছে, এবং এই সর্বের উপর তিনি আধিপত্য করেন বলিয়া তাঁহার নাম “ইন্দ্র” অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ । তিনিই দেবরাজ অর্থাৎ সকল দেবতা তাঁহার মধ্যেই রহিয়াছেন । একমাত্র তিনিই আছেন অথচ তিনিই দেবাদি বহুরূপে প্রকাশিত হইতেছেন ;—যে কুটস্থে সর্বা লক্ষ্য বাধে, অনেকক্ষণ সেই কুটস্থের মধ্যে থাকিতে থাকিতে সকলকেই দেখিতে পায় । “তমসঃ পরস্তাৎ”—প্রথমে মূর্খপুচ্ছের মত চারিদিকে জ্যোতিঃ পূরে তমঃ—মধ্যে ক্রমবর্ণ গোলাকার শূন্যেতে দেখিতে পায়, তাহার পর উত্তম পুরুষ—ঐহাকে সকল শব্দ, যুনি, যোগী ও দেবতারা এক দৃষ্টিতে দেখিতেছেন । যখন কিছু নাই তখন তিনি মহাশূন্য, আবার যখন এই ব্যক্ত জগৎ তখন তিনি জগদ্রাজ্য, তাঁহার ভিতরেই সকল লোক রহিয়াছে, তিনিই ভর্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর ও সর্বব্যাপক । এই কুটস্থ রূপ চক্ষুকে যে দেখিতে না পায় সেই অন্ধ—সে অজ্ঞানে আবৃত হইয়া কেবল “আমার আমার” করিয়া মুগ্ধ হইতেছে । এই মোহ হইতে উদ্ধার হইবার ক্রিয়াই একমাত্র উপায় । ক্রিয়ার দ্বারা এই জগদ্রাজ্যের দর্শন পায়, পরে তাহাতে লীন হইয়া তাঁহাকে স্পর্শ করে, পরে ক্রিয়ার পর অবস্থায় মগ্ন হইয়া অমৃত পান করিয়া অমর পদ বা ব্রহ্মপদ লাভ করার তাহার সর্বত্র ব্রহ্মময় জগৎ হইয়া যায় । এই শরীরের মধ্যে যে কুটস্থ তাহার পর উত্তম পুরুষ—আকাশ পরব্যোম স্বরূপ । তিনি সর্বব্যাপক ত্রিমিত্র আমিও তাঁহারই মধ্যে । যখন আমি নাই, আমি বলিবারও কেহ নাই, তখন সমস্ত এক ব্রহ্ম, সুতরাং তখন আর কিছুই ইচ্ছা নাই । তখন ভোক্তা, ভোজন ও ভোক্তা সবই এক । ইহাই ইড়া পিজলা সুম্মার অতীত অবস্থা । প্রাণায়াম দ্বারা বায়ু স্থির হইলে এই অবস্থায় আপনা আপনিই উদ্ভিত হয় ॥ ১৪

অমর । তৎ (তিনি) ভূতানাং (সর্বভূতের) বহিঃ অন্তঃ চ (বাহিরে ও অভ্যন্তরে), অচরং চরম্ এবং চ (স্থাবর এবং জলময়—তিনি), হৃদম্বাৎ (হৃদয় বলিয়া) অবিজ্ঞেয়ং (জানা যায় না), তৎ (তাহা) দূরং অন্তিকে চ (দূর এবং নিকটস্থ উভয়ই) ॥ ১৫

শ্রীধর । কিং—বহিরিতি । ভূতানাং চরাচরাণাং স্বকর্মাণাং বহিঃ অন্তঃ তদেব—সুবর্ণমিব কটককুণ্ডলাদীনাম্ । জলতরঙ্গাণাম্ অন্তরং হি জলমিব । অচরং—স্থাবরং চরকং—

জলমং চ ভূতজাতং তদেব, কাংগাশ্রকথাং কার্যম্ । এবমপি হৃদম্বাৎ ক্রপাদিহীনম্ভাৎ তৎ অবিজ্ঞেয়ং—ইদং তদ্বিত্তি স্পষ্টজ্ঞানার্থং ন ভবতি । অতএব অবিদ্যায় যোজনলক্ষ্য-বিতমিব দূরম্ভক । সবিচারায়ঃ প্রকৃতেঃ পরম্বাৎ । বিদ্যায় পুনঃ প্রত্যগাত্মায় অন্তিকে চ তৎ নিত্যসন্নিহিতং । তথা চ মন্তঃ—

“তদেতত্তি তদেতত্তি তদেতত্তি তদেতত্তি ।

তদন্তরং সর্বং তদন্তরং সর্বং বাহ্যতঃ ॥”

ইতি । এতত্তি—চলতি, নৈতত্তি—ন চলতি ; তৎ উ অন্তিকে ইতি ছেদঃ ॥ ১৫

বঙ্গানুবাদ । [আরও বলিতেছেন]—কটককুণ্ডলাদি অলঙ্কারের অন্তরে এবং বাহিরে যেরূপ সুবর্ণ, জলতরঙ্গের অন্তরে বাহিরে যেরূপ জল, সেইরূপ তিনি তাঁহারই হৃদ (কার্য) চরাচর ভূতসমূহের অন্তরে এবং বাহিরে অবস্থান করিতেছেন । যেহেতু সমস্ত কার্যই কারণাত্মক, সেইরূপ ব্রহ্ম স্থাবর জগদম অর্থাৎ সমস্ত ভূতজাত । তিনি এইরূপ হইলেও হৃদম্বাৎ হেতু অর্থাৎ রূপাদিবিহীন বলিয়া অবিজ্ঞেয় অর্থাৎ স্পষ্ট জ্ঞানের অযোগ্য হন । অতএব তিনি অবিধানের পক্ষে লক্ষ্যযোজনান্তরিতের ভায় দূরহই, যেহেতু তিনি সবিচার। যে প্রকৃতি তাঁহার পর অর্থাৎ অতীত । যেহেতু বিধানগণের নিকট হইতে প্রত্যগাত্মা, তাই তাঁহার পক্ষে তিনি নিত্য সন্নিহিত । এই সম্বন্ধে দীক্ষাকৃতি মন্তব্যঃ—“তিনি গমন করেন আবার গমন করেন না, তিনি দূরে তিনি নিকটে, তিনি পবিত্রমান সমস্ত জগতের অন্তরস্থিত এবং তাহার বাহিরেও বিদ্যমান” ॥ ১৫

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সবভূতের বাহিরে এবং ভিতরে বাহ্য ক্রিয়াবিত ব্যক্তিরূপ দেখিতেছে—অচর এবং চর—যাহা ব্রহ্মজ্ঞান হইলে নিরাবরণ হইয়া যায়—সুতরাং সকল দেখিতে পায়—বাড়ীর ভিতরে এবং বাহিরে । অত্যন্ত সূক্ষ্ম, ব্রহ্মের অণু সূক্ষ্ম ; ত্রিমিত্তে বিশেষরূপে জানা যায় না—তুমি দূরেও আছ ও ভিতরেও আছ ।—সমস্ত বস্তু বাহ্যেও তিনি, অন্তরেও তিনি । এই বাহ্য অন্তর ভাব হয় দেখেই লইয়া, নচেৎ বাহ্য অন্তর বলিয়া কিছু নাই । কিন্তু বতরূপ দেহেন্দ্রিয়ের জ্ঞান রহিয়াছে, ততরূপ হইটি ভাব থাকিবেই । একটি ব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গম্য, আর একটি অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর । বতরূপ প্রকৃত জ্ঞান না হয় ততরূপ ব্যক্ত ও অব্যক্ত হইটি অবস্থাই থাকে । অব্যক্ত অবস্থা ইন্দ্রিয়গোচর নহে, সেই জন্ত প্রত্যক্ষগোচর হয় না । যখন ক্রিয়ার পর অবস্থায় ভিতর বাহির এক হইয়া যায় তখন বাহ্য ও অভ্যন্তর কিছুই থাকে না । এই ভিতর বাহির ঐহাং এক হয় তিনিই জ্ঞানী বা মূক্ত পুরুষ । জ্ঞানীরও ইন্দ্রিয় থাকে এবং তাহার কার্যও থাকে কিন্তু বিষয় কখনও তাঁহাকে বিমূক্ত করিতে পারে না । তিনি অনন্ত অনৈক্যের মধ্যে এক এককে দেখিতে পান বলিয়া তাঁহার জগৎ বা নানাধ বোধ লোপ পায়, সুতরাং তাঁহার নিকট স্থাবর জগদম বলিয়া কোন বস্তু অস্তিত্ব নাই—একমাত্র ব্রহ্মই বিদ্যমান । সেই ব্রহ্ম বস্তুতে আমার অবিবেকী মনই সংসার করনা করিতেছে, বালক যেমন

অন্ধকারে ভুত কল্পনা করে। মন চঞ্চল হইলেই বহির্দৃষ্টি হইতে থাকে, বহির্দৃষ্টি হইতেই রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রম হয় সেইরূপ ব্রহ্মে সংসার-বোধ হইতে থাকে। রজ্জুতে সর্পবোধ কালীনও রজ্জু রজ্জুই থাকে, তরুণ ব্রহ্মে সংসার-বোধ জাগিলেও ব্রহ্ম ব্রহ্মই থাকেন, কখনও সংসার হইয়া যান না। তবুও এই জগৎপ্রপঞ্চ আমাদের নিত্যবোধের বিষয় হইয়া রহিয়াছে, এই বোধের নিরোধ না হওয়া পর্যন্ত জগদৃষ্টি রুদ্ধ হইবে না। সেইজন্য আমাদের সাধনাত্ম্যে প্রয়াস করিতে হইবে। স্থূল জাগতিক পদার্থগুলিকে আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করি, কিন্তু ব্রহ্ম পদার্থ অত্যন্ত সূক্ষ্ম সুতরাং তাহা এই সকল ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের অতীত। তাহা হইলেও সত্য! মাত্রই তিনি, সুতরাং ভিতর বাহির বলিয়া যাহা প্রতিভাত হইতেছে তাহা ব্রহ্মাত্মবিশিষ্ট কোন বস্তু নহে। ভিতরেও যে প্রকাশ বাহিরেও তাহারই প্রকাশ। অজ্ঞানবশতঃ যে নামরূপময় বাহ্য বস্তু রহিয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে তাহারও দৃষ্টা সেই ব্রহ্মই, তিনি বাহ্য বস্তু অনুভব করিবার ক্ষমতা বাহ্যেই থাকিলেও কল্পনা করিয়াছেন। সেই বাহ্যেইয়ের সমষ্টিই এই জীবশরীর, এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর জ্ঞাতা জীব স্বয়ং। জীবচৈতন্যই সেই ব্রহ্ম, সুতরাং ব্রহ্ম সর্বত্রই, সেইজন্য ভিতর বাহির থাকিতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই এই ভিতর বাহিরের ধার্মা মিটিয়া যায়। যে একটি সূক্ষ্ম কাল্পনিক আবরণ আছে, তাহাও আর তখন থাকে না, সুতরাং যোগী তখন দূরের ও নিকটের সবই দেখিতে পান। নিকটের কথা তো শুনেই, বহু দূরের কথাও তাহার প্রবণগোচর হইয়া থাকে। সমুদ্রে, পিছনে, দূরে, নিকটে, উর্দ্ধে, অধোভাগে সমস্ত বস্তু-নিচয়কে সমভাবেই দেখিতে পান। ব্রহ্মাণু বড় সূক্ষ্ম, মন অত্যন্ত সূক্ষ্ম না হইলে সেই ব্রহ্মাণু মধ্য প্রবেশ করা যায় না। যে ব্রহ্মাণুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে তাহার নিকট দূরও নাই নিকটও নাই, কারণ ব্রহ্ম সর্বব্যাপক। এই অবস্থাকেই বিষ্ণুভাব বলে, বিষ্ণু যেমন সকলের মধ্যে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন, ঐ অবস্থা প্রাপ্ত যোগীও সেইরূপ সকলের মধ্যেই থাকেন।

ক্রিয়ার পরাবস্থায় যে স্থিতি তিনি বিষ্ণুরূপ, তিনিই শূন্য-স্বরূপ কারণ বারি। তিনি মায়ার বশীভূত হইয়া চঞ্চল হন, সেই চঞ্চল ভাব স্থির হইলেই সাধক সচি অর্থাৎ পবিত্র হন। সত্যতাই ব্রহ্মভাব, তাহা নিত্য বিদ্যমান, তখন আমিও থাকে না আমারও থাকে না—সুতরাং জগদ্বাদিরূপে কোন প্রকাশও থাকে না। যখনই চাক্ষুষ তখনই জগৎরূপ বা বহুরূপ প্রকাশিত হয়, এই বহুত্বই মায়িক ভাব বা অসৎ।

ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থা না থাকিলে এই বহুত্বের বিলোপ সাধন হয় না। সুতরাং ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে স্থিতি তাহা হইতেই ব্রহ্ম যে এক ও অবিভীত এই ব্রহ্ম বিবাস উৎপন্ন হয়। তখন চক্রে মত জ্যোৎস্না সর্বা দেখিতে পাওয়া যায়, সর্বদা স্থিতিগত অমূল্য হয়, উহাই বিষ্ণুর পরম পদ। সুস্থায়ী সূক্ষ্ম বাহু সর্বা বহিতে থাকে, প্রত্যাশের মত এক প্রকাশ অনুভব হয়, সেই প্রকাশের সাহায্যে সমস্তই হেবা যায়। ঐহারা ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্ত হন তাহার প্রথমে তৃতীয় নেত্র কূটস্থে থাকিয়া শিবরূপ হইয়া যান, সেই কূটস্থ স্থির হইলেই বিষ্ণুরূপ হয়। ঐহাদের সাধনে প্রথম ও চেষ্টা থাকে, তাহার পর সকলেই এই অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারেন। বাহিরের সামান্য ক্রেশ সহ করিয়া ক্রিয়া করিলেই

অবিভক্ত্য চ ভূতেশু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।

ভূতভর্তৃ চ তজ্জ্যেয়ং প্রসিদ্ধং প্রভবিষ্ণু চ ॥ ১৬

মূলধারে কুলকুলিনী জাগ্রত হন। তখন স্বয়ং কামাদি সমূলে উৎপাটিত হয়। সর্ব প্রকার ইচ্ছা হইতেই তখন যোগী মুক্ত হন।

মনের মনন দ্বারা একমাত্র ব্রহ্মবস্তুর স্বাবর-জগদ্বাদিরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে, মন না থাকিলে কোন বস্তুই থাকে না। এইজন্য মনোনাশের চেষ্টাই সর্বাগ্রে কর্তব্য। ক্রিয়া দ্বারা মন তহুতা ভাব প্রাপ্ত হইলেই কল্পনা ক্ষীণ হইয়া আসে, কল্পনা ক্ষীণ হইলেই মনের সহিত যাবতীয় বস্তুই বিলয় প্রাপ্ত হয়। তখন সমস্ত বস্তুই আত্মার সহিত মিলিয়া এক হইয়া যায় এবং তখন ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়-জ্ঞান না থাকায় আত্মা অবিজ্ঞেয় বলিয়াই অনুমিত হইয়া থাকেন ॥ ১৫

অন্থয়। ভূতেশু (সর্বভূতে) অবিভক্ত্য চ (অবিভক্ত হইয়াও) বিভক্ত্য ইব (যেন ভিন্ন ভিন্ন হইয়া) স্থিত্য (প্রতীত হইতেছেন) [তাহাকে] ভূতভর্তৃ (ভূতসকলের পালনকর্তা), চ প্রসিদ্ধং (প্রাসক্ত) বা সংহর্তা) প্রভবিষ্ণু চ (উৎপাদন কর্তা বলিয়া) তৎ জ্যেয়ং (তাঁহাকে জানিবে) ॥ ১৬

শ্রীধর। কিক—অবিভক্তমিতি। ভূতেশু—স্বাবরজগদ্বাদিরূপে অবিভক্ত—কার্য্যাত্মনা অভিন্ন, কার্য্যাত্মনা বিভক্ত—ভিন্নমিব অবস্থিতং চ। সমুদ্রাং জাতং কেনাদি সমুদ্রাৎ অন্তং ন ভবতি। তৎ পূর্বোক্তং স্বরূপং চ জ্যেয়ং। ভূতানাং ভর্তৃ চ—পোষকং স্থিতিকালে, প্রলয়-কালে প্রসিদ্ধ—প্রসন্নশীলং, সৃষ্টিকালে চ প্রভবিষ্ণু—নানাকার্য্যাত্মনা প্রভবনশীলম্ ॥ ১৬

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন] ভূতসকলে অর্থাৎ স্বাবরজগদ্বাদিরূপে ভূতনিচয়ে অবিভক্ত অর্থাৎ কার্য্যরূপে অভিন্ন, কিন্তু কার্য্যরূপে বিভক্ত অর্থাৎ ভিন্নভাবে অবস্থিত। যেমন সমুদ্র হইতে কেনাদি সমুদ্র হইতে স্থির নহে। [কেনাসমুদ্রের কারণ সমুদ্র, সেই কারণে কোন ভেদ নাই, কিন্তু কেনারূপ কার্য্যে ভিন্ন ভিন্ন রূপে যেরূপে প্রতীয়মান হয় তরুণ—সুতরাং ক্ষেত্রজ ও পরব্রহ্মে ভেদের সম্ভাবনা নাই]। সেই যে পূর্বোক্তরূপ ব্রহ্ম তিনিই জ্যেয়, তিনিই স্থিতিকালে ভূতগণের পোষক, প্রলয়কালে প্রসন্নশীল অর্থাৎ প্রাসক্তারী এবং সৃষ্টিকালে প্রভবিষ্ণু অর্থাৎ নানাকার্য্যরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকেন ॥ ১৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সম বস্তুতে এবং ভূতেতে একই বস্তু ব্রহ্ম রহিয়াছে—আবার পৃথক পৃথকও রহিয়াছে—হইতেছেন তিনি—ভগ্নগণকর্তাও তিনি, লোককর্তাও তিনি, সৃষ্টিকর্তাও তিনি।—ব্রহ্মবস্তুর এক এবং তাহার দ্বিতীয় কিছু না থাকায় তাহা বিভক্ত হইবে কিরূপে? ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যক্ষেত্রে অগ্নি রহিয়াছে তাহা একই বটে, কিন্তু তবুও ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে বেদন অগ্নিকে বিভিন্নরূপে মনে হয়, তরুণ পরমাত্মা বস্তুতঃ এক হইলেও ভিন্ন ভিন্ন যেরূপে বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হন। যদিও পরমাত্মা সর্বত্রই সমভাবে বিদ্যমান কিন্তু পৃথক পৃথক ঘটে ভিন্ন ভিন্ন আকাশবৎ ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্ররূপ ঘটে পরমাত্মাকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে অভিব্যক্ত মনে হইলেও বাস্তবিক তাহা ভিন্ন নহে। পৃথক পৃথক ঘটে আকাশের উপাধি মাত্র। এই জন্ত যতরূপ যেরূপরূপ উপাধি থাকিবে ততরূপ আত্মার উৎপত্তি বিনাশ না থাকিলেও ঘটের উৎপত্তি লয়ের সহিত তাহার উৎপত্তি ও লয় কল্পিত হইয়া থাকে।

প্রকৃত পক্ষে উৎপত্তি, স্থিতি লয়াদি না থাকিলেও এইরূপ কল্পিত উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণ রূপে তিনি কল্পিত হইয়া থাকেন।

সেই পরমাস্থিতিরূপ ব্রহ্মই ক্ষেত্রজ রূপে চঞ্চল হন, তখন তাঁহার উপাধি হয় প্রাণ। ক্ষেত্রজ চঞ্চল প্রাণের আকার ধারণ করিলেই ঘন, মরণ ও স্থিতি এই তিনটি ভাব উৎপন্ন হয়। কিন্তু চাঞ্চল্য ও স্থিরতা একই বস্তুর দুইটি দিক মাত্র। স্থিরতাকে ছাড়িয়া চাঞ্চল্য থাকিতে পারে না, এবং স্থিরতা না থাকিলে চাঞ্চল্য আসিবে কোথা হইতে? ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে স্থিতির অনুভব হয় তাহা অব্যক্ত, কারণ উহা ইন্দ্রিয়ের অগোচর, কিন্তু সেই স্থিতিই ইন্দ্রিয়-গোচর হইয়া চঞ্চল বা ব্যক্ত হন। কিন্তু অব্যক্ত অবস্থার সহিত যোগ ছিন্ন করিয়া ব্যক্তাবস্থা প্রকাশিতই হইতে পারিত না, তাহাতেই বুঝা যাইতেছে চঞ্চল ভাবটীও সেই অচঞ্চল ভাবের সহিত যোগযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। তাই চণ্ডীতে বুদ্ধান হইল যে জ্ঞানময়ী বিভ্রামৃতিও বাঁহার, মোহময়ী অবিজ্ঞা ভাবও তাঁহারই। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে টান ক্রিয়ার পর অবস্থার পর অবস্থাতেও সেই টান, আবার বিক্ষেপযুক্ত সংসারভাবের মধ্যেও সেই টান, সেই বাঁচিয়া থাকার ইচ্ছা, সেই সকল বস্তুকে আপনার করিবার জন্য ঐকান্তিক লালসা—এ সমস্তই সেই একমাত্র স্থিতিগম্বই যে পরম সত্য তাহাই প্রমাণ করিতেছে মাত্র। সেই সত্যের পানে আকর্ষণই জীবের জীবন।

আত্মার অস্তিত্বেই জগৎ ও জীবের অস্তিত্ব। যতদিন আমার “আমিটা” থাকিবে ততদিন এই বিশ্বকে এবং ইহাদের কর্তা ভগবানকেও জানিবার ইচ্ছা-বা সেই দিকে যাইবার ইচ্ছা বর্তমান থাকিবে। কিন্তু এই “আমি” ও “বিশ্বজ্ঞান” লুপ্ত না হইলে নানাধ বাইবে না সুতরাং অজ্ঞানও নষ্ট হইবে না। সুস্থিতি অবস্থায় সমস্ত বিষয়াদি যেমন স্বকারণ অজ্ঞানে বিলীন হয়, তদ্রূপ ক্রিয়ার পর অবস্থাতে “আমি” থাকে না, “বিশ্ব” থাকে না এবং বিশ্বের রচয়িতাও থাকে না—অহং, বিশ্ব ও কর্তা ভগবান সমস্তই এক হইয়া চিন্মাত্র রূপে অবস্থিত হন, বা সমস্তই তখন ব্রহ্মসাগরে নিমজ্জিত হইয়া নিম্ন নিম্ন পৃথক পৃথক করিয়া এক হইয়া যায়। সেই বিশুদ্ধ সংভাবই যে শুদ্ধ চৈতন্য, এক অখণ্ড বৈতবিবজ্জিত দেশকালাতীত বস্তু তখনই তাহা প্রমাণিত হয়। যতদিন বৈতভাব থাকিবে ততদিন অজ্ঞান থাকিবেই, এবং এই অজ্ঞান থাকিতে দৃষ্টপ্রপঞ্চ বিপীণ হইবে না। আত্মা এক অখণ্ড সত্তামাত্র, অবিজ্ঞা বশতঃ উহাতে নানাধ কল্পিত হয়, সুতরাং সেই নানাধ অসং পদার্থ ব্যতীত অস্ত কিছু হইতে পারে না। যদি নানাধ মনের কল্পনা মাত্র তবে দৃষ্ট ভাবও কল্পনা ব্যতীত অস্ত কিছু নহে। এবং দৃষ্টের অভাবে আত্মার স্ট্রীকরণে যে সঙ্কট তাহাও সত্য নহে। সমস্ত অসত্যের নিবারণ হইলে যাহা থাকে তাহাই শুদ্ধ চৈতন্য বা ব্রহ্ম ভাব—যাহা ক্রিয়ার পর অবস্থায় অনুভূত হয়। এই জ্ঞান ত্রিকালে বিদ্যমান। কালের অস্তিত্ব হইতেই জ্ঞেয় বস্তুর নানাধ পরিদৃষ্ট হয়, তখনই বৃন্দন, পালন ও সংহার লীলা চলিতে থাকে। কিন্তু উহা সত্য নহে। ব্রহ্মে সমস্ত খণ্ডকাল কলিত হয় বলিয়াই ব্রহ্মকে মহাকাল বা মহাকালী বলা হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে সেই ব্রহ্মরূপে কালের কল্পনা নাই, কারণ তথায় ঘটনা নাই, ঘটনার পারস্পর্য্য নাই বলিয়া কাল-বলিয়া কিছু থাকে না।

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বশ্চাধিষ্ঠিতম্ ॥ ১৭

ব্রহ্ম এক অবিভীত হইলেও যখন তাহা চঞ্চল হইয়া দৃষ্টপ্রপঞ্চ ব্যক্ত করে তখন তাহাতে সাত প্রকারের ভঙ্গী থাকে। (১) স্থির, (২) চঞ্চল, (৩) স্থিরে স্থিতি, (৪) চঞ্চলে স্থিতি, (৫) আছে, (৬) অথচ নাই, (৭) যাহা আছে তাহা অব্যক্ত। ব্রহ্মের এই সাত অবস্থা। ক্রিয়ার পর অবস্থায় সমস্ত বস্তু এক হইয়া ব্রহ্ম হইয়া যায়—উহাই স্থির ভাব উহাই পরব্যোম। কূটস্থের মধ্যে এবং বাহ্য জগতে যে নানাধ ও বহুরূপ দেখা যায় তাহা সমস্তই ঐ পরব্যোমেরই রূপ—ইহাই চঞ্চল ভাব বা সৃষ্টি। এই স্থিরেতেও স্থিতি রহিয়াছে, চঞ্চলেও স্থিতি রহিয়াছে নচেৎ চঞ্চল অবস্থা প্রকাশই হইতে পারিত না। আছে অথচ নাই—অর্থাৎ যাহা ব্যক্ত বা চঞ্চল ভাব তাহার পৃথক ভাবে অস্তিত্ব নাই, ঐ স্থিরতাকে ধরিয়াই তাহাকে অস্তিত্ববান বলিয়া মনে হয়। যাহা প্রকৃত “অস্তি”র বিপর্য্য তাহা চিন্মাত্র, এই ব্যক্ত মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদির গোচর নহে।

এইরূপে নানাভাবে ব্রহ্ম কখনও কত কি উৎপন্ন করিতেছেন, কখনও পালন করিতেছেন, আবার কখনও বা গ্রাস করিতেছেন। ইহা বলিবার ভঙ্গীমাত্র। যোগবান্ধিষ্ঠে আছে—যত দিন আপনাতে আপনি না থাকে, ততদিন মৃত্যুরূপে তিনি হমন করেন, পালকরূপে রক্ষা করেন, ভাবকরূপে স্তব করেন, বিপদের বিপদ উদ্ধার করেন এবং ফললাভেচ্ছুকে বাহিত ফল প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ১৬

অন্থয়। তৎ (তাহা) জ্যোতিষামপি জ্যোতিঃ (স্বর্ঘ্যাদি জ্যোতিষ্ক সমূহেরও জ্যোতিঃ) তমসঃ পরং (তমঃ শক্তি বা অবিজ্ঞা ব্রহ্মকারের অতীত বা অসংস্পৃষ্ট) উচ্যতে (বলিয়া কথিত হন), [তিনি] জ্ঞানং, জ্ঞেয়ং (জ্ঞান ও জ্ঞেয়) জ্ঞানগম্যং (অমানিষাদি সাধন লভ্য) সর্ব্বশ্চ (সকলের) হৃদি অধিষ্ঠিতম্ (হৃদয়ে অবস্থিত) ॥ ১৭

শ্রীধর। কিঞ্চ—জ্যোতিষামপি ইতি। জ্যোতিষাং—স্বর্ঘ্যাদীনামপি তৎ জ্যোতিঃ—প্রকাশকং, “যেন স্বর্ঘ্যোপপত্তি তেজসেধঃ”, “ন তত্র স্বর্ঘ্যো ভাতি ন চন্দ্রতারণং নেমা বিদ্যাতো ভাস্তি কৃতোহয়মগ্নিঃ। তমেব ভাস্তমমুভাতি সর্বং তত্র ভাসা সর্বমিহং বিভাতি”—ইত্যাদি শ্রুতেঃ। অতএব তমসোহজ্ঞানাং পরং তেন অসংস্পৃষ্টমুচ্যতে, “আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরম্বাং” ইত্যাদি শ্রুতেঃ। জ্ঞানঞ্চ তদেব বুদ্ধিবর্জ্যে অভিব্যক্তম্। তদেব রূপাভা-কারেণ জ্ঞেয়ং চ জ্ঞানগম্যং চ। অমানিষাদি লক্ষণেন পূর্ব্বোক্ত-জ্ঞানসাধনেন প্রাপ্যমিত্যর্থঃ। জ্ঞানগম্যং বিশিনষ্টি—সর্ব্বশ্চ প্রাণিমাত্রস্ত হৃদি অধিষ্ঠিতম্—বিশেষেণ অপ্রচ্যুত-স্বরূপেণ নিয়ন্তৃত্বাং স্থিতম্। অধিষ্ঠিতমিতি পার্থে অধিষ্ঠায় স্থিতমিত্যর্থঃ ॥ ১৭

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন]—স্বর্ঘ্যাদি জ্যোতিষ্কদিগেরও তিনি জ্যোতি অর্থাৎ প্রকাশক। শ্রুতি প্রমাণ এই—“যে তেজযুক্ত হইয়া স্বর্ঘ্য তাপ দেন”। [পরমাত্মা যে স্বয়ংপ্রকাশ তাহাই বলিতেছেন]—“সেই ব্রহ্মসত্তায় স্বর্ঘ্য প্রকাশিত হয় না, চন্দ্র ও নক্ষত্র-সমূহও তথায় ভাসমান নহেন এবং বিদ্যায় সমূহও তথায় প্রকাশিত হয় না, এই অগ্নিই বা

সেখানে কোথায়? প্রকাশমান আত্মাকে অবলম্বন করিয়াই অর্থাৎ তাঁহারই প্রকাশে সূর্য্যাদি সমস্ত স্থাবর-জঙ্গমাশ্রক জগৎ দীপ্তি পাইতেছে।” অতএব তিনি তমঃ অজ্ঞান হইতে পর, অর্থাৎ ব্রহ্ম অজ্ঞান দ্বারা অসংস্পৃষ্ট বলিয়া কথিত হন। প্রতিভাতে আছে—তিনি আদিত্যবর্ণ এবং তমের অতীত, তিনিই জ্ঞান অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিতে অভিব্যক্ত তিনিই রূপাধি আকারে জ্যে, এবং তিনিই জ্ঞানগম্য অর্থাৎ অমানিষাদি পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানসাধন দ্বারা প্রাপ্য। জ্ঞানগম্য কিরূপ তাহাই বিশেষরূপে বলিতেছেন—সকল প্রাণিমাত্রের দ্বয়ে বিধিত কিনা বিশেষভাবে স্থিত অর্থাৎ অপ্রচ্যুত নিয়ন্তা ভাবে তিনি স্থিত। “ধিষ্ঠিত” এইরূপ পাঠ হইলে “অধিষ্ঠান পূর্ব্বক আছেন” এইরূপ অর্থ হইবে ॥ ১৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সকল জ্যোতির জ্যোতিঃ অর্থাৎ তাঁহার মত আর জ্যোতিঃ নাই—তাঁহারই পর অন্ধকার, ব্রহ্ম কূটস্থ স্বরূপ; ইহারই নাম জ্ঞান, ইনিই জ্যেষ্ঠ বস্তু—ইহাই জানিলে জানা যায়—সকলের দ্বয়ে স্থির হইয়া আছে।—জ্যেষ্ঠ বস্তু ব্রহ্ম তাহা স্থিররূপ, সেখানে কোনও কল্যাণ নাই, দ্বয়ের মধ্যে সেই স্থির ভাব অমৃতত্ব হয়, এই স্থিরতাকে অমৃতত্ব করিতে পারিলেই আর যাহা কিছু সমস্তই অমৃতভূত হয়। প্রথমে খুব জ্যোতিঃ, তাহার মধ্যে অন্ধকার অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ কূটস্থ। কূটস্থের মধ্যে নক্ষত্র এবং তাহার মধ্যে গুহা আছে, সেই গুহার মধ্যে বুদ্ধি স্থির হইয়া থাকে। দ্বয়ের বায়ুকে স্থির করিতে পারিলেই জীব সেইখানে স্থির হইয়া থাকে। গুরুবাক্যগম্য সাধনা জানিয়া সাধন করিতে পারিলেই পরমাশ্রাকে প্রত্যক্ষ দর্শন হয়। শুভ্র জ্যোতির জ্যোতিঃ তাঁহাকেই আশ্রয়ানীরা আত্মা বলিয়া জানেন। ইনিই জ্যেষ্ঠ, উত্তমরূপে প্রাণায়াম করিলে প্রাণ সুস্থায়ী যায়, সেখানে যাইলে অগ্নির অপেক্ষাও প্রজ্জ্বলিত জ্যোতিঃস্বরূপ কূটস্থ দেখা যায়—এইগুহা উহা জ্ঞানগম্য, ইন্দিই গায়ত্রীহৃদয়রূপা চতুর্থাংশ ব্রহ্ম। এখানে পৌঁছিলে সূর্যবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায় ও শ্বেতদ্বীপনিবাসী উত্তম পুরুষে লীন হওয়া যায়। পরে সূর্য্যাত্মক সূর্য্যবাপক পরমাশ্রা পুরুষকে দেখিতে পাওয়া যায়, এবং উহাকে দেখিতে দেখিতে সাধক তরুণ হইয়া বান। ক্রিয়ার অভ্যাসের দ্বারা ইচ্ছা রহিত হইলেই ব্রহ্মপথ প্রকাশিত হয়। দীপোপনিষদে আছে—

“পুণ্ড্রকর্ষে যম সূর্য্য প্রোক্ষাপত্য

বৃহৎ রশ্মীন্ সমুহ তেজো।

যৎ তে রূপং কল্যাণতমং ততে পশ্যামি

যোহসাবসৌ পুরুষঃ সোহহমস্মি ॥”

পুণ্ড্র (হে জগৎপোষক সূর্য—কারণ প্রাণরূপ সূর্য্য না থাকিলে জগৎ থাকে না), একর্ষে (একাকী গমনশীল—মন আশ্রয় হইলে তাহার বহুযুগী চিন্তা থাকে না—এক আশ্রয়কারী বৃত্তি হইতে থাকে), যম (সংযমকারি—তখন বাহির বৃত্তি সংযত হয়), সূর্য্য (রশ্মীনাং প্রাণানাং রসানাক স্বীকরণং সূর্য্যঃ—শরীর)—প্রাণশক্তি শরীর ইন্দ্রিয়ে থাকিলে বাহু বস্তুর রসগ্রহণ হয় অর্থাৎ বোধ হয়—সাধন প্রভাবে যখন সূর্য্য বিচ্ছুরিত প্রাণশক্তি মস্তকে নীত হয় তখন সূর্য্যস্বরূপ প্রকাশ সাধকের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে), প্রোক্ষাপত্য (প্রোক্ষাপতির অপত্য—

প্রোক্ষাপতি কে? যিনি সূর্য্যের শাসনকর্তা—‘এব সূর্য্যেখর এব সূর্য্যজঃ’—(মাণ্ডুক্য)—সেই সূর্য্য-খর আদি পুরুষ হইতে যিনি উৎপন্ন তিনিই প্রকাশ স্বরূপ তৈজসরূপ দ্বিতীয় পাদ—তিনিই অন্তঃপ্রজ্ঞ তৈজসঃ দ্বিতীয় পাদঃ—তিনিই মনোগ্রাহ বিষয় সমূহের জ্ঞাতা তিনি তেজোময়। তাঁহাকে উদ্ভেদ্য করিয়া বলা হইতেছে—‘বৃহৎ’ অর্থাৎ বান্ রশ্মীন্ বিগময় (শরীর)—অর্থাৎ স্বীয় রশ্মি সমুহ অপনাবিত কর নচেৎ তাঁহার কিরণোদ্ভাসিত বাহু বস্তুতে আশ্রয়বুদ্ধি নষ্ট হইবে না। ‘তেজঃ সমুহ’—তেজকে সঙ্কোচিত কর—কূটস্থের বাহিরে যে তেজঃ বাহা প্রথমেই দেখা যায়—তাহাও ভেদ করিয়া বাইতে হইবে। তাহার পর—‘যৎ তে রূপং কল্যাণতমঃ’—যে রূপ অতিশয় হৃদয়-সুখের মত প্রকাশ অথচ ‘চক্ষুরেকোটিমুশীতলম্’। ‘তে তৎ পশ্যামি’—তোমার প্রসাদে যেন তাহা দেখিতে পাই। কারণ প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণ স্থির হইলে তবে তাঁহার প্রসন্নতা বুঝা যায়—উহাই আত্মার আনন্দময় বা স্নিগ্ধজ্যোতিঃস্বরূপ। ‘যঃ অসৌ পুরুষঃ’—জাগ্রাহি অবস্থার সাক্ষী স্বরূপ যে আদিত্য মণ্ডলস্থ পুরুষ—‘পুরুষাকারত্বাৎ’—পুরুষের মত স্বাভাব্য আকৃতি অর্থাৎ কূটস্থমণ্ডলের মধ্যে পুরুষোত্তম নর-নারায়ণ বপু; ‘সোহহমস্মি’—আমি তাঁহার স্বরূপ অর্থাৎ আমিই তাই।

“স্থিরত্বের পরে কোষে বিরজৎ ব্রহ্ম নিষ্কলং।

তচ্ছূভং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্বৎ বহ্নীমুদ্বিষো বিদ্বঃ ॥”—যুগল

সোনার মত জ্যোতিঃ, তাহার পর ব্রহ্মের রূপ, তিনি নিষ্কল ব্রহ্ম—অর্থাৎ রজঃগুণরহিত—যিনি স্থির হইয়া আছেন, গুরু উপদেশ মত চলিলে যাহা দেখা যায়। “এবোহস্তরাহিত্যে স্থিরত্ব পুরুষো দৃষ্টতে ইত্যাহৈবৈবতং”—এই অন্তরাহিত্য কূটস্থে স্থিরত্ব পুরুষ—চারিদিকে সোনার মত আলো—তাহার মধ্যেই পুরুষ—যাঁহার ভাগরূপে ক্রিয়া করিয়া থাকেন তাঁহার দেখিয়া থাকেন—উহাকেই “অধিষ্টেবত” পুরুষ বলে, সেই পুরুষই সূর্য্যবাপক ব্রহ্ম হইয়া বান। নিষ্কল—বাহিরের বায়ু বাহিরে থাকিবে, চক্ষু ভ্রম মধ্যে থাকিবে, প্রাণ ও অপানকে সমান বায়ুতে অর্থাৎ নাভিদেশে স্থির রাখিতে হইবে। তখন বায়ু নাকের বাহিরে আসিবে না, নাকের মধ্যেই থাকিবে, সমস্ত ইন্দ্রিয়, মন বুদ্ধি সংযত হইয়া প্রশান্ত হইবে, কথা বলিতে ইচ্ছা হইবে না—এই অবস্থাকেই “নিষ্কল” বলে। এই অবস্থা যাঁহাদের হয় তাঁহাদেরই মোক্ষপরায়ণ হুনি বলিয়া গণ্য হন। তখন ব্রহ্মাচার হইতে ব্রহ্মরূপ পর্য্যন্ত হুয়ুয়ায় এক টানের অমৃতত্ব হয় উহাই বিষ্ণুদৈবত বা দ্বিতীয় মাত্রা। যোনিমুদ্রায় অধিকক্ষণ থাকিলে কৃষ্ণবর্ণ কূটস্থের মধ্যে সকল দেবতার সহিত সাক্ষাৎ হয়, পুরুষোত্তমরূপ দর্শন হয়, উনিই নিত্য এবং পুরাণ পুরুষ—উহাই বৈষ্ণবপথ। তখন লিঙ্গমূল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত বায়ু স্থির থাকে। তাঁহার ক্রিয়া দ্বারা যখন সমস্ত জানা যায় তাহাই দীপান বা তৃতীয় পাদ। যিনি ঈশ্বর ও অধিপতি সেই ব্রহ্ম সকল ভূতের মধ্যেই আছেন বলিয়া তখন জানা যায়। যখন ছাইয়ের মত বর্ণ দেখা যায়, এইরূপ নিত্য ধ্যান করিতে করিতে নাভি হইতে মস্তক পর্য্যন্ত বায়ুর টান থাকে, এইরূপ ধ্যানাবস্থার মধ্যে দীপানপথ প্রাপ্তি হইবে। কূটস্থের মধ্যে যে বিষ্ণু, অথবা বাহু বিষ্ণুতে (যাহা চক্ষুর সামনে যেন দেখা যায়) থাকিবে—সেই অনিচ্ছার

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ধেয়সমাসতঃ ।

মন্তুস্তে এতদ্বিজ্ঞায় মন্তাব্যোপপত্ততে ॥ ১৮

ইচ্ছা—যাহা বোধগম্য—তাঁহারই মহিমা—তাহা দ্বারাই সমস্ত জানিতে পারিবে। আর যে অর্জনাত্মা যাহাকে চতুর্ভুজ মাত্রাও বলে—তখন হৃদয়ে ত্রৈলোক্য স্থিতি অমূল্য হয়, যেখানে সমস্ত দেবতার তেজোময় রূপ দেখা যায়, আকাশে শুদ্ধ ক্ষতিকেব জায় বর্ণ দেখা যায়, তাহাই ধ্যান করিতে হয়। গগন-মণ্ডলে সেই ধ্যান নিত্য করিতে করিতে সহস্রাবল পদ্ব নামক নিধি প্রাপ্ত হয়। এতদ্বারা সর্বব্যাপী আশ্চর্য স্বরূপ বোধ হয় তাহার পর আর কিছুই নাই। এই শ্লোকে ব্রহ্ম-জ্ঞানের পর পর অবস্থা বর্ণিত হইল ॥ ১৭

অর্থঃ । ইতি (এই প্রকারে) ক্ষেত্রং (ক্ষেত্র) তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ (জ্ঞান এবং জ্ঞেয়) সমাসতঃ (সংক্ষেপে) উক্তং (কথিত হইল), মন্তুস্তে (আমার ভজনশীল) এতৎ বিজ্ঞায় (ইহা জানিয়া) মন্তু ভাবায় উপপত্ততে (আমার ভাব প্রাপ্তির যোগ্য হন) ॥ ১৮

শ্রীধর । উক্তং ক্ষেত্রাদিকম্ অধিকারিকলসহিতং উপসংহরতি—ইতীতি । ইত্যেবং ক্ষেত্রং মহাত্মত্বাদি ধৃত্যন্তম্ । তথা জ্ঞানঞ্চ অমানিষাদি তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনাত্মকং । জ্ঞেয়ং অনাদিমং পরং ব্রহ্মেত্যাদি বিস্তৃতং ইত্যন্তং । বশিষ্ঠাদিভিঃ বিস্তরেণোক্তং সৰ্বমপি মন্তা সংক্ষেপেণ উক্তম্ । এতচ্চ পূর্বাধ্যায়োক্ত লক্ষণো মন্তুস্তে বিজ্ঞায় মন্তু ভাবায়—ব্রহ্মদ্বার উপপত্ততে—যোগ্যেয়া ভবতি ॥ ১৮

বঙ্গানুবাদ । [অধিকারী এবং কলের সহিত উক্ত ক্ষেত্রাদির উপসংহার করিতেছেন]— এইরূপে—মহাত্মত্বাদি হইতে ধৃতি পর্যন্ত ক্ষেত্র, অমানিষাদি তত্ত্বজ্ঞানার্থ-দর্শন পর্যন্ত জ্ঞান, ও জ্ঞানাদিমং পরং ব্রহ্ম হইতে বিস্তৃত পর্যন্ত জ্ঞেয় সংক্ষেপে বলা হইল, যাহা বশিষ্ঠাদি কর্তৃক বিস্তৃতভাবে কথিত হইয়াছে। ইহাই পূর্বাধ্যায়-কথিত লক্ষণাধিত ভক্ত এই সমস্ত অবগত হইয়া আনার ভাব অর্থাৎ ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির যোগ্য হন ॥ ১৮

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এই শরীরই এবং জানিবার বস্তু সমুদয় বলিলাম। আমার যে ভক্ত অর্থাৎ গুরুবাক্যে বিশ্বাস রাখার আছে ইহা জেনে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থেকে আটকিয়া থাকে।—পরব্রহ্ম অবিজ্ঞাত বস্তু, উহা জানেন্মিয়েব বিষয় না হইলেও উহা জ্ঞাতব্য। কিন্তু উহা জানিতে হইলে সাধন করিতে হইবে, শাস্ত্রালোচনাও করিতে হইবে, কিন্তু সে আলোচনা গুরুবাক্যসূত্রসারী হওয়া আবশ্যক। গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিয়া সাধন করিলে সংসারের উপাধান স্বরূপা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি বা এই দেহকে এবং ক্ষেত্রজ-রূপা পরা প্রকৃতি জীব সৰ্ব্বদে বর্ধাৰ্জ জ্ঞান লাভ হয়। এই জ্ঞানলাভ যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ কিছুই জানিবার উপায় নাই। তাই সাধককে প্রথমেই এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের পরিচয় লাভ করিতে হয়। এই শরীর, এবং শরীরস্থ নাড়ী এবং নাড়ীমধ্যে প্রাণের প্রবাহ যদ্বারা বাহবল ইঞ্জিরদ্বার দ্বারা জ্ঞানের বিষয় হইতেছে—ইহাই ক্ষেত্র, এই ক্ষেত্রের সৰ্বদে জ্ঞান লাভ করিতে হইবে এবং সূর্য্যের কিরণ আসিয়া যেমন জগৎস্থ বস্তুকে প্রকাশিত করিতেছে,

তরুণ এই শরীরের মধ্যে কূটস্থ রহিয়াছেন, সেই কূটস্থ জ্যোতিঃ দ্বারাই এই বিশ্ববস্তু অস্তিত্ব-বান, বলিয়া মনে হইতেছে; তিনিই বিশ্বের প্রাণ, তিনিই ক্ষেত্রজ, তাঁহারও পরিচয় লাভ করিতে হইবে। সাধন ব্যতীত এই প্রকৃতিদ্বয়ের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। যাহারা সাধক তাঁহারাই এই কূটস্থের মধ্যে উত্তম-পুরুষ রহিয়াছেন অমূল্যব করিতে পাবেন এবং তিনিই যে আমার “আমি” বা আমার স্বার্থ স্বরূপ সেই জ্ঞানলাভ করিয়া থাকেন। তিনিই পুরুষ, তিনিই ব্রহ্ম এবং তিনিই জগন্ময় পরিব্যাপ্ত, ইহা জানিয়াই সাধকের সর্বাঙ্গক ব্রহ্ম-ভাবে উপলব্ধি হয়। কিন্তু ক্রিয়া না করিলে কিছু জ্ঞান যায় না। সেই ক্রিয়া করিবার আশার হইল এই শরীর। শরীরের মধ্যে ৭২০০০ নাড়ী রহিয়াছে, সেই সকল নাড়ীর অভ্যন্তরে প্রাণ প্রবাহিত হইয়া এই জগৎভাবে সৃষ্টি করিতেছে এবং এই জগৎসীলা অমূল্যব করাইতেছে। এই অমূল্যব যতদিন থাকিবে ততদিন ব্রহ্মের ঘোর রূপ বা সংসার দর্শনের বিরাম হইবে না। তাই এই প্রাণক্রিয়াকে রুদ্ধ করিতে হইবে, উহার গতিকে বিপরীতগামী করিতে হইবে। প্রাণায়ামাদি যোগাভ্যাসই হইল তাহার সাধনা। সেই সাধনার কৃতকার্য হইলে সাধকের চক্রব্যূহ ভেদ হইবে, এবং চক্রব্যূহ ভেদ হইলেই পুরুষোত্তমকে দর্শন লাভ করিয়া সাধকের অজ্ঞানময়ী তিমির রজনীর অবসান হয়। সেই পুরুষোত্তমই জ্ঞেয় বস্তু। এই জ্ঞেয় বস্তুটির দর্শন সাধক যখন পান তখন তিনি সম্ভাসর্গদ্বা বটানার হইতেছে শ্রবণ করেন, পরে ক্রিয়ায় পর অবস্থা বা ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ হয়। উহাতে যে আটকাইয়া রহিল সে-ই অমূল্য পদ লাভ করিল। তখন হৃদয়েতে যে একশত নাড়ী রহিয়াছে তাহারও উর্দ্ধে যে একটি নাড়ী রহিয়াছে, প্রাণ তন্মধ্যে প্রবেশ করে। প্রাণ তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেই বিপ সংসারকে ব্রহ্মময় বলিয়া অমূল্যব হইতে থাকে। তখন মনে কোন সন্দেহ থাকে না, যাহা কিছু করে অনিচ্ছার ইচ্ছায় করে, ইচ্ছাপূর্বক কিছু করে না। সর্গদ্বা চক্ষু সূর্য্যকে ভিতরে দেখিতে পায়। সর্গদ্বা আনন্দে থাকে। দূর-দৃষ্টি হয়। তখন কেহ এই সাধকের অনিষ্ট করিতে চাহিলে ভগবান তাহাকে দণ্ড দেন। শরীর ধ্বংসিষ্ট থাকে। আশ্রিতে ভক্তি হওয়ায় কেশ ও লোম উথিত হয়। সর্গদ্বা নেশার মতন মনে হয়, বিষয়ের কোন আকর্ষণ থাকে না। এই যোগী সর্গদ্বাই তৃপ্ত থাকেন; তাঁহার দৃষ্টি সর্গদ্বাই শূন্য এবং দৃষ্টি সর্গদ্বা স্থির। তাহাকেই উন্নয়ী ভাব বলে। ইচ্ছা না করিলেও দূরের জিনিস তাঁহার চোখের সামনে আসে। যে বাক্য বলেন তাহা সিদ্ধ হয়, পৃথিবীর সমস্ত জীবের গুণ বুদ্ধিতে পাবেন।

ক্রিয়া ব্যতীত এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজের জ্ঞান হয় না, এই জন্ত গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিয়া ভক্তির সহিত ক্রিয়া করা আবশ্যক। যদি বলা যায় সাধনার দ্বারাই যখন জ্ঞেয়-বস্তুটিকে বুদ্ধিতে হইবে তখন আর ভক্তির কি প্রয়োজন? ভক্তির প্রয়োজন আছে। গুরুবাক্যে জ্ঞান ও বিশ্বাস সহ যে ভগবৎ সাধনের প্রচেষ্টা তাহার নামই ভক্তি। ভক্তি না থাকিলে সাধনা কি করা যায়? সমস্ত সাধনাই প্রবর্তকের পক্ষে দীরস তৈকে, যখন তাহা ভক্তিরসাপ্ত হয় তখনই তাহা সাধন করা সহজ হয়। এইরূপ ভক্তির সহিত বিনি সাধনাভ্যাস করেন তাঁহার শীঘ্রই মনে একপ্রকার নেশার মত ভাব হয়, এবং এই নেশা

প্রকৃতি পুরুষকে বিজ্ঞানাদী উভাবপি ।

বিকারান্তে গুণান্তে চ বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান ॥ ১৯

হইতেই ক্রিয়ায় পর অবস্থায় উন্নয় হয়। এই দেশের মত ভাবই পর অবস্থা রূপ জ্ঞানের অঙ্গরূপক। এই ভাব হইতেই বাবডীয় বস্তুর প্রতি বৈরাগ্য হয়। “অনন্তত্যাগ বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ বৎ অহৈতুকম্”। বে ক্রিয়া—জ্ঞান, বৈরাগ্য ও তত্ত্ব আনিয়া দিয়া সাধককে কৃতার্থ করে তাহা চিন্তা করিয়া দেখিলেই ক্রিয়া করার কত আবশ্যকতা তাহা হৃদয়ঙ্গম হয় ॥ ১৮

অর্থঃ। প্রকৃতিং পুরুষম্ এষ চ (প্রকৃতি এবং পুরুষ) উভৌ অপি (উভয়কেই) অনাদী বিদ্ধি (অনাদি বলিয়া জানিও), বিকারান্ চ (বিকার সমূহ) গুণান্ চ (এবং গুণ-সমূহকে) প্রকৃতি সম্ভবান্ (প্রকৃতি হইতে সমুদ্ভূত বলিয়া) বিদ্ধি (জানিবে) ॥ ১৯

শ্রীভগ্নঃ। তৎসংক্ষেপং যচ্চ যাদৃচ্ চ” ইতি এতাবৎ প্রপঞ্চিতং। ইদানীং তু “যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ স চ যো যৎ প্রভাবশ্চ” ইত্যেতৎ পূৰ্ণং প্রতিজ্ঞাতমেব প্রকৃতি-পুরুষয়োঃ আহিমম্ তয়োঃপি প্রকৃত্যন্তরং ভাব্যম্ ইতি অনবস্থাপতিঃ শ্রীঃ। অতঃ তৌ উভৌ অনাদী বিদ্ধি। অনাদেঃ দৈবরশ্ম শক্তিবাৎ প্রকৃতেঃ অনাদিষ্ম। পুরুষোঃপি শ্রীমদ্ভগ্নঃ অনাদিবেব। অত্র চ পরমেশ্বরস্ত তচ্ছক্তীনাঞ্চ অনাদিষ্ম শ্রীমদ্ভগ্নঃ ভগবদ্ভক্ত্যন্তঃ প্রকৃতি প্রবন্ধেন উপপাদিতমিতি গ্রন্থবাহুল্যং অস্মাভিঃ ন প্রপঞ্চ্যতে। বিকারান্তে বেহেজিয়াদীন গুণান্তে গুণপরিণামান্ সুখদুঃখমোহাদীন প্রকৃতেঃ সংভূতান্ বিদ্ধি ॥ ১৯

বদ্যভ্যুদায়ঃ। [ইদানীং “তৎসংক্ষেপং যচ্চ যাদৃচ্ চ” এই পর্যন্ত বিস্তৃত ভাবেই বলা হইল, এখন “যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ স চ যো যৎ প্রভাবশ্চ” পূৰ্ণপ্রতিজ্ঞাত বিষয়কেই প্রকৃতিপুরুষের সংসারহেতু কখন দ্বারা পাঁচটা স্তোকে বিশদ ভাবে দেখাইতেছেন]—তাহাতে প্রকৃতি-পুরুষ আহিমং হইলে তদুভয়ের উৎপত্তির অত্র অত্র আর এক প্রকৃতি স্বীকার করিতে হয় এইরূপে অনবস্থা ঘোষ হয়, অতএব উভয়কেই অনাদি বলিয়া জানিবে। অনাদি দৈবের শক্তি বলিয়া প্রকৃতিও অনাদি এবং পুরুষও তাঁহার (দৈবের) অংশ বলিয়া উহা অনাদি বটেই। এই বিষয়ে পরমেশ্বরের ও তাঁহার শক্তি সমূহের অনাদি ভগবান ভক্ত্যকার শঙ্করাচার্যের ভাষ্যে বিস্তৃত প্রবন্ধ দ্বারা উপপাদিত হইয়াছে, অতএব গ্রন্থবাহুল্য আশঙ্কায় আমরা উহা বিস্তৃতরূপে বলিলাম না। “বিকার” অর্থাৎ বেহেজিয়াদি এবং “গুণ” অর্থাৎ গুণপরিণাম সুখদুঃখমোহাদি প্রকৃতি হইতে সমুদ্ভূত জানিবে ॥ ১৯

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—শরীর এবং ক্ষেত্রজ পুরুষ অর্থাৎ কূটস্থ এই দুয়েরই আদি নাই—ইড়া, পিজলা, সুমুদ্রা—এই ক্রিয়া দ্বারা—আসক্তি পূর্বক অস্ত্রদিকে দৃষ্টি করিয়া হইয়া থাকে—বাহ্য পঞ্চভূত শরীরে থাকায় হয়।—প্রকৃতি ও তাহার অধীশ্বর পুরুষ এই দুইটা বস্তুই আছে। প্রকৃতি হইলেন শরীর, আর কূটস্থই পুরুষ। এই কূটস্থ যদি না থাকে শরীর হইতে পারে না। যেমন নদীতে ফেনা বহিয়া যায় তেমনি ব্রহ্ম-রূপ নদীর মধ্যে এই শরীররূপ ফেনা ভাসিতে থাকে। সেইজন্য উভয়ই অনাদি। ক্ষেত্রজা অপরা প্রকৃতিই দৈবের মায়াশক্তি। এই মায়াশক্তি সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—ত্রিগুণরূপ। ইড়া,

পিজলা, সুমুদ্রাই এই ত্রিগুণের খেলিবার স্থান। স্থির প্রাণই শুদ্ধস্বরূপ, তাহা স্পন্দিত হইয়া বধন ইড়া, পিজলা, সুমুদ্রার মধ্যে আসিয়া খেলা করে তখনই তাহা মন ইন্দ্রিয়রূপে অগদ্যাপার সম্পন্ন করে। কিন্তু স্থিরভাবেই দৈবভাবে, উহা অজ্ঞাতদীন, স্তবধাঃ দৈবের ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজরূপ। দুইই প্রকৃতিও অনাদি হইবেই। এই প্রকৃতিই বিকৃত হইয়া পঞ্চভূত ও তৎসহ একাংশ ইন্দ্রিয় এই বোড়শ বিকার উৎপন্ন করে। তাহা হইলে মূলে হইল এক জ্ঞান। একে প্রকৃতি হইতেছে—সর্বদোষ বিবর্জিত আত্মা কিরূপে সর্বদোষ যুক্ত শরীর হইতে পাবেম? যেমন বহু নির্মল আকাশ বায়ু হইয়া ধূম হয়, তাহা হইতে অল অর্থাৎ ছোট মেঘ, পরে মেঘ হইতে বর্ষা হয়, বর্ষা হইতে শস্তাদি এবং শস্তাদি হইতে বেতঃ হয়, তাহাই আবার সর্বভূতমিচর। আত্মা ব্রহ্মজ্ঞানময় মন দ্বারা ক্রিয়ায় পর অবস্থা হইতেছে। আকাশ বায়ু-রূপে যেমন পরিণত হয় তদ্রূপ আত্মাই চঞ্চল হইয়া মন হয়, ব্রহ্মরূপ আকাশ হইতে মন বিক্ষিপ্ত হইয়া অল্পের মত স্থান হইতে বিচ্যুত হয়, আবার সেই চঞ্চল মন বাসনাময় হইয়া স্থলভূতাদি-রূপে পরিণত হয়, এইরূপে শুদ্ধ বা স্থির ভাব হইতে নামিয়া ধীরে ধীরে মন এই বিধিরূপ পরিণাম লাভ করে। এইরূপে শুদ্ধমন হইতে ক্রমে ক্রমে এই বিশ্বের উৎপত্তি হইয়া থাকে। মনই আগন্তিকশতঃ কামনা করিয়া কাম্য বস্তু সকলকে সৃষ্টি করে, আবার এই মন কামনা রহিত হইলে ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মপ্রাপ্ত হয়। পূৰ্ণভগ্নরূপ কলাহুসন্ধান হেতু কৰ্ম্ম এবং কৰ্ম্মের ফলভোগ নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ জন্মমুখ্য হইয়া থাকে। যিনি সাধনাভ্যাস দ্বারা ইচ্ছারহিত হইয়া যান তাঁহার দ্বারে স্থিতি লাভ হয়, তখনই তিনি জন্মমুখ্যের অতীত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যান। জীবের যতদিন এই মোক্ষলাভ না হয়, ততদিন তাঁহার গমনাগমন থাকে, এবং বর্ণা-ধর্মরূপ কৰ্ম্ম হইতে জীবের গৃহ বা স্তম্ভশরীর উৎপন্ন হয়, এবং সেই স্তম্ভশরীরই স্থলশরীর রূপে প্রকটিত হয়। আত্মা নিত্য, সদা একরূপ, তাঁহার কোনরূপ বিকৃতি হইতে পারে না, তাই এই দেহ ও অগদ্যাদি বিকারকে জ্ঞানীরা স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ছায় শূন্যমাত্র মনে করেন। আত্মাব্যবস্থায় যেমন স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুসমূহের উদ্দেশ পাওয়া যায় না, তদ্রূপ প্রবুদ্ধ সাধকের নিকট এই জড়দেহ বা দৃঢ় অগদ্যাদির কোন অস্তিত্বই থাকে না। অধ্যাত্মরামায়ণে ব্যাস বলিয়াছেন—“মায়ায়া কল্লিতং বিশ্বং পরমাশ্রয়ি কেবলে। রজ্জৌ ভুজঙ্গবৎ দ্রাস্তা বিচারে নাস্তি কিঞ্চন।” যেমন স্বর্ণে কুণ্ডলরূপ কল্লিত হয়, রজ্জুতে ভুজঙ্গ কল্লিত হয় তদ্রূপ নির্বিকল্প স্থির পরমাশ্রয়তে এই জগৎরূপ কল্লিত হইয়াছে। বিচার দ্বারা এই ভ্রান্তি বিদূরিত হইয়া থাকে। বিচার অর্থাৎ বিগত চরণ। যতক্ষণ মন চঞ্চল, ততক্ষণ তাহার বিষয়াহুসন্ধান থাকিবেই, যখন মনের চরণ বা চলন নষ্ট হয়, তখন আর তাহার বিষয়াহুসন্ধান থাকিতে পারে না; স্তবধাঃ বিষয়াকারে পরিণত হওয়াও থাকে না। সৃষ্টি হয় মন হইতে, মন যতক্ষণ আছে সৃষ্টি-প্রবাহ ততক্ষণ চলিবেই। মন নিরুদ্ধ হইয়া গেলে তৎসহ সৃষ্টিরও নিবোধ হইয়া থাকে। দৈবের সৃষ্টায়ুস্থল শক্তিই তাঁহার প্রকৃতি, উহা ত্রিগুণময়ী, শাস্ত্রে তাঁহাকেই মায়া বলিয়াছেন, গুণ এই মায়াই কার্য বা বিকার। প্রাণ বা বাসের চাকল্য হইতেই এই অগদ্যবাক্য দৃষ্টি উঠে। ক্রিয়ায় পর অবস্থায় চঞ্চল প্রাণ ও তৎসহ মন নিরুদ্ধ হইলেই ত্রিগুণের ক্রিয়া থাকে না। ত্রিগুণের অর্থাৎ ইড়া, পিজলা, সুমুদ্রার অন্তর্গত ক্রিয়া রুদ্ধ হইলে কোন কিছুই উৎপত্তি বা

কার্যাকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরূপ্যতে ।

পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরূপ্যতে ॥ ২০

পরিণাম থাকে না। এই অন্ন এই সকল গুণ বিকারাদি প্রকৃতির পরিণাম অর্থাৎ ইড়া, পিঙ্গলা, সূর্য্যায় প্রাণের প্রবাহ হেতুই হইয়া থাকে। সুতরাং যতদিন মনের আসক্তি থাকিবে ততদিন শরীর এবং শরীর থাকিলেই ক্ষেত্রজ পুরুষ কূটস্থ থাকিবেনই। ক্রিয়ায় পর অবস্থায় যখন আমি-আমার থাকে না তখন ক্ষেত্র বা ক্ষেত্রজ কিছুই থাকে না। এই নিরোধ অবস্থা হইতে অদৃষ্ট বশতঃ যখন কল্পনার তরঙ্গ উদ্ভিত হয়, তখন কার্যসাধন ক্ষেত্রও উদ্ভিত হইয়া থাকে। ঈশ্বরের ঈশ্বর্য্য নিত্যসিদ্ধ বলিয়া তাঁহার প্রকৃতিত্বয় বাহা জগতের কারণ তাহাও অনাদি হইবে ॥ ১৯

অনুয়। কার্য কারণকর্তৃত্বে (কার্য=দেহ, কারণ=ইন্দ্রিয়াদি মন বুদ্ধি ঐ কার্যের কারণ—ইহাদের কর্তৃত্ব বিষয়ে) প্রকৃতিঃ হেতু উচ্যতে (প্রকৃতি হেতু বলিয়া উক্ত হন); পুরুষঃ (পুরুষ) সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে (সুখ দুঃখ সমূহের ভোগ বিষয়ে) হেতুঃ উচ্যতে (হেতু বলিয়া উক্ত হন) ॥ ২০

শ্রীধর। বিকারাণাং প্রকৃতিসত্ত্ববদং দর্শয়ন্ পুরুষস্ত সংসার হেতুত্বং দর্শয়তি—কার্যোতি। কার্যং—শরীরঃ। কারণানি—সুখদুঃখসাধনানি ইন্দ্রিয়ানি। তেষাং কর্তৃত্বে তদ্ব্যাকারপরিণামে প্রকৃতিঃ হেতুরূপ্যতে কপিলাদিভিঃ। পুরুষঃ—জীবঃ তৎকৃতসুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরূপ্যতে। অয়ং ভাবঃ—যতপি অচেতনান্নাঃ প্রকৃতেঃ স্বতঃ কর্তৃত্বং ন সম্ভবতি, তথা পুরুষস্তাপি অবিকারিণো ভোক্তৃত্বং ন সম্ভবতি—তথাপি কর্তৃত্বং নাম ক্রিয়া নির্মুক্তকৃত্বং। তচ্চ অচেতনস্তাপি চেতনাদৃষ্টবশাৎ চৈতন্যাবিধিতত্বাৎ সম্ভবতি। যথা বহুঃ উর্দ্ধজলনং, বায়োঃ তির্ধ্যগ্গমনং, বৎসাদৃষ্টবশাৎ স্তম্ভপরসঃ করণমিত্যাदि। অতঃ পুরুষসন্নিধানাং প্রকৃতেঃ কর্তৃত্বমুচ্যতে। ভোক্তৃত্বঞ্চ সুখদুঃখসংবেদনম্। তচ্চ চেতনমর্থং এবেতি প্রকৃতিসন্নিধানাং পুরুষস্ত ভোক্তৃত্বমুচ্যতে ইতি ॥ ২০

বঙ্গানুবাদ। [বিকার সকল প্রকৃতি সম্মত তাহা দেখাইয়া পুরুষের সংসারহেতুত্ব দেখাইতেছেন]—কার্য=শরীর, এবং কারণ=সুখদুঃখ সাধক ইন্দ্রিয়গণ—তাহাদের কর্তৃত্ব সম্বন্ধে অর্থাৎ তদ্ব্যাকার পরিণাম বিষয়ে প্রকৃতিই কপিলাদির মতে হেতু বলিয়া কথিত হয়। পুরুষ অর্থাৎ জীব, দেহেন্দ্রিয়কৃত সুখদুঃখের ভোক্তৃত্বের হেতু বলিয়া কথিত হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যদিও অচেতন প্রকৃতির স্বতঃ কর্তৃত্ব সম্ভব নহে এবং অবিকারী পুরুষেরও ভোক্তৃত্ব এই যে, যদিও অচেতন প্রকৃতির স্বতঃ কর্তৃত্ব সম্ভব নহে এবং অবিকারী পুরুষেরও ভোক্তৃত্ব সম্ভব হয় না, তথাপি ক্রিয়া সম্পাদন যে কর্তৃত্ব শব্দের অর্থ তাহা চেতন জীবের অদৃষ্ট বশতঃ সম্ভব হয়। যেমন বহির উর্দ্ধজলন, বায়ুর তির্ধ্যগ্গমন, বৎসের অদৃষ্টবশতঃ স্তম্ভপারসের ক্ষরণ, তজ্জপ পুরুষের সারিধ্য হেতু প্রকৃতির কর্তৃত্ব কথিত হইল। ভোক্তৃত্ব শব্দের অর্থ সুখদুঃখের অনুভব। সুখদুঃখ সংবেদন চেতন মর্থং। প্রকৃতির সারিধ্য হেতু পুরুষের ভোক্তৃত্ব সম্পাদিত হয়, এজন্য পুরুষের ভোক্তৃত্ব উক্ত হইল ॥ ২০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—পঞ্চভূত মন বুদ্ধি অহংকার—ইহাতে থাকিলে কর্তব্য কর্ত্তব্যের কারণ লক্ষ্য হয়। সেই কারণ উপলক্ষে কর্ম্ম করায় কর্ত্তব্য অহং ইত্যাকার বোধ হইয়া সকলে বিষয়াসক্ত অর্থাৎ ফলাকাজ্ঞার সহিত কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত। অহংকার যিনি স্থির হইয়া কূটস্থ অল্প এই শরীরে রহিয়াছেন—ইহাকে স্পষ্টরূপে কূটস্থের পর ক্রিয়া ভক্তিপূর্ব্বক করিলে দেখিতে পায়—তিনি সুখ দুঃখ বর্জিত—তাঁহাতে না থাকায় অর্থাৎ আপনাতে আপনি না থাকায় অল্প দিকে আসক্তি পূর্ব্বক দৃষ্টি করায় প্রাপ্তি হওয়াতে সুখা বিবেচনা করে। অপ্রাপ্তিতে দুঃখ, কিন্তু ইহার (সুখ দুঃখের) মূলীভূত কারণ সেই উত্তম-পুরুষই। কারণ তিনি না থাকিলে এ সকল অনুভব কে করে? সুতরাং সুখদুঃখ ভোগের হেতু তিনি।—পঞ্চভূত, মন, বুদ্ধি ও অহংকার এইগুলিকে লইয়াই স্থল, সূক্ষ্ম ও কারণ দেহ বচিত হইয়াছে, এইগুলির নামই প্রকৃতি। প্রকৃতিই চৈতন্তের নীলাপীঠ। প্রকৃতির মধ্য দিয়া চৈতন্ত আপনাকে প্রকাশ করেন বলিয়াই আমরা চৈতন্তের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারি। এই দেহাধিতে জীবের অভিমান ও আসক্তি বশতঃই দেহকৃত শুভাশুভ কর্ম্মে জীব আবদ্ধ হয় এবং শুভাশুভ কর্ম্মজনিত ফল ভোগও করিয়া থাকে। এই আসক্তি বশতঃই সংসারের গতি রোধ হয় না, উহা সমভাবেই চলিতে থাকে, যেমন তাহার কর্ম্মেরও বিরাম নাই, তেমনি তাহার ফলভোগ ক্ষণ-বাতায়াতেরও অন্ত নাই। গুণ বৈষম্য হেতু দেহাভিমানে জীবের শুভাশুভ বিবিধ কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয় এবং সেই প্রবৃত্তি অনুযায়ী কর্ম্ম করিয়া জীব পুনঃ পুনঃ তাহার ফল ভোগে বাধ্য হয়। দেহাসক্তি থাকিতে এই প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির স্রোত রুদ্ধ হইবার নহে, এবং জন্ম, মরণ, মরণের বশবর্তী না হইয়াও থাকিবার উপায় নাই। কিন্তু প্রকৃতির অতোত একটি অপ্রাকৃত ভাব রহিয়াছে যাহা চঞ্চল নহে, জন্মমরণশীল নহে, যাহা চিরন্তন, যাহা নিত্য, সমুদ্র ধ্বংস হইলেও যাহা ধ্বংস হয় না—তিনিই সুখদুঃখ-বর্জিত—চিরস্থির মহেশ্বর—বাহা এই প্রাকৃত দেহের মধ্যে থাকিয়াও দেহাতীত ভাবে নিত্য বর্তমান—তিনিই কূটস্থ সত্য। যে সাধকের চিত্ত কূটস্থে বলীন হইয়া যায় তিনিই পব-মাত্মার এই মহেশ্বর ভাব অনুভব করিতে পারেন। ভক্তিপূর্ব্বক ক্রিয়া করিলেই যে স্থিরতা বা পরাবস্থা প্রকাশিত হয় তাহাই সর্ব্ব সুখদুঃখাতীত মহেশ্বর ভাব। যে ঐ ভাবে ভাবিত হয় তাহার আর অল্প দিকে আসক্তি থাকে না—উহাই আপনাতে আপনি থাকা। যে আপনাতে আপনি না থাকে সে সংসার দৃষ্টিবারা আবদ্ধ হয় এবং তজ্জগৎ কত না সুখ-দুঃখ ভোগ করিতে থাকে। এই সুখ দুঃখ ভোগও সম্ভব হইত না যদি কূটস্থ চৈতন্ত না থাকিতেন। তাই এই কূটস্থ চৈতন্ত পুরুষকেই সুখ-দুঃখাদির ভোক্তৃত্ব বিষয়ে হেতু বলা হইয়া থাকে। প্রকৃতির মধ্যে চেতন পুরুষের অধিষ্ঠান বশতঃই সুখ-দুঃখাদির অনুভব হয়। প্রকৃতির সহিত তাহাঙ্গ্য বশতঃ প্রকৃতির মধ্যে স্থিরিত সুখ-দুঃখাদি পুরুষের জ্ঞানের বিষয় হইয়া তাঁহার ভোগ সম্পাদন করে, নচেৎ অসংলিপ্ত কূটস্থ নির্বিকার পুরুষের আবার ভোগ সম্ভব হয় কিরূপে? অধ্যাস হেতু তাঁহাকে ভোক্তা বলিয়া মনে হয়। যেহেতু ক্ষেত্রজ পুরুষ ক্ষেত্রকে আমার বলিয়া অভিমান করেন, তাই সুখ-দুঃখাদি ক্ষেত্রমর্থ ক্ষেত্রজ পুরুষে আবোপিত হয় মাত্র।

পুরুষঃ প্রকৃতিস্বো হি ভুঙ্ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্ ।

কারণং গুণসঙ্গোহস্ত সদসদ্যোনি-জন্মান্ন ॥ ২১

তপ্ত লৌহখণ্ডকে যেমন অগ্নিময় বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের গুণ পরস্পরের মধ্যে অধ্যারোপিত হয় । পুরুষের প্রকাশশীল স্বভাব হেতু প্রকৃতিকেও প্রকাশশীল বলিয়া বোধ হয় এবং প্রকৃতির অন্তর্গত অহংকার স্মৃতিত হইয়া আত্মার 'আমি কর্তা' 'আমি ভোক্তা' ইত্যাদি ভাবের উদয় হয় । ইহাই নিকরিকার চেতন ক্ষেত্রজ পুরুষের ভোক্তৃত্ব । ইহাই অসংসারী আত্মার সংসার ভাব । ক্ষেত্রজের এই অসংলিপ্ত ভাব কিছুতেই ধারণা করা যায় না বহিঃক্রিয়ার পর অবস্থায় ক্ষেত্রজের স্বরূপ অবগত হওয়া না যায় । সেইজন্যই মন দিয়া ক্রিয়া করিতে হয় । ক্রিয়া মন দিয়া করিলেই ক্রিয়ার পর অবস্থার সাক্ষাৎ হয় । তখন আত্মা ও প্রকৃতির ভেদ এবং উভয়ের সম্বন্ধ কোথায় তাহা বুঝা যায় ॥ ২০

— — —

অন্বয় । হি (যেহেতু) পুরুষঃ (পুরুষ) প্রকৃতিস্বঃ (প্রকৃতিতে অবস্থিত হইয়া) প্রকৃতিজান্ গুণান্ (প্রকৃতিজাত সুখদুঃখাদি গুণসমূহকে) ভুঙ্ক্তে (ভোগ করেন), অস্ত (পুরুষের) গুণসঙ্গঃ (গুণসমূহের সহিত সংযোগই) সদসদ্যোনিজন্মান্ন (সৎ ও অসৎ যোনিসমূহে জন্ম ধারণের) কারণম্ (কারণ হয়) ॥ ২১

তীর্থন । তথাপি অবিকারিণো জন্মবহিতস্ত চ ভোক্তৃষ্ণ কথম্ ? ইতি অত আহ—পুরুষ ইতি । হি যথাং প্রকৃতিস্বঃ তৎকার্যে দেহে তাদাত্ম্যোনি স্থিতঃ পুরুষঃ । অতঃ তজ্জনিতান্ সুখদুঃখাদীন ভুঙ্ক্তে । অস্ত চ পুরুষস্ত সত্যীষু দেবায়িযোনিষু অসত্যীষু তিৰ্য্যগায়িযোনিষু যানি জন্মানি তেষু গুণসঙ্গো—গুণৈঃ শুভাশুভকর্ম্মকারিভিঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ সঙ্গঃ—কারণ মিত্যর্থঃ ॥ ২১

বঙ্গানুবাদ । [অবিকারী ও জন্মবহিত পুরুষের তথাপি ভোক্তৃষ্ণ কিরূপে সম্ভব হয়, তদুত্তরে বলিতেছেন]—যেহেতু পুরুষ প্রকৃতিস্থ হয় অর্থাৎ প্রকৃতির কার্য দেহে তাদাত্ম্য-ভাবে অবস্থান করেন, সেইজন্য প্রকৃতিজাত গুণ অর্থাৎ দেহজনিত সুখ-দুঃখাদি ভোগ করেন । এই পুরুষের কিন্তু সৎ অর্থাৎ দেবায়িযোনিতে, আর অসৎ অর্থাৎ তিৰ্য্যগায়ি পশুপক্ষী যোনিতে যে জন্ম হয়, তাহার কারণ গুণসঙ্গ অর্থাৎ শুভাশুভ কর্ম্মকারী ইন্দ্রিয়গণের সঙ্গই তাহার কারণ ॥ ২১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—পুরুষ উপযুক্ত প্রকৃতিস্থ হ'য়ে প্রকৃতি হইতে জন্মিয়াছে যে গুণত্রয় অর্থাৎ ইড়া, পিঙ্গলা, সূক্ষ্মা তাহার ভোগ ত্রিগুণবশে আকৃষ্ট হইয়া অশ্রুদিকে আসক্তিপূর্বক দৃষ্টি করিয়া ভোগ করিতেছেন । সেই প্রকৃতির গুণই সকলকে যেরূপ কর্ম্ম করাইতেছে ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত, তদ্রূপ সৎ অসৎ যোনিতে ভোগ করিতেছে ।—আত্মাতে না থাকিয়া অস্ত্র দিকে আসক্তিপূর্বক দৃষ্টি করিলে যে ভোগ হয় তাহাই গুণত্রয়ে মনঃসংযোগ হেতু হইয়া থাকে । উহাই পুরুষের প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতিজ গুণ সকলের ভোগ । ইড়া, পিঙ্গলা, সূক্ষ্মা এই ত্রিগুণ বশে আকৃষ্ট হইলেই আত্মার বহির্গত

দৃষ্টি হয় । সেই বহির্গত দৃষ্টি হইতেই আত্মার বিষয়ভোগ হইয়া থাকে । প্রকৃতির গুণ-মোহিত কর্ম্ম হেতুই মনে ফললাভের আশা জাগ্রত হয় এবং সেই ফললাভের প্রতীতি হইতেই সৎ-অসৎ যোনিতে জন্ম হয় । ভোগের বিচিত্রতা হইতেই বিচিত্র যোনি এবং বিচিত্র যোনির অনুরূপ ফলভোগেরও বিচিত্রতা হইয়া থাকে । ঝাঁহার দৃষ্টি কেবল মাত্র কূটস্থে থাকে তাঁহাকে আর যোনির মধ্যে আসিতে হয় না । কূটস্থ সর্বদেবময়, এইজন্য ঝাঁহাদের লক্ষ্য কূটস্থে থাকে, তাঁহাদের অসৎ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না । কূটস্থব্রহ্ম যিনি এই শরীরের মধ্যে ও বাহিরে আধিপত্য করিতেছেন তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ, এইজন্য তাঁহাকে দেবরাজ বলে । কূটস্থের মধ্যেই সকল দেবতার অধিষ্ঠান ; যিনি কূটস্থে থাকিবার অভিলাষ করিয়াছেন তিনি তন্ন্যাস দেবতা সকলকে দেধিতে পান । এই কূটস্থই জগদ্রাধ, সমস্ত সিদ্ধ পুরুষেরা সেই জ্যোতির অন্তর্গত যে তমঃ এবং তাহার পরে যে উত্তম পুরুষ সেই উত্তম পুরুষের পানে একদৃষ্টিতে তাকাইয়া আছেন । তাঁহার ভিতরেই সব, সেইজন্য তিনিই ভর্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর, অর্থাৎ সর্বব্যাপক হইয়া সকলের মধ্যে সব হইয়া রহিয়াছেন । এই কূটস্থরূপ চক্ষু ঝাঁহার নাই অর্থাৎ কূটস্থে ঝাঁহার লক্ষ্য নাই তিনিই অজ্ঞানাক হইয়া আমার আমার করিয়া মুগ্ধ হইয়া থাকেন । এই অজ্ঞান মোহ হইতে পরিভ্রাণ পাইবার একমাত্র উপায় হইল ক্রিয়া । কূটস্থ গায়ত্রী, তাহার মধ্যে ব্যোমস্বরূপ যে মহাদেব তিনিই আত্মা । এই ব্রহ্মপুরী শরীরের মধ্যে যে গ্রন্থিস্বরূপ গহ্বর হৃদয়েতে রহিয়াছে, বায়ু দ্বারা (প্রাণায়াম দ্বারা বায়ু স্থির হইলে) আপনা আপনি কুস্তক হইলে কূটস্থের মধ্যে যে আকাশবৎ দেখা যায়—বাহা পুণ্ডরীক নয়ন-স্বরূপ—তাহার মধ্যে এক মহাকাশ আছে । সেই আকাশই আত্মা, তিনিই ব্রহ্মস্বরূপ গায়ত্রী, তিনিই পরব্যোম, তাহার নামই শিব । ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে আটকাইয়া থাকা তাহা এই আকাশেই আটকাইয়া থাকা । ভোর হইবার সময় যে জ্যোতিঃ দেখা যায় সেইরূপ এক জ্যোতির প্রকাশ হয় । এই জ্যোতিঃ দেখিলে সর্ব অবরণ হইতে মুক্তি হয় । প্রথমে নোনার মত জ্যোতিঃ চারিদিকে দেখা যায়, তন্মধ্যে চক্ষুরূপ সবিভা, সেই সবিভার অন্তর্গত যে দেবতা তিনিই পুরুষোত্তম । পুরুষোত্তম দর্শনের কালেও বৈতরীণ ভাব হয় না । যখন পুরুষোত্তমও ব্রহ্ম হইয়া যান, যখন এক বলিবারও কেহ থাকে না, তখন পুরুষোত্তম পতির পতি পরব্যোমরূপ শিবের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া এক অধিতার হইয়া যান । প্রাণেন্দ্রিয়াদির অবরোধে কূটস্থের যে রূপ দেখা যায় তাহাও ব্রহ্মস্বরূপ, তাহাতে থাকিলেও মন অস্ত্রদিকে যায় না, স্তবরাং প্রকৃতিস্থ হইয়া আত্মাকে পাপপুণ্য সুখদুঃখাদি ভোগ করিতে হয় না । কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় যিনি থাকেন তিনি স্বদাতীত অবস্থা লাভ করেন, তখন 'আমি' থাকে না, স্তবরাং কোন জ্যোতিঃও থাকে না—তখন সবই ব্রহ্মময় হইয়া যায় । সে এমন একটি অবস্থা যেখানে কিছু আছে বা নাই বলা যায় না । ইহাই ত্রিগুণাতীত বা ইড়া, পিঙ্গলা, সূক্ষ্মার অতীত অবস্থা । ইড়া, পিঙ্গলা, সূক্ষ্মা বা গদা, বম্বনা, সরস্বতীর সঙ্গম স্থানই পবিত্র তীর্থ—ঐ মিলনের স্থানই ক্রিয়ার পর অবস্থা, এই স্থানেই ব্রহ্মেতে মনঃপ্রাণবুদ্ধি সমপ্তি হয় । "মমঃস্বং মনোবজ্জিতং"—যখন মনেতেই মন থাকে, উহার মানেই আপনাতে আপনি থাকা

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ ।

পরমাশ্রুতি চাপ্যুক্তো দেহেশ্বস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥২২

—সেই মনই তখন ব্রহ্ম, তদ্যতীত ক্রিয়ার পর অবস্থাতে অত কোন রূপ নাই। ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকাই সত্য প্রতিষ্ঠা। ইহা ছাড়া অস্ত্র যা কিছু সমস্তই মিথ্যা। সাধনা দ্বারা ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না এক হইয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত প্রকৃতির মধ্যে থাকিতে হয়। ষষ্ঠময়ী প্রকৃতির মধ্যে মন থাকিলেই মন কল্পনারাশ্যে বিচরণ করে, তাহাতেই অন্তর্দৃষ্টি অবরুদ্ধ হইয়া যায়, তখন সেই সকল মনঃকল্পিত বস্তুতে আসক্ত হইয়া জীব স্বধঃখময় বিষয় সকল ভোগ করিতে থাকে। তখন ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কৰ্ম করিতে জীব বশতঃই প্রবৃত্ত হয়। জীব যেমন যেমন কৰ্ম করে তদনুরূপ তাহার বিবিধ যোনি লাভ হয়, এবং সেই সকল যোনিতে সদস্য কৰ্মের ফলভোগ হইতে থাকে। ষষ্ঠযুক্ত বস্তুতে তাহা দ্বারা ভাবে অভিমান করিলেই জীবাশ্মাকে স্বধঃখাদি ভোগের জন্য বিবিধ দেহ ধারণ করিতে হয়। প্রকৃতির সহিত এই তাহা দ্বারা ভাব নিবন্ধনই পুরুষ যখন প্রকৃতির সবভাবে অভিমানী হইয়া থাকেন তখন তিনি দেবযোনি লাভ করেন, প্রকৃতির রক্ষাওঁণে অভিমানী হইলে মনুষ্য এবং প্রকৃতির তমোওঁণে অভিমানী হইলে মূঢ়যোনিতে জন্মলাভ হইয়া থাকে। পুরুষ এইরূপ আশ্রয়িত্ব অবস্থায় প্রকৃতির সহিত তাহা দ্বারা সম্বন্ধে যুক্ত হইলেই প্রকৃতির সহিত অভেদভাবে মিলিত হইয়া প্রকৃতিজাত স্বধঃখাদি নিষ্কর মনে করিয়া ভোগ করিয়া থাকেন। ইহাই নিত্যযুক্ত আশ্রয় বদ্ধতাব। এই বদ্ধতাবের খেলা খেলিবার অন্তই যেন প্রাণ ইড়া-পিঙ্গলায় প্রবাহিত হইয়া পৃথক্ হইয়া পড়ে। আবার সাধনাদ্বারা যখন ইড়া-পিঙ্গলার প্রবাহ সুষুম্নায় সংকালিত হয় তখন জীবতাব রুদ্ধ হইয়া দেবতাব প্রকটিত হয়। আবার এই তিন মুখ যখন এক হইয়া যায় তখন জীব সর্বতাব বিনির্গুক্ত হইয়া ভাবাতীত কৈবল্য ভাবে মুক্ত হন। ইহাকেই জীবের মুক্তি বলে। ইহাই পুরুষের সহিত প্রকৃতির-সংযোগ বিচ্ছিন্নতাব। এ সময়ে পুরুষের আর কিছু ভোগ হইতে পারে না। জীবের অন্তঃস্থ বশতঃ একবার এই মিথ্যাভোগ আরম্ভ হইলে ষণ্মসঙ্গ হেতু ঐ ভোগ পুনঃ পুনঃ হইতে থাকে। প্রকৃতির ত্রিগুণময়ীতাব ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্নায় প্রাণের প্রবাহ-বশতঃই হইতে থাকে, এবং তাহারই বশে জীবের বিবিধ শরীরের উৎপত্তি হয়। ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্নায় প্রাণ প্রবাহের সহিত আশ্রয় যে নিমজ্জন তাহার নামই ষণ্মসঙ্গ। এই ষণ্মসঙ্গ হেতুই জীবের শুভাশুভ ফলযোগ। এই ভোক্তৃ-ভ্রম ততদিন যাইবার নহে যতদিন ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্না তিন মুখ এক হইয়া না যায়। এই তিন মুখের পতি পৃথক্ থাকি পর্য্যন্ত অসাধক জীবের বৃত্তি বহির্গুণে স্মৃতি হইতে থাকে এবং বহির্কৃতি স্মরণের সহিত জীবের ভোক্তৃ-জ্ঞান ক্রমশঃই বৃদ্ধিলাভ করে, ক্রমে বাসনা-নদী সমুদ্রের আকার ধারণ করিয়া জীবকে স্বধাধমলিলে ডুবাইয়া দেয় ॥ ২১

অস্ময়। অস্মিন্ দেহে (এই দেহে) পুরুষঃ (আত্মা) পরঃ (বস্তুত্ব অর্থাৎ দেহ হইতে ভিন্ন)। [তাহার কারণ তিনি] উপদ্রষ্টা (সাক্ষীস্বরূপ) অহুমন্তা (সন্নিধিমাতেই অমুগ্রাহক) ভর্তা (ভরণকর্তা)—ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি জড় হইলেও চেতন পুরুষের চেতন সত্তায় চৈতন্য যুক্ত বলিয়া অমুভূত হয়, ইহাই তাহার ভরণ ভোক্তা (স্বধঃখাদি, বুদ্ধিবৃত্তির উপলব্ধি তাহার

অন্তই হইয়া থাকে, এই ভ্রম তাঁহাকে ভোক্তা বলে) মহেশ্বরঃ পরমাশ্রা চ (তিনিই মহেশ্বর ও পরমাশ্রা) ইতি অপি উক্তঃ (ইহাও কথিত হন) ॥ ২২

শ্রীধর। তখনেন প্রকারেণ প্রকৃত্যবিরোধেব পুরুষস্ত সংসারঃ, ন তু স্বরূপতঃ। ইত্যাপ্যয়েন তস্ত স্বরূপমা—উপদ্রষ্টেতি। অস্মিন্ প্রকৃতিকার্য্যে দেহে বর্তমানোহপি পুরুষঃ পনো ভিন্ন এব, ন তদ্বৎপৈঃ যুক্ত্যত ইত্যর্থঃ। তত্র হেতবঃ—স্বাশ্রা উপদ্রষ্টা পৃথক্ ভূত এব সমীপে স্থিতা দ্রষ্টা সাক্ষীত্যর্থঃ। তথা অহুমন্তা—অহুমোহিতোব সন্নিধিমাতেণ অমুগ্রাহকঃ—“সাক্ষী চেতা কেবলো নিগুণঃ” ইত্যাহি ক্রতেঃ। তথা ঐশ্বরেণ রূপেণ ভর্তা বিধায়ক ইতি চোক্তঃ, ভোক্তা পালক ইতি চ। মহাশ্রাস্তো দৈবরশ্চেতি, স ব্রহ্মাধীনামপি পতিয়িতি চ, পরমাশ্রা অন্তর্ধ্যামীতি চোক্তঃ শ্রুত্যা। তথা চ শ্রুতিঃ, “এব সর্বেশ্বর এব ভূতাদিগতিরেষ লোকপালঃ” ইত্যাহি ॥ ২২

বঙ্গানুবাদ। [উক্ত প্রকারে প্রকৃতির অবিরোধ বশতঃই পুরুষের সংসার, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে পুরুষের সংসার নাই—এই আশ্রয়ে পুরুষের স্বরূপ বলিতেছেন]—এই যে প্রকৃত কার্য্য দেহ, তাহাতে বর্তমান থাকিয়াও পুরুষ প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, অর্থাৎ প্রকৃতির ওঁণে যুক্ত নহেন। তাহার কারণ এই যে তিনি উপদ্রষ্টা অর্থাৎ পৃথক্ ভূতই, নিকটে থাকিয়া দর্শক অর্থাৎ সাক্ষী। অহুমন্তার অর্থ সন্নিধিমাতেই অমুগ্রাহক। শ্রুতিতে আছে—“তিনি সাক্ষী, চেতন, উপাবিবজিত ও নিগুণ। তিনি দৈবরূপে ভর্তা অর্থাৎ বিধায়ক, আর তিনি ভোক্তা অর্থাৎ পালক। তিনি মহান দৈব অর্থাৎ ব্রহ্মাদিরও অধিপতি। আর তিনি শ্রুত্যান্ত পরমাশ্রা অর্থাৎ অন্তর্ধ্যামী। এ বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ এই যে “ইনি সকলের দৈব, ইনি ভূতাদিগতি এবং ইনি লোকপাল” ॥ ২২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সেই মহেশ্বর তিনিই গুরু ; যে দেশ লক্ষ্য হয় না তাহাকে গুরুবাক্যের দ্বারা দেখিতে পায়—সেই ব্রহ্মের অণুতে স্থিতি হইলেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড জগদ্বয় ব্রহ্মের স্বরূপকে দেখিতে পায়। তিনিই সকলের ভরণ পোষণ কর্তা অর্থাৎ আপনায় ভরণ পোষণ কর্তা আপনাই—ইহা লোকে জানিয়াও মূর্খের মতন হায় ভগবান! হায় ভগবান! কিরূপে সংসার যাত্রা নির্বাহ করিব এইরূপে বৃথা কালযাপন করিতেছে। লোকে মনে করে যে আমি উপার্জন করিয়া বাইতেছি, কিন্তু স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া বাইতেছে বাহা লোকে দেখিয়াও দেখে না যে মরা ব্যক্তি খায় না—আমাতে তিনি রহিয়াছেন তন্নিমিত্তে তিনিই খাইতেছেন ও যিনি খাইতেছেন তিনিই সর্বজ্ঞেতে সব জিনিষই খাইতেছেন জীব স্বরূপ হইয়া—দৃষ্টান্ত দাঁতেও পোকা; তিনি সব ভূতেতে জীব-রূপে এক ব্রহ্ম-স্বরূপ হইয়া মহেশ্বর, জগদ্বয়, জগদ্বাণ, ব্রহ্মময় সর্বশাস্ত্রে কথিত হইয়াছেন। তাহাতে থাকিলে তিনিই হইয়া যায়—বাহা ক্রিয়ার পর অবস্থায় বোধ হইয়াও কেহ লক্ষ্য করিতে পারে না—তন্নিমিত্তে অব্যক্ত। কেবল ১৭২৮ বার প্রাণায়ামের পর যোগীদিগের ধ্যানগম্য। ইনিই আশ্রয় পর কূটস্থস্বরূপ। এই দেহেতেই কূটস্থের পর এক উত্তম পুরুষ, ক্রিয়া গুরু বাক্যের দ্বারা জানিয়া

দেখিতে পান (এই বেছে)।—যদিও পুরুষ (জীবাত্মা) প্রকৃতির পরিণাম এই বেছেই অবস্থান করিয়া থাকেন, তথাপি তিনি স্বতন্ত্র, প্রকৃতির গুণে তিনি কখনও আবদ্ধ হন না। স্বল্পে এই আত্মা অনসারী হইলেও তাঁহাকে উপদ্রষ্টা বলিয়া মনে হয়, অর্থাৎ তিনি প্রকৃতির সমীপস্থ তাই তাঁহাকে প্রকৃতির কার্যের সাক্ষী বলিয়া মনে হয়। অধ্যাত্মবায়মানে আছে—“আত্মা মাং চেত্তমং শুদ্ধং জীবরূপেণ সংস্থিতম্।” এই আত্মা প্রকৃতির সমীপস্থ বলিয়া প্রকৃতির কার্যের সাক্ষী মাত্র, কিন্তু তিনি কখনই কৰ্তা নহেন।

তিনি অল্পমন্তা—আচার্য শব্দ বলিয়াছেন—“দেহ ও ইন্দ্রিয়সমূহের ব্যাপারসমূহে স্বয়ং কোন প্রকারে ব্যাপ্ত না হইয়াও নিজে যেন অদৃশ্য ভাবে ব্যাপ্ত হইয়াছে বলিয়া আপাততঃ প্রতীত হয়। অথবা নিজ নিজ ব্যাপারে প্রস্তুত দেহ ও ইন্দ্রিয়সমূহকে কোন সময়ে নিবারণ করেন না বলিয়া আত্মাকেই অল্পমন্তা বলা হইতে পারে।”

তিনি ভক্তা—তাঁহার সত্তা ব্যতীত বেহেজিয়াহির সত্তার সুরূপ হইতে পারে না। চৈতন্যময় আত্মার চৈতন্য আভাসেই, এই জড় বেহেজিয়াবর্গ আত্মার ব্যবহারিক ভোগ সিদ্ধ করে—বেহেজিয়াহিকে যে চৈতন্যময় করিয়া তুলেন তাই তিনি ইহাধের ভক্তা।

তিনি ভোক্তা—আত্মা না থাকিলে কোন কিছুই অনুভব হইতে পারে না। সমস্ত বস্তু বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া আত্মার বোধের বিষয় হয়—তিনি বুদ্ধির প্রতিসংবেদী। তাঁহার নিধের কোন ভোগ হয় না, কিন্তু তিনি প্রকৃতিকে আমার বলিয়া অভিমান করেন, সেইজন্য তাঁহাকে প্রকৃতি ভাঁড় বিষয়সমূহের ভোক্তা বলা হয়।

তিনি “মহেশ্বর”—অর্থাৎ মহান ও ঈশ্বর, কারণ তিনি সকলের আত্মারই আত্মা এবং তিনি সর্ব হইতে স্বতন্ত্র সেইজন্য তিনি “মহেশ্বর”।

তিনি পরমাত্মা—এই আত্মা “পর” অর্থাৎ অব্যক্ত হইতে বিলক্ষণ যে উত্তম পুরুষ তাহাই তিনি, সেইজন্য তাঁহাকে “পরমাত্মা” বলা হয়। ইনিই মূলতত্ত্ব, সকল জীবের আশ্রয়। নানা পোষক জলে যেমন চন্দের প্রতিবিম্ব পড়ে, কিন্তু চন্দ্র একমাত্র, তদ্রূপ নানা বেহ মধ্যে যে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য, সেই সমস্ত প্রতিবিম্বের যিনি বিধ স্বরূপ তিনিই পরমাত্মা।

তাঁহাকে মহেশ্বর কেন বলা হয়? “মুলাধার হইতে ব্রহ্মবজ্র পর্যন্ত বায়ু স্থিতি বাহার নাম পূজা। সেই স্থিতিবাহ্যই ক্রিয়ার পর অবস্থা, সেই স্থিতি স্বরূপকেই বিষ্ণু বলে, তিনি সর্ব-ব্যাপক। এমন কোন স্থান নাই যেখানে তিনি নাই, এইজন্য তিনি মহেশ্বর। তিনিই শুক্ল—এই শরীরের রূপ হইতেছে উঁকার। কূটস্থের ইচ্ছা হওয়াতে বিষ্ণু স্বরূপে প্রকৃতিতে প্রবেশ করিলেই প্রাণ বায়ু স্বরূপ মহাবেবের আপনা আপনি আবির্ভাব হয়। সেই শরীরের মধ্যে উঁকার ধ্বনি স্বরূপ নাহ সর্বদা হইতেছে। সেই নাহের পরই বিষ্ণু, সেই বিষ্ণু ভ্রম মধ্যে দৃষ্ট করিলেই দেখা যায়, সেই বিষ্ণু স্থির হইলেই ব্রহ্মপদ প্রকাশ হয়। এই শরীরে ক্রিয়া করিতে করিতে যখন মন অস্তমিক না হইয়া স্থির হয়, তখনই অজান অন্ধকার ভেদ করিয়া স্বপ্রকাশ স্বরূপ আত্মাবায়ম গুরু প্রকাশ হয়। ক্রিয়া করিতে করিতে মেরুধোর পরে মুলাধারে যে শক্তি বহিয়াছে, সেই শক্তি দ্বয়েতে স্থির হইলেই স্থিতিপদ লাভ হয়। এই মুলাধার শক্তিই শরীরকে ধরিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন; শক্তি দ্বয়েতে স্থির হইলেও মূণাল

তত্ত্ব মত দ্বয়েতে গমনাগমন করে, তখনই তাহার নাম হংস, আর যখন ভ্রমধ্যে যায় ও বিষ্ণু দেখিতে পাওয়া যায় তাহারই নাম ‘রূপ’—ইহাই কূটস্থ রূপ, কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে রূপ তাহাই ব্রহ্ম নিবন্ধনের রূপ—উহাই অরূপের রূপ।”

“সোহং সর্বময়ো ভূত্বা পরং ব্রহ্ম বিলোকয়েৎ।

পর্যাপবতবং নাত্যং সর্বমেব নিরাময়ম্॥”

ক্রিয়ার পর অবস্থাতে “আমিই সর্ব” এইরূপ হইলে পরমব্রহ্ম দর্শন হইল, উহাই অব্যক্ত পদ। ইহাই পর্যাপবতব, ইহা ছাড়া আর কিছুই নাই। এই অবস্থার উদয় হইলেই জীব সর্বত্র নিরাময় হয়, অর্থাৎ আর মম অস্তমিক বায় না।

এই ব্রহ্মই সকলের ভরণ পোষণের কৰ্ত্তা। তিনিই জীব, আবার জীবের কর্ত্তরূপে তাহার কল উৎপন্ন করিতেছেন এবং জীবরূপে তাহা ভোগ করিতেছেন। সুতরাং জীব যে ‘আমি করিতেছি’ ‘আমি করিতেছি’ বলিয়া কৰ্ত্তা সাজিয়া বসে তাহা নিতান্তই হান্তাদীপক। কৰ্ত্তা একমাত্র তিনিই। সুতরাং তাবিবার কিছু নাই! বাহাতে স্বরূপাবস্থা লাভ হয় তদ্ব্যবহায়ে প্রাণপন যত করা আবশ্যক। স্বরূপাবস্থা পাইলেই বৃত্তিতে পারা বাইবে জগৎই বা কি, জগৎপাই বা কি? প্রাণ চঞ্চল হইলেই মন বহির্গত হয়, তখনই জগদর্শন হয়, অর্থাৎ সবই যেন চলিয়া যাইতেছে বলিয়া মনে হয়। যখন প্রাণ স্থির হয় তখন আর কিছুই যায় বলিয়া মনে হয় না, সবই স্থির সবই অচল বলিয়া মনে হয়। সচল অবস্থা বাঁহার প্রভাবে অচল হইয়া থাকে তিনিই জগদাধ। ক্রিয়ার অবস্থায় ইহা বোধ করা যায় না, পরাবস্থায় ইহা অনুভূত হয়, এইজন্য উহাকে অব্যক্ত পদ বলে। উহা ধ্যানগম্য পদ।

“যস্তাবলোকনাদেব সর্বসদ্যবিবর্জিতঃ।

একান্ত নিস্পৃহঃ শান্তঃ সৎকথাং ভবতি প্রিয়ে॥”

এই পরম ব্রহ্মের অবলোকনে সর্ব সঙ্গ হইতে জীব বিমুক্ত হইয়া সকলের মধ্যে সেই একই ব্রহ্মকে দেখে। ইহারই নাম একান্ত। যখন সকলের মধ্যে একের অনুভব হইল তখন আর স্পৃহা কেন হইবে? এইরূপ যিনি ইচ্ছারহিত হইয়া যান, তিনি শান্তিপদকে লাভ করেন।

ক্রিয়ার পর অবস্থায় যিনি যোগনিদ্রায় মগ্ন থাকেন তাঁহার স্বপ্ন দর্শন হয় না, ইহাই প্রকৃত সুশুপ্তি; এই সুশুপ্তি স্থানে থাকিতে থাকিতে নিঃশেষ সেই ব্রহ্ম স্বরূপ হইয়া এক হইয়া যায়। তৎপরে প্রজ্ঞানধন অবস্থা প্রকাশ পায়, অর্থাৎ হৈহী-ভাব-যখন অনেকক্ষণ স্থায়ী ও গাঢ় হয় এবং অধিককাল স্থায়ী ঘটনাদি গুণিতে গুণিতে সেই ধ্বনিতে লয় হয়, অর্থাৎ স্থিতি-লাভ করিয়া আনন্দময়-স্বরূপ হইয়া কেবল আনন্দই ভোগ করে। এইরূপে আনন্দস্বরূপ সুখভোগ হইতে সাধক প্রাজ্ঞ হইয়া তৃতীয়পাদ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ দ্বয়-গ্রন্থি ভেদ করিয়া ‘সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ’ হয়। সেখানে মনোবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি ব্রহ্মতে লীন হয়। ব্রহ্মের সহিত মিলন হইলেই পরমাত্মার স্থিতি হয়, তাহারই নাম সঙ্খ্যা বা ধ্যান যাহা ১৭২৮ বাস প্রাণায়াম করিলে বুঝা যায়। এইরূপে রুদ্ধ থাকার অভ্যাস গাঢ় হইলে ধ্যানসঙ্খ্যা হয়,

য এবং বেত্তি পুরুষঃ প্রকৃতিঃ গুণৈঃ সহ ।

সর্বথা বর্তমানোহপি ন স ভূয়োহভিজায়তে ॥ ২৩

যাহাতে কোন কার্যক্ৰেপ নাই। এইরূপ ব্রহ্মতে মিলিয়া সকল ভূতে মিলিতে পারা যায়। ইহাই একদ্বিত্বের সন্ধ্যা। যখন সর্বদা স্মৃয়ায় থাকে, তখনই একদ্বিত্ব হওয়া যায় এবং তাহা হইলেই 'সর্বঃ ব্রহ্মময়ঃ জগৎ' হয়।

বিষয়েতে থাকিয়া তাঁহাতে মন বাঁধার বাধিয়া দিতে পারেন তাঁহারাই ঋষি। যেখানে স্বরূপকূটস্থ কোটি স্বর্ধোর মত প্রকাশ, তাহা অপেক্ষাও মহাভ্যোতিঃ (অগ্নি ও বিদ্যামিশ্রিত ভ্যোতিঃ), যেখানে অনেক দেবতার বহিয়াছেন, সেই কূটস্থের মধ্যে উত্তম পুরুষ বহিয়াছেন; এবং বাহার মধ্যে জগৎ ব্রহ্মাণ্ড সব বহিয়াছে যাহা ক্রিয়া করিলে দেখা যায়, সেই কূটস্থই পূজনীয়, তিনিই গুরুব্রহ্ম, তিনিই শরীর ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই সর্বত্র বহিয়াছেন বলিয়া বিষ্ণু, ষড়ৈশ্বর্যবান বলিয়া ভগবান, এবং অত্যন্ত নির্মল বলিয়া তিনি শিব। তিনি “পরম” অর্থাৎ ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় আপনা আপনি থাকিতে তিনি পরম। তিনি অরস এবং সকল রসের রস। তিনি বিজ্ঞান স্বরূপ, কারণ সেখানে যে থাকে সে সর্বজ্ঞ হয়। তিনি সর্বব্যাপক এই জন্ত মহৎ, তিনি ক্রিয়ার পর অবস্থায় মহাদেব, তিনি জ্বলন্ত থাকিয়া সর্বত্র লোকের মধ্যে দান ও কোন লোকের বশ হন না—এইজন্য তিনি ঈশ্বর। তিনি ব্রহ্মা অর্থাৎ ইচ্ছাস্বরূপ; তিনি হইয়াছেন এই জন্ত তিনি ভূত। তিনি ক্ষেত্র অর্থাৎ শরীরকে জানেন এইজন্য ক্ষেত্রজ্ঞ। তিনি ব্রহ্মা, হর, ইন্দ্র, কূটস্থ, বিষ্ণু-স্বরূপে জগৎ ও জীবকে পালন করিতেছেন। তিনি সকলের আদি এইজন্য আদিভ্য, তাঁহার জন্ম নাই এইজন্য অজ। তিনি প্রজাপতিমূহকে পালন করেন এইজন্য প্রজাপতি। তিনি যখন প্রজাপতি ও জগৎভর্তা তখন লোকে মিথ্যা খাবার ভাবনায় ভাবিয়া মরে কেন? ক্রিয়ার পর অবস্থায় তিনি “কেবল”। এই দেহপূরীতে শয়ন করিয়া আছেন বলিয়া তিনি পুরুষ। তাঁহারই বন্ধন করা যায় তন্নিমিত্ত তিনি যজ্ঞ, ক্রিয়ার পর অবস্থায় শান্তি-পদকে পাওয়া যায় তন্নিমিত্ত তিনি শান্ত। তিনি ব্যতীত আর কিছুই নাই এই জন্ত তিনি অদ্বিতীয়। প্রাণস্বরূপ যে অগ্নি সেই অগ্নি হিরণ্যবেষ্টিত বলিয়া তিনি হিরণ্যগর্ভ। এই প্রাণই বিশ্বধর, তাঁহাকে কেহ দেখে না, কিন্তু তিনি সমস্ত করিতেছেন ও বাঁধিতেছেন। দেখা-শুনা, মনন করা সমস্ত প্রাণেরই কর্তব্য, প্রাণই বাক্য, প্রাণই পরমাত্মার গৌণ নাম। এই প্রাণের সাধনা দ্বারা প্রাণ ও মন স্থির হইলেই এই দেহের মধ্যে যিনি দ্বিতম পুরুষ অথচ দেহ হইতে স্বতন্ত্র তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। তিনিই অন্তর্ধ্যামী—তিনিই ভূতাদিপতি পরমাত্মা ॥ ২২

— — —

অর্থঃ। যঃ (যিনি) এবং (এই প্রকারে) পুরুষঃ (পুরুষকে) গুণৈঃ সহ প্রকৃতিঃ চ (এবং গুণ সমূহের সহিত প্রকৃতিকে) বেত্তি (জানেন) সঃ (তিনি) সর্বথা (সকল অবস্থায়) বর্তমানঃ অপি (বর্তমান থাকিলেও) ভূয়ঃ (পুনরায়) ন অভিজায়তে (জন্ম গ্রহণ করেন না) ॥ ২৩

শ্রীধর। এবং প্রকৃতিপুরুষবিবেকজ্ঞানিমং জ্যোতিঃ—য এবংমতি। এবং—উপদ্রষ্টব্যদি রূপে পুরুষ যো বেত্তি, প্রকৃতিঃ চ গুণৈঃ সহ—স্ববদ্ব্যধিগরিণার্থমঃ সহিতাঃ যো বেত্তি : পুরুষঃ সর্বথা—বিধিম্ অভিলম্ব্য বর্তমানোহপি পুনঃ ন অভিজায়তে মৃত্যুত এব ইত্যর্থঃ ॥ ২৩

বদ্ব্যধিগরিণার্থমঃ। [এইরূপ প্রকৃতিপুরুষবিবেকজ্ঞানীকে প্রশংসা করিতেছেন]—এইরূপ উপদ্রষ্ট্য প্রভৃতি ভাবে যিনি পুরুষকে জানেন এবং যিনি গুণের অর্থাৎ স্ববদ্ব্যধিগরিণার্থমঃ পরিণামের সহিত প্রকৃতিকে জানেন, সেই পুরুষ সর্বথা অর্থাৎ বিধিলম্বন করিয়া বর্তমান থাকিলেও পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না, তিনি মৃত্যুই হন ॥ ২৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এইরূপ উত্তমপুরুষকে যে জানে অর্থাৎ দেখিতেছে পঞ্চভূত, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, উত্তম, মধ্যম, অধমগুণ; সকলেতেই সেই ব্রহ্মের অণু স্বরূপ—সে সব সময়ে সেই পুরুষেতে না থাকিলেও তাঁহার পুনর্দ্বার জন্ম হয় না এবং হইয়াও সে হয়নি কারণ তৎব্রহ্মস্বরূপ হইয়াছে।—পঞ্চভূত, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার যুক্ত জীব প্রকৃতি যখন উত্তম পুরুষকে জানিতে পারে তখন সে সকলের মধ্যেই ব্রহ্মের অণুকে দেখিতে পায়। সুতরাং কোন বস্তুই যে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ তাহা আর মনে হয় না। শরীর, প্রাণ, মন ও বুদ্ধির জাত্যাক্রমে যে সাক্ষীচৈতন্য বহিয়াছেন তাঁহারই সত্তার উপর এই বিশ্ব প্রকৃতির বিকাশ নির্ভর করিতেছে, সুতরাং সাক্ষীচৈতন্য ব্যতীত উহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। যে সাধকের মনঃ প্রাণ সাধনার দ্বারা ঐ সাক্ষীচৈতন্যের সহিত মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছে—যাহা ক্রিয়ার পর অবস্থায় হইয়া থাকে, কিন্তু সে অবস্থা হইতে নামিয়া আসিলেও যদি সেই অবস্থার স্মৃতি জাগ্রত থাকে, তাহা হইলেও সে সাধকের পুনর্জন্ম হয় না। কারণ তিনি ব্রহ্মের স্বরূপ অবগত হইয়াছেন।

প্রকৃতির জন্তই অসীম কালকে খণ্ড খণ্ড বলিয়া মনে হয় এবং কালের খণ্ড হেতু সমস্ত বস্তুরই পরিবর্তন দেখা যায়। কিন্তু ক্রিয়া করিয়া বাহার ক্রিয়ার পর অবস্থার অমূল্য হয় এবং ঐ অবস্থা ক্রমশঃ দীর্ঘ হইতে থাকে, তখন সেই সাধকের বাহ্য বস্তুরে সংসক্তি লুপ্ত হইয়া শিথিল মত অবস্থা হয়। এই হাঙ্গি এই কান্না—আবার স্বপ্নারূপে সে সকলের নাম গন্ধও স্বরূপ থাকে না—এই প্রকারের জীবন্ত পুরুষ বাহার, তাঁহাদের নিকট কালের ব্যবধান থাকে না, ভূত-ভবিষ্যৎ বলিয়া কিছু থাকে না। সমস্তই তখন তাঁহার নিকট বর্তমান স্পৃশ হইয়া থাকে। বাহার নিকট কাল সর্বদাই বর্তমান অর্থাৎ অখণ্ড, সে আর ভূত-ভবিষ্যতের ধার ধারে না। কালের দ্বারাই কণ্ঠের সুখ-দুঃখাদি ফল উৎপন্ন হয়, বাহার নিকট কাল সৰ্বা বর্তমানরূপে অবস্থিত তাহার আর সুখ-দুঃখের ভোগ কোথায়? এক চিন্তা হইতে আর একটি চিন্তায় আসিতে হইলেই কালজ্ঞানের প্রয়োজন হয়, বাহার চিন্তান্তির কোন স্পন্দনই নাই তখন আর কৰ্ম হইবে কি প্রকারে? সুতরাং কণ্ঠের ফলস্বরূপ সুখ-দুঃখাদি ভোগের জন্ত তাঁহার পুনর্জন্ম হওয়াও সম্ভব নহে। শরীরের মধ্যে যে কূটস্থ, তাহার পর উত্তম পুরুষ—পরমব্যোম স্বরূপে তখন তিনি সর্বব্যাপক, সুতরাং সব ‘আমি’ তখন উহার মধ্যে। আমিরের জ্ঞান দ্বারাই বিষয়ের অমূল্য হয়, যখন সেই “আমি” থাকে না তখন কোন বিষয়ও থাকে না তখন সমস্তই এক ব্রহ্ম। শরীর দৃষ্ট থাকিতেই সাক্ষী চৈতন্যকে পৃথক্ পৃথক্ভাবে অমূল্য হয়, কিন্তু

ধ্যানেনান্ননি পশুস্তি কেচিদান্নানমান্নান।

অন্তো সাংখ্যেন যোগেন কর্ণযোগেন চাপরে ॥ ২৪

অ জ্ঞানাত্মার সর্বব্যাপকত্ব বুদ্ধিতে পারিলে সেই এককেই সবার মধ্যে অনুভব হয়। প্রবর্তক উপাধকের বাহ্য সর্বরূপে প্রতীতি হয়, ক্রিয়ার পর অবস্থায় সেই “সর্ব” তখন একে মিলিয়া নাক হইয়া যায়। প্রথমে বিশ্বের বিবর্তিত অণুশ্রেণী পরিণত হয়, এবং অণু ক্রীণ হইতে হইতে শ্রেণী পরিণত হয়। বাহ্যার কুটম্বের মধ্যে ব্রহ্মের অণু বাহ্য বিন্দুরূপে বহিয়াছে প্রত্যক্ষ করেন তাঁহারাই যোগী, সমস্ত বস্তু সংহত হইয়া এই বিন্দুরূপে, আবার এই বিন্দুই অনন্ত বস্তু-রূপে প্রকাশ পায়—ইহা বাহ্যার প্রত্যক্ষ করিতে পারেন তাঁহারাই ষষ্ঠরূপে অবস্থান হয়। তখন তাঁহারই ভ্রমভ্রান্তির নিক্তি কর্ণসমষ্টি বাহ্যকে প্রারম্ভ বলে তাহা সমূলে বিধ্বংস হইয়া পুণ্যায়। তখন সাংখ্যের জ্ঞাননেত্রের নিকট এক ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই বর্তমান থাকে না—পূর্ণবে এক বলিবারও কেহ থাকে না। পরমাত্মা বাহ্য প্রকৃতই এক এবং অদ্বিতীয় বাহ্যকে দ্বামাত্র্য প্রভাবে বহু বলিয়া বোধ হয়, দেহ বোধ নিরুদ্ধ হইলে সেই মায়ার মায়ীর মধ্যে সংপ্রবিষ্ট হয়, তখন এক আত্মাই বর্তমান থাকে। শ্রীমদ্ভগবতে আছে—

দমন “ইদম্ভ বিশ্বং ভগবানিবেতরো

পা যতো জগৎস্থাননিরোধসম্ভবাঃ”

জা বে দৈব হইতে এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হইতেছে সেই দৈব এবং এই বিশ্ব এবং সংসার জীবরূপে প্রতীয়মান হইতেছে সমস্তই ভগবান অর্থাৎ সমস্তই ব্রহ্মময় ॥ ২৩

অর্থঃ। কেচিৎ (কেহ কেহ) ধ্যানেন (ধ্যানের দ্বারা) আত্মনি (বুদ্ধির অভ্যন্তরে) আত্মানং (আত্মাকে) পশুস্তি (দর্শন করেন); অন্ত্রে (অপর কেহ) সাংখ্যেন যোগেন (সাংখ্যযোগদ্বারা), অপরে চ (আবার অন্ত কেহ কেহ) কর্ণযোগেন (কর্ণযোগদ্বারা) অর্থাৎ [আত্মদর্শন করেন] ॥ ২৪

কি শ্রীশ্রীঃ। এবতুতবিবিক্তজ্ঞানসাধনবিকল্পান্ আহ—ধ্যানেনেতি বাভ্যাম্। ধ্যানেন নি—আত্মাকারপ্রত্যয়বৃত্ত্য, আত্মনি—দেহে এব, আত্মনা—মনসা, এনম্—আত্মানং কেচিৎ হই পশুস্তি। অন্ত্রে সাংখ্যেন—প্রকৃতিপুরুষবৈলক্ষণ্য আলোচনেন, যোগেন—অষ্টাঙ্গেন, যোগে অপরে চ কর্ণযোগেন পশুস্তীতি সর্বত্রায়ুষঃ। এতেষাং চ ধ্যানাদীনাং যথাযোগ্যং ক্রম-শাঃ সমুচ্চরে সত্যপি তত্ত্বজ্ঞানভেদাভিপ্রায়েণ বিকল্পোক্তিঃ ॥ ২৪

কি বলাসুবাঃ। [এই প্রকার বিবিধ আত্মজ্ঞানের সাধন বিষয়ে যে নানা বিকল্প আছে তাহা দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন]—(১) ধ্যান অর্থাৎ আত্মাকারপ্রত্যয় আত্মজ্ঞান দ্বারা

“আত্মনি” দেহে “আত্মনা” মন দ্বারা কেহ কেহ আত্মাকে দর্শন করেন। (২) অপর কেহ সাংখ্য অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের বৈলক্ষণ্য (ভেদ) আলোচনা দ্বারা ও অষ্টাঙ্গযোগের দ্বারা আত্মাকে দর্শন করেন। (৩) অপর কেহ বা কর্ণযোগ দ্বারা আত্মাকে দর্শন করেন।

না (এই “পশুস্তি” এই পূর্বোক্ত ক্রিয়ার সর্বত্র অর্থহীন জানিবে)। এই সকল ধ্যানাদির জ্ঞান যথাযোগ্য ক্রম সমুচ্চর থাকিলেও নিষ্ঠার বিভিন্ন অভিজ্ঞার দ্বারা ইহার ভ্রম প্রবৃত্তি থাকে উক্ত

হইল। [যদিও আত্মদর্শনের জন্য ধ্যান, সাংখ্য, কর্ণ প্রভৃতির সমুচ্চর অর্থাৎ পরস্পর মিলিত ভাবে অনুষ্ঠান করাই প্রয়োজন, তথাপি নিষ্ঠাভেদে দ্বৈতভাবের ভ্রম ভগবান এইরূপ বিকল্প উক্তি করিলেন।] ॥ ২৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—১৭২৮ বার প্রাণায়াম করিলে পর আত্মা নির্মল ব্রহ্ম স্বরূপ অণু দেখিতে পায়। কেহ অসংখ্য প্রাণায়াম করিতে করিতে আপনা আপনি আত্মাকে দেখিতে পায়, অল্প লোকে সকল হইতে রহিত হইয়া আসক্তি পূর্বক কোন দিকে মন না দিয়া কেবল আত্মাতে থেকে আত্মাকে আপনা আপনি দেখে—বাহ্যাত্মক সাংখ্যযোগ কহে—তাহারও তাৎপর্য এই ক্রিয়া; অপর লোকে ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া ধারণা-ধ্যান-সমাধি মুক্ত হইয়া এই ক্রিয়া করিয়া (যাহা গুরুবক্ত গম্য) সেই আত্মাকে আপনা আপন দেখে।—বাহ্য বিষয়গুলি মনে আসিতেছে ইন্দ্রিয় দ্বার দিয়া, আবার বাহ্যের বিষয়গুলি ইন্দ্রিয় সাহায্যেই প্রকাশিত হইয়া বাসনারূপে জ্বরে প্রবিষ্ট হইতেছে—এইভাবে যতক্ষণ ততক্ষণই সংসার। প্রাণধারা স্পন্দিত হইয়া মনরূপে এই সকল সঞ্চল বিকল্পের তরঙ্গ উঠায়। ইহাই জীবভাব, এইরূপেই জীবের সংসার ভাব ছুটিয়া উঠে। কিন্তু আত্মার মধ্যে এই সকল তরঙ্গোচ্ছ্বাস নাই। সূর্য হইতেই কিরণসমূহ উৎপন্ন হইয়া যেমন বিধে ছড়াইয়া পড়ে, সেইরূপ আত্মা চঞ্চল হইয়া প্রাণরূপে এই বিশ্বসংসারকে উৎপন্ন করে এবং বাসনা সহযোগে তাহার সহিত যুক্ত থাকিয়া কেবল সংসার-তরঙ্গই অবলোকন করে; যখন ভাগ্যবশে সূর্য্যক রূপায় এই সংসার-চাকল্য তাহাকে ক্রিষ্ট করে, তখন আবার তরঙ্গাকার মনোবৃত্তিগুলি নিজ কেন্দ্রাভিমুখে প্রধাবিত হয়; যখন বাসনাসমূহ আত্মকেদ্রে মিলিত হইয়া শাস্ত হইয়া যায় তখনই চঞ্চল প্রাণ অব্যক্ত শান্ত প্রাণে মিশিয়া এক আত্মাকারভাবে ভাবিত হইয়া থাকে—

“ততঃ পরং ব্রহ্মপরং বৃহত্তং

যথানিকায়ং সর্বভূতেষু গুণম্।

বিশ্বৈকং পরিবেষ্টিতায়ম্

দিশং তং জাহ্নাহুতা ভবন্তি ॥” খেতা, ৩৭

আত্মার সহিত সঞ্চলযুক্ত জগৎ, তরপেক্ষাও যিান শ্রেষ্ঠ, কারণরূপে তিনি জগৎ প্রপঞ্চের মধ্যেও বর্তমান, এবং সেই জগদাত্মক বিবর্ত পুরুষের অতীত অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভরূপী ব্রহ্ম অপেক্ষা উত্তম এবং ব্যাপক বলিয়া বৃহৎ। তিনি “যথানিকায়” অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন শরীর অগ্রসারে সর্বভূতে গুণ অর্থাৎ প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান, এবং সমস্ত জগতের পরিবেষ্টিত, অর্থাৎ সমস্ত জগৎকে অভ্যর্জিত করিয়া স্বরূপে যিনি জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত সেই পরমেশ্বরকে অবগত হইয়া জীবগণ অমৃত অর্থাৎ মুক্ত হন।

সেই পরম পুরুষকে কিরূপে লাভ করিতে হয়? “ত্রিপিপায়া বিচক্রমে বিকোর্পোপহৃদাভ্যাং অতো ধ্যানি ধারয়ন্”—ঋগ বেদ। ইড়া, পিঙ্গলা, সূর্য্য। এই তিন পদ—আড়াই হও বামদিকে, আড়াই হও দক্ষিণ দিকে আর কিঞ্চিৎকাল মধ্যভাগে শ্বাস বহিতেছে—ইহাতেই সংসারচক্রের প্রবাহ চলিতেছে। এই অনন্ত কালচক্রের গতি স্থির হইলেই

বিভূর পরমপদ বাহা তাহা লাভ করিতে পাবা যায়। বাম দক্ষিণ অর্থাৎ ইড়া-পিদলায় পতি ক্রিয়ার দ্বারা স্থির হইয়া যখন সুস্থায় প্রবেশ করে তখনই স্থিরত্ব পদ লাভ হয়—ক্রিয়ার পর অবস্থায় এই স্থিতিকে ধারণ হয়, ঐ স্থিরত্বই প্রকৃত ধর্ম—এই স্থিরতা দ্বারাই নিরুত্তিপঙ্কে লাভ করা যায়। প্রথমে ক্রিয়া করিতে করিতে যত মন স্থির হয় ততই পাপের ক্ষয় হইতে থাকে। সমুদ্রার পাপক্ষয় হইলেই মনেতে মন ডুবিয়া যায়, এই শরীরের অধিপতি যে ব্রহ্ম তাঁহার সহিত যোগ হইয়া যায়। এই যোগযুক্ত অবস্থা হইতেই সর্বত্র সমভাব হয়, হৃদয় স্থবর হয়, অর্থাৎ সে হৃদয়ে কোন গানি বা মল থাকে না, তখনই আনন্দের অমৃতত্ব হইতে থাকে। তখন সাধক আর কোন আশ্রয়েরই অপেক্ষা করেন না, তখনই সাধকের “রাম-ভরোস” বা ব্রহ্মের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরতা আসে। এই অবস্থাই ক্রিয়ায় পর অবস্থা, ইহাই বিষ্ণুর পরমপদ। খাস মস্তকে চড়িয়া যখন স্থির হয় তখনই পরম পদকে যোগী নদা দেখিতে পান। বায়ুর স্থির গতির সহিত মায়া-রহিত হইয়া সাধক তথাভীত ব্রহ্মভাবে থাকেন। ক্রিয়ার পর অবস্থা, পরম পদ বা ব্রহ্মপদ ইহাই। যক্ষ অণু স্বরূপে ব্রহ্ম তখন সর্ব-ব্যাপক, তাঁহার কোন উপলব্ধি হয় না, অথচ তাহাতে মন লীন হইলে সাধক সর্বব্যাপী ব্রহ্মস্বরূপে বর্তমান থাকেন। ১৭২৮ বার প্রাণায়াম করিলে যে ধ্যানাবস্থা আসে তাহাতে নির্মল ব্রহ্মাণুর সময়ে সময়ে উপলব্ধি হয়, সেই ব্রহ্মাণুই অম্মার নিজ স্বরূপ। উহা অমৃতত্ব করিয়া সাধক কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন। তখন প্রাণের বাহু স্পন্দন না থাকায় মন প্রাণেতেই বিলীন হইয়া পরম শান্তিময় ভাবে অবস্থান করে। এই অবস্থায় মনের বিজাতীয় প্রত্যয়-প্রবাহ সম্পূর্ণ রুদ্ধ হইয়া যায়। সেই “সমবস” ভাব অর্থাৎ জ্ঞানদ্বারা তৈলধারার দ্বারা অবিকল্পিতভাবে প্রবাহিত হইতে থাকে—ইহাই ধ্যানের দ্বারা আত্মসাক্ষ্যকার। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে পরমস্থির বা ব্রহ্মভাবে উপলব্ধি হয়, সেই ব্রহ্মই সকলের আধার, তাহাতে থাকিলে পরমানন্দের বোধ হয় এবং তখন এক অশুভ ব্রহ্ম-বোধের দ্বারা সমস্ত বোধ আচ্ছাদিত হইয়া যায়, এবং অপর বাহা কিছু মনস্তত্বই ব্রহ্মে লয় হয়।

উপরোক্ত সাধনা এবং পবে অস্ত্রাঙ্গ সাধনার ক্রম বাহা কথিত হইবে, তাহার সমস্ত গুলিকেই একসঙ্গে আরম্ভ করা যাইতে পারে, তাহাতে নিবোধ অবস্থা অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য হয়। বহুলাল ও বহুক্ষণ ধরিয়া ক্রিয়ার অভ্যাস কলে ক্রিয়ার পর অবস্থা—যাহাকে ধ্যান-যোগ বলে তাহা প্রকটিত হয়। এই সাধনার অঙ্গ হইতেছে, সাংখ্যযোগ ও ক্রিয়াযোগ। (১) ক্রিয়াযোগের বহু অঙ্গ আছে। তন্মধ্যে অপের সহিত প্রাণায়ামই সর্বপ্রধান। প্রাণায়ামের ক্রিয়া করিতে করিতে মনের বহির্বিচরণ কমিয়া যায়, চিত্ত একাগ্র হইতে থাকে—ইহাই ধারণা, পবে চিত্ত বিশেষভাবে অন্তর্মুখী হইয়া নিবোধের দিকে অগ্রসর হয়, তখনই ধ্যানাবস্থা লাভ হয়, পবে ধ্যান গভীরতর হইলে চিত্তের একাগ্রতা পরাকর্ষী লাভ করে, তখন মন নিরুদ্ধ হইয়া যায়—উহার নামই সমাধি। প্রাণায়াম-সাধনায় চিত্ত যত চিত্তাশূন্য হয় ততই সত্ত্বগুণি হইয়া মন অন্তর্মুখ হইয়া আত্মস্থ হয়—ইহাই ভগবানে সর্ব কৰ্ম-সমর্পণ। চিত্তার দ্বারাও ভগবানে সর্বকৰ্ম-অর্পণ করিয়া নিরমিত কর্তব্য কর্মের যে অনুষ্ঠান তাহাও কৰ্মযোগ। পূর্বোক্ত প্রাণায়ামাধি ক্রিয়াযোগগুলিও কৰ্মযোগ।

অন্যে ত্রেবমজানন্তঃ শ্রদ্ধাশ্চেভ্য উপাসতে।

তেহপি চাতিত্তরন্ত্যেব যুক্ত্যঃ শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥ ২৫

(২) “সাংখ্য ও ধ্যানযোগ”—বিচার যুক্ত জ্ঞানযোগই সাংখ্যযোগ, কিন্তু কেবল মৌখিক বিচার লইয়া থাকিলে প্রকৃত জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। অষ্টাঙ্গ যোগাত্ম্যাসে বস্তু হইয়া ক্রিয়াবান সাধকেরা আত্মাধারা আত্মাকে দর্শন করেন। ইহাতেও প্রাণায়ামের আবশ্যকতা আছে, তাহা যোগীরা জানেন। সাধক প্রথম যোনিমুদ্রার দ্বারা শরীরস্থ আত্মজ্যোতিঃ দর্শন করেন, ক্রমে প্রজ্ঞা ও অত্যাসপটুতার দ্বারা জ্যোতির অন্তর্গত কূটস্থ মধ্যে উত্তম পুরুষ নারায়ণের দর্শনলাভ করেন। ইহাই আপনাকে আপনি দেখা। তখন মনের আর অস্ত্র বস্ত্রতে আসক্তি থাকে না, যোগী কেবল আত্মক্রিয়ার দ্বারা আত্মস্থিতি লাভ করিয়া ভৌ হইয়া থাকেন। ইহাও প্রাণায়ামেরই স্বল। বেশী করিয়া প্রাণায়াম করিলে সাধকেরা আত্ম-জ্যোতিঃ নিত্যই দর্শন করিতে পারেন ॥ ২৪

অন্যত্র তু (অপর কেহ কেহ বা) এবম্ অজানন্তঃ (পূর্বোক্ত উপায়গুলির কোন একটির দ্বারা আত্মার স্বরূপ জানিতে সমর্থ না হইয়া), অন্তেভ্যঃ (অন্তের নিকট হইতে) শ্রদ্ধা (তিনিয়া) উপাসতে (উপাসনা করিতে থাকে), শ্রুতিপরায়ণাঃ (আচার্যের উপদেশ বাক্যই ঋষিদের মোক্ষমার্গ গমনের সাধন) তে অপি (তাঁহারাও) যুক্ত্যঃ অতিতরন্তি এব (যুক্ত্যকে অতিক্রম করেন) ॥ ২৫

শ্রীধর। অতিমন্দাধিকারিণ্যে নিস্তারোপায়মাহ—অন্তে তু ইতি। অন্তে তু সাংখ্য-যোগাধিমার্গেণ এবভূতং উপদ্রষ্টৃদ্বাদিলক্ষণং আত্মানং সাক্ষ্যং কর্তৃম্ অজানন্তঃ অন্তেভ্যঃ আচার্যেভ্যঃ উপদেশতঃ শ্রদ্ধা উপাসতে ধ্যায়ন্তি। তেহপি চ শ্রদ্ধা উপদেশপ্রবণপরায়ণাঃ সন্তো যুক্ত্যঃ—সংসার শঠৈঃ অতিত্তরন্ত্যেব ॥ ২৫

বলাশুভান। [অতি মন্দাধিকারীদিগের নিস্তারোপায় বলিতেছেন]—অপরে (মন্দা-ধিকারীরা) সাংখ্যযোগাধি মার্গ দ্বারা উপদ্রষ্টাদি লক্ষণাধিত আত্মাকে সাক্ষ্যং করিতে না জানিয়া অত্র আচার্যের নিকট উপদেশ প্রবণ করিয়া ধ্যান করেন। তাঁহারাও শ্রদ্ধার সহিত উপদেশ প্রবণপরায়ণ হইয়া যুক্ত্য অর্থাৎ সংসার ক্রমশঃ ধীরে ধীরে অতিক্রম করেন ॥ ২৫

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ইহা সকল শুনে অর্থাৎ উপমু্যুক্ত কর্ত্ত্ব সকল শুনে কোল একটা কিছু মনে স্থির করিয়া বসে; তাহারাও আর কিছু না পাইয়া কেবল ঔকার ধ্বনি শুনিয়া পড়িয়া থাকে, তাহারাও তরে যায় অর্থাৎ ক্রিয়া করিলে যে স্থিতি তাহার অনুভব হয়।—তিন গুণের সাম্য হইলে ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্তি হয়, ইহাই তিনগুণের অতীত ভাব। প্রাণ, অপান ও ব্যানের গতি তখন সমান। সেই সাম্যে স্থিত হইলে স্থিরত্বপঙ্কে পাওয়া যায়। তিনগুণের অতীত হইলে সমান বায়ু নাভিবেশেতে স্থির হইয়া হৃদয় পর্য্যন্ত স্থির হওয়াতে দৈবর যিনি দ্বয়সেতে আছেন তাহাতে লীন হইয়া সাধক সর্বজ্ঞ হন—এ অধিকার লাভ ঋষিদের পক্ষে কঠিন বা অসম্ভব, কূটস্থেতে প্রতিষ্ঠা

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিং সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্ ।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজসংযোগান্তর্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥ ২৬

হইলৈও অনন্ত লোকের প্রাপ্তি হয় ; সেই কূটস্থের গুহাব মধ্যে প্রবেশ করাও যাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় না, তিনি যদি কেবল গুরু উপদেশ মত ক্রিয়া করিয়া চলেন, তিনিও আপনা আপনি গুঁকার ধ্বনি শুনিতে পান। পূর্বোক্ত ক্রিয়ার পরাবস্থা প্রাপ্ত যোগীৰও যে অবস্থা, যাঁহার গুরুকৃপায় না দ ব্যক্ত হইয়াছে তিনিও সেই অবস্থা প্রাপ্ত হন—যাহাকে বিষ্ণুর পরম পদ বলে। এই শব্দব্রহ্মের সাধন খুব সহজ, একটু মন দিয়া ক্রিয়া করিলেই ‘ঐশবধ্বনি শুনা যায়, এবং তাহাতে যিনি মন দিয়া থাকেন তাঁহারও নেশা হয় এবং জগৎ ভুল হইয়া যায় ॥২৫

অবয়। ভরতবর্ষ! (হে ভরতশ্রেষ্ঠ) যাবৎ কিঞ্চিৎ (যত কিছু) স্থাবরজঙ্গম সমুৎ
(স্থাবরজঙ্গম পদার্থ) সংজ্ঞায়তে (উৎপন্ন হয়) তৎ (তাহা) ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞানযোগ্যাৎ (ক্ষেত্র
ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হইতেই হইয়া থাকে) বিদ্ধি (জানিও) ॥ ২৬

শ্রীধর । তত্র কৰ্মযোগস্ত তৃতীয় চতুর্থ-পৰ্য্যায়-প্রাপ্তিত্বাৎ, ধ্যানযোগস্ত চ ষষ্ঠাষ্টময়োঃ
প্রাপ্তিত্বাৎ, ধ্যানাদেব সাংখ্যবিভক্ত্যবিষয়ত্বাৎ সাংখ্যমেব প্রাপ্তয়ন্ আহ—যাবদিত্যাदि
যাবদধ্যায়সমাপ্তিঃ । যাবৎ কিকিং বস্তুমাত্রং সৰং উপপত্তে তৎ সৰং ক্ষেত্রক্ষেত্রয়োঃ
যোগাৎ, অবिवেককৃতান্তাহাধ্যাদ্যানাং ভবতীতি জানীহি ॥ ২৬

বঙ্গানুবাদ। [তাহাতে কৰ্মযোগসম্বন্ধে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে বিস্তৃত ভাবে বলায়, এবং ষষ্ঠ ও অষ্টম অধ্যায়ে ধ্যান যোগাধির বিষয়ও বিস্তৃতভাবে বলায়, ধ্যানাদিরও সাংখ্যবিভিন্ন আত্মবিষয়ক হেতু সাংখ্যকেই অধ্যায় সমাপ্তি পর্য্যন্ত বিস্তৃতভাবে বলিতেছেন] —যাহা কিছু স্থাবরজঙ্গমাধি বস্তু উৎপন্ন হয়, তৎসমস্তই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের যোগ হইতে। ঐ দুইয়ের অবিবেককৃত তাদাত্ম্যাধ্যাস হেতু উৎপন্ন হয় জ্ঞানিবে। [এক পদার্থে অল্প পদার্থের ধর্মকে বোধ করার নাম অধ্যাস। অনাত্মাকে আত্ম বোধ হইলে অনাত্মার ধর্মকে আত্মার ধর্ম বলিয়া যে বোধ তাহার নাম অধ্যাস। স্থূলত্ব ও কৃশত্ব আত্মার ধর্ম নহে, কিন্তু আমি স্থূল আমি কৃশ বলিলে দেহ-ধর্ম আত্মাতে অধ্যাসিত হয়। আত্মা যে অনাত্মা হইতে বিলক্ষণ তাহার জ্ঞান না থাকায় এই অধ্যাস উৎপন্ন হয়। তাহা হইলে এই অধ্যাস অবিবেক হেতুই হয় বলা যাইতে পারে] ॥ ২৬

[জীব ও পরমেশ্বরের অভেদ জ্ঞানই মোক্ষের সাধন, “যচ্ছাস্বাস্থ্যমশুভে”—যাহা ঘানিয়া মোক্ষলাভ করিতে পারা যায়। এই সিদ্ধান্তের কি হেতু তাহাই বেবাইবার ক্ষম এই শ্লোকের আরম্ভ করা হইতেছে। যাহা কিছু বস্তু সম্ভ্রাত অর্থাৎ উৎপন্ন হয় সেই স্বাবর-জন্ম সমস্ত বস্তুই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের সংযোগ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই যে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের সংযোগ বলিয়া নির্দিষ্ট হইল, ইহার তাৎপৰ্য্য কি ? অর্থাৎ কি প্রকার সংযোগ এইস্থলে অভি-
প্রেত ? [ইহাই বুঝাইবার ক্ষম বলা হইতেছে] যেমন বজ্রের সহিত বটের অবয়ব-সংযোগমূলক পরস্পর সংযোগ হয়—ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের সংযোগ কি সেই প্রকার ? তাহা হইতে পারে না,

কারণ আকাশের ছায় ক্ষেত্রজের কোন অন্য়ব নাই। তত্ত্ব এবং পটের যেমন সমবায় রূপ সম্বন্ধ আছে, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের মধ্যে সেই প্রকার সমবায় রূপ সম্বন্ধই এস্থলে সংযোগের অর্থ, তাহাও নহে, কারণ তত্ত্ব-পটের মধ্যে একটি কারণ এবং অপবটি কার্য। তাহাদের মধ্যে এই কার্য-কারণ ভাব আছে বলিয়াই তত্ত্ব ও পটের পরস্পর সমবায়রূপ সম্বন্ধ স্বীকার করা যায়; ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের মধ্যে সেই প্রকার কার্য-কারণ ভাবরূপ সম্বন্ধ নাই, এই দৃষ্ট উদাহের মধ্যে সমবায়রূপ সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। তবে ইহা কিরূপ সংযোগ? ইহার উত্তরে বলা ষাইতে পারে—ক্ষেত্রজ ও ক্ষেত্র বস্তুতঃই বিলক্ষণ স্বভাব। ক্ষেত্রজ স্বয়ং জ্ঞান-স্বরূপ, ক্ষেত্র জ্ঞানের বিষয়। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে যে অধ্যাসরূপ সম্বন্ধ তাহাই এই স্থলে সংযোগ শব্দের অর্থ। অর্থাৎ ক্ষেত্রজের ধর্ম ক্ষেত্রে আরোপিত হয়, এবং ক্ষেত্রের ধর্ম ক্ষেত্রজে আরোপিত হয়। তাহা হাড়া ক্ষেত্রের তাদৃশ্য ক্ষেত্রজে আরোপিত হয় এবং ক্ষেত্রজের ধর্ম ও তাদৃশ্য ক্ষেত্রে আরোপিত হয়, এই প্রকার পরস্পরের স্বরূপ ও ধর্মের পরস্পরে যে আরোপ হয়, সেই আরোপ বা অধ্যাসই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের সংযোগ। এই সংযোগই সংসারের কারণ; ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের স্বরূপগত বিবেকের অভাবই এই সংযোগের কারণ; যেমন শুক্তি ও রক্তের বিবেক জ্ঞান না থাকিলে শুক্তিতে রক্তত এবং সেই রক্তের ধর্ম আরোপিত হয়, ক্ষেত্রজ ও ক্ষেত্রের পরস্পরাধ্যাসও সেই প্রকার অবিবেকমূলক]—শঙ্করভাষ্যের অনুবাদ।

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—যাহা কিছু হইয়াছে দেখিতেছে—স্বাবর ও জগৎ—
ইহা সকলেতেই সংপ্রজ্ঞ আছেন; এবং সকলেরই আকার ক্ষেত্রস্বরূপ
আছেন প্রকৃতিরূপে এবং সকলেতেই ক্ষেত্রজ স্বরূপ জীব পরম পুরুষ
ব্রহ্মস্বরূপ সর্বব্যাপক এক তিনি আছেন; অতএব সেই এক পুরুষ
দেখিলে অনন্ত চিন্তে সেই এক পুরুষেতে থাকিলে একই এক অর্থাৎ ব্রহ্মেই
ব্রহ্ম। তখন আর কিছু জামিবার ও পাইবার থাকি থাকিল না।—স্বাবর
জগৎস্বাক্ষর জগৎ সমস্তই ব্রহ্মময়। “দৈশ্যবাস্তুমিহং সর্বং।” তবে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ ভিন্নবস্তু
কিরূপে এবং তাহাদের সংযোগই বা কিরূপে কল্পনা করা যায়? ক্ষর, অক্ষর—হুই তাঁহার
প্রকৃতি এবং হুই প্রকৃতি তাঁহা হইতে অভিন্ন। আমরা যেমন নিজের দক্ষিণ হস্তের সহিত
বাম হস্তকে সংযুক্ত করি সেইরূপ পুরুষোত্তম নারায়ণের ইচ্ছায় তাঁহার এই ক্ষর, অক্ষর
প্রকৃতির মিলন হয়, এই মিলনই জীব ও জগৎ। হুই হস্তের মধ্যে যেমন “আমি” বর্তমান
তদ্রূপ তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে তিনিই বর্তমান। সমুদ্রে তবৎ দেখিলেও তবৎ বেরূপ সমুদ্র
হইতে অভিন্ন, তদ্রূপ এই নামরূপময় জগৎ ও জীব ব্রহ্মস্বরূপ হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন। বহির্দৃষ্টি
থাকিতে ভিন্ন-বোধ কিছুতেই নষ্ট হয়না। কথার বিচারে বুদ্ধি এই ঐক্যটাকে অমুভব
করিলেও বাহ্য দৃশ্য থাকিতে এই ঐক্যের অমুভব কথার কথা মাত্র। অধ্যাস বুদ্ধিতে
পারিলেও অধ্যাস মন হইতে মুছিয়া যায় না। এই অধ্যাস যে জন্ম হয় তাহার কারণ অমুসন্ধান
করিলে দেখা যায় যে প্রাণের স্পন্দন হেতুই মন স্পন্দিত বা সঞ্চলময় হইয়া এই বিরাট গন্ধর্ব্ব
নগরী নির্মাণ করিয়া তুলিয়াছে। ইহা সত্য বা অসত্য কেবল বিচার করিয়া নির্ধারণ
করিতে যাওয়া বালচপলতা মাত্র। খুদ্বাংগ্য বাহ্য জগৎ বোধের বিষয় হয় না, জ্ঞানদ্রব্যস্থান

‘আমরা স্বপ্ন দেখি না। কিন্তু দুটি অবস্থার মধ্যে যেটিতেই থাকিব তখন সেই অবস্থাস্বরূপ দৃশ্য দেখা য়োব হইবে না। ইহা নাই মনে করিলেই নাই হয় না—কিন্তু এমন অবস্থা আছে যেখানে সত্যই তাহাদের অস্তিত্ব থাকে না। স্বপ্ন-জগৎ ও বাহ্য-জগৎ মনের দুইটি অবস্থা ভেদে পরিদৃষ্ট হয়। এক অবস্থায় অস্তিত্ব থাকে না। সৰ্বকালে উহার থাকে না বলিয়া উহাদ্বয়কে অসং বলা হইয়া থাকে। সদ্বস্ত কেবল মাত্র আত্মা, তাহার ত্রিকালে কোন পরিবর্তন নাই। সেই সদ্বস্তর একটি স্থান আছে—তাহা বাহ্যদৃষ্ট স্থানের মত স্থান (space) নহে, তাহাই তাঁহার স্বধাম; সেই স্বধামে কোন মায়া নাই, সূত্রবাং স্বাবর-জগদ্বাদি নামরূপাত্মক জগতেরও তাহার কোন অস্তিত্ব নাই। সেই আত্মা স্বধামে থাকিয়াও যখন স্বধাম হইতে দূরে সরিয়া আসেন বলিয়া বাহ্যকে আত্মার গুণযুক্ত অবস্থা বলে—সেই অবস্থায়, এক সময়ে যেমন অসংখ্য তরঙ্গোচ্ছাস হয়, তদ্রূপ সেই এক আত্মাতে যেন অসংখ্য বিশ্বপাত হয়, তখনই তেজোজ্ঞাপক স্বাবর-জগদ্বাদি নামরূপময় অসংখ্য অসংখ্য প্রতিবিম্ব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এই গুণময়ী অবস্থার অন্তরালে যে সত্তা বর্তমান সেখানে নানাত্ব নাই, সেখানে সৰ্বস্বাই “সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ” হইয়াই আছে, সূত্রবাং সৃষ্টি বা লয় সেখানে কিছুই সম্ভাবনা নাই। কেবল স্বরূপ জীব, এবং পরমপুরুষ ব্রহ্ম ইহাদের ভেদ যখন ঔপাধিক, প্রকৃত ভেদ বর্তমান নাই, সেখানে সৃষ্টি বা লয় এ সমস্তই কাল্পনিক, প্রকৃত সত্য নহে। বিবিধ স্বর্ণালঙ্কারের মধ্যে যেমন এক স্বর্ণই সত্যরূপে বর্তমান থাকে, তদ্রূপ বহু ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের মধ্যে এক আত্মাই বর্তমান আছেন। তবে যে সাধারণতঃ আমাদের নিকট বহু বলিয়া প্রতীত হয় এবং চৈতন্ত জড়ের ভেদ অসুতব হয় উহা সমস্তই আপেক্ষিক বোধ মাত্র। সমস্ত ক্ষেত্রকে ফুটাইয়া তুলিতেছেন তদ্ব্যবস্থ পুরুষ, সেই পুরুষকে যখন দেখা যায় তখন তদ্ব্যবস্থাকে একই বস্তুরূপে ফুটিয়া উঠে, আর এই সমস্ত রূপ বাহ্যের সেই পুরুষকে দেখিতে দেখিতে যখন নামরূপময় বোধ সব ডুবিয়া যায়—তখন থাকেই কেবল সেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বা আত্মা। তখন জানিবারও কিছু থাকে না, পাইবারও কিছু থাকে না। তখন জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান তিন এক হইয়া কেবল “সৎ” স্বরূপে বিরাজমান থাকেন। কবীর বলিয়াছেন—“হরি ভজি আপাঁ মিটে তব পাওয়ে কবতার” —হরি ভজন করিতে করিতে “আমি” মিটিয়া গেলে তখন কর্তাকে পাওয়া যায়। তাই সাধকেরা বলিয়াছেন—“হরি ভজলেই সৰ্বনাশ”। অর্থাৎ যে হরি ভজে তাহার নিকট ‘সর্বের’ প্রতীতি থাকে না, সে তখন হরির সহিত এক হইয়া যায়। ভক্ত জুলসীদাস রামচরিতমানসে বাসীকির মুখ হইতে বলাইয়াছেন—“জানত তুমিহি তুমিহি হোই আদি”—তোমাকে জানিলে তুমিই হইয়া যায়। এই শরীর-বট যে চৈতন্তের আলোক সম্পাতে চৈতন্তময় হইয়া রহিয়াছে—সেই চৈতন্তের সন্ধান কর, তখন এই দেহের মধ্যেই তাঁহাকে দেখিতে পাইবে, এবং দেখিতে দেখিতে আর জ্ঞা ও দর্শন কিছুই থাকিবে না। কবীর বলিয়াছেন—“বটহি মাছ চৌবতারা বটহি মাছ দিবান্”—এই শরীর রূপ মটের মধ্যে বাজা ও রাজসিংহাসন (কুটস্থ জ্যোতি ও তদ্ব্যবস্থ উত্তম পুরুষ উভয়েই বর্তমান) রহিয়াছেন। এই সকল বিষয় সন্ধান না করিয়া কেবল ঘট পট লইয়া কলহ করিলে কিছুই সেই অগম্য অপার বস্তুর সন্ধান পাওয়া যাইবে না ॥ ২৬

সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্ ।

বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৭

অর্থঃ । সর্বেষু ভূতেষু (সর্বভূতে) সমং তিষ্ঠন্তং (সমভাবে অবস্থিত), বিনশ্যন্তং (সমস্ত বস্তু বিনষ্ট হইলেও) অবিনশ্যন্তং (অবিনাশী) পরমেশ্বরং (পরমেশ্বরকে) যঃ (যিনি) পশ্যতি (দেখেন), সঃ পশ্যতি (তিনিই স্বার্থভাবে দর্শন করেন) ॥ ২৭

শ্রীধর । অবিবেকরূপ সংসারোক্তবৎ উক্তা তদ্বিত্তয়ে বিবিক্তাবিবয়ং সম্যাদর্শনমাহ— সমমিতি । স্বাবরজগদ্ব্যবস্থায় ভূতেষু নির্কিশেবং সজ্ঞপেণ সমং যথা ভবতি এবং তিষ্ঠন্তং পরমাত্মানং যঃ পশ্যতি, অতএব তেষু বিনশ্যৎস্বপি অবিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স এব সম্যক পশ্যতি নান্ন ইত্যর্থঃ ॥ ২৭

বঙ্গানুবাদ । [অবিবেকরূপ সংসারের যে উদ্ভব তাহা বলিয়া সেই সংসার নিবৃত্তির জন্ত বিবিক্তাবিবয়ক (প্রকৃতি হইতে আত্মা যে ভিন্ন তদ্বিবয়ক) সম্যক দর্শন অর্থাৎ তবজ্ঞান সধক্ষে বলিতেছেন—স্বাবরজগদ্ব্যবস্থায় ভূতেষু নির্কিশেবং সজ্ঞপেণ সমভাবে অবস্থিত পরমাত্মাকে যিনি দর্শন করেন, অতএব তাহাদের বিনাশেও সেই পরমাত্মাকে যিনি অবিনাশী বলিয়া দেখেন তিনিই সম্যক দর্শী, অপরে নহে ॥ ২৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এইরূপে যখন সবভূতেতে সমান হইয়া গেল ও সকল ভূতেতেই স্থিররূপে আটকিয়ে থাকিল—সেই এক ব্রহ্ম পরমেশ্বর হৃদয়েতে অর্থাৎ কুটস্থে—বিনাশমান বস্তুর বিশেষরূপে নাশ হইবার অন্তে যে পরব্রহ্ম দেখিতেছে তাহার আর বিনাশ নাই—ইহা যে দেখিতেছে সেই দেখিতেছে।— সর্ববোধান্তসিদ্ধান্ত-সংগ্রহে আছে—

“এব প্রত্যক্ স্বপ্রকাশো নিরংশো-

হসদঃ শুদ্ধঃ সর্বদৈক্যতাবঃ ।

নিত্যাধগুণানন্দরূপো নিরীহঃ

সাকী চেতা কেবলো নিগুণশ্চ ॥”

এই আত্মা প্রকাশস্বরূপ, অংশবিহীন, সঙ্গবহিত, দোষশূন্য, সকল সময়ে একরূপ, সর্বদা অবগুণ আনন্দস্বরূপ, কিয়দূরবিস্তৃত, উদাসীন, জ্ঞানরূপ, কেবল এবং নিগুণ ।

কিন্তু এই যে এত ব্যক্তরূপ বাহার অস্ত নাই বলিলেই হয়, বাহা বাহ চক্ষে দেখিয়া এক মনে করাই অসম্ভব, সেই অসম্ভবও সম্ভব হয় কিয়দূর পাবাবস্থায়। এত যে বহুরূপ তাহার মধ্যে সেই একই যেন গুণ হইয়া আছে; স্বর্ণালঙ্কারের মধ্যে তাহার গঠনের নানাত্বই লোকে দেখিতেছে, জানে না সেই স্বর্ণেরই এই বহুরূপ, তাহার মধ্যে স্বর্ণ ছাড়া আর কিছুই নাই—সেই একই ভাবটা তখনই প্রকাশ হয় যখন কিয়দূর পর অবস্থায় বহুভাব প্রকটরূপে লীন হইয়া যায়, তখন মূলধার হইতে ব্রহ্মরূপ পর্যন্ত টান থাকে, তখন মন তন্নীন হয়, সে অবস্থায় অগ্নিকে মন যাইতে পারে না। ইহাই ভগবানের

“অবরুদ্ধ” রূপ। এইরূপে মন আটকাইয়া থাকিলে আর কিছু দেখা যায় না। অসুস্থিতে মন যেমন রুদ্ধ হয় ইহা সে ভাবের অবরোধ নহে। ইহা সম্পূর্ণ জাগ্রত ভাব, কিন্তু উহাতে মনের বিষয় দর্শন হয় না। মন থাকে না বলিয়াই যে বিষয় দর্শন হয় না তাহা নহে। অজ্ঞান হেতুই বিষয়-প্রপঞ্চ ব্যক্ত করে, অবরুদ্ধ অবস্থায় অজ্ঞান থাকে না, সুতরাং অজ্ঞান যে প্রপঞ্চের জননিত্তা অজ্ঞান না থাকায় সে প্রপঞ্চও থাকিতে পারে না। মনের কল্পনামত যেমন আকাশে কত রূপ দেখা যায়, কিন্তু কল্পনা নষ্ট হইলে কল্পিতরূপের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। সব রূপ যখন অরূপ সাগরে ডুবিয়া এক হইয়া যায় উহাই সমস্ত, উহাই ব্রহ্মপরমেশ্বরের রূপ। যাবতীয় জীবভূত কল্পিত হইয়া যখন মূর্তরূপে ব্যক্ত হয়—সেই ব্যক্ত মূর্তির অন্তরালে এই অমূর্তই বিরাজিত থাকেন। অমূর্তকে আশ্রয় করিয়াই অনন্তরূপময় জগৎ অস্তিত্বমান হইয়া থাকে। সমস্ত রূপ যখন আবার এই অব্যক্ত অরূপের মধ্যে আত্মগোপন করে, তখনও কিন্তু সেই সমস্ত ব্যক্ত ভাবের অধিষ্ঠানরূপ অব্যক্তভাব বিনষ্ট হয় না। সে অবস্থায় যে অস্ত্র কোন রত্নের অস্তিত্ব থাকে না তাহা চুলিকোপনিষদে বর্ণিত আছে—

“যস্মিন্ সৰ্ব্বমিদং প্রোক্তং ব্রহ্মস্বাবরুদ্ধমং ।

ত সন্নেব সয়ং যাস্তি বুদ্ধবুদ্ধা সাগরে যথা ॥”

ব্রহ্ম সৰ্ব্বব্যাপক, সেই সৰ্বব্যাপক ব্রহ্মেতেই এই স্বাবর-অবরুদ্ধ যেমন সাগরের তরঙ্গের মত উদ্ভিত হইয়াছে এবং তাহাতেই আবার লয় হইয়া যাইতেছে।

যেমন সমুদ্র হইতে বুদ্ধবুদ্ধের উৎপত্তি এবং তাহাতেই লয়, সেইরূপ ব্রহ্মসমুদ্র হইতে বুদ্ধবুদ্ধরূপ এই বিশ্ব চরচরের উৎপত্তি এবং ব্রহ্মব্রহ্মপেই আবার তাহা লয় হইয়া যাইতেছে। ব্রহ্মই প্রাণরূপে প্রবৃত্ত হইয়া দেহেন্দ্রিয়-মনরূপে পরিদৃষ্ট হইতেছেন, আবার ক্রিয়ার পর অবস্থায় প্রাণস্পন্দন রুদ্ধ হইলেই সমস্ত ব্যক্ত জগৎ ব্রহ্মে প্রবেশ করে, তখন জগৎ আর জগৎরূপে বর্তমান থাকে না, তাহাও ব্রহ্মময় হইয়া যায়। বুদ্ধবুদ্ধের উৎপত্তি, স্থিতি যেমন ক্ষণিক, বিশ্বের স্থিতিও তদ্রূপ ক্ষণিক। বুদ্ধবুদ্ধের প্রকাশ যেমন ক্ষণেকের জন্য, এইরূপ বিশ্বের প্রকাশও ক্ষণস্থায়ী মাত্র। মনের চঞ্চলাবস্থায় এই তুমি-আমি, সমুদ্র বিশ্বের জ্ঞান হয়, আবার ক্রিয়ার পর অবস্থায় মন স্থির হইলে সেই সমস্ত ক্ষণেকের খণ্ড-জ্ঞান পরাবস্থার জ্ঞান মধ্যে লুপ্ত হইয়া যায়। ব্রহ্মশক্তি যে প্রাণ, সেই প্রাণের স্পন্দনেই এই নামরূপময় জগৎ স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছে। সেইজন্য প্রাণ বাহাতে স্পন্দিত না হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে, প্রাণের স্পন্দন থাকিতে সংসার দর্শন নষ্ট হইবে না। অতএব সৰ্ব্বদা প্রাণের ক্রিয়া করিয়া প্রাণকে স্থির করিতে চেষ্টা কর, তখন আর এই ব্যক্তরূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হইবে না। যাহারা আত্মদর্শী যোগী তাহারা নিজেদের দেহের অভ্যন্তরে কূটস্থকে দর্শন করেন, এবং তন্মধ্যে এই পরমরূপময় জগৎও দর্শন করিয়া থাকেন। এই নামরূপময় দৃশ্যভাবও শেষে জ্যোতিষ্করূপে পরিণত হয়, এবং সেই জ্যোতিও পরাবস্থার মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। সেই পরাবস্থার আর বিনাশ নাই, ইহা যিনি যোগ-প্রভাবে জানেন তাহার জ্ঞানই সম্যক জ্ঞান ॥২৭

সমং পশ্যন্ হি সৰ্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্ ।

ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মনং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২৮

অশ্বর। হি (যেহেতু) সৰ্বত্র সমং (সৰ্বত্র সমান) সমবস্থিতম্ ঈশ্বরম্ (সমভাবে অবস্থিত ঈশ্বরকে) পশ্যন্ (দেখিয়া) আত্মনা (স্বীয় অবিচ্ছাদিত বুদ্ধি দ্বারা) আত্মনং (সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আত্মাকে) ন হিনস্তি (হিংসা করেন না অর্থাৎ আপনা হইতে অস্ত্র কিছু মনে করেন না) ততঃ (সেই হেতু) পরাং গতিম্ (পরমগতি) যাতি (প্রাপ্ত হন) ॥ ২৮

শ্রীধর। কৃত ইতি? অত আহ সমমিতি। সৰ্বত্র—ভূতমাত্র, সমং সম্যগপ্রচ্যুত রূপেণ অবস্থিতঃ পরমাত্মনং পশ্যন্ হি যথাং আত্মনং ন হিনস্তি—অবিচ্ছিন্না সচ্চিদানন্দ-রূপমাত্মনং ন বিনাশয়তি, ততশ্চ পরাং গতিং—মোক্শং আশ্রোতি। স্বঃ এবং ন পশ্যতি স হি দেহাত্মদর্শী, দেহেন সহ আত্মনং হিনস্তি। তথাচ প্রতিঃ—

“অস্বৰ্গ্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃত্তাঃ ।

তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥” ২৮ ॥

বল্লাভবাদ। [কেন যে তিনি সম্যকদর্শী তাহাই বলিতেছেন]—যিনি সৰ্বত্র অর্থাৎ ভূতমাত্র, পরমাত্মাকে অগ্রচ্যুতরূপে অবস্থিত দর্শন করেন তিনি আপনি আপনাকে (আত্মাকে) হিংসা করেন না। অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন হেতু সচ্চিদানন্দরূপ আত্মাকে (আরও করিয়া) বিনাশ করেন না; এবং তাহাতেই পরাগতি যে মোক্ষ তাহা তিনি প্রাপ্ত হন। যিনি একরূপ দেখেন না তিনি নিশ্চয়ই দেহাত্মদর্শী, দেহের বিনাশের সহিত আত্মাকেও বিনাশ করেন। [এইরূপ অবিবেকী ব্যক্তিরাই প্রকৃতপক্ষে আত্মহা]—প্রতি বলিতেছেন—“যে সকল ব্যক্তির আত্মহা হন তাহারা মৃত্যুর পর আলোকহীন, অন্ধকারাবৃত্ত যে সকল লোক (নিরয়াদি) তাহাতেই গমন করেন।” ২৮ ॥

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এইরূপ (সমান রূপ) সৰ্বত্র ব্রহ্ম সকলেতে স্থিতি যে দেখিতেছে—সে আত্মাকে আত্মাধারা নষ্ট না ক’রে, অর্থাৎ অস্ত্রদিকে দৃষ্টি না ক’রে ক্রিয়া করে যাহা গুরুবক্তৃগম্য, তাহার পর পরাগতি (অর্থাৎ স্থিতি ক্রিয়ার পর) লাভ করে।—পরমাত্মা সৰ্বভূতে একই ভাবে অবস্থিত—যাহারা আত্মাকে কূটস্থ দর্শন করেন তাহারা ইহা জানেন। বাহিরের রূপে বা গুণে জীবসমূহের ঐক্য না থাকিতে পারে কিন্তু যে আত্মতেজের প্রকাশ শক্তি দেহাদিরূপে ব্যক্ত হয়, সেই সকল শক্তির মূলই ঐ কূটস্থ জ্যোতিঃ। যদিও অনন্ত বস্তুতে তাহার অনন্ত প্রকাশ বর্তমান তথাপি কূটস্থ রূপ মূল উৎসের মধ্যে কোন বর্ণগত বা গুণগত ভেদ নাই। সে কূটস্থ সকলের মধ্যে একই রূপে বর্তমান। সেই কূটস্থ-আত্মার কোন কালে বিনাশ নাই। যাহারা কূটস্থকে দেখে না কূটস্থের তেজে বিকশিত বিশেষ বিশেষ দেহেন্দ্রিয়াদি-বৃক্ষ আকৃতি মাত্রকে দেখে, তাহারা আপনার বার বার জন্ম-মরণ দেখিয়া থাকে, অর্থাৎ দেহান্ত দ্বারা পৃথক পৃথক উপাধির বিনাশ দেখিতে পায়। যাহারা কূটস্থকেই দেখেন, তাহারা কোন পদার্থের বিনাশ বা জন্ম জানিতে পারেন না। প্রাণের চাক্ষু্য হইতেই মন, সেই মন স্থির হইলেই স্থির প্রাণের সন্ধান পাওয়া

যায়। মন সঙ্কল্প-বিকল্পহীন হইয়া স্থির হইলে তখন আর তাহা মন নহে—তাহা স্থির প্রাণ, সেই স্থির প্রাণই আত্মা। প্রাণের উর্দ্ধগতি হইলে আত্মাচক্রে যে তাহার স্থিতি হয়, সেই স্থিতির অবস্থাকেই আত্মা বলে, ইহা নিজ বোধরূপ, সিদ্ধিয়া বা বলিয়া বুঝাইবার নহে। আত্মাচক্রে প্রাণ স্থির হইলে মনের লয় হয়—তখন এক আত্মসত্তা ব্যতীত আর কোন উপাধি বর্তমান থাকে না। এই অন্নস্থায় সব সমান হইয়া যায়, এই অন্ন ইহাকে “নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম” বলা হইয়াছে। এই যে সমতারূপ আত্মা—ইহাকে কেহই হিংসা বা মাশ করিতে পারে না। যিনি বিষয়রূপ বিষয়ের মস্তকে চরণ রাখিয়া পরমানন্দে বংশী শাঝাইতেছেন সেই সমতা রূপ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রভু গোবিন্দকে যে দর্শন না করে সে আত্মার অনিন্দ্য ভাব বুঝিবে কিরূপে? তাহাদের জ্ঞান অজানাত, শুধু দেহ-সংসার হইয়াই চিরকাল থাকে। দেহে আবেশিত আত্মবোধ হেতু প্রতি দেহ গ্রহণ ও ত্যাগের সময় তাহারা আত্মাকে অনুমরণধর্মী বলিয়া মনে করে ও শোকগ্রস্ত হয়। ইহারা এই প্রকৃতপক্ষে “আত্মহা”। বাহারা প্রাণের চাক্ষুশ্য এবং তজ্জনিত মনের বিক্ষেপ ধামাইতে না পারে তাহারা এই নিত্য নির্বিকার অদ্বিতীয় বিশ্বের আত্মায় নানাব্য কল্পনা করে এবং দেহদৃষ্টি-যুক্ত হইয়া অনুমৃত্যুর বিভীষিকা দর্শন করে। আত্মার স্বরূপ অবগত না হইলে জীবকে এইরূপ ঘোর নরক বাতনাই ভোগ করিতে হয়—এইরূপ আত্মহনন ব্যাপার অজানাত জীবের মধ্যে সর্বদাই চলিতেছে। তাই আমাদের দুঃখের অবধি নাই, জন্ম মরণ-ক্লেশেরও আর অন্ত নাই। হায় জীব, কবে তোমার সে সৌভাগ্যের উদয় হইবে? কবে তুমি শ্রীগুরুদেবে আত্মদর্শন করিতে সমর্থ হইয়া এই জন্ম-মরণ-নাট্যাভিনয়ের পরিসমাপ্তি দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইবে? বেদ জীবকে তাই প্রবুদ্ধ করিতেছেন “উত্তীৰ্ণত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত”—একবার সেই আত্মদর্শী মুক্তাত্মার চরণ-ধূলিতে অভিষিক্ত হইয়া, হে জীব, জাগিয়া উঠ, জাগিয়া উঠিয়া আপনাকে আপনি চিনিয়া লও। অবিচার বশে পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গযোনিতে জন্ম লাভ করিয়া আপনাকে আপনি জানিবার সুযোগ লাভ করিতে পার নাই, এইবার মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়াছে; ওগো! এইবার আত্মাহুসন্ধান করিয়া দেখ দেখি! এই সুযোগ কিন্তু আর হারাইও না। মনুষ্য দেহ পাওয়াও তত কঠিন নহে, অতিশয় সুদুর্লভ হইতেছে মনুষ্য দেহ পাইয়া আত্মাহুসন্ধান সচেষ্ট হওয়া। যে এই আত্মজ্ঞান লাভ করিতে না পারে, তাহার গর্ববাস ও দেহ-ধারণের ক্লেশ-স্বীকার মাত্রই সার হয়। মনুষ্য দেহ পাইয়া কেবল পশুদের মত ইন্দ্রিয়-সুখে উন্মত্ত হইয়া থাকিলে আর কি হইল? হে জীব! একবার উদ্বুদ্ধ হও, একবার জাগিয়া তোমার স্বরূপ সন্ধান কর, তুমি নিজে কে? দেখ; তোমার সর্বশ্রম যে আত্মা সেই আত্মার প্রতি মনোযোগী হইয়া ভাব্যব উত্তীর্ণ হইবার জন্ত শ্রীগুরু চরণপদ্ম আশ্রয় কর। দেখ শ্রীমদ্ভগবতে কি বলিতেছেন—

“বৃহৎসংসারং সুদুর্লভং
প্রবং স্কল্পং গুরুকণ্ঠধারম্।
ময়াহুসুলেন নভস্বতেরিতং

পুমান্ ভবাঙ্কি ন তবৈং স আত্মহা” ভাঃ, ১১ শ্লোক।

প্রকৃতিৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ।

যঃ পশ্যতি তথা আত্মানমকর্তারং স পশ্যতি ॥ ২৯

দুর্লভ এই মনুষ্য দেহ। কর্তৃকর্ম্মিত দেহ প্রাপ্তি কথঞ্চিৎ সুদুর্লভ হইলেও যে মনুষ্যদেহ ভগবদহুসন্ধান ব্যাপ্ত হইবে, সে রূপ দেহ লাভ করা যে বড় কঠিন। কারণ মনুষ্য দেহ পাইয়া লোকে দেহেন্দ্রিয়-সুখ লইয়াই উন্মত্ত হয় এবং কামিনী-কাকন-ভোগে অমুরক্ত হয়, এবং তাহার ফল-স্বরূপ কত অধম যোনি প্রাপ্ত হয় তাহার নীমা সংখ্যা নাই। প্রজ্ঞানও বলিয়াছেন, “দুর্লভং মানুষং জন্ম, তদপ্যত্র বর্ম্মধম্”। মানুষ হওয়া তো দুর্লভই, বাহাতে ভগবৎ প্রাপ্তি হয় সেইরূপ অনুলাভ তদপেক্ষা দুর্লভ। এই মনুষ্য দেহ রূপ নৌকার সাংসার্যেই জীব ভবসিন্ধু উত্তীর্ণ হয়। এই দেহতরীর কর্ণধার শ্রীগুরুদেব। গুরুরূপ লাভ করিয়া যে আত্মাকে স্বরণ করিয়া থাকে, তাহার তরী অশুকল বায়ু প্রাপ্ত হইয়া শীঘ্র শীঘ্র লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিয়া যায়। যে ব্যক্তি এই অপূর্ণ দেহতরী পাইয়া এবং তাহার প্রকৃত কাণ্ডারী লাভ করিয়াও আত্মদর্শনে বঞ্চিত থাকে, স্তব্ধাঃ সংসারসমুদ্রে উত্তীর্ণ হইতে পারে না, সে একতাই আত্মবাতী। এ জগতে যেখি সকলেই আপনাকে আপনি আঘাত করে ও সকলেই আপনাকে আপনি নষ্ট করিতে সতত উত্তোষযুক্ত। কেবল তাহারা আপনাকে আপনি-রক্ষা করে বাহারা গুরুদেব মত সাধনাভ্যাসে রত থাকে, আত্মা অন্ধদিকে দৃষ্টি করে না। এই সকল উত্তম সুচতুর সাধকেদ্রগণই পরাগতি যে মোক্ষ তাহাই লাভ করেন; ক্রিয়া মন দিয়া করিলেই ক্রিয়ার পর অবস্থা রূপ স্থিতি ক্রিয়াবানের অমুভব করিতে পারেন, এবং এই স্থিতি যে অমুভব করিতে পারিয়াছে সে সকলের মধ্যেই এই স্থির অবিচল রামকে দেখিতে পাইয়া বুঝিতে পারে যে সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত এই আত্মা কাহাকেও হনন করেন না। কারণ “অমিই” আত্মারূপে সকলের মধ্যে বহিয়াছেন। কেহ তো নিজেই নিজে হনন করে না। আত্মার এইরূপ অবিনশ্বর ও একত্ব বুঝিলেই উহার যথার্থ ফল যে মোক্ষ তাহাই লাভ হইয়া থাকে। বাহারা আত্মদৃষ্টিসম্পন্ন নহে তাহারা দেহের মৃত্যুকেই মৃত্যু মনে করিয়া বার বার মরণ-পাশে আবদ্ধ হয় ॥ ২৮

অন্থম্। যঃ চ (আর যিনি) কর্ম্মাণি (সমস্ত কার্য্যই) প্রকৃত্যা এব (প্রকৃতির দ্বারা) সর্বশঃ (সর্ব প্রকারে) ক্রিয়মাণানি (সাধিত হইতেছে) তথা (এবং) আত্মানম্ (আত্মাকে) অকর্তারং (অকর্তা বলিয়া) পশ্যতি (দেখেন) সঃ পশ্যতি (তিনিই যথার্থতঃ দর্শন করেন) ॥ ২৯

শ্রীধর। নহু শুভাশুভকর্ম্মকর্তৃভেদে বৈষম্যে দৃশ্যমানে কথম্ আত্মনঃ সমত্বম্ ইত্যশঙ্ক্যাহ—প্রকৃতিৈবৈতি। প্রকৃতিৈব—দেহেন্দ্রিয়াকারেণ পরিণতয়া; সর্বশঃ—সর্বৈঃ প্রকারৈঃ; ক্রিয়মাণানি কর্ম্মাণি যঃ পশ্যতি, তথা আত্মানং চ অকর্তারং—দেহাতিমানেনৈব আত্মনঃ কর্তৃৎ, ন স্বতঃ; ইতৈব যঃ পশ্যতি স এব সম্যক্ পশ্যতি; নাত ইত্যর্থঃ ॥ ২৯

বঙ্গানুবাদ। [যদি বল শুভাশুভ কর্ম্মের কর্তৃৎদেহে আত্মার বৈষম্যই দেখা যায়, অতএব আত্মার সমত্ব কিরূপে হয়? এই প্রশ্নের বলিতেছেন]—দেহেন্দ্রিয়াকারে পরিণত

প্রকৃতির দ্বারা সর্বপ্রকারে কর্মসমূহ সম্পাদিত হইতেছে যিনি দেখেন, সেইরূপ আত্মাকেও যিনি অকর্তা বলিয়া দেখেন—(দেহাভিমান বশতঃ আত্মার কর্তৃত্ব, কিন্তু স্বতঃ কর্তৃত্ব নাই) —এইরূপ যিনি দর্শন করেন তিনিই সম্যক দর্শন করেন, অন্তে নহে ॥ ২২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—প্রকৃতির গুণের দ্বারায় সমুদয় কর্ম করে কিন্তু আত্মাতে দৃষ্টি রেখে—সুতরাং সে অকর্তা—ব্রহ্মোক্তে সর্বদা থাকে।—এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীমদাচার্য্য শঙ্করের ভাষ্য এইরূপ—“সর্বভূতস্বামীশং সমং পশুন্ ন হিনস্তি আত্মনা আত্মানমি-
ত্বাং তদ্বশুপপন্নং স্বগুণকর্মবৈলক্ষণ্যভেদভিঃসু আত্মসু ইত্যোক্তদ্ব্যর্থক্যাং—প্রকৃত্যা প্রকৃতি-
ভগবতো মায়া ত্রিগুণা আত্মা, ‘মায়াং তু প্রকৃতিং বিভাগ্যং’ ইতি মন্ত্রবর্ণ্যং, তয়া প্রকৃতিভাব চ
নাশ্চেন মহাদ্বিধিকার্য্যকারণ্যকারপরিণতয়া ভাগ্যেব কর্ম্মণি বাঙ্মনঃকায়ারভ্যাপি ক্রিয়মাণানি
নির্কর্তৃমানানি সর্বশঃ সর্বপ্রকারৈঃ বঃ পশ্যতি উপলভ্যেত তথা আত্মানং ক্ষেত্রজমকর্তারং
সর্বোপাধিবিবজ্জিতং পশ্যতি স পরমার্থদর্শীভ্যুদ্ভিপ্রায়ঃ। নিগুণত্বকর্তৃনির্কিংশেষত্ব
আকাশস্তেব ভেদে প্রমাণাহুপপত্তিরিত্যর্থঃ” —সর্বভূতে অধিষ্ঠিত পরমেশ্বরকে সর্বত্র সমভাবে
যে দেখিয়া থাকে, সে আত্মাকে আত্মাধারা হিংসা করে না, ইহা বলা হইয়াছে। এক্ষণে এই
প্রকার শব্দ হইতে পারে যে—এই যে কথা বলা হইল, ইহা প্রমাণবিরুদ্ধ, কারণ জীবের গুণ
ও কর্মের বৈলক্ষণ্য দেখিয়া ইহাই প্রমাণিত হইয়া থাকে যে, দেহভেদে আত্মাও ভিন্ন ভিন্ন
[সকল ভূতে এই আত্মা সমভাবে থাকিতে পারে না, তাহাই যদি হইত তবে কেহ সুখী কেহ
বা দুঃখী, কেহ জ্ঞানী, কেহ বা অজ্ঞ, এই প্রকার জীবগণের মধ্যে ব্যবস্থা হইতে পারিত না]।
এই প্রকার শব্দার নিরাকরণ করিবার জন্য বলিতেছেন যে, প্রকৃতি শব্দের অর্থ ভগবানের
মায়া; সেই মায়া ত্রিগুণা আত্মা; প্রকৃতিভেদ আছে যে “মায়াতে প্রকৃতি বলিয়া জানিবে”।
মহত্ত্ব প্রভৃতি কার্য্য ও কারণরূপে পরিণত প্রকৃতিই কর্ম করিয়া থাকে, প্রকৃতি ব্যতিরেকে
অন্ত কেহ কর্তা হইতে পারে না। ঐ সকল কর্মও তিন প্রকার—ভাটিক, মানসিক এবং
কায়িক। সর্ব প্রকারে প্রকৃতিই সকল প্রকার কার্য্য করিয়া থাকে; আত্মা ক্ষেত্রজ কর্তা নহে;
কারণ আত্মা সর্বপ্রকার উপাধিবজ্জিত। এই প্রকারে প্রকৃতি ও আত্মার স্বরূপ যে দেখিয়া
থাকে, সেই পরমার্থদর্শী—ইহাই তাৎপর্য্য। যাহা নিগুণ সুতরাং অকর্তা সেই আকাশের স্থায়
নির্কিংশেষ ও নিরূপাধি আত্মা যে প্রতি দেহে ভিন্ন, সে বিষয়ে কোন প্রকার প্রমাণ দেখিতে
পাওয়া যায় না।—আত্মা প্রতি দেহে ভিন্ন নয়, এবং আত্মা অকর্তা, ইহা শাস্ত্র ও আচার্য্য মুখে
শুনিতেছি বটে, কিন্তু ইহা কি বুঝিয়াছি বলিতে পারি? বরং দৃশ্যমান জগতে বৈবম্যই
রহিয়াছে দেখা যায়। যদি বল আত্মা কর্তা নহে, প্রকৃতির দ্বারা এই সকল কার্য্য সম্পাদিত
হয়, তাহাতে আত্মাকে অকর্তা সাধন হইল বটে, কিন্তু প্রকৃতি আসিল কোথা হইতে? এবং
প্রকৃতির পরিণাম অন্তঃকরণে যে আত্মার অধ্যাস হয় এবং অধ্যাস বশতঃ আত্মাতে
যে কর্তৃত্ব কল্পিত হয়, সেই অধ্যাস সম্ভব হয় কিরূপে? আত্মার অকর্তৃত্ব স্বীকার
করিলেও প্রকৃতির অন্তিম অধীকার করা সম্ভব নহে। কারণ দুটির সংযোগই প্রয়োজন;
তখন জগতে দুইটি পৃথক্ পৃথক্ মূলতত্ত্ব রহিয়াছে বলিতে হয়, এবং তাহাদের পরস্পর
অধ্যাসই এই জগৎ জীবরূপে যে পরিণাম তাহা কি করিয়া অধীকার করা যায়? আত্মাকে

সকলের অধিষ্ঠানভূত ও স্বতন্ত্র বলিয়া স্বীকার করিলেও—“সকল” ভো থাকিয়া বাইতেছে,
সুতরাং দৃশ্যমান প্রকৃতিকেও উড়াইয়া দেওয়া যায় না। যদি প্রকৃতিকে তাঁহারই শক্তি
বল, তবে ভগবান্কে বা আত্মাকে অকর্তা বলা হয় কিরূপে? আমার শক্তির মধ্যে আমিই
আছি, সেইরূপ ভগবৎশক্তির মধ্যে ভগবান্ই বিদ্যমান রহিয়াছেন। এই সব নানা শব্দ
উদয় হয়।

বাস্তবিক অচিন্ত্যশক্তি ভগবানের নানাবিধ ঐশ্বর্য্য বা শক্তি রহিয়াছে। সেই ঐশ্বর্য্য
বশতঃ কখনও তাঁহাকে নিগুণ নিরূপাধিক এবং কখনও সগুণ সোপাধিক বলিয়া দেখা
যায়। সুতরাং উভয়ের সত্যতা অধীকার করা যায় না। তাই তিনি অকর্তা হইয়াও
কর্তা। অবশ্য এ কথা সত্য যে তিনি নিগুণ, নির্কিংশার ও সর্বোপাধি-বজ্জিত হইয়াও
এবং নিত্য নিগুণ অবস্থায় অবস্থিত হইয়াও তিনি সগুণ অর্বাং জীব, ঈশ্বর ও জগৎরূপে
প্রকাশ পাইতেছেন তাহা কিছুতেই অধীকার করিবার উপায় নাই। বরং এই কথা বলাই
সম্ভব যে তিনি নিগুণ ও সগুণ উভয়ই। নিগুণ আত্মা প্রকৃতি-যুক্ত হইয়া সগুণ হন।
এই প্রকৃতিও কোন ভিন্ন সত্তা নহে, এই প্রকৃতি ভগবানের নিম্নশক্তি বা মহিমা। ইহাকেই
ব্রহ্মের অবটন-বটন-পটীয়া মায়া বলে। ভগবানেরও যেমন অন্ত নাই, তাঁহার মায়াও
তরুণ অন্ত নাই। প্রকৃতিকে কেহ কেহ জড় বলিয়া থাকেন কিন্তু তিনি কাঠ-পাথরের মত
জড় নহেন, তিনিও আত্মার দৃশ্য পদার্থ বলিয়া তাঁহাকে জড় বলা হয়। প্রকৃতি ও আত্মা
অবিভাক্তে সম্মিলিত। উভয়ই ঈশ্বর বা ঈশ্বরী। এখন প্রশ্ন হয়—যিনি এক অদ্বিতীয় শ্রুতি
বলিতেছেন—তিনি দুই বা বহু হন কিরূপে? ইহাই তাঁহার অনিচ্ছার ইচ্ছা—ইহা কিরূপে
হয়, কেন হয় বলা যায় না। ভগবানের বিকল্প নাই, বাসনা নাই, তবুও বহন তাঁহার
আপনাকে আপনি দেখিতে ইচ্ছা হয় যেমন দর্পণে আমরা মুখ দেখি, তখন তিনি নিজ
মায়াতে প্রকাশ করিয়া আপনাকে তিনি বহুরূপে প্রকাশ করিয়া থাকেন। এক অদ্বিতীয়
হইলেও আপনাকে বহুরূপে প্রকাশ করিবার তাঁহার সামর্থ্য আছে, সেই সামর্থ্যই তাঁহার
শক্তি বা মায়া। এই মায়া-মিলিত হইয়াই তিনি বহু হইয়া থাকেন, এবং বহু হইয়া অর্ডক
যেমন নিজ প্রতিবিম্বের সহিত খেলা করে তিনিও তরুণ নিজ প্রতিবিম্বের সহিত খেলা
করেন। এ খেলা খেলিবার সময়ও তিনি স্বরূপ হইতে কখনও বিচ্যুত হন না। তাঁহার এই
মায়া-স্বত্ব ক্রীড়নকগুলিও কোন পৃথক্ বস্তু নহে, ইহার তাহারই শক্তি মাত্র। যখন এই
ক্রীড়নকগুলি মায়া চক্রে মধ্যে পৃথক্ রূপে খেলিতে থাকে তখনই তাহাদিগকে বহু মনে
হয় এবং তাহারা ব্রহ্ম হইতে ভিন্নবৎ প্রতীত হইয়া থাকে। এই ক্রীড়নকগুলি যখন মায়াভেদ
করিয়া স্বকল্পে উপনীত হয়, যেমন জল-বিধ জলে মিলিয়া যায় উহারও তরুণ ব্রহ্ম-দেহে
মিলিয়া যায়। জীব-বিষের এই অবস্থা প্রাপ্তিকেই তাহার মুক্তি বলে।

এই মায়া অস্ত কিছু বস্তু নহে, ইহা তাঁহার স্বশক্তি। ঋষিরা সেই মূল কেন্দ্রকে পিতা এবং
তাঁহার অচিন্ত্য শক্তি বাহা জগতের উৎপত্তির হেতু তাঁহাকে তাঁহার বিখ্যজননী বলিয়া
সম্বোধন করিয়াছেন। ঋষিদের এক সম্প্রদায় নিগুণ ব্রহ্ম ভাবকে ছাড়িয়া এই ব্রহ্মশক্তিকে
সগুণ ভাবকেই পূজা করিয়াছেন এবং তাঁহাকেই বিষের আদি জননী বলিয়া তাঁহাকে

পরমেশ্বরী রূপে চিন্তা করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন। ইহাও বড় সুন্দর ভাব। মা যেন নানা সাজে সাজিয়া কখনও বিশ্বরূপে কখনও জীবরূপে কখনও জীবের মোক্ষদাত্রী হইয়া আত্ম প্রকাশ করিতেছেন। দেবতা, জীব সকলেই তাঁহার খেলায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার দিকে অমিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে।

তিনি কার্যরূপে বিশ্ব আবার কারণ রূপে নিরাকারী, বিখ্যাতীতা, অকপিণী হইয়াও জীবের সম্ভাপ হরণ করিতেছেন এবং উপযুক্ত পাত্রকে যুক্তি দানের দ্রষ্টা সঙ্গী উদ্যুক্ত হইয়া আছেন। শিবও যেমন বুদ্ধির অগম্য মাও তজপ বুদ্ধির অগম্য, তাই দেবীমাহাত্ম্যে ঋষিরা স্তব করিতেছেন—

“হেতুঃ সমস্তজগতাং ত্রিগুণাপি দোষৈঃ

ন জায়সে হরিহরাদিত্তিরপ্যাপার।।

সর্বপ্রাণাখিলমিদং জগদংশভূত-

মব্যাকৃত্য হি পরমা প্রকৃতিশ্চমায়া ॥”

‘হে দেবি, তুমি সমস্ত জগতের মূল কারণ, যেহেতু তুমি ত্রিগুণময়ী, তাই রজোগুণে জগৎসৃষ্টি কর, সত্ত্বগুণে জগৎ পালন কর, আবার তমোগুণে জগৎ সংহার করিতেছ—সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমিই একমাত্র হেতু। জগতের সব বস্তু তোমারই প্রকাশ, তথাপি তুমি রাগদেবাদি দোষযুক্ত জীবের জ্ঞেয় নহ। হরিহরাদিও তোমাকে জানিতে পারেন না, তুমি যে অন্তরহিত। তুমি সকলের আশ্রয়কণা সর্বব্যাপিনী, তাই এ অখিল ব্রহ্মাণ্ড তোমারই অংশভূতা। প্রকৃতি পৃথক্ পৃথক্ দৃশ্যবস্তুরূপে অবিচ্ছিন্ন হইলেও তুমি ষড়বিধবিকারশূন্য আত্ম প্রকৃতি।’

সুতরাং জগতে যত কিছু কার্য্য হইতেছে, তাহা সমস্তই প্রকৃতির। ব্রহ্মের মধ্যে যে কার্য্যরূপা ভাব বা শক্তি তাহাই প্রকৃতি, তাহাই আত্মার ক্রিয়াশক্তি—বাহ্য প্রকাশ বা শরীর গ্রহণ। এই ক্রিয়াশক্তি আত্মকেন্দ্রে হইতে সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া জগদ্বাদিরূপে পরিণত হয়, আবার এই ক্রিয়াশক্তি সম্বলিত হইয়া যখন কেন্দ্রে মধ্যে লীন হয়, তখন তাহা অব্যাকৃত, জগদ্বাদিরূপে পরিণাম তখন নাই। প্রথমে এই শক্তি আত্মাতে অবিভাবাবে সম্মিলিত থাকে, পরে তাঁহার নিজেকে নিজে দেখিবার ইচ্ছা হইলেই তাঁহার স্বশক্তি বাহ্য তাঁহাতেই সুপ্ত থাকে তাহার সুরণ আরম্ভ হয়। এই “একোহং বহুস্যাম্” সঙ্কল্প। সুরণের প্রথমাবস্থাতেও এই শক্তি অব্যক্ত, তখনও আপনাতে আপনি, কেবল জীব একটু ব্যঞ্জনযুক্ত, শক্তি ও শক্তিমান তখনও অভেদ। পরে শক্তি ও শক্তিমান দ্বন্দ্বমিথুন অথচ যুগল—এইরূপে ব্যক্ত হ’ন। তখনও তাঁহার আত্মরূপেই অবস্থিত। পরে শক্তি যত সৃষ্টির দিকে উন্মুখ হয় তখন শক্তি ও শক্তিমান যেন পৃথক্ ভাবে উপলব্ধ হইতে থাকে, এই অবস্থায় তাঁহার পদস্পর্শে একটু পৃথক্ ভাবে প্রকাশিত হইলেও পরস্পর হইতে তখনও বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকেন না। তাই “চিৎ” যতই শক্তি (প্রকাশ) রূপে পৃথক্ হইতে থাকেন ততই শক্তি মধ্যে চিহ্নভাসরূপে তিনি আপনাকে আপনি প্রকাশ করিতে থাকেন। বহির্দৃষ্টিতে শক্তিকে যতই দেহাদি স্থলরূপে পরিণত হইতে দেখা যায় ততই সেই সকল স্থলরূপের মধ্যে চৈতন্য বিধ প্রজ্জলিত হইয়া উঠে।

এইরূপে প্রথমে প্রাণশক্তিরূপে, পরে মন-ইন্দ্রিয়-দেহাদিরূপে সেই স্বক্স্মান স্বক্স্মতর আত্মশক্তি যেন স্থূল হইতে স্থূলতর রূপ ধারণ করেন। বায়ু যেমন জল হয়, জল যেমন বরফ হয়, সেইরূপ স্বক্স্ম প্রাণশক্তি, মন, ইন্দ্রিয় ও দেহরূপে ব্যক্ত হইতে থাকে। আত্মা যখন প্রাণরূপে ব্যক্ত হন, তখন ঐ প্রাণকেই তাঁহার প্রকৃতি বলে। তাঁহার মধ্যে বিচিত্র জগৎ নির্মাণ শক্তি যতই বর্তমান থাকে। সেই প্রাণরূপা আত্মা-প্রকৃতির মধ্যে আত্মচৈতন্য সঙ্গীকাল ঝলমল করিতে থাকে। এই প্রাণের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই আত্মা ও প্রাণ যেন পৃথক্ পৃথক্ বস্তু এইরূপ ভাবের খেলা আরম্ভ হয়। এই খেলাকেই মায়ার খেলা বলে। ইহাতে বহু বিচিত্র ভাবের সুরণ আরম্ভ হয়। এই প্রাণশক্তির সহিত আত্মার নিত্য নিষ্ঠুর্ণভাব যতঃ সম্মিলিত। প্রাণের বিচিত্র নির্মাণ শক্তির সুরণের সহিত তাঁহার যেন নিজ সৃষ্ট বাহ্য জগতের সহিত মিলিত হইবার একটা প্রবল আকর্ষণ তন্মধ্যে দেখা যায়। ইহাই প্রাণের কম্পন বা প্রাণ-তরঙ্গের উচ্ছ্বাস। তাহার ফলে মায়োপহিত চৈতন্য অহংকে মনোরূপে বাহ্য ব্যাপারে লিপ্ত হইতে দেখা যায়। নিষ্ঠুর্ণ পুরুষ হইতে এই মায়ামেশেরই পৃথক্ জীব উপাধি হইয়া থাকে। এই প্রকৃতি যেন পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র। ইহা যে বাস্তবিক পৃথক্ তাহা নহে, কিন্তু তবুও যে পার্থক্য দেখায় সেটুকুও যাহাতে না থাকে এইজন্য, প্রকৃতি-পুরুষের মধ্যে একটি বিষম আকর্ষণ লক্ষিত হয়। সেই আকর্ষণের বেগই জীবকে পরমাত্মার সহিত মিলিত হইবার দ্রষ্টব্য দ্বাৰাঘাত করে। জগদ্বাদি ভোগ্যবস্তু ও ভোক্তা মন প্রাণশক্তিরই পরিণাম। এ সময় প্রাণের অবস্থা চকল বিক্ষেপময়। উহা যখন নিজ কেন্দ্রে মূখ্য-প্রাণের সহিত মিলিত হইবার দ্রষ্টব্য বেগযুক্ত হয় তখন প্রাণের পরিণাম দেহেই মন প্রকৃতিও সমস্তই কেন্দ্রমুখী হইতে থাকে। ক্রমে সর্বত্রাবস্থিত প্রাণশক্তি গুটাইয়া একেজ্রে সম্মিলিত হয়। এই সম্মেলনের উপায় প্রাণের দ্বারা প্রাণকে বর্ষণ। ইহাও এক প্রকারের হবন ক্রিয়া। দ্রষ্টার প্রতি পরমাণুতে অবস্থিত যত যেমন মননের দ্বারা একীভূত হইয়া ভাসিয়া উঠে, কাঠঘর সংঘর্ষণ দ্বারা যেমন তাম্রাঙ্ক অগ্নি জ্বলিয়া উঠে তজপ প্রাণের মনন দ্বারা প্রকৃতিমধ্যগত আত্মজ্যোতিঃ দেহেই প্রাণ হইতে পৃথক্ হইয়া প্রকাশিত হইতে থাকে। প্রকৃতিরূপ সলিলের মধ্যে যেন স্বর্ণকমল ঝলমল করিয়া উঠে। ইহাই কারণার্ণবশায়ী বা ক্ষীরোদশায়ী ভগবৎরূপ। ইহাই প্রকৃতি-মধ্যগত পুরুষ অথবা রাধাবক্ষবিহারী ক্রীড়ক। জড় চেতনরূপ পুরুষ প্রকৃতির ইহাই যুগল-ভাবে সংবদ্ধ ভাব। পরে এই যুগল-ভাবের যুগ্মবোধও লয় হইয়া এক অখণ্ডাকার মহাভাব বা পরাবস্থারূপে বর্তমান থাকে। চরাচর ব্রহ্মাণ্ড এবং নিদ্রের ব্যক্তিত্ব সমস্তই একের সহিত মিলিয়া এক হইয়া যায়। ‘সদেব আসৌং’ যে ‘একমেবাদ্বিতীয়ং’ অগ্রে বর্তমান ছিল পরেও এই নানাস্থের বিচিত্রভাব সব মিলিয়া গিয়া এক অদ্বিতীয় হইয়া দাঁড়ায়। মধ্যের এই নানাস্থ মায়ার খেলা মাত্র—প্রকৃত নানাশ্রু নাই। এই পুনর্মিলনের নামই সমতা, ইহা সমাধিভাব-গম্য। ইহারাই এইরূপ সমতা লাভ করিয়াছেন সেই সকল সাধকেজ্জন্মের দেহান্তের পর আর তাঁহাদের স্থলদেহ উৎপন্ন হয় না। কারণ যে স্বক্স্ম শরীরকে অবলম্বন করিয়া স্থূল শরীর রচিত হয়, জ্ঞান প্রাপ্তির পর তাঁহাদের সেই স্বক্স্মশরীরও স্থূলদেহের পতনের সহিত চির নির্বাপিত হইয়া যায়। যতক্ষণ তাঁহাদের স্থূলদেহ থাকে ততক্ষণ প্রকৃতি তাঁহাদের সর্বপ্রকারে পরিচর্যা

যদা ভূতপৃথগ্ ভাবমেকস্মিনুপশ্যতি ।

তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্বতে তদা ॥ ৩০

করেন, তাঁহাদের অভিমান বিলীন হওয়ায় আর প্রকৃতির কার্য স্বথঃস্বাধিতে তাঁহাদের আসক্তি বোধ থাকে না, সুতরাং আত্মমগ্ন এই সকল পুরুষেরা সৰ্বদা ব্রাহ্মীস্থিতিতে বর্তমান থাকায় এবং নিরহঙ্কার বশতঃ প্রকৃতির কার্যে তাঁহাদের কর্তৃত্ব বোধ চিরদিনের মত অন্তর্হিত হওয়ায় অকর্তৃকল্পে তাঁহারা প্রকৃতির কার্যাবলী-দ্রষ্টারূপে উদাসীনের ছায় দেখিতে থাকেন মাত্র ॥ ২৯

— — —

অর্থঃ । যদা (যখন) ভূতপৃথগ্ ভাবম্ (ভূতসমূহের পৃথক্ পৃথক্ ভাব অর্থাৎ নানাত্ব) একস্মিন্ (এক আত্মাতে স্থিত), ততঃ এব চ (এবং উহা হইতেই) বিস্তারং (নানাত্বের অভিব্যক্তি বা বিস্তার (অনুপপ্রতি) দর্শন করেন), তদা (তখনই) ব্রহ্ম সম্পদ্বতে (ব্রহ্মতাব প্রাপ্ত হন) ॥ ৩০

শ্রীধর । ইহানীং ভূ ভূতানাং, প্রকৃতিতাবন্মাত্রেন অভেদাৎ ভূতভেদরূপমপি আত্মনঃ ভেদম্ অপশ্যন্ ব্রহ্মম্ উটপাত ইত্যাহ—যদেতি । যদা ভূতানাং—স্বাবরজ্জন্মানাং, পৃথগ্-ভাবং—ভেদম্ পৃথক্ভবম্, একস্মিন্—একাত্মমেব দৈবরশক্তিরূপায়াং প্রকৃতেঃ প্রলয়ে স্থিতম্, অনুপপ্রতি—আলোচয়তি । তত এব তত্শা এব প্রকৃতেঃ সকাশাৎ ভূতানাং বিস্তারং সৃষ্টিসময়ে অনুপপ্রতি । তদা প্রকৃতি তাবন্মাত্রেন ভূতানামপি অভেদং পশ্যন্ পরিপূর্ণং ব্রহ্ম সম্পদ্বতে—ব্রহ্মৈব ভবতি ইত্যর্থঃ ॥ ৩০

বঙ্গানুবাদ । [এখন দেখ ভূতগণও স্বকারণ প্রকৃতি হইতে অতির বলিয়া ভূতভেদ-বশতঃ আত্মার যে ভেদ তাহাও যিনি না দেখেন তিনি ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন, এতদ্বর্থে বলিতেছেন]—যখন স্বাবরজ্জন্মাদি ভূতগণের পৃথক্ ভাবগুলিকে একস্থ বলিয়া অর্থাৎ একমাত্র দৈবর শক্তিরূপা প্রকৃতিতে প্রলয়কালে অবস্থিত বলিয়া যিনি আলোচনা করেন, অতএব সৃষ্টি-কালেও সেই প্রকৃতি হইতে ভূতগণের আবার বিস্তার বা বিকাশ পর্যালোচনা করেন, তখন প্রকৃতি তাবন্মাত্র অর্থাৎ সব প্রকৃতিতে পর্যাবসিত হওয়ায় সমস্তই এক—এইরূপ অভেদ দর্শন করেন, তিনি ব্রহ্মই হইয়া যান । [প্রকৃতি ব্রহ্মশক্তি বলিয়া ব্রহ্মের সহিত অভেদ, এবং সবভূত প্রলয়কালে প্রকৃতিরূপতা প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃতির সহিত অভেদ, সুতরাং ব্রহ্মের সহিত অভেদ—এইরূপ অভেদদর্শী পুরুষেরাই ব্রহ্মরূপ হইয়া যান] ॥ ৩০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—পৃথক্ পৃথক্ ভূতকে যখন সব এক ব্রহ্মজ্ঞান হইল, এবং সেই এক ব্রহ্মের অণুর মধ্যে সকলই থাকিলেন, অতএব এই যে বিস্তার সংসার তখন সমুদয় ব্রহ্ম হইয়া গেল । এক অণুতেই সব, সবই এক অণুতে; তখন আর কিছুই নাই ব্রহ্ম ব্যতীত ।—ক্রিয়ার পর অবস্থায় যখন সকল ভূত মনের ও প্রাণের সহিত ব্রহ্ম লয় হয়, তখন ব্রহ্মব্যতীত আর কিছু থাকে না । ঋগ্বেদ, ১ম অঃ, ৮ অষ্টক, ১৪ ঋচা—“অমৃতং যজ্ঞে মধিমর্ত্বম্”—ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় সেই যে কুটস্থ-রূপ ব্রহ্ম মর্ত্যালোকে তিনিই মধু অর্থাৎ অমৃতরূপ হইতেছেন । আত্মাই সকল

চলায়মান বস্তুতে আছেন, নচেৎ বস্তুর নাম-রূপও প্রকাশ পাইত না, আত্মা প্রকৃতিস্থ হইয়া চকল, এবং চকল হইয়া মনোরূপে বিবিধ কল্পনা করিতেছেন । প্রাণই আত্মার প্রকৃতি, এই প্রাণে মন দিতে-দিতেই চকল প্রাণ স্থির হয়, সেই স্থির প্রাণে যাহা কিছু দেখিবে সমস্তই ব্রহ্ম বলিয়া বোধ হইবে । আত্মারই বিস্তার প্রাণ, এবং প্রাণের বিস্তার মন বা সঙ্কল্প এবং সঙ্কল্প-রূপ হইতেই এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি । প্রাণ স্থির হইলে যে অণু স্বরূপ ব্রহ্মের প্রকাশ হয়, সেই অণুর মধ্যে জগৎ ব্রহ্মাণ্ড সব ডুবিয়া যায়, এবং বুদ্ধবুদ্ধ যেমন সাগরে প্রবিষ্ট হইয়া যায়, তরুণ সেই অণুও ব্রহ্মরূপে বিলীন হইয়া যায় তখন এক বলিবারও কেহ থাকে না, কেবল ব্রহ্মই ব্রহ্ম । ব্রহ্মের এই এক অণুতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পোরা । সেই এক অণুর জ্ঞান তইলেই ব্রহ্মজ্ঞান হয় । কুটস্থ থাকিতে থাকিতে অণু দেখা যায় । কুটস্থে যে সৰ্বদা থাকে তাহার আমি-আমার থাকে না, এই আকাশ-পাতাল-পৃথিবী তাহার সব ব্রহ্মময় হইয়া যায় । এই আত্মবৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত হইলে ভূতসমূহকে আত্মাতেই অবস্থিত দেখা যায়, এবং তরঙ্গমালা অসংখ্য হইলেও যেমন তাহারা সাগর হইতে উদ্ভিত হইয়া সাগরেই বিলীন হয়, এবং সেই অসংখ্য তরঙ্গকে সাগর হইতে অভেদ রূপে দেখা যায়, তরুণ এক ব্রহ্মসত্তা হইতেই এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের বিকাশ, এবং সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মসত্তাতেই নিমজ্জন ও তাহাতেই একীকরণ যাহার জ্ঞাননেত্রে ভাসিতে থাকে, তিনিই ব্রহ্ম-স্বরূপতা লাভ করেন । অজ্ঞান বশতঃ বজ্জুতে যে সর্প বোধ হইয়াছিল সেই অজ্ঞান-স্রগ কাটিয়া যাইলে সর্পবোধ বজ্জুতে বিলীন হয়, তরুণ অজ্ঞান বশতঃ ব্রহ্মে যে জগৎ ভ্রম কল্পিত হইয়াছিল, জ্ঞানের প্রকাশে সেই জগৎ প্রপঞ্চ ব্রহ্মরূপে পরিণত হয় । নাম-রূপ মিটিয়া এক সত্তা মাত্রে পর্যাবসিত হয় ।

যেমন মণিগণ মধ্যে সূত্র প্রোত আছে, তরুণ ব্রহ্ম স্বরূপে সকলের মধ্যে নির্লিপ্ত ভাবে আছেন । হৃদয়, প্রাণ, মন এই তিন সূত্র—যজ্ঞোপবীত—সকল বাহ্য বস্তু যাহা দ্বারা গ্রথিত আছে; যেমন কোন কর্ণের সঙ্কল্প হইলে প্রথমে হৃদয়ে, পরে প্রাণবায়ুতে পরে মনেতে উদয় হয় । মনেতে যাহা উদয় হয় তাহাই কার্যে পরিণত হয় । কার্য, কারণ ও কর্তৃত্ব হেতু বাহ্যিক সকল কর্ণের মধ্যে এই ব্রহ্মসূত্র আছে, অভ্যন্তরেও তাই । গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিয়া হৃদয়ে ক্রিয়া করিয়া হৃদয়কে স্থির করিতে হইবে;—সেই ক্রিয়া—প্রাণের দ্বারা প্রাণকে বৃত্তি করিলে ক্রিয়ার পর অবস্থা হয়, এবং সে অবস্থায় মনের চাকল্য আপনা আপনি দূর হয় । স্থিরত্বপথে থাকিলেই ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হয়, তখন ব্রহ্মরূপে প্রবেশ লাভ করিয়া সাধক ব্রহ্মরূপ হন । ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে থাকে সেই যোগী, ক্রিয়া করিতে করিতে যোগীদের আপনা-আপনি ধারণা হয়, সেই ধারণার দ্বারা পূর্বোক্ত সূত্রের ধারণা করিতে হয় । তখন তাঁহারা যোগযুক্তাবস্থায় থাকিয়া ২৪ তত্বকে যেন দেখিতে পান—এইরূপ অমৃতব করেন । (১) মূল প্রকৃতি—এই শরীর মূলধার, তাহাতে থাকিতে থাকিতে, (২) ক্রিয়ার পর অবস্থায় মনঃ ব্রহ্ম হয়, (৩) পরে সোহং ব্রহ্ম ইত্যাকার বোধ হয়, (৪) মন—যিনি ব্রহ্মেতে লীন হন । (৫—২৪) শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ (পঞ্চ ভূতাত্মা); চক্ষু, শ্রোত্র, বসনা, নাসিকা, ঘ্র্ণ (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়),

অনাদিত্বানিগুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ ।

শরীরস্থোহপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ ৩১

বাক্, পানি, পাদ, পায়ু, উপস্থ (পঞ্চ কৰ্ম্মেন্দ্রিয়); ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম (পঞ্চ মহাভূত) যাহা বোগবলে দ্বিবা দৃষ্টিদ্বারা দেখা যায়—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপূর, অনাহত, বিভূত্বাখ্য, আজ্ঞাচক্রে। পঞ্চ মহাভূতের স্বল্প অণুসকল পৃথক্ রূপে দেখা যায়। এই সকলের মধ্যেই ব্রহ্ম আছেন, ইহা যাহারা দেখিতে পান তাঁহারা ই তত্ত্বদর্শী। সকল তত্ত্বের মধ্যে সেই একই ব্রহ্ম রহিয়াছেন। তাই তাঁহারা যে তত্ত্বই দেখেন সকল তত্ত্বই ব্রহ্ম দর্শন করেন।

মান্যার প্রধান বিকাশ দেশ-কাল। ইহা দ্বারা ই এক বস্তু এত অসংখ্যরূপে প্রতিভাত হয়। এই নানাত্ব দর্শন কিছুতেই যায় না যতক্ষণ আত্মচৈতন্যে বুদ্ধি নিরুদ্ধ না হয়। বুদ্ধি নিরুদ্ধ না হইলে দেশ-কালের অভীত হওয়া সম্ভব নহে। দৃঢ় অভ্যাস সহ যিনি আত্মস্থ হইতে পারেন, তাঁহার নিকট দেশ-কাল জনিত পদার্থ সমূহের পার্থক্য কিছুই থাকে না, সমস্তই স্বপ্নবৎ মনে হয়। ক্রিয়ার পর অবস্থায় একমাত্র ব্রহ্ম চৈতন্যই থাকেন, সূত্রাত্ম এই যে অসংখ্য জীব ও জগৎ যাহা দেখা যাইতেছে, ক্রিয়ার পর অবস্থায় তাহার কোন অস্তিত্বই থাকে না। এই জ্ঞান এই জগৎদ্বারা ব্রহ্মবিস্তার, সমস্ত ক্রিয়ার পর অবস্থায় ব্রহ্মাণুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ব্রহ্ম হইয়া যায় ॥ ৩০

অবয়। কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয়!) অনাদিত্বাৎ নিগুণত্বাৎ (অনাদি এবং নিগুণ বলিয়া) অয়ন্য অবয়ঃ পরমাত্মা (এই অবয়ব পরমাত্মা), শরীরস্থঃ অপি (শরীরে থাকিয়াও) ন করোতি ন লিপ্যতে (কিছুই করেন না সূত্রাত্ম লিপ্তও হ'ন না) ॥ ৩১

শ্রীধর। তথাপি পরমেশ্বরস্য সংসারাবস্থায় দেহকৰ্ম্মসম্বন্ধনিমিত্তঃ কৰ্ম্মভিঃ তৎফলৈশ্চ স্বধৃঃখাদিবিষম্যং হৃৎপরিহরমিতি কৃতঃ সমদর্শনং তত্রাহ—অনাদিত্বাদিতি। যদ্বৎপত্তিমৎ তদেব হি ব্যোতি বিনাশমেতি। যত গুণবস্তু তস্য গুণনাশে ব্যয়ো ভবতি। অয়ং তু পরমাত্মা অনাদিঃ নিগুণশ্চ। অতঃ অবয়ঃ—অবিকারীত্যর্থঃ। তস্যাং শরীরে স্থিতোহপি ন কিঞ্চিং করোতি ন চ কৰ্ম্মফলৈঃ লিপ্যতে ॥ ৩১

বঙ্গানুবাদ। [তথাপি পরমেশ্বরের সংসারাবস্থায় দেহকৰ্ম্মসম্বন্ধ-নিমিত্ত কৰ্ম্ম ও তৎফলজাত স্বধৃঃখাদি দ্বারা যে বিষম্য তাহা হৃৎপরিহর, অতএব সমদর্শন কিরূপে সম্ভব হয়? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন]—যাহা উৎপত্তিমৎ তাহাই “ব্যোতি” অর্থাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। আর যাহা গুণবৎ তাহার গুণনাশে ব্যয় অর্থাৎ বিনাশ হয়; কিন্তু এই পরমাত্মা অনাদি এবং নিগুণ অতএব অবিকারী। সেজন্য শরীরে থাকিয়াও তিনি কিছুই করেন না বা কৰ্ম্মফলে লিপ্ত হন না ॥ ৩১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সূত্রাত্ম একেতে সব, সবেতে এক; তখন তাহার আদি কই? গুণই বা কোথায় থাকে তখন? কারণ গুণসব ব্রহ্ম হইয়া গিয়াছে—ক্রিয়ার পর অবস্থাতে ব্রহ্মেতে লীন হইয়া গিয়াছে—আত্মার পর অবস্থায় স্থিতি প্রাপ্ত হইয়াছে—যাহার স্থিতি হইলেও অনন্ত, তাহার আর

বিনাশ কোথায়? তিনি অর্থাৎ যাহার একুপ জ্ঞান হইয়াছে—শরীরে থেকের কিছুই করিতেছেন না—কিন্তু ব্রহ্ম—করাও ব্রহ্ম!! সূত্রাত্ম কিছু করিতেছেন না—অন্তবস্ত থাকিলে তবে লিপ্ত হইতেন, সবই ব্রহ্ম, সূত্রাত্ম তিনি নির্লিপ্ত।—ক্রিয়ার পর অবস্থায় যখন সমস্তই ব্রহ্মে লীন হইয়া গেল, তখন আর তাহাতে গুণ থাকে কি প্রকারে? ক্রিয়ার পর অবস্থায় ব্রহ্মদশা—তাহার আদি-অন্ত নাই, সূত্রাত্ম কিছু করিবারও নাই, এবং যখন সবই এক তখন লিপ্ত করিবার বস্তু কোথায়? প্রাণ ইড়া-পিঙ্গলায় বহিলে বহির্বস্তুর জ্ঞান হয়, দেহাদির অমৃতত্ব হয়, এবং পরম্পরের মধ্যে যেন একটা সম্বন্ধ আছে বলিয়া ধারণা হয়, আবার প্রাণ যখন হৃদয়াবাহী হইয়া ত্রিগুণাতীত হইয়া যায় তখন প্রকৃতি কোথায়, এবং তাহার সহিত সংশ্রবই বা হইবে কাহার? প্রকৃতির সহিত সংশ্রব না থাকিলে জন্ম-মরণাদি বিকার থাকিও সম্ভব নহে। শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্য এই শ্লোকের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা সংক্ষিপ্ত ভাবে এই:—যাহার আদি নাই তাহাকেই অনাদি বলা যায়; আত্মা নিরবয়ব সূত্রাত্ম বিনাশও নাই। যে বস্তু সত্ত্ব, তাহার গুণের অপচয় হইলে বিনাশ হয়; আত্মা নিগুণ সূত্রাত্ম তাহার বিনাশ হইতে পারে না। শরীরস্থ হইয়াও আত্মা কোন প্রকার কার্য্য করে না, এবং কার্য্য করে না বলিয়া কার্য্যের ফল দ্বারাও লিপ্ত হয় না। আত্মাকে শরীরস্থ বলা হইয়াছে, কারণ শরীরেই আত্মার উপলব্ধি হইয়া থাকে।

জল মধ্যে সূর্য্যের যে প্রতিবিম্ব পড়ে, জলের চাঞ্চল্য প্রযুক্ত তন্মধ্যস্থ প্রতিবিম্বকেও হিল্লোলিত বোধ হয়, কিন্তু সূর্য্য যেমন প্রকৃত পক্ষে চঞ্চল হয় না তদ্রূপ শরীরের সূক্ষ-দুঃখের সহিত আত্মাকে সূখী বা দুঃখী মনে হয় বটে, কিন্তু আত্মার সহিত সে সকল সূক্ষ দুঃখাদির প্রকৃত কোন সম্বন্ধ নাই। সেই জ্ঞান আত্মা-শরীরস্থ হইয়াও শরীরের ধর্ম্মের সহিত লিপ্ত হন না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে—দেহের মধ্যে তবে কে কার্য্য করে? পরমাত্মা হইতে অতিরিক্ত কোন দেহী যদি থাকে, তবে সেই কার্য্য করে ও কেবল সেই লিপ্ত হয় বলা যাইতে পারে, কিন্তু দেহী তো তিনিই। “আমাকে সকল ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ বলিয়া জানিবে”—এইরূপ উক্তির দ্বারা জীব ও ঈশ্বরে ভেদ অপ্রমাণ্য হয়। যদি ঈশ্বর হইতে পৃথক্ কোন দেহী না থাকে তাহা হইলে করেই বা কে? লিপ্তই বা হয় কে? ভগবান্ একস্থানে বলিয়াছেন—‘স্বভাবস্ত প্রবর্ততে’—অবিজ্ঞাই কৰ্ম্ম করে এবং কৰ্ম্মফলে অবিজ্ঞালিপ্ত জীবের মন লিপ্ত হয়। “অবিজ্ঞা সংসৃতোহেতু বিজ্ঞা তস্মা নিবর্তিকা”—অবিজ্ঞাই যখন সত্য নহে মিথ্যা, তখন তৎকর্তৃক ব্যবহারও মিথ্যা বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই জগৎদ্বারা বিষয়, জীব এবং কৰ্ম্ম ও জীবের কৰ্ম্মফলে লিপ্ত হওয়া এ সমস্তই স্বপ্ন দর্শনের মত। স্বপ্নাবস্থায় প্রতীত হয়, জাগ্রদবস্থায় তাহার কোন চিহ্ন থাকে না। যাহা সর্ব্বকালে সত্য নহে, তাহা অসত্যই বুঝিতে হইবে। সেই জ্ঞান জীবের বন্ধন ও মোচন ভ্রমজনিত মনঃব্যাপার মাত্র। আমবা সকলের দ্বারা জগতে লিপ্ত ও আবদ্ধ হই, এই সকল মনের কার্য্য। বলপূর্ব্বক সকল না কবিলে কাহাকেও কোন কিছুর সহিত লিপ্ত বা বদ্ধ হইতে হয় না। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যখন দেহ-বোধই থাকে না তখন দেহাদির কার্য্যে লিপ্ত হইবারও কাহারও সম্ভাবনা নাই ॥ ৩১

যথা সর্বগতং সৌক্ষ্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে ।
সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥ ৩২

অর্থঃ। যথা (যেমন) সর্বগতং আকাশং (সর্বত্র অবস্থিত আকাশ) সৌক্ষ্যং (সূক্ষ্ম বলিয়া) ন উপলিপ্যতে (কোন বস্তুর সহিত লিপ্ত হয় না) তথা (সেইরূপ) আত্মা (আত্মা) সর্বত্র দেহে (সকল দেহে) অবস্থিতঃ অপি (বিদ্যমান থাকিয়াও) ন উপলিপ্যতে (কিছুই সহিত লিপ্ত হয় না) ॥ ৩২

শ্রীধর। তত্র দৃষ্টান্তমাহ—যথা ইতি। যথা সর্বত্র—পঞ্চাধিবচি হিতম্ আকাশম্ সৌক্ষ্যং—অসঙ্গং পঞ্চাধিভিঃ নোপলিপ্যতে তথা সর্বত্র—উক্তমে মধ্যমে অধমে বা দেহে অবস্থিতোহপি আত্মা নোপলিপ্যতে—দৈর্ঘ্যকৈর্দোষগুণৈঃ ন যুক্ত্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩২

বঙ্গানুবাদ। [ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন] যেমন সর্বত্র অর্থাৎ পঞ্চাধিতেও অবস্থিত আকাশ অসঙ্গ হেতু পঞ্চাদি কর্তৃক উপলিপ্ত হয় না, সেইরূপ সর্বত্র; উত্তম, মধ্যম, অধম দেহে অবস্থিত হইয়াও আত্মা দৈহিক দোষগুণ দ্বারা গুণ বা দোষযুক্ত হয় না ॥ ৩২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—যেমন বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডেতে সকলেতেই সূক্ষ্মরূপে আকাশের গতি অর্থাৎ স্থিতি—তাৎপর্য্য স্থিতি গতি দুইই!! সূক্ষ্মগতি হইলে স্থিতি স্থল গতিতেই গতি!!! কিন্তু সূক্ষ্মই প্রযুক্ত নিলিপ্ত। তদ্রূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড অণু স্বরূপে সকল দেহেতেই ব্রহ্মব্যাপ্ত অথচ স্থিতি। সেইরূপ আত্মা অণু স্বরূপে সকল দেহেতেই ব্রহ্মব্যাপ্ত অথচ স্থিতি। দেহেতে সূক্ষ্ম ব্রহ্ম স্বরূপে সকল স্থানে আছেন। গতি হইতেছে অথচ স্থিতি!! স্থিতি হইলেই নিলিপ্ত ব্রহ্ম—সেই স্থিতি ক্রিয়ার পর অবস্থা—যে না পাইয়াছে সে জগতেতে আছে অর্থাৎ জগৎ হইবা পর্য্যন্তই কেবল গতিতেই রহিয়াছে। তাৎপর্য্য—ব্রহ্মাণ্ডের গতি রোধ করিবার জন্ত কেবল এই ক্রিয়া—যাহা গুরুবস্তুরূপে ও স্থখে করা যাইতে পারে। কেবল একটু অনুগ্রহ পূর্ব্বক এদিকে দৃষ্টি রাখামাত্র ও “কেবলই স্রোতে বেয়ে যাবে”—একটা খুঁটি ধর যাহা তোমার মধ্যে রহিয়াছে।—আত্মা যে নিলিপ্ত তাহার দৃষ্টান্ত হইতেছে আকাশ। আকাশ সকলের মধ্যেই আছে, কিন্তু কোন কিছুই সহিত আকাশ লিপ্ত নহে, কারণ আকাশ অসঙ্গ। আকাশকে সর্বত্রগ বলে অর্থাৎ সর্বত্রগতেই তাহার স্থিতি, এই স্থিতি ও গতিটি কি বুঝা চাই। স্থিতি ও গতি একই কথা। স্থিতিশীল আত্মা কালের দ্বারাই গতিশীল হন। সীমাবদ্ধ কালই মায়ার রূপ। দেহ তাহার আশ্রয়, এই কালের জন্তই আমরা আত্মার ইহ-পরম গমনাগমনের কথা শুনি; এই জন্তই বালা, যুবা, বার্ককা, জ্ঞান, মৃত্যুর নানাবিধ খেলা দেখিতে পাঠ। এই প্রাকৃত সঞ্চরিত হইলেই আত্মাকে চির স্থির, নিত্য নিরীকার, জগদ্রামরূপে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। সংস্রবলে যাহাকে নিত্য নিরীকার রূপে বুঝা যায়—তাহাকে সূক্ষ্মায় অবস্থিত যখন

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমাং রবিঃ ।

ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ৩৩

দেখি তখন তিনি গতিশীল অথচ স্থির। স্থির এইজন্য যে সূক্ষ্মায় অবস্থিত প্রাণ যত্নপাশে বদ্ধ হয় না, অর্থাৎ পরিবর্তন হয় না—“যাবৎ বায়ু মেঘোর্ব্যধে তাবন্মৃত্যুভয়ং কুতঃ”—অথচ সেখানে যে একেবারে গতি নাই তাহাও নহে; একেবারে গতিশূন্য হইলে দেহ থাকিতে পারে না। তবুও সূক্ষ্মায় প্রাণের সূক্ষ্মগতিকে গতিশূন্যই বলে, কারণ সে গতিতে কোন পরিবর্তন আনিতে পারে না। যখন প্রাণ ইড়া-পিঙ্গলায় আসিয়া জন্মরূপধর্ম্মী হয়, তখনও সূক্ষ্মভাবে সূক্ষ্মায় স্থির প্রাণের সহিত তাহার সঞ্চরিত থাকে আবার এই স্থির প্রাণ যাহা অচল হইয়াও সচল, তাহা যখন একেবারে সহস্রারে পৌছিয়া গতিশূন্য হয়, তখন আর দেহাদি সহিত প্রাকৃত সঞ্চরিত থাকে না। জীবের জন্মাবধি মৃত্যু কাল পর্য্যন্ত এই গতির বোধ হয় না, তাই জীবের অদৃষ্ট ও দেহ-সঞ্চরিতও কখন রুদ্ধ হয় না। প্রত্যেক গতিশীল পদার্থই কোন আপেক্ষিক গতিহীন পদার্থকে অবলম্বন করিয়াই বর্তমান থাকে, নচেৎ তাহার অস্তিত্ব থাকে না। যতক্ষণ অস্তিত্ব ততক্ষণ একদিকে গতি ও অত্রদিকে গতিহীন অবস্থা থাকিবেই। ইহাই জীবের বার বার জন্মমরণ বা বারম্বার যাতায়াতের কারণ। এই গতি ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্রই। গতি না থাকিলে ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব নাই; সকলেই এই গতির মধ্যে পড়িয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে পুনঃ পুনঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। এই গতি রোধ করিতে হইলে ব্রহ্মাবস্থায় পৌছানো চাই, যেখানে কিছু হয় নাই, কিছু হইবে না। “ধারা স্নেন মধা নিরন্ত-কুহকং সত্যং পরং ধীমহি”। এই পরম সত্যকে বুঝিতে হইবে, তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে, যেখানে মায়ার কুহক লীলা নিরন্তর কালের জন্ত স্তম্ভিত হইয়া আছে। ক্রিয়ার পরাবস্থাই এই স্বকীয় ধাম; অতএব এই পথযাত্রীদের প্রতি এই অমরোষ যে তাহার যেন আত্মবিশ্বত হইয়া না থাকেন, যাহাতে এই কৈবল্যাবস্থা লাভ হয় তজ্জন্ত এই প্রাণের খুঁটিটিকে সবলে যেন ধরিয়া থাকেন। এই খুঁটি বা স্থির-ভাব এবং শাস বা গতি সকলের মধ্যেই রহিয়াছে; যে স্থানের দিকে লক্ষ্য রাখিতে পারে সেই সংসার-গতি অতিক্রম করে। নিরন্তর শাস-প্রশাস চলিয়াছে এবং পলকে-পলকে জীব মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছে—এই সাধারণ স্রোতে আপনাকে বহিয়া যাইতে না দিয়া সেই অচল লক্ষ্যকে ধরিবার চেষ্টা করাই কর্তব্য। পরিশ্রম করিলেই ধরিতে পারা যায়; একবার সেই অচল লক্ষ্যকে ধরিতে পারিলেই “অবিচল বাম” কে প্রাপ্ত হইবে যিনি সকলের মধ্যেই রহিয়াছেন ॥ ৩২

অর্থঃ। ভারত (হে ভারত!) যথা (যেমন) একঃ রবিঃ (এক সূর্য্য) ইমং কৃৎস্নং (এই সমস্ত) লোকঃ (জগৎকে) প্রকাশয়তি (প্রকাশ করেন), তথা (সেইরূপ) ক্ষেত্রী (আত্মা) কৃৎস্নং ক্ষেত্রং (সমুদায় ক্ষেত্রকে) প্রকাশয়তি (প্রকাশ করিয়া থাকেন) ॥ ৩৩

শ্রীধর। অসঙ্গত্বং লেপো নাস্তি ইতি আকাশদৃষ্টান্তেন দর্শিতম্। প্রকাশকত্বাচ্চ প্রাকৃতধর্ম্মৈন যুক্ত্যত ইতি বিবৃষ্টান্তেনাহ—যথা প্রকাশয়তীতি। স্পষ্টোহর্থঃ ॥ ৩৩

বঙ্গানুবাদ। [অসঙ্গত্ব হেতু আত্মার লিপ্ততা নাই ইহা আকাশদৃষ্টান্ত দ্বারা

ক্ষেত্রক্ষেত্রজয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুশা ।

ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্হাস্তি তে পরম্ ॥ ৩৪

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎ ব্রহ্মবিজ্ঞানং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে

ক্ষেত্রক্ষেত্রজবিভাগযোগো নাম ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

দেখাইয়াছেন । এক্ষণে প্রকাশক যে তু আত্মা যে প্রকাশ্যধর্মযুক্ত হন না তাহা স্বর্ষের দৃষ্টান্ত দ্বারা বলিতেছেন]—স্নোকার্থ স্পষ্ট ।

[এক রবি যেমন এই সমস্ত লোককে প্রকাশ করেন, তদ্রূপ ক্ষেত্রজ আত্মা সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রকাশ করেন] ॥ ৩৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—যেমন এক সূর্য্য সকল পৃথিবীকে প্রকাশ করিতেছেন তদ্রূপ শরীরী এই শরীরকে প্রকাশ করেন—(Note)—যতক্ষণ অজ্ঞকার অর্থাৎ আত্মায় অজ্ঞাদিকে দৃষ্টি আসক্তি পূর্ব্বক রহিয়াছে ও আত্মায় স্বরূপ আদিত্যবৎ প্রকাশ কূটস্থের না হইতেছে—সর্বলোকচক্ষু স্বর্ষা যেমন ‘ন লিপ্যতে চাক্ষুর্বাহাদ্বাঐঃ’—বাহু পদার্থসমূহের ঘোষে দূষিত হন না, সেইরূপ সর্বভূতান্তরাষ্ট্রা সর্ব দেহের প্রকাশক হইলেও দেহের সুবন্ধুধ আত্মাকে লিপ্ত করিতে পারে না । এইরূপ কূটস্থ স্বর্ষা যিনি ভিতরে থাকিয়া এই দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিকে প্রকাশিত করিতেছেন, কিন্তু তবুও এই দেহেন্দ্রিয়াধির অন্তর ও নানাব্য ভাব কূটস্থকে লিপ্ত করিতে পারে না । যতক্ষণ অজ্ঞাদিকে দৃষ্টি ততক্ষণ সব অপ্রকাশ অজ্ঞকার, আবার যখন কূটস্থ আদিত্যের মত প্রকাশিত হন, সাধক সেই কূটস্থে দৃষ্টি রাখিয়া অনন্তলক্ষ্য হন, তখন আর তাঁহাকে বাহ্যপ্রকৃতি নানাত্বের দিকে কিছুতেই আসক্ত করিতে পারে না । মনে হইতে পারে—এই যে এত বাহ্যরূপের সুবর্ণ এবং সে সকলের প্রতি মনেরও অসীম আকর্ষণ, এবং জগৎও যখন থাকিবে এবং আমাদেব মনও থাকিবে তখন আর জীবের মুক্তি কোথায় ? তাই ভগবান্ বলিতেছেন—ক্ষেত্রই জীবকে মুক্ত করিয়া রাখিয়াছে, সেই ক্ষেত্রের প্রকাশকই তো ক্ষেত্রজ—সেই ক্ষেত্রজকে দেখ না বলিয়া এই ক্ষেত্রের নানাধে মোহিত হইয়া বাধা পড়িয়া যাও । কিন্তু ক্ষেত্রকে যিনি আলোকিত করিতেছেন সেই ক্ষেত্রজ তুমিই ; তুমি তোমাকে জ্ঞান তাহা হইলেই নিজের খেলায় নিজেকে আর মুক্ত হইতে হইবে না ॥ ৩৩

অন্তর্য্য। এবং (এই প্রকারে) ক্ষেত্রক্ষেত্রজয়োঃ অন্তরং (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের ভেদ) ভূতপ্রকৃতি মোক্ষং চ (ভূতগণের প্রকৃতি এবং তাহা হইতে মুক্তি লাভ) যে (যাহারা) জ্ঞানচক্ষুশা (জ্ঞান চক্ষু দ্বারা) বিহঃ (জানিতে পাবেন) তে (তাঁহারা) পরম্ যান্তি (পরমপদ প্রাপ্ত হন) ॥ ৩৪

শ্রীধর । অধ্যায়ার্থম্ উপসংহরতি—ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজয়োরিতি । এবম্—উক্ত প্রকারেণ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজয়োঃ অন্তরং—ভেদং বিবেকজ্ঞানলক্ষণেন চক্ষুশা যে বিহঃ, তথা বা ইয়ম্ উক্তা

জ্ঞানাতঃ প্রকৃতিঃ ভক্তাঃ সকাশাৎ মোক্ষঃ—মোক্ষোপায়ং ধ্যানাত্মিকঞ্চ যে বিহঃ তে পরম্ পদম্ যান্তি ॥ ৩৪

বিবিক্তো যেন ভবেন মিশ্রো প্রকৃতিপুরুষো ।

তং কথং পরমামন্যং মননমনমীশ্বরম্ ॥

[প্রকৃতি পুরুষ মিলিত হইয়া একতাব্যাপ্ত হওয়ার যিনি তৎ বিশেষণ দ্বাৰায় সেই উভয়কে পূর্ণরূপে প্রতিপন্ন করিলেন সেই পরমামন্য পরমেশ্বররূপ মননমনকে আমি নমস্কার করি ।]

ইতি শ্রীশ্রীধর ঋষিকৃত্যায়ং ভগবদ্গীতাতীকারাং সুবোধিতাং

প্রকৃতিপুরুষবিবেকযোগো নাম ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥

বঙ্গানুবাদ । [এই অধ্যায়ের অর্থ উপসংহার করিতেছেন—] উক্ত প্রকারে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের অন্তর অর্থাৎ ভেদ বিবেকজ্ঞানলক্ষণরূপ চক্ষুর দ্বারা যাহারা জানিতে পাবেন, এবং যাহারা এই ভূতলিপের প্রকৃতি এবং তাহা হইতে মোক্ষলাভের উপায় যে ধ্যানাত্মি তাহা জানেন, তাঁহারা পরমপদ প্রাপ্ত হন ॥ ৩৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ অর্থাৎ শরীর এবং শরীরীর জ্ঞান জ্ঞানচক্ষু কূটস্থের প্রকাশ হইলেই হয়, অর্থাৎ যোনিমুক্তা অজ্ঞাদিকে মন যায় না কেবল সেই দিব্যদৃষ্টিতেই থাকে বাহ্য অন্তরবস্তুরূপম্য । পঞ্চভূত, মূলধার, আধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধাখ্য এই পঞ্চভূত আত্মলিঙ্গ, লিঙ্গের দ্বারায় লিঙ্গেতে মৈথুন করে—মনকে স্থির করিলে বুদ্ধি হইবে—বুদ্ধির পর পরাবুদ্ধি অর্থাৎ প্রকৃতির পর যে পুরুষ সেই আমি ব্রহ্ম !! তাৎপর্য্য—কালী স্বরূপ প্রকৃতি বলবতী অহঙ্কার স্বরূপ পুরুষের উপর চড়িয়া সকলকে আপন মায়ায় ছজন করিতেছেন । তাঁহাকে মহাদেব আপনাই রূপ করিয়া লয়েন । নিজেই অজ্ঞাদিকে দৃষ্টি থাকিল না, আপনাতে আপনি থাকা—সেই জিহ্বার পর অবস্থা এবং সকলের পর—ভাষাতেই লয়, ইহারই নাম মোক্ষ । এইই পরম পদ, এইই পরমপদ ।—যতদিন দিব্যদৃষ্টি সৎগুরু-রূপায় লাভ না হয় ততদিন ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজকে কেহ বুঝিতে পারে না । প্রকৃতি-পুরুষের মিলিত ভাব এই দেহের দিকে চাহিলেই কতকটা বুঝিতে পারা যায় । এই রক্ত মাংস অস্থি মজ্জার ঢাকা দেহ—সে তো জড়, তাহার মধ্যে আবার চৈতন্যের অপরূপ খেলা, তাহাতেই এই সমস্ত জড়ের পরমাণুকে যেন চৈতন্যময় করিয়া তুলিতেছে, চেতন জড় যেন মিলিয়া এক হইয়া রহিয়াছে, কাহারও সহিত কাহাকেও যেন পৃথক করা যায় না—কিন্তু সেই প্রকৃতি-পুরুষের বিবিধ ভাবেও দেখা যাইতে পারে । এই জড়পিণ্ড দেহ তেজ করিয়া এক চৈতন্য জ্যোতিঃ প্রতি অজ প্রত্যক্ষে স্বলমল করিয়া উঠিতেছে । সৎগুরু রূপায় যিনি সাধন পাইয়াছেন তিনি যোনিমুক্তার সাধন

সাহায্যে ইহা দেখিতে পান। এই দেহস্থ জ্যোতিঃ বাঁহাব জ্যোতিঃ, সেই জ্যোতির্গুণ পুরুষকে অনুভব করিতে পারেন; এবং এইরূপ অনুভব করিতে করিতে সে অনুভব আর বৃদ্ধ হয় না। সাধক ইচ্ছা করিলেই—

“ব্রহ্মিণ্যে স্থিতঃ সোমঃ সোমমধ্যে হতাশনঃ ।
তেন্দ্রোমধ্যে স্থিতং সত্যং সত্যমধ্যে স্থিতোহচ্যুতঃ ॥
একো হি সোমমধ্যস্থোহমৃতং জ্যোতিঃ স্বরূপকম্ ।
হৃদিস্থং সর্বভূতানাং চেতো জ্যোতিঃ সর্বো ॥
আদিত্যাস্তর্গতং যচ্চ জ্যোতিঃ স জ্যোতিঃ সর্বমস্মি ॥
হৃদয়ে সর্বভূতানাং দীপভূতঃ স তিষ্ঠতি ॥”

ইহাই কুটস্থ জ্যোতিঃ। এই জ্যোতির অন্তর্গতই যে পুরুষ, তিনিই “আমি”। এই “আমি”কে জানিলেই সব জানা হয়। যখন মন আর অহাদিকে যায় না, সেই দিব্য চক্ষুরূপ কুটস্থ মধ্যেই নিহিত থাকে। তখনই জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া যায়, এবং ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের বিভাগ সম্পূর্ণরূপে ধারণা হইয়া থাকে। সেই পরম পুরুষের সাক্ষ্য লাভের উপায় হইতেছে—এই পঞ্চভূতময় দেহে মূল্যধারি পঞ্চস্থানে পঞ্চ মূর্তিতে পঞ্চ লিঙ্গ রহিয়াছেন, ইহারাই পঞ্চ প্রাণরূপে দেহে বর্তমান। যখন প্রাণের দ্বারা প্রাণকে মনন করা যায় যাহাকে মৈথুন বলে, সেই মৈথুনের ফলে মনঃস্থির হইয়া যায়, মনঃস্থিরে বুদ্ধি স্থির হয়, সেই স্থিরবুদ্ধি বা পরাবুদ্ধিতে প্রকাশিত যে আত্মভাব, তাহাই পুরুষ, তাহাই ব্রহ্ম এবং তাহাই “আমি”। প্রথমে প্রকৃতি বলবতী—তাই কালিকা-রূপিণী তাঁর প্রচণ্ড মূর্তি “চণ্ডারূপাতিভীষণা” প্রকাশ পায়। ইহাই সংসার মূর্তি—আসক্তিরূপা ও জন্মমৃত্যুরূপা ঘোরা বিভীষণা মূর্তি—যাহা স্বরণ করিলে সকলের হৃদকম্প হইতে থাকে। স্থির, শূন্য, ব্যোম বা মহেশ্বরের হৃদয় ভেদ করিয়া বা তাঁহাকে আয়ত্ত করিয়া “তাবেই তাবেই” ভাবে তাঁর অবিচ্ছিন্ন নৃত্য চলিতেছে—তাহাতেই অখণ্ড মহাকাল মহেশ্বরকে কত বিচ্ছিন্নভাবে, কত অসংখ্য খণ্ড-বিখণ্ড ভাবে দেখা যাইতেছে; আর এককে বহুভাবে বহুরূপে দেখিয়া মনের ধন্দ মিটিতেছে না—অজ্ঞান ছুটিতেছে না। আবার লীলা শেষে স্বয়ং মহাদেব যখন তাঁর এই কুহকিনী বহিমুখী শক্তিকে সঙ্কচিত করিয়া লন, তখন বহু এক হইয়া যায়, ঘোরা অঘোরা হইয়া যায়, জন্মমৃত্যুর বিভীষিকাময়ী করালমূর্তি—নীলেন্দ্রীবরলোচনা হইয়া, আর ঐ মোহময়ী মায়া সন্তানবৎসলা জননী হইয়া, অনন্ত বিভিন্নভাবে এক মহাকাশ বা চিদ্রূপে পরিণত করিয়া—“সৌম্য সৌম্যতরাসেব-সৌম্যোভ্যস্তিসুন্দরী” হইয়া—“সর্বশ্রামা অসিকরা মুণ্ডমালাবিভূষিতা” হইয়া—অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডকে নিজ ভাণ্ডারের শোয়াইয়া রাখেন। ইহাই শবরূপ অনাশ্রুভাবকে শিবরূপে পরিণত করা, ইহাই বিশ্বকে আপনার করা—ইহাই “আপনাতে আপনি থাকা”। তাহা হইলেই আর অহাদিকে দৃষ্টি থাকিল না। পূর্বে যিনি অসিকরা হইয়া শবকে হনন করিতেছিলেন—মায়া-মোহ-রূপে নিষ্কেপ করিতেছিলেন—এখন সেই সকলকে নিজ গলায় পরিয়া, সর্বকে আপনার অঙ্গশোভন হাররূপে পরিণত করিয়া ফেলিলেন। যুদ্ধ ধামিয়া গেল, অশুভ

শুভরূপে রূপান্তর পরিগ্রহ করিল। যখন দেবাদিদেব এইরূপে স্বভক্তকে আপনার রূপ করিয়া লন, তখন ভক্ত অনন্তদৃষ্টি হইয়া আপনাকে তাঁহার মধ্যে বিসর্জন করেন। ইহাই ত্যাগের পরাকাষ্ঠা। অহাদিকে আসক্তি নাই, সংসার থাকিয়াও তার সংসার নাই, ইহাই আপনাতে আপনি থাকা, ইহারই নাম “ক্রিয়ার পর অবস্থা”। ইহাই সর্বশেষ অবস্থা, ইহাতেই সর্বের নিমজ্জন বা লয়, ইহাই মোক্ষপথ, ইহাই পরম পদ ॥ ইহাই ভূতপ্রকৃতি হইতে মুক্তি লাভ ॥ এবং ভূতপ্রকৃতিরও মুক্তি ॥ সমাধি সাধনে বাঁহারা দৃঢ় অভ্যস্ত, তাঁহারা সমাধি ভঙ্গের পরও আত্মাকে আর প্রকৃতিকার্যে লিপ্ত বলিয়া মনে করেন না। তাঁহাদের এই অবস্থাতে যে ক্ষেত্রের পৃথক্ অভিন্ন থাকে না তাহা নহে, তাঁহারা আত্মবস্থাতেও যোগযুক্ত থাকায় প্রকৃত ক্ষেত্রে আর নিজ আত্মসত্তা হইতে পৃথক্ উপলব্ধি করেন না—ইহাই ভূতপ্রকৃতিরও মোক্ষলাভ। রামপ্রসাদ বলিয়াছেন—“বা ছিলি ভাই তাই হবি”। অধ্যাসবশতঃ প্রাণ চঞ্চল হইয়া বাহ্য দৃষ্টিযুক্ত হইয়া এই অনন্ত দৃশ্যের সমুৎপত্তি। আবার প্রাণ স্থিরে বুদ্ধি স্থির হইলেই—“নেহ নানাস্তি কিঞ্চন”—সাধকের অনুভব হয়। প্রকৃত বন্ধন বা তাহার মোচন নাই, যাহা স্বপ্নে দৃষ্ট হইয়াছিল, স্বপ্ন ভঙ্গের পর তাহা অস্তিত্ব রহিল না—এইমাত্র, ইহার নামই মোক্ষ। শ্রীমদ্ভগবত তাই বলিয়াছেন “বদ্ধো যুক্ত ইতি ব্যাখ্যা গুণতো মে ন বদ্যতঃ”—১১শ স্কন্ধঃ ১৩৪

ইতি ভ্রামাচরণ-আধ্যাত্মিক-দীপিকা নামক গীতার

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা

সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের পরিশিষ্ট

বা আলোচনা ।

“তেষামহং সমুদ্রস্তা বৃত্তাসংসারসাগরাৎ”—ভক্ত সকলকে আমি বৃত্তাসংসার হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি, ইহাই ভগবানের প্রতিজ্ঞা, কিন্তু আত্মজ্ঞান ব্যতীত তাহা সম্ভবপর নহে, সুতরাং সেই তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশের দ্বারা ভগবান্ প্রকৃতিপুরুষবিবেকযোগ এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আরম্ভ করিলেন । এই প্রকৃতি-পুরুষকেই ভগবান্ সপ্তমাধ্যায়ে অপরা ও পরা প্রকৃতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । এই উভয় প্রকৃতির প্রকৃত জ্ঞানের অভাব হেতুই চিৎসংসার-গতি হইয়া থাকে । তাই এ অধ্যায়ে ভগবান্ প্রকৃতি ও পুরুষ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ, জ্ঞান ও জ্ঞেয় প্রকৃতি ভঙ্গুলির আলোচনা করিলেন । গভীর জ্ঞানযুক্তি-পূর্ণ বহুশ্রম আত্মতত্ত্ব না বুঝিলে এবং বুদ্ধিগোচর তত্ত্বস্বরূপ সাধন করিতে না পারিলে জ্ঞানের উদয় হয় না । জ্ঞানের উদয় ব্যতীত সংসারসিদ্ধি উত্তীর্ণ হওয়া অসম্ভব, তাই শাস্ত্রাদেশ হইল—শ্রদ্ধালু হইয়া তত্ত্বকথা গুরুমুখ হইতে শুনিতে হইবে, শুধু শুনিলেই হইবে না, শুনিয়া “মৎপরম” হইতে হইবে । “মৎপরম” অর্থাৎ পরব্রহ্মরূপ অক্ষরাআই বাঁহাদের নিরতিশয় গতি, এইরূপ জ্ঞানাত্মিত ভক্তিকে আশ্রয় করিতে পারিলে তবে ভগবানের প্রিয় বা ভক্ত হইতে পারা যায়—“প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহন্ত্যর্থঃ”—আমি জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয়, সুতরাং জ্ঞানবান্‌ই তাঁহার প্রকৃত ভক্ত । দেহাত্মবোধই ভগবানের (আত্মার) সর্গে মিলিবার প্রচণ্ড অন্তরায় । এই দেহাত্মবোধ হয় কেন ? পরমপুরুষের শক্তিরূপ প্রাণ, নাড়ী মধ্য দিয়া দেহ মধ্যে সঞ্চারিত হয় । ইন্দ্রিয়গণ প্রাণশক্তি বলে জগৎস্ব দর্শন করে । প্রাণই ইন্দ্রিয়গত হইয়া এই দর্শন ক্রিয়া সম্পাদন করে, এবং সেই প্রাণ আত্মার শক্তি বলিয়া প্রাণের সত্তায় অহং জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া জাগতিক বস্তু-সমূহ দর্শন করিতে থাকে । জ্ঞান অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থাদ্বারা দেহবোধরূপ অভিমান নষ্ট হইলে আত্মপ্রতিষ্ঠা হয় বা জীবমুক্তি অবস্থা লাভ হয় । জীবমুক্ত তিনই বাঁহার দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি নাই ; অবিচার সহিত সম্বন্ধ শূন্য হইলেই জীব মুক্ত হন, তখন তিনি কেবল আত্মা-রূপেই অবস্থান করেন ; এইজন্য জ্ঞানী শুধু তাঁহার প্রিয় নহেন, তাঁহার আত্মসম হইয়া থাকেন —“জ্ঞানী আত্মৈব মে মতম্”—জ্ঞানী আত্মাই স্বরূপ । আর যে সকল ভক্ত আত্মজ্ঞান-বিবজ্জিত, তাঁহাদের ভগবানের সহিত যে মিলন অসহ্য বাহ্যিক, তাঁহারা ভগবানের সহিত অভিন্ন হইয়া তাঁহার প্রকৃত নিঃসঙ্গ হইতে পারেন না । সেইজন্য ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—“যস্মাৎ ধর্ম্যামৃতমিদং যথোক্তং অমৃতীর্জনং ভগবতো বিষ্ণোঃ পরমেশ্বরস্ত অতীত মে প্রিয়ো ভবতি, তস্মাৎ ইদং ধর্ম্যামৃতং মুমুকুশা যত্নতঃ অমৃতৈরম্”—ধর্ম্যামৃতের অমুষ্ঠান করিতে করিতে সেই ভগবান্ পরমেশ্বর বিষ্ণুর অতীত প্রিয় হইতে পারা যায়, সেই কারণে বাঁহারা বিষ্ণুর পরম পদ লাভ করিতে ইচ্ছা করেন এরূপ মুমুকুশ যত্নপূর্বক এই ধর্ম্যামৃতের অমুষ্ঠান করিবেন ।

আত্মজ্ঞান ব্যতীত বাস্তবিকই দৃষ্টের শোকসিদ্ধ উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব নহে। দ্বিতীয় বস্তুর অভিনিবেশ হেতুই আমাদের ভয় ও শোক উৎপন্ন হয়। অজ্ঞান হইতেই এই দ্বিতীয় বস্তুর জ্ঞান হয়, ইহাই আত্মার অবিস্মার। এই ভয় ও শোক হইতে একমাত্র আত্মবিশ্বই উত্তীর্ণ হইতে পারেন। ছান্দোগ্যশ্রুতি বলিতেছেন—“তবতি শোকমাত্মবিন্”। যতক্ষণ নানাভয়ের নিরসন না হয় ততক্ষণ শোক বাইতে পাবে না, কারণ মৃত্যু বা অস্তাববোধই শোকের প্রধান আশ্রয়।

এক্য জ্ঞান ব্যতীত অমৃত লাভ হয় না; যতদিন নানাভয়ের দর্শন হইবে ততদিন মৃত্যু আমাদের পিছন ছাড়িবে না। বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিতেছেন—“মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাশ্রোতি য ইহ নানৈব পশ্রুতি” - যে এই ব্রহ্মসত্যার দিব্য-জীব-জগৎ ইত্যাদি বিবিধ ভেদ দর্শন করে সে মৃত্যুর পর পুনঃপুনঃ জন্মমরণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আত্মা বহু নহে, আত্মা এক—ইহা সমাধিক জ্ঞান দ্বারা জানিতে পারিলেই জীবের জন্মমরণের ভ্রাস ঘুচিয়া যায়।

আত্মা, আত্মা স্তো অমৃতস্বরূপ এবং আত্মা ব্যতীত যখন অন্ম কিছু নাই তখন জন্ম-মৃত্যু বন্ধতাব আমরা অনুভব করি কেন? দেহাত্মবুদ্ধিই ঐক্লপ জ্ঞাপ্তি বোধের কারণ। দেহ নিত্য বদন্তব্য আমরা অনুভব করি কেন? দেহাত্মবুদ্ধিই ঐক্লপ জ্ঞাপ্তি বোধের কারণ। দেহ নিত্য পরিবর্তনশীল, দেহে আত্মবোধ থাকায় জন্ম-মরণের সহিত এই আত্মারও জন্ম-মরণ হইতেছে, জ্ঞাত জীবের এইরূপ মনে হইয়া থাকে। এই দেহভ্রম যতদিন না ঘুচে ততদিন জীবের সংসারসিদ্ধি পার হওয়া অসম্ভব।

এই জ্ঞানজালভয়ের চেষ্টা করা একান্তই আবশ্যিক। আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে এই

দেহাতীত বস্তুর জ্ঞান

দেহটির পরিচয় জানা ও দেহ মধ্যে যে দেহাতীত নিত্য-চৈতন্য জন্মমরণহীন একটি বস্তু রহিয়াছেন তৎসংস্পর্শেও একটি

অজ্ঞাত জ্ঞান থাকা আবশ্যিক। এইটাই জ্ঞেয় বস্তু, উহাকে জানিলেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। কিন্তু জ্ঞেয় বস্তুটিকে অবগত হওয়া একটুখানি কষ্ট নহে, সে জ্ঞাত বহু সাধ্য-সাধনা করিয়া নিঃস্বপ্নে প্রস্তুত করিয়া তুলিতে হয়; বহু সঙ্কটরাশি আয়ত্ত করিতে হয়; অমানিত-অদৃষ্টি হইতে আরক্ত করিয়া সর্বপ্রকার সংযম ও সাধনায় অভ্যস্ত হইতে হয়। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যেগুলিকে জ্ঞান বা জ্ঞানের সাধন বলা হইয়াছে, ঐ সকল সঙ্কট অনায়ত্ত থাকিলে শাস্ত্রাভ্যাস বা উপদেশ শ্রবণেও কোন ফল হয় না। সুতরাং আত্মার সহজ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে যোগাভ্যাসে স্থিতিপূর্ণ হইতে হইবে। কেবল মৌখিক বুক্তি-তর্কের দ্বারা অচিন্ত্য বস্তুর ধারণা হয় না।

প্রথমতঃ সাধনা দ্বারা সম্বন্ধ বিচিন্ন হইতে হইবে, সম্বন্ধ বিচিন্ন হইলে আত্মবিষয়ক স্মৃতি লাভ হইবে। এই স্মৃতিধারা অবিক্লিষ্টভাবে চলিলে মনোয়ত্তি কীর্ণ হইতে থাকিবে। বৃত্তি নিরোধপূর্বক সমাধিস্থ হইতে না পারিলে নিঃশব্দ পুরুষে স্থিতি লাভ করা সহজ নহে। এই স্থিতির নামই অপবোদ্ধারভূতি, জ্ঞান বা ক্রিয়ার পর অবস্থা। মূলধার হইতে ব্রহ্মরূপ পর্য্যন্ত যে আত্মা কূটস্থরূপে বিরাজ করিতেছেন, তিনিই এই শরীরের কারণ। এই শরীর ও শরীরস্থ পদার্থ (ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি

প্রভৃতি) ব্রহ্মের পৃথক পৃথক স্বত্র মেরুদণ্ডের মধ্যে রহিয়াছে, উহা হইতেই এই বিশ্বসংসার বিস্তার লাভ করে। পঞ্চ মহাভূতে এই জগৎ; সেই পঞ্চ মহাভূতের কারণ যে সূক্ষ্ম পঞ্চভূত উহাই মেরুদণ্ডস্থিত চক্রমধ্যে থাকিয়া জীবের দেহ-ইন্দ্রিয়কে সংগঠন করিয়া তুলিতেছে। সেই পঞ্চ ভূতের মধ্যে যে অণু-রূপ ব্রহ্ম রহিয়াছেন তিনিই বহিঃস্থ হইয়া পঞ্চভূতকে প্রকাশ করেন। যতদিন উহা আবার অন্তর্ভুক্ত না হয় ততদিন জীবের বিশ্বদর্শনরূপ-ভ্রম কিছুতেই ঘুচিতে পাবে না।

যোগের মূল তত্ত্বটী বুদ্ধিতে পারিলে মুক্তির জন্ম যোগসাধনের কি প্রয়োজনীয়তা তাহা স্বয়ংস্ব হইবে। ব্রহ্মের অণু প্রাণধারার সহিত মিলিত হইয়া মাড়ীমুখে প্রবাহিত হয় এবং

এই প্রবাহের কম্পনের সহিত ইচ্ছা-ধেব প্রভৃতি মনোবৃত্তি ফুটিতে আরম্ভ করে এবং তখন উহা আরও বহিঃস্থ হইয়া

বিষয় অবেষণে প্রবৃত্ত হয়। এই বিষয় অবেষণ মনের স্বাভাবিক ক্রিয়া। এই ক্রিয়া অল্প কোন রূপে বোধ করা যায় না। এই জ্ঞাত প্রাণের যে স্পন্দন হইতে এই সঙ্কল্প-বাসনাময় মনোবর্ণ প্রভৃতি জাগিয়া উঠে, সেই স্পন্দনকে বোধ করিতে করিতে যতই প্রাণবৃত্তি নিস্পন্দিত হইতে থাকিবে, ততই জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়ার ক্রিয়াও অন্যরূপ হইয়া যাইবে, তখন তাহাতে ব্যবহারিক জগতের ক্রিয়া না হইয়া অন্তর্জগতের ক্রিয়া প্রকাশিত হইবে, পরে সেই সমস্ত ক্রিয়াও আর থাকিবে না। ক্রমশঃ ক্রিয়াদ্বারা স্থির হইতে হইতে অব্যক্ত পদের অনুভব হইতে থাকিবে। অর্থাৎ প্রথমে বাহ্য ছিল—“সোহং ব্রহ্ম” আবার তাহাই হইয়া যাইবে। সব বস্তুর মধ্যে এবং সর্বভূতের মধ্যে এক মহাপ্রাণকে লক্ষ্য করিতে পারিলেই, তিনিই যে সর্বভূতের মধ্যে সব হইয়া রহিয়াছেন তাহা বুদ্ধিতে পারা আর কঠিন হইবে না। পরে ক্রিয়ার পর অবস্থা যত বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে ততই বাহ্যক্রিয়া বোধ হইয়া যাইবে। ইড়া, পিঙ্গলা, সূর্য্যা যতদিন চলিবে ততদিন অন্ম বিষয় হইতে আসক্তি যাইবে না, বাহ্যক্রিয়া রুদ্ধ হইবে না। ব্রহ্মের অণুতে স্থিতি হইলেই ইড়া-পিঙ্গলা-সূর্য্যা এক হইয়া যাইবে, তখন জগন্ময় ব্রহ্মের স্বরূপকে জানিয়া জীবন কৃতকৃত্য হইতে থাকিবে।

সেই অদ্বৈত মাত্র পুরুষ যিনি জীবগণের জঘন্যাকাশে অবস্থিত রহিয়াছেন তাঁহাকে দেহ

আত্মাকে দেহ হইতে পৃথক হইতে পৃথক ভাবে অবস্থিত বলিয়া অনুভব করিতে হইবে।

করিয়া দেপা যুগ্মত্ব হইতে ইহিকা অর্থাৎ মধ্যস্থ হওকে যেরূপ পৃথক করা যায়, এইরূপ সর্বদেহস্থ হইয়াও যিনি দেহাতীত,

তাঁহাকে ক্রিয়া দ্বারা স্থিরচিত্ত হইয়া স্থায়ী শরীর হইতে পৃথক করিয়া দেহিতে পাইবে। সুতরাং কে দেহ স্থিতি করিল এবং কিরূপে করিল এবং তিনিই বা কে এবং তুমিই বা কে, প্রকৃতিই বা কি, পুরুষই বা কি—এ সমস্ত রহস্যই তখন বুদ্ধিতে পারিবে। এই রহস্য ভেদ করিতে হইলে প্রাণায়ামাদি যোগাস্ক্রিয়া বহু পরিমাণে করা প্রয়োজন হয়। তখন বোধিতে পাইবে এই দেহ কারণ? কে এই দেহকদম্বরূপে বসিয়া অহর্নিশ বংশীবাদন করিতেছেন? তাঁহাকে দেখিলে তাঁহার বংশী বব শুনিবে এবং সেই পয়মপুরুষকে দেখিয়া

তাঁহাতে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে আর নানাহেতু কোন চিত্ত থাকিবে না। তখন আর জামিবার বা পাইবারও কিছু থাকিবে না।

দ্বাদশ অধ্যায়ে তত্ত্বজ্ঞানী বা ভক্তের লক্ষণ কি তাহা দেখানো হইয়াছে, কিন্তু যে তত্ত্বজ্ঞান (দেহ ও দেহীর জ্ঞান এবং তাঁহাদের ঐক্য) লাভ করিয়া ভগবানের প্রিয় হইতে পারা যায় সেই তত্ত্বজ্ঞানের বিষয়টি এই অধ্যায়ে সম্যক আলোচিত হইয়াছে। এক্ষণে এ অধ্যায়টি প্রকৃতই দ্রুত।

আত্মতত্ত্ব বুঝিবার এক দুইটি প্রধান বিষয় আলোচ্য—ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ বা প্রকৃতি ও পুরুষ। উহাদের পরস্পরের সংযোগই সংসার। এই সংযোগ প্রকৃতি ও পুরুষ, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ হইলে আত্মদর্শন হয় না বা প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয় না। প্রকৃতি-পুরুষের জ্ঞানলাভ করিলেই এই সংযোগ ছিন্ন হয়। এই দেহ ও দেহমধ্যস্থ চৈতন্ত্য যিনি দেহের সব ক্রিয়ার সাক্ষী এবং যিনি না থাকিলে দেহের ক্রিয়া হইতে পারে না—তিনিই চেতন পুরুষ, সাক্ষী বা আত্মা। প্রথমতঃ এই দেহ-প্রকৃতির ক্রিয়া যে প্রেরিত্ব নিম্নে তাহা না বুঝিয়া উহা আত্মার কার্য বলিয়া মনে হয়। যদিও এ কথা সত্য—আত্মা দেহ মধ্যে বর্তমান না থাকিলে প্রকৃতির ক্রিয়ার (প্রাণ, মন, বুদ্ধাদি) কোন পরিচয় পাওয়া যায় না, কিন্তু চৈতন্ত্য সত্ত্বা অস্তিত্ব হেতু প্রকৃতি যে ক্রিয়াশীল হয় উহা আত্মার ধর্ম বলিয়াই ভ্রম হয়। আত্মা যে কর্ত্তা নহেন, কেবল সাক্ষীমাত্র, তাহা ক্রিয়ার পর অবস্থায় আত্ম-সাক্ষ্যকার হইলে তবে অসুতব করা যায় এবং তখন তাঁহাকে অকর্ত্তা বলিয়া ধারণা হয়। এই জ্ঞানলাভের উপায় যোগমার্গ বা ক্রিয়ামার্গ। সাধারণতঃ ভক্তি বা জ্ঞানালোচনাও এই যোগমার্গেরই অন্তর্গত। প্রকৃত জ্ঞান বা ভক্তি আত্মদর্শন ব্যতীত হইবার নহে।

অথও অপরিচ্ছিন্ন আত্মা কিরূপে দেহের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিয়া থাকেন তাহা অতীব বিস্ময়কর। সহস্রাবস্থিত পরমাশ্রী লীলা বশতঃ আত্মাচক্রে আত্মার অবতরণ ও প্রাণের প্রকাশ নামিয়া পড়িলেই তাঁহার যে আবরণ রচিত হয় উহাই অজ্ঞানের আবরণ। বাহ্য অত্যন্ত স্থির ছিল তাহাই স্পন্দনযুক্ত হইলে মায়াশক্তি বা প্রাণের প্রকাশ হয়। সেই প্রাণ চঞ্চল হইলে আত্মা প্রাণের সহিত মিলিয়া নিম্নে অর্থাৎ স্থলে অবতরণ করেন—ইহাই সৃষ্টি-বহন। সেই চঞ্চল প্রাণই মনোরূপে এবং পরে দেহাধিপে পরিণাম লাভ করিয়া এই বিশাল ব্যক্ত ভগবৎকে প্রকাশ করেন। সেই ক্ষণ বদ্ধজীবের প্রথমে দেহ-কেই আত্মা বলিয়া ভ্রম হয়। কারণ সে পঞ্চভূতময় দেহেই প্রথমে আত্মার প্রকাশ অনুভব করে। এই দেহের সহিত জড়িত যে আত্মভাবের বিকাশ

ভূতাত্মা

হয়—সেই আত্মাকেই (১) “ভূতাত্মা” বলা হয়। চিন্তাশীল পুরুষেরা তখন বিচার করিলেই বুঝিতে পারেন যে এই নখর, নিত্যপরিবর্তনশীল ভূতময় দেহ কখনই আত্মা হইতে পারে না। তাঁহারা যেন—দেহের মধ্যে দেহের অতীত আরও কিছু পর্য্যবহিষ্কার করে, বাহ্যর দীপ্তিতে এই দেহকে প্রভাবিত করিয়া রাখিয়াছে, সেই দীপ্তির অভাব হইলে এই দেহ জড়বৎ হইয়া যায়, তাহাতে চৈতন্ত্যের গন্ধমাত্র থাকে না। পরে তাঁহারা সাধনচক্ষু দ্বারা দেখিতে পান দেহের মধ্যে যে একটি স্পন্দন রহিয়াছে তদ্ব্যবহি দেহ মধ্যে চৈতন্ত্য সঞ্চার হইতেছে। উহাই প্রাণ-স্পন্দন। উহারা প্রাণের

স্পন্দন বটে, কিন্তু উহাও আসলে মুখ্য প্রাণ নহে বন্ধারা জীব জীবিত থাকে। তাহা (২) সূত্রাত্মা, প্রাণ-স্পন্দন তাহারই শক্তি। এই প্রাণ

স্পন্দন দ্বারা জীব ভোগোপযুক্ত দেহের পরমাণু সকলকে সম্মিলিত করিয়া এই স্থল দেহকে রচনা করে। পরে এই প্রাণ বহুধা বিভক্ত হইয়া শরীরাত্মকত্বে নাড়ীমুখে প্রবাহিত হইয়া দেহকে প্রাণময় ও কর্মোপযোগী করিয়া তুলে। ঐ প্রাণপ্রবাহের মধ্যে একটি অপদ্রুপ শক্তি রহিয়াছে বাহ্য দেহকে সংগঠিত করিয়া তুলিতে পারে। প্রাণ না থাকিলে দেহগঠন ক্রিয়া যে সম্পন্ন হয় না, তাহা আমরা সকলেই বুঝিতে পারি। এই নাড়ীমধ্যস্থিত শক্তিই প্রাণের শক্তি, কিন্তু উহাও মুখ্য প্রাণ নহে। এই নাড়ীমধ্যস্থিত শক্তিই তাঁহার দেহ বা প্রাণময় কোষ, যিনি এই প্রাণময় কোষে থাকিয়া দেহের ও ইন্দ্রিয়াদির কার্যকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, তিনিই (৩) জীবাত্মা বা কূটস্থ; দেহাদিতে বর্তমান থাকিয়াও তিনি সর্বদা দেহের

জীবাত্মা

অতীত। দেহ-প্রাণাদিতে সংশ্লিষ্ট হেতু তাঁহাকে সাবয়ব, সীমাবদ্ধ, বহু ও কর্মকল-ভোক্তা বলিয়া ধারণা জন্মে। বহির্দৃষ্টি বশতঃ প্রকৃতির অহুগামী হইয়া জীবের সুখ-দুঃখের ভোগ হইয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি সুখ-দুঃখের ভাগী অথবা কর্মকল-ভোক্তা নহেন। কিন্তু প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়ের সান্নিধ্য হেতু তাহাদের কৃতকর্মের ফল-ভোগাদি তাঁহাতে অধ্যস্ত হয়। স্বরূপ জ্ঞানে ঐরূপ ভ্রান্তির নিবারণ হয়। যত যেমন দুষ্কের প্রতি অগুতে থাকিয়া দুষ্কের অস্তিত্ব প্রদান করে অথচ দুষ্কের চল ভাগের সহিত তাহার সঞ্চর্চ নাই, যখনদুঃখ দ্বারা দুঃখ মণ্ডিত হইলে যেমন তন্মধ্যস্থ যত তত্পরি ভাসিতে থাকে, তাহার সহিত লিপ্ত থাকিয়াও সংলিপ্ত নহে, তদ্রূপ এই দেহাদি বা প্রকৃতি রূপ দুঃখ প্রাণায়াম রূপ মনন ক্রিয়ার সাহায্যে আত্মা হইতে স্বতন্ত্র রূপে ভাসিতে থাকে। তখন আত্মা যে প্রকৃতি হইতে অসংশ্লিষ্ট তাহা সম্পূর্ণ বুঝিতে পারা যায়। উহাই ভূত-প্রকৃতি হইতে মুক্তিলাভ। এইরূপ ভূত-প্রকৃতি হইতে মুক্তিলাভ করিলে এই দৃষ্টমান্ অনন্য জীব বা ষণ্ড ভাব তখন একে মিলিয়া একাকার হইয়া যায়। (৪) সেই দেহেন্দ্রিয়ের অপোচর অব্যক্ত পরম একই পুরুষোত্তম

পরমাশ্রী

বা পরমাশ্রী। এই নির্গুণ পরমাশ্রী লীলা বশতঃ যখন সগুণ হন তখন তাঁহাকে ঈশ্বর বলা হয়। ভিন্ন ভিন্ন দেহে প্রকৃতি কূটস্থ চৈতন্ত্যই ক্ষেত্রজ পুরুষ—“ক্ষেত্রজকপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভাবত”। এই ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ হইতে অস্তিত্ব, “বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি”। সর্বভূতের মূল হইতেছে পরা ও অপরা প্রকৃতি; এই উভয় প্রকৃতিই তাঁহার, সূত্রবাং এক হিসাবে সর্বভূতই তিনি—সেইজন্ত বেদ আনাদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন—“নেহ নানাশ্চি কঞ্চন”।

পর্য্যাপ্ত

সুখানুভূত ব্রহ্মসত্ত্ব পদই পরা প্রকৃতি, তন্মধ্যে স্বরূপে সমস্ত ভূতই বর্তমান, ইহার স্থল ভাবই অপরা প্রকৃতি বা বিদ্য। সূত্রবাং বিদ্যের যোনি ঐ ব্রহ্মসত্ত্ব বা ব্রহ্মধোনি কূটস্থ। কূটস্থের মধ্যেই সমুদায় দেবতারাও রহিয়াছেন। ভিতরের সবিতাই কূটস্থের রূপ, উহা হঠাৎ ত্রিলোক প্রসৃত হয়। এই

কূটস্থ বা ব্রহ্মধোনি

কুটস্থের মধ্যে যে পুরুষ “বোহস্যাবসৌ পুরুষঃসোহিমম্নি”—“এবোহিমম্নিবিত্যে হিরণ্যপুরুষো
বৃহতে ইত্যধিদৈবতম্”—এই অন্তর্বাদিত্য কুটস্থে হিরণ্যপুরুষ বহিরাছেন। চারিদিকে সোণার
মত আলো, মধ্যস্থলে পুরুষ—ঐহার্য তালরূপে ক্রিয়া করেন তাঁহার্য সেই অধিদৈবত
পুরুষকে ঘেঁষিতে পান। সেই পুরুষই সর্বব্যাপক ব্রহ্ম।
ভূত-প্রকৃতি হইতে সৃষ্টিলাভ
“ক্ষেত্রজ্ঞাপি মাং বিদ্ধি”—ক্ষেত্রোত্তর্গত দ্বিবা চকুর স্বায়
প্রকাশিত কুটস্থকে ঘেঁষিলেই আর মন অন্তরিকে যায় না, উহাতে নিত্য স্থিতি হইলেই
জীবমুক্ত বা ভূত-প্রকৃতি হইতে মোক্ষলাভ হয়।

বিষের উপাধান চতুর্নিশ্চলিত ভূত্বই ক্ষেত্র বা প্রকৃতি। বিরাট প্রকৃতি এবং এই
ভোগায়তন ঘেঁষ উভয়েরই স্বরূপ বা উপাধান এক,
প্রকৃতির পরিচয়.
সাম্য ও গীতার মত
এই ক্ষত্র উভয়কেই ক্ষেত্র বা প্রকৃতি বলা যাইতে পারে।

“মহাত্মাত্ত্বজ্ঞাবো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।

ইন্দ্রিয়ানি দর্শকক পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥

ইচ্ছা দ্বেষঃ সূখং দুঃখং সংঘাতশ্চৈতন্যম্।

এতৎ ক্ষেত্রং সমানেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥”

মহাত্ম (অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম—এই পাঁচটি), অহঙ্কার, বুদ্ধি (মহতত্ত্ব),
অব্যক্ত (মূল প্রকৃতি), দশ ইন্দ্রিয়, মন এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচর (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও
গন্ধ)—এই চতুর্নিশ্চলিত ভূত্বই ক্ষেত্র। এবং ইচ্ছা, দ্বেষ, সূখ, দুঃখ, সংঘাত (শরীর),
চৈতন্য (জ্ঞানাত্মিক মনোবৃত্তি) এবং ধৃতি—এগুলি সমস্তই মনোবর্ধন সূত্রবাং উহার্য
ক্ষেত্রের অন্তর্গত।

বিষের মূল কারণ অব্যক্ত বা মূলপ্রকৃতি। মূল প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও
তমঃ গুণাত্মিক। গুণত্রয় যখন স্থপ্ত বা সাম্যাবস্থায় থাকে তখনই তাহাকে অব্যক্ত বলা হয়।

অর্থাৎ ইড়া-পিকলা-সুহৃদ্যর অতীত ভাব। জীবের অদৃষ্ট
বশতঃ কাল প্রভাবে এই সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটে, তখন
প্রকৃতি ক্ষুব্ধ হইয়া বিকৃত হয়। প্রকৃতির এই বিকৃত ভাবকেই সৃষ্টি বলে। সৃষ্টিকালে প্রথমে
সত্ত্বগুণ বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে জ্ঞানাত্মক মহতত্ত্ব বা বুদ্ধির উৎপত্তি হয় (অর্থাৎ আমি কে এবং
আমার শক্তির কথা স্মৃতিপথে উদ্ভূত হয়)। পরে রজঃ ও তমোগুণ প্রবৃত্ত হইয়া অভিমানাত্মক
অহঙ্কার (“আমি” কে পৃথক করিয়া দেবার ভাব এবং এই “অহং” কার্যের সহিত সম্বন্ধযুক্ত
হইয়া আমি করিতেছি, আমি ঘেঁষিতেছি ইত্যাদি অভিমান করে) উৎপন্ন হয়। বিষয়
সমূহকে আত্মগোচর করার প্রথম শক্তিই অভিমান। এই অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্ত্রা এবং
পঞ্চতন্ত্রা পঞ্চীকৃত হইলেই আকাশাদি স্থূল ভূত উৎপন্ন হইয়া থাকে। পঞ্চতন্ত্রাগুলিও
ইন্দ্রিয়-গোচর নহে, ইহার্য পঞ্চীকৃত হইয়া তবে স্থূল ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হয়।

সাম্যশাস্ত্র প্রকৃতিকে ক্ষুব্ধ বলিয়াছেন এবং সাম্যমতে প্রকৃতি স্বতন্ত্রা এবং এই ক্ষণে
না খোর ও গীতার মত
প্রকৃতির স্বতঃ পরিণাম মাত্র। কিন্তু গীতার ভগবান্
প্রকৃতিকে স্বতন্ত্রা বলেন নাই—

“ময়াধ্যাক্ষেপ প্রকৃতি স্তয়তে সচরাচরম্।

হেতুনােন কোন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ততে ॥”

আমার অধিষ্ঠান বশতঃ প্রকৃতি চরাচরাশ্রক ক্ষণে প্রসব করিয়া থাকে, হে কৌন্তেয়,
এ ক্ষণে বার বার এই ক্ষত্রই উৎপন্ন হয়।

সাম্যমতে প্রকৃতি ক্ষুব্ধ বলিয়া সৃষ্টি কার্যে একাএক সমর্থ্য নহে, সূত্রবাং পুরুষের সংযোগ
প্রয়োজন। কিন্তু সাম্যের পুরুষ নিগুণ, নিগুণের ইচ্ছা থাকিতে পারে না। তাহা হইলে
তাঁহার সংযোগ সাধন করে কে? পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃই প্রকৃতি সৃষ্টি কার্যে সমর্থ্য হন
সত্য, কিন্তু এই সামর্থ্যদান করিলেন তো পুরুষ, সূত্রবাং পুরুষের মধ্যেই প্রেরণা বা ইচ্ছা
বহিয়াছে মানিতে হয়, কিন্তু তাহা হইলে পুরুষকে নিগুণ বলা চলে না। ইচ্ছা-অন্তঃকরণের
ধর্ম, পুরুষের ইচ্ছা বলিলে তাঁহাকে সমন্য বলিয়া মানিতে হয়। পুরুষের ঐদাসীভ্য ও কর্তৃত্ব
পরম্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। সেইজন্য মনে হয়—প্রকৃতি ও পুরুষ স্বতন্ত্র বস্তু
নহে, যেন লীলা হেতু দ্বিধা বিভক্ত হইয়া তিনি স্বয়ং প্রকৃতি-পুরুষরূপে খেলা করিতেছেন।
গীতার ভগবান্ বলিতেছেন—

“এতদ্ব্যোনীনি ভূতানি সর্বাণীতুপধায়ম্।

অহং কুংসম্ভ জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥”—৭ম অঃ

ভূতগণ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ স্বরূপ এই দ্বিবিধ প্রকৃতি হইতে জাত ইহা জানিও। অপরা
প্রকৃতি দেহরূপে পরিণত হইয়া এবং পরাপ্রকৃতি ভোক্ত-রূপে ঘেঁষে প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থান
করেন। এই মর্দীয় প্রকৃতিদ্বয় আমা হইতেই উৎপন্ন, অতএব আমিই নিখিল জগতের উদ্ভব
ও লয়ের কারণ।

মেহের মধ্যে যে দেহী বিরাজ বসিতেছেন, তাঁহার সেই অমূল্য ভূত-মহেশ্বর ভাব সাধা-
রণ লোকে অবগত নহে, তাই ভূতগণ বিক্ষিপ্তচিত্ত বশতঃ তাঁহার পরমতত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া
তাঁহাকে সামান্য মনুষ্য বোধকারী মনে করিয়া অবজ্ঞা করে।

ভগবানের এই অমূল্য ভাবটী খেলার সুমর যোগমায়ার দ্বারা সমাচ্ছাদিত হয়। তাই

প্রকৃতি-পুরুষের মধ্যে যে সেই এক পরম পুরুষই বহিয়াছেন
যোগমায়

তাহা লোকে বুঝিতে পারে না। শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য
যোগমায় শব্দের অর্থ করিয়াছেন—“ভগবতো যঃ সঙ্কল্পঃ স এব যোগঃ, তদ্বশবর্তিনী বা মায়ী
সা যোগমায়ী”—সূত্রবাং ভগবানের ইচ্ছা বা সঙ্কল্প মানিতেই হইল। এই সঙ্কল্প ভগবানের
মধ্যগত বস্তু, তাহা বাহিরের আগন্তক পদার্থ নহে, সূত্রবাং সেই সঙ্কল্প বা ইচ্ছাই তাঁহার
মায়ী—এই ইচ্ছা রূপ পরিগ্রহ করিলে তাহাই জগদ্রূপে দৃষ্টিয়া উঠে। সূত্রবাং জগদ্বাদিও
তাঁহা হইতে ভিন্ন কোন বস্তু নহে।

উপনিষদেও আছে—“তৎ সৃষ্টা তদেবানুপ্রাৰিশং”, “তদনুপ্রাৰিশ সচ্চ ত্যাক্তবৎ”—

উপনিষদের মত

সৃষ্ট পদার্থে অনুপ্রাৰিশ হইয়া তিনি সংস্কৰাচ্য ও ত্যৎ
সংস্কৰাচ্য হইয়া থাকেন। “তদাত্মানং স্বয়মকুরুত”—তিনি

আপনি আপনাকে সৃষ্টি বিষয়ে পরিণত করিয়াছেন। তদ্বৎ বলিলেন—“যা শক্তি: সৰ্বভূ-
তানাং দ্বিধা ভবতি সা পুনঃ”—একমাত্র শক্তি তিনিই আবার সমস্ত ভূতে দ্বিধা হইলেন।

এই শক্তির কথা উপনিষদেও বর্ণিত হইয়াছে দেখা যায়। যেতাস্থতরোপনিষদ্
বলিলেন :—

“তে ধ্যানযোগাহুগতা অপশ্চন্

দেবানুশক্তিং স্বপুণৈর্নিগূঢ়ান্।

যঃ কারণানি নিধিলানি তানি

কালানুসৃত্যনুশিতীৰ্ত্ত্যেকঃ।”

ধ্যানযোগের সাহায্যে ঋষিরা পরমাত্মদেবের অণুগাত শক্তিকে কারণ বলিয়া
বুঝিতে পারিলেন। যে এক বস্তু কাল হইতে পুরুষ পর্য্যন্ত সমস্ত কারণ সমূহকে
পরিচালিত করেন—তাঁহার শক্তিকে ঋষিরা দর্শন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবও
তাঁহার শক্তিমাত্র—“শক্তয়ো যস্য দেবস্য ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাশ্রিতা।” “দেবানুশক্তিং”—দেব,
আত্মা ও শক্তি পরস্পরেরই অবস্থা-ভেদ। ব্রহ্মরূপে অবস্থিত হইয়াও তিনি
প্রকৃতি, পুরুষ ও ঈশ্বররূপে, অথবা ভোক্তা, ভোগ্য ও প্রেরয়িতা-রূপে প্রকাশিত
হন। “পরাস্য শক্তিরিবিধৈব জ্ঞয়তে স্বাভাবিকীজ্ঞানবলক্রিয়া চ”। তাঁহার নানাবিধ পরা-
শক্তি এবং স্বভাবনিষ্ঠ জ্ঞান, প্রভাব ও ক্রিয়ার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। ইহা যুক্তিযায়া
বোধগম্য হয় না, কিন্তু সাধকেব্রহ্মা তাঁহার শক্তির বিষয় অবগত হইয়া যাহা বর্ণনা করেন
তাহা ঋদ্ধমুখে শুনা যায়। “একো দেবঃ সৰ্বভূতেষু গূঢ়ঃ”—সেই এক বস্তুই সৰ্বভূতে গূঢ়
ভাবে বহিয়াছেন—কিন্তু “তৎ চূর্দশং গূঢ়মনুপ্রাৰিশং”—সৰ্বভূতের স্বয়ং-গুহ্য প্রচ্ছন্নভাবে
অবস্থিত, সূতরাং সহজে তাঁহাকে বুঝা যায় না।

এই প্রকৃতিত্বের যে তাঁহা হইতে অভিন্ন ভগবান্ গীতায় তাহা বুঝাইতে গিয়া তিনটি

পুরুষের উল্লেখ করিয়াছেন—ক্ষর, অক্ষর ও পুরুষোত্তম।

প্রতিষ্ম ভগবান্‌ই শক্তি—

ক্ষর, অক্ষর ও পুরুষোত্তম

(১) বাহ্য ক্ষরিত হয় বা বিনাশ প্রাপ্ত হয়—ব্রহ্মাদি

স্থাবরাস্ত শরীর, সেই শরীরগণই ক্ষর পুরুষ। (২) ক্ষরের

যাহা বিপরীত তাহাই অক্ষর পুরুষ, অর্থাৎ যিনি ক্ষর পুরুষের উৎপত্তির কারণ, যিনি মায়া
আশ্রয় যিনি চেতন ভোক্তা; শরীর নষ্ট হইলেও তিনি বিচলিত থাকেন। (৩) যিনি ক্ষর-অক্ষর
এই উপাধিধারা স্পৃষ্ট নহেন, বাহ্য সৰ্ব্বদা শুদ্ধ, মূক্তস্বভাব তিনিই উত্তম পুরুষ বা পরমাত্মা।
উত্তম পুরুষেরই ক্ষর ও অক্ষর বা অপরা ও পরা দুইটি প্রকৃতি। সূতরাং দেখা যাইতেছে এ
প্রকৃতি স্বতন্ত্র নহে, ইহাই পুরুষোত্তম বা পরমেশ্বরের কার্যকারিণী শক্তি। তাহা ভড়া নহে,
তাহা নিত্য চৈতন্যময়ী। এই চৈতন্যময়ী পরমশক্তিকেই ঈশ্বর এবং তন্মৈ তাঁহাকেই
পরমেশ্বরী বলা হইয়াছে। তাহাই আত্মশক্তি। যোগীরা তাঁহাকেই “চিদাকাশ”

বলেন। এ চিদাকাশই সমস্ত ব্যক্ত জগতের মূল কারণ। ইহা হইতেই ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী ও
মাহেশ্বরী শক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইজন্ত চিদাকাশকেই জগদম্বা বা ব্রহ্মাবিষ্ণুশিব-প্রসবিনী
বলা হইয়াছে। চেতনের সান্নিধ্যবশতঃই ইহাকে চেতন বলিয়া বোধ হয় তাহা নহে,
ইহা মূল চেতন বস্তুরই স্ফূরণ বা শক্তি। শক্তি শক্তিমান্ হইতে পৃথক্ নহেন, ইহাদের

নিত্য অবিনা সধ্বং, সূতরাং উভয়কে কেহ কোন কালে
প্রকৃতি ও পুরুষ অভিন্ন পৃথক্ করিতে পারে না। তবে পৃথক্ করিয়া আলোচনা

করা যাইতে পারে। ব্রহ্ম নিষ্ঠুর, তাহা কখনও বোধের বিষয় হয় না, কিন্তু ব্রাহ্মীশক্তি
বা মায়া প্রতিবিম্বিত চৈতন্য বোধের বিষয় হয়—তাহাকেই ঈশ্বর বলে। এই ঈশ্বর বা পরা
প্রকৃতিকে জানিতে পারিলেই জীব জীবন্ত অস্থায়ী লাভের যোগ্য হইয়া থাকেন। চণ্ডীতে
তাই বলিলেন—“তৎ বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীৰ্য্যা, বিশ্বস্ত বীজং পরমাসি মায়া।

সংমোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ, স্বং বৈ প্রসন্ন ভুবি মুক্তিহেতুঃ ॥”

হে দেবি, তুমি অনন্তবীৰ্য্যা বৈষ্ণবী শক্তি, তুমিই জগতের মূল কারণ মহামায়া, তুমিই সমস্ত
বিশ্বকে সংমোহিত করিয়া রাখিয়াছ। আবার তুমি প্রসন্ন হইলেই জগতের মুক্তির হেতু হও।

এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া কঠোপনিষদ্ বলিয়াছেন—“যাতু প্রসাদানুহিমানমানন্দঃ”
যাতুর প্রসন্নতাবশতঃ আত্মমহিমা দর্শন করেন। এই যাতুই শরীরধারক মন প্রকৃতি ও পু-
রুষগণেরই নহে, এই যাতুই প্রকৃতি বা ঈশ্বরী। এই প্রকৃতি প্রসন্ন হইলেই তিনি তাঁহার
স্বামীকে দেখাইয়া দিয়া সাধকে চিরদিনের জন্ত কৃতার্থ করিয়া দেন। যাতু=ধী+তুন;
“ধী” যাতুর অর্থ ধারণ করা, “শরীরধারণং যাতব-ইত্যচ্যন্তে”; সূতরাং প্রাণ পদার্থই প্রকৃত
যাতু, “প্রাণেন ধার্যতে লোকঃ”—এই প্রাণই জগদম্বা জগতের মা। “সেই দেবী নিত্য অর্থাৎ
উৎপত্তি-নাশ শূন্য। এই জগৎ তাঁহারই মূর্ত্তি, তিনি চিন্ময়ী-রূপে এই সমুদ্র জগৎ ব্যাপিয়া
আছেন। তথাপি তাঁহার আবির্ভাবের কথা অনেক প্রকারে কথিত হয়। তিনি নিত্য
হইলেও যখন তিনি দেবগণের কার্যাদিদির জন্ত আবির্ভূত হন তখন তিনি উৎপন্ন বলিয়া
জগতে অভিহিত হন।”—চণ্ডী।

কপিলদেব “সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ” বলিয়াছেন। ইহার মানে এ নহে
যে তিনি জড়। নিরবচ্ছিন্ন জড় জগতে থাকিতে পারে না। তাহা ছাড়া শাস্ত্র ও ঋষিরা
বলিতেছেন—“সৰ্বং প্রাণনয়ং জগৎ”, “সৰ্বং বহিৎ ব্রহ্ম”, তখন জড়ত্ব কল্পনা করিতে যাই
কেন? চৈতন্যকে বাদ দিলে কোন বস্তুরই অস্তিত্ব থাকে না। এক পরম বস্তুরই শক্তি
পরা ও অপরা প্রকৃতি-রূপে বিভাজিত। শক্তি হইতে শক্তিমান্ অভিন্ন। স্বর্ণালঙ্কার হইতে
স্বর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলে অলঙ্কার বলিয়া আর যেমন কোন পদার্থ থাকে না, তদ্রূপ
চৈতন্যের অতিরিক্ত কোনও জড় পদার্থকে কল্পনা করা যায় না। ‘অনাদি অবিচ্ছিন্ন হেতু
আত্মপদার্থে অনাত্মা কল্পিত হয় মাত্র। তাই যেতাস্থতর প্রকৃতি বলিতেছেন—“সৰ্ব্বাঙ্গীবে
সৰ্বসংস্থে বৃহন্তে তস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে ॥”

ঈদামাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ দর্শন করার কলে এই সংসার চক্রে বা স্থলদেহে জীব
কেবলই ভ্রাম্যমান হয়।

এই প্রকৃতিও আত্মার মতই ইন্দ্রিয়াদির অগোচর, সেইজন্য প্রকৃতিকেও অব্যক্ত বলা হয়। তাহার কারণ আত্মা ব্যতীত আত্মার ক্ষুদ্র উপাধি মাত্রকে ক্ষুদ্র বলা হইয়াছে। ক্ষুদ্রের অর্থ বাহ্যিক অস্বাধীন। প্রকৃতি বাস্তবিক ক্ষুদ্র নহেন, উহা ব্রহ্মই বা ব্রহ্মের ব্যক্তাবস্থামাত্র। প্রকৃতিকে পৃথক্ মানিতে হইলে উহাকে ব্রহ্মের আবরণ বলিয়া মানিতে হয়; এই আবরণ করণা করিতে হইলেই—এ আবরণ কে সৃষ্টি করিল, কেন করিল—প্রভৃতি বহুবিধ প্রশ্ন উঠিতে থাকিবে। ভগবান্ গীতায় এ প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছেন—তিনি বলিয়াছেন, এই জীব-চৈতন্য তাঁহারই পরা প্রকৃতি, এবং যাহা বাস্তবপ্রকৃতি-রূপে বর্তমান রহিয়াছে তাহাই তাঁহার অপরা প্রকৃতি। উভয় প্রকৃতি যখন তাঁহারই তখন উহারা কেহই ক্ষুদ্র হইতে পারে না। ভাগবতে আছে :—

“জ্ঞানমাত্রেঃ পবনত্রৈশ্চ পরমাত্মৈশ্চরঃ পুমান্।

দৃশ্যাদিভিঃ পৃথক্ভাবৈবভগবানেকৈঃ দৈবতৈঃ ॥”

পরব্রহ্ম জ্ঞান মাত্র, তিনি পরমাত্মা, পরমেশ্বর প্রভৃতি বহুবিধ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। জ্ঞেয়া ও দৃশ্যরূপে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তিনিই বিদ্যমান রহিয়াছেন। তাঁহার পরা প্রকৃতিই হইল প্রাণ যাহা ব্রহ্মস্বরূপে জীবদেহে সূক্ষ্মার মধ্যে বিরাজমান থাকিয়া এই বিশ্বলীলা সম্পাদন করিতেছেন।

সম্ভিদানন্দ-বিতত পরব্রহ্মকে যিনি এই বিশ্বরূপে পরিণত করান, সেই পরমাশক্তি ব্রহ্মাতিরিক্ত অতীত কিছু বস্তু হইতে পারেন না। ভগবান্ নিম্নশক্তি বলেই স্বেচ্ছায় আপনাকে বিবিধ নাম-রূপ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন করিয়া থাকেন। এই শক্তি তাঁহার মধ্যে স্বাভাবিক ও সত্ত্ব ও নিগুণ স্বভঃসিক্তরূপে বর্তমান। সেই জন্য কেহ কেহ প্রকৃতিকে ব্রহ্মের স্পন্দন বা মায়ী বলিয়া থাকেন। বাস্তবিকই যিনি না থাকিলে ব্রহ্ম আছেন কি নাই কেহ স্থানিতেই পারিত না; ব্রহ্মের সেই কার্য্যভাব বা সত্ত্ব বা দৈবর ভাবই তাঁহার প্রকৃতি। কারণ ভাবই নিগুণ ভাব। কিন্তু সাধককে এই নিগুণ ভাবের সহিতও পরিচিত হইতে হয়, নিগুণ ভাবের সহিত পরিচিত হইতে না পারিলে নিগুণব্রহ্ম আত্মমায়ী-বশে বিশ্বভূতনে পরিণত হইয়াও কিরূপে অবিকৃত ও অসংশ্লিষ্ট হইয়া থাকেন তাহা কিছুতেই বুঝা যায় না। পরমাত্মার দুইটি বিভাবকে (aspects) পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আলোচনা করিতে গিয়াই এক মহাদন্দ উপস্থিত হইয়াছে। পরমাত্মা ক্ষেত্ররূপে নিগুণ; প্রকৃতিরূপে গুণময়ী। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ যাহার প্রকৃতি সেই পরমাত্মা সত্ত্ব গুণাতীত উভয়ই। কিন্তু ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ ব্যতীত প্রকাশিত হয় না, এবং ক্ষেত্রজও ক্ষেত্র ব্যতীত থাকেন না।

তাহা হইলে উহার অর্থ এই হয়—ভগবানের যে বিশ্বলীলা দেখা যাইতেছে (তাহাকে স্বপ্ন বলিলেও তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই) তাহার মধ্যে শুদ্ধ জ্ঞানাত্মক ভাবকে পুরুষ বা ক্ষেত্রজ, এবং এই লীলার অবিস্তান বা আশ্রয় যে বস্তুগুলি তাহার সমূহকে ক্ষেত্র বলে।

প্রকৃতি হইতে যে মহান্ বা বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, বোধান্ত তাহাকেই ভগবদ্ দৈক্ষণ বলিতেছেন।

ভগবদ্ দৈক্ষণ।

ভগবান্ হইতে ভগবদ্ দৈক্ষণ কাৰ্য্যতঃ স্বতন্ত্র বোধ হইলেও তাহা তাঁহার নিজ শক্তিরই বিলাস মাত্র, অতঃ কোন আগন্তুক পদার্থ নহে, এই দৈক্ষণই ভগবদ্ মায়ী। এই মায়ী যখন লীলা-বিলাস হেতু বহির্মুখ হয় তখনই তাহা হইতে অহংকার উৎপন্ন হয় অর্থাৎ চৈতন্যের বাহ্য সুরণ হয়। সূক্ষ্মবাস্তব হইতে যেমন স্বপ্নাবস্থার সুরণ হইয়া থাকে, তখন আপনাকে আপনি কিছু বলিয়া মনে করে। এই আলোচনা বা মনন ক্রিয়া হইতেই মন হয়; পরে তাহা বহুধা সম্প্রসারিত হইয়া শ্রবণ, দর্শন, স্পর্শাদির ইচ্ছা হয়; সেই ইচ্ছা হইতে ইন্দ্রিয় শক্তির বিকাশ হয়। ইন্দ্রিয় শক্তি প্রকটিত হইলেই তাহা হেব সূক্ষ্ম নিবারণের জন্য ইন্দ্রিয়-ভোগ্য স্থূল জড়-জগদাদি উৎপন্ন হয়। কিন্তু সকলের মূলেই তাঁর সেই অনাদি ইচ্ছা—“একোহহং বহু ভূতাম্ ॥”

পরমাত্মার সেই অনাদি ইচ্ছা বা সঙ্কল্পই মায়ী। ভগবান্ এই গীতায় মায়াকে ত্রিগুণাত্মিক।

মায়ী

দৈবী ও ভূতরা বলিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর “দৈবী” শব্দের অর্থ করিয়াছেন “দৈবী হেবন্ত মমেবরম্য বিষ্ণোঃ স্বভাব-ভূতা”—দেব অর্থাৎ পরমেশ্বর বিষ্ণুরূপ আমি, আমারই স্বভাবভূতা মায়ী এই কারণে দৈবী। আচার্য্য রামানুজ বলেন—“দেবেন ক্রিয়া-প্রবৃত্তেন ময়া এব নিম্বিতা”—লীলাপ্রবৃত্ত ভগবান্ লীলার জন্য মায়ী প্রস্তুত করিয়াছেন। এই মায়ীও অনির্কাত্যা। অবৈত বোধান্ত মতে এই মায়ী—“স্বপ্নসম্যামনির্কটনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানবিরোধিতাব্যবরণং যৎকিঞ্চিৎ” ইহা সংগত নহে, অসংগত নহে, ইহা যে কি তাহা ঠিক বচনীয় নহে, ত্রিগুণাত্মিকা, জ্ঞান-বিরোধী ভাবরূপ যৎকিঞ্চিৎ। ইহাকে সং বলা যায় না এই জন্য যে, ইহা জ্ঞান হইলে থাকে না, ইহাকে শব্দশব্দের মত মিথ্যাও বলা যায় না, কারণ ইহার ব্যবহারিক সত্তা সকলেই অনুভব করে। কিন্তু উহা যখন ব্রহ্মশক্তি তখন ব্রহ্মের মত সং বস্তু নাই হইলেও ইহা অত্যন্ত অসংগত নহে। ইহা জ্ঞানবিরোধী, কারণ যতক্ষণ মায়ী বা গুণের খেলা থাকে ততক্ষণ জ্ঞান নিত্যবস্তু হইয়াও আবৃত্তবৎ বোধ হয়। এই আবরণই মায়ার আবরণ। কিন্তু শুদ্ধ শাস্ত্র এই মায়াকে অবস্তু বলেন নাই।

“অপ্রত্যক্ষ্যমনির্দেশ্যমনৌপম্যমনাময়ং।

তত্ত্ব মতে মায়ী কি ?

তস্য কাচিৎ স্বভঃসিদ্ধা শক্তির্দ্ব্যয়েতি বিস্তৃতা ॥”—দেবী গীতা

প্রতি-প্রতিপাত সেই আত্মার স্বরূপ অসুমান্যাদি প্রমাণের অবিসয়, এবং সেই আত্ম-পদার্থকে জ্ঞাতি, গুণ, ক্রিয়া ও সংজ্ঞাদি দ্বারা নির্দেশ করিতে পারা যায় না—তাই উহা অনির্দেশ্য, তৎসদৃশ দ্বিতীয় পদার্থের অভাব বশতঃ তিনি উপমারহিত, এবং ভগ্নময়ণাদি বড়-ভাব বিকার শূন্য বলিয়া তিনি অনাময়। এই আত্মার স্বভঃসিদ্ধা এক শক্তি আছে তিনি মায়ী নামে-বিখ্যাত।

“বশক্তেস্চ সমাযোগাহং বীজাত্মনঃ গতা।

স্বাধারাবরণাতস্যো যৌষতঃ সমাগতম্ ॥”—দেঃ গী:

আমি নিগুণা হইয়াও বশক্তির সমাযোগ বশতঃ ভগ্নতের কারণে প্রাপ্ত হইয়াছি। এই

মায়াই অবিদ্যাশক্তি দ্বারা আত্মাকে আবৃত করে বলিয়া মায়াতে স্বাশ্রয়ব্যামোহকতা ঘোষ বিভ্রমমান রহিয়াছে।

“চৈতন্যস্য সমাযোগান্নিমিত্তঞ্চ কথ্যতে।

প্রপঞ্চ-পরিণামাক্ত সমবায়িত্বচ্যুতে ॥” দে: গী:

আমার চৈতন্যই জগতের নিমিত্ত কারণ এবং আমার মায়াশক্তি প্রপঞ্চরূপে পরিণত হইয়া জগৎ নির্মাণ করে, অতএব মায়াই জগতের সমবায়ী বা উপাদান কারণ।

“তত্র যা প্রকৃতিঃ প্রোক্তা সা রাজন্ দ্বিবিধা স্বতা।

সত্ত্বাত্মিকা তু মায়া স্যাৎস্ববিদ্যাগুণমিশ্রিতা ॥

স্বাশ্রয়ং যা তু সংরক্ষণং সা মায়েতি নিগততে।

তস্যাং তৎ প্রতিবিম্বং স্যাৎস্বভূতস্য চেশিতুঃ ॥

স দৈবঃ সমাখ্যাতঃ স্বাশ্রয়জ্ঞানবান্ পরঃ।

সৰ্গজঃ সৰ্গকর্তা চ সৰ্গাহুগ্রহকারকঃ ॥

অবিদ্যাস্ত বৎকিঞ্চিৎ প্রতিবিম্বং নগাধিপ।

তদেব জীব-সংজ্ঞং স্যাৎ সৰ্গদুঃখাশ্রয়ঃ পুনঃ ॥” দে: গী:

হে রাজন্, পূর্বে যে প্রকৃতি বলা হইয়াছে তাহা দ্বিবিধ। সবপ্রধান প্রকৃতিকে মায়া ও বহুতমমিশ্র প্রকৃতিকে অবিদ্যা বলে। এই মায়া স্বাশ্রয় আত্মাকে আবৃত করেন। এই মায়া-প্রতিবিম্বিত চৈতন্যের নাম দৈব। ইহার আত্মজ্ঞান কখন আবৃত হয় না। ইনি সৰ্গ শ্রেষ্ঠ, সৰ্গজ, সৰ্গকর্তা এবং সকলের প্রতি অহুগ্রহে সমর্থ। হে নগাধিপ, অবিদ্যা-প্রতিবিম্বিত চৈতন্যকে জীব বলে; ইনি সৰ্গদুঃখের আশ্রয়।

“কবোতি বিবিধং বিম্বং নানা ভোগাশ্রয়ঃ পুনঃ।

মচ্ছক্তিপ্রেরিতো নিত্যং ময়ি রাজন্ প্রকল্পিতঃ ॥” দে: গী:

হে রাজন্, এই দৈবও ব্রহ্মরূপিণী আমার মায়াশক্তি দ্বারা প্রেরিত হইয়াই অখিল বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া থাকেন। কারণ এই দৈবও ব্রহ্মস্বরূপ ব্রহ্মরূপি আমাতে কল্পিত হইয়া থাকে, অতএব তিনি মৎশক্তি-প্রেরিত অর্থাৎ মদ্বীন।

মায়া ভগবানের শক্তি

“মন্ময়াশক্তিঃ সংকল্পঃ জগৎ সৰ্গঃ চরাচরঃ।

সাপি মন্তঃ পৃথগ্ মায়া নাস্ত্যেব পরমার্থতঃ ॥” দে: গী:

এই চরাচর সমস্ত জগৎ আমারই মায়াশক্তি দ্বারা কল্পিত হইয়া থাকে, কিন্তু সেই মায়াশক্তি পরমার্থ দৃষ্টিতে মদ্ব্যতিরিক্ত কোন অল্পপদার্থ নহে। কারণ সেই মায়া আমাতেই কল্পিত হইয়া থাকে। পরব্রহ্মের দৃষ্টি শক্তির মধ্যে যেটা চৈতন্য অবিকারী তাহাকেই পুরুষ বলে এবং যেটা বিকার-বৃত্ত ও পরিণামী-তাহাকেই প্রকৃতি বলে। শ্রুতিতে বলিয়াছেন—“দে প্রকৃতি বৈহিত্যেবো পরা চ অপরা”। গীতাতেও এই দুই শক্তিকে পরা ও অপরা নাম দেওয়া হইয়াছে। এই পরা প্রকৃতি জীবের জীবনকালে তিনিই জগৎকে ধারণ করিয়া আছেন। চৈতন্যের ধারণার বিষয় হইয়াই জগতের অস্তিত্ব বর্তমান, এই জগৎ তাহার ধারণার বিষয় না হইলে

তাহার অস্তিত্ব থাকিত না।” ইহাকেই আচার্য্য শঙ্কর বলিলেন—“জীবরূপাং ক্ষেত্রজ-লক্ষণাং প্রাণধারণনিমিত্তভূতাম্।” বেদান্তের ভাষায় ইহাই পরব্রহ্মের স্পন্দন শক্তি। যোগের ভাষায় ইহাই প্রাণশক্তি। মণিতে যেমন স্বাভাবিক জ্যোতি বসকিত হয়, শাস্ত্র শুদ্ধ চৈত্রয় ব্রহ্মও সেইরূপ স্বাভাবিক স্পন্দন উঠে, ঐ স্পন্দনই প্রাণ বা মায়া। ব্রহ্ম চাক্ষু্যল্যহীন শাস্ত্র শুদ্ধ শিবরূপ এবং তাঁহাতে যে স্পন্দন উদ্ভিত হইতেছে তাহাই তাহার প্রাণশক্তি, মন বা মায়া। পঞ্চদশী (১।৪৮) বলিতেছেন—

“মায়াবিদ্যে বিহার্যেবং উপাধী পরজীবয়োঃ ॥

অখণ্ডং সচ্চিদানন্দং পরং ব্রহ্মৈব লক্ষ্যতে ॥”

দৈব ও জীব উভয়ই উপাধি কল্পিত অবস্ত। (“দৈবত্বং তু জীবত্বং উপাধিবয়-কল্পিতম্”)। মায়া ও অবিদ্যারূপ উপাধি পরিভাষ্য করিলে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মই লক্ষিত হন। অদৈতবাধীরা ব্রহ্মের দ্বিবিধ লক্ষণ বলিয়াছেন—স্বরূপ লক্ষণ নির্ভণ নির্মিকল্প, তাহাতে সৃষ্টির কোন কথাই উঠিতে পারে না; তাই তাহার ব্রহ্মের এক ভট্টলক্ষণও স্বীকার করিয়াছেন। ভট্টলক্ষণে তিনি সগুণ স্তবরাং সৰ্গজ, সৰ্গশক্তিমান, সৰ্গকল্প ও সৃষ্টিস্থিতিপ্রায়-কর্তা। এই লইয়া সগুণ ও নির্ভণ বাধীত্বের মধ্যে কত কলহ বিদ্যমান হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু যোগীর পক্ষে ইহার তথ্য নির্ণয় কিছুই কঠিন নহে। দৃক্ষস্থতিতে আছে—

“স্বসংবেদ্যং হি তদব্রহ্ম কুমারী জীম্বং যথা।

অযোগী নৈব আনাতি জাতাক্ষো হি যথা ঘটম্ ॥”

জন্মান্বের যেমন ঘটাদি পদার্থের চাক্ষুযজ্ঞান জন্মে না, কুমারী যেমন জীম্ব বৃক্ষিতে পারে না, অযোগীও সেইরূপ স্বসংবেদ ব্রহ্মের বিষয় কিছুই আনিতে পারে না।

“যোগিনস্তঃ প্রপশ্যন্তি ভগবন্তং সনাতনম্ ॥”

তন্মে বলিয়াছেন—“অভ্যাসাৎ কাঙ্ক্ষিণ্যনি যথা শাস্ত্রাণি বোধয়েৎ।

তথা যোগং সমাস্তা তত্ত্বজ্ঞানং চ লভ্যতে ॥”

ককাবাহিবর্ণের অভ্যাস যেমন শাস্ত্রবোধ উৎপাদন করে, যোগও সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানের উদয় করাইয়া থাকে।

তত্ত্বজ্ঞান যোগসাপেক্ষ—যোগাভ্যাস হইতেই তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়। শ্রুতিতে আছে—“আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ”; এবং ইহাও বলিয়াছেন “শাস্ত্র, দ্বান্ত, উপবন্ত, তিতিক্ষু ও সমাহিত হইয়া আপন অভ্যাসের আত্মার উপলব্ধি করিবে।”

ভগবান্ এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বলিয়াছেন—তিনিই ক্ষেত্রজ। অপরা প্রকৃতির কার্য্য হইল যেহেতু বা ভোগসাধন-অব্যাহিক্রমে পরিণত হওয়া, এবং পরা প্রকৃতি বা ক্ষেত্রজের কার্য্য—ভোক্তব্য। ইনিই প্রকৃতি হইয়া “ভূত্বৈ প্রকৃতি-পুরুষ ক্ষেত্রজ বা আত্মা, ইনিই জ্ঞেয় জ্ঞান-গুণান্” প্রকৃতির গুণের ভোক্তা হন। প্রকৃতপক্ষে এই প্রকৃতি-পুরুষ একই বস্তুর দুটি দিক মাত্র। পরমাখ্যার এই দুইটি প্রকৃতি একত্রে থাকার জন্যই অঙ্গ পুরুষের সংসার-ভাব পরিলক্ষিত হয়। পরা ও অপরা প্রকৃতিদ্বয় একত্র মিলিলেই

জীবের বন্ধাবস্থা হয় এবং জ্ঞানোদয় না হওয়া পর্যন্ত এই বন্ধাবস্থাই বর্তমান থাকে। জ্ঞানধারা পুরুষ নিম্ন পরিচয় পাইলেই অপরা প্রকৃতির মমতা-বন্ধন হইতে জীব মুক্তিসাধন করে। এই মোহবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিলেই জীব স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন অপরা প্রকৃতি রক্ষের জীর্ণত্বের মত আপনাই স্থলিত হইয়া যায়। তাই বেদান্ত বলেন—প্রবুদ্ধ হইবার পরে অর্থাৎ স্বরূপদর্শনের পর এই জগৎপ্রতি স্বপ্নদর্শন তিরোভূত হইয়া যায়। জ্ঞানোদয়ের সন্দেশ আমার সৃষ্ট বিশ্ব আর আমার প্রতীতির বিষয় হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া এই বিশ্ব একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় না, কিন্তু মুক্ত জীব তৎসমক্ষে উপাসী হইয়া যান। তিনি প্রপঞ্চাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া আর প্রপঞ্চ দর্শন করেন না। বস্তুমাত্রেরই কাহারও বোধের বিষয় হইয়া তবে প্রতীত হয়, জীবের স্বরূপে স্থিতি হইলে আর তাহার বুদ্ধির অস্তিত্ব থাকে না, সুতরাং জগৎপ্রতি বুদ্ধির পরিণাম লাভ না হওয়ায় আর জগতের কোন অনুভব থাকিতে পারে না। সেইজন্য মুক্ত জীবের দেহেন্দ্রিয়াদি বস্তু কণ্ঠ করিলেও তাঁহার আর কণ্ঠবন্ধন হয় না। ক্ষেত্রের সহিত ক্ষেত্রজের তাৎপর্য্য হেতুই জগদদর্শন হয়, উহা তাঁহার ব্যবহারিক স্বরূপ; ক্ষেত্রজের এই ব্যবহারিক-ভাব দেখাইয়া পরে তাঁহার পারমার্থিক অসংসারি-স্বরূপ দেখানো হইতেছে। ক্ষেত্রজের এই অসংসারি-স্বরূপই জ্যেয় বস্তু, এবং ঐ জ্যেয় বস্তুই ব্রহ্ম, ইহা না জানিলে অমৃতত্ব লাভের অধিকারী হইতে পারা যায় না। ভগবান্ বলিতেছেন—সেই জ্যেয় ব্রহ্ম-বস্তু অনাদি, তিনি সং-অসং প্রমাণের বিষয় নহেন। সাধারণতঃ যাহা ইন্দ্রিয় জ্ঞানে লক্ষিত হয় তাহাই সং, যাহা ইন্দ্রিয়াদির অগোচর তাহাই অসং; তিনি এই সদস্য অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম কিছুই নহেন—তিনি নির্কিংশেব স্বপ্রকাশ রূপ। তিনি কিছুই নহেন, তবে কি তিনি শূন্যমাত্র?—তাহা নহে। তিনি কিছুই নহেন ইহার অর্থ এই—যেমন স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু আমার মনের অতিরিক্ত কোন পদার্থ নহে, তজ্জপ পরা বা অপরা প্রকৃতি স্থূল বা সূক্ষ্ম তাঁহা হইতে কিছু অতিরিক্ত পদার্থ নহে। কিন্তু সং-অসং ভাব তাঁহার স্বরূপে না থাকিলেও যতক্ষণ পর্য্যন্ত “সর্বের” প্রতীতি আছে, ততক্ষণ তিনিই সর্বাঙ্গরূপে—“সর্বতঃ পাশিপাৎ তং সর্বোতোহক্শির্বোমুখম্। সর্বতঃ স্ফুটমলোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।” কিন্তু ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণে “বহিঃশূন্য ভূতানামচরং চরমেব চ” এই সর্বাঙ্গক ভাবও থাকে না। ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ এই সর্বাঙ্গক ভাবেই বুঝিতে হয়। “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্মানন্দরূপমমৃতং বহিভাতি”—ইহাই ব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণ। কনক কুণ্ডলের যেমন ভিতরে বাহিরে স্বর্ণ, তেমনই দৃশ্য-জগতের অন্তরে বাহিরে এবং তাহার অতীত ভাবেও কেবল এক ব্রহ্মই বিচরমান আছেন।

সাংখ্যের মতে জগৎ প্রকৃতির স্বতঃ পরিণাম মাত্র। গীতার মতে যাহা কিছু হইয়াছে সমস্ত তাঁহারই ইচ্ছায়—“ময়াধ্যাক্ষেপ”—তিনি স্বয়ং যেন ষিখা বিভক্ত হইয়া প্রকৃতি ও পুরুষ-

রূপে খেলা করিতেছেন। সেই প্রকৃতিই “ব্রহ্মযোনি বা মহন্ততু” এবং ঈশ্বর বীজপ্রদ পিতা, অর্থাৎ তাঁহার ঈশ্বরেই

প্রকৃতির গর্ভাধান হইতেছে। ঈশ্বর স্বয়ং কামগন্ধহীন, নির্কিঞ্চর, আপনাতে আপনি প্রতিষ্ঠিত, তথাপি অচিন্ত্যনীয় ষৌণ্ডিক-বলে তিনি এই বিশ্বসংসারের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার সাধন করিতেছেন। এই সৃষ্টি একবারে অলৌকিক। সৃষ্ট বস্তুর সহিত তাঁহার কোন যোগ

নাই। সর্বাঙ্গাপক অথচ কিছুতে তিনি লিপ্ত নহেন, এ বিচিত্র অবস্থা এক ক্রিয়ার পর অবস্থাতেই অনুভব করা যায়। তিনি লিপ্ত কেন হন না? প্রথমতঃ সৃষ্ট বস্তু প্রকৃতই কল্পিত, যাহা কল্পিত বা স্বপ্নমাত্র তাহা বস্তুতন্ত্রতা-বিহীন। সুতরাং কেই বা কিসে লিপ্ত হইবে? তাহা ব্যতীত ব্রহ্ম “স্বপ্নাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি, অণুভ্যোহণু চ”—এত সূক্ষ্ম যে অণু তাহার নিকট স্থূল। এত সূক্ষ্ম আর কোন বস্তু হইতে পারে না বলিয়া তিনি কিছুতেই লিপ্ত হইতে পারেন না। যেমন বায়ু সূক্ষ্ম পদার্থ হইলেও অত্যন্ত সূক্ষ্ম নহে, এইজন্য তাহার স্পর্শ আমরা ত্বকে অনুভব করিতে পারি। শূন্য বা ব্যোম বায়ু অপেক্ষাও সূক্ষ্ম—সেই শূন্য কোন বস্তু লিপ্ত হইতে পারে না। সেই শূন্যের অণুরও দশভাগের একভাগ ব্রহ্মাণু, সুতরাং তাহা কিরূপে অল্প বস্তুর সহিত সংযুক্ত হইবে? তাই ব্রহ্ম সকল বস্তুর আধার হইয়াও সকল বস্তু হইতে পৃথক্। আপ্তকামের ইহা এক অপূর্ব লীলা। কিন্তু সে অবস্থাতেও তিনি অনাসক্ত এইজন্য সব সাজাই তাঁ’র, তথাপি তিনি সকলের সহিত সন্ধ-বহিত। ব্রহ্মতে সর্পদ্রম হইলে ব্রহ্মই যেমন কল্পিত সর্পের আশ্রয় হয়, সেইরূপ নিগুণ ব্রহ্ম সত্ত্বাদিগুণের অতীত হইয়াও সত্ত্বাদিগুণের পালক। ব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণ বুঝানো যায় না, যেমন ক্রিয়ার পর অবস্থা কাহাকেও বুঝাইবার উপায় নাই, কিন্তু তাহা অনুভবগম্য, এইজন্য তাহার অস্তিত্বে সন্দেহ করা যায় না। ব্রহ্মের তটস্থ-লক্ষণের যাহা তাঁহার স্বরূপের কিছু কিছু ধারণা হয়—তাঁই ভগবান্ ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ১০শ শ্লোক হইতে ১৭শ শ্লোক পর্য্যন্ত ব্রহ্মের তটস্থ-লক্ষণ বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। অর্থাৎ সেই ব্রহ্মই সকলের অন্তরে বাহিরে, দূরে ও নিকটে; তিনিই স্থাবর-জঙ্গম; সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কগণ তাঁহারই জ্যোতিঃ মাত্র। তিনি বহি ও এক, অথও, অবিকৃত তথাপি বিভক্তের মত দৃষ্ট হইতেছেন, তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্ম সেইজন্য আমাদের জ্ঞান-দ্বার ইন্দ্রিয়গণের অবিজ্ঞেয়, তিনিই জ্যেয় ও জ্ঞানগম্য, এবং সকলের দ্বারা তিনিই অধিষ্ঠাতা। তাঁহাকে না জানিলে প্রকৃতি-নৃত্য দেহেন্দ্রিয়াদির কবল হইতে পরিভ্রাণের অল্প উপায় নাই। এইজন্য জ্ঞানালোচনা ও জ্ঞানের সাধনগুলি জানিয়া জ্যেয় বস্তুর যথার্থ ধারণা করিয়া লইতে হয়।

এই অধ্যায়ের ৭ম শ্লোক হইতে ১১শ শ্লোকোক্ত অমানিত্ব, অধস্তিত্ব প্রভৃতি সদগুণবান্দি আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করা আবশ্যিক, উহাই জ্ঞানের সাধন, এবং প্রকৃত জ্ঞান উৎপন্ন হইলে জ্ঞানীর ঐ সকল লক্ষণগুলি প্রকটিত হয়।

“ধ্যানেনাস্মি পশন্তি কেচিদানন্দমাশ্রয়ম্।

অন্তো সাংখ্যেন যোগেন কৰ্ম্মযোগেন চাপরে ॥

অন্তো স্বৈরমজ্ঞানন্তঃ স্ফোতোভ্য উপাসতে।

তেহপি চাতিতরন্ত্যেব যুক্ত্যং স্ফুটপরাযণাঃ ॥”

(১) কোন কোন অধিকারিগণের পক্ষে ধ্যানযোগই আত্মদর্শনের উপায়, তাঁহার বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত আত্মাকে প্রত্যক্ষ করেন, (২) দ্বিতীয় অধিকারিগণ প্রকৃতি-পুরুষের প্রভেদ আলোচনা দ্বারা আত্মদর্শন করেন, (৩) এবং সেইজন্য তৃতীয় অধিকারিগণ অষ্টাদ্ধ যোগের সাধনে

অ-সুত হন, এবং (৪) চতুর্থ অধিকারিগণ ভগবৎ-শ্রীভার্য কৰ্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা আত্মদর্শনের চেষ্টা করিয়া থাকেন।

ধ্যানযোগ কি? শব্দাদি বিষয়সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রত্যাহৃত করিয়া মনেতে আটকাইতে হয় এবং মনকে আত্মাতে উপসংহৃত করিয়া একাগ্রভাবে যে চিন্তা, তাহারই নাম ধ্যান। এই ধ্যানকালে বিদ্যাতীত জ্ঞানধারা থাকে না, তৈল ধারার মত অবচ্ছিন্ন মনোবৃত্তিই বহিতে থাকে। সেই ধ্যানের দ্বারা বুদ্ধিতে কোন কোন যোগী প্রত্যক্ষ চেতন বা আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন।

সাংখ্যযোগ কিরূপ? সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় আমার দৃশ্য, আমি এই গুণত্রয় হইতে বিলক্ষণ, এবং এই গুণত্রয়ের বাহা কিছু ব্যাপার আমি তাহারই দ্রষ্টা। আমি অবিনাশী অপরিণামী আত্মা। এই প্রকার প্রকৃতি-পুরুষের বিভাগ চিন্তাই সাংখ্যযোগ—(শঙ্কর)। এইরূপ সাংখ্যযোগ দ্বারা সংস্কৃত অন্তঃকরণে কেহ কেহ আত্মদর্শন করিয়া থাকেন। অষ্টাঙ্গ যোগাভ্যাস ইহাদেব সাধনা। আবার কোন কোন অধিকারিগণ নিকাম কৰ্ম্মযোগ অবলম্বন করিয়া ভজনা করেন। তদ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে তাঁহারা নিষিধ্যাননের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া আত্মদর্শন করিয়া কৃতার্ক হন।

কিন্তু যাঁহারা অতিমন্দ অধিকারী তাঁহারা পূৰ্ব্বোক্ত উপায় অবলম্বনে অসমর্থ হইয়া গুরু-বাক্যানুসারে তাঁহার উপদিষ্ট উপায়ে শ্রদ্ধালু হইয়া আত্মোপাসনা করিয়া থাকেন, তাঁহারাও যত্ন অতিক্রম করিয়া ভবিষ্যতে জ্ঞানলাভ করেন।

পূজ্যপাদ গুরুদেব লাহিড়ী মহাশয় বলিয়াছেন—ভালরূপে ১৭২৮ বার প্রাণায়াম করিলে নির্মল ব্রহ্মস্বরূপ অণু দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকেই তিনি ধ্যান-যোগ বলিয়াছেন, কারণ ধ্যানেতে ধ্যেয় বস্তু কিছু থাকা চাই, উহাই সাবলম্ব-ধ্যান। আর সাংখ্যযোগ হইতেছে নিরাবলম্ব-ধ্যান—অসংখ্য প্রাণায়াম দ্বারা মন যখন বিষয় প্রভৃতিতে অনাসক্ত হইয়া স্থির হয়, সেই নির্বিষয় অর্থাৎ আপনাতে আপনি থাকা রূপ যে স্থিতি তাহাই প্রকৃত সাংখ্যযোগ। আর ক্রিয়াযোগ হইতেছে—যাঁহারা ফলাকাতঙ্ক রহিত হইয়া প্রাণায়ামকে স্থির করিবার কৌশল অষ্টাঙ্গযোগ অবলম্বন করিয়া থাকেন—তাঁহারা কৰ্ম্মযোগী। কিন্তু সমস্ত উপায়গুলির মধ্যেই ক্রিয়াযোগ আছে।

“জানাদেব হি কৈবল্যমতঃ স্রাস্তং সমুচ্চয়ঃ।

সহায়তাং ব্রজেৎ কৰ্ম্ম জ্ঞানসু হিতকারি চ॥”

জ্ঞান দ্বারাই কৈবল্য লাভ হয়, কিন্তু নিকাম কৰ্ম্মাদি দ্বারা সেই জ্ঞানলাভের সহায়তা হয়।

ক্রিয়াযোগ দ্বারা বৃত্তি

একমাত্র প্রাণকৰ্ম্মই নিকাম কৰ্ম্ম। এই প্রাণকৰ্ম্মের

সাধনার দ্বারাই প্রাণের স্থিরতা সম্পাদিত হয়। স্থিরতাই

প্রাণের স্বাভাবিক অবস্থা, এবং চাক্ষু্যই বিকৃত অবস্থা। প্রাণ স্থির হইলেই মৃত্যু বস্তুর প্রত্যক্ষ হয়। স্থির জলে সূর্যের প্রতিবিম্ব স্বাভাবিক হয়, বিক্ষিপ্ত জলে প্রতিবিম্ব

বিকৃত দেখায়। যেমন মেঘ-মালার দ্বারা সূর্য্যকিরণ আচ্ছাদিতবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে, আবার মেঘমালা অপসারিত হইলে সূর্য্যকিরণকে প্রত্যক্ষ করা যায়, তদ্রূপ প্রাণায়াম প্রভৃতি প্রাণবৃত্তি দ্বারা অনন্ত স্থিরতা যেন আচ্ছাদিত বলিয়াই বোধ হয়। সাধনশক্তি দ্বারা আবার প্রাণায়াম-বৃত্তি রুদ্ধ হইলেই চির স্থির, চির অবিকৃত স্থির প্রাণকে উপলব্ধি করা যায়। এই স্থির প্রাণই অখণ্ড একরস আত্মারই নামভেদ-মাত্র। এই জ্ঞান সাক্ষাৎ জ্ঞান স্বরূপ আত্মার অববোধই কৈবল্য লাভের প্রত্যক্ষ কারণ হইলেও, স্পন্দনাজিকা প্রাণবৃত্তি এই অববোধের যে প্রধান ভাবে অন্তরায়, তাহার কোন সন্দেহ নাই। প্রাণবৃত্তি নিস্পন্দিত হইলেই সমস্ত বাধা ক্ষীণ হইয়া যায়; তখন আত্মবোধ বাধাশূন্য হওয়ায় মেঘযুক্ত সূর্যের মত স্বয়ং প্রকাশিত থাকে। প্রাণায়ামরূপ প্রযত্নের দ্বারা প্রাণশক্তিকে আয়ত্ত করা যায়। চঞ্চল প্রাণই মোহপাশ এবং উহাই মৃত্যুভয়ের কারণ; প্রাণায়াম-সিদ্ধির দ্বারা সেই ভয় সম্যক বিদূরিত হয়। তাহা ব্যতীত মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং ভূত ও রূপাদি বিষয় প্রাণের দ্বারা সর্বদেহে পরিচালিত হয়।

“মনোবুদ্ধিরহংকারো ভূতানি বিষয়াশ্চ যঃ।

এবং ত্রিহ স সর্বত্র প্রাণেন পরিচাল্যতে॥”—মহাত্মারত, শান্তিপর্ক

সুতরাং প্রাণ যদি স্থির হয়, তাহা হইলে মন, বুদ্ধি ও রূপাদি বিষয় বাহা মনকে চঞ্চল করে— তাহা আর উঠিতেই পারে না।

চক্ষুঃ-শ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ও প্রাণ বর্তমান রহিয়াছে এবং বিষয়-জ্ঞানবাহক যন্ত্রেও অধিষ্ঠিত রহিয়াছে, মস্তিষ্কের মধ্যেও উহা বর্তমান আছে। “প্রাণো হৃদয়ন্, হৃদি প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতঃ”— প্রাণ হৃদয়ে থাকে, চক্ষুঃসিদ্ধি নাড়ীতে স্বরূপ (বোধবাহী) প্রাণ-স্থান, শাসনেন্দ্রেও সেই প্রকার প্রাণবৃত্তি রহিয়াছে। তাই শ্রুতি বলিলেন—“উৎপত্তিমায়তিং স্থানং বিভূষকৈব পঞ্চধা। অব্যাক্ষকৈব প্রাপ্তস্ত বিজ্ঞানায়তমমুত্তমং”। প্রাণের উৎপত্তি, আগমন, স্থিতি, বিভূষ এবং বাহ ও অব্যাক্ষক ভেদে পঞ্চ প্রকারে অবস্থিতি জানিয়া (সাধক) অমৃত ভোগ করেন।

সমস্ত সৃষ্টির প্রথমের প্রাণ—“প্রাণো ভূতানাং স্রোষ্ঠঃ”।

প্রাণ

জাগতিক সমস্ত পদার্থকে “রয়ি” ও “প্রাণ” বলা হইয়াছে।

তন্মধ্যে প্রাণই শক্তি-পদার্থ ও রয়ি জব্য-পদার্থ। “এবোহগ্নিস্তপত্যেব সূর্য্যঃ, এব পঙ্কজো মধবান্বেব বায়ুঃ। এব পৃথিবী রয়ির্দেবঃ সমসচ্চায়তনঞ্চ যৎ”—প্রঃ। এই প্রাণ অগ্নি হইয়া তাপ দিতেছেন, ইনি সূর্য্য, ইনি পঙ্কজ, ইনি মধবান্ (ইন্দ্র), ইনি বায়ু, ইনি পৃথিবী, এবং ইনি প্রকাশস্বভাব রয়ি (চন্দ্র); অধিক কি, যাহা সৎ ও অসৎ এবং অমৃত তাহাও ইনি। সেই শক্তি পদার্থের স্থানই সূর্য্য নাড়ী, উহাই স্থির প্রাণের আধার।

“দীর্ঘাশ্বিনুর্দপর্ধ্যস্তং ব্রহ্মদণ্ডেতি কথ্যতে।

ভক্তান্তে সূর্যিরং স্বপ্নং ব্রহ্মনাড়ীতি স্থিতিঃ॥”—উত্তর গীতা

মস্তক পর্ধ্যস্ত যে দীর্ঘাশ্বি অর্থাৎ মেরুদণ্ড রহিয়াছে তাহাকে ব্রহ্মদণ্ড বলে, তাহার মধ্যে খুব কোমল ও স্বপ্ন ব্রহ্মনাড়ী রহিয়াছে। এই ন ড়াৰ মধ্যেই শ্বাসকে দাপনা করিতে হইবে। যদি বলা যায় সে পথ ভেদে আমাদের দুই নহে, কিন্তু সে আমরা

তন্মধ্যে প্রাণকে পরিচালনা করিব? তাই শ্রুতির উপদেশ “যেনাসৌ পশ্ততে মার্গং প্রাণন্তেন হি গচ্ছতি”—অমৃতবিশু। মনের দ্বারা যদি ঐ মার্গকে লক্ষ্য করা যায় তবে প্রাণও সেই মার্গে গমন করিবে।

এই সঙ্গে পুষ্পপাদ লাহিড়ী মহাশয় বেদান্ত ব্যাখ্যায় বাহা বলিয়াছেন তাহা বুঝিলে উপরোক্ত বিষয়টি বুঝিবার পক্ষে আরও সুবিধা হইবে। “পুরুষ চতুষ্পাদ—জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয় এই চারিটি অবস্থা। এই চারিটি অবস্থার ৪টি স্থান, যথা—(১) নাভি, (২) হৃদয়, (৩) কণ্ঠ, (৪) মূর্ধা। নাভিতে বায়ু থাকিলে নানাদিকে মন প্রাবৃত হয়, মন নানা স্থানে যাওয়ায় চক্ষের পলক পড়িতে থাকে। আবার যখন ক্রিয়াধারা বায়ু নাভিতে স্থির হয় তখন মনও স্থির থাকে চক্ষেরও পলক পড়ে না। এই স্থিরতাই অমৃতবস্বরূপ ব্রহ্মের প্রথমপাদ। হৃদয় হইতে কণ্ঠ পর্যন্ত বায়ু চলায়মান থাকিলে ভিতরে ও বাহিরে স্বপ্নদর্শন হয়। বাহিরের স্বপ্ন বাহিরের বস্তু দর্শন, যাহা প্রকৃত পক্ষে নাই তাহাই দেখিয়া মোহিত হওয়া। ভিতরেরও যাহা নাই তাহাই স্বপ্নে দেখা যায়, যেমন স্বপ্নে সর্প নাই অথচ সর্প দেখিলে যে ভয়ের উদ্বেক হয়, সেইরূপ ভয় দেখা। হৃদয় হইতে কণ্ঠ যে বায়ু চলায়মান রহিয়াছে তাহা স্থির হইলেই আর স্বপ্ন দেখা যায় না। বাহিরেও সে ব্রহ্ম ব্যতীত কিছু দেখে না। স্বপ্ন না দেখাই ব্রহ্মজ্ঞানের চিহ্ন হইতেছে—ইহাই ব্রহ্মের দ্বিতীয় পাদ। যখন বায়ু হৃদয়েতে স্থির হয় তখনই সুসুপ্তাবস্থা অর্থাৎ তখন নানাত্বের জ্ঞান বিলুপ্ত হয়। ইহাই ব্রহ্মের তৃতীয় পাদ। এই তিন পাদের উর্ধ্বে যে বায়ু রহিয়াছে তাহারই নাম অমৃত। উহা উর্ধ্বে উন্মিত হইয়া ব্রহ্মরূপে যখন স্থির হয়, তখনই গগন-সদৃশ অবস্থা প্রকাশ পায়। উহাই চতুর্থপাদ বা তুর্ধ্যাবস্থা।”

যখন তুমি অস্থির হও, তাহার মানে এই যে তোমার বুদ্ধি তখন স্থির নহে। তখন ইহা-উহা করিবার, ওখানে-সেখানে বাইবার কত কি ইচ্ছা হয়, আবার ক্রিয়া করিয়া যখন স্থির হইয়া যাও, যখন বহু বাসনায় চিত্ত বিক্ষিপ্ত না হয়, তখন তোমার বুদ্ধিও স্থির হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যে বুদ্ধি ব্রহ্মমুখী তাহাতে আর কল্পনা থাকে না, তখন মনও নিরুদ্ধ, বুদ্ধিও স্থির অচঞ্চল। এই স্থৈর্য যখন পরাকাষ্ঠা লাভ করে তখনই তাহাকে পরাবুদ্ধি বলে। উহাই ক্রিয়ার পর অবস্থা। হৃদয়েতে প্রাণবায়ুর প্রতিষ্ঠা হইলেই ঐরূপ স্থৈর্যের পরাকাষ্ঠা লাভ হয়। এই পরমস্থিরতার অবস্থাতেই ‘সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ’ হইয়া থাকে। তখন আপনি না থাকায় এষ্টার দৃশ্যপ্রপঞ্চও থাকে না, সে অবস্থায় বিশ্বের উৎপত্তি, প্রলয় কিছুই সম্ভব হয় না। “জগদ্বাদি অসত্য” এই অবস্থায় বলা যাইতে পারে।

“আসীদ্বিৎ তমোভূতং অপ্রজাতং অলক্ষণং”—প্রথমে কিছুই ছিল না, তখন একমাত্র ব্রহ্মই ছিলেন, কিন্তু অজ্ঞ জ্ঞাতার অভাবে ব্রহ্মও না থাকার মতই হইয়া রহিলেন। এই অগোচর, অনির্দেশ্য বস্তু হইতে, এক পুরুষ উৎপন্ন হইলেন—ইনিই প্রথম পুরুষ নারায়ণ, কারণারবশ্যায়ী। কৃষ্ণরূপ কারণলিঙ্গে প্রথম দৃষ্ট হন। তাঁহাকে ঔকার-মহাশূ—বলা যায়। এই শূল, শূন্য, কারণ শরীরই ঔকার, এবং তাহার অভীত বিদেহ পুরুষ। এই

তিনটি শরীরই সেই বিদেহ পুরুষের প্রকৃতি। তখনও প্রকৃতি-পুরুষ সমবস-স্বাবাপন্ন। পরে তাহা পৃথক হইয়া বিচ্ছিন্নবন্ধন হইয়া গেল। কিন্তু তখনও উভয়ের মধ্যে চেতনাস্বাক্ শিব ও জড়াস্বাক্ প্রকৃতি বর্তমান রহিলেন। তাহাই বিভক্ত হইয়া দুইটি রূপ গ্রহণ করিল—একটি পুরুষ ও একটি কন্ডা হইল। তখন তাহাদের সম্বন্ধস্বাক্ মন ও মনের কার্য-নির্বাহক ইন্দ্রিয়াদি রচিত হইল, এবং ইন্দ্রিয়াদিব কার্যস্থান শূল দেহাদিও রচিত হইল। পরে মন, চঞ্চল হইয়া অভিমানাস্বাক্ বৃত্তি বশতঃ পুরুষ আপনাকে ও কন্ডাকে পৃথক রূপে দেখিতে লাগিল। পরে পুরুষের মন কন্ডার প্রতি আসক্ত হইল; এবং মনের চাকল্য দ্বারা নিজেকেই নিজে স্থগিত করিলেন অর্থাৎ পুরুষ কন্ডার গর্ভে আপনাই জন্মগ্রহণ করিলেন। এইরূপে সকল জীবের উৎপত্তি হইল। ইন্দ্রিয়, মন, অহঙ্কার ও প্রাণ এ সমস্তই চঞ্চল ভাব। গতিশীল হইলেই আশ্রয় ঐ সকল উপাধি হয়। এই উপাধি বা আবরণই জীবের জীবত্ব। উপরোক্ত (ইন্দ্রিয়, মন, অহঙ্কার ও প্রাণ) আবরণচতুষ্টয়ই ব্রহ্মনের কারণ; এই আবরণ চতুষ্টয় হইতে মুক্ত হইলেই জীবত্ব নাশ হয়। এই চাকল্যই সমস্ত আবরণের মূল কারণ তাই যতদিন জীবের এই অবস্থা থাকে ততদিন তাহার জন্ম-মৃত্যুর চাকল্য, সুখ-দুঃখের চাকল্য, আরও কতবিধ চাকল্য লক্ষিত হয়। এই চাকল্য হইতেই হৃদয়ের ধুকধুকানি ও ভয়-ব্যাকুলতার শ্রোত প্রবাহিত হইয়া থাকে। এই চাকল্য বা বেগ নাতীমুখে সর্বত্র সম্প্রসারিত হয়। স্তবরাং যতদিন এই নাতীশোধান বা ভূতভক্তি না হয়, ততদিন স্বরূপাবস্থায় প্রত্যাবর্তন করা যায় না। তাই প্রাণকে স্থির করিয়া এই আবরণ চতুষ্টয়কে ছিন্ন করিতে পারিলেই যোগী আপনাতে আপনি প্রতিষ্ঠিত হন। ইহারই নাম তুর্ধ্যাবস্থা। ক্রিয়ার পর অবস্থা গভীর হইতে গভীরতর হইয়া এই তুর্ধ্যাবস্থায় উপনীত করে। এই অবস্থা লাভ করিলে আর যোগীকে পুনরাবর্তন করিতে হয় না। উহাই নিশ্চর্ণ ভাব, উহা আনন্দময় বা নিয়ানন্দময় নহে। উহা কুটস্থ অধিকারী। সর্বগুণ অতিমাত্র বিরুদ্ধ হইলেই আনন্দাশ্রয় হয়, উহা আশ্রয় নিশ্চর্ণ অবস্থার নিম্ন অবস্থা। কিন্তু ঐ অবস্থা লাভ করিতে পারিলেও যোগী বিশোকা অবস্থা লাভ করেন।

গীতায় ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ উভয়কেই ভগবানের প্রকৃতি বলা হইয়াছে—সুতরাং উভয়ই ভগবান্ হইতে কোন স্বতন্ত্র বস্তু নহে—আমরা পূর্বে বলিয়াছি। ভগবান্ যে জগৎলীলা করেন, এই লীলা-প্রসঙ্গেই উভয়ের ভেদ স্বীকৃত হয়।

প্রকৃতি বা মায়া হইতে

মুক্তিলাভের উপায়

এই জন্ম মুক্তিতার্থী সাধকবৃন্দের উভয় তত্ত্বই জ্ঞাতব্য।

উভয়ের ভেদ যেখানে মিলাইয়া গিয়াছে, তাহাই পরম

তত্ত্বের স্থান। তববিধেই এই পরতত্ত্বকেই তত্ত্ববস্তু বা জ্ঞেয় বলিয়া থাকেন। এই তত্ত্ব বস্তুটিকেই পরম ব্রহ্ম, পরমাশ্রা বা পরমেশ্বর বলা হইয়া থাকে। উহা এক অখণ্ড অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দস্বরূপ। সাংখ্য বলিয়াছেন—“জ্ঞানামুক্তিঃ”। এই সচ্চিদানন্দস্বরূপের জ্ঞান হইলেই মুক্তি হয়। যতদিন এই জ্ঞান লাভ না হয় ততদিন ত্রিবিধ দুঃখের জালায় জীব জলিয়া পুড়িয়া মরে। এই ত্রিবিধ দুঃখের হেতু জীবের শূলাদি দেহজন্ম, এবং জীবের

উহাতে অত্যন্ত আসক্তি হেতু এই দুঃখ অমূল্য হয়। অবশ্য দেহাদির উৎপত্তির কারণ কৰ্ম, এবং দেহ থাকিলে কৰ্ম হওয়া অনিবার্য। জীবের স্থল দেহে পঞ্চদশ গুণ বর্তমান থাকে। উহাই প্রপঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের সমষ্টি। ব্যোম হইতে শব্দ। অনিলে—শব্দ ও স্পর্শ। অনলে—শব্দ+স্পর্শ+রূপ। সলিলে—শব্দ+স্পর্শ+রূপ+রস। এবং ক্ষিতিতে—শব্দ+স্পর্শ+রূপ+রস+গন্ধ। সমস্ত মিলিয়া পঞ্চদশ। এই পঞ্চদশ গুণের দ্বারা জীব মোহিত হইয়া তত্ত্ব বস্তুতে আসক্ত হয়। এই আসক্তিই বন্ধন। এই বন্ধন ছাড়াইবার উপায় হইল যোগাভ্যাস। কিন্তু এই বন্ধনের ফাঁস আসলে স্থলদেহে নাই, স্থলে অভিব্যক্ত হয় মাত্র। উহার বন্ধনের মূল সূক্ষ্মদেহে, এই সূক্ষ্ম দেহের শোধনই ভূতত্ত্ব।

এই ভূতত্ত্ব ব্যতীত সূক্ষ্মদেহে যে সংস্কার লাগিয়া থাকে তাহা কিছুতেই মুছা যায় না। সূক্ষ্ম দেহে—পৃথিবীতত্ত্ব হইতে ভয় উৎপন্ন হয়, জলতত্ত্ব হইতে মোহ উৎপন্ন হয়, অগ্নিতত্ত্ব হইতে ক্রোধ, বায়ুতত্ত্ব হইতে কাম এবং আকাশতত্ত্ব হইতে লোভ উৎপন্ন হয়। সূক্ষ্ম পঞ্চভূতদ্বারা জীবচিতে বহু মনোবৃত্তি উৎপন্ন হইয়া তাহাকে আবদ্ধ করে। যোগাভ্যাস দ্বারা শরীর ও প্রাণ গুল হইলে মনোবুদ্ধিও বিমুক্ত হইয়া যায়, এবং বিমুক্ত বুদ্ধির মধ্যে আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ হয়। সেইজন্য প্রাচীন আচার্য্যেরা ও ঋষিরা যোগাভ্যাসের দ্বারা সকলকে উপদেশ করিয়াছেন। যোগাভ্যাস দ্বারা ভূতত্ত্ব হইলে কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয় ও মোহ আপনাপনিই নিবৃত্ত হইয়া যায়, এবং মনে পরম প্রশান্ত ভাব আসিয়া সাধককে পরমানন্দের অধিকারী করে। সেইজন্য প্রাচীন ঋষিরা ও আচার্য্যগণ যোগাভ্যাসের দ্বারা সকলকে উৎসাহিত করিয়াছেন। গৌতম-সূত্র বা স্মার্ত্তধর্মে এবং তাহার বাৎস্তায়ন ভাণ্ডেও যোগাভ্যাসের দ্বারা যে উহা লভ্য তাহা স্বীকার করিয়াছেন :—

“অরণ্য গুহাপুলিনাদিহ যোগাভ্যাসোপদেশঃ”—গৌতমসূত্রে তত্ত্বজ্ঞানবিসৃদ্ধিক্রমঃ। যোগাভ্যাসজনিতো ধর্মো জ্ঞানান্তরেহ্যাপ্যবর্ততে। প্রচয়কার্ভাগতে তত্ত্বজ্ঞানহেতো ধর্মো প্রকৃষ্টায়াং সনাধিকারনায়াং তত্ত্বজ্ঞানমুৎপত্তে ইতি। দৃষ্টম্ সমাধিনা “তদ্বর্থে যমনিয়মাভ্যা-মাশ্রয়সংস্কারো যোগাভ্যাসায়াংবিদ্যুপায়ৈঃ”।

তস্তাপবর্গস্তাধিগমায় যমনিয়মাভ্যাসায়াংসংস্কারঃ। যোগশাস্ত্রাভ্যাসায়াংবিধিঃ প্রতিপত্তব্যঃ। স পুনঃ তপঃ প্রাণায়ামঃ প্রত্যাহারো ধ্যানং ধারণেতি। ইন্দ্রিয়বিশেষে প্রসংখ্যানাভ্যাসো রাগদ্বेषপ্রহারণঃ, উপায়স্ত যোগাচার-বিধানমিতি।—বাৎস্তায়ন ভাষ্য।

“যেনাববুধ্যতে তত্ত্বং প্রকৃতে: পুরুষস্তচ”—যে জ্ঞান দ্বারা প্রকৃতি ও পুরুষের তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় তাহাই প্রকৃতি হইতে মুক্তির উপায়। তত্ত্ববিচার দ্বারা জ্ঞান উৎপন্ন হয়। কিন্তু মলযুক্ত চিত্তে তত্ত্ব-বিচারের উদয়ই হয় না। এইজন্যই ভূতত্ত্ব কবিত হইবে। ক্রিয়াযোগই ভূতত্ত্বের সর্বোত্তম সাধনা। প্রাণপ্রবাহ উর্দ্ধায়াং (বেদের শিরোভাগে অর্থাৎ সহস্রারে) স্থিতি লাভ করিলেই ভূত-প্রকৃতি হইতে যোগীরা মুক্তির উপায় পান।

দেহান্ধবোধই সংস্কার কারণ। শ্রীমন্তাপবতে কপিলদেব বলিয়াছেন—

“ভূতৈঃ পঞ্চভিরারব্ধে দেহে দেহবোধোহসরুৎ।

অহং মমেত্যসদগ্রাহঃ কয়োতি কুমতিশ্রুতিম্॥

তদ্বর্থে কুরুতে কৰ্ম যদ্বদ্বো যাতি সংসৃতিম্।

যোহনুযাতি দ্বদ্বং ক্লেমবিভাকর্ষবন্ধনঃ॥” ভাঃ—৩য় স্কঃ, ৩১শ অঃ

যে সকল জীব যুগ্ম অর্থাৎ বাহ্যার দেহাতিরিক্ত কোন বস্তুর সন্ধান জানে না, তাহারাই এই পঞ্চতত্ত্ব বিনিশ্চিত স্থলদেহে আসক্ত হইয়া মূঢ়তা বশতঃ পুনঃপুনঃ অসৎ আগ্রহবিশিষ্ট হইয়া কুকার্য্য করে। অবিজ্ঞা কৰ্মবন্ধন হেতু যে দেহ এত দুঃখ দেয়, মূঢ় দেহী সেই দেহার্থ কৰ্ম করিয়াই আসক্তি বশতঃ সংসারগতি লাভ করে।

দেবহুতি বলিতেছেন :—

“যাবৎ পৃথক্ত্বমিদমাশ্রম ইন্দ্রিয়ার্থ-

মায়াবলং ভগবতো জনৈশ্চ পশ্যেৎ।

তাবন্ম সংসৃতিরসৌ প্রতিসংক্রমেত।

ব্যর্থাপি দুঃখনিবহং বহতী ক্রিয়ার্থা॥”

হে ভগবন্ লোকসকল যতদিন পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়ফলদ্বারা মায়াকর্ষক বদ্ধিত এই দেহকে তোমা হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া না দেখিতে পার, ততদিন পর্য্যন্ত দুঃখসমূহের দাতা ক্রিয়াফল-প্রসবকারী এই সংসার তাহা হইতে উপরত হইবে না।

কিন্তু দেহ হইতে দেহীকে পৃথক্ ভাবে দেখাও বড় কঠিন। তাই দেবহুতি বলিতেছেন—

“পুরুষঃ প্রকৃতি ব্রহ্মন্ ন যিমুক্তি কহিচিৎ।

অগ্নোহগ্নাপাশ্রয়বান্ধু নিত্যত্যাগানয়োঃ প্রভো॥”

হে প্রভো, হে ব্রহ্মন্, প্রকৃতি ও পুরুষের পরস্পরের মধ্যে যে দৃঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে, এবং ব্রহ্মনেই অবিনাশী, অতএব প্রকৃতি কখনও পুরুষকে পরিত্যাগ করিতে পারে না।

“যথা ঋক্স্ত ভূমেশ্চ ন ভাবো ব্যতিরেকতঃ।

অপাং রসস্ত চ যথা তথা বুদ্ধে: পরস্ত চ॥”

যেমন গন্ধ ও ভূমির, জল ও রসের সম্বন্ধ বিনাভাব হইতে পারে না, অর্থাৎ একের অভাবে অন্নের সত্তা থাকিতে পারে না, তদ্রূপ প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে একের অভাবে অন্নের সত্তা উপলব্ধি হইতে পারে না।

“কৃচিৎ তদ্বাবমর্শেন নিবৃত্তং ভয়মুৎপদম্।

অনিবৃত্তনিমিত্তত্বাং পুনঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে॥”

কখন কখন তদ্ব্য বিচারে কোন কোন পুরুষের সংসার-ভয় নিবৃত্ত হইলেও তাহার কারণদ্বয় অবিনাশী বলিয়া উহা একবারে নিবৃত্ত হইতে পারে না বলিয়া পুনর্বার সেই ভয় উৎপন্ন হয়।

ইহার উত্তরে কপিলদেব বলিতেছেন :—

“অনিমিত্তনিমিত্তেন স্বপ্নশ্চৈবামলাশ্রম।

তীব্রয়া ময়ি ভক্ত্যা চ ক্রতসংকতয়া চিরম্॥

জ্ঞানেন দৃষ্টতত্ত্বেন বৈরাগ্যেণ বলীয়সা ।
তপোযুক্তেন যোগেন তীৱ্ণেণাসমাধিনা ॥
প্রকৃতিঃ পুরুষস্তেহ বহুমানা বহুনিশম্ ।
তিরোভবিত্রী শনকৈরঘোনিবিবারিণিঃ ॥
ভুক্তভোগা পরিত্যক্তা দৃষ্টদোষা চ নিত্যশঃ ।
নেত্বরজাতভং যন্তে স্তে মহিম্নি স্থিতস্ত চ ॥
যথা হুপ্রতিবুদ্ধস্ত প্রস্থাপো বহ্ননর্থভূঃ ।
স এব প্রতিবুদ্ধস্ত ন বৈ মোহায় কল্পতে ॥
এবং বিদিততত্ত্বস্ত প্রকৃতির্ময়ি মানসম্ ।
যুক্তো নাগকুরুত আত্মারামস্ত কহিচিৎ ॥”

অগ্নির উৎপত্তিস্থান অরণির ত্রায় (কাঠ হইতে উৎপন্ন অগ্নি যেমন সেই কাঠকে ধ্বংস করে),
নিকাম ধর্ম, নির্মল মন, তীৱ্ণ তগবৎসুখাঙ্গ, প্রকৃতি-পুরুষের বাধার্থ জ্ঞান, প্রবল বৈরাগ্য,
তপোযুক্ত যোগাত্মক জনিত তীৱ্ণ আত্মসমাধি দ্বারা পুরুষের প্রকৃতি (বা লিঙ্গশরীর)
পূর্নোক্ত প্রকারে নিয়ত বহুমান হইয়া তিরোহিত হইয়া যায় । তখন প্রকৃতিবৎ ভোগ শেষ
হইয়া যায়, এবং পুরুষও প্রকৃতির-দোষগুণের প্রতি সন্তত লক্ষ্য রাখেন; এই ক্ষণ প্রকৃতি যেন
পরিত্যক্তা জীব মত স্বীয় মহিমা যুক্ত পুরুষের কোন অমঙ্গল বা বন্ধন উৎপাদন করিতে
সমর্থ হয় না । পুরুষ নিম্নিত হইলে স্বপ্নযোগে যেমন তাহার নানা অনর্থসংঘটন দৃষ্ট হয়, কিন্তু
জাগরিত হইলে ঐ স্বপ্নকথা তাহার চিন্তে উদ্ভিত হইলেও তাহা আর মোহ উৎপন্ন করিতে
পারে না, সেইরূপ আত্মাতে চিত্তসংযোগকারী যে আত্মারাম পুরুষ, প্রকৃতি তাহার কোন
অপকার করিতে সমর্থ হয় না ।

“এতৈরবৈক্যৈশ্চ পুৰিভির্মনো দৃষ্টমসংপদম্ ।

বুদ্ধ্যা যুক্তীত শনকৈক্কিতপ্রাণোহুতজিতঃ ॥”

আলস্ত পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রোক্ত অত্যাশ্র উপায়দ্বারা এবং পুণ্ডিতপ্রাণ হইয়া (অর্থাৎ
প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়া) অসং পথে প্রবৃত্ত দৃষ্ট মনকে বুদ্ধিদ্বারা যোগ সাধনে নিযোজিত
করিবে ।

উহার ফল বলিতেছেন—

“মনোহচিরাং স্রাধিবজং জিতখাসস্ত যোগিনঃ ।

বায়ু স্নিতাং যথা লোহং স্নাতং ত্যজতি বৈ মলম্ ॥”

যেমন স্বর্ণ অগ্নিতে স্নতপ্ত হইলে অচিরে নিজের মলিনতা পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ জিতখাস
যোগীর চিত্ত অল্পসময়ের মধ্যেই নির্মল হয় ।

এই স্বল্পভূত সমুদায় স্বল্পশরীরে নিহিত থাকে—পূর্বে বলিয়াছি ; স্বল্পশরীর বায়ুভূত,
সুতরাই এই স্বল্প শরীরের প্রাণ । সুতরাই প্রাণময়, সুতরাং স্পন্দনধর্মী ; এই স্পন্দন
যতদিন না ধামিবে ততদিন ত্রিতাপের আলা নিবিবে কিরূপে ? এবং জীব মুক্তি-লাভই বা
কিভাবে করিবে ? সুতরাং প্রাণতত্ত্ব সবন্ধে আরও একটু এখানে আলোচনা করিতে চাই ।

“আত্মন এব প্রাণো জায়তে । যথৈব পুরুষে ছায়া, এতন্নিম্নেতদাততং, মনোকুন্তেনায়াত
শিঙ্করীবে”—প্রশ্ন উপঃ ।

প্রাণতত্ত্ব

আত্মা হইতে এই প্রাণ জন্মলাভ করে, পুরুষ-
দেহে যে রূপ ছায়া সমুৎপন্ন হয়, সেই রূপ এই প্রাণও এই

আত্মাতে (বা পরমেশ্বরে) আতত বা অহংগত থাকে, এবং মনঃসম্পাদিত (কামাদি দ্বারা)
এই স্থূল শরীরে আগমন করে ।

“যথা সন্নাড়োবাধিকৃতান্ বিনিগুণ্ডে—এতান্ প্রামানেতান্ প্রামানধিত্তিষ্ঠেতি, এবমে-
বৈব প্রাণ ইতরান্ প্রাণান্ পৃথক্ পৃথগেব সম্বিধন্তে ॥”—প্রশ্নঃ । সন্নাড়ি যে রূপ ‘এই সমস্ত প্রাম
শাসন কর’ বলিয়া অধিকার-প্রাপ্ত লোকদিগকে নিযুক্ত করেন, ঠিক এইরূপই এই প্রাণও
অপর প্রাণকে (চক্ষুঃ প্রভৃতি এবং স্থায়ী ভেদ সমূহকে) যথাস্থানে নিযুক্ত করিয়া থাকে ।

“পায়ুপৃষ্ঠেপানং চক্ষুঃশ্রোত্রে মুখনাসিকাভ্যাং প্রাণঃ স্বয়ং প্রাতিষ্ঠতে চ মধ্যে তু সমানঃ,
এব হেতুতমসং সমং নয়তি, তন্মাদেতাঃ সপ্তাচ্চিহ্নো ভবতি”—প্রশ্নঃ । উক্ত প্রাণই আপনকে
পায়ু ও উপস্থদেশে নিযুক্ত করে এবং প্রাণ নিজেই চক্ষুঃ শ্রোত্র মুখ ও নাসিকার অধিষ্ঠান
করে । সমান মধ্যস্থানে নাভিতে অবস্থান করে । কারণ ইনিই হৃত অঙ্গকে সমতা প্রাপ্ত
করান । প্রাণাগ্নি হইতে এই সাত প্রকার দীপ্তি (চক্ষুর্দৃশ্য, শ্রোত্রদ্বয়, নাসিকাদ্বয়, মুখ ও
জিহ্বা-সম্পাদিত জ্ঞান) নির্গত হইয়া থাকে ।

“হৃদি শব আত্মা; অত্রৈতদেককশতং নাড়ীনাং, তাসাং শতং শতমেকৈকশ্চাং দ্বাসপ্ততির্ভা
সপ্ততিঃ প্রতিশাবানাড়ী সহস্রাণি ভবন্ত্যাসু ব্যানশ্চরতি”—প্রশ্নঃ । জীবাত্মা মাংসপিণ্ড দ্বারা
পরিব্যাপ্ত হৃদয়াকাশে বাস করেন, এই হৃদয়ে একশত একটি নাড়ী আছে, তাহাদের এক
একটিতে আবার একশত একশত শাখা নাড়ী আছে, সেই প্রত্যেক শাখা নাড়ীতে আবার
বায়ান্তর বায়ান্তর হাওয়ার নাড়ী আছে । এই সকলের অভ্যন্তরে ব্যান বায়ু সঞ্চরণ করে ।
আবৃত্ত্য-মণ্ডল হইতে নির্গত রশ্মি সমূহের ত্রায় হৃদয় হইতে সর্বাধঃবয়গামী নাড়ীসমূহদ্বারা
সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া ব্যান বায়ু বর্তমান আছে ।

এই সকল নাড়ীর অভ্যন্তর দ্বিগাহি যে প্রাণের প্রবাহ হয়, তাহাতেই দেহকে প্রাণময়
করিয়া রাখে এবং শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে চতস্তময় করিয়া রাখে । জীবাত্মার স্থানও জীব-
শরীর মধ্যে হৃদয়ে, এবং এই হৃদয়ে বায়ান্তর হাওয়ার নাড়ী আছে, এই সকলের অভ্যন্তরে
ব্যানবায়ু সঞ্চরণ করে । ইহা দ্বারা ই বুঝা যায় প্রাণাগ্নি বায়ুর মধ্যেই আত্মার শক্তিই ক্রীড়া
করে ।

“অধিকয়োর্জ্জ উদানঃ পুণ্যেন পুণ্যং লোকং নয়তি, পাপেন পাপমুভাত্যমেব মহমলোকম্”
—প্রশ্নঃ । একশত একটি নাড়ীর মধ্যে হৃদয়া নামক একটি উর্দ্ধগামিনী নাড়ী, তাহার দ্বারা
উদানবায়ু উর্দ্ধগামী হইয়া পদতল হইতে মস্তক পর্যন্ত সর্বত্র বিচরণ করতঃ পুণ্য দ্বারা পুণ্যলোক
আর পাপ কর্ম দ্বারা পাপলোকে লইয়া যায়, এবং পাপ-পুণ্য সমান হইলে মহমলোক প্রাপ্ত
করায় । উদান জয় করিলে শরীর লবু হয় ও ইচ্ছাসূত্বের ক্ষমতা হয় । দেহদণ্ডের অভ্যন্তর
বোধবাহী নাড়ীই হৃদয়া । হৃদয়া উর্দ্ধগামিনী । উদানও সেই হৃদয়া স্থিত শক্তি । তাহার
করেন প্রাণ এক প্রকার বায়ু তাহার শাস্তিসিদ্ধান্ত অবগত নহেন । বেদান্ত :

দ্বিতীয় অধ্যায়, চতুর্থ পাদে আছে—“ন বায়ুক্রিয়ে পৃথগ্গুপ্দেশাৎ”—এই শব্দের দ্বারা জানা যায় যে মুখ্য প্রাণ বায়ু অথবা ইন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয়সকলের সামান্য বৃত্তিমান্বিত নহে, কারণ শ্রুতি পৃথক্ ভাবে এই প্রাণের উপদেশ কবিয়াছেন।

“পীতং ভক্ষিতমাত্মাতং বক্তৃপিত্তকফানিলাং।

সমং নয়তি গাত্রাণি সমানো নান মারুতঃ ॥”—যোগার্ণব।

সমান বায়ু অন্তরসকৈ সর্বস্থানে সমনয়ন করে। আত্মারূপে সমনয়ন (assimilate) করা বা শরীরের উপাদান রসবক্তাদিরূপে পরিণত করা সমানের কার্য।

দ্যানসিক্ত পুষ্কবেরা অলৌকিক যোগবল প্রভাবে দেখিয়াছেন—প্রাণবায়ু স্থির হইলেই অনরপদ প্রাপ্তি হয়, সেই অমৃত পদই ব্রহ্মযোগিনি। সেই যোগিনি হইতেই সমুদ্রায়ের উৎপত্তি ও সেখানেই সমুদ্রায়ের লয় হয়। এ সংসারে জীব কৰ্মবশে একবার আসিতেছে ও একবার গাইতেছে, যে ব্রহ্মের খুঁটি প্রাণকে (স্থির বা মুখ্য প্রাণ) দৃঢ়রূপে ধরিয়া থাকে, সে গতায়াত হইতে মুক্ত। এই প্রাণ ক্রিয়া দ্বারাই ক্রিয়ার পর অবস্থা বা স্থিতিপদ লাভ হয়, সুতরাং ক্রিয়াই ক্রিয়ার পর অবস্থার আশ্রয়।

“উনাসহায়ং পরমেশ্বরং প্রভুং,

ত্রিলোচনং নীলকণ্ঠং প্রশান্তং।

দ্বাখা মুনির্গচ্ছতি ভূতযোনিং ॥”—শ্রীরাম তাপিনী।

উমা—উ—শিব, মা—লক্ষ্মী, শিব অর্থাৎ আত্মার লক্ষ্মী বা ঐশ্বর্য এই শরীর। এই শরীরই প্রকৃতি বা উমা, এই উমার সহায়তায় অর্থাৎ এই শরীরের দ্বারা (সাধন শরীরের দ্বারাই হয়) যিনি সকলের শ্রেষ্ঠ সেই ঈশ্বরকে পায়। ঈশ্বর=ক্রিয়ায় পর অবস্থায় স্কন্দয়ে স্থিতরূপ যে অনুভব তাহাই ঈশ্বর। তখন তৃতীয় চক্ষু কুটস্থ দেখেন; সেই তৃতীয় চক্ষু। এই সংসার সমুদ্র-বরূপ, ক্রিয়ারদ্বারা সেই সমুদ্র মন্থন করিয়া যে ঐশ্বর্যাদি লাভ হয়, তাহাই বিষয়রূপ বিষ। সেই বিষকে হজম করেন নীলকণ্ঠ। কণ্ঠস্থিত বোড়শরল পুণ্ড্র বায়ু স্থির হইলে সাধক নীলকণ্ঠ হইয়া যান। তখন সংসার বিষজালা প্রশমিত হইয়া শান্তি পদ লাভ হয়। তখন হয় “বধিব বোবা রসে ডোবা”—সুতরাং কাহারও সহিত কণা কহিতেও ভাল লাগে না, তখনই সাধকের ব্রহ্মযোগিনীতে স্থিতি হয়।

ভূতবল্লীতে আছে—“প্রাণো ব্রহ্ম ইতি, মনো ব্রহ্মতি, বিজ্ঞান ব্রহ্মতি, আনন্দং ব্রহ্মতি ॥” প্রাণ স্থির হইলেই ব্রহ্ম, প্রাণের সঙ্গেই মন থাকে, সুতরাং প্রাণ স্থির হইলেই মন স্থির হইয়া যায়। তখন মনও ব্রহ্ম। পবে ক্রিয়ার পর অবস্থায় বিজ্ঞানপদ লাভ হয়, তাহাও ব্রহ্ম। বিজ্ঞানের পর যে আনন্দ বোধ হয় সেই আনন্দও ব্রহ্ম।

“প্রাণাপানয়ো কৰ্ম্মতি”—প্রাণ ও অপানের কৰ্ম্মই এই ক্রিয়া; এই ক্রিয়া হইতেই ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হয়। এই কৰ্ম্মই প্রকৃত কৰ্ম্ম, আর সব অকৰ্ম্ম।

এইরূপ কৰ্ম্মরহিত অবগত হইয়া যিনি কৰ্ম্মদ্বারা জীবভাব নষ্ট করিতে পারেন তিনিই পরমতত্ত্ব অবগত হইয়া আনায়াসে মুক্তি লাভ করিতে পারেন। জীব বাহাতে মুক্তি লাভ করিতে পারে সেইজন্যই ভগবান্ জ্যোত্শ্ব অধ্যায়ে জীবের বন্ধনের কারণ ও তাহা হইতে বিমুক্তির পথ নির্দেশ করিয়াছেন।

চতুর্দশোঃধ্যায়ঃ

(গুণত্রয়বিভাগযোগঃ)

শ্রীভগবান্‌হুবাচ।

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।

যজ্জ্ঞানান্‌ মুনয়ঃ সর্বৈঃ পরাং সিদ্ধিমিতৌ গতাঃ ॥ ১

অনুয়। শ্রীভগবান্‌ উবাচ (শ্রীভগবান্‌ বলিলেন)। জ্ঞানানাং (সকল জ্ঞানের মধ্যে) উত্তমং (শ্রেষ্ঠ) পরং জ্ঞানং (পরম জ্ঞান) ভূয়ঃ (পুনরায়) প্রবক্ষ্যামি (বলিতেছি), যৎ জ্ঞানং (যাহা জ্ঞানিয়া) সর্বৈঃ মুনয়ঃ (সকল মুনিগণ) ইতঃ (এই দেহবন্ধন হইতে) পরাং সিদ্ধিং (পরা সিদ্ধি) গতাঃ (প্রাপ্ত হইয়াছেন) ॥ ১

শ্রীপর।

পুং প্রকৃত্যোঃ স্বতন্ত্রত্বং ব্যবয়ন্‌ গুণসদতঃ।

প্রাঃ সংসারবৈচিত্র্যং বিস্তরেণ চতুর্দশে ॥

“যাবৎ সজ্জায়তে কিঞ্চিৎ সৎ স্বাবরজদমম্। ক্ষেত্রক্ষেত্রজসংযোগাত্তিদ্ধি ভবতুর্ভব ॥”—ইত্যুক্তম্‌, স চ ক্ষেত্রক্ষেত্রজয়োঃ সংযোগো নিরীশ্বর-সাংখ্যানামিব, ন স্বাতন্ত্র্যেণ। কিন্তু ঈশ্বরে-চ্ছয়া এবৈং কখনপূর্বকং “কারণং গুণসদোহন্ত সৎসদ্যোগিনি জনহ” ইত্যনেন উক্তং সবাধি-গুণকৃতং সংসারবৈচিত্র্যং প্রপঞ্চয়িত্বান্‌ এবভূতং বক্ষ্যমাণমর্থং শ্রোতি—পরং ভূয় ইতি দ্বাত্যাম্‌। পরং—পরমায়নিষ্ঠং। জায়তে অনেনেতি জ্ঞানমুপদেশঃ। ভূয়োংপি তৃত্যং প্রকষণং বক্ষ্যামি। কথং তৎ? জ্ঞানানাং তপঃকর্মাধি-বিষয়াণাং মধ্যে উত্তমং মোক্ষহেতুত্বাৎ। তদেবাহ—যজ্ জ্ঞানান্‌ মুনয়ো—মননশীলাঃ সর্বৈঃ, ইতঃ—দেহবন্ধনানাং, পরাং সিদ্ধিং—মোক্ষং, গতাঃ—প্রাপ্তাঃ ॥ ১

বঙ্গানুবাদ। [পুরুষ ও প্রকৃতির স্বতন্ত্রতা বারণ করিয়া গুণসদ বশতঃ যে সংসারের বিচিত্রতা তাহাই চতুর্দশ অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে বলিতেছেন—]

“ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের সংযোগে, হে ভবতুর্ভব! স্বাবরজদমাত্মক সমুদয় পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে”—ইহাই জ্যোত্শ্ব অধ্যায়ে ২৬শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। সেই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের সংযোগ নিরীশ্বর সাংখ্যগণ ধারণা বলিয়া থাকেন সেজন্য স্বাধীনভাবে ভব মা, কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছয়া তাহা হইয়া থাকে, ইহা কখন পূর্বক ১৩শ অধ্যায়ের ২১শ শ্লোকোক্ত যে সত্যাদিগুণ সমস্ত সংসার-বৈচিত্র্য তাহাই বিস্তৃতভাবে বর্ণনাক্রিয়ায় দুইটি শ্লোক দ্বারা ঐ বক্ষ্যমাণ বিষয়ের প্রশংসা করিতেছেন।—পরং অর্থাৎ পরমায়নিষ্ঠ যে জ্ঞান (যাহা দ্বারা জানা যায়) অর্থাৎ উপদেশ তাহা পুনরায় তোমাকে প্রকটরূপে বলিব। কিন্তু সেই জ্ঞান? মোক্ষের হেতু বলিয়া তাহা সমস্ত জ্ঞান অর্থাৎ তপস্যা ও কর্ম্মাদিবিষয়ক জ্ঞান সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাহাই বলিতেছেন যে—যাহা জানিয়া মননশীল মুনিগণ “ইতঃ”—এই দেহবন্ধন হইতে “পরং সিদ্ধিম্‌” অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—কুটস্থ দ্বারা অনুভব হইতেছে—সকল জ্ঞানীর উত্তম জ্ঞান—যাহা জানিলে আপন আপন কোন কথা বলিতে ইচ্ছা করে না—এমত যে মুনিগণ তাহারাই এই ক্রিয়া পেয়ে (যাহা গুরুবক্তৃগম্য) সকল সিদ্ধির পর যে পরাসিদ্ধি অর্থাৎ ব্রহ্ম—ইচ্ছারহিত যথচ ইচ্ছা না হইতে হইতেই সমুদয় আপন আপন হয়—এইরূপ যথার্থই হয়—ইহা কথার কথা নয়! কাজেরই কথা!! যথার্থ!!! দোহাই তোমার!!!! যাহার পর আর কিছুই নাই।— ভগবান্ ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যে সকল বিষয় বলিয়াছেন তাহার কোন কোনটিকে আরও স্পষ্ট করিবার জন্য এই অধ্যায়ের আশ্রয় হইয়াছে। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের সংযোগেই যে জগদ্বাদি উৎপন্ন হয়—ইহা নিরীক্ষার সাংখ্যমতেও সমর্থিত; এই অধ্যায়ে ভগবান্ বলিবেন সাংখ্যমতাবলম্বিগণ, যেরূপ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের সংযোগ স্বাধীন ভাবেই হইয়া থাকে বলিয়া থাকেন, উহা কিন্তু সেরূপ নহে। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের সংযোগ স্বাধীন ভাবে হইতে পারে না, উহা দ্বন্দ্বেরচ্ছাতেই হইয়া থাকে, এই অধ্যায়ে সেই কথা স্পষ্টভাবে ভগবান্ বিবৃত করিবেন। জীব গুণসঙ্গ দ্বারা বিবিধ বোনিতে পরিভ্রমণ করে, ভগবান্ পূর্ণাধ্যায়ে উহা বলিয়াছেন—এখন গুণগুলি কি কি, কিরূপেই বা গুণসংযোগ হয় এবং গুণসমূহ কিরূপেই বা জীবকে বন্ধন করে—ইহা পূর্বে বলা হয় নাই, এক্ষণে সে বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যিক, এবং ভূত-প্রকৃতি হইতে জীবের কিরূপে মুক্তিস্নাত সম্ভব, এবং পূর্বে “অমানিষাদি” জ্ঞান-সাধন অপেক্ষাও যে উৎকৃষ্ট জ্ঞানতত্ত্ব আছে সেই পরম জ্ঞান কি এবং কি কি লক্ষণের দ্বারা মুক্ত পুরুষবিগণকে বুঝা যায় সেই সকল লক্ষণ এই অধ্যায়ে উল্লেখ করিবেন। পূর্বে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে সাধনের জন্য “সাধন জ্ঞান” মুখ্যতঃ উপদেশ করিয়া চতুর্দশ অধ্যায়ে “সাধ্য জ্ঞানের” বিষয় বর্ণনা করিতেছেন, যাহাপেক্ষা পরমজ্ঞান আর কিছু হইতে পারে না। যে জ্ঞান লাভ করিয়া সর্বেকগ্রগণ বাসনারহিত-রূপ পরমানন্দিব্র অবস্থা লাভ করিয়া থাকেন। ইহাই সকল জ্ঞানীর উত্তম জ্ঞান কেন? কারণ আর আর সব বিষয় জানিয়া তাহার পর আরও কি আছে এইরূপ প্রশ্ন মনে উদয় হয়। কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থা-রূপ এই যে সাধ্য জ্ঞান ইহা জানিলে আর জানিবার কোন ইচ্ছা থাকে না। অর্থাৎ ইহার পরেও আর কোন উৎকৃষ্ট অবস্থা আছে কিনা এরূপ জিজ্ঞাসা করিবার প্রবৃত্তিই থাকে না, কারণ উহাতেই সব সফল—সব বাসনার নিঃশেষে পরিসমাপ্ত হয়। এইরূপ সংসীন-মানস মুনিগণ পরমানন্দরূপ চরমাবস্থাকে জানিয়া আপনাতঃ আপনিতঃ স্তব্ধ হইয়া যান। যেহেতু তাঁহাদের আর কিছু পাইবার নাই, সেইজন্য তাঁহাদের চিন্তে কোন সঙ্কল্পের উদয় হয় না এবং অনাবশ্যক বিষয়ে কথা কহিবার প্রবৃত্তির অভাব বশতঃ তাঁহারা সংযতবাক্ বা মৌন হইয়া থাকেন। এইরূপেই ভূতপ্রকৃতি হইতে যোগীদের মুক্তিস্নাত হইয়া থাকে। অবশ্য এবমুত মুক্তিস্নাত সাধারণ শক্তি ও সৌভাগ্যের কথা নহে। আচ্ছা, এইরূপ ইচ্ছারহিত অবস্থাকেই বহি চরমসৌভাগ্য বলিয়া গণ্য করা হয় তবে সে সৌভাগ্য যাহারা লাভ করিবেন তাঁহাদের ঘেহ-যাত্রা কিরূপে চলিবে? সিদ্ধ সাধকের প্রয়োজন মত দৈবদেহায় সমস্ত বিষয়াদি আপন আপন তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়। সাধক সেই সকল বিষয় লাভে হরিত হন না এবং তাহাতে

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্মাগতাঃ।

সর্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ ২

তাঁহার কিছুমাত্র আসক্তিও থাকে না। তথাপি সেই সকল বিষয় সিদ্ধিরূপে সাধকের নিকট স্বয়ং উপস্থিত হয়। কিন্তু উহা সিদ্ধি হইলেও চরম সিদ্ধি বা পরাসিদ্ধি নহে। যখন সাধকের ভয়, দ্বেষ, সঙ্কল্পাদি কিছুই থাকে না, পরমাত্মনিষ্ঠ হেতু আত্মানন্দে মগ্ন পুরুষের ইন্দ্রিয়বিষয় আর তাঁহার চিন্তকে বিক্ষুব্ধ বা একটুও অশান্ত করিতে পারে না, অপ্রাপ্য বস্তু পাইবারও ইচ্ছা থাকে না, যাহা প্রাপ্ত তাহারও সংরক্ষণে তিনি উদ্বাসীন—এইরূপ অবস্থাকেই পরাসিদ্ধি বলে। অথচ মজা এমনি যে তাঁহার ভূতপ্রকৃতির প্রযোজনীয় কোন বস্তুর আবশ্যক হইলে তাঁহার ইচ্ছা হইবার পূর্বেই উহা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। যদি সবাই কোন ইচ্ছা হয় তাহাও পূর্ণ হইতে বাকী থাকে না, কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা হওয়াই কঠিন। মন থাকিলে বিষয়-ভোগ হয়, কিন্তু অমনস্ক পুরুষের নিকট বিষয় আসিলেও বা, বিষয় যাইলেও তাই, কখন কোনরূপ অভাব বোধ তাঁহার হয় না, হৃতবাস সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে তাঁহার তুল্য বোধ হইয়া থাকে। ইহাবাই পূর্ণকাম, ইহাবাই পরাসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন ॥ ১

অদ্বয়। ইদং জ্ঞানং (এই জ্ঞান) উপাশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া) মম সাধর্মাং (আমার স্বরূপতা) আগতাঃ (প্রাপ্ত হইয়া) সর্গে অপি (সৃষ্টি কালেও) ন উপজায়ন্তে (জন্ম গ্রহণ করেন না), প্রলয়ে চ (এবং প্রলয় কালেও) ন ব্যথন্তি (ব্যথিত হন না) ॥ ২

শ্রীমদ। কিঞ্চ—ইহমিতি। ইদং—বক্ষ্যমাণং জ্ঞানম্ উপাশ্রিত্য—ইদং জ্ঞানসাধনম্ অহুষ্ঠায়, মম সাধর্মাং—মজপতং প্রাপ্তাঃ সন্তঃ, সর্গেহপি—ব্রহ্মাদিম্ উৎপত্ত্যমেষমপি নোৎপত্ত্যন্তে তথা প্রলয়েহপি ন ব্যথন্তি—প্রলয়ে দুঃখানি ন অনুভবন্তি। পূর্নাবর্তন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২

বক্ষ্যমুনাদ। [আরও বলিতেছেন]—এই বক্ষ্যমাণ জ্ঞানসাধন অহুষ্ঠান করিয়া সকলেই আমার সাধর্মা অর্থাৎ মদ্রূপতঃ প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহারা সৃষ্টিকালে (ব্রহ্মাবিরূপ উৎপত্তি কালে) পুনরুৎপন্ন হন না, এবং প্রলয় কালেও প্রলয় দুঃখ অনুভব করেন না; অর্থাৎ পুনরায় তাঁহাদের কিরূপে আসিতে হয় না ॥ ২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ইহা জেনে যাহা কোন কর্মই নয় অথচ একটা কর্ম! সে আপনার মর্মেতে এলে অর্থাৎ স্থিতি হইলে স্বেচ্ছাতেও তাহা নষ্ট হয় না—বিশেষ রূপে অগ্নি দিকে গেলেও তাহার নাশ নাই!! অর্থাৎ ক্রিয়ার পর স্থিতি।—পূর্বে শ্লোক কথিত যে জ্ঞানের কথা বলিবেন ভগবান্ বলিয়াছেন, সেই জ্ঞান রূপ এই শ্লোকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। “তত্ত্বং যজ্ঞ জ্ঞানমদ্বয়ং”—তাঃ, ১ম শ্লঃ। “তৎ অদ্বয়ং জ্ঞানং তত্ত্বং বদন্তি”। যে অদ্বয় জ্ঞান ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান্ এই তিন নামে অভিহিত হন, সেই জ্ঞানকে তত্ত্ববিদগণ “তত্ত্ব” বলেন। অদ্বয় অর্থে অদ্বিতীয়, কেবল যে ‘চিৎ’ মাত্র বস্তু বিশ্ব পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন, যাহা ছাড়া বিধে অজ্ঞ কোন বস্তু নাই, সেই জ্ঞানই তত্ত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপ। এই জ্ঞান-স্বরূপকে জানিবার সাধন আছে, তাহাকেও জ্ঞান বলে। এই জ্ঞান-সাধনের সম্যক্ অহুষ্ঠানে মৎস্বরূপতা প্রাপ্তি হওয়া যায়। অর্থাৎ এখন যেমন ব্রহ্ম

মম যোনির্মহদ ব্রহ্ম তস্মিন্ গৰ্ভং দধাম্যহম্ ।

সম্ভবঃ সৰ্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥ ৩

হইতে আপনাকে পৃথকরূপে বোধ হইতেছে সেই ভেদভাব মিটিয়া গেলে এক অদ্বিতীয় ভাবে সাধকের স্থিতি লাভ হয় । এই পরিস্থিতি হইলে আর তাঁহাকে জন্ম-মরণের ক্লেশ অনুভব করিতে হয় না । যে সাধনার দ্বারা এই পরিস্থিতি লাভ হয়, তাহাকে এক প্রকার কর্মই বলে বটে, কিন্তু সে কর্ম অল্প সাধারণ কর্মের মত ক্লেশ স্বীকার বা উত্তম করিয়া স্বরিতে হয় না, সে কর্ম আপনা হইতেই হয় । সে কর্ম—প্রাণকর্ম । উহা স্বস্থানচ্যুত হইয়া দ্বিবারাত্র আপনা-আপনি চলিতেছে—কিন্তু তাহাতে স্থিতি নাই, কেবল চলন । এই চঞ্চল প্রাণ-তরঙ্গের উৎপাতে সমস্ত ইঞ্জিয়াদি অহরহঃ স্ব স্ব বিষয় কর্ম লইয়া ব্যাপ্ত রহিয়াছে—যাহাকে অজ্ঞান ভ্রমঃ বলিয়া সাধুরা নিন্দা করেন । এই চাঞ্চল্য যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ সংসারের কি বিভীষণ মুক্তি ! জন্ম, জরা, মরণ, অভাবের শত শত ক্লেশ যেন হাঁ করিয়া গিলিতে আসিতেছে । উহার বিকট বদন হইতে কাহারও পরিজ্ঞাপ পাইবার উপায় নাই ! এই চঞ্চল প্রাণই আবার বহু সৌভাগ্য বশে যখন স্বস্থানে আসিয়া মিলে, তখন তাহার নিজেব ধাতে আসে । এই চঞ্চল প্রাণের নিজ ধাতে আলাই, তাহার স্বরূপে অবস্থান । উহা চিরস্থির, চিরনিখিল, সুখ-দুঃখ জন্ম মরণের অতীত ভাব । প্রাণের সুস্থায়ী স্থিতি হইতেই এই সকল অভয় পূরম ভাব সকল প্রত্যক্ষ হইতে থাকে, যখন এই স্থিতির একটুও ব্যত্যয় হয় না, সৰ্বকালে সমান ভাবে চলিতে থাকে, তখন সুখভোগই কর আর দুর্ভোগই ভোগ কর—তোমার মন আর কিছুতেই বিচলিত হইবে না । এই অচল স্থিতিই ব্রহ্মপদ । জন্ম-মরণের ক্লেশ তাহাদেরই হয় যাহারা এই অচল স্থিতিপদকে ধরিতে পারে না । যাহারা এই স্থির ব্রহ্মপদ লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের চিত্ত প্রকৃষ্টরূপেই লয় হইয়াছে, উহাই প্রলয় । যাহার মনই নাই তাঁহার গকে সৃষ্টিও নাই, লয়ও নাই ॥ ২

অমর । ভারত (হে ভারত !) মহৎ ব্রহ্ম (মহৎ ব্রহ্ম অর্থাৎ আমার প্রকৃতি) মম যোনিঃ (আমার গর্ভাধান স্থান) ; তস্মিন্ (তাহাতে) অহং (আমি) গৰ্ভং দধামি (জগদ্বীজ নিক্ষেপ করি) ; ততঃ (তাহা হইতেই) সৰ্বভূতানাং (সমস্ত ভূতের) সম্ভবঃ ভবতি (উৎপত্তি হয়) ॥ ৩

শ্রীমহা । তদেবং প্রশংসয়া শ্রোতারম্ অভিমুখীকৃত্য পরমেশ্বরাদীনয়োঃ প্রকৃতিপুরুষয়োঃ সৰ্বভূতাত্ত্বপত্তিঃ প্রতি হেতুঃ, ন তু স্বতন্ত্রয়োঃ ইতি ইমং বিবক্ষিতমর্থং কথয়তি—মমতি । দেশতঃ কালতঃ অপরিচ্ছিন্নত্বাৎ মহৎ বৃহত্ত্বাৎ স্বকার্য্যাণাং বুদ্ধিহেতুত্বাৎ ব্রহ্ম প্রকৃতিরিত্যর্থঃ । তৎ মহদ ব্রহ্ম মম—পরমেশ্বরঃ যোনিঃ—গর্ভাধানস্থানম্ । তস্মিন্ গৰ্ভং—জগদ্বিস্তার-হেতুঃ চিদ্রাসাৎ, দধামি—নিক্ষিপামি । প্রলয়ে ময়ি লীনঃ সম্ভব্ অবিচ্ছিন্নকামকর্মানুশয়বন্তঃ ক্ষেত্রজঃ সৃষ্টি-সময়ে ভোগযোগেন ক্ষেত্রেণ সংযোজ্যমীত্যর্থঃ । ততঃ—গর্ভাধানাং সৰ্বভূতানাং ব্রহ্মাদীনাং সম্ভবঃ—উৎপত্তিঃ ভবতি ॥ ৩

বঙ্গানুবাদ । [এইরূপে বক্ষ্যমাণ বিষয়ের প্রশংসাদ্বারা শ্রোতাকে অভিমুখ করিয়া (অর্থাৎ শ্রোতাকে শ্রবণোন্মুখ করিয়া) প্রকৃতি-পুরুষের সৰ্বভূতাত্ত্বপত্তির প্রতি যে হেতু

তাহা পরমেশ্বরাদীন, স্বতন্ত্র ভাবে তাহাদের হেতু নাই, ইহাই যে বিবক্ষিত অর্থ, অর্থাৎ বজ্রার বলিবার তাৎপর্য্য তাহাই বলিতেছেন]—প্রকৃতিকে মহৎ ব্রহ্ম বলা হয়, কারণ দেশ ও কাল দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন বলিয়া প্রকৃতি মহৎ, এবং বৃহত্ত্ব অর্থাৎ স্বীয় কর্ম সকলের বৃদ্ধির হেতু বলিয়া প্রকৃতি ব্রহ্ম (নিরতিশয়) । সেই মহদব্রহ্ম (প্রকৃতি) আমার (পরমেশ্বরের) যোনি অর্থাৎ গর্ভাধানস্থান । তাহাতেই আমি গর্ভ অর্থাৎ জগদ্বিস্তার হেতু যে চিদ্রাসাৎ তাহা ক্ষেপণ করি । প্রলয়কালে অবিচ্ছিন্নকামানুশায়ী জীব আমাতে লীন থাকে, সৃষ্টি সময়ে তাহার ভোগযোগ্য ক্ষেত্রের সহিত তাহাকে (জীবকে) সম্যক যোজনা করি । এইরূপ গর্ভাধান হইতেই ব্রহ্মাদি সৰ্বভূতের উৎপত্তি হইয়া থাকে ।

[ক্ষেত্রক্ষেত্রজসংযোগ দৃশ্যো ভূতকারণমিত্যাহ—মম স্বভূতা মদীয় মায়া ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির্যোনিঃ সৰ্বভূতানাং সৰ্বকার্য্যোভ্যঃ মহত্ত্বাৎ ভরণাচ্চ স্ববিকারাণাং মহদব্রহ্মেতি যোনিবেব বিশিখ্যতে । তস্মিন্ মহতি ব্রহ্মণি যোনৌ গৰ্ভং হিরণ্যগর্ভস্ত জন্মনো বীজং সৰ্বভূতজন্মকারণং বীজং দধামি নিক্ষিপামি । ক্ষেত্রক্ষেত্রজপ্রকৃতিদ্বয়শক্তিমানীখরোহনম্ অবিচ্ছিন্নকামকর্ষণোপাধিব্রহ্মপাদুবিধায়িনং ক্ষেত্রজঃ ক্ষেত্রেণ সংযোজ্যমীত্যর্থঃ । সংভবঃ উৎপত্তিঃ সৰ্বভূতানাং হিরণ্যগর্ভোৎপত্তিধারেণ ততস্তস্মান্ গর্ভাধানান্তবতি হে ভারত—এই প্রকার ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের সংযোগই যে প্রাণিসৃষ্টির কারণ, তাহাই বলিতেছেন—আমার আশ্রয়কপা—মদীয় যে মায়া ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি বলিয়া নির্দিষ্ট, সেই মারাই যোনি অর্থাৎ সৰ্বভূতের উৎপত্তির কারণ—অতএব এই প্রকৃতি সকল প্রকার কার্য্য হইতে প্রধান এবং আশ্রয়িকার স্বরূপ সকল কার্য্যের ভরণ করিয়া থাকে ; এই কারণে সেই প্রকৃতিই এই স্থানে ‘মহৎ’ ও ‘ব্রহ্ম’ এই দুইটি বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত হইয়াছে । সেই মহৎ ও ব্রহ্মস্বরূপ যোনিতে আমি গর্ভের আধান করিয়া থাকি । এই স্থলে গর্ভ শব্দের অর্থ হিরণ্যগর্ভেরও জন্মহেতু বীজ অথবা সৰ্বভূতের জন্মকারণস্বরূপ বীজ । সেই বীজকেই আমি সেই প্রকৃতিরূপ যোনিতে আদিত করি । ইহার তাৎপর্য্য—ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ এই দ্বিবিধ প্রকৃতিই দৈবের শক্তি, এই দ্বিবিধ শক্তিমান পুরুষই দৈব । সেই দৈবই অবিচ্ছিন্ন, কাম ও কর্মরূপ স্বীয় উপাধিবশে স্বরূপ-গ্রহণ করিতে উত্তম জীবগণকে ক্ষেত্রের সহিত সংযোজিত করিয়া থাকেন, অর্থাৎ ভূতগণকে তাহাদের নিজ নিজ প্রাক্কন কৰ্ম্মানুশয়কে ক্ষেত্রের সহিত সংযোজিত করেন । এই প্রকার সংযোজনই গর্ভের আধান । সেই গর্ভাধানেরই ফল হইতেছে, সৰ্বপ্রকার ভূতগণের সম্ভব অর্থাৎ উৎপত্তি । এই সৰ্বভূতের উৎপত্তি হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তির পরে হয় ।—‘লোটাং লাইত্রেবী’ হইতে প্রকাশিত শাক্তব্রহ্ম ও তাহার অনুবাদ ॥ ৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—আমার যে যোনি, “সর্বত্র ব্রহ্মময়ং জগৎ ব্যাপক” যে ব্রহ্ম তাহার যে অণু, তাহার মধ্যে প্রবেশ করায় অর্থাৎ ক্রিয়ার পর, স্থিতি—সূক্ষ্ম ব্রহ্মাণুরূপে—যেখানে—গেলে কিছুই বলিতে পারে না—জিজ্ঞাসা করিলেও বলে যাহা তাহাই!!—পুনরায় সৃষ্টিক্রম ভগবান্ এখানে বলিতেছেন । এই সৃষ্টিভূত অতিশয় সূক্ষ্ম । প্রজ্ঞাচক্ষু নাথকেদেরা ব্যতীত ইহা ধারণা করা কঠিন । তথাপি শাস্ত্রে এই সকল কথা পুনঃপুনঃ বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে । বাহ্যভাবে বুঝিতে গেলে

তাহা বলিয়াও শেষ করা যায় না, এবং শ্রোতারও সকল প্রাণের স্মৃতিমাংসা হয় না। বাহ্য নিম্নবোধরূপ, তাহা অস্ত্রের মুখে ঝাল খাইলে বাহ্য হয় তাহাই হইবে। ব্রহ্ম সৰ্বব্যাপক, নিরাকার, উৎপত্তি-বিনাশ-বজ্জিত। তাহাকে এই ইচ্ছিয়, মন, বুদ্ধি দ্বারা কি বুঝিবে? তিনি সৰ্বব্যাপক, সৰ্বশক্তিমান, সৰ্বজ্ঞ ও অত্যন্ত স্বল্প; তাহারই একাংশ হইতেছে অত্যন্ত স্বল্প অণুর মত, বাহ্য যোগীরা অমৃতত্ব করিতে পারেন; তাহারই মধ্যে ত্রিলোক বর্তমান। ব্রহ্ম অণুর অর্ধেকের তিন ভাগের এক ভাগ, এই মর্ত্যলোক। তাহার মধ্যে সপ্তসমুদ্র ও সপ্তদ্বীপ। সেই সপ্তদ্বীপের এক ভাগে জম্বুদ্বীপ, সেই জম্বুদ্বীপের লক্ষ কোটী অংশেরও এক অংশ তুমি নহ। আবার তোমার মধ্যে কত লক্ষ লক্ষ অণু সব রহিয়াছে। সেই সমস্ত অণু অমৃতত্বের দ্বারা বোধগম্য। ভগবান্ কত স্বল্পরূপে সেই অণুর মধ্যে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। তাহা আর এ বুঝির দ্বারা বুঝা অসম্ভব। অণুর মধ্যেই সব, সেই অণুই ব্রহ্মযোগি।

ক্রিয়ায় পর অবস্থায় যিনি গুণাতীত, নির্লিপ্ত ও অব্যক্ত, তিনিই আবার সৰ্বগুণবিশিষ্ট হইয়া জীব। বাহ্যারা ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ায় পর অবস্থা অমৃতত্ব করেন না—তাহারা প্রপঞ্চভে বর্তমান থাকে, তাই তাহারা সংসারকে ঘেবে, ব্রহ্মকে ঘেবে না। মনের সঙ্কল্প হেতুই প্রপঞ্চ-দর্শন। মনই সঙ্কল্প করিয়া বন্ধ হয়, সঙ্কল্প না থাকিলে জীব মুক্ত হয়। এই অবস্থায় মন আপনি নিঃসঙ্গ হইয়া স্বয়ং নিরুদ্ধ থাকে; এইরূপ থাকিতে থাকিতে উন্মত্ততা ভাব হয়। এই উন্মত্ততা ভাবই পরমপদ। মনেতেই সংসার ভাসে, এই জন্ত মনস্কর যতদিন না হয় ততদিন ক্রিয়ায় পর অবস্থা ভাল জাবে হয় না, হইলেও বৈশিষ্ট্য স্থায়ী হয় না। উর্দ্ধ বিন্দু ও অধ-বিন্দুর মধ্যে মন; সেই মন মনেতে থাকিয়া ব্রহ্মে লীন হয়, তখন কর্তা বা কৰণ বলিয়া পৃথক কিছুই থাকে না।

আত্মা প্রকৃতিস্থ হইয়া মন উপাধি ধারণ করে, এবং সেই মন হইতেই এই প্রপঞ্চ সৃষ্টি। আত্মাচক্র পর্যন্ত গুণের স্থান, এই আত্মাচক্রে অচল স্থিতি না হওয়া পর্যন্ত প্রকৃতির কবল হইতে মুক্তি লাভের উপায় নাই। আত্মাচক্রই ব্রহ্মযোগি, আত্মাচক্র হইতে নিয়ে অবতরণই মনের সংসারমুখী গতি। এইখানেই উর্দ্ধমুখী ত্রিকোণ এবং অধোমুখ ত্রিকোণের স্থান। অধোমুখ ত্রিকোণ হইতেই সংসার-প্রবৃত্তি আরম্ভ হয়, এবং উর্দ্ধমুখ ত্রিকোণের উর্দ্ধমুখই ব্রহ্মলোকের পথ। এইখানে স্থিতিলাভ হইলেই গুণাতীত অবস্থা লাভ হয়। এই আত্মাচক্রেই যোগমায়ায় পুর, এই পুরেতে যিনি থাকেন তিনিই পুরুষ, তিনিই মহেশ্বর বা উত্তম পুরুষ। এই মহেশ্বরের সহিত আত্মাশক্তি অবিনাশমুখ নিত্যযুক্ত। কিন্তু গুণাতীত ব্রহ্ম বা পরশিবই মহেশ্বর বা পুরুষোত্তমেরও আধি। এই পরশিবই জ্ঞানাত্মানসংগোচর। এখানে প্রকৃতিও নাই পুরুষও নাই। পরে পুরুষোত্তম নারায়ণের মধ্যে এই শিবশক্তি সমভাবে সম্মিলিত; সেখানেও পরস্পরকে বিভিন্ন ভাবে দেখিবার উপায় নাই। পুরুষ-প্রকৃতি অভিন্নরূপ হইলেও উহাই তাঁহাদের মূলরূপ। একটিকে সত্ত্ব, অটরিকে নিগুণ ইহাই মহেশ্বর বা শিবশক্তি সম্মিলিত অর্ধনারায়ণ-ভাব। শারদা-ভিলকে আছে :—

“নিগুণঃ সত্ত্বগুণৈশ্চৈতি শিবো জ্ঞেয়ঃ সনাতনঃ।

নিগুণঃ প্রকৃতেঃ সত্ত্বগুণঃ সকলঃ স্বতঃ।

সচ্চিদানন্দবিতব্যঃ সকলঃ পরমেশ্বরঃ।

আসীচ্ছক্তিগুণো নাদো নাদ্যাদিন্দুসমুদ্ভবঃ॥”

সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মের সত্ত্ব নিগুণ ভেদে দুইটি বিভাব। ব্রহ্ম যখন মায়াতে অমুপহিত অর্থাৎ মায়াকে স্বীকার করেন নাই তখনই নিগুণ; মায়াতে উপহিত হইলে তাহাকেই সত্ত্ব ব্রহ্ম বলে। সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ব্রহ্ম যখন কলাবৃত্ত হন অর্থাৎ মূলপ্রকৃতিতে উপহিত থাকেন তখন তাহা হইতে শক্তির আবির্ভাব হয় এবং ঐ আবির্ভূত শক্তি হইতে নাদ (মহত্ত্ব) এবং নাদ হইতে বিন্দু (অহঙ্কারত্ব) উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই মূলপ্রকৃতিতে উপহিত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মেরই উপাসনা হইয়া থাকে। মূলপ্রকৃতিতে অমুপহিত যে নিগুণ ব্রহ্ম তাহার উপাসনা নাই। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম জীবের অদৃষ্ট সংযোগে অথবা কোন দৈব-কারণ বশতঃ (যাহা কাহারও জ্ঞান নাই) তাহা আত্ম-সংস্কৃত কালে অবিষ্ঠান করিলে চৈতন্যমুক্ত মূলপ্রকৃতি হইতে প্রথমতঃ শক্তির আবির্ভাব হয়। এই শক্তিই আত্মাশক্তি নামে প্রসিদ্ধ। এই আত্মা-শক্তিও মূলপ্রকৃতির রূপভেদ মাত্র। ইনিও সচ্চিদানন্দের সহিত একীভূত, এবং এখানেও গুণ-সাম্যাবস্থা বর্তমান। মূলপ্রকৃতিতে বিকৃতি নাই, কিন্তু কাল-নাহচর্য্যে জীবের অদৃষ্ট নিবন্ধন এই আত্মাশক্তিতে গুণ-ক্ষোভ হইয়া থাকে। তত্ত্ব আছে :—

“সৃষ্টিচতুর্বিধা দেবি প্রকৃত্যামমুপবর্ততে।

অদৃষ্টাঙ্কায়তে সৃষ্টিঃ প্রথমে তু বরাননে।

বিবর্ত্তভাবে সম্প্রাপ্তে মানসী সৃষ্টিরুচ্যতে।

তৃতীয়ে বিকৃতিং প্রাপ্তে পরিণামাঙ্কিতা তথা।

আবৃত্ত-সৃষ্টিশ্চ ততশ্চতুর্থে যৌগিকী প্রিয়ে॥

ইদানীং শৃণু দেবেশি তত্ত্বংক বিশেষতঃ।

সৃষ্টিচতুর্বিধা দেবি যথাপূর্ব্বং সমাসতঃ॥”

দেবি! প্রকৃতি হইতে চারি প্রকারের সৃষ্টি হয়। প্রথমতঃ অদৃষ্টবশতঃ জীবসমষ্টির ভোগকাল উপস্থিত হইলে যে সৃষ্টি হয়, তাহা প্রথম সৃষ্টি ও অদৃষ্ট-সৃষ্টি বলিয়া কথিত হয়। মূলপ্রকৃতি হইতে শক্তির আবির্ভাব ও গুণক্ষোভই এই প্রথম সৃষ্টি।

বিবর্ত্ত-সৃষ্টিকে মানসী-সৃষ্টি বলে। বেদান্তসারে কথিত হইয়াছে :—

“সতত্বতোহন্তথা প্রথা বিকার ইত্যাদীরিতঃ।

অতবতোহন্তথা প্রথা বিবর্ত্ত ইত্যাদান্তঃ॥”

যে স্থলে এক বস্তু হইতে অন্য বস্তু উৎপন্ন হইবার সময় পূর্ব্ব বস্তু প্রকৃত প্রস্তাবে রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, তাহার নাম বিকার। যেমন হৃদয়ের বিকার হৃদি, এবং শব্দ-তন্মাত্রাদি বিকার আকাশাদি। যে স্থলে এক বস্তু হইতে অন্য বস্তু উৎপন্ন হয়, অথচ পূর্ব্ব বস্তুর অন্ত্যাত্ম্য হয় না তাহাকে বিবর্ত্ত বলা যায়। যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রম কালে রজ্জুতে মিথ্যা সর্পের উৎপত্তি হইলেও রজ্জুর স্বরূপ তখনও অব্যাহত থাকে, তাহাই বিবর্ত্তবাহ। এইরূপ প্রকৃতিতে

উপহিত ব্রহ্ম হইতে যে জগতেব সৃষ্টি হইতেছে, তাহাতে অদ্বিতীয় ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব অব্যাহত থাকে, পরন্তু এই ব্রহ্মতে সর্ব কল্পনার জায় মায়াকল্পিত এই জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত স্বরূপ। ইহাই দ্বিতীয় সৃষ্টি বা মানস-সৃষ্টি নামে অভিহিত হয়। এই সৃষ্টি পদার্থ যখন বিকৃতি প্রাপ্ত হইতে হইতে এক বস্তুকে রূপান্তরিত করিয়া অন্য বস্তুকে উৎপন্ন করে তাহাকে তৃতীয় সৃষ্টি বা পরিণাম-সৃষ্টি বলে। মহত্ত্ব হইতে অহংকার তত্ত্ব, অহংকার তত্ত্ব হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্র, এবং পঞ্চ তন্মাত্র হইতে পঞ্চভূতের উৎপত্তিই তৃতীয় সৃষ্টি বা পরিণাম-সৃষ্টি। যখন পঞ্চীকৃত পরমাণু সমুদায়ের পরস্পর যোগ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর উৎপত্তি হইতে থাকে তখন তাহাকে চতুর্থ সৃষ্টি বা আরম্ভ-সৃষ্টি বা যৌগিকী-সৃষ্টি বলা যায়।

ঈশ্বরের সমষ্টি অদৃষ্ট বস্তুত: তাহাদের ভোগকাল সমুপস্থিত হইলে যখন আত্মশক্তিতে (মূলপ্রকৃতি) গুণকোষ হয়, তৎকালে প্রথমত: তমোগুণের আবির্ভাব হয়। চৈতন্যযুক্ত শক্তিও, তখন ঐ তমোগুণে অন্তর্প্রবিষ্টা হন। এই তমোগুণ মহাকাল শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। যৎকালে প্রলয়কাল উপস্থিত হয়, তৎকালে সৎগুণ রজোগুণে এবং রজোগুণ তমোগুণে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই তমোগুণও একান্তিতে লয় প্রাপ্ত হয়। ইহাই আত্মাকালী মহাকালকে প্রসব করিয়া তাহাতে উপগতা হ'ন অথবা বিপরীত রীতিতে প্রবৃত্তা হন। ইহাই আত্মশক্তি হইতে আবির্ভূত তমোগুণে আত্মশক্তির অন্তর্প্রবেশ। স্ত্রী-পুরুষ সহযোগে বৈরূপ জীব-সৃষ্টি সেইরূপ মহাকাল-সংযোগে আত্মশক্তি হইতে এই জগৎ-সৃষ্টি হইতেছে।

প্রকৃতির গুণকোষ হইলে তৎপ্রসূত মহাকাল সহকায়ে নাদের বা মহত্ত্বের উৎপত্তি হয়। এই নাদ আবার সব, রজঃ, তমো ভেদে ত্রিবিধ। এই মহত্ত্বই হিরণ্যগর্ভ, ইনিই প্রথম সৃষ্ট বস্তু।

“হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততায়ে”—প্রথমত: হিরণ্যগর্ভ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। গুণভেদে তাঁহাবই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এই তিন মূর্তি হইয়াছে। রূপ জ্ঞানশক্তি স্বরূপ, ব্রহ্মা ইচ্ছাশক্তি স্বরূপ ও বিষ্ণু ক্রিয়াশক্তি স্বরূপ। গৌরবসংহিতায় আছে—

“ইচ্ছাক্রিয়া তথা জ্ঞানং গোবী ব্রাহ্মী চ বৈষ্ণবী।

ত্রিধাশক্তিঃ স্থিতা লোকে তৎপরং জ্যোতির্বোমিত ॥”

জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি গোবী, ব্রাহ্মী ও বৈষ্ণবী নামে আখ্যাত। এই তিন শক্তি হইতেই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় হইতেছে। এই ত্রিধাশক্তি-রূপ জ্যোতিঃই প্রণবের প্রতীপাত।

ক্রিয়ানাবে উক্ত আছে :—

“বিন্দুঃ শিবাস্ত্রকণ্ঠে বীজঃ শক্ত্যাশ্রকং স্মৃতম্।

তয়োর্বোণে ভবেদ্রাহন্তেভ্যো দ্বাতাদ্রিশক্তয়ঃ ॥”

বিন্দু শিবাস্ত্রক, বীজ শক্ত্যাশ্রক ও নাদ শিবশক্ত্যাশ্রক। এই বিন্দু, বীজ ও নাদ হইতে ত্রিশক্তি অর্থাৎ জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তি উৎপন্ন হয়।

মূলপ্রকৃতির সহিত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের যেরূপ কোন ভেদ নাই, তদ্রূপ ব্রহ্ম, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু এই জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তির সহিত তাদাত্ম্যরূপে সম্মিলিত হইয়া আছেন। সূত্রবাং শক্তির

সহিত শক্তিমানের কোন ভেদ নাই। মায়া সঙ্ঘটিত অবস্থাই ব্রহ্ম ভাব, সূত্রবাং তাহা অগোচর। ইহাই তুর্ধ্যাবস্থা, কৈবল্যাবস্থা ও অবাচ্য; ইহাই মহাকাষণ দেহ, কৈবল্যজ্ঞান দেহ ও বিদেহ, উহাই পরা, পরাপরা ও নিঃশব্দ বাক্য। উহাই অগোচরী, উন্মাদী ও ব্রহ্ম। ইহাই স্বল্পবেদ ও অগোচর, উহাই স্বদ্যাক্ষাশ, অগোচর, শূন্য ও সর্বশূন্যাতীত; উহাই দৈশ, অদৈশ ও নিরাকার। উহাই ‘মহেশ্বরমাত্র দীপকং’ ও ‘সোহং ব্রহ্ম’ দ্বারা সৃচিত।

এই ভাণ্ড (দেহ) ও ব্রহ্মাণ্ড একই নিয়মের অধীন, একই রূপ-গুণ সমাবেশে নির্মিত, সূত্রবাং ব্রহ্মাণ্ডে বাহা আছে দেহেও তাহাই আছে। এই ব্রহ্মাণ্ড বা দেহ সমস্তই প্রণবরূপ। সর্ব দেবস্থান এই দেহ মধ্যে সন্নিবিষ্ট। প্রণবের অকার স্বরূপ ব্রহ্মা পৃথীতত্ত্ব মূলধার চক্রে অবস্থান করিতেছেন, উকার স্বরূপ বিষ্ণুমূর্তি জলতত্ত্ব স্বাধীন চক্রে, মকার স্বরূপ রূপ তেজতত্ত্ব মণিপূব চক্রে, নাদ স্বরূপ ঈশ্বর বায়ুতত্ত্ব অনাহত চক্রে, বিন্দু স্বরূপ মহেশ্বর আকাশতত্ত্ব বিষ্ণু চক্রে, কলাস্বরূপ পরশিব মনোরূপে আজ্ঞাচক্রে, কলাতীত পরব্রহ্ম বা পরমা প্রকৃতি সহস্রার চক্রে অবস্থান করিতেছেন।

এই সপ্ত চক্রেই প্রণবের সপ্তাঙ্গ, এবং বহির্দৃষ্টিতে ইহাই সপ্ত আশ্রয়। এই সপ্ত আশ্রয়কে বুদ্ধিতে পারিলেই সব বুঝা শেষ হয়। প্রথম আশ্রয়ে সৃষ্টি (মূলধারে কুলকুণ্ডলিনী প্রাণ শক্তিদ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেন, দ্বিতীয় আশ্রয় স্থিতি (লিঙ্গমূলে স্থিতিরূপ বিষ্ণু), তৃতীয় আশ্রয়ে সংহার, নাভিদেশে কন্দরূপ—নাভিধ্বাস আরম্ভ হইলেই ঈশ্বরের মৃত্যু। চতুর্থ আশ্রয়ে অনুগ্রহ—ভক্তি হইলেই ভজন হয়, তাহাতেই অনাহত স্থিত অনাহত শব্দই ঈশ্বর-রূপা, তখন স্বয়ংই ঈশ্বরের রূপা অনুভব হয়। পঞ্চম আশ্রয়ে-অনুভব—বিশুদ্ধচক্রে কণ্ঠে প্রাণের স্থিতি হইলেই অনুভব পদ লাভ হয়। ষষ্ঠ আশ্রয় আজ্ঞাচক্রে নিবহুভব, অনুভবাতীত অবস্থা। এবং সপ্তম আশ্রয় সহস্রার পরব্যোম।

প্রথম আশ্রয়ের জ্যেষ্ঠ কুণ্ডলিনীশক্তি, দ্বিতীয় আশ্রয়ের গম্য নারায়ণ বা পুরুষোত্তম, তৃতীয় আশ্রয়ের জ্যেষ্ঠ কাল, চতুর্থের গম্য বিজ্ঞান পদ, পঞ্চমের শূন্য, ষষ্ঠের গম্য ব্রহ্ম, সপ্তমের জ্যেষ্ঠ পরব্রহ্ম বা পরব্যোম।

প্রথম আশ্রয়ের সাধন কুলকুণ্ডলিনীকে জাগাইবার ক্ষম মন্ত্রযোগ ও হঠযোগ। দ্বিতীয় আশ্রয়ের সাধন ভক্তিব্যোগ ও লয়ব্যোগ; তৃতীয় আশ্রয়ের সাধন ক্রিয়াব্যোগ ও লক্ষ্য বা ধ্যানব্যোগ, চতুর্থ আশ্রয়ের সাধন জ্ঞানব্যোগ ও উরোব্যোগ (স্বয়ংগ্রন্থিভেদের সাধন), পঞ্চম আশ্রয়ে পরাব্যোগ ও সন্ন্যাস, ষষ্ঠ আশ্রয়ে অমনস্বব্যোগ ও শান্তবীব্যোগ, সপ্তম আশ্রয়ে সহজ-ব্যোগ ও মোক্ষ-সাধন হইয়া থাকে।

এই সকল ব্যোগ-সাধনের করণও আশ্রয় ভেদে বিভিন্ন। প্রথম আশ্রয়ের করণ নাসিকা, শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারা, এই শ্বাস-প্রশ্বাস লইয়াই প্রথম আশ্রয়ের সাধন। এই শ্বাস স্থির না হইলে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিতা হন না। দ্বিতীয় ব্যোগের করণ জিহ্বা—এই জিহ্বা তালুকুহবে প্রবিষ্ট হইলে তবে বাক্য সংযত হয়, এবং বাক্য সংযমের সহিত ইচ্ছার নাশ হয়। তাহাই ভক্তি-ব্যোগ—যখন মনোগতি অন্তর্কীভূত না বাইয়া নিবচ্ছিন্ন ভাবে ব্রহ্মে মগ্ন হয়। তৃতীয় আশ্রয়-ব্যোগাত্ম্যের করণ চক্ষু, এই চক্ষুর লক্ষ্য ক্রমধ্যস্থ হইলে মন ঐকান্তিক লক্ষ্যের প্রতি নিযুক্ত

হয়। দৃষ্টি স্থির না হওয়া পর্য্যন্ত মন চতুর্দিকে, বহু বিষয়যুগে ধাবিত হয়। চতুর্থ আশ্রায়স্থ যোগাভ্যাসের করণ ত্বক্। কৃষ্ণকের দ্বারা সহজে পুনঃ পুনঃ ঠোকর, এই ঠোকর ক্রিয়াধারা চর্চের মধ্যে যে মোহময়ী শক্তি আত্মত বহিয়াছে তাহার শোধন হয়, এই চর্চের আকর্ষণই সর্বাঙ্গোপেক্ষা মোহময়ী আকর্ষণ, কামসঙ্কল্পের প্রধান স্থান। এই সাধনের পরিসমাপ্তিতে যদ্ব্য-গ্রহি তেহ হইয়া দ্বিবা জ্ঞানের সঞ্চার হয়। পঞ্চম আশ্রায়স্থ যোগাভ্যাসের করণ কর্ণ। কর্ণ তত্ত্ব হইলে মন অত্যন্ত অন্তর্মুখ হয়। শব্দই আত্মদ্বিগকে প্রগতির সহিত নানা সঙ্কে যুক্ত করিয়া দেয়, শব্দের বন্ধন যদিও তদুপাধি খুব দৃঢ়। শেষ পর্য্যন্ত উহা থাকে। সমস্ত তত্ত্ব আকাশতত্ত্বে মিলিয়া যাইলে এক অনির্কচনীয় শব্দ প্রত্যাগোচর হয়, বদ্বারা ভববন্ধন ছুটিয়া যায়। ইহাই ভগবান্-প্রবেশ। এই শব্দে তন্ময় হইলেই ধ্বনির অন্তর্গত জ্যোতিঃ এবং জ্যোতিঃর অন্তর্গত শুদ্ধ মনের সন্ধান পাওয়া যায়। এই “মন”ই ষষ্ঠ আশ্রায়স্থ যোগাভ্যাসের করণ। “মনঃস্থং মনমধ্যস্থং মনস্থং মনোবজ্জিতং। মনসা মনমালোক্য স্বয়ং সিদ্ধান্তি যোগিনঃ॥” বাহিরের দিক্ দিয়া এই ষষ্ঠ আশ্রায়ের করণ প্রাণ। তাই প্রাণ-ক্রিয়া করিলে যত শীঘ্র মন মনেতে প্রবেশ করে এত শীঘ্র আর অস্ত্র কিছুতে হইত না। সপ্তম আশ্রায়ের যোগাভ্যাস সমাধিতে স্থিতি লাভ। বাহ্যভাবে এই সপ্তম আশ্রায়ের করণ হইল মৃত্যু; বাস্তবিক সমাধি ও মৃত্যু একই কথা।

তাহা হইলে “মম যোনির্মহদ ব্রহ্ম”—মহদব্রহ্মই যে ভগবানের যোনি অর্থাৎ গর্ভাধান স্থান এবং মহদব্রহ্মই বা কি তাহা বুঝা গেল। এই মহদব্রহ্মে গর্ভাধানই দ্বিতীয় বা বিবর্ত-সৃষ্টি। এখানে মূল সত্তা অবিকৃত, কেবল কল্পনায জগৎ রচিতবৎ বোধ হইতেছে। এই মহদব্রহ্মরূপ যোনিতে প্রবিষ্ট হইয়া ভগবানের বহুরূপে প্রকাশ। মহদব্রহ্ম, ব্রহ্মই সমষ্টি মন, ইহাতেই ব্রহ্ম অশুপ্রবিষ্ট হইয়া বিখ্যে উৎপন্ন করেন। “তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে”—যিনি হৃদা অর্থাৎ স্বকীয় ইচ্ছার প্রভাবে আদিকবয়ে অর্থাৎ ব্রহ্মার চিত্তে, ব্রহ্ম—ব্রহ্মের স্বরূপজ্ঞান তেনে—বিস্তার করিয়াছিলেন তাঃ ১ম স্তঃ। ব্রহ্মাই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের মন, এই মনই সঙ্কল্পের স্থান। মন না থাকিলে কিছু হইবার নহে, তাই যেন ব্রহ্মের মনঃস্বরূপ ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভ উৎপন্ন হইলেন। বিখ্যেষ্টির সঙ্কল্প এই মনেই বর্তমান থাকে। “বিদ্ধি মায়া মনোময়ম্”—তাঃ ১১শ স্তঃ। ক্রিয়ার পর অবস্থায় এই মন থাকে না। ক্রিয়ার পর অবস্থার পরাবস্থায় যেখানে সঙ্কল্প হইতে না হইতেই সব হয়—এমন যে ব্রহ্ম-অণু বাহা অত্যন্ত সূক্ষ্ম, সেই সূক্ষ্ম অণুর মধ্যে ব্রহ্ম অন্তঃপ্রবিষ্ট ইহাই তাহার একাংশ, ইহাই ব্রহ্ম-যোনি, এখানে নিজ সঙ্কল্প কিছুই নাই, কিন্তু অনিচ্ছার ইচ্ছা—এই স্থান হইতেই সমস্ত বিষয়ের স্ফুরণ হয়। তথাপি বিনা সঙ্কল্পে বাহা বলেন, তখনই তাহাই হয়—ইহাই ব্রহ্মযোনি। এই ব্রহ্মযোনিই ভগবানের স্বশক্তি, ইহার নিজস্ব কোন কামনা বা সঙ্কল্প নাই, কিন্তু জীবের অদৃষ্ট বশতঃ যখন এই অনিচ্ছার ইচ্ছারূপে সঙ্কল্প জাগ্রত হয়, তখনই শক্তি ক্রিয়াবতী হয়, ইহাই তাহার গর্ভধারণ। ইহাই তাহার বস্তু হইবার ইচ্ছা। জীবের অদৃষ্ট ইহার হেতু এই জগৎ বলা হয়। যদিও অদৃষ্ট কর্তব্যবশেই হইয়া থাকে, কিন্তু জীবের যেমন আদি নাই, তেমনি কর্তব্যের আদিও কোথাও নাই। জীব মৃত্যুকালে কামনা পইয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়, সুতরাং

সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সন্তবন্তি যাঃ।

তাসাং ব্রহ্ম মহদযোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ ৪

তাহার উৎপত্তির বীজ তাহার মধ্যেই লীন থাকে। সমস্ত জগতের প্রলয়েও জীবের কর্ণ শেষ হয় না; সুতরাং প্রলয়ের পর আবার তাহার উৎপত্তি হওয়াই সম্ভব। প্রলয়কালে জীব কর্ণসহ মহদব্রহ্মে লীন হয়, মহদব্রহ্ম প্রকৃতিতে স্তম্ভ হন। আবার সৃষ্টিকালে কাম-কর্মাণুযায়ী জীবকে স্ব স্ব অদৃষ্ট ভোগের জগৎ ভোগ্যক্ষেত্রের সহিত সঙ্কল্প যুক্ত করিবার যে চেষ্টা তাহাই গর্ভাধান-ক্রিয়া। এই গর্ভাধান-কর্তাই সমগ্র ব্রহ্ম।

পরে মহতত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব ও অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে পঞ্চতত্ত্বের সৃষ্টি—ইহাই বিকার সৃষ্টি বা পরিণাম-সৃষ্টি। এই তৃতীয় সৃষ্টির পর যখন অপকীর্তিত পরমাণু সকল জীবের অদৃষ্ট বশতঃ পকীর্তিত হইয়া স্থূল বেহ ও অন্নাদি উৎপন্ন করে তাহাই চতুর্থ সৃষ্টি বা যৌগিক-সৃষ্টি। অর্থাৎ প্রথম ব্রহ্মরূপ ক্রিয়ার পরাবস্থা হইতে তৎপর্য্যবস্থায় কৃৎস্ন জ্যোতিঃর মধ্যে বিন্দুরূপা মহাশক্তির আবির্ভাব, পরে শুদ্ধ সঙ্কল্প বাহাতে নিজ ভোগেচ্ছা থাকে না। অথচ ব্রহ্মাণ্ড বীজ কাষণ সলিলের মধ্যে ভাসমান। পরে বিবিধ বস্তুর বিবিধ পরমাণুর প্রকাশ, তৎপরে স্থূলতম পিণ্ডভাব। কিন্তু পিণ্ডভাবই থাকুক, অথবা সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম ভাবই থাকুক—সবই ব্রহ্মময় বা ব্রহ্মরূপ। এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম কিরূপে বহু কোটি ব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হন এবং সেই বিশাল বিস্তৃত ব্রহ্মাণ্ড সর্ব জীব সহ আবার কিরূপে অণুর স্বরূপ ব্রহ্মে প্রবেশ করে, এবং সেই অণু কিরূপে অব্যক্ত মধ্যে বিলীন হয়, তাহা পরম বহুতময় ব্যাপার ॥ ৩

অন্থম্। কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয়!) সর্বযোনিষু (সর্ব যোনিতে) যাঃ (যে সকল মূর্তয়ঃ (মূর্তি সমূহ) সন্তবন্তি (উৎপন্ন হয়), মহদব্রহ্ম (মহদব্রহ্ম) তাসাং যোনিঃ (তাহাদের মাতৃস্থানীয়), অহং বীজপ্রদঃ পিতা (আমি বীজদাতা পিতা) ॥ ৪

শ্রীধর। ন কেবল সৃষ্টিপত্রম্ এবং মধ্যস্থিতাভ্যাং প্রকৃতিপুরুষাভ্যাং অয়ং ভূতোৎপত্তি-প্রকারঃ, অপি তু সর্বদেব ইত্যাহ—সর্কেতি। সর্কাস্থ যোনিষু মহাব্যাক্রাস্থ বা মূর্তয়ঃ—স্বাবরূপমাত্মিকা উৎপত্তিতে, তাসাং—মূর্তীনাং মহদব্রহ্ম প্রকৃতিঃ যোনিঃ—মাতৃস্থানীয়া, অহং বীজপ্রদঃ পিতা—গর্ভাধানকর্তা পিতা ॥ ৪

বঙ্গানুবাদ। [কেবল যে সৃষ্টি উপক্রমেই মধ্যস্থিতান হেতু প্রকৃতি পুরুষ দ্বারা ভূতোৎপত্তি হয় তাহা নহে, পরন্তু ঐরূপে সর্বদেবই ভূতোৎপত্তি হইয়া থাকে; এতদর্থে বলিতেছেন]—মহাব্যাক্রাস্থ সকল যোনিতে যে স্বাবরূপমাত্মিক মূর্তি সকল উৎপন্ন হয়, সেই সকল মূর্তির মহদব্রহ্ম বা প্রকৃতিই মাতৃস্থানীয়া আর আমিই গর্ভাধান কর্তা পিতা ॥ ৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—যত যোনি হইতে মূর্তি সব হইতেছে সে একটু একটু পৃথক্ পৃথক্ যোনি—সে সকল যোনির মধ্যেও ব্রহ্ম আছেন, তাহাও ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি—কিন্তু সে বিস্তৃত অবিভক্ত ব্রহ্ম মহৎ যোনি, আমি—তাহার বীজ ব্রহ্মের অনুষঙ্গরূপেই আছি এবং প্রকৃষ্টরূপে—দশকে যোনি, তাহাতেও যোগে দাই অর্থাৎ আপনাতে আপনি রাখি—বাহা ক্রিয়ার পর অবস্থা—আবার

আমি পিতা অর্থাৎ শক্তি পূর্বক আপনা হইতে আপনায় মূর্তাস্বরূপ—কুটস্থের স্বরূপ ব্রহ্ম !! অর্থাৎ আত্মজ—অর্থাৎ পিতা, পিতাই পুত্র !!! পুত্রই পিতা !!!—
 দেব, পিতৃ, মনুষ্য, পশু, যুগাদিবোনিতে যে সকল মূর্তি উৎপন্ন হয় ব্রহ্মই তাহার যোনি অর্থাৎ উৎপত্তির কারণ এবং আমি বীজপ্রদ পিতা । এই মহদব্রহ্মই বা কে এবং আমিটাই বা কে ?
 যাহা না থাকিলে কিছু হয় না সেই ব্রহ্মই মহদ যোনি, বা পরম কারণ । যদিও বস্তু যোনি হইতে বস্তু মূর্তি প্রকট হইতেছে, সে সকলের যোনিও ব্রহ্ম, কারণ সবই ব্রহ্ম হইতে হইয়াছে, ব্রহ্ম না থাকিলে কোন কিছুই উৎপত্তি হওয়া সম্ভব হইত না । সকলের মধ্যেই ব্রহ্ম মহদ যোনি, অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা, এই ক্রিয়ার পর অবস্থার মধ্যে সমস্ত বিভক্ত যোনি অবিকল্প রূপে বর্তমান রহিয়াছে । কিন্তু সকল সময়েই তো সেই ব্রহ্ম সর্বত্র বিস্তৃত, কিন্তু সকল সময়ে বা সর্বত্র প্রকাশ হয় না কেন ? কারণ অহং জ্ঞানের অভাবে । যোনি হইতে প্রকাশিত হইতে হইলে অহং জ্ঞান থাকা আবশ্যক । অহং জ্ঞান যখন একেবারে মিটিয়া যায় তখন ব্রহ্মাণ্ড ও তদতিরিক্ত স্থানে বিশাল ব্রহ্মই কেবল পড়িয়া আছেন, কেবল সত্তামাত্র ভাবে, তাহা আছে বলিবারও কোন দ্বিতীয় সেখানে কেহ নাই । পরে যখন অহং জ্ঞান স্মৃতি হয়, সেই অহংএর মধ্যেও তিনি—তখন সেই “অহং”ই কুটস্থ চৈতন্যরূপে প্রতিবিম্বিত হন এই অহং-ই ব্রহ্মাণ্ডরূপে সর্বত্র ব্যাপ্ত । এই ব্রহ্মাণ্ড বা কুটস্থ ক্রিয়ার পর অবস্থার মধ্যেই নিহিত থাকে, অর্থাৎ আপনায় মধ্যেই আপনি থাকে । ক্রিয়ার পর অবস্থায় যাহা মহৎ অর্থাৎ বিখ্যাত একাকার ছিল, তাহাই শক্তিপূর্বক ক্রিয়া করিলে পিতা হইতে যেমন পুত্র উৎপন্ন হয়, সেইরূপ ক্রিয়ার পর অবস্থা হইতে কুটস্থ স্বরূপ ব্রহ্ম সর্বদেহের মধ্যে প্রকাশিত হন । কখনও পিতা পুত্র হন, কখনও পুত্র পিতা হন । অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা হইতে কুটস্থ জ্যোতিঃ প্রকাশ হইতেছে, কখনও কুটস্থ জ্যোতিঃ হইতে ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রকাশিত হইতেছে !! কুটস্থ ও ক্রিয়ার পর অবস্থা একেই মূর্তাস্বরূপ মাত্র । আমিটি তাহা হইলে বীজ, ব্রহ্মাণ্ডরূপে সর্বত্র সম্প্রবীষ্ট, এবং মহদ ব্রহ্ম—বিরাট ক্রিয়ার পর অবস্থা যাহা বিখ্যাতবনকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে—অথবা সমুদ্র হইতে তরঙ্গোচ্ছাসের স্রাব—যাহা হইতে এই ব্রহ্মাণ্ড পুনঃপুনঃ উঠিতেছে ও ডুবিতেছে ! এই ক্রিয়ার পর অবস্থা ও কুটস্থ কি ভাল করিয়া বুঝিলে আর পুরুষ, প্রকৃতি, ব্রহ্ম, মায়া, সত্ত্ব, নিশ্চল নইয়া গলে পড়িতে হয় না ।

মহাভারতে শান্তিপর্বে আছে—“যোগমতে পরমাশ্রা উপাধিযুক্ত হইলেই জীবরূপে পরিণত হন ।” পরমাশ্রা উপাধিই হইল এই স্থল, যন্ত্র কারণ দেহ বা প্রকৃতি । প্রকৃতির মধ্যে চৈতন্যের বেলা যতক্ষণ ততক্ষণই বদ্ধতাব বা জীবতাব । প্রকৃতি-পুরুষ একেই ভিন্ন উপাধি মাত্র । যখন ক্রিয়ার পর অবস্থায় গুণসদ-বহিত হন তখন তিনি নিশ্চল, তখন তাহার উপাধি পুরুষ, যখন তিনি বাহ্য ব্যাপারে লিপ্ত হন তখন তিনি গুণযুক্ত, তখন তাহার উপাধি প্রকৃতি ।

প্রকৃতির মধ্যে ভ্রমোভাব প্রবল হইলে তাহা অড় বৃক্ষরূপে প্রকটিত হয়, প্রকৃতির মধ্যে বজ্র ও সত্ত্ব ভাব থাকিলে মনুষ্যতাব প্রকটিত হয় এবং প্রকৃতির মধ্যে সত্ত্বগুণ প্রকাশিত

সত্ত্ব রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ ।

নিবয়ন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥ ৫

থাকিলে দেবশরীর রূপে প্রকটিত হয় । আত্মা প্রকৃতিস্থ হইলেই তাহার মন উপাধি হয়, এবং সেই মন হইতেই এই সৃষ্টি কার্য চলিতে থাকে ।

আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত গুণের স্থান, আজ্ঞাচক্রে মনের স্থিতি সম্যকরূপে হইলেই জীব প্রকৃতি-যুক্ত হইতে পারে । তখন কোন উপাধিও থাকে না, সৃষ্টিও থাকে না । কিন্তু যিনি আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত উঠেন কিন্তু স্থিতিলাভ করেন না, তিনি প্রকৃতির অধীন থাকেন এবং এই প্রপঞ্চ-লগ্ন প্রত্যক্ষ করিতে থাকেন । সুতরাং যে স্থান পর্যন্ত গুণের স্থান বা আরম্ভ, সেই স্থানে স্থিতি লাভ করিলে গুণের অতীত অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারা যায় ; তাহাই যোনি অর্থাৎ সৃষ্টির কারণ ; অতএব এই আজ্ঞাচক্রই ব্রহ্মযোনি বা মহদব্রহ্মের স্থান । তাহা হইতেই ভূত সমূহের উৎপত্তি বা সৃষ্টি । আজ্ঞাচক্রের অধোদেশে নামিলেই ইচ্ছার উদ্ভব হয় এবং সেই ইচ্ছা হইতেই সৃষ্টি ॥ ৫

অন্বয় । মহাবাহো (হে মহাবাহো !) সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ ইতি (এই সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ) প্রকৃতিসম্ভবাঃ গুণাঃ (প্রকৃতি সত্ত্ব গুণত্রয়) অব্যয়ং দেহিনং (অবিনাশী আত্মাকে) দেহে (দেহ মধ্যে) নিবয়ন্তি (আবদ্ধ করে) ॥ ৫

শ্রীধর । তদেবং পরমেশ্বরাদীনাত্যাং প্রকৃতিপুরুষাত্যাং সর্বভূতোৎপত্তিং নিরূপ্য ইদানীং প্রকৃতিসম্বন্ধে পুরুষস্য সংসারং প্রপঞ্চয়তি সর্বমিত্যাধি চতুর্দশভিঃ বা চতুর্ভিঃ । সত্ত্বং রজস্তমঃ ইতি ত্রয়োগুণাঃ, প্রকৃতিসম্ভবাঃ—প্রকৃতিঃ সত্ত্ববো উদ্ভবো যেষাং তে তথোক্তাঃ । গুণসাম্যাং প্রকৃতিঃ, তস্মাৎ সকাশাং পৃথক্বেদে অভিব্যক্তাঃ সত্ত্বঃ প্রকৃতিকার্যো দেহে তাহাশ্চৈব স্থিতং, দেহিনং—চিরংশং বস্ততোহব্যয়ং—নির্জিকারমেব সত্ত্বং নিবয়ন্তি—স্বকার্যোঃ স্বদুঃখমোহাদিভিঃ সংযোজয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ৫

বঙ্গাশ্রবাদ । [পরমেশ্বরাদীন প্রকৃতি-পুরুষ হইতে সর্বভূতোৎপত্তি নিরূপণ করিয়া ইদানীং প্রকৃতি সংযোগে পুরুষের সংসারাবস্থা বিষয় চারিটি বা চতুর্দশ শ্লোকদ্বারা বিস্তৃত ভাবে বলিতেছেন]—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ নামক তিনটি গুণ প্রকৃতি হইতে সত্ত্ব (তাদৃশ রূপে যাহাদেব উদ্ভব কথিত) । গুণ সকলের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি; গুণত্রয় পৃথক্ ভাবে অভি-ব্যক্ত হইয়া প্রকৃতির কার্য যে শরীর তাহাতে তাহাঅ্য ভাবে অবস্থিত দেখীকে সুখ-দুঃখ-মোহাদিতে বদ্ধ অর্থাৎ সংযুক্ত করে । যেহী চিরংশ, সেই চিরংশ বস্ততঃ অব্যয় অর্থাৎ নির্জিকার ॥ ৫

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, ইড়া পিঙ্গলা স্তম্ভরূপ যন্ত্রে আকৃষ্ট রহিয়া যাহা পঞ্চতন্ত্র মন বুদ্ধি অহঙ্কারের সহিত আত্মা ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য দিকে আশক্তিপূর্বক দৃষ্টি করিয়া এই দেহেতে দেহী আত্মা অবিনাশী কুটস্থ ব্রহ্ম আবদ্ধ !! সেই বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেই তিনি শুদ্ধ বুদ্ধি যুক্ত স্বরূপ—ক্রিয়ার পর স্থিতি রূপ চাকের কাটি শুভ্র করে পড়বে ।—আত্মা, যেহী তো বদ্ব-জরা-মরণাধি বহিত, তবে সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণ ও তদুৎপন্ন সুখ-দুঃখ-মোহাদি তাহাকে কিরূপে বদ্ধ করে ? এর

কালে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়, স্তব্ধতা এই সাম্যাবস্থা-প্রাপ্ত প্রকৃতি ও ত্রিগুণে কোন ভেদ নাই। প্রকৃতিতে বৈষম্য আরম্ভ হইলেই ত্রিগুণ প্রকাশিত হইতে থাকে, তখনই জীব ও জগৎ সব সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হয়। প্রকৃতি হইতে গুণগুলি উৎপন্ন হইয়া এই দেহেই তাহারা অবস্থিতি করে। জীবাত্মা জন্ম-মরণ-জরাতির অতীত হইলেও দেহেতে তাহা স্বেচ্ছাভাব প্রযুক্ত দেহস্থ ত্রিগুণের যে ধর্ম—শোক মোহাদি তদ্বারা দেহীকে যেন আবদ্ধ করিয়া রাখে। যেমন দেহাশ্রিত ছায়া দেহীকে আবৃত করে মনে হয়, তজ্জপ ক্ষেত্রজ্ঞ-আত্মার আশ্রিত যে গুণ, তাহা যেন আশ্রয়দাতা ক্ষেত্রজ্ঞকে বন্ধন করে এইরূপ মনে হয়।

গুণই শক্তি। গুণ কোথা হইতে আসে এবং কেনই বা আসে? শক্তিমানের মধ্যে যেমন শক্তি অন্তর্নিহিত, সে শক্তির খেলা তিনি যে সর্বদাই দেখান তাহা নহে, কিন্তু ইচ্ছা করিলেই দেখাইতে পারেন; সেইরূপ গুণীর মধ্যে গুণ সর্বদাই অন্তর্নিবিষ্ট থাকে, যখনই প্রকাশ হয়—এই প্রকাশও স্বাভাবিক, তজ্জপ কোন সঙ্কল্প করিতে হয় না—তখনই শক্তি-মানের শক্তিকে আমরা বৃষ্টিতে পারি। যখন এই শক্তি তাঁহার মধ্যে স্বেচ্ছাভাব থাকে, দীর্ঘকাল ধরিয়াও প্রকাশিত হয় না—সেই অবস্থাই নিগুণ, নিষ্পন্দিত ভাব। উহাই প্রকৃতির সাম্যাবস্থা, পুরুষ ও প্রকৃতি—তখন যেন শিব-গৌরীরূপে এক সত্ত্বের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। ঋষিরা ধ্যানযোগে সেই বিশ্বকারণ শক্তিকে দেখিয়াছিলেন:—

“তে ধ্যানযোগাশুগতা অপশ্চন্দ্ৰ

মেবাস্তশক্তিং স্বত্বৈবনিগূঢ়াম্।

যঃ কারণানি নিখিলানি তানি

কাস্মাস্থুক্তান্তধিষ্ঠিত্যেকঃ ॥”—শ্বেতাঃ উপঃ

স্বপ্রকাশ মায়াধীশ্বর পরমেশ্বরের আত্মভূতা শক্তিকে তাঁহার কারণরূপে ধর্শন করিয়াছিলেন। এই যে শক্তি ইনিই মায়া বা প্রকৃতি। কিন্তু মাংসের প্রকৃতির স্রাব ইহা ভড়ানহে। ইহা তাঁহারই নিজ শক্তি। “মায়াস্ত প্রকৃতিং বিভ্রাৎ মায়িনস্ত মহেশ্বরম্।” এই মায়াই পরাপ্রকৃতি। ভগবান্ ও গীতার বলিয়াছেন—এই প্রকৃতি আমার অধ্যক্ষতায় (প্রেরণায়) চরাচর সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করেন। সেই শক্তি স্বগুণ (সত্ত্বরজস্তমো নামক গুণ ও স্বীয় কার্য পৃথিবী জলাদি) দ্বারা আচ্ছাদিত, কারণ মাজেই স্বীয় কার্য দ্বারা আবৃত থাকে, অর্থাৎ কারণের আকার কার্যের আকারে লুক্কায়িত থাকে, সেই জন্ত কারণ বস্তুটিকে ধরিতে পারা যায় না।

এই বিশ্বজননী শক্তি যাহার সেই দেবতা কালাস্থুক্ত অর্থাৎ সমস্ত কারণের অধিষ্ঠাতা, যিনি সেই সকল কারণকে যথানিয়মে পরিচালিত করেন—সেই যে ভগবানের স্বীয় শক্তি তাঁহাকে তাঁহার ধর্শন করিয়াছিলেন।

যেমন অগ্নিতে জলন স্বাভাবিক, সে প্রকাশের জন্ত কোন আগ্রাসের প্রয়োজন হয় না, সেইরূপ ব্রহ্মের মধ্যে শক্তির ছিলল অত্যন্তই স্বাভাবিক। বিনা প্রযত্ন বা সঙ্কল্পেই তাহা স্মৃতিত হয়। যখন স্মরণ আরম্ভ হয়, তখনই উহা তাঁহার সঙ্কল্প এইরূপ মানিয়া লওয়া হয়। এই শক্তি গতিশীল, স্পন্দনধর্মী, কিন্তু কোন গতিই স্থিতিশীল কোন সত্তায় যুক্ত না হইয়া গতিশীল

(সম্বৎসরের বন্ধন)

তত্র সত্ত্বং নির্খলভ্যাং প্রকাশকমনাময়ম্।

সুখসঙ্গেন বদ্ধাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ ৬

হইতে পারে না। এই গতিটী চিরন্তন নহে বলিয়া উহাকে মিথ্যা বা মায়া বলা হয়। কিন্তু স্থিতিশীলতা তাঁহার মধ্যে নিত্য বর্তমান। জলে পতিত চন্দ্রিকারই চাকল্য দৃষ্টি হয়, কিন্তু চন্দ্রিকার চাকল্য নাই; সেইরূপ ব্রহ্মের মধ্যে যে স্বাভাবিক জ্ঞান-কৌমুদী বিচ্ছুরিত হয় তাহা সর্বপ্রকার চাকল্য-বিক্ষেপাদি ধর্ম-শূন্য, সেই জন্ত তাহা চিরস্থির, চিরনির্খল, স্তব্ধাং নিত্য অবিনাশী। সেই ব্রহ্মকিরণ মায়া স্পর্শে মায়াই চকলত্ব প্রাপ্তি গুণ দ্বারা চকলবৎ মনে হন। প্রকৃতি বিচ্ছুরণ না হইলে তো সৃষ্টি হয় না, প্রকৃতি ক্ষুদ্র হইলেই প্রাণ চকল হয়, এবং সেই চকল প্রাণই সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণরূপে এবং তাহার বাহন ইড়া-পিঙ্গলা-সুহুমা নাড়ী মুখে প্রবাহিত হইয়া পঞ্চতত্ত্ব, মন, বুদ্ধি অহংকারে পরিণত হইয়া এই জগৎ খেলা আরম্ভ করিয়া দেন, তখন এই সকল বস্তুতে আত্মবোধ হওয়ায় ইহাধিগের পানে আসক্তি পূর্বক ক্ষেত্রজ দৃষ্টিপাত করেন। এই কারণেই নিত্যযুক্ত অবিনাশী কূটস্থ দেহী দেহের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া যান। এই দেহই যেন তাঁহার নিষেধ এবং উহা তাঁহার সর্বত্র বলিয়া মনে হয় ইহাই দেহীর বদ্ধাবস্থা। আবার এই বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেই তিনি যে গুঢ় মুক্ত, সেই গুঢ় মুক্ত স্বভাবকেই প্রাপ্ত হন। প্রাণই চকল হইয়া এত গোলযোগ উৎপন্ন করিয়াছে, তাই অতি যত্নে প্রাণের চাকল্যকে রুদ্ধ করিতে হইবে। ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়া পর স্থিতি হইলেই সর্ববন্ধবিনিমুক্ত আত্মা নিজ মহিমায় নিজে বিরাজ করিবেন ॥ ৬

— — —

অনঘ। অনঘ (হে নিষ্পাপ!) তত্র (সেই সকলের মধ্যে) নির্খলভ্যাং (নির্খল বলিয়া) প্রকাশকম্ (প্রকাশশীল) অনাময়ম্ (নিরূপদ্রব সত্ত্বং (সত্ত্বগুণ) [আত্মাকে] সুখসঙ্গেন জ্ঞান-সঙ্গেন চ (সুখাসক্তি ও জ্ঞানাসক্তি দ্বারা) বদ্ধাতি (বন্ধন করে) ॥ ৬

ক্রীধর। তত্র সত্ত্বং লক্ষণং বন্ধকত্বপ্রকারং চাহ—তত্রৈতি। তত্র - তেথাং গুণানাং মধ্যে, সত্ত্বং নির্খলভ্যাং—স্বচ্ছভ্যাং স্ফটিকমণিরিব প্রকাশকং—ভাষ্যরম্। অনাময়ম্—নিরূপদ্রবং, শাস্তমিত্যর্থঃ। অতঃ শাস্তভ্যাং স্বকার্যেণ সুখেন যঃ সঙ্গঃ তেন চ বদ্ধাতি। প্রকাশ-কদ্বাক স্বকার্যেণ জ্ঞানেন যঃ সঙ্গঃ তেন চ বদ্ধাতি। হে অনঘ—অপাপ। অহং স্বখী জ্ঞানী চেতি মনোবর্ধমান্ তদভিমানিনি ক্ষেত্রজ্ঞে সংযোজয়তীত্যর্থঃ ॥ ৬

বঙ্গাশুবাদ। [সম্বৎসরের লক্ষণ ও তাহার বন্ধকত্বের প্রকার বলিতেছেন]—সেই স্ফটিক গুণত্রয়ের মধ্যে সত্ত্বগুণ নির্খল বলিয়া অর্থাৎ সত্ত্ব স্ফটিক মণির স্রাব প্রকাশক অর্থাৎ ভাষ্যর এবং অনাময় অর্থাৎ নিরূপদ্রব শাস্ত, অতএব শাস্ত বলিয়া স্বীয় কার্যে যে সুখ তাহার সহিত যে সঙ্গ বা আসক্তি, তদ্বারা আবদ্ধ করে। আর সত্ত্বগুণের প্রকাশকত্ব হেতু স্বকার্যে যে জ্ঞান তাহার সহিত যে সঙ্গ বা আসক্তি, তদ্বারাও আবদ্ধ করে। হে নিষ্পাপ অর্জন, ‘আমি স্বখী’ ‘আমি জ্ঞানী’ প্রভৃতি মনোবর্ধক সকলকে তদভিমানী ক্ষেত্রজ্ঞে সংযোজনা করিয়া থাকে ॥ ৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সেখানে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থাতে পঞ্চভূত, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ইহাতেই ময়লা—ইহা ছাড়া আত্মাতে থাকি নিম্নলিখিত। কূটস্থ ব্রহ্ম!! নির্মল কোন বস্তু হইলেই প্রকাশকে পায়—যে তলওয়ারে মরুতে লেগেচে তাহা পরিষ্কার ক্রিয়ার দ্বারা করিলে—যাহা গুরু-বলু-গম্য—সেই তলওয়ারেতে এরূপ প্রকাশ হয় যে আপনার মুখ তাহাতে দেখা যায়। ইহাই পাতঞ্জল সূত্রে বলিয়াছেন “স্বরূপ দর্শনম্” (অর্থাৎ প্রকৃতিজ দর্পণে আপনার রূপ আপনি দেখা যায়)। যখন আপনাকে আপনি দেখিল ও আপনি ব্রহ্ম হইল তখন সবই ব্রহ্ম! ও সবই দেখিল স্তুরাং প্রকাশই রূপ—ব্রহ্মের; ইহার নিমিত্তই অপ্রকাশ স্বরূপ বেদান্তে কহিয়াছে। যখন সব এক বস্তু হইল তখন বিশেষ নাশ হইয়া অল্প বস্তুস্তর কি প্রকারে হইবে—অতএব অবিনাশী—বিকার রহিত—আসক্তি পূর্বক অল্প বস্তুতে সুখাভিলাষ করিলে নিঃশেষরূপে তাহাতে আবদ্ধ হইয়া রহিলেন। তাহা ছাড়িয়া আত্মাতে আপনি থাকিলে অর্থাৎ ক্রিয়া করিলে মুক্ত অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা।—তমোগুণ জ্ঞানকে ধারত কহিয়া থাকে, যতদূর সেই আবরণ নষ্ট করে, এই অল্প ইহা প্রকাশক। যতদূর এই প্রকাশকই গুণ থাকায় সে বস্তুর সাহা স্বরূপ তাহা বুঝাইয়া দিতে পারে। ব্রহ্মসত্ত্বগুণের মত ইহা বিক্ষেপ ও আবরণ যুক্ত নহে বলিয়া ইহা বস্তুর স্বার্থ রূপকে প্রকাশ করে, তাহাতে আমরা কোন বস্তু গ্রহণযোগ্য বা কোন বস্তু ত্যাগযোগ্য তাহা বুঝিতে পারি, ইহাতে ভ্রমদর্শন হয় না বলিয়া ইহা সর্বপ্রকার উপদ্রব-শূন্য। কিন্তু অন্তঃকরণের সংগুণজনিত যে প্রকাশ ধর্ম তাহাতে জ্ঞান জন্মায় বটে, কিন্তু উহা মিশ্রজ্ঞান অর্থাৎ তাহার সহিত ব্রহ্মসত্ত্ব ভাব মিলিত, তাহা নানান্তর জ্ঞানের প্রকাশক, উহা কথঞ্চিৎ সুখনয় বলিয়া জীবকে সেই সকল ধর্মিত সুখে আবদ্ধ করে, এতদ্বারা অধঃজ্ঞান যাহা গুরু আত্মার ধর্ম তাহা এ জ্ঞান নহে, যাহাকে পরা-বিজ্ঞা বলে যদ্বারা আত্মদর্শন হয় উহাও জ্ঞান নহে। স্তুরাং এ জ্ঞান দ্বারা বহিঃবিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া জীব বন্ধন দশা প্রাপ্ত হয়। আলোচনাত্মক দর্শন শাস্ত্র ও পদার্থ বিজ্ঞানজাত জ্ঞান দ্বারা অব্যাহির গুণের যে জ্ঞান হয়, তাহা এই জাতীয় জ্ঞান। ইহার সঙ্গ ত্যাগও কম কঠিন নহে। আত্মাতে যে মনের প্রকাশিত হিত তাহাই সত্য জ্ঞান ও উহা সত্য জ্ঞানের প্রকাশক। উহার লক্ষণ হইতেছে বিশুদ্ধ জ্ঞান ও বিশুদ্ধ আনন্দ, উহা একনাত্র আত্মারই ধর্ম। এই আত্মাতে না থাকিয়া মন পঞ্চভূতে থাকিলে মনে নানাকরূপ ময়লা লাগে, এবং তাহার ব্রহ্ম-তার হাস হইয়া যায়। তরবারিতে মরিচা পড়িয়া গেলে যেমন তাহা অস্বচ্ছ হয় ও তাহাতে প্রতিবিম্ব পড়ে না, তদ্রূপ মন সমল থাকিলে তাহাতে আত্ম-প্রতিবিম্ব দেখা যাব না। আবার তরবারিকে ঘসিলে যেমন উহা পরিষ্কৃত হইয়া চক্ চক্ করে, এবং তাহাতে নিধের মুখও দেখা যায়, তদ্রূপ ক্রিয়ার দ্বারা মন বিকলশূন্য হইলে তাহা অত্যন্ত স্বচ্ছ হয়, সেই স্বচ্ছ শুদ্ধ মনের মধ্যে আত্মার স্বরূপ দর্শন হয়। আত্মা বাতীত অল্প বস্তুর মধ্যে যে সুখাভিলাষ আশা, তাহাই মনের চঞ্চল ভাব। মন যতদিন চঞ্চল থাকে ততদিন আত্মার বিশুদ্ধ তাৎ প্রত্যক্ষ হয় না। এই অল্প কি কঠিতে হইবে কবীর সাহেব বলিয়াছেন—

“কবির, নিকলিগর কীজিয়ে, সবদ মনলা দেই।

মনকী মৈল ছুড়াইকে, চিত্ত দর্পণ করি লেই ॥”

অল্পপরিষ্কারক বস্তুর নাম নিকলিগর, কামারের জাঁতা; তাহাতে অল্প শান দিতে হইলে অল্পকে আগা হইতে গোড়া পর্যন্ত সেই শান প্রস্তরের চাকার বার বার আগা হইতে গোড়া এবং গোড়া হইতে আগা পর্যন্ত লাগাইয়া রাখিতে হয়। চাকা তো ঘুরিতেছে, সেই চক্ররূপ শাস-ক্রিয়া পুনঃপুনঃ আসিতেছে যাইতেছে, সেই যাওয়া আসার সহিত তুমি অল্পরূপ মনকে লাগাইয়া রাখ। অল্প শান দিয়া পরিষ্কার কবির বার সময় একরূপ শব্দ হয়, তদ্রূপ তুমিও মরিচা পড়া মন অল্পটিকে যখন প্রাণরূপ শানের উপর বসাইবে, তখনও এক প্রকার শব্দ হইবে। মরিচা কাটিয়া গেলে আর শব্দ হয় না, তদ্রূপ মনের ময়লা কাটিয়া মন যত নির্মল হইবে, ততই আর শব্দ হইবে না। মনের কথা কহাও আর থাকিবে না। মন একটু স্থির হইলেও বিন্দু দর্শন হইবে, কিন্তু সে বিন্দু স্থির নহে, যেন নড়িতেছে মনে হইবে। যত নড়িবে তত দেখাও কম যাইবে, বেশী নড়িলে একেবারেই দেখা যাইবে না। দর্পণ নড়িলে কি তাহাতে মুখ দেখা যায়? দর্পণ স্থির হইলে যে কোন প্রতিবিম্ব পড়ুক দেখা যাইবে, সেই প্রকার চিত্তরূপ বিন্দুকে স্থির করিয়া দর্পণের তায় সমুদ্রে রাখিলে সমস্ত জগৎ তাহার মধ্যে দেখা যায়।

কিরূপে সেই বিন্দু জ্যোতি দর্শন করিতে হয়, তাই কবীর বলিতেছেন—

গুরু ধোবী, দিখ কাপড়া সাধন সীদনহার,

স্বরত দিগাপর ধোইয়ে, নিকলে জ্যোতি অপার ॥

কবীর বলিতেছেন শিষ্যের মনটা ময়লা কাপড়ের মত, আর গুরু হ'লেন ধোপা। ধোপা যেমন কাপড়ে সাজিমাটা মাখাইয়া পাথরে আছাড় দেয়, গুরুরূপী ধোপা শিষ্যকে সাধনরূপ সাজিমাটি মাখাইয়া, আত্মার ধ্যানরূপ শিলাতে বারবার আছড়াইতে শিক্ষা দেন। আছড়াইতে আছড়াইতে কাপড়ের সমস্ত ময়লা কাটিয়া কাপড় যেমন স্বচ্ছ সুনির্মল হয়, তদ্রূপ গুরুদেব মত সাধন করিতে করিতে শিষ্যের মন হইতে সব ময়লা কাটিয়া গিয়া শুদ্ধ অপরূপ চিত্ত-জ্যোতির প্রকাশ হয়; প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণ স্থির হইলে মনের যে স্বচ্ছতা ও বিশুদ্ধতা আসে তদ্বারাই প্রকৃত আত্মজ্ঞান জন্মে ও উহাতেই আত্মাহুতি হয়। বিবেকচূড়ামণিতে শ্রীমদাচার্য্য শব্দ বলিয়াছেন—

“বিশুদ্ধসত্ত্ব গুণাঃ প্রসাদঃ স্বাস্থ্যাহুতিঃ পরমা প্রশান্তিঃ,

তৃপ্তিঃ প্রহর্ষঃ পরমাত্মনিষ্ঠা যয়া সহানন্দরসঃ সমুচ্ছতি ॥”

বিশুদ্ধ সত্ত্বের লক্ষণ হইল—(১) প্রসন্নতা, (২) স্বাস্থ্যাহুতি, (৩) পরমা শান্তি, (৪) তৃপ্তি, (৫) প্রহর্ষ ও (৬) পরমাত্মনিষ্ঠা—এতদ্বারা নিত্যরস-রূপ আত্মাকে লাভ করা যায়।

যতদিন প্রাণপ্রবাহ চঞ্চল থাকিবে ও ইড়া পিঙ্গলার মুখে চলিবে ততদিন জ্ঞান জন্মিবে বটে, কিন্তু তাহা সাংসারিক জ্ঞান, পরমাত্মনিষ্ঠজ্ঞান নহে। সুস্থায় প্রাণপ্রবাহ চলিতে থাকিলে বিশুদ্ধ সত্ত্বের আবির্ভাব হয়, পরে ত্রিগুণাতীত অবস্থা লাভ হয়। উহাই প্রকৃত পরমাত্মনিষ্ঠা, এরূপ অবস্থা লাভ হইলে আর অশান্তি, নিবানন্দ বা অজ্ঞানে তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিতে পারিবে না ॥ ৬

(ব্রহ্মোত্তমের বন্ধন)

রজো রাগাজ্ঞকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্ ।

তন্নিবদ্ধাতি কৌন্তেয় কর্ণসঙ্গেন দেহিনম্ ॥ ৭

অর্থঃ । কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয় !) রজঃ (ব্রহ্মোত্তম) রাগাজ্ঞকং (অহুরাগরূপ) তৃষ্ণা শঙ্গসমুদ্ভবং (তৃষ্ণা ও আসক্তির উৎপাদক) বিদ্ধি (বলিয়া জানিও) । তৎ (তাহা) কর্ণসঙ্গেন (কর্ণাসক্তির দ্বারা) দেহিনং (দেহীকে) নিবদ্ধাতি (আবদ্ধ করে) ॥ ৭

শ্রীধর । রজসো লক্ষণং বন্ধকত্বক্ আহ—রজ ইতি । রজঃসংজ্ঞকং গুণং রাগাজ্ঞকং—অহুরাগরূপং বিদ্ধি । অতএব তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্—তৃষ্ণা অপ্রাপ্তাভিলাষঃ, সঙ্গঃ—প্রাপ্তেহর্থে স্রীতিঃ বিশেষণ আসক্তিঃ । তয়োঃ তৃষ্ণাসঙ্গয়োঃ সমুদ্ভবঃ স্বভাবঃ তৎ ব্রহ্মো দেহিনং দৃষ্টা-দৃষ্টার্থে কৰ্ম্মসু সঙ্গেন—আসক্ত্যা নিতর্যং বদ্ধাতি । তৃষ্ণাসঙ্গাত্যাং হি কৰ্ম্মসু আসক্তিৰ্ভবতি ইত্যর্থঃ ॥ ৭

বঙ্গানুবাদ । [ব্রহ্মোত্তমের লক্ষণ ও বন্ধকত্ব বলিতেছেন]—রজঃসংজ্ঞক গুণ রাগাজ্ঞক অর্থাৎ অহুরাগরূপ (অহুরাগ বন্ধন) জানিবে অতএব তৃষ্ণা ও সঙ্গ উৎপাদক । তৃষ্ণা—অপ্রাপ্ত বিষয়ের অভিলাষ এবং সঙ্গ প্রাপ্তবিষয়ে স্রীতি অর্থাৎ বিশেষরূপ আসক্তি । তৃষ্ণা, সঙ্গ—এই দুইটির সমুদ্ভব হব যাহা হইতে সেই ব্রহ্মোত্তম, দেহীকে দৃষ্টাদৃষ্ট কৰ্ম্মসকলের আসক্তিতে নিরন্তর বদ্ধ করে । যেহেতু তৃষ্ণা ও সঙ্গ দ্বারাই কৰ্ম্ম আসক্তি জন্মে ॥ ৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—রজঃ অর্থাৎ ইড়া; অন্না কোন বস্তুতে আসক্তি পূর্বক ইচ্ছা—আত্মার দ্বারায় হইলে হয়—সেই বস্তুতে প্রার্থনার ইচ্ছা অনেকক্ষণ দৃষ্টি করিলে সেই বস্তু পাইবার ইচ্ছা হয় অত্যন্ত আগ্রহের সহিত, যাহা না পাইলেই অত্যন্ত ব্যাকুল হয় । তাহারই নাম তৃষ্ণা, সেই তৃষ্ণা তোমাকে বদ্ধ করিয়া ভালরূপে দাঁড় করিয়া রেখে দিয়াছে হাত জোড় করিয়া । কারণ সেই বস্তুর দ্বারায় আমার মনের কিয়ৎক্ষণ তৃপ্তিরূপ ফল প্রাপ্ত হইব । এইরূপ ইচ্ছাতে দাঁড়িয়ে থাকারূপ কৰ্ম্ম সম্পন্ন হইতেছে—এই শরীরের মধ্যে কুটম্বরূপে অর্থাৎ মহাদেবের—যেমন কোন ব্যক্তি মেঠাইয়ের দোকানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে :—ব্রহ্মোত্তমের স্বভাব রঙাইয়া দেওয়া । ইহা হইতেই তৃষ্ণা ও আসঙ্গ হয় । যে বস্তু আমার নাই তাহাকে পাইবার জন্য যে অভিলাষ তাহার নাম তৃষ্ণা, এবং যে বস্তু আমার আছে তাহাতে স্রীতি বশতঃ তাহা যেন থাকে এইরূপ মনোবৃত্তির নাম আসঙ্গ । ব্রহ্মোত্তমই কর্ণসঙ্গ উৎপন্ন করিয়া উদ্ভাবা জীবকে বদ্ধ করে । কোন বস্তুকে বার বার আসক্তির সহিত দেখিলেই তাহা পাইবার জন্য লোভ হয় । এই লোভই জীবকে পরের দ্বারায় স্বীকার করায়, অস্ত্রের নিকট মাথাকে অবনত করায় । কেননা অভিসম্বিত বস্তু পাইয়া মনের একটু তৃপ্তিলাভ হয় । এই অতৃপ্তিও বেগ মনে উদ্ভব হয় কেন ? তাহার কারণ তখন ইড়া নাড়ীতে প্রাণবেগ সঞ্চারিত হয় । গৈরিক বং শাধা কাপড়ে লাগাইলে সেই কাপড়কে যেমন গৈরিক বস্ত্রে অহরহিত করে, তদ্রূপ ইড়া-নাড়ীর প্রবাহ চলিলে সকল বস্তুর প্রতি লোভের সহিত আসক্তি আসে ।

(তমোত্তমের বন্ধন)

তমস্তজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সৰ্বদেহিনাম্ ।

প্রমাদানস্তনিদ্রান্তিস্তন্নিবদ্ধাতি ভারত ॥ ৮

আমাদের বেশ-শ্রীতি, জীবের কল্যাণ-ইচ্ছা—এই ত্রৈণীর আসক্তি । জীব যে মহাদেব, তিনি ভিখারীর মত একটু কিছু পাইবার আশায় যেন হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন । তিনি জানেন না যে তাহার সম্বন্ধেই নয়, তাহার পাইবার কিছু নাই, তবুও প্রাণের চাকল্য হেতু এই অমনস্ক অপ্রতি ভাব আসিয়া উপস্থিত হয় । মন দিয়া ক্রিয়া করিলে প্রাণের স্ববর্তা যেমন যেমন হইতে থাকে বস্তুর প্রতি তখন আর কোন আসক্তি থাকে না । সেই জন্য যাহারা কল্যাণকামী তাহাদের সকলের মন দিয়া ক্রিয়া করা আবশ্যক ॥ ৭

অর্থঃ । ভারত (হে ভারত !) তমঃ তু (তমোত্তম কিন্তু) অজ্ঞানজং (অজ্ঞান হইতে জন্মে) সৰ্বদেহিনাম্ (সকল দেহীর) মোহনং বিদ্ধি (মোহনক বলিয়া জানিবে) । তৎ (তাহা) প্রমাদানস্ত-নিদ্রান্তিঃ (প্রমাদ আলস্ত ও নিদ্রার দ্বারা) নিবদ্ধাতি (দেহীকে আবদ্ধ করে) ॥ ৮

শ্রীধর । তমো লক্ষণং বন্ধকত্বক্ আহ—তম ইতি । তমঃ তু অজ্ঞান্যং জাতম্ আবরণ-শক্তিপ্রধানং প্রকৃত্যংশোঃ উদ্ভূতং বিদ্ধি ইত্যর্থঃ । অতঃ সৰ্বদেহীং দেহিনাং মোহনং—প্রান্তিজনকম্, অস্তএব প্রমাদেন, আলস্তেন, নিদ্রয়া চ তৎ তমো দেহিনং নিবদ্ধাতি । তত্র প্রমাদঃ—অনবধানম্, আলস্তম্—অশুচ্যম্, নিদ্রা—চিহ্নস্ত অবসাদাৎ শয়ঃ ॥ ৮

বঙ্গানুবাদ । [তমোত্তমের লক্ষণ ও বন্ধকত্ব কি বলিতেছেন]—তমোত্তমটী কিন্তু অজ্ঞান হইতে জাত অর্থাৎ প্রকৃতির যে অংশ আবরণ-শক্তি প্রধান, তাহা হইতে উদ্ভূত । অতএব সকল দেহীর মোহন অর্থাৎ প্রান্তিজনক । সুতরাং প্রমাদ, আলস্ত এবং নিদ্রা দ্বারা সেই তমোত্তম দেহীকে আবদ্ধ করে । প্রমাদ শব্দের অর্থ অনবধানতা, আলস্ত শব্দের অর্থ অশুচ্য এবং নিদ্রা শব্দের অর্থ অবসাদ জন্ত শয় ॥ ৮

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—আত্মাতে না থাকায়—অজ্ঞানবশত আসক্তিপূর্বক দৃষ্টি করার নাম তমোত্তম অর্থাৎ পিঙ্গল। সকল দেহীর অর্থাৎ মহাদেবকে মোহিত করিয়া রাখিয়াছে, নতুবা জীবমাত্রেরই শিব অর্থাৎ ক্রিয়া করিলে যাহা গুরুবস্তুরূপ হয় । সে সকল কৰ্ম্ম যাহা দ্বারায় আবদ্ধ হইতেছেন তাহা প্রকৃষ্টরূপে আসক্তির সহিত ভঙ্গগত চিত্তে আগ্রহ প্রকাশ মাভালের মতন কাছাকে কি বলিতেছেন মিছে অনুধাবন করিতে পারেন না—না পারিয়া আপনার গম্বিতে উৎখলিয়া উঠে নেচে নেচে মানারূপ দেখাইয়া কালযাপন করিতেছেন । আর বলেন যে আমার সাবকাশ নাই—আর করেন যে কি তাহাও নিজে জানেন না, কারণ মাভাল !! যাহা আসিবে সম্মুখে কোন ভাল কৰ্ম্ম তাহা বলেন পরে করুব—“সে পর” পর পর হইয়া যায়, পরে নিদ্রা !! ও !!! মত আবশ্যক নাই তাহারও অনেক অধিক অর্থাৎ

আমাদের খাস-ক্রিয়া কখনও ইড়াইয়া চলে, কখনও পিঙ্গলায় চলে। এই খাসের গতি অনুসারে মনের বং বলাইয়া যায়। খাসের গতির দিকে যাঁহাদের লক্ষ্য নাই, তাঁহারা চিত্ত-স্পন্দনের স্রোতে গা ভাসাইয়া যেন। তাঁহারা বুঝিতে পারেন না কেন আমার ক্রোধ হয়, কেন আমার নিস্ফলতা হয়, কেন আমি আলস্যের বশবর্তী হই। যাঁহারা গুরুপদে মত খাসে লক্ষ্য রাখিবার অভ্যাস করেন; তাঁহারা প্রাণের স্পন্দনানুরূপ মনও যে স্পন্দিত হই-তেছে তাহা বুঝিতে পারেন, তাই তাঁহারা চিত্তে অর্টবধ চিন্তা আসিবামাত্র তখনই জাগ্রত হইয়া উঠেন। খাসে একটু লক্ষ্য রাখিলে অথবা কিছুক্ষণ প্রাণায়াম করিলে গুণের আক্রমণ হইতে আপনাকে বাঁচাইতে পারা যায়। শরীর মনের জন্ত কিছু বিশ্রাম বা নিদ্রা আবশ্যক বটে, কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন মাত্রা ছাপাইয়া না উঠে। এই সকল বন্ধন কেহ আমা-দেহ স্বপ্নে চাপাইয়া দেয় না, আমরাই অবিরেক ও আলস্য বশতঃ শুভ কার্যে প্রবৃত্ত না হইয়া অশুভের হস্তে আত্মসমর্পণ করি !! তাহাতে যে কত হঃখ পাই, তবুও মোহ কাটে না !! ৮

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—আত্মাতে সর্বদা থাকিলে অর্থাৎ জিয়া করিলে সম্যক প্রকারে সুখ উপপত্তি আপনা আপনি সুখে থেকে পরমানন্দ জিয়ার পর অবস্থা লাভ করে। যে আনন্দ মুখে ব্যক্ত করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই তজ্জন্ম অব্যক্ত—নিজবোধরূপ—পরে বুঝাইয়া দিতে পারে না। রজোগুণেতে কলাকান্ডকার সহিত যে কল কিছুকালের নিমিত্ত অর্থাৎ এ জন্ম আমার একশত বৎসরের নিমিত্তে পরে কাহার হইবে তাহার ক্ষিত্তা নাই—জন্মটুকু দশহাত লম্বা সাড়ে তিন হাত চওড়া তাহার নিমিত্ত দ্বন্দ্বজন লোক খুন্ আর অর্থব্যয় কত? যে মামলা করিতে করিতে ককির হইয়া গেলেন—পেশাদার ফকির এই ত রজোগুণের কর্ম্ম। এইরূপ কর্ণেতেই প্রায় লোক আবিষ্ট—আর আমিই যে কে? ও আত্মাই বা কি? তাহা জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত ভুলেও মনে এল না—অথচ জ্ঞান জ্ঞান ঘ্যান্ ঘ্যান্ শব্দ, লোকের কাছে আমি বড়লোক বলিয়া জ্ঞাত হব করিয়া থাকে। সুতরাং অজ্ঞানতা বস্তু এবং কথাবার্ত্তাতে আসক্তিপূর্ব্বক প্রায় সমুদয় সময় যাপন করেন। যাহা কিছু বাকী থাকে—তাহা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করিয়া নিজাক্রুপ অনিয়মিত অবস্থাতে প্রতাইই আবৃত্ত থাকিয়া ঘোর অন্ধকারে পতিত থাকেন—সুতরাং আলো না থাকিলেই অন্ধকারে থাকিতে হয়। সে আলো স্বচেষ্টাপূর্ব্বক অনুসন্ধান করা উচিত। তাহা যেনে শুনেও ঐ অন্ধকারে থাকিতে আমি ভালবাসি এইরূপ

বলিয়া থাকে—আমার টাকা আছে খাচ্ছি দাচ্ছি ভড়ভড়িয়ে হাগ্ছি বেস্ আছি। এইরূপ আশ্রয়ভেদে অন্ধকারে মিথ্যা কিছুদিনের নিমিত্ত মত্ত থাকিয়া ছারপোকায় জ্ঞান হুতুর অরূপ যমে এসে ধরে।—সত্ত্বগুণ সুখে সংশ্লিষ্ট করে। আশ্রাতে না থাকিতে পারিলে প্রকৃত সুখের মুখ দেখা যায় না। ক্রিয়া ঘাটাই আশ্রাতে স্থিতরূপ পরমানন্দ অবস্থা লাভ হয়, উহা অব্যক্ত, সুখে জানাইবার উপায় নাই। কিন্তু ক্রিয়া কবাটাও থুথু থুথু কর নয়, বরং করিতে নীরসই বোধ হয়। তবুও সত্ত্বপ্রবণ চিত্ত যে, ক্রিয়া করিতে বাহু বোধ না হইলেও সে কিন্তু প্রত্যহ নিয়মিত ক্রিয়া করিতে ছাড়ে না। আবার যে প্রত্যহ শ্রদ্ধাপূর্বক ক্রিয়াভ্যাস করে তাহার মনটা ধীরে ধীরে সত্ত্বগুণে ভরিয়া যায়। প্রকৃত দুঃখশোকের কারণ থাকিলেও যিনি জোর করিয়া ক্রিয়া করিতে বসেন, ক্রিয়াতে একটু মন লাগিলেই তাঁহার মন হইতে বিষয় চিন্তা চলিয়া যায়, তখন একটি অনাময় অবস্থা মনকে ঘেরিয়া বসে, তখন মনের নিশ্চিন্ত অবস্থার জ্ঞান একপ্রকার সুখ বোধ হয়। অবশ্য অর্থ, সম্মান, ভোগাদি পাইলেও মনে একপ্রকারের সুখের উদয় হয়, কিন্তু সে সুখ সাময়িক সুখ নহে। তবে দুঃখ শোক না থাকিয়া মনে যে হর্ষ উৎপন্ন হয়, এইটুকু সাময়িকতা তাহার মধ্যে থাকে। সত্ত্বগুণ সুখে আবদ্ধ করে বটে, কিন্তু সে বন্ধনরজ্জু ততটা দৃশ্যে নহে। সত্ত্বগুণ সুখের দিকে আবদ্ধ করে কেমন? যেমন ক্রিয়া করিতে করিতে যে শান্তি একটু একটু পাওয়া যায়, বাহা এই দুঃখের জগতে বড়ই দুর্লভ—সেই শান্তিটুকুর লোভে ক্রিয়া করিতে প্রত্যহ নিয়মিত বসে—এই যে সুখের বন্ধন ইহা অবশ্যই সত্ত্বগুণে আছে, কিন্তু এ বন্ধনে শেখ পৰ্য্যন্ত বন্ধন মোচন করিয়া দেয়, এইজন্য ইহাকে মন্দ বলা যাইতে পারে না।

আর রজোগুণের বন্ধন কি? কেবল কর্মে নিয়োগ করা। সাধু হইয়াছে, ত্যাগী বৈশ লইয়াছে তবুও কর্তব্যশক্তি যায় না। সামান্য বিষয় যাহা উপেক্ষা করিলেও চলে তাহারই জ্ঞান মাসে কুড়ি বার আদালতে ছুটাছুটি করিতেছে। সম্যাসী সাজিয়াও বিষয়-ভোগের দিকে থুথু আকর্ষণ; কেহ কিছু বলিলে বুঝাইয়া দেন জনক রাজার মত তিনি বিষয় ভোগ করিয়া থাকেন। তাই আশ্র কাল এই ঘরে ঘরে জনক রাজার ঠেলায় অতিমাত্রায় লোককে বিপন্ন করিয়া তুলিতেছে। আবার যিনি ধনী তিনি সাধুসঙ্গ করিলেও তাঁহার মধ্যেও ধনমদের দুর্গন্ধে লোককে অস্থির করিয়া রাখে। টাকা কড়ি হয়তো যথেষ্ট আছে, সংসারে প্রয়োজনও তেমন নহে, পেঙ্গন হইবা গিয়াছে—তবু যে একটু ভগবৎ আলোচনা করিবেন বা সাধন করিবেন—সে হবার জো নাই, সেই বদ্ধ জীবনস্থাতেও ময়লা ঘাঁটিবার সালসা অতিমাত্রায় বিদ্যমান। ইহা সমস্তই রজোগুণের খেলা। রজোগুণে জীবকে এই প্রকারেই আবদ্ধ করে!! তমোগুণ আরও অধিক! কেবল কর্তব্য কর্মের অকরণ জনিত প্রমাণে জীবকে সংশ্লিষ্ট করে। কিছু বুঝে না তাহাও নহে, বেশ বিচার শক্তিশূন্য আছে, কিন্তু এত অলস এত নিদ্রাকাতর যে ভাল পথে যাইবার ইচ্ছা থাকিলেও যাইতে পারে না। হয় তো মহৎসঙ্গ হেতু বিবেক-ভাল পথে যাইবার ইচ্ছা থাকিলেও যাইতে পারে না। হয় তো মহৎসঙ্গ হেতু বিবেক-বৈরাগ্যও আছে, ভগবানের দিকে মনও যায় কিন্তু সাধন করিবার জ্ঞান অতক্ষণ কে আসনে বসিয়া থাকে! এই সাধন করিতে যাইবে, অমনি কেহ আসিয়া ভূতেব গল্প জুড়িয়া দিল, ইহা করিয়া তাহাই শুনিতো লাগিল, এইরূপে দুর্লভ সময় প্রমাণে, আলস্যে, ইথা কার্যে ব্যয়িত

(দুইটি গুণের অভিব্যক্তি ও একটির প্রাবল্য)

রজঃ স্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।

রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥ ১০

হইয়া যায় ও এ সমস্তই তমোগুণের খেলা। অবিচার মাত্রা এই তমোগুণেই অধিক ঘেঁষিতে পাওয়া যায়। মাতাল যেমন মলপিত্ত দেহের কর্ণধারাব অমূল্যব করিতে পারে না, তমো-গুণীয়া সেইরূপ অজ্ঞান অন্ধকারে আবৃত হইয়া নিজের প্রমাদজনিত দুঃখের অবস্থাকে অমূল্যব করিতে পারে না, ইহাও তারপর একদিন মুখ্য আসিয়া লোকান্তরে লইয়া যায় ॥ ১০

অর্থ। ভারত (হে ভারত !) সত্ত্বং (সত্ত্বগুণ) রজঃ তমঃ চ (রজঃ ও তমোগুণকে) অভিভূয় (অভিভব করিয়া) ভবতি (উদ্ভূত হয় বা প্রবল হয়), রজঃ (রজোগুণ) সত্ত্বং তমঃ চ (সত্ত্ব ও তমোগুণকে) [অভিভূত করিয়া], তথা (এবং) তমঃ (তমোগুণ) সত্ত্বং রজঃ এব (সত্ত্ব ও রজোগুণকে) [অভিভূত করিয়া প্রবল হয়] ॥ ১০

শ্রীধর। তত্র হেতুনাহ—রজ ইতি। রজঃস্তমশ্চৈতি গুণদ্বয়ম্ অভিভূয়—তিরস্কৃত্য সত্ত্বং ভবতি—অদৃষ্টবশাৎ উদ্ভবতি, ততঃ স্বকার্যে সুখে জ্ঞানার্থে সংযোজয়তীত্যর্থঃ। এবং রজোহপি সত্ত্বং তমশ্চৈতি গুণদ্বয়ম্ অভিভূয় উদ্ভবতি। ততঃ স্বকার্যে তৃষ্ণার্থে সংযোজয়তি। এবং তমোহপি সত্ত্বং রজশ্চ উভৌ অপি গুণৌ অভিভূয় উদ্ভবতি। তত্ত্বশ্চ স্বকার্যে প্রমাদালম্ব্যার্থে সঞ্জয়তীত্যর্থঃ ॥ ১০

বঙ্গানুবাদ। [উক্ত বিষয়ের হেতু কি তাহাই বলিতেছেন]—সত্ত্বগুণটি, রজঃ এবং তমোগুণকে তিরস্কৃত করিয়া উদ্ভূত হয় অর্থাৎ জীবের অদৃষ্টবশতঃ উৎপন্ন হয়, তখন সত্ত্ব স্বকার্যে যে সুখ ও জ্ঞানাদি তাহাতেই জীবকে সংযোজিত করে। রজোগুণ, সত্ত্ব ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া উৎপন্ন হয়, তখন স্বীয় কার্য তৃষ্ণাদিতে জীবকে সংযুক্ত করে, আর তমো-গুণটিও সত্ত্ব এবং রজঃ উভয়কেই অভিভূত করিয়া উৎপন্ন হয়, তখন স্বকার্যে যে প্রমাদ ও আলস্য তাহাতেই জীবকে সংযুক্ত করে। ইহাই তাৎপৰ্য্য ॥ ১০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—প্রথমে একজনকে মারিলেন—মারিয়া দুঃখ করিতে লাগিলেন, এইরূপ রজঃ আর তমোগুণেতে আবৃত হইয়া সত্ত্বগুণাবলম্বী হইলেন, অর্থাৎ কানীতে এসে লক্ষ্যসারী হইলেন—মেরে হায় হায় করিলেন—রজোগুণ হইতে সত্ত্বগুণে আসিলেন; আবার বলিতে লাগিলেন যে হায় হায় করিলে কি হইবে, মেরেছি বেস্ করেছি—সত্ত্বগুণ হইতে তমোগুণে আসিলেন; পরে মনে করিলেন যে কর্মটা ভাল করিনি—পুনরায় তমঃ হইতে সত্ত্বগুণে আসিলেন; এখন বাহ্যকে মারিয়াছিলেন, তাহার ভরফের লোকগুলি পুনরায় লড়াই করিতে এল—স্বতরাং সত্ত্বগুণ হইতে পুনরায় রজোগুণে এলেন—এইরূপ ভালপাতার সিপাইরা এক নিশেষের ফুঁ দিয়ে যম উড়িয়ে বাহাদুরগকে নিয়ে যায়।—তিনটি গুণ একই কালে কার্য করিতে পারে না।

(গুণসমূহের বৃদ্ধির চিহ্ন)

সর্বদ্বারেষু দেহেহস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে ।

জ্ঞানং যদা তদা বিভাষিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥ ১১

একটি গুণ প্রবল হইলে আর দুইটি অতিভূত অবস্থায় থাকে, কিন্তু নষ্ট হয় না। এই গুণগুলি সকল অবস্থাতেই মিলিত ভাবে থাকে। তবে সত্ত্বগুণের উদয় তখনই বলা যায় যখন সত্ত্বগুণ প্রবল হইয়া মাথা তুলিয়া বসে এবং অজ্ঞ দুইটি অতিভূত ভাবে থাকে। যাহারা নিষ্কের প্রতি লক্ষ্য রাখেন তাঁহারা বৃদ্ধিতে পারেন কোন গুণটি এইবার মাথা চাড়া দিয়াছে। যাহারা সাধনাত্ম্যাসে মনকে নিযুক্ত না রাখেন তাঁহাদিগকে গুণগুলি স্বেচ্ছামত ঘুরাইয়া বেড়ায়। তাই একই মানুষের কোন সময়ে বেশ সাত্ত্বিক ভাব, কোন সময়ে রাজসিক ভাব ও কোন সময়ে তামসিক ভাব উদয় হইতে দেখা যায়। সেই ভাব দেখিয়া বুঝা যায় তাঁহার মধ্যে কোন গুণ এখন খেলা করিতেছে। স্বাসের গতি দেখিলেও উহা বুঝা যাইতে পারে পূর্বে-উল্লেখ করিয়াছি।

কিন্তু এই গুণগুলি স্বেচ্ছামত আসিয়া কি দেহীকে আক্রমণ করে? তাহা নহে, ইহাই জীবের পূর্বকর্মে বা অদৃষ্টে। বেশ ভাল মানুষটি বসিয়া আছে, হঠাৎ ভিতরে ভূত বাগিয়া উঠিল, মনটা তখনই তমোভাবে অতিভূত হইয়া পড়িল। এই সমস্ত গুণক্রিয়া কখন কখন পূর্বকর্মে ধরিয়া দেহীকে বিকল করিতে থাকে। বাহিরের দিক হইতে কখন কখন কোন হেতু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না অথচ মনটা কখন আনন্দিত, কখন বিষাদিত হইতেছে ইহাই রজোগুণজনিত বিক্ষিপ্ত ভাব।

সাধারণ লোকেরা অধিকাংশ সময়েই স্রোতোতাত্ত্বিত ভূতের দ্বারা এইরূপ গুণকর্মের দ্বারা অতিভূত হইয়া থাকে, কিন্তু যাহারা সাধক তাঁহারা সেইরূপ অনুবধান নহেন, তাঁহারা সর্বদাই প্রাণে লক্ষ্য রাখেন, তাই কোন গুণ স্বাভাবিক ভাবে প্রবল হইলেও তাঁহাকে একেবারে অতিভূত করিতে পারে না। কোন গুণকেই প্রাণ দিলে তাহারা অতিমাত্রায় দেহীকে জড়াইয়া ধরে। এইজন্য গুণের প্রতি বা প্রাণের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। যাহারা অলস তাঁহারা যদি আপনার এই তমোগুণের প্রতি ঠোঁটদাঁড়া দেখান, তবে তাঁহাকে তমো গুণ এরূপ আক্রমণ করিবে যে সেই গুণ যেন তাঁহার স্বভাবজাত বলিয়া মনে হইবে, তাঁহার অন্তঃকরণে যেন উহা বাসা বাধিয়া আছে বলিয়া মনে হইবে। এইরূপ সব গুণই প্রবল হইতে পারে; জীব অভ্যাস বশতঃ যেমন যেমন ভাবে উদাহরণকে প্রায় দিবেন, উদাহরণ সেই সেই মত প্রবল বা দুর্বল ভাবে দেহীকে আক্রমণ করিতে থাকিবে ॥ ১০

অন্য। যদা (যখন) অস্মিন্ দেহে (এই দেহে) সর্বদ্বারেষু সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারে জ্ঞানং প্রকাশঃ (জ্ঞানরূপ প্রকাশ) উপজায়তে (আবির্ভূত হয়), তদা উত (তখনই) সত্ত্বং বিবৃদ্ধং (সত্ত্বগুণ বিশেষরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত) ইতি বিভাষ্যে (ইহা জানিবে) ॥ ১১

তীর্থর। ইদানীং সর্বাধীনাং বিবৃদ্ধানাং লিঙ্গানি আহ—সর্বদ্বারেষু ইতি জিহ্বাঃ। অস্মিন্ আত্মনো ভোগাবতনে দেহে সর্বেষু অপি দ্বারেষু—শ্রোত্রাদিষু যদা শব্দাদি জ্ঞানাত্মকঃ

প্রকাশ উপজায়তে—উৎপত্তিতে, তদা অনেন প্রকাশলিঙ্গেন সত্ত্বং বিবৃদ্ধং বিভাষ্যে—জানীয়াৎ। উত শব্দাৎ স্থগাদিলিঙ্গেনাপি জানীয়াৎ ইত্যুক্তম্ ॥ ১১

বঙ্গানুবাদ। [ইদানীং সত্ত্বাদি গুণের বিশেষভাবে বৃদ্ধির চিহ্ন তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন]—এই আত্মার ভোগায়তন দেহে শ্রোত্রাদি দ্বারসমূহে যখন শব্দাদি জ্ঞানময় প্রকাশ উৎপন্ন হয়, তখন এই প্রকাশ চিহ্ন দ্বারা সত্ত্বগুণকে বিশেষভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বলিয়া জানিবে। “উত” শব্দে স্থগাদি চিহ্নদ্বারাও সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বলিয়া জানিতে হইবে ॥ ১১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এই দেহের সব ইন্দ্রিয়েরেই লক্ষ্য করিলে আত্মার প্রকাশ গুরুবাক্যের দ্বারায় জন্মাইতে পারে। সে ক্রিয়া স্বরূপ জ্ঞান হইতেছে, যাহা গুরুবক্তৃগম্য। সেই বিভাষ্যে বিভা, আর সব অবিজ্ঞা, অর্থাৎ সেই জানাই জ্ঞান আর সব অজ্ঞতা। সেই ক্রিয়ার বৃদ্ধি হইলেই সত্ত্বগুণে থাকা হইল।—যে সময় যে গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় সে সময় তাহার কিরূপ চিহ্ন প্রকাশ পায়, তাহারই কথা ভগবান্ বলিতেছেন। সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেই সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারে সাত্ত্বিক ভাব প্রকাশ পায়। তখন যে জ্ঞানপ্রবাহ চলে তাহার মধ্যে কোন ভ্রম-প্রমাণ থাকে না, যাহার যাহা স্বরূপ তাহাই প্রকাশিত হয়। সত্ত্বগুণশালী সাত্ত্বিক পুরুষের কথাবার্তা, ভাব-ভঙ্গীর মধ্যেও সাত্ত্বিকতার চিহ্নই প্রকটিত হইবে। তখন তাঁহার মুখ দিয়া এমন কথা বাহির হয় না, বা তাঁহার মন এমন কিছু মনন করিতে পারে না, যাহা সাত্ত্বিকতার বিরোধী, অথবা ইন্দ্রিয়াদির উত্তেজক বা অবসাদকর হইতে পারে। তখন ঠিক যেন উপনিষদোক্ত এই প্রার্থনা বাক্যের সফলতা সাধক আপনার মধ্যে বৃদ্ধিতে পারেন :—

ও ভক্তঃ কর্ণেতি: শৃণুয়াম দেব্যা:

ভক্তঃ পশ্যেমাচ্চির্বিজ্ঞাতা:

ও দেবগণ। যজ্ঞপরাধণ আমরা কর্ণ দ্বারা যেন উত্তম বিষয় শ্রবণ করিতে পারি, চক্ষুদ্বারা উত্তম বিষয় সেন দর্শন করিতে পারি। সত্ত্বগুণ প্রবৃদ্ধ হইলে এই কর্ণ এমন বদ শুনিতে পায় যাহা শুনিলে মনের বহির্মুখ ভাব স্বভাৱেই তিরোহিত হইয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, সে অশব্দের শব্দ, সে মূর্খমূর্খলীর মুর্খানা শুনিয়া মনঃপ্রাণ বিমোহিত হইয়া উঠে। বাহিরের দর্শন নহে, অন্তঃচক্ষু খুলিয়া যায়, সাধক কত কি অপূর্ণ দৃশ্য দর্শন করিতে করিতে বাহিরের সব দৃশ্য ভুলিয়া যান। এমন পবিত্র শৃংগের উদয় হয় যাহাতে নানিকা পবিত্র গন্ধে আমোদিত হইয়া উঠে, জিহ্বায় এমন রসাত্মক হইতে থাকে যে বাহিরের রসের সঙ্গিত আর সে রসের তুলনা হয় না। এইরূপ সব ইন্দ্রিয়দ্বারেই দিব্যভাব ফুটিয়া উঠে। মন এত স্থির হইয়া যায় যে সেই বিশেষপশু শাস্ত চিত্তাকাশ শব্দকালীন মেঘশব্দ স্বচ্ছ আকাশের মত সুনির্জল শ্যামশোভায় উৎকৃষ্ট হইয়া উঠে। এই অবস্থায় কেহ গালি দিলেও ধারণা বোধ হয় না, কেহ সর্বস্ব কাড়িয়া লইলেও কোন ক্ষতি বোধ মনে হয় না। সুস্থ্যাব যখন প্রাণবায়ু প্রবাহিত হয়, তখনই এই অবস্থা হয়। এই অবস্থায় যাহা জানা যায়, তাহাই আসল বিদ্যা বা জ্ঞান, আর সবই অজ্ঞান। যে বস্তু মন দিয়া ক্রিয়া করিবে তাহার সত্ত্বগুণ তত্ত্বই

(রজোগুণ বুদ্ধির চিহ্ন)

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কৰ্মণামশমঃ স্পৃহা ।

রজস্তোতানি জায়ন্তে বিবুদ্ধে ভরতবর্ষ ॥ ১২

বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। তাই কবীর বলিয়াছেন, ভগবানকে পাইবার জন্য এই শরীরকে জালাইয়া কালী কর অর্থাৎ খুব পরিশ্রম কর, আর কালীর কলম দিয়া সেই কালিতে রামের নাম লিখিয়া পাঠাও। এইরূপ অষ্টপ্রহর যে লাগিয়া থাকে, সেই ভগবানের প্রেমাত্মার নেশায় ভোর হইয়া যায়। কবীর আরও উৎসাহের সহিত বলিয়াছেন—

“প্রেম পিয়ালা ভরি পিয়া কবির্য্য রটি গুরুজ্ঞান।

দিয়া নগারা শবকা, লাল খড়া মৈদান ॥”

কবীর বলিতেছেন যে ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থারূপ প্রেম বাটি ভরিয়া পান কর, অর্থাৎ দেহেজিয় মন প্রাণ সব প্রেমে ভরপুর হইয়া উঠুক, এই ভাবে গুরুদত্ত সাধনা দিনরাত রটিতে থাক, তখন কত অপূর্ণ হৃদয় দৃশ্য, কত অদ্ভুত কাণ্ড সকল দেখিতে পাইবে। রাজা আসিলে যেমন তাঁহার আগমনের চিহ্ন স্বরূপ নানাবিধ স্বশ্রব-সংযুক্ত বাজনা বাজিত হইতে থাকে, তদ্রূপ এই দেহের মধ্যে তাঁকারের বিবিধ নাড় ব্যস্ত হইতে থাকিবে এবং তখন দেখিবে তোমার যিনি সর্বস্ব লাগমণি—তিনি ময়দানে—চিৎকাশের প্রান্তরে অপক্লপ দ্বিবা মাড়ে সাক্ষিয়া সাধকদের চিরদিনের আশা সকল করিতেছেন ॥ ১১

অন্থয়। ভরতবর্ষ (হে ভরতবর্ষ !) লোভঃ (পরজন্ম গ্রহণে ইচ্ছা) প্রবৃত্তিঃ (সর্বদা কার্যে লাগিয়া থাকা) কৰ্মণাম্ আৰম্ভঃ (কৰ্মে সতত উত্তম), অশমঃ (অশান্তি বা অস্থিরতা বা উপশমহীন স্বরূপাধি প্রবৃত্তি) স্পৃহা (সকল বস্তু পাইবার জন্যই তৃষ্ণা) এতানি (এই সকল চিহ্ন) রজসি বিবুদ্ধে (রজোগুণ বুদ্ধি পাইলে) জায়ন্তে (জন্মে) ॥ ১২

শ্রীধর। কিঞ্চ—লোভ ইতি। লোভঃ—ধনাভ্যাগমে বহুণ্য জায়মান্বেপি পুনঃ—পুনঃবর্জমানোহভিলাষঃ। প্রবৃত্তিঃ—নিত্যং কুরুক্রপতা, কৰ্মণামারম্ভঃ—মহাগৃহাদিনির্গাণো-জন্মঃ। অশমঃ—ইহং কৃতা ইহং করিষ্যামীত্যাদি সঙ্কল্পবিকল্পানুপবসঃ। স্পৃহা—উচ্চাচেষ্টা দৃষ্টমাত্রেয় বস্তু ইত্যন্ততো জিহ্বা। রজসি বিবুদ্ধে সতি এতানি লিঙ্গানি জায়ন্তে। এতিঃ লিঙ্গৈঃ রজোগুণস্ত বিবুদ্ধিঃ জানীয়াদিত্যর্থঃ ॥ ১২

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন]—লোভ শব্দে ধনাদির আগম, উহা বহুরূপে হইলেও পুনঃ পুনঃ তাহার বুদ্ধি করিবার যে অভিলাষ, প্রবৃত্তি—সর্বদা কৰ্মে লাগিয়া থাকা, কৰ্মসকলের আরম্ভ, মহাগৃহ (অট্টালিকা) নির্মাণের উত্তম ; অশম—এইটি করিয়া আবার এইটি করিব ইত্যাদি নিরন্তর সঙ্কল্প-বিকল্পের অশান্তি-ভাব। স্পৃহা—বস্তু দেখিবামাত্রেই তাহা উত্তমই হউক বা অধমই হউক ইত্যন্ততো সংগ্রহেচ্ছা। রজোগুণ বুদ্ধি হইলে এইসকল চিহ্ন উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ এই সকল চিহ্ন দ্বারা রজোগুণ বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে জানিবে ॥ ১২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—কোন বিষয়েতে ইচ্ছাপূর্বক প্রকৃষ্টরূপে আসক্তিপূর্বক দৃষ্টিকরতঃ উদগত চিন্ত হইবার পূর্বক্ষণের নাম লোভ ; প্রবৃত্তি—প্রকৃষ্টরূপে সেই

অপ্রকাশোহপ্রবৃত্তিঃ প্রমাদো মোহ এব চ ।

তমস্যোতানি জায়ন্তে বিবুদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৩

অর্থকে সদাসর্বদা তদ্রূপ হইয়া মনকে সেইখানে রাখার নাম প্রবৃত্তি ; কোন বস্তু ভাল করে চোকে দেখে আসক্তিপূর্বক হঠাৎ করার নাম আরম্ভ, কলা কাঙ্ক্ষার সহিত কোন কৰ্ম করার নাম কৰ্ম। সম্যক প্রকারে ইচ্ছারহিত না হওয়া অর্থাৎ এ দরজার হেরেছি অন্য দরজায় যাব, অর্থাৎ মুনসেক আদালত, ক্ষুদ্র আদালত, বড় আদালত ইত্যাদি—ইহা সকল রজোগুণের কৰ্ম, রজোগুণ বুদ্ধির কৰ্ম।—রজোগুণ বুদ্ধি হইলে কি কি চিহ্ন উপস্থিত হয় তাহাই ভগবান বলিতেছেন। (১) কোন বিষয় দেখিবামাত্র তাহা পাইবার জন্য আসক্তি পূর্বক সেই বস্তুর পানে চাহিয়া থাকার নাম লোভ। বহু ধনাগম সঙ্গে আরও পাইবার ইচ্ছা, যাহা কিছু চোখে পড়ে তাহাই সংগ্রহ করিয়া ঘরে পুরিয়া রাখার ইচ্ছা। (২) প্রবৃত্তি—সর্বদাই কিছু না কিছু একটা লইয়া ব্যস্ত থাকা। যাহা একবার মনে লাগিয়াছে, সেই খানেই মনকে লাগিয়া রাখা। আহা! উহার কেমন গহনাটি, আহা উহার কেমন বাড়ীটি, আহা কেমন সুন্দর তার বাগানটি—এই সব সর্বদা মনে জল্পনা করা, এবং সেই সব বিষয় সংগ্রহে হিমরাত পরিশ্রম করা। (৩) কৰ্মারম্ভ—বড় বড় গৃহ অট্টালিকা প্রাণে উজোগ, নিজের অনেক কিছু আছে, তথাপি স্বাধিকার বিস্তারের জন্য সর্বদা উজোগ। (৪) অশম—মনের শান্তি নাই, সর্বদা মনে সঙ্কল্প-বিকল্পের ভাঙ্গন-গড়ন চলিতেছে, মকর্দমা করিতেছি, হারিতেছি, কখন জিতিতেছি কখনও বা হারিলে আবার উচ্চ আদালতে গাঠবার ইচ্ছা ইত্যাদি। (৫) স্পৃহা—যা কিছু দ্রব্য, ভূমি, ধন, স্ত্রী—সমস্ত আমার হউক, এইরূপ মনে মনে জল্পনা।

এই সমস্তই রজোগুণ বুদ্ধির লক্ষণ—ইড়ায় শাস বহিবার সময় মনের এইরূপ অবস্থা হয় ॥ ১২

অন্থয়। কুরুনন্দন (হে কুরুনন্দন !) অপ্রকাশঃ (আবরণ—জ্ঞানের অভাব) অপ্রবৃত্তিঃ চ (কৰ্মে অহুগম, আলস্য), প্রমাদঃ (অনবধানতা, কর্তব্যের বিস্মৃতি), মোহঃ এব চ (এবং মোহ, আচ্ছন্ন-ভাব, বুদ্ধির বিপর্য্য) এতানি (এই সকল) তমসি বিবুদ্ধে (তমোগুণ বুদ্ধি পাইলে) জায়ন্তে (উৎপন্ন হয়) ॥ ১৩

শ্রীধর। কিঞ্চ—অপ্রকাশ ইতি। অপ্রকাশঃ বিবেকভ্রংশঃ, অপ্রবৃত্তিঃ—অহুগমঃ, প্রমাদঃ—কর্তব্যার্থানুসন্ধানরাহিত্য, মোহঃ—মিথ্যাভিনিবেশঃ, তমসি বিবুদ্ধে সতি এতানি লিঙ্গানি জায়ন্তে। এতৈঃ তমসো বুদ্ধিঃ জানীয়াদিত্যর্থঃ ॥ ১৩

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন]—অপ্রকাশ—বিবেকভ্রংশ, অপ্রবৃত্তি—অহুগম, প্রমাদ—কর্তব্য বিষয়ে অহুসন্ধান রাহিত্য, মোহ—মিথ্যাভিনিবেশ ; তমোগুণ বুদ্ধি পাইলে এই সমস্ত চিহ্ন প্রকাশ পায়। এই সকল চিহ্ন দ্বারা তমোগুণ বুদ্ধি হইয়াছে জানিবে ॥ ১৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—অন্যদিকে আসক্তি পূর্বক দৃষ্টি করার আত্মান্যাতীত তমো-গুণে থেকে আর প্রবৃত্তি—ভালরূপে আসক্তিপূর্বক উদগতচিন্ত হইয়া অর্থাৎ

(সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস কর্মের ফল)

কর্মণঃ সুকৃতস্যাহং সাত্ত্বিকং নির্মলং ফলম্ ।

রজসস্ত ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্ ॥ ১৬

কাম ক্রোধ লোভাদি অতিরিক্ত মাত্রায় থাকিলে, সেই সকল বৃত্তি চরিতার্থ করিবার ঈচ্ছা তাহার যে দ্বেষ হইবে তাহা বিভীষণ কুহুর, ছাগ মহিষ, ব্যাঘ্র সর্পাদির মতই হইবে । নচেৎ ঐ সকল বৃত্তি চরিতার্থ হইবে কিরূপে ? জীবিতাবস্থাতেও যাহাদের রজোগুণ প্রবল থাকে, তাহারা সদাসর্বদা ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া বহুবিধ কর্মে আপনাকে লিপ্ত রাখে, আর তমোগুণ প্রবল হইলে তখন তাহার বুদ্ধি-শক্তি যেন লোপ পায়, একটা গুণ মুখের মত তাহার মনো-ভাব হয় । সকলের মধ্যে সেই একই নারায়ণ, কিন্তু তবু গুণভেদে কত বৈষম্য দেখায় । রজনী কঁচের মধ্য দিয়া শুদ্ধ বস্তুকে দেখিলেও যেমন তাহা কঁচের রূপে অনুরঞ্জিত হয়, তদ্রূপ চিরনির্মল অবিকারী আত্মাকে প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের মধ্য দিয়া দেখিলে তাঁহাকে সেই সেই গুণরঞ্জিতের ছায় দেখায় । বাস্তবিক তাহার নিজেই শুদ্ধতাবের মধ্যে কোন গুণের ব্যঞ্জন নাই । তাই শুদ্ধ চৈতন্য ব্রহ্মকে, মূর্খ, চোর, বোকা, লম্পট বলিয়া মনে হয় । কিন্তু ব্রহ্ম সব জানিয়াও কিছুই জানেন না যেন, আর প্রাকৃত লোকেয়া কিছুই জানেন না, অথচ বলে সব জানি ॥ ১৫

অন্থয় । সুকৃতস্ত কর্মণঃ (সুকৃত বা সাত্ত্বিক কর্মের) ফলং (ফল) নির্মলং সাত্ত্বিকং (নির্মল ও সাত্ত্বিক) আহং (তত্ত্বদর্শী বলিয়াছেন), তু (কিন্তু), বজসঃ ফলং (রজোগুণের ফল) দুঃখং (দুঃখ) ; তমসঃ ফলম্ (তামসিক কর্মের ফল) অজ্ঞানম্ (অজ্ঞান) ॥ ১৬

শ্রীধর । ইদানীং সত্ত্বাদীনাম্ স্বাক্ষরূপকর্মধারেণ বিচিত্রফলহেতুত্বমাহ—কর্মণ ইতি । সুকৃতস্ত—সাত্ত্বিকস্ত কর্মণঃ সাত্ত্বিকং—সত্ত্বপ্রধানং নির্মলং—প্রকাশবহুলম্ সুখং ফলম্ আহং কপিলাদয়ঃ । রজসঃ ইতি—রাজসস্য কর্মণঃ ইত্যর্থঃ । কর্মফলকথনস্ত প্রকৃতত্বাৎ । তস্ত দুঃখং ফলমাহঃ । তমসঃ ইতি—তামসস্য কর্মণঃ ইত্যর্থঃ । তস্য অজ্ঞানং—মূঢ়ত্বং ফলমাহঃ । সাত্ত্বিকাদি কর্মলক্ষণং চ ‘নিয়তং সঙ্গরহিতং’ ইত্যাদিনা অষ্টাদশেধ্যায়ৈ বক্ষ্যতি ॥ ১৬

বঙ্গানুবাদ । [এক্ষণে সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের স্বাক্ষরূপ কর্মদ্বারা যে বিচিত্র ফলহেতুত্ব তাহাই বলিতেছেন]—সাত্ত্বিক কর্মের সবপ্রধান, নির্মল অর্থাৎ প্রকাশ-বহুল সুখরূপ ফল—ইহা কপিলাদি ঋষিরা বলেন । কর্মফল কথনের প্রস্তাব চলিতেছে বলিয়া বলিতেছেন যে রজস শব্দের অর্থ রাজস কর্ম, তাহার ফল দুঃখ বলিয়া ঋষিরা বলেন । তমস শব্দে তামস কর্ম, তাহার ফল অজ্ঞান অর্থাৎ মূঢ়ত্ব । সাত্ত্বিকাদি কর্মের লক্ষণ “নিয়তং সঙ্গরহিতং” ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা অষ্টাদশ অধ্যায়ে বলিবেন ॥ ১৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—কর্ম ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত যাহা মন গ্রাস করে—সে এই ক্রিয়া যাহা গুরুবাক্য দ্বারা লভ্য—এই সৎ সুকৃত এই সাত্ত্বিক কর্ম ইহার নির্মল ফল ব্রহ্ম যাহা ক্রিয়ার পর অবস্থায় হয়—রজোগুণের ফল অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম করিলেই দুঃখ—অন্যদিকে আসক্তিপূর্বক দৃষ্টি করিলে, তমোগুণে

(গুণত্রয়ের বিশেষ বিশেষ ফল)

সত্ত্বাৎ সজ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ ।

প্রমাদমোহো তমসো ভবতোহজ্ঞানমেব চ ॥ ১৭

থাকিয়া—আমি যে কে তাহা জানিতে পারে না সুতরাং অজ্ঞান—তমোগুণের ফল—যেমন কোন ভজলোক চামারগীর বাড়ীতে গিয়া আপনাকে আপনি ভুলিয়া যায় ।—সাত্ত্বিক কর্ম অত্যন্ত নির্মল বলিয়া উহার সর্বপ্রধান ফল মনের অকপট মল-রহিত অবস্থা । কারণ তখন কোন আবরণ থাকে না । যে কর্মের দ্বারা মনের “অহংমনাকার” রূপ আবরণ কাটে তাহাই সাত্ত্বিক কর্ম । ইন্দ্রিয়দ্বারে আমরা শুভ কর্ম করিলেও তাহা পূর্ণসাত্ত্বিক হয় না । কারণ রজস্তমোগুণ প্রবৃত্ত হইয়াই অতিমানাস্থক অহংকারের উৎপত্তি হয়, এই অহংকারের সাত্ত্বিক অংশ প্রবৃত্ত হইয়া একাদশ ইন্দ্রিয় (Organs) এবং মন উৎপন্ন হয় । সুতরাং মন ব্যতীত অন্য ইন্দ্রিয় দ্বারা ঠিক ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত কর্ম হয় না । অতএব যে কর্ম ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত হইবে তাহা মনোগ্রাহ্য । পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, মনও বুদ্ধি, এই সপ্তদশ অবয়বাস্থক লিঙ্গ শরীর—এই লিঙ্গ শরীর হৃদয় বস্তু সুতরাং স্থলদেহাদি হইতে হৃদয়ধর্মী । মনঃ ও প্রাণের কল অধিরত চলিয়াছে, সেই অবিশ্রান্ত কর্ম করার ফল চাক্ষুশ্য ও অবসাদ, গুতরাং তাহা সাত্ত্বিক নহে । সাত্ত্বিক কর্ম তাহাই যখন প্রাণ স্থির ও মন স্থির হইয়া সঙ্গলবিকল্পশূন্য হয় । সুতরাং সুকৃত বা সাত্ত্বিক কর্ম তাহাই যাহা দ্বারা প্রাণ স্থির হয় ও তৎসহ মনও স্থির হয় । সেই কর্মই হইল প্রাণ-ক্রিয়া, ইহা একমাত্র সাত্ত্বিক কর্ম, ইহার ফল মলশূন্য হওয়া । একমাত্র ব্রহ্মই মলশূন্য পবিত্র, যাহা ক্রিয়ার পর অবস্থায় আপনিই হয় । ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য দিকে আসক্তি পূর্বক দৃষ্টি করিলেই মন কর্ম ক্রিয়া ফলের দ্বারা ধুকপুক করে, তদ্বারা আসক্তি জন্মে—ইহাই রজোগুণের ফল । আর তমোগুণে আত্মবিস্মৃত হইব তাহার কর্তব্যাকর্তব্য সব ভুলিয়া যায়, কেবল প্রকৃতির তাড়নায় পশুর ছায় ইন্দ্রিয়ভোগে আসক্ত হয় ; এবং এই আসক্তি অজ্ঞানই ফল । এই দ্বিতীয় তমোগুণের ফল দুঃখবহল ॥ ১৬

অন্থয় । সত্ত্বাৎ (সত্ত্বগুণ হইতে) জ্ঞানং সজ্জায়তে (জ্ঞান জন্মে) ; রজসঃ (রজোগুণ হইতে) লোভঃ এব চ (লোভ হয়) ; তমসঃ (তমোগুণ হইতে) প্রমাদমোহো (প্রমাদ ও মোহ) অজ্ঞানং এব চ (আর অজ্ঞান) ভবতঃ (হইয়া থাকে) ॥ ১৭

শ্রীধর । তত্রৈব হেতুমাং—সদ্বাদিতি । সত্ত্বাৎ জ্ঞানং সজ্জায়তে । অতঃ সাত্ত্বিকস্য কর্মণঃ প্রকাশবহলং সুখং ফলং ভবতি । রজসো লোভো জায়তে, তস্ত চ দুঃখহেতুত্বাৎ তৎপূর্বকস্ত কর্মণো দুঃখং ফলং ভবতি । তমসস্ত প্রমাদমোহাজ্ঞানানি ভবন্তি । ততঃ তামসস্ত কর্মণঃ অজ্ঞানপ্রাপকং ফলং ভবতীতি যুক্তমেব ইত্যর্থঃ ॥ ১৭

বঙ্গানুবাদ । [এ বিষয়ে হেতু কি তাহাই বলিতেছেন]—সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, অতএব সাত্ত্বিক কর্মের ফল প্রকাশবহল সুখ । রজোগুণ হইতে লোভ উৎপন্ন হয়, লোভ দুঃখহেতু বলিয়া লোভপূর্বক কর্মের ফল দুঃখই হয় । তমোগুণ হইতে প্রমাদ, মোহ ও

(সহাদি বৃত্তিশীলের ফলে ভেদ)

উর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজস্যাঃ ।

জঘন্নাগুণবৃত্তিহা অধো-গচ্ছন্তি তামস্যাঃ ॥ ১৮

জ্ঞানেন উৎপত্তি হয়, এজ্ঞ তামস কর্মের যে অজ্ঞানপ্রাপক ফল হয় তাহা বৃত্তিবৃত্ত—ইহাই তাৎপর্য ॥ ১৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সত্ত্বগুণে থাকিলে পর অর্থাৎ ক্রিয়া করিলে পর ক্রিয়ার পর অবস্থাতে আপনার স্থিরপদ ব্রহ্মজ্ঞান হয়। রজোগুণ অর্থাৎ যখন ইড়ায় থাকে তখন ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম করিতে তদগতচিত্ত হইয়া তাহার প্রাপ্তি-ইচ্ছা সর্বপ্রকারে করে—ইহারই নাম যোগ—পিঙ্গলাতে থাকিলে প্রকৃষ্ট-রূপে মত্ত হইয়া একজনকে মারিতে অল্প জনকে মারে মোহিত হইয়া সেই বস্তুর প্রতি—আপনাকে আপনি না জেনে স্তবরাং অজ্ঞান তমোগুণেতে হয়। পূর্বের বলা হইয়াছে ক্রিয়া করিলে সত্ত্বগুণ বাড়ি, স্তবরাং যে ক্রিয়া অধিক করে তাহার সত্ত্বগুণও বাড়িতে থাকে। সত্ত্বগুণ হইল ক্রিয়ার পর অবস্থায় অল্প অল্প স্থিতি, সুস্থায় প্রাণ তখন ধীরে ধীরে চলে, এই স্থিরতা বাড়িলেই স্থিরত্বের লাভ হয়। উহাই ব্রহ্মজ্ঞান। ক্রিয়ার পর অবস্থা ক্রমশঃ ক্রিয়া করিতে করিতেই হয়। যে যেমন ক্রিয়া করিবে তাহার সেই রূপ নেশা হইবে। কূটস্থ মধ্যে পরব্যোম স্বরূপের প্রকাশ হয়—উহাই পরমাকাশ। পরমাকাশের অন্তত্বই জ্ঞানের চিহ্ন ব্রহ্মের অস্ত্র কোন চিহ্ন নাই, তিনি আছেন এই জ্ঞানই তাঁহার চিহ্ন। অস্ত্র সাধনায় যে যুক্তিক্রম আছে, তদপেক্ষা ক্রিয়া দ্বারায় উহা সহজলভ্য। সৃষ্টির বিকাশের সময় আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল ও জল হইতে পৃথিবী হয়। ক্রম পূর্বক প্রলয় হইলে প্রত্যেক ওতুই স্ব স্ব কারণে লয় হয়। কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় একেবারে প্রলয় হয়, ক্রমের অপেক্ষা নাই। একেবারে সর্ব কারণের কারণ-স্বরূপ যে ব্রহ্ম তাহাই হইয়া যায়। উপরোক্ত অবস্থা ক্রিয়া করিয়া সুস্থায়্য থাকার ফলেই লাভ হয়। ইড়ায় থাকিলে নিম্ন-তৃষ্ণা বাড়িয়া চলে, তজ্জাত লাভ অর্থাৎ বিষয়াসক্তি খুব বাড়িয়া যায়। আর তমোগুণে কেবল প্রমাদ ও কেবল মোহ ॥ ১৭

অন্বয়। সত্ত্বস্থাঃ (সত্ত্বগুণপ্রধান ব্যক্তিগণ) উর্দ্ধং (উর্দ্ধলোকে) গচ্ছন্তি (গমন করেন)। রাজস্যাঃ (রজোগুণপ্রধান ব্যক্তিগণ) মধ্যে তিষ্ঠন্তি (মধ্য-লোকে অবস্থান করেন)। জঘন্নাগুণ-বৃত্তিহাঃ (নিকৃষ্টগুণ সম্পন্ন) তামস্যাঃ (তামস ব্যক্তিগণ) অধঃ গচ্ছন্তি (অধোগতি প্রাপ্ত হয়) ॥ ১৮

শ্রীধর। ইদানীং সত্ত্বাদিবৃত্তিশীলানাং ফলভেদমাহ—উর্দ্ধমিতি। সত্ত্বস্থাঃ—সত্ত্ববৃত্তি প্রধানাঃ। উর্দ্ধং গচ্ছন্তি—সর্বোৎকর্ষতারতম্যাং উত্তরোত্তরশতগুণানন্দান্ মহুগন্ধর্ক-পিতৃদেবালোকান্ সত্যলোকপর্যন্তান্ প্রাপ্নবন্তি ইত্যর্থঃ। রাজস্যাং তৃষ্ণাখালা মধ্যে তিষ্ঠন্তি—মহুগলোকে এব উৎপন্নন্তে। জঘন্নাঃ—নিকৃষ্টঃ তমোগুণঃ শুভ বৃত্তি—প্রমাদমোহাদিঃ। তত্র স্থিতা অধো গচ্ছন্তি। তমসো বৃত্তিতারতম্যাং তামিষাদিষু নিয়মেই উৎপন্নন্তে ॥ ১৮

বঙ্গানুবাদ। [সম্প্রতি সত্ত্বাদিবৃত্তিশীল ব্যক্তিদের ফলভেদকিরূপ হয় তাহাই বলিতেছেন]

—স্ববৃত্তিপ্রধান ব্যক্তিগণ উর্দ্ধলোকে গমন করেন। সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ ও তারতম্য অনুসারে মহুগন্ধ, গন্ধর্ক, দেবলোক, এমন কি সত্যলোক পর্যন্ত প্রাপ্তি হয়। মহুগলোকে যত সুখ তাহার শতগুণ গন্ধর্কলোকে, আবার গন্ধর্কলোকে হইতে শতগুণ পিতৃলোকে, পিতৃলোকে হইতে শতগুণ দেবলোকে এবং দেবলোকে হইতে শতগুণ সত্যলোকে আনন্দ হয়। যাহারা রাজস অর্থাৎ তৃষ্ণাদি দ্বারা আকুল তাহারা মধ্যে থাকেন, অর্থাৎ মহুগলোকে উৎপন্ন হন। জঘন্না অর্থাৎ নিকৃষ্ট, সেই নিকৃষ্ট তমোগুণের বৃত্তি যে প্রমাদ-মোহাদি, তাহাতে স্থিত ব্যক্তিগণ অধোলোকে গমন করে। তমোগুণের বৃত্তির তারতম্য অনুসারে তামিষাদি নিয়মে (নরকে) উৎপন্ন হয় ॥ ১৮

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ক্রিয়া করিতে করিতে মাথার উপরে যায়—সেখানে গেলেই নেশা হয়—সেই আনন্দ সর্বদা ভোগ করে—লড়াই বড়াই মধ্যস্থানে বাছদ্বারা করে—যাহার জোড়গুণের কর্ম—আর অধম ক্রিয়া, অধোতে থেকে অধো-দেশে গমন করে যাহা তমোগুণের কর্ম—যাহা অত্যন্ত মন্দ।—সুস্থায়-মার্গে স্থির স্তব্বরূপ যে বায়ু যিনি এই শরীরকে ধারণ করিয়া আছেন তাহাতে যিনি থাকেন তিনি ব্রহ্মের অণুকে অনুভব করেন। পরে হৃদয়ে, কূটস্থে ও ব্রহ্মরঞ্জে মন ও প্রাণের স্থিতি লাভ হয়, তখন সর্বত্রই ব্রহ্মের উপলব্ধি হয়। ক্রিয়া না করিলে সাধারণে ইহা লক্ষ্য করিতে পারে না। কূটস্থের মধ্যে ভালরকমের চ্যোতিবিশিষ্ট আকাশ মণ্ডল, প্রদীপের সলিভার মত আলো সেই আকাশমণ্ডলে জলিতে থাকে, তাহারই মধ্যে ত্রিলোক। পরে এই সমস্তই যে ব্রহ্ম তাহাই বোধ হয়। ক্রিয়া মন দিয়া অনেকদিন প্রতিদিন করিলেই প্রাণ সুস্থায়্য মধ্যে গমনাগমন করে। যাহাদের এইরূপ হয় তাহারাই সত্ত্বপ্রধান পুরুষ। পরে এই প্রাণ যখন মাথায় চড়িয়া স্থির হইয়া যায়—তখন গুণাতীত অবস্থা লাভ হয়। এই জ্ঞান বাহারা সুস্থায়্য থাকেন তাহাদের ক্রমশঃ উর্দ্ধগতি হইতে হইতে আজ্যচক্রে স্থিতি হয়, পরে সহস্রারে প্রবেশ হয়।

আজ্যচক্র হইতে কণ্ঠ পর্যন্ত সত্ত্বগুণের স্থান। কণ্ঠ হইতে নাভি পর্যন্ত রজোগুণের এবং নাভির নীচে তমোগুণের স্থান। সাধনার দ্বারা কণ্ঠের উপরে মন যিনি রাখিতে পারেন তাহার মন রজস্তমোময় ক্ষেত্র পার হইয়া সত্ত্বগুণে অবস্থান করিতে পারে। ইহাই সত্ত্বগুণের বিবুদ্ধাবস্থা। সত্ত্বগুণের বিবুদ্ধাবস্থা হইতেই আজ্যচক্র ও তদুর্দ্ধে মনের স্থিতি হইলে ত্রিগুণাতীত অবস্থা লাভ করা যায়। সত্ত্বগুণের বিবুদ্ধাবস্থা হইলে দেহের সর্ব দ্বার দিয়াই জ্ঞানের প্রকাশ হয়। তখন দূর ভ্রমণ, দূর দর্শন, ইচ্ছামাত্রই দেবলোকে দেবতাদের সহিত অবস্থান হইয়া থাকে। যাহাদের রজোগুণ প্রবল তাহাদের স্থান মধ্যলোকে অর্থাৎ কর্মভূমি এই ভ্রমণে বারংবার আসা যাওয়া করিতে হয়। তাহাদের কর্মস্থান কণ্ঠের নীচে (হৃদয়ে), এ হৃদয় সর্বদাই ধুক ধুক করিতেছে, কি হইবে, কিরূপে উহা অধঃ হইবে—এই সমস্ত মনোভাব। হস্তাদিই তাহাদের কর্মের প্রধান সাধন, যাহা দ্বারা সাধারণতঃ সংসারী জীব কষ করিয়া থাকে। তমোগুণের অধম কাণ্যাদি অধোদেশ হইতেই বেশির ভাগ হয়। নাভির নীচে নিম্নত্ব, জঘন্যাদি প্রদেশ, ঐ সব স্থানেই কামের বসতি। কামলীলা পশ্চাদ্-সব ঐ দেশ হইতেই হয়। যাহাদের মন সর্বদাই নাভির নীচে, সেই সকল কামভোগপরায়ণ জঘন্না জীবের অধোগতিই লাভ হয় ॥ ১৮

(গুণকে অতিক্রম করিতে পারিলেই মোক্ষ লাভ হয়)

নাশং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি ।

গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মন্তাবং সোহধিগচ্ছতি ॥ ১৯

অন্থয়। যদা দ্রষ্টা (যখন দ্রষ্টা) গুণেভ্যঃ (ত্রিগুণ হইতে) অস্তং কর্তারং (অস্তকে কর্তা বলিয়া) ন অনুপশ্যতি (না দেখেন), গুণেভ্যঃ চ (এবং গুণসকল হইতে) পরং (গুণের অতীত বস্তুকে) বেত্তি (জানিতে পারেন), তদা (তখন) সঃ (সেই জীব) মন্তাবং (আমার ভাব, ব্রহ্মভাব) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হন) ॥ ১৯

শ্রীধর। তদেবং প্রকৃতিগুণসঙ্গতং সংসারপ্রপঞ্চ উক্ত্য ভবিষ্যতঃ (ভবিষ্যতিবেকেন) মোক্ষং দর্শয়তি - নাশমিতি । যদা তু দ্রষ্টা বিবেকী ভূত্বা বুদ্ধাভ্যাকারপরিণতেভ্যো গুণেভ্যঃ অস্তং কর্তারং ন অনুপশ্যতি, অপি তু গুণা এব কর্মাণি কুর্ষন্তীতি পশ্যতি । গুণেভ্যশ্চ পরং - ব্যতিরিক্তং তৎ সাক্ষিণ্য আত্মানং বেত্তি তু মন্তাবং - ব্রহ্মত্বম্ অধিগচ্ছতি - প্রাপ্নোতি ॥ ১৯

বঙ্গানুবাদ । [এইরূপে প্রকৃতির গুণসঙ্গ কারণই যে সংসারপ্রপঞ্চ তাহা বলিয়া এক্ষণে তদব্যতিরিক্তকে মোক্ষপ্রাপ্তি দেখাইতেছেন] - যখন কিন্তু দ্রষ্টা বিবেকী হইয়া বুদ্ধাদি আকারে পরিণত গুণ ভিন্ন অস্তকে কর্তারূপে দেখেন না, কিন্তু গুণই কর্তা করে এইরূপ দেখেন, এবং গুণসমূহের ব্যতিরিক্ত তৎসাক্ষি স্বরূপ আত্মাকে জ্ঞাত হন, তখন তিনি মন্তাব অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন ॥ ১৯

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ক্রিয়ার পর অবস্থাতে যখন ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুমা, যাহারা ঐচ্ছাদিকে দৃষ্টি করিতেছে যাহা দ্বারায় সেই আত্মাতে সর্বদা দৃষ্টি রহিয়াছে—তখন ত্রিগুণাতীত হইয়া পর ব্রহ্মেতে থাকিয়া আমার ভাব অর্থাৎ এক হইয়া আপনা আপনি বুদ্ধির পর পরাবুদ্ধি ব্রহ্মেতে গমন করে।—শ্রীমদ্ আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—“পুরুষের প্রকৃতিস্বতাক্ষণ মিথ্যা জ্ঞানের সহিত যে জীব সম্বন্ধ, তাহারই গুণত্রয়ে আসঙ্গ হয়। সুখ, দুঃখ, মোহাদি এই ত্রিবিধ গুণ হইতে—আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি নৃ—এই প্রকার বোধই গুণত্রয়ের সহিত পুরুষের সঙ্গ। এই সঙ্গই পুরুষের সংসারের কারণ। সদস্য জ্ঞাতির মধ্যে যে জ্ঞান তাহাই সংসার। এই অবিজ্ঞানমূলক মিথ্যা জ্ঞানই বন্ধের কারণ, এবং সম্যগ্ দর্শনই মোক্ষের উপায়, সেইজন্য বলিতেছেন যে কার্য্য, কারণ ও বিষয় এই তিনরূপে পরিণত গুণত্রয় হইতে অস্ত কেহ কর্তা হইতে পারে না, যে ব্যক্তি এইরূপ দর্শন করিয়া থাকে, এবং গুণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক গুণসমূহের সাক্ষীকেও বেধিয়া থাকে, সেই দ্রষ্টা মন্তাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।” বাস্তবিক দেহবুদ্ধাদি আকারে পরিণত গুণগুলি ব্যতীত কর্মের কর্তা অস্ত কেহ নহে, এইরূপ গুণ সমূহকে কর্তা, এবং তাহা হইতে স্বতন্ত্র আত্মা সাক্ষী মাত্র, এই জ্ঞান যাহার সুদূত হইয়াছে তিনি ভগবদ্ ভাব প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ হইয়া যান। ইহাই “মম স্বাধর্ম্যমাগতা.”। এখন এটুকু উপর উপর পুণির জ্ঞান থাকিলেই যে তাহার ভগবানের স্বরূপাবস্থায় পৌঁছিতে পারিবেন তাহা নহে। আনন্দের সংসারে জড়াইয়াছে কে? ত্রিগুণ অর্থাৎ ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না যে প্রাণ প্রবাহ

গুণেনেতান্ভ্যঃ জীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্ ।

জন্মমৃত্যুজরাভ্রাখৈবিমুক্তোহমৃতমশ্নু তে ॥ ২০

এদ্যাহে, তাহাতেই জীবের সহিত ত্রিগুণের তাৎপর্য্য—উহাই জীবের বহির্দৃষ্টরূপ সংসার হইতেছে, সেই প্রাণ-প্রবাহের অন্তর্গত না হইলে সংসারদৃষ্টি নষ্ট কিছুতেই হইবে না। এইজন্য কি করিতে হইবে? সেই প্রাণের সাধনা গুরুপদেশ মত করিতে পারিলে তবেই প্রাণ-প্রবাহ ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্নার অতীত অবস্থা লাভ করিবে, তখনই গুণাতীত পবিত্রত্বের সহিত মিলন হইবে। পরাবুদ্ধির সহিত এই বুদ্ধি এক হইয়া যাইবে। গুণের সহিত বুদ্ধির সম্বন্ধ লুপ্ত হইবে, তখন গুণকার্য্য আর আমাদের বিচলিত করিতে পারিবে না। আত্মাকে তখনই গুণাতীত বলিয়া বুঝা যাইবে। প্রাণ-প্রবাহ ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না থাকায় বিষয়ে আসক্তি পূর্বক দৃষ্টি হয়, কিন্তু ব্রহ্মদৃষ্টি-সম্পন্ন হইতে হইলেও এই ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্নার দ্বারাই সাধন করিতে হইবে এবং তদ্বারাই গুণাতীত অবস্থা লাভ করা যায়। ইহার কৌশল গুরুমুখে জানিতে হয়। গুণাতীত পুরুষেরা গুণের কার্য্য কেবল সাক্ষিরূপে দর্শন করিয়া থাকেন, আত্মাও প্রকৃতির কার্য্যের ঐরূপ দ্রষ্টামাত্র। প্রাণ স্থির করিয়া আত্মাচক্রের উর্দ্ধে থাকিতে পারিলেই জগৎকাণ্ডে ঐশ্বরীভূত আসে ॥ ২০

অন্থয়। দেহী (জীব) দেহসমুদ্ভবান্ (দেহোৎপত্তির বীজভূত) এতান্ জীন্ গুণান্ (এই তিন গুণকে) অতীত্য (অতিক্রম করিয়া) জন্মমৃত্যুজরাভ্রাখৈঃ (জন্ম, মৃত্যু, জরা হুঃ হইতে) বিমুক্তঃ (বিমুক্ত হইয়া) অমৃতম্ অমৃতং (মোক্ষ লাভ করেন) ॥ ২০

শ্রীধর। ততশ্চ গুণকৃতসর্বানর্থনিবৃত্ত্যা কৃতার্থো ভবতি ইত্যাহ—গুণানিতি । দেহাত্মা-কারঃ সমুদ্ভবঃ পরিণামো যেষাং তে দেহসমুদ্ভবঃ । তান্ এতান্ জীন্ অপি গুণান্ অতীত্য —অতিক্রম্য, তৎকৃতৈঃ জন্মাদিভি বিমুক্তঃ সন্, অমৃতং—পরমানন্দং প্রাপ্নোতি ॥ ২০

বঙ্গানুবাদ । [তাহার পর সম্বাদিগুণকৃত অর্থাৎ যে গুণত্রয় দেহাদি আকারে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াছে) অনর্থ সমূহের নিবৃত্তি দ্বারা মানব যে কৃতার্থ হয় তাহা বলিতেছেন] —দেহী দেহসমুদ্ভব গুণত্রয় অতিক্রম করিয়া তৎকৃত জন্ম, জরা, মৃত্যুরূপ হুঃ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হন ॥ ২০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এই তিনগুণ অতীত হ'য়ে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকেন সেই মহাদেব যিনি এই দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন অর্থাৎ কুটম্ব স্বরূপ আপনাই আসিয়াছেন তিনি শ্রিত্ব পদ পাইয়া জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাদি হইতে মুক্ত হইয়া অমৃত পদ অর্থাৎ অমর পদ ভোগ করেন।—শ্রীমদাচার্য্য শঙ্কর এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—“মায়ার উপাধিভূত তিনটি গুণকে—জীবিত থাকিতে থাকিতেই অতিক্রম করিয়া দেহী জন্ম-মৃত্যু-জরানিবন্ধন হুঃ হইতে মুক্তিলাভ পূর্বক অমৃতপদ লাভ করিয়া থাকেন। এই প্রকার হইলেই জীব মন্তাব অর্থাৎ ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হয়। এই দেহোৎপত্তির মূল হেতু পূর্বোক্ত গুণত্রয়।”

গুণত্রয়ের পরিণাম এই দেহ, এই দেহের অতীত অবস্থা লাভ না করিলে কেহই মুক্তি

কৈলিন্দৈস্ত্রীন্ গুণানেনতনতীতো ভবতি প্রভো ।

কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্গুণানতিবর্ততে ॥ ২১

লাভ করিতে পারে না । এই দেহাতীত অবস্থা লাভ করিতে হইলেই গুণত্রয়কে অতিক্রম করিতে হইবে, অর্থাৎ ইন্ডা-পিঞ্চলা-সুগন্ধা-বর্জিত অবস্থা লাভ করিতে হইবে । তাহার উপায় ক্রিয়া । ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্তি হইলে অণুপরিমাণ যে এই জীব দেহকে অণুতে মিলিয়া অজীব ব্রহ্ম হয় অর্থাৎ তাহার ইন্দ্রিয়গ্রামও ব্রহ্মরূপ হয় । যোনিবৃত্তায় নদীর অণু জায় ব্রহ্মের অণু কূটস্থের মধ্যে প্রকাশ হইয়া থাকে । সুতরাং সেই অণুরূপ ব্রহ্মকে দেখিয়া ইন্দ্রিয়েরা নিবৃত্ত হইয়া যায় অর্থাৎ বিষয়াবেষণে ব্যাপৃত না থাকিয়া স্থিরভাবে থাকে । ক্রিয়ার পর অবস্থার এই নিদর্শন । তখন দেহা মদ্যাদি অর্থাৎ ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হয় । তাহা কিরূপে হয় ? ক্রিয়ার পর অবস্থায় মন অজটিকে যায় না, আত্মা পরমাশ্রিতে লীন হইলে যে ঐশ্বর্য্য (নেশা) হয়, তাহাতে থাকিয়া মহদব্রহ্মে লীন হয়, অর্থাৎ নবতত্ত্বাধিবগতি ও গুণের জ্ঞান হওয়ায় তখন তাহাকে ভগবান্‌ই বলা যায়, তিনিই ভগদ্ব্যাপক মহেশ্বর । কূটস্থের মধ্যে নক্ষত্র স্বরূপ জ্যোতিঃ আছে । সেই ভগবান্‌ সর্বব্যাপী, ত্রিমিত্ত তিনি সর্বগত শিব । তিলের মধ্যে তৈল, ধর্ম্মের মধ্যে স্মৃত, স্রোতের মধ্যে জল, কার্ঠের মধ্যে অগ্নি যেমন থাকে তজ্জপ । বর্ষণ বা পেণব দ্বারা বেরূপ ঐশ্বর্য্য বাহিব করিতে হয়, সেইরূপ প্রাণ-পানের বর্ষণ দ্বারা এই গুহ্যস্থিত পুরুষকে দর্শন করা যায় । যিনি প্রাজ্ঞ (জীব) তিনিই পরমাশ্রা । তাহার উপাধি হৃদয়াকাশ । ক্রিয়ার পর অবস্থায় আটকাইয়া থাকিলে 'আমি'র স্বরূপ (হং) হয়, অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় "আমি" থাকে না । এই অবস্থাকে "অন্তরাকাশ" বলে, এই অন্তরাকাশই পরব্যোম ব্রহ্মরূপ হইতেছেন । সেই পরমাশ্রা শরীরের আনর্থাৎকেনে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন । এই শরীরের সাব জ্যোতিঃ, যাহা না থাকিলে এই শরীর মৃতের স্থায় হয় । সেই অচিন্ত্য শক্তিরূপ জ্যোতিঃের সাব হইতেছেন যিনি স্বয়ং গুহ্য "অণোরপীমান" রূপে প্রকাশিত আছেন । এই অক্ষাণু ক্রিয়ার পর অবস্থার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মরূপ । তাহা হইলে এই মহাদেব কূটস্থই দেহে উৎপন্ন হইয়া জীবরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, আবার ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থির পদ লাভ করিয়া তিনি জন্ম-জরা-ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়া বিবেক অবস্থা যাহা অমৃত পদ তাহা লাভ করেন ॥ ২০

অর্থঃ । অজুনঃ উবাচ (অর্জুন বলিলেন) । প্রভো (হে প্রভোঃ) । কৈ. ১. ৫: (কিরূপ লক্ষণদ্বারা) [দেহী] এতান্‌ ত্রীন্‌ গুণান্‌ (এই তিন গুণ) অতীতঃ ভবতি (যুক্ত হন) ; কিমাচারঃ (কিরূপ আচার যুক্ত হন), কথং চ (এবং কি প্রকারে) এতান্‌ ত্রীন্‌ গুণান্‌ (এই তিন গুণকে) অতিবর্ততে (অতিক্রম করেন) ॥ ২১

শ্রীধরঃ । গুণান্‌ এতান্‌ অতীত্য অমৃতম্‌ অমৃতং ইত্যোক্তং ত্রয়া গুণাতীতম্‌ লক্ষণং আচারং গুণাত্যয়োপায়ঃ চ সম্যগ্‌ বুভুংসুঃ অর্জুন উবাচ—কৈবলি । হে প্রভো ! কৈ: লৈষ্ট-কামনৈ: আত্মনি উৎপন্নৈ: চিষ্টৈ: গুণাতীতো দেহী ভবতাতি লক্ষণ-প্রশ্নঃ । ক: আচারঃ অশ্র

প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং চ মোহমেব চ পাণ্ডব ।

ন হোষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাজ্জতি ॥ ২২

ইতি কিমাচারঃ—কথং বর্ততে ইত্যর্থঃ । কথং—কেন উপায়েন, এতান্‌ ত্রীন্‌ গুণান্‌ অতীত্য বর্ততে ? তৎ কথং ইত্যর্থঃ ॥ ২১

বঙ্গানুবাদ । [এই গুণত্রয়কে অতিক্রম করিলে অমৃত লাভ হয়, ইহা শুনিয়া গুণ-তীতের লক্ষণ, তাহার আচার এবং গুণত্রয় অতিক্রমের উপায় সংক্ষেপে জ্ঞানলাভেচ্ছা হইয়া] —অর্জুন বলিতেছেন, প্রভো ! আত্মাতে উৎপন্ন কীদৃশ লক্ষণ বা চিহ্ন দ্বারা দেহীকে গুণাতীত বলিয়া জ্ঞান যায়—ইহাই লক্ষণ সংক্ষেপে প্রশ্ন । কিমাচারঃ শব্দের অর্থ তাহার আচার কিরূপ, অর্থাৎ তিনি কি ভাবে অবস্থান করেন ? কথং অর্থাৎ কি প্রকারে বা এই গুণত্রয় অতিক্রম করা যাইতে পারে ? তাহা বল ॥ ২১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—শরীরের ভেদ বলিতেছেন—এই তিন গুণের চিহ্ন কি প্রকার আর ইহার অতীতই বা কিরূপ প্রকারে হয় আর কিসে থাকিলেই বা হয় ? আর এই তিন গুণটাই বা কি প্রকার ? আর ইহাতে কিরূপেই বা লোকেরা বহিয়াছে ? হে প্রভো ! প্রকৃষ্টরূপে হইয়াছে তুমি এই শরীর হইতে অর্থাৎ উত্তম পুরুষ তুমি বল ।—যখন জানা গেল এই গুণত্রয়ই আমাদের ভাববন্ধনের হেতু, তখন ভাববন্ধন মোচনের উপায় বিজ্ঞানসা করা সাধকের পক্ষে স্বাভাবিক । তাই অর্জুন বলিতেছেন, প্রভো, ত্রিগুণের আলায় জীব ছটফট করিয়া বেড়াইতেছে, সে ত্রিগুণের লক্ষণ তো তুমি বলিলে আমিও বুঝিলাম । এখন বলিয়া দাও ভগ্নমৃত্যুর দীর্ঘ এই ত্রিগুণকে অতিক্রম করা যায় কিসে ? যে অতিক্রম করে তাহার এমন কি লক্ষণ কটে উঠে যদ্বারা তাহাকে ত্রিগুণাতীত বলিয়া বুঝিতে পারা যাইবে ? তুমি চিনাইয়া না দিলে আমাদের নিজ নিজ অন্তঃকার সন্দেহ ভুল বুঝাইয়া দিবে । গুণেতে থাকেই বা কেনন করিয়া ? গুণাতীত হয়ই বা কেনন করিয়া ? গুণাতীত হইলে তাহার আচার ব্যবহার কেনন হয় ? এই সব বুঝাইয়া দাও, প্রভো ॥ ২১

অর্থঃ । শ্রীভগবান্‌ উবাচ (শ্রীভগবান্‌ বলিলেন) । পাণ্ডব (হে পাণ্ডব !) প্রকাশং চ (প্রকাশ অর্থাৎ জ্ঞান) প্রবৃত্তিং চ (ও কর্ম্ম-প্রবৃত্তি) মোহম্‌ এব চ (এবং মোহ) সংপ্রবৃত্তানি (সমুদ্রিত হইলে) ন হোষ্টি (যিনি দেখ করেন না), নিবৃত্তানি চ (এবং উহার নিবৃত্ত হইলে) ন কাজ্জতি (আকাজ্জা করেন না) ॥ ২২

শ্রীধরঃ । “স্থিতপ্রজ্ঞস্ত্ব কা ভাবা” ইত্যাদিনা দ্বিতীয়াধ্যায়ে পৃষ্টমপি দত্তোত্তরমপি পুন-র্ক্লিষ্টবৃত্তংসয়া পৃচ্ছতাতি জ্ঞাত্বা প্রকারান্তরেণ তত্ত্ব লক্ষণাদিকং শ্রীভগবান্নুবাচ—প্রকাশং চেত্যাধি বৃত্তিঃ । তত্রৈকেন লক্ষণমাহ—প্রকাশমিতি । প্রকাশক—সর্বদায়ৈষু দেহেহস্মি মিত্তি পুরোক্তং সত্বকার্য্যং । প্রবৃত্তিক—বজ: কার্য্যম্‌ । মোহক—তম: কার্য্যম্‌ । উপলক্ষণমন্তঃ সত্ত্ব-রীণাম্‌ । সর্বাণ্যপি কার্য্যাণি যথার্থং সংপ্রবৃত্তানি—স্বত: প্রাণানি সন্তি হংসবুদ্ধ্যা যো ন হোষ্টি । নিবৃত্তাস্তি চ সন্তি স্ত্ববুদ্ধ্যা ন কাজ্জতি, “গুণাতীতঃ স উচ্যতে” ইতি চতুর্থেনাধ্যায়ঃ ॥ ২২

বঙ্গানুবাদ। [দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৫৪শ শ্লোকে “স্থিতপ্রজের কি লক্ষণ” ইত্যাদি দ্বিজানুসার উত্তর দেওয়া হইলেও, পুনরায় তাহা বিশেষরূপে জানিবার অভিপ্রায়ে অর্জুন দ্বিজানুসার করিতেছেন—ইহা মনে করিয়া প্রকারান্তরে তাহার লক্ষণাদি ছয়টি শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন। তন্মধ্যে এই এক শ্লোকদ্বারা তাহার লক্ষণ বলিতেছেন।] প্রকাশ শব্দের অর্থ (একাদশ শ্লোকে পূর্বে যাহা বলিয়াছেন)—সত্ত্বের কার্য্য। প্রবৃত্তি শব্দে রজোগুণের কার্য্য। মোহ শব্দে তমোগুণের কার্য্য। গুণত্রয়ের উপলক্ষণার্থ ইহা কথিত। সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের কার্য্য যথাযথ স্বতঃ প্রবৃত্ত (উপস্থিত) হইলে যিনি হৃৎ-বুদ্ধিতে ধ্বংস করেন না, এবং নিবৃত্ত হইলে হৃৎ-বুদ্ধিতে আকাজ্ঞা না করেন তিনিই গুণাতীত—এইরূপে ৪র্থ শ্লোকের সহিত ইহার অবধি ॥ ২২

[“তামসীবৃত্তি উৎপন্ন হইয়াছে, সেই কারণে আমি মূঢ় হইয়াছি, রাধসী প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইয়াছে, সেই কারণে আমি রজোগুণের দ্বারা প্রবর্তিত অর্থাৎ স্বরূপ হইতে ভ্রংশ হইতেছি—ইহা আমার পক্ষে অত্যন্ত ক্লেশকর, এইরূপ সাত্ত্বিক প্রকাশরূপ গুণ আমার বিবেক উৎপাদন করিতেছে এবং আমাকে সুখে আসক্ত করিতেছে—এই প্রকার ভাবনার বশে গুণত্রয়ের কার্য্যগুলির প্রতি বিদ্রোহ ভাবাপন্ন হইয়া থাকে। সাত্ত্বিকাদি গুণত্রয়যুক্ত পুরুষেরা যেমন আত্মসংলগ্ন একবার প্রকটিত হইয়া পুনর্বার নিবৃত্ত সত্ত্বাদিগুণের কার্য্যাবলীর প্রতি আকাজ্ঞা সম্পন্ন হয়, গুণাতীত পুরুষ কোন প্রকার গুণকার্যের প্রতি সেরূপ আকাজ্ঞাযুক্ত হন না।”—শঙ্কর]

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—কুটম্ব দ্বারা অনুভব হইতেছে—ক্রিয়ার পর অবস্থায় এক রকমের প্রকাশ, যেখানে দিনও নাই রাতও নাই—সেই প্রকাশেতেই প্রকৃষ্ট-রূপে তদগতচিত্ত; তদ্রূপ ভাবাপন্ন হইয়া প্রকৃষ্টরূপে মত্ত মাতালের মত থেকে অল্প সকল দিক্ হইতে চিত্ত তদগত হইয়া তৎপদে মোহিত তজ্জন্ম তাহাতে থাকিতে সম্যকরূপে ইচ্ছা, তাহাও নাই আর তাহাতে না থাকি তাহারও ইচ্ছা নাই—মাথার উপর চড়ে বসে যেন কেহ বলিয়া আছে—এইরূপ বসে থেকে এই তিন গুণকে অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না বিশেষরূপে চলিতেছে না অর্থাৎ সূক্ষ্মরূপে ব্রহ্মনাড়ীতে চলিতেছে এইরূপ গুণের পর অবস্থা একভাবে থাকা। ইহা যে জানে সেই আমার ভাবেতে যার—অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা যতদূর পারা গেল বর্ণনা করা গেল (যাহা গুরুবক্তৃ-গম্য—‘কু’র চিহ্ন সব স্থির।—আমরা সাধারণতঃ যে রকম প্রকাশকে প্রকাশ বলিয়া থাকি, ক্রিয়ার পরাবস্থায় প্রকাশ সেরূপ ধরনের নহে। তাহা যে অজ্ঞান বা অন্ধকার তাহাতে নয়ই, অথবা আলোকের মত কিছু যে প্রকাশ তাহাও নহে। সে এক আশ্চর্য্য রকমের প্রকাশ, ইন্দ্রিয়াদির অনধিগম্য। উপনিষদ বলিতেছেন:—

ন তত্র স্বর্ঘ্যো ভাতি ন চন্দ্র-তারকঃ

নেমা বিদ্যতো ভাস্তি কুতোহয়মগ্নিঃ।

তমেব ভাস্তমহুভাতি সর্গঃ

তত্ত্ব ভাস্য সর্গমিহং বিভাতি ॥ কঠঃ, ২য় অঃ, ২য় বাক্য

স্বর্ঘ্য সর্গরস্তর প্রকাশক হইয়াও সর্গাভূত সেই ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্র এবং তারকাও তদ্রূপ; এই বিদ্যাসমূহও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। আমাদের প্রত্যক্ষ-গোচর এই অগ্নি আর পারিবে কোথা হইতে? অধিক কি, এই যে স্বর্ঘ্য প্রভৃতি সমস্ত জ্যোতি-র্ময় পদার্থ প্রকাশ পাইতেছে, তাহা সেই প্রকাশমান পরমেশ্বরের অল্পগত ভাবেই প্রকাশ পাইতেছে। অসত্ত্ব কাঠখণ্ড যেমন অগ্নিসংযোগবশতঃ দাহকারী অগ্নির অল্পগত ভাবে দাহ করে, কিন্তু স্বভাবতঃ নহে, তেমনি এই স্বর্ঘ্যাদি পদার্থ সমূহও তাঁহার দীপ্তিতেই বিভ্রান্ত হন। এই প্রকারে সেই ব্রহ্মই ভাত ও বিভ্রান্ত হন। এবং কার্য্যগত বিবিধ দীপ্তিতে সেই ব্রহ্মের দীপ্তিরূপতা স্বতঃই অবগত হওয়া যায়। কেননা, যাহার স্বভাবসিদ্ধ দীপ্তি নাই সে কখনই অন্তের দীপ্তি সম্পাদন করিতে পারে না।

ব্রহ্ম স্বয়ংপ্রকাশ বলিয়া তাঁহার চৈতন্য সত্তায় চরাচর জগৎ প্রকাশিত হইতেছে।

“এব সর্কেষু ভূতেশু গুণাত্মা ন প্রকাশতে

দৃশ্যতে ত্বেয়া বুদ্ধ্যা স্বপ্নয়া স্বপ্নদর্শিতঃ।” কঠ, ১ম, তৃতীয়।

ব্রহ্মাদিসত্ত্বপর্ব্যন্ত সর্বভূতে গূঢ়—আবৃত্ত অর্থাৎ আত্মরূপে কাহারো নিকট প্রকাশ পায় না। কারণ ধর্মন-শ্রবণাদি ব্যাপারও অবিদ্যা দ্বারা সমাচ্ছন্ন। তবে ধীর ব্যক্তি তাঁহাকে মনন করিয়া শোকমুক্ত হন কিরূপে? তিনি তো প্রকাশ পান না। বিরুদ্ধ কথা হয় বলিয়া বলিতেছেন—যে তিনি অবিদিত্ত বুদ্ধিরই অজ্ঞেয়, পরন্তু সংস্কৃত অথ্য একাগ্রতায়ুক্ত এবং স্বপ্ন বস্ত্র গ্রহণে তৎপর্য্য বুদ্ধি দ্বারা দৃষ্ট হন।

অগ্রে বুদ্ধি স্থির করিতে পারিলে অত্যন্ত স্বপ্নের স্বপ্ন যিনি তাঁহাকে দেখা যায়। ‘ক্ষীণদোষাঃ যতয়ঃ পশুন্তি’—যাঁহারা সংযতচিত্ত অর্থাৎ যাঁহাদের মন অল্পদিকে যায় না তাঁহারা গুঢ় জ্যোতির্ময় আত্মাকে ধর্মন করিয়া থাকেন।

এই যে গুঢ় নির্মল প্রকাশ, এই প্রকাশ-স্বরূপে যাঁহা চিত্ত তদগত, এই গুরম পদ ছাড়িয়া যাঁহা চিত্ত অন্ত কোথাও বাইতে চাহে না—এরূপ অবস্থা যাঁহারা লাভ করিয়াছেন তাঁহারা তো পরপারে পৌঁছিলেন বলিয়া, কিন্তু যাঁহারা পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছেন, পরম নির্ভয় পদ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা উক্ত অবস্থাকেও আগ্রহভরে কামনা করেন না, আবার চিত্ত যদি একটু সংসারে নামিয়া পড়ে তাহা হইলেও বিরক্ত হন না। তাঁহারা সকল অবস্থাতেই ব্রহ্মধর্মন করিবার শক্তি লাভ করিয়াছেন। সেই জন্য “পরমপদে বলিয়াই থাকিব আর সংসার ধর্মন করিব না,” এইরূপ ইচ্ছাও তাঁহাদের উদয় হয় না, অথবা সংসারের যে যে ভোগ বাকী আছে তাহা ভোগ করিয়া লই এরূপ ইচ্ছাও মনে উদয় হয় না। কারণ যাঁহারা ব্রহ্মবিদ হন—তাঁহাদের নিকট

“যে যে কামাঃ দুর্লভা মর্ত্যলোকে, সর্কান্ কামাংস্কমতঃ প্রার্থয়ত্ব।

ইমা রামাঃ সবধাঃ সত্বর্ঘ্যা, নহীদৃশা সঙ্কনীয়া মনুষ্যৈঃ ॥” কঠ

মমুন্মলোকে যে যে কাম্যপদার্থ অত্যন্ত দুর্লভ সেই সমস্ত কাম্যবস্ত্র যেহেতুস্বারা প্রার্থন্য কর। বর্ধিতা, বাদিরাহিত্য। এই রমণী সমূহ তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, এরূপ স্বপ্নবী

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্ঘো ন বিচাল্যতে ।

গুণা বর্তন্ত ইত্যেবং যোহবতিষ্ঠতি নৈবতঃ ॥ ২৩

মহত্ত্ব কর্তৃক লব্ধ হওয়া সম্ভব নহে। সাধনে বহুদূর অগ্রসর হইলে এই সকল এবং অস্বাভাবিক উপভোগ্য কাম্য বস্তু সকল সাধকের নিকট আপনা-আপনি উপস্থিত হয়, বাহারা এই সকল ভোগ্য বস্তুতে মোহিত না হইয়া ইহাদ্বিগকে নিজীবনের মত ত্যাগ করিতে পারেন তাহারা অবশ্যই সাধকাগ্রগণ্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তদুপেক্ষাও উচ্চাবস্থার সাধক তাহারা—যাহারা এইসকল কাম্যবস্তু, এবং ব্রহ্মবস্তুর মধ্যে কোন পার্থক্য দেখেন না। ইন্দ্রিয়লালসা হেতুই কাম্য বস্তুকে সুখকর মনে হয় এবং হৃৎকেন্দ্রক বস্তু গ্রহণে অনিচ্ছা হয়। কিন্তু যাহারা মনঃ বুদ্ধি ইন্দ্রিয় সমূহের অতীত স্থানে উপনীত হইয়া নিঃস্বপ্নে নিঃস্বপ্ন হারাইয়া ফলিয়াছেন—যাহারা ভাল মন্দ উভয়ের মধ্যেই কোন পার্থক্য অনুভব করেন না—সেই ব্রহ্মবিদ্য যোগীদের প্রাণশক্তি (বদ্ধারা চালিত হইয়া মন বিষয়ানুভব করে) মাথার উপরে চড়িয়া বসে, আর নামে না, তাহারা তিনগুণের অর্থাৎ ইন্দ্ৰিয়-পিশলা-সুস্থতার অতীত অবস্থা লাভ করিয়াছেন কিনা, সুতরাং গুণ আর তাহাদ্বিগকে আকর্ষণ করিয়া বিষয়ে টানিয়া আনিতে পারে না। যখন ব্রহ্মরূপে প্রাণ ব্রহ্মনাড়ীতে চলে তখন গুণের পর অবস্থা, অর্থাৎ তখন মন অনন্ত হয়, একভাবে সর্বদা স্থির থাকে। এই অবস্থা যে পায় এবং তাহাতেই থাকে সেই ব্রহ্মপদ লাভ করে, ক্রিয়ার পর অবস্থা ইহাই। ইহাই গুরুভাব। কারণ “গুরু”

“গুরুঃ প্রথমো বর্ণো মায়াদ্বিগুণভাসকঃ ।

রূকাযো দ্বিতীয়ো ব্রহ্ম মায়াদ্রাস্তিবিমোচকঃ ॥”

গুরু—“গুরু” বর্ণ মায়াকে বলে, অর্থাৎ বাহ্য গুণবিশিষ্ট। মূলধারস্থিত শক্তি হৃদয়ে ত আনিয়া যখন স্থিতি-পদ লাভ করে অথচ মূলালস্তর মত হৃদয়েতে গমনাগমন করে, সেই স্থিতি-পদের নাম—হংস, এবং তাহা যখন প্রাণমধ্যে যায় ও বিন্দু দেখায়, তাহারই নাম—রূপ বা কূটস্থ। এই পর্য্যন্ত “গুরু”র “গুরু” কার। তাহার পর “রূপ” কার মায়াদ্রাস্তি বিমোচক। উহাই ক্রিয়ার পর অবস্থা—ব্রহ্মনিবন্ধন রূপ। তখন সব স্থির। এই পরম স্থির ভাবই বিশ্বাতীত বা গুণাতীত অবস্থা।

ক্রিয়ার পর অবস্থার পর অবস্থাতে আনিয়া এই সকল জীবমুক্ত পুরুষ সংসারের কিছু কিছু কার্যাদি করেন বটে, কিন্তু সংসারে অভিজ্ঞ হইবার মানুষ সেখানে না থাকা, প্রকৃতি তাহাকে কিছুতে লিপ্ত করিতে পারে না। তখন তিনি এঘোষের লোক নহেন। পরাবস্থার পরাবস্থাতেও গুণ তাহাকে জড়াইতে পারে না। ব্রহ্ম, তমঃ তো আসিতেই পারে না, কখন কখন স্থির স্থির করিয়া ক্ষীণ ধারায় সত্ত্বগুণ আসিয়া থাকে, কিন্তু তাহার স্বরূপ চ্যুতি ঘটাইতে পারে না ॥ ২২

অনুব্র। যঃ (যিনি) উদাসীনবৎ (উদাসীনের ভায়) অসীনঃ (স্থিত হওয়ায়) গুণৈঃ (গুণ সমূহের) কার্য্য সুখ-দুঃখাদির দ্বারা) ন বিচাল্যতে (বিচলিত হন না) গুণাঃ (গুণ সমূহ)

নন্তস্তে (স্বকার্য্য করিতেছে) ইত্যেবং (এইরূপে) যঃ অবতিষ্ঠতি (যিনি অবস্থান করেন), ন ইবতঃ (চঞ্চল হন না) ; [তিনিই গুণাতীত] ॥ ২৩

শ্রীমদ্র। তদেবং স্বসংবেদ্যঃ গুণাতীতস্ত লক্ষণম্ উক্ত্বা পদসংক্ষেপে তত্ত্ব লক্ষণং ব্রহ্মঃ কিমাচার ইতি দ্বিতীয় প্রশ্নস্ত উত্তরমাহ—উদাসীনবহিতি ত্রিভিঃ । উদাসীনবৎ স্যাক্রিয়তা অসীনঃ—স্থিতঃ সন্, গুণৈঃ—গুণকার্য্যৈঃ সুখদুঃখাদিভিঃ, ন যো বিচাল্যতে—ব্রহ্মপাৎ ন প্রচ্যাব্যতে । অপি তু গুণা এব স্বকার্য্যো বর্ত্তন্তে, এতৈ মন সত্ত্ব এব নাতীতি বিবেক জ্ঞানেন যঃ তুক্ষীম্ অবতিষ্ঠতি । পরমৈষপদমার্থম্ । নৈবতঃ ন চলতি ॥ ২৩

ব্রহ্মানুবাদঃ । [এইরূপে গুণাতীতের স্বসংবেদ্য (বিজ্ঞ বোধগম্য) লক্ষণ বলিয়া, পদ-সংবেদ্য (অপরের বোধগম্য) লক্ষণ—তাহার আচার কিরূপ—এই দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর তিনটি শ্লোক দ্বারা বলিতেছেন]—(১) উদাসীনবৎ—উদাসীনের ভায় সাক্ষীস্বরূপে অবস্থিত হইয়া—(২) গুণকার্য্য যে সুখদুঃখাদি তাহার দ্বারা যিনি বিচলিত হন না অর্থাৎ স্বরূপ হইতে চ্যুত হন না। (৩) সত্ত্বাদি গুণসকল স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত রহিয়াছে, ইহাদের সহিত আমার সংঘ মাত্র নাই—এইরূপ বিবেকজ্ঞান দ্বারা যিনি তুক্ষীভাবে অবস্থান করেন, চঞ্চল হন না। ‘অবতিষ্ঠতি’—এই ক্রিয়া পদে যে পরমৈষপদ রহিয়াছে, তাহা আর্ষ প্রয়োগ ॥ ২৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—গুণ সব যেমন তেমনই আছে—বায়ু স্থির যেমত নিকর্বাণ দ্বীপ।—নির্বাণ স্থানে দ্বীপ শিখা যেমন স্থির ও চঞ্চল থাকে, তরুণ যোগীর প্রাণবায়ু স্থির হইয়া যায়, এবং প্রাণবায়ুর স্থিরতার সহিত মনও অত্যন্ত স্থির হইয়া যায়, তখন সে মন আর বিষয়ে ভ্রমণ করে না, কিন্তু যেহ-প্রকৃতি যত দিন বর্ত্তমান থাকে ততদিন যোগীর প্রারব্ধ কর্মের ভোগ দেহাদিতে যেমন হইবার হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার মন সেই সব সুখ-দুঃখাদি ভোগে নিলিপ্ত থাকে অর্থাৎ সুখের বিষয় পাইয়া সুখী হওয়া বা দুঃখানুভব ব্যাপারে তিনি হুগ্নী হন না। তুর্ধ্যাবস্থাপ্রাপ্ত চিত্তের বিষয়-সংস্পর্শ হয় না। জাগ্রত, স্বপ্ন, অশ্রুতি ও তুর্ধ্যাবস্থা—তন্মধ্যে প্রথম তিনটি পদন্ত ভোপের, আনন্দের অবস্থা; চতুর্থ অবস্থান শিষ্যতাব, সেখানে কিছুই নাই, কোন ভোগ নাই। এই কূটস্থের পর যে পুরুষ (চতুর্থ অবস্থা—গুণাতীত অবস্থা) তিনিই ব্রহ্ম। কূটস্থই ক্ষেত্রজ পুরুষ, তিনিই সকল কার্য্যের কারকিতা, আর যিনি কাজ করেন, বিষয়ে লিপ্ত হন তিনিই ভূতাত্মা। এই ভূতাত্মাই শাস না জীব যিনি বিষয়ে লিপ্ত হন। কূটস্থই মহৎ, তিনি অণুর অণু, রূপার নত আভা। তাহার পর যে পুরুষ, তিনিই শিব। এই ঋনই ব্রহ্ম, ইহার দ্বাবাই ব্রহ্মতে যাওয়া যায়। সমুদ্র তখন এক হয়, সেই এককে দেখিলে সমুদ্রকে দেখা যায়। মনই এই সমুদ্রকে সৃষ্টি করে, সেই মন যাহার কূটস্থ থাকে সে সর্বজ্ঞ হয়। ক্রিয়ার পর অরূপতাই সাধক ব্রহ্মস্বরূপ হন, তখন চরাচররূপ যে রোধ না ভাব তাহার হনন হয়। মনই সকল ভাবের কর্ত্তা, মন যখন চর বা অচর কোন বস্তু মনন করে, তখন তাহা মস্তকে স্থিত হয়। সেই মস্তকেই আবার মন যখন ব্রহ্মলীন হয়, তখন চরাচর সমস্ত বস্তুই বিনাশ হয়, উহাই ক্রিয়ার পরাবস্থা বা ব্রহ্ম। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যখন আত্মা পরমাত্মাতে দ্রুত হইয়া লীন হন, তখন সকল বস্তুকেই দেখা-শুনা সংহার হয়, ও তদন্ত-চিত্ত হইয়া চরাচর বস্তুর নশ হয়। অন্তএব সেই

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্বকাক্ষনঃ ।

তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরন্তল্যানিন্দাতুসংস্তুতিঃ ॥ ২৪

শিবই রূপে সকলকে নাশ করেন । ইনিই ব্রহ্ম, সদা সর্বদা ইহাকেই ধ্যান করা উচিত, তাহা হইলেই ক্ষমাতা হইতে রহিত হইয়া পরমপদে লীন হওয়া যায়, সংসারে বাহ্যেপক্ষ আর মঙ্গলকর বিষয় হইতে পারে না । এইরূপেই সকল বস্তুর ত্যাগ আপনা-আপনি হইয়া থাকে, তখন কোন বস্তুতেই মন যায় না । সুতরাং অমুকুল বা প্রতিকূল বস্তুর প্রতি তাঁহার রাগ বা ঘেব থাকিতে পারে না । সর্ববিষয়েই তিনি উদাসীনবৎ থাকেন, অর্থাৎ বাহ্য কোন ব্যাপারই তাঁহাকে চঞ্চল করিতে পারে না । চিত্তকে বহির্গত করিবার মত শত শত ঘটনা ঘটয়া যায়, কিন্তু কোন ঘটনাই তাঁহার মনকে বাহিরে টানিয়া আনিতে পারে না । বিষয়ের প্রবাহ নদীপ্রোতের মত চলিতেছে, তিনি তাহাতে তলাইয়া যান না, প্রোতের উপরে যেন ভাসিতে থাকেন । প্রাণের স্থিতি উর্দ্ধদেশে অর্থাৎ মস্তকে হইলে, এই অবস্থা সাধকের স্বাভাবিক হয় । ইহাই প্রাণবায়ুর স্থিরতা । গুণসকল যে বাহ্যে কণ্ড করিতেছে, কিন্তু তিনি নির্ঝাঁপ দীপের মত স্থির—এইরূপ আত্মস্থ পুরুষই গুণাতীত । সুখ, দুঃখ বা মোহে তাঁহার হৃদয় একটুও বিচলিত হয় না ॥ ২৩

অন্বয় । [বঃ—যিনি] সমদুঃখসুখঃ (দুঃখে ও সুখে সমজ্ঞান বিশিষ্ট) স্বস্থঃ (স্বরূপে অবস্থিত) সমলোষ্ট্রাশ্বকাক্ষনঃ (লোষ্ট্র, পাশাণ ও সুবর্ণে সমজ্ঞান সম্পন্ন) তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ঃ (প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয়ে তুল্যবুদ্ধিসম্পন্ন) ধীরঃ (ধীমান্) তুল্যানিন্দাতুসংস্তুতিঃ (নিন্দা প্রশংসাতে সমভাব)—॥ ২৪

শ্রীধর । অপি চ—নমোতি । মনে সুখদুঃখে যন্ত । যতঃ স্বস্থঃ—স্বরূপে অবস্থিতঃ অতএব সমানি লোষ্ট্রাশ্বকাক্ষনানি যন্ত । তুল্যে প্রিয়াপ্রিয়ে সুখদুঃখেতুভূতে যন্ত । ধীরঃ—ধীমান্ । তুল্যা নিন্দা চ আশ্বস্তিচ্চ যন্ত ॥ ২৪

বঙ্গানুবাদ । [আরও]—(৪) যে ব্যক্তির সুখদুঃখে সমান জ্ঞান (৫) যিনি স্বস্থ অর্থাৎ ঐশ্বর্য স্বরূপে অবস্থিত, অতএব (৬) লোষ্ট্র, পাশাণ ও সুবর্ণে সমজ্ঞানসম্পন্ন, এবং (৭) সুখ দুঃখের হেতুভূত যে প্রিয়াপ্রিয় সে সমস্ত বাহ্য তুল্যবুদ্ধি, আর (৮) যে ব্যক্তি ধীমান্ এবং (৯) নিন্দাস্তুতিতে বাহ্য তুল্য জ্ঞান [তিনিই গুণাতীত] ॥ ২৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—স্বীয় অবস্থায় থাকিয়া দুঃখ-সুখ দুইই সমান, সে সময়ে সোনা আর ঢেলা, নিন্দা স্তুতি দুইই সমান, যেমত মাতালের প্রিয় অপ্রিয় দুয়েতে সমান; বুদ্ধির পর পরাবুদ্ধিতে দৃষ্টি।—ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে স্থিতি তাহাই পরাবুদ্ধি অর্থাৎ আপনাতে আপনি থাকা । সেই পরমানন্দ অবস্থাতে বাহ্যের নিত্যময় তাহাদের নিকট আর সুখ-দুঃখ কি ? সুখ-দুঃখ অন্তঃকরণের ধর্ম, যখন মনই নাই তখন আর সুখ-দুঃখ আসিবে কিরূপে ? বিষয়াসক্তচিত্ত সুখের জিনিষ পাইলে সুখী হয়, দুঃখের ব্যাপার ঘটলে কাঁদিয়া আকুল হয়, কিন্তু যিনি আত্মস্থ থাকিয়া এই সব জগৎ ও জগদব্যাপারকে স্বপ্নতলা দেখ করেন, সেই সদা দ্ব্যগ্রত পুরুষকে আর সুখ-দুঃখ দিবে

মানাপমানয়োস্তল্যস্তল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ ।

সর্বরাস্তপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ২৫

(গুণাতীত হইবার উপায়)

মাঞ্চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তিব্যোগেন সেবতে ।

স গুণান্ সমতীতৈত্যান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ২৬

কে ? পরমানন্দরূপে ময় হইয়া বাহ্যের নিজ সাংসারিক হিতাহিতের প্রতি দৃষ্টি নাই, তাঁহার নিকট সুবর্ণ ও মাটির ঢেলার সমানই মূল্য । গুণেরই স্তুতি-নিন্দা, যিনি গুণকে অতিক্রম করিয়া আত্মস্থ হইয়াছেন তাঁহার নিকট স্তুতি-নিন্দার আর পার্থক্য কোথায় ? মাতালের যেনন নিজের অবস্থার জ্ঞান নাই, সেইরূপ বাহ্যের লক্ষ্য বুদ্ধিকে ছাড়াইয়া পরাবুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তিনিই গুণাতীত । মতপ যেনন সুখ-দুঃখের প্রতি উদাসীন, মূল্য পুরুষের পরাবুদ্ধিতে স্থিতি হেতু তাঁহার নিকট প্রিয়-অপ্রিয় বলিয়া কিছুই থাকে না ॥ ২৪

অন্বয় । মানাপমানয়োঃ (মান ও অপমানে) তুল্যোঃ (সমবোধ) মিত্রারিপক্ষয়োঃ (মিত্র ও শত্রুপক্ষে) তুল্যোঃ (সমবুদ্ধিসম্পন্ন), সর্বরাস্তপরিত্যাগী (দেহধারণার্থ কণ্ড ব্যতীত অন্য সমস্ত উত্তমত্যাগী) সঃ (তিনি) গুণাতীতঃ (গুণাতীত বলিয়া) উচ্যতে (উক্ত হন) ॥ ২৫

শ্রীধর । অপি চ—মানেনি । মানে অপমানে চ তুল্যোঃ । মিত্রপক্ষে অরিপক্ষে চ তুল্যোঃ । সর্বান্ দৃষ্টাদৃষ্টার্থান্ আবন্তান্—উত্তমান্ পরিত্যক্ত্য শীলং যন্ত সঃ । এবভূতচারযুক্তো গুণাতীত উচ্যতে ॥ ২৫

বঙ্গানুবাদ । [আরও বলিতেছেন]—(১০) যে ব্যক্তি মানাপমানে তুল্য, আর (১১) মিত্রপক্ষে, শত্রুপক্ষে যিনি তুল্য এবং (১২) যিনি দৃষ্টাদৃষ্ট বিষয়ের উত্তমে ত্যাগশীল—এবভূত আচারযুক্ত ব্যক্তিকেই লোকে ত্রিগুণাতীত বলে ॥ ২৫

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—মান-অপমান শত্রুমিত্র বুদ্ধি-ক্ষয় দুয়েতেই তুল্য মাতালের মতন । সুর হবার পূর্বেই ত্যাগ হয়ে বসে রয়েছে সুরই কণ্ডে চায় না অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন কণ্ডই করিতে চায় না, ইহারই নাম গুণাতীত ।—মাতালের পক্ষে যেনন তিরস্কার-পূরস্কার দুই সমান, গুণাতীতের অবস্থাও তদ্রূপ । তাঁহার কোন কাঞ্চ সঞ্চল করিয়া শুরু করিতে হয় না । কেহ কিছু করিতে বলিল করিলেন, আবার কেহ বার বার নিষেধ করিতেছে তাহাও তাঁর কাণে যায় না । আমিষ খাইলেন কি নিরামিষ খাইলেন তাঁহার কোন ধারণাই নেই, খাইতে দিলে খাইলেন এই পর্যন্ত । বাহ্য মনে আসিল করিলেন, করিয়া তজ্জন্ত কোন আনন্দ বা তাপ নাই । শত্রুপক্ষ অপমান করিল, নিন্দা করিল বা মিত্রপক্ষ প্রশংসা করিল তাঁহার কিছুই গ্রাহ্য নাই ॥ ২৫

অন্বয় । য চ (আর যিনি) মান্ (আমাকে) অব্যভিচারেণ ভক্তিব্যোগেন (ঐকান্তিক ভক্তিব্যোগ সহকারে) সেবতে (উপাসনা করেন), সঃ (তিনি) এতান্ গুণান্ (এই গুণ সকলকে) সমতীত্য় সম্যকরূপে অতিক্রম করিয়া) ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে (ব্রহ্মত্ব লাভের যোগ্য হ'ন) ॥ ২৬

শ্রীধর। কথঞ্চ এতান্ জীন্ গুণান্ অতিবর্তত ইতি ? অস্ত প্রশস্ত উত্তরমাহ—মাক্ষেতি ।
“চ” শব্দঃ অবধারণার্থঃ। মামেব পরমেশ্বরম্ অব্যভিচারেণ—একাত্মেন ভক্তিব্যগেন যঃ সেবতে
স এতান্ গুণান্ সমতীত্য—সম্যগতিক্রম্য, ব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্মভাবায় মোক্ষায়, কল্পতে—সমর্পে
ভবতি ॥ ২৬

বঙ্গানুবাদ। [কিরূপে এই গুণত্রয় অতিক্রম করা যায় ? এই প্রশ্নের উত্তরে
বলিতেছেন]—শ্লোকস্থ ‘চ’ শব্দের অর্থ অবধারণ। আমি যে পরমেশ্বর আমাকেই অব্যভিচার
অর্থাৎ একাত্ম ভক্তিব্যোগসহ যিনি সেবা করেন, তিনিই এই ত্রিগুণ সম্যগ্‌রূপে অতিক্রম
করিয়া ব্রহ্মভাব অর্থাৎ মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হন ॥ ২৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—“মাক্ষ” আমাকে অর্থাৎ ক্রিয়া যে করে—অম্ম দিকে
(মন) আসক্তিপূর্ব্বক দৃষ্টি না করিয়া অর্থাৎ সত্য হইয়া—কুটম্ব প্রতি এক দৃষ্টে
থাকিয়া আত্মায় থাকা, অপর বস্তুতে আসক্তি পূর্ব্বক দৃষ্টি না করে থাকা—ধারণা,
ধ্যান, সমাধি পূর্ব্বক গুরু বাক্যেতে বিশ্বাস করিয়া যে ক্রিয়া করে—যাহা গুরু-
বক্তৃ গম্য সে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া ত্রিগুণ রহিত হইয়া অষ্ট প্রহর সমান
রূপে স্থির থাকিয়া আমার ভাব অর্থাৎ এক ব্রহ্ম হইয়া গিয়াছি বা যাইব—
এরূপ কল্পনা হয়—ওঁ।—ত্রিগুণ কিরূপে অতিক্রম করা যায় এইবার সেই উপদেশ ভগবান্
দিতেছেন। সেই উপায় হইতেছে—অব্যভিচারিণী ভক্তিব্যোগের দ্বারা ভগবানের সেবা।
অব্যভিচারিণী ভক্তি কি ? আচার্য্য শব্দর বলিয়াছেন—“ন কদাচিৎ যো ব্যভিচারতি তেন
ভক্তিব্যোগেন কল্পনঃ”—যে ভক্তিব্যোগ কোন সময়েই অন্তর্য্যাব প্রাপ্ত হয় না, সেই ভক্তি-
যোগই অব্যভিচার, এইরূপ অব্যভিচার ভক্তিব্যোগের দ্বারা যে উদ্ভব করে। অব্যভিচারিণী
ভক্তিদ্বারা ভগবানের সেবার অর্থ তাহা হইলে এই হইতেছে—সাব্যবহৃতঃ আত্মার
অন্তঃকরণে বহুবিধ বৃত্তির উদয় হইয়া থাকে, কিন্তু যে অস্তঃকরণে অত্র বৃত্তির উদয় না হইয়া
সর্ব্বভূতের স্বয়ং যে আত্মা, নারায়ণ বা ঈশ্বর রহিয়াছেন—যিনি আমার ‘আমি’—সেই
“আমি” কে ছাড়া অস্ত্রভাব বা অস্ত্র প্রত্যয় যার মনে আসে না তাঁহারই অব্যভিচারিণী
ভক্তির দ্বারা ভগবানের ভজন হয়।

সর্ব্বরূপে তাঁহার রূপ, জগতে চেতন অচেতন সমস্ত পদার্থই সেই পরমেশ্বর সত্যর পরিপূর্ণ,
স্বভাবীত অস্ত কিছু নাই—এইভাবে অল্প প্রাণিত হইয়া ভজন করাই প্রকৃত ভজন, কিন্তু তাহা
মুখের কথা নহে, এই স্রাবটি চিন্তা করিলেই যে সেই ভাব মনে জন্মিয়া যাইবে বা স্থায়ী হইবে
তাহা নহে। অনন্তভাবে তখনই হইতে পারে যখন মন শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধের দ্বারা বিচলিত
হইবে না। এরূপ অবস্থাটি পাইতে হইলে মনকে নিশ্চল করিতে হইবে। মন যদি ময়লা ঘাঁটে
বা আসক্তি পূর্ব্বক বিষয়ের দিকে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তবে তাহার সত্যও থাকিল কৈ ?
অব্যভিচারী সে হইবে কিরূপে ? তখনই সে অব্যভিচারী হইতে পারে যখন অত্র কোন বস্তুর
দিকে আসক্তিপূর্ব্বক সে দৃষ্টিপাত করিবে না। দৃষ্টিকে আত্মাভিমুখ করাইতে হইলে ক্রিয়া
করিতে হইবে, ক্রিয়া দ্বারা বিনাবরোধে প্রাণ স্থির হইলে তৎসহ মনও স্পন্দনশূন্য হইয়া যাইবে।
স্পন্দনশূন্য মনের কোন অবলম্বন থাকে না, এই নিবাবলম্ব চিন্তেই অনন্তাশ্রয় বা ভক্তি সূচিয়া

উঠে। ইহা ইড়া-পিঙ্গলায় খাস চলিতে হইবে না। তবে ক্রিয়া করিতে করিতে প্রাণের
স্থিরতা সহ যখন খাস সুষুম্নায় প্রবাহিত হইবে, এবং সেই প্রবাহ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলেই
প্রাণ মস্তকে চড়িয়া বসিবে, তখন অষ্টপ্রহর স্থির ভাব—এইরূপে ত্রিগুণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত
হইয়া সাধক পবন অভয় পদ লাভ করিয়া থাকেন। কেবল জ্ঞানের কথা আওড়াইয়া বা
উচ্চকণ্ঠে বহি নাম করিয়া অশ্রু ফেলিলেই হইবে না। বিষয়ের প্রতি আসক্তি থাকিতে
প্রকৃত ভক্তি আসিবে না। কামিনী-কাঞ্চনে অত্যাশক্ত পুরুষের ভক্তি লাভ হয় না।
তবে জ্ঞান-ভক্তির কথা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক বাঁহারা আলোচনা করেন তাঁহাদের যথেষ্ট উপকার
হয়। কবীর বলিয়াছেন—

“পাবকরূপী রাম হায সবঘট রহা সময়।

চিৎ চকমক্ জিন্ নহি হট্টো ধূয়া হো হো জায় ॥”

কবীর বলিতেছেন, রাম যিনি তিনি অগ্নিরূপী সকল ঘটতেই প্রবেশ করিয়া আছেন,
যিনি চিত্তরূপী চকমকীকে সরাইতে না পারেন (অর্থাৎ মনের কল্পনা) তাহার অগ্নি দর্শনের
সৌভাগ্য হয় না, কেবল ধূমাত্র দেখা হইয়া থাকে।

“চিহ্নঃ কারণমর্থানাং তস্মিন্ভক্তি জগৎত্রয়ম্।

তস্মিন্ ক্ষীণে জগৎক্ষীণে তচ্চিকিৎস্তং প্রযত্নতঃ ॥”

বিষয়ের কারণ চিত্ত, তাহাতেই ত্রিজগৎ বর্তমান রহিয়াছে, সেই চিত্ত ক্ষীণ হইলে তবে
জগৎ ক্ষীণ হবে, অতএব সেই চিত্তক্ষয়ের উপায় অল্পসঙ্কানই বিধেয়।

সে জিনিষ তো সহজ নহে, সে যে নামরূপের অতীত, নামরূপ না মিটিলে তাহাকে কে
পাইবে ? কবীর বলিয়াছেন—

নিগদিন হমে বিরহিনী অন্তরগতকী লায়।

দাস কবীরী কা বুঝে সংগুরু গয়ে লগায় ॥

কো জন বিরহী নাম কে সহ্য মগন মন মাহ।

যা হরপন কী সুন্দরী কহু ন পকড়ী বাহ ॥

কবীরদাস বিরহিণী অর্থাৎ ভগবান্ ব্যতীত আর কিছুই বাঁহার মনে উদয় হয় না। দিন-
রাত বিরহ জ্বালায় জ্বলিতেছেন, বাঁহার জ্ঞান জ্বলিতেছেন তিনি অন্তরে অন্তর হইয়া গোপনে
বসিয়া আছেন। কবীরের এ জ্বালায় কথা আর কে বুঝিবে ? কিন্তু সদ্‌গুরুই এই আগুন
ধরাইয়া গিয়াছেন। কবীর যিনি নামের (পরমাশ্রয়) বিরহী অর্থাৎ ভগবান্ ব্যতীত আর
কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না, পরাবস্থারূপী পরমাশ্রয়—বাহাকে পাইলে প্রাণ শীতল হয়,
তাঁহাকে পাইবার জন্য মন সেই সাধন লইয়াই মগ্ন হইয়া আছেন—কিন্তু মনে করিয়াছিলেন
তাঁহাকে সাধারণ দৃষ্টের মত দেখা যাইবে—যেমন জীপুজ্ঞানাদি আমরা পাই—কিন্তু হায় কুটস্থে
যাহা দেখা যায় ঐ বুঝি সেই—এই মনে করিয়া যে তাঁহাকে দেখিতে বা ধরিতে যাইবে,
তখনই তাহা আর দৃষ্টীগোচর হইবে না। যেমন হর্পণে সুন্দরী দেখা যায়, অমূল্য করা যায়,
কিন্তু ধরা যায় না। ধরা গেলে তো চিন্নয় ছড়ে পরিণত হইতেন—তাই তাঁহাকে ধরিয়াও
ধরা যায় না, পাইয়াও পাওয়া যায় না। তবে এই বিরহের অবস্থা বাঁহার লাভ হয়, তাঁহার

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতশ্রাব্যসু চ ।

শাস্ততস্ত চ ধর্মস্য স্মৃথশ্চৈকান্তিকস্য চ ॥ ২৭

ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতাস্থপনিষৎসু ব্রহ্মবিজ্ঞানং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণাঙ্কনমংবাধে

গুণত্রয়বিভাগযোগো নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥

মনে আর কোন বিষয়াভিলাষ থাকে না, স্মৃতবাং চিত্তস্পন্দনও থাকে না। তখন যা কিছু প্রত্যক্ষ হয় সবই যেন সেই বিজ্ঞময় বলিয়া মনে হয়। এই অগৎ প্রপঞ্চ মনেরই কল্পনা; সেই মন থাকিতে প্রপঞ্চ মিটিবে না, ব্রহ্ম দর্শনও হইবে না। এইজন্ত প্রকৃত ভগবদ্ভজন মনো-নিগ্রহ। সেই মন নিগ্রহ করিবার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় ক্রিয়া ॥ ২৬

অর্থঃ। হি (যেহেতু) অহম্ (আমি) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মের) প্রতিষ্ঠা (আশ্রয়, পর্যাণ্ডি অথবা প্রতিমা বা ঘনীভূত প্রকাশ), অব্যয়স্ত (অব্যয় অর্থাৎ পরিণামশূন্য) অমৃতস্ত (মোক্শের) [প্রতিষ্ঠা]; শাস্ততস্ত (অপক্ষয় রহিত বা চিরন্তন ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা); ধর্মস্য চ (ধর্মেরও প্রতিষ্ঠা); ঐকান্তিকস্য স্মৃথস্ত চ (অথগু আনন্দস্বরূপেরও প্রতিষ্ঠা) ॥ ২৭

শ্রীধর। তত্র হেতুমাৎ—ব্রহ্মণোহীতি। হি—যস্মাদ্ ব্রহ্মণোহহং প্রতিষ্ঠা—প্রতিমা, ঘনীভূতং ব্রহ্মবাহং। যথা ঘনীভূতঃ প্রকাশ এব স্বর্যমণ্ডলং তদ্বদিত্যর্থঃ। তথা অব্যয়স্ত—নিত্যস্ত, অমৃতস্ত—মোক্শস্ত নিত্যমুক্তত্বাৎ। তথা তৎসাধনস্ত শাস্ততস্ত ধর্মস্য চ গুণ-সহায়কত্বাৎ তথা ঐকান্তিকস্য—অধিত্তস্য স্বর্যস্য চ প্রতিষ্ঠা অহং পরমানন্দ-স্বরূপত্বাৎ। অতো মৎসেবিনঃ মন্তাবস্য অবশস্তাবিত্তাদ্ যুক্তমেবোক্তং ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ইতি ॥ ২৭

কৃষ্ণাধীন-গুণানন্দ-প্রসঞ্জিত-ভবাসুখম্।

স্বং তরতি তত্ত্বত ইত্যভ্যাসি চতুর্দশে ॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতায়াম্ ভগবদগীতাস্থপনিষৎসু ব্রহ্মবিজ্ঞানং

গুণত্রয়বিভাগযোগো নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মানুবাদ। [এ বিষয়ে অর্থাৎ উক্ত ব্যক্তির ব্রহ্মপ্রাপ্তির বিষয়ে হেতু বলিতেছেন]—যেহেতু আমি ব্রহ্মের প্রতিমা অর্থাৎ আমি ঘনীভূত ব্রহ্ম। যেমন স্বর্যমণ্ডল ঘনীভূত প্রকাশ তদ্বৎ আমিও ব্রহ্মের ঘনীভূত প্রকাশ। আমি নিত্যমুক্ত বলিয়া নিত্য অমৃত অর্থাৎ মোক্ষের প্রতিষ্ঠা। গুণসত্ত্ব বলিয়া আমি মোক্ষের সাধনারূপে শাস্ত ধর্মের প্রতিষ্ঠা। এবং পরমানন্দ স্বরূপ বলিয়া ঐকান্তিক অর্থাৎ অধিত্ত স্মৃথেরও আমি প্রতিষ্ঠা। অতএব মৎসেবকপণের মন্তাব প্রাপ্তির অবশস্তাবিত্ত প্রযুক্ত তাঁহারা যে ব্রহ্মভাব লাভে সমর্থ হন ইহা যুক্তিযুক্ত বলাই হইয়াছে ॥ ২৭

শ্রীকৃষ্ণাধীন যে গুণ সমূহ (স্বরূপসমূহ) তাহাদের প্রতি আসক্তি দ্বারা প্রসঞ্জিত (সত্ত্বত্ব) এই যে ভবনাগর তাহা তাঁহার ভক্ত স্মৃথে উত্তীর্ণ হয়—ইহাই চতুর্দশ অধ্যায়ে ভগবাস্ বলিলেন।

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সেই ব্রহ্মেতে যখন ক্রিয়া করিতে করিতে যখন প্রকৃষ্টরূপে স্থিতি হয় তখন অমর পদ পাইয়া অমৃত ক্ষরণ হয় অর্থাৎ এক ব্রহ্ম হইয়া যায়—তখন অব্যয় অবিনাশী স্তম্ভরূপেই—কারণ সব ব্রহ্ম হইলে

নাশ হইয়া যাহা হইবে তাহাও ব্রহ্ম, এক বস্তু হইলে বস্তুত্তর না থাকিলে নাশ কি প্রকারে হইবে? নিত্য সেই অবস্থায় থাকিলে অর্থাৎ অষ্টপ্রহর সেই অবস্থায় থাকিলে, সেও ব্রহ্ম হইয়া গেল—ইহারই নাম ধর্ম—অধর্মের নাম ধর্ম অর্থাৎ অন্য কোন বস্তুতে আসক্তিপূর্বক দৃষ্টি না করিয়া আত্মাতে থাকার নাম ধর্ম—কলাকাক্সারহিত ক্রিয়া করার নাম ধর্ম যাহা গুরুবক্তৃগম্য—যেখানে থাকিলে স্মৃথের এক অন্ত অর্থাৎ বরাবর একই অবস্থায় পরমানন্দ স্মৃথে অবস্থিতি করে, যাহা ক্রিয়ার পর অবস্থাতে যাহারা ক্রিয়া করেন সকলেরই হইয়া থাকে অমরস্বয়—আর এই স্মৃথের নিমিত্তই সকলেই পরের গোলান্নী করিতেছে আর মহাশয় মহাশয় বলিয়া খুন!! কিন্তু “বিরলোহি মহাশয়ঃ” যাহা অষ্টাবক্র বলিয়াছেন, অর্থাৎ যিনি সদা সর্বদা বিশেষরূপে দিব্যদৃষ্টি দ্বারা আত্মপূর্বক কুটুম্বিতে আটকিয়া রহিয়াছেন, তৎপদ ব্যতীত অন্য কিছু দেখেন না তিনিই মহৎ ও মহাশয়—সেই বড় মানুষ যাহা কিছু দিবে তাহা পাইয়া কিছুক্ষণের নিমিত্ত স্মৃথ; কিন্তু যে স্মৃথের অন্ত নাই, এমত স্মৃথ লাভ করিতে কাহারও ইচ্ছা হয় না—এমত স্মৃথে সর্বসাধারণের ইচ্ছা করা চাই!!!—পূর্ব প্রোক্ত বলা হইয়াছে অচলা ভক্তির সহিত যে আমার সেবা করে সে সমস্ত গুণ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্ম বা ব্রহ্মভাব লাভ করেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে ব্রহ্মভাব লাভ করিতে হইলে গুণ অতিক্রম করিতে হইবে। অর্থাৎ ইড়া-পিঙ্গলা-স্বস্থার অতীত অবস্থা লাভ করিতে হইবে। সেই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ ঘনীভূত স্বরূপ হইতেছি “আমি”। এই “আমি”টি কে? ইমিই কুটুম্ব চৈতন্ত, যিনি গীতা বলিতেছেন। ব্রহ্মই শেণ গন্তব্য স্থান, কিন্তু তাহা সর্বপ্রকার উপাধি বিবজ্জিত, সম্যামাত্র নিগুণ স্বরূপ—যাহা ক্রিয়ার পর অবস্থার দ্বারা লক্ষিত হইয়াছে। এই নিগুণ স্বরূপ অদৃশ্য, অস্পর্শ ও অণুসহায়, তাহাতে আনন্দও নাই নিরানন্দও নাই। জল যেমন বাষ্পের ঘনীভূত মূর্তি, তদ্বৎ যেমন জলের ঘনীভূত মূর্তি—তদ্রূপ নিরবয়ব নিলিপ্ত বিশ্বব্যাপী আত্মসত্তাব ঘনীভূত প্রকাশ এই কুটুম্ব চৈতন্ত—তিনি শ্রীকৃষ্ণ, অজ্ঞানের জ্ঞানদাতা, তিনি সকল উপাসক মাত্রেই জ্ঞানদাতা। তাহা হইলে রূপ-বিবজ্জিত ব্রহ্মের যদি কিছু প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় থাকে, যাহাকে অলম্বন করিয়া ব্রহ্ম নিজে প্রকাশিত করেন—তিনিই কুটুম্ব চৈতন্ত শ্রীকৃষ্ণ। এই কুটুম্ব চৈতন্ত ও ব্রহ্ম একই। ব্রহ্ম মনঃবুদ্ধির অতীত, ইনি মনঃবুদ্ধির গ্রাহ্য এই মাত্র। কিন্তু তাঁহাকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক করা যায় না। যেমন সর্বোবরে কমল কুটিয়া উঠে, তদ্রূপ ব্রহ্মসর্বোবরে এই কুটুম্ব চৈতন্তের বিনল-জ্যোতিঃ স্মৃথিত হইয়া থাকে। উহাই অরূপের রূপ। ভক্ত সাধক এইরূপ দেখিয়া কৃতার্থ হন।

“একত্বমাশ্রয় পুরুষঃ পুরাণঃ সত্যঃ স্বয়ং জ্যোতিরনন্ত আত্মা।”

তুমি সর্বত্র একরূপ, সকল প্রাণীর তুমিই আত্মা, সর্ব-শরীর-রূপ-পূরে তুমিই অবস্থিত, তুমি নিত্য বিদ্যমান, সত্যস্বরূপ ও স্বয়ং প্রকাশ, তুমি অন্তরীক অথচ সকলের আদি। এই কুটুম্ব চৈতন্তের দ্বারা উপাসক, তাঁহারা ক্রিয়ার পর অবস্থায় সর্বব্যাপী ব্রহ্ম স্বরূপ

প্রাণিকাদ্বারস্বায়ে উৎপাদন ও সংরক্ষণ এই দুইটি ক্রিয়াই জীবনতত্ত্বে প্রদান বিষয়
এই দুইটি ক্রিয়া পরস্পর বিপরীত হইয়াও একটি অঙ্কটির সহিত মিলিত ভাবে অবস্থিত
কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। উভা সর্বদা একসঙ্গে বর্তমান। হিন্দুদের
লিঙ্গপূজার মধ্যে এই মিলিত ভাবটী বড় সুস্পষ্টভাবে বহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়

যোনির সহিত লিঙ্গের নিত্য সম্বন্ধরূপ মূর্তি হইল শিবলিঙ্গ। এই বিষয়টি বুঝিতে হইলে বাহ্য প্রথমে বুঝা আবশ্যক সেই প্রসঙ্গই এখানে উত্থাপন করিতেছি। সংস্রব ক্রিয়ার সর্বপ্রধান ব্যাপার হইতেছে উৎসর্গ ক্রিয়া, অর্থাৎ বা বায়ুর অপগম। এতদ্বারাই প্রত্যেক জীব-কোষাণুর মূল বাহিরে প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, ক্ষণকালের দ্বারা এ ক্রিয়া বন্ধ হইলে জীবের জীবন থাকে না। উপায় বিশেষ দ্বারা এই স্বাস্থ্যের নির্গমন রোধ করা যায় তখন স্বাস্থ্য গ্রহণেরও প্রয়োজন হয় না। সমাধিমগ্ন যোগীর এই অবস্থা এত স্বাভাবিক হয় যে সাধারণ জীবের মত স্বাস্থ্য গ্রহণ ও ত্যাগই তাঁহার পক্ষে অস্বাভাবিক মনে হইয়া থাকে। স্বাস্থ্যের বহিঃক্রিয়া যোগীর মিক্র হইলেও তাঁহার এই স্বপন ক্রিয়া ভিতরে ভিতরে চলিতে থাকে, তখন তাহা সূক্ষ্ম নান্দীর মধ্য দিয়া হয় বলিয়া বাহির হইতে তাহার ক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় না। কারণ একবার বন্ধ হইয়া গেলে শরীর থাকিতে পারে না। আমাদের শারীরিক সমস্ত ব্যাপারই এই স্বপন ক্রিয়ার অধীন। পত্র, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ এমন কি বৃক্ষলতাদির মধ্যেও এই স্বপন ক্রিয়া অবিরাম গতিতে চলিতেছে। সুস্থিতগত স্বপন ক্রিয়ার বাহ্য চিহ্ন থাকে না, কিন্তু তাহা যে আছে তাহার প্রমাণ স্বপন ক্রিয়া না থাকিলে বীজের মধ্যে অঙ্কুরোৎপত্তি হইতে পারিত না। ভজিত বীজে অঙ্কুরোদগম হয় না, কারণ তন্মধ্যে প্রাণ-প্রবাহিকার আধারভূতা নান্দীটি অগ্নিতে পুড়িয়া নষ্ট হইয়া যায়। এই প্রবাহিকা যতদিন থাকে ততদিন জীব যতবৎ হইলেও তাহার মধ্যে জীবনী শক্তি ফিরিয়া আসিতে পারে। এই প্রবাহিকা নষ্ট হইয়া গেলে জীবনের আর কোন আশা থাকে না। সমাধিমগ্ন যোগীর বাহ্য স্বাস্থ্য-ক্রিয়া থাকে না, এমন কি চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, স্বকের মধ্যেও প্রাণের স্পন্দন পাওয়া যায় না; কিন্তু তবুও তাঁহার মধ্যে প্রাণ আছে নিশ্চয়, কারণ ব্যুৎখিত যোগীর সাধারণ জীবের মতই ইন্দ্রিয়ের কার্য্য হইতে দেখা যায়। এই প্রাণশারা যখন ইড়া-গিহ্মলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয় তখনই স্বাস্থ্যের আগম ও নিগমকে আমরা লক্ষ্য করিতে পারি। জীবের এই অবস্থাকেই সাধারণ ভাষায় জীবিতাবস্থা বলে। একমাত্র প্রাণকেই বিবিধ কার্য্যসমূহের ও তাহার বিভিন্ন স্থানে স্রুতির অঙ্গস্বরূপ প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান—নাগ, কুর্খ, ক্রকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় প্রভৃতি উপাধি দেওয়া হইয়া থাকে। ঐরূপে প্রাণ দেহের সর্বত্র বিচরণ করিয়া দেহেন্দ্রিয়-মনোবুদ্ধি প্রভৃতিকে নিজ নিজ কার্য্যে সংস্থাপিত করে। সৃষ্টি, পোষণ ও ধ্বংস কার্য্য এই প্রাণেরই শক্তি বিশেষ। ঐ সকল কার্য্যশক্তিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র নামে অভিহিত হয়। সৃষ্টির স্থান হইল মূলধার হইতে নান্দী, নান্দী ও বক্ষের মধ্যে পোষণ কার্য্য সম্পাদিত হয়, কণ্ঠ হইতে আঞ্জাচক্র হইল লয়স্থান এবং তদুর্দ্ধ সহস্রারই অমৃতময় স্থান। ঐ স্থানে স্থিতি হইলে জীব অমর অমর হইয়া যায়। প্রাণাদিরা সাধারণতঃ বিক্ষিপ্ত-স্বভাব, কিন্তু প্রাণের যেটি অপরিবর্তনীয় স্থির ভাব তাহাই আত্মা। প্রাণের এই স্থির ভাব না থাকিলে তাহার চাকল্যও থাকিতে পারিত না। এই স্থির ও চকল ভাব এক সঙ্গেই গাঁথা রহিয়াছে—যোনি ও লিঙ্গ বা পুরুষ ও প্রকৃতির সংযুক্তাবস্থার দ্বারা। তাহাতেই জগৎ ও ব্রহ্ম যেন এক স্তরে গ্রথিত হইয়া আছে।

সংস্রব ১০ স্থির প্রাণ এক সঙ্গে গ্রথিত, সেই চকলতা হইতে স্থির ভাবকে বাহির

করিয়া লইতে হইবে। যেমন দুগ্ধের দলভাগ পৃথক করিলেই তন্মধ্যস্থ ঘৃতকে দেখিতে পাওয়া যায়, তরুণ অনন্ত চাকল্যের মধ্য হইতেই অনন্ত স্থিরতাকে বাহির করিয়া লইতে হইবে। মূক-তৃণ হইতে ইখীকা (মধ্যস্থ ঘৃত) গ্রহণের দ্বারা ধৈর্য্যসহকারে স্থির প্রাণ অন্তরাত্মাকে প্রাণায়ামাদি যোগকৌশলের দ্বারা এই শরীরেন্দ্রিয় হইতে পৃথক করিয়া ফেলিতে হইবে। স্ত্রীত্যাগ (জীব বা প্রাণ) পরমাত্মার সহিত নিত্য যোগযুক্ত হইলেও জীবের অনূষ্ট বশতঃ নিজে কেন্দ্র হইতে পরিধি পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া আবার কেন্দ্রস্থে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে। জীব বহির্মুখ হইয়া কেন্দ্র হইতে পরিধির মধ্যে পুনঃ পুনঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; জন্মমৃত্যুর চাকল্য হইতে সুখ-দুঃখাদির চাকল্য বা বিকার এ সমস্তই স্বকেন্দ্রের বহির্ভাগে বিচরণ হেতু হইয়া থাকে। আবার নিজ কেন্দ্রে ফিরিয়া আসিলে এ সমস্ত চাকল্যের লেশমাত্র থাকে না। সাধন প্রভাবে প্রাণাদি বায়ু নিজ কেন্দ্রে স্ত্রীত্যাগের মধ্যে ফিরিয়া আসে, এবং স্ত্রীত্যাগ পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হইলেই যে অবস্থা প্রাপ্তি হয় যোগীরা তাহাকেই অবস্থাভেদে সবিবর্ত ও নির্বিকল্প সমাধি নাম দিয়া থাকেন। এই প্রাণকে রুদ্র বলা হয়। যেমন রুদ্র সংখ্যায় একাদশ, তেমনিই প্রাণ (প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান—নাগ, কুর্খ, ক্রকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়) স্ত্রীত্যাগকে লইয়া একাদশ। প্রাণকে যে রুদ্র বলে তাহার প্রমাণ—“যে রুদ্রান্তে ধ্বংস প্রাণাঃ।” রুদ্রের অর্থ যিনি বোদন করান। এই প্রাণরূপী রুদ্রই বিবিধ নান্দীর মধ্যে প্রবাহিত হইয়া দেহীকে অষ্ট পাশে যেন আবদ্ধ করিয়া রাখে। দর্শন-প্রবণাদি ক্রিয়া সমস্তই প্রাণবায়ুর অধীন, এবং এই দর্শন-প্রবণাদির দ্বারাই জীব মোহাবিষ্ট হইয়া বিধয়ে আসক্ত হইয়া বদ্ধ হয়, এবং বহুদিন দুঃখ ভোগ করিয়া বোদন করিতে থাকে। তাই স্রুতিতে ঋষিদের প্রার্থনা হইতেছে—“রুদ্র যন্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং”—হে রুদ্র, তোমার প্রসন্ন দক্ষিণ মুখ দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর। প্রাণের স্থিরতাই রুদ্রের দক্ষিণ মুখ। প্রাণ সূক্ষ্মবাহী হইলেই এই প্রাণের প্রসন্ন ভাব সাধককে অভয় দান করিয়া থাকে। প্রাণ সূক্ষ্মবাহী হইয়া প্রশান্তভাব ধারণ না করিলে পুনঃ পুনঃ জন্মমরণের ঘুরপাক হইতে পরিদ্রাণ লাভের আর কোন উপায় নাই। ইহাই প্রকৃত শিবোপাসনা বা লিঙ্গপূজা। এইরূপ শিবোপাসনাই সাব্যস্তসার তত্ত্ব। ভক্ত সাধক তুলসীদাস তাই বুঝি বলিয়াছেন—

“সবহিঁ কর্ণো কর জোরি।

শব্দর ভঙ্গম বিনা নর ভগতি ন পারি মোরি ॥”

লিঙ্গ আর যোনি এই দুইটিই সৃষ্টি কার্য্যের প্রধান উপকরণ। শিব শক্তি, পুরুষ প্রকৃতি, কিংবা দেব ও মায়ী। এই যুগ্মভাবগুলি ঐ লিঙ্গ ও যোনির সাক্ষাতিক নাম মাত্র। এই দুই মূল শক্তির সংযোগ হইতেই সৃষ্টি কার্য্য হইয়া থাকে—যদিও এই দুই শক্তি স্বরূপতঃ একেবাই বিভিন্ন প্রকাশ। বীজাবস্থায় এই দুই শক্তি একত্রে মিলিত থাকে, তখন বীজের মধ্যে এই দুই শক্তি অভিন্নরূপে বর্তমান থাকে। এই অভিন্ন যুগ্মভাবকেই দেব বা দেবরী বলা হয়। এই দেবরের মধ্যে একদিকে যেমন সৃষ্টিকারিণী শক্তির বিদ্যমানতা রহিয়াছে অপর দিকে উহা তরুণ প্রপঞ্চাতীত শাস্ত শিবাত্মক পরমব্রহ্মরূপে বর্তমান। তখন শিব ও শক্তিকে পৃথক

বসিয়া বুদ্ধিতে পারা যায় না। কিন্তু যখন পরস্পরের মধ্যে স্থিতির ইচ্ছা হয়, তখন “ন ঐক্যত” — পরস্পরের এই স্থিতিমুখী সংকল্পের বৃদ্ধি উপরে উন্নিত হইতে না হইতেই শিব-শক্তি পৃথক্ হইয়া দৈততত্ত্বের বিকাশ হইতে থাকে। কিন্তু এই শিব-শক্তি তখনও পরস্পর বিচ্ছিন্ন নহে, তখনও উভয়ে অঙ্গাঙ্গী ভাবে অচ্ছেদ্য বন্ধনে মিলিত থাকেন। তখনও উহা অলিঙ্গ পদবাচ্য না হইলেও জ্ঞান-গোচর নহে — এইজন্ত এ ভাবেও অব্যক্তাবস্থা বলা হইতে পারে। ইহাই শিবশক্তির সমরস ভাব, উহাই জগদম্বা বা আত্মশক্তি — এতৎমধ্য যে চৈতন্য তাহাই দ্বিতীয় পুরুষ। পরে এই অব্যক্তাবস্থা ভেদ করিয়া যে ভাস্কর জ্যোতিঃ আবির্ভূত হয়, তাহাকেই লিঙ্গ বলা হয়, ইনিই তৃতীয় পুরুষ, এই স্থান হইতেই প্রকৃতি পুরুষের ভেদ আরম্ভ হয়। লিঙ্গ যখন প্রকাশিত হয় তাহার সহিত যোনিও উৎপন্ন হয়। পূর্বে যাহা এক অর্ধতীয় ছিল, পরে যাহা দ্বৈতরূপে প্রকাশিত হইয়াও অব্যক্তের মধ্যেই অঙ্গাঙ্গী রূপে বর্তমান ছিল, এখন সেই অভেদ ভাব যেন ছুটিয়া গেল, প্রকৃতি-পুরুষ দুইটি পৃথক্ ভাবে প্রকাশ পাইতে লাগিল, কিন্তু পরস্পরের এই পৃথক্ অস্তিত্ব প্রস্ফুটিত হইলেও তাঁহারা এক অন্তের সহিত যেন জড়িত হইয়া রহিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। বাস্তবিকই এ অবস্থায় তাঁহাদের পৃথক্ রূপ বা ভাব প্রকাশিত হইলেও কদাপি তাঁহারা এক অন্তকে ছাড়িয়া থাকেন না। ইহাই পুরুষ-প্রকৃতির পৃথক্ ও মিলিত ভাব। যোগীরা ইহাকেই কুটস্থ জ্যোতিঃ রূপে দর্শন করিয়া থাকেন। জ্যোতির্ময়ী প্রকৃতিমণ্ডলের মধ্য-বিন্দু বা কেন্দ্র-স্থানীয় যে কৃষ্ণ-গোলক (ছোট শালগ্রাম শিলার তায়), উনিই রাধাবক্ষস্থলস্থিত ক্রীড়ক, ইনিই সাধকেন্দ্রগণের ধ্যেয় সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্তী পুরুষ। এই পুরুষটিই পুরুষোত্তম নারায়ণ বা দ্বিতীয় পুরুষের সহিত অভিন্ন। কিন্তু জ্যোতিঃ ও তন্মধ্যস্থ কৃষ্ণ যে “পুরুষঃ কৃষ্ণপিঙ্গলঃ” (নীল-পীতের মিশ্রণ), তিনিই তৃতীয় পুরুষ। এ দুয়ের এমনই সম্বন্ধ যে এককে ছাড়িয়া অন্য প্রকাশিত হইতে পারে না — ইহাই যুগল ভাব। তদবধি সর্ব প্রকার সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে এই যুগলভাব অন্তর্ভুক্ত হইয়া আছে। কিন্তু এই যুগলরূপ সেই শিবশক্তি-সমরস-ভাবপূর্ণ চিদ্রূপ হইতেই সরোবরের সলিল মধ্য হইতে কমলের প্রস্ফুরণের মত উথিত হয়, ঠিক যোনির অন্তর্গত লিঙ্গের তায়। জ্যোতিঃই যেন প্রকৃতির দেহ এবং কৃষ্ণ-গোলক মধ্যস্থ বিন্দুই যেন পুরুষের দেহ। এই দেহদ্বয় পৃথক্ ভাবে একটি হইয়াও অনাদিকাল হইতেই নিত্য নিলিতা-বস্থায় চির বর্তমান। এই জ্যোতিঃ স্বরূপ দেহ ত্রিঙাখিত, তাই উহাকে তিনটি রেখা রূপে কল্পনা করা হইতে পারে। এই তিনটি রেখার মিলনে একটা ত্রিভুজ গঠিত হয়। এই তিনটি বস্তুতঃ এক হইলেও গুণে প্রভেদ হেতু বিভিন্নাকার (যেত, বৃত্ত, কৃষ্ণ রূপ) প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তদবস্থাতেই তাহাদের কেন্দ্রমধ্যস্থ বিন্দুটি একই। এই যোনিমণ্ডল উর্দ্ধমুখ ও অধোমুখ ভেদে দুই প্রকার। উর্দ্ধমুখ যোনিকে ব্রহ্মযোনি ও অধোমুখ যোনিকে মাতৃযোনি বলে। সাধককে এই মাতৃযোনি ভেদ করিয়া উর্দ্ধে উঠিতে হয়, তাই তন্মুখে বলা হইয়াছে — “মাতৃযোনিং পদিত্যঙ্গা সর্বযোনিং (ব্রহ্ম) সমাচরেৎ।” কিন্তু উভয় যোনির কেন্দ্র হইল সেই বিন্দু। এই বিন্দুস্থানকে না জানিলে কেহই সাধক হইতে পারেন না। যদিও উভয় যোনির মধ্যে সেই একই বিন্দু (পুরুষ) বর্তমান তথাপি জগদ্যোনি কুণ্ডলিনীর উর্দ্ধ ও অধোভাগে অবস্থান হেতু ঐ বিন্দুকেও

যেন দুইটি বলিযা ভ্রম হয়। এই দুইটি বিন্দু ধার্মোমিটারের পারস্পর মত উপরেও থাকিতে পারে নীচেও থাকিতে পারে। পার্থক্য এই যে এই বিন্দু একই কালে উভয় যোনিতেই বর্তমান থাকে। যখন এই বিন্দু অধোমুখী হইয়া মূলধারস্থ ত্রিকোণ যন্ত্রে অবস্থিত হয়, তখনই সংসারমুখী বাসনা প্রবাহিত হয়, শিব জীবরূপে প্রকাশিত হন। এই অধোমুখ বিন্দুকে উর্দ্ধমুখ করিবার প্রক্রিয়া হইল ষট্চক্র ভেদের ক্রিয়া বা প্রাণায়াম। ইহাকে মূলধার হইতে যেন ধোর করিয়া উঠাইয়া আজ্ঞাচক্রের উপর উর্দ্ধ ত্রিকোণ-মধ্যে সংস্থাপন করিতে হয়। প্রাণ সযমের দ্বারা যখন উর্দ্ধ ত্রিকোণক্ষেত্রে বিন্দু সংস্থাপিত হন, তখনই জীব শিব হইয়া যান। ইহাকে স্মরণ করিয়াই বেদ বলিলেন — “উর্দ্ধলিঙ্গং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপং নমোনমঃ।” ইনি বিরূপাক্ষ কারণ তাঁহার দৃষ্টি তখন জগতে সম্বদ্ধ নহে। উর্দ্ধ ত্রিকোণে বিন্দু প্রতিষ্ঠিত হইলেই প্রপঞ্চাতীত অবস্থার সাক্ষাৎ হয়। উর্দ্ধ ত্রিকোণে বিন্দুকে ধারণ করাই গর্ভাধান ক্রিয়া। উর্দ্ধ ত্রিকোণে গর্ভধারণ হইলেই জগৎ লয় হইয়া ব্রহ্মমুখী অপ্রাকৃত অবস্থার উদয় হয়, এবং অধঃ ত্রিকোণে গর্ভাধান হইলেই জগৎ-প্রপঞ্চ প্রকটিত হয়।

পঞ্চদশোধ্যায়ঃ ।

(পুরুষোত্তম-যোগঃ)

(সংসার অর্থঃ)

শ্রীভগবান্মুবাচ ।

উর্দ্ধমূলমধঃশাখমখং প্রাহুরব্যয়ম্ ।

ছন্দাংসি যন্ত পর্ণানি যন্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ১

অনুয় । শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন) । উর্দ্ধমূলং (উর্দ্ধে যাহার মূল) অধঃশাখম্ (অধোদিকে যাহার শাখা) অব্যয়ম্ (অব্যয়) অখং (অখরূপ সংসার—কাম পথান্ত যাহা থাকিলে না সংসার এতই অনিত্য ! অ—না, খ—কল্য, স্থা—থাকা) প্রাহুঃ (বলেন), ছন্দাংসি (বেদ নকল) যন্ত (যাহার) পর্ণানি (পত্রসমূহ), তং (তাহাকে) যঃ বেদ (যিনি জানেন) সঃ বেদবিৎ (তিনি বেদবেত্তা) ॥ ১

শ্রীধর । বৈরাগ্যেণ বিনা জ্ঞানং ন চ ভক্তিরতঃ স্মৃটম্ ।

বৈরাগ্যোপস্থতং জ্ঞানমীশঃ পঞ্চদশেহধিশং ॥

পূর্বাধ্যায়ান্তে ‘মাঞ্চ যোহব্যতিচারেণ ভক্তিযোগেন স্বেভে’ ইত্যাদিনা পরমেধবন্ একান্ত ভক্ত্যা ভজতঃ তৎপ্রসাদলব্ধজ্ঞানেন ব্রহ্মভাবো ভবতি ইত্যুক্তং । ন চ একান্ত ভক্তিঃ জ্ঞানং বা অবিরক্তস্ত সত্ত্বভক্তি ইতি বৈরাগ্য পূর্বকম্ জ্ঞানম্ উপদেষ্টুকামঃ প্রথমং তাবৎ সার্কল্লোকাভ্যাং সংসারবন্ধপং বৃক্ষরূপকালংকারেণ বর্ণয়ন্ শ্রীভগবান্ উবাচ—উর্দ্ধমূলমিতি । উর্দ্ধম্—উত্তমঃ ক্ষরাক্ষরভ্যাং উৎকৃষ্টঃ পুরুষোত্তমো মূলং যন্ত তম্ । অধঃ ইতি ততোহর্ধাচীনঃ কার্যোপাধ্যায়ো হিরণ্যগর্ভায়ো গৃহ্যে । তে তু শাখা ইব শাখা যন্ত তম্ । বিনশ্বদেব ধঃ প্রভাতপর্ধ্যন্তমপি ন স্থাত্তি ইতি বিশ্বাসানর্হতাং অখং প্রাহুঃ । প্রবাহরূপেণ অবিচ্ছেদাৎ অব্যয়ক প্রাহুঃ, “উর্দ্ধমূলোহবাক্ষাধ এষোহখং সনাতনঃ” ইত্যুচ্যতে । ছন্দাংসি—বেদা যন্ত পর্ণানি—ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রতিপাদনদ্বারেণ ছায়াস্থানীয়ৈঃ কর্ম্মফলৈঃ সংসারবৃক্ষস্ত সর্গজীবাস্রয়ণীয়ত্ব প্রতিপাদনাং পর্ণস্থানীয়া বেদাঃ । যঃ তং এবভূতং অখং বেদে স এব বেদার্থবিৎ । সংসারপ্রপঞ্চবৃক্ষস্ত মূলম্ ঈশ্বরঃ জীনারায়ণঃ । ব্রহ্মাধ্বয়ঃ তদংশাঃ শাখাস্থানীয়াঃ । স চ সংসার-বৃক্ষো বিনশ্বরঃ, প্রবাহরূপেণ নিত্যশ্চ । বেদোক্তৈঃ কর্ম্মভিঃ সেব্যতাম্ ইত্যুপাধিত্যশ্চ । ইতি এতাবানেব হি বেদার্থঃ । অত এব বিধান্ বেদবিৎ ইতি জ্ঞায়তে ॥ ১

বদ্যামুবাচ । [বৈরাগ্য ব্যতীত জ্ঞান বা ভক্তি হয় না—ইহা স্মৃট অর্থাৎ ব্যক্ত হইল । এতদ্ব্যতীত ভগবান্ পঞ্চদশ অধ্যায়ে বৈরাগ্য সহিত জ্ঞানের উপদেশ দিতেছেন ।]

[পূর্বাধ্যায়ের (১৪শ অঃ) শেষভাগে (২৬শ, ২৭শ শ্লোকে) ‘মাঞ্চ যোহব্যতিচারেণ’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা পরমেধবর একান্ত ভক্তি দ্বারা ভজনশীল ব্যক্তির তৎপ্রসাদলব্ধ জ্ঞান দ্বারা মুক্তিলাভ করেন—ইহা বলা হইয়াছে, কিন্তু অবিরক্ত (বৈরাগ্যহীন) ব্যক্তির একান্ত

১৫শ অঃ]

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

১৬৯

ভক্তি বা জ্ঞান হওয়া সম্ভব নহে, এইজন্য বৈরাগ্যপূর্বক জ্ঞানের উপদেশ দিবার ইচ্ছায় প্রথমতঃ সার্কল্লোক দ্বারা সংসার-বৃক্ষ বৃক্ষকে রূপকালঙ্কারে বর্ণন করতঃ]—শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—এই সংসারবৃক্ষ উর্দ্ধমূল—অর্থাৎ ইহার মূল উর্দ্ধ—অর্থাৎ উত্তম, যাহা ক্ষর এবং অক্ষর হইতে উৎকৃষ্ট, এমন যে পুরুষোত্তম তিনিই যাহার মূল, তাহাকে এবং পুরুষোত্তম হইতে অধঃ অর্ধাচীন কার্যোপাধিবিষিষ্ট হিরণ্যগর্ভাদিকে এতদ্বারা গৃহীত হইয়াছে ; বৃক্ষের শাখার মত ইহার যাহার শাখা—তাহাকে অখং বলে, কারণ বিনশ্বর বলিয়া অর্থাৎ “ধঃ” আগামী প্রভাত পর্য্যন্ত থাকিবে না এইজন্য যাহা বিশ্বাসের অযোগ্য । ইহাকে আবার “অব্যয়” বলে, কারণ প্রবাহরূপে ইহার কখনও বিচ্ছেদ নাই । “উর্দ্ধমূলোহবাক্ষাধ এষোহখং সনাতনঃ”—কঠ উঃ । (এষঃ—এই সংসাররূপ বৃক্ষ, অখং—অস্থায়ী, আগামী দ্বিৎস পর্য্যন্ত থাকিবে কিনা বলা যায় না । উর্দ্ধমূলঃ—ইহার মূল উর্দ্ধ অর্থাৎ ইহা ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, অবাক্ষাধঃ—নিয়মিত বিস্তৃত শাখাবৃদ্ধ, অর্থাৎ দেব মনুষ্য তির্য্যগাদি জীবদ্বারা পূর্ণ, সনাতনঃ—অনাদিকাল হইতে এই সংসার প্রবাহরূপে বিচলমান রহিয়াছে) । বেদসকল সেই সংসার-বৃক্ষের পত্রত্রয়জি, অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রতিপাদন দ্বারা ছায়াস্থানীয় যে কর্ম্মফলসমূহ তদ্বারা সংসার-বৃক্ষটি জীবসমূহের আশ্রয়ণীয় রূপে প্রতিপাদন করে বলিয়া বেদ-সকল যেন পত্রের কার্য্য করে । অর্থাৎ বেদ ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রতিপাদন করিয়াছেন, সেই ধর্ম্মাধর্ম্মই কর্ম্মফল উৎপত্তির কারণ । কর্ম্মফলই ছায়াস্থানীয় হইয়া সর্গজীবের আশ্রয়রূপ, এতদ্ব্যতীত সংসার বৃক্ষের পর্ণস্থানীয় বেদ । [যথা বৃক্ষস্ত পরিরক্ষণার্থানি পর্ণানি তথা বেদাঃ সংসারবৃক্ষ-পরিরক্ষণার্থা ধর্ম্মাধর্ম্ম-ভেদেতু ফলপ্রকাশনার্থত্বাৎ । যেরূপ পত্রগুলি বৃক্ষের রক্ষার প্রতি হেতু, সেইরূপ এই বেদত্রয়ও সংসার বৃক্ষের পরিরক্ষক ; যেহেতু বেদের দ্বারাই ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের কারণ এবং ফল প্রকাশিত হইয়া থাকে—শঙ্কর]

যিনি সংসারকে এইভাবে জানেন তিনিই বেদার্থবিৎ । সংসারপ্রপঞ্চরূপ বৃক্ষের মূল—ঈশ্বর বা নারায়ণ, তদংশ ব্রহ্মাদি শাখাস্থানীয় । এই সংসার-বৃক্ষ বিনশ্বর, কিন্তু প্রবাহরূপে নিত্য এবং বেদোক্ত কর্ম্ম সমূহ দ্বারা এই সংসারের সেব্যত্ব প্রতিপাদিত হয়, অর্থাৎ সংসারে আসিয়া বেদোক্ত কার্য্য নিরীহ করা যায় বলিয়া ইহা সেব্যও বটে—ইহাই বেদার্থ বা তাৎপর্য্য । অতএব এই প্রকার জ্ঞানযুক্ত পুরুষকেই বেদবিদ্ রূপে স্তুতি করা যায় ॥ ১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—কূটস্থ দ্বারায় অনুভব হইতেছে—মূল উপরে শাখা নীচে—মাথা উপরে হাত পা নীচে এইরূপ অখণ্ডবৃক্ষাকার কলবর, উল্টা ছন্দ অর্থাৎ কূটস্থের মধ্যে যে সকল ঝড়-বুট্টা দেখা যায়, সেই পাঁতা ; এইরূপ যে কূটস্থকে জানে সেই বেদকে জানে, আবার—।—ক্ষতিতেও আছে—

উর্দ্ধমূলোহবাক্ষাধ এষোহখং সনাতনঃ ।

তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে ।

তন্নিম্নোকাঃ শ্রিতাঃ সর্গে তদ্রূপে নাত্যেতি কশন ।

এতদ্বৈতং ॥ —কঠ উঃ

এবঃ (এই—সংসাররূপবৃক্ষ) অর্থঃ (অচিরস্থায়ী, যাহা আগামী দিবস পর্য্যন্ত থাকিবে কিনা সম্ভেদ) [এই অর্থের] উর্দ্ধমূলঃ (উর্দ্ধ যে বিষ্ণুর পরমপদ তাহাই বাহার মূল) অবাক্-শাখঃ (শাখা সমূহ বাহার অধোগামী—স্বর্গ, নরক তিথ্যক্ ও প্রেতাদি দেহ প্রাপ্তিরূপ শাখা-সমূহ দ্বারা অবাক্শাখ) [ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্যঃ—এই সপ্তলোকস্থ ব্রহ্মাদি ভূতসমূহরূপ পক্ষিগণ বাহাতে নীড় নির্মিত করিয়াছে।] সনাতনঃ (অনাদিকাল হইতে প্রবাহরূপে বর্তমান বলিয়া চিরন্তন)—[এই সংসার-বৃক্ষের যিনি মূল] তিনিই বৃক্ষঃ (শুভ্র বা শুদ্ধ-প্রোতিষ্ঠ্য, চৈতন্যাক্রম আশ্রয়প্রাপ্তিঃস্বভাব), তৎ ব্রক্ষ (সর্বাপেক্ষা মহত্ত্বনিবন্ধন তিনিই ব্রক্ষ) তৎ এব (তিনিই) অমৃতং (অবিনাশ স্বভাব) উচ্যতে (বলিয়া কথিত হন), সর্বে লোকাঃ (সমস্ত লোক) প্রিতাঃ (সেই ব্রক্ষেই আশ্রিত রহিয়াছে) তৎ উ (তাঁহাকে) কশ্চন (কেহই) ন অতোতি (অতিক্রম করিয়া অবস্থান করিতে পারে না)। ইহাই সেই বস্তু যাহা নচিকেতা জানিতে চাহিয়াছিলেন।

আমরা পূর্বে অনেকবার এই গীতা ব্যাখ্যায় উল্লেখ করিয়াছি যে ব্রহ্মাওই সংসার, এবং এই দেহ সেই ব্রহ্মাওর ক্ষুদ্র আয়তন। “দেহেহহ্মিন্ বর্ততে মেরুঃ সপ্তদ্বীপসমম্বিতঃ। সৱিতঃ সাগরাঃ শৈলাঃ ক্ষেত্রানি ক্ষেত্রপালকাঃ। ত্রৈলোক্যে যানি ভূতানি তানি সর্গানি মে মতঃ ॥” (শিবসংহিতা)। শ্রীমদ্বাচার্য্য শঙ্করও বলিয়াছেন—এই সংসারবৃক্ষ অবাক্শাখঃ অর্থাৎ শাখাগুলি অধোদিকে বিস্তৃত—স্বর্গ নরক তিথ্যক্ ও প্রেতাদি দেহ প্রাপ্তিরূপ শাখাসমূহ দ্বারা অবাক্-শাখঃ—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্যঃ এই সপ্তলোকস্থ ব্রহ্মাদি ভূতসমূহরূপ পক্ষিগণ বাহাতে নীড় নির্মিত করিয়াছে—এই বৃক্ষাকায় কলেবর। মূল বলিতে আমরা সাধারণতঃ তলেব দিকে অবেষণ করিব, কিন্তু এই বৃক্ষের মূল উপরে, শাখা নীচে। এই মূল জীবের মস্তক, মেরুশিখর। এই মেরুশিখর সহস্রাংগী বিষ্ণুর পবন পদ। *

“শিবস্থানং শৈবাঃ পরমপুরুষং বৈষ্ণবগণাঃ

লপন্ত্যতি প্রায়ো হরিহরপদং কেচিদপরে।

পদং দেব্যাঃ দেবীচরণযুগলানন্দরসিকা

মুনীন্দ্ৰা অপ্যন্তে প্রকৃতিপুরুষং স্থানমমলাঃ ॥”

যাঁহার। শৈব তাঁহার। উক্ত স্থানকে শিব স্থান বলিয়া থাকেন, বৈষ্ণবগণ উহাকে

* জীবের মূল মস্তিষ্ক বা নেওশিখর বলিলে এমন কেহ যেন না বুঝেন যে মস্তিষ্কই (Brain) যেন আসল বস্তু। মস্তিষ্কটি জীব-নবিতের আত্মপ্রকাশের স্থান মাত্র। সমস্তিক অবয়বটি আত্মার অবিষ্ঠান। উহার। কেহই আত্মচৈতন্য নহে, দেহকে অবলম্বন করিয়া আত্মপ্রকাশ করে মাত্র। শরীরের নাগে জীবের নাশ হয় না, বরং দেহ হইতে বিনির্গত হইলে দেহেরই নাশ হইয়া থাকে। সেইজন্য বাক্য আসল বস্তু নহে, যিনি বলিতেছেন তিনিই জ্ঞেয় বা আত্মা, ভ্রাণ আসল সত্য বস্তু নহে, ভ্রাতাই আসল বস্তু, কণ আসল বস্তু নয়, উঠাই জাতব্য বস্তু, মন আসল বস্তু নহে, মনন-কর্ত্তাই আসল বস্তু, কর্ণ আসল বস্তু নহে, কর্ণের কর্ত্তাই আসল জাতব্য বস্তু—(কৌণ্ডিকী উঃ)। সুতরাং মনুষ্যবয়বের মধ্যে মস্তিষ্কন্যায়ত যে স্থানটিতে বিষ্ণুর পরমপদ অভিযুক্ত হইয়া থাকে, তাহাকেই সংসার-পদ্য বলে।

পরমপুরুষ বিষ্ণুস্থান বলেন, কেহ কেহ উহাকে হরিহর-স্থান বলিয়া থাকেন, এবং দেবীভক্তেরা উহাকে শক্তিস্থান এবং কোন কোন বিদ্বৎ মুনিগণ ঐ স্থানকে প্রকৃতিপুরুষের স্থান বলিয়া বর্ণনা করেন।

“ইহ স্থানং জ্ঞাত্বা নিয়তনিজচিত্তো নরবরো

ন ভূয়াৎ সংসারে কচিদপি চ বদ্ধজিভুবনে।

সমগ্রা শক্তিঃ স্যাদ্ভিন্নমমনসস্তস্য কৃতিনঃ

সদা কর্ত্তুং হর্ন্তুং যগতিয়পি বাণী সুবিমলা ॥”

এই সহস্রাংগপন্ন বিদিত হইয়া যিনি নিজ চিত্তকে তথায় সংযত করিতে সমর্থ হন তিনি নরশ্রেষ্ঠ। তাঁহাকে পুনরায় সংসারে বা জিভুবনের কুত্রাপি স্থানে আবদ্ধ হইতে হয় না। সেই সংযতচিত্ত কৃতি সমগ্র শক্তিই আয়ত্ত করিতে পারেন। স্থিতি-স্থিতি-সংহারে তাঁহার সামর্থ্য হইয়া থাকে এবং শূন্যমার্গে তিনি বিচরণ করিতে পারেন। বাগ্‌দেবী তদীয় মুখে নিরন্তর অধিষ্ঠান করেন।

“ব্রহ্মব্রজে মনো দ্ববা ক্ষণাৎ যদি তিষ্ঠতি।

সর্গপাপবিনিমুক্তঃ স যতি পরমাং গতিম্ ॥”

ব্রহ্মব্রজে মন স্থাপিত করিয়া যদি কেহ ক্ষণাৎ কালও অবস্থান করিতে পারে, তাহা হইলে সে সর্গপাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরমা গতি লাভ করে।

“অহ্মিন্ লীনং মনো যন্ত স যোগী মস্মি লীয়তে।

অর্ণিমাধিগুণান্ ভুক্ত্বা শ্বেচ্ছয়া পুরুষোত্তমঃ ॥”

যাঁহার চিত্ত ব্রহ্মব্রজে লীন হয়, তিনিই পুরুষোত্তম। তিনি শ্বেচ্ছাশূন্যে অর্ণিমাধিগুণা সকল ভোগ করিয়া, শেবে আনাতাই বিলীন হইয়া যান।

এই সহস্রাং-কমলদলস্থিত বিষ্ণুর পরমপদ হইতে গজা-যমুনা-সরস্বতীরূপা ত্রিধারা ইড়া-পিঙ্গলা-সুহৃদারূপিণী নাতীত্রয় প্রবাহিত হইয়াছে। এই তিনটি ধারাই ত্রয়ী বা বেদত্রয়। এই বেদোক্ত ক্রিয়া দ্বারাই (ইড়া-পিঙ্গলা-সুহৃদাতে ক্রিয়া করিয়া থাকিলে) ত্রিলোক ব্যবস্থিত, অর্থাৎ যতক্ষণ ইহাদের ক্রিয়া বর্ত্তমান থাকে ততক্ষণ এই ভূঃ ভুবঃ স্বঃ প্রভৃতি ত্রিলোকের বিद्यমানতা।

যাহা সহস্রারে সব মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছিল, যেখানে কিছুই ছিল না, সেই মহাশূন্য পরব্যোম (ক্রিয়ার পর অবস্থা) হইতে—

“সচ্চিদানন্দবিভবায় সকলাৎ পরমেশ্বরায়।

আসীচ্ছক্তিস্তো নাদো নাধাধিন্দুসমুদ্ভবঃ ॥” শারদাভিলক।

সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মযুক্ত আত্মশক্তি হইতে যে নাদ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই নাদ হইতে বিন্দুর উৎপত্তি হয়।

“প্রাণিদিগের সকাম-ভাবে কৃত কর্ম্মসকল যখন ফলশূন্য হয়, তখন সর্বসাক্ষী—সর্বকর্ম্ম-ফলপ্রদ পরমেশ্বর হইতে অবুদ্ধিপূর্ব্বক সৃষ্টি, মায়া ও পুরুষের প্রাদুর্ভাব হয়। তখনস্তর

বিন্দুরূপী ত্রিগুণাত্মক অব্যক্তের আবির্ভাব হইয়া থাকে। ইহাই “শক্তিভব”। বিন্দুর অচিৎংশ বীজ এবং চিৎ-অচিৎ মিশ্রাংশ “নাদ”; চৈতন্যাদিষ্টিত প্রকৃতি বা শক্তির ক্রিয়া-প্রধান অবস্থাই নাদ।

“অবয়বীভূত হওয়া” এই অর্থবাচী “বিন্দু” শব্দের উত্তর “উ” প্রত্যয় করিয়া “বিন্দু” পদটি সিদ্ধ হইয়াছে। যাহা অবয়বীভূত হয় তাহাই বিন্দু। রেখা হইতে ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ প্রভৃতি নানা অবয়ব (Figure) সৃষ্টি হয়। সেই রেখা বিন্দুর সমষ্টি মাত্র; বিন্দু অবিভাজ্য বস্তু, কিন্তু সেই বিন্দুর পরিচালনে (মাত্রা শক্তির প্রভাবে) বহু বিন্দুর উৎপত্তি মনে হয়, এবং সেই সকল বিন্দু সমষ্টিই রেখা, এবং রেখার পরিচ্ছিন্ন সংস্থানেই ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, বৃত্তাদি আকৃতিতে পরিণত হয়।

অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম মাত্রাশক্তির দ্বারা স্বীয় তত্ত্বকে নানারূপে পরিচ্ছিন্ন করেন। সেই মাত্রা দ্বারাই এক অবগু বস্তু বহুরূপে প্রাতিভাত হন। সহস্রাবের কলাতীত পরমব্রহ্ম বা পরমা প্রকৃতি অবস্থান করেন, তাহাই আজ্ঞাচক্রে মনোরূপ কলাধরূপ পরশিব এবং বিচক্রে আকাশ মূর্তি বিন্দুরূপ মহেশ্বর, অনাহতচক্রে বায়ুমূর্তি নাদরূপ ঈশ্বর, মণিচক্রে তৈজস মূর্তি রুদ্র, স্বাধীর্ভানচক্রে জলমূর্তি বিষ্ণু ও মূলাধারচক্রে পৃথিবীমূর্তি ব্রহ্মা এবং তাহা হইতেই সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের উৎপত্তি। তাহা হইলে আমার এই-দেহই ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতার আধারস্থান। ক্রিয়ার পর অবস্থার স্থির থাকিলে শূন্য হইতে এক শব্দ হয়, সেই শব্দের নাম নাদ, সেই নাদ-ব্রহ্মের একাংশেতে জগৎ, আর অর্ধমাত্রাতে নিশ্চল স্থিতি বা ক্রিয়ার পর অবস্থা। পক্ষিষাবকের বাসার মতন হৃদয় আশ্রয় স্থান, সেই আশ্রয় বিষয়াধিত হইলেই জীব, বিষয়-পাশ হইতে রহিত হইলেই তখন শিব। ক্রিয়ার পর অবস্থা হইতেছে অব্যক্ত পদ, সেই অব্যক্ত ব্রহ্ম হইতে এক পুরুষ হয়, যাহা দেখা যায় এবং দেখা যায়ও না। সেই পুরুষের পর আর কিছুই নাই; তাহাই কাষ্ঠা এবং তাহাই পরা গতি। ১৮ নিমেষ পর্য্যন্ত বিনা ক্রেশে স্থিতি সাধার হয় সেই কালকে জয় করিয়াছে, তাহাই পরা গতি। উত্তম পুরুষের রূপ শরীরের মত অর্থাৎ মহুজ্যাকৃতি, অলুষ্ঠমাত্র জ্যোতিঃস্বরূপ, জন্মধ্যে বাহ্যাকে দেখা যায় এবং চুলের একহাদ্যর ভাগের এক ভাগ দৃশ্য সূক্ষ্ম নক্ষত্রের মত জ্যোতিঃ, তিনিই জীব, সুবুয়্যার মধ্যে আসিতেছেন ও বাইতেছেন। ‘অক্ষরাং সংজ্ঞ্যতে কালঃ’—ব্রহ্মা হইতে কাল অর্থাৎ শূন্য, শূন্য হইতে বায়ু সেই বায়ু উর্দ্ধেতে গিয়া তমঃ, সেই তমঃ হইতে জল, তাহার মথনে শিশির, তাহার মথনে ফেন, তাহা হইতে অণু, অণু হইতে ব্রহ্মা, তাহা হইতে বায়ু, তাহা হইতে উঁকাররূপ শরীর, তাহা হইতে সাবিত্রী জগদ্ধাত্রী মূলাধারে, তাহা হইতে সমুদ্রর লোক, পুনরায় ইহার উঁটা দিক—গায়ত্রী অর্থাৎ ক্রিয়া করা, ক্রিয়া করিয়া কূটস্থে থাকি, পরে ক্রিয়ার পর অবস্থা। ক্রিয়া করিতে করিতে কূটস্থে থাকা হয়, জ্যোতিঃ দর্শন হয়, ও অমৃতরূপ বদ্যবাদ হয়, তখন এক আশ্চর্য্যরূপ স্থিতি মূলাধার হইতে লিঙ্গমূল ও লিঙ্গমূল হইতে নাতি পর্য্যন্ত হইতে থাকে। হৃদয় হইতে মস্তক পর্য্যন্ত যে বায়ু তাহাই ইড়া বা প্রাণ বায়ু; পিঙ্গলার গতি অধোদেশে, এই অধঃ ও উর্দ্ধ মধ্যে সুষুম্না। তিনি অগ্নিস্বরূপ, সকল বস্তুকে ভস্ম করিয়া এক করিয়া দেন এবং আপনিও ভস্ম হইয়া যান। কণ্ঠ হইতে মস্তক

অধশ্চোর্দ্ধং প্রস্থতাস্ত্য শাখা

গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।

অধশ্চ মূলানুসন্তানি

কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥ ২

পর্য্যন্ত অগ্নি আছেন, ইহাকেই ব্রহ্মাণি বলে, ইহা স্বপ্রকাশ স্বরূপ। এই তিন বায়ু নাতিতে এক হইয়া যখন হৃদয় পর্য্যন্ত স্থির হইয়া থাকে, তখনই ক্রিয়ার পর অবস্থা, তখন প্রাণ ও অপান সমান রূপে স্থির—ইহাই প্রলয়। সৃষ্টি সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে দেহ পর্য্যন্ত ক্রম অনুযায়ী হয়। এই সৃষ্টি-লয় পুনঃ পুনঃ হইতেছে, এক অবস্থার থাকে না, সেই জ্ঞাত ইহা অখণ্ড, আবার সর্বদাই এইরূপ সৃষ্টি-লয় হয় বলিয়া প্রবাহরূপে উহা অব্যয়। পর্ণজলি যেমন বৃক্ষকে সজীব রাখে সেইরূপ ছন্দ অর্থাৎ জীবের ইচ্ছা বা বাসনাই এই সংসারবৃক্ষকে জীবিত রাখে। এই ইচ্ছাই কূটস্থের মধ্যে বিবিধ শক্তির খেলা ও বর্ণরূপে দেখা যায়। এই কূটস্থকে যিনি জানেন তিনিই বেদকে জানেন। ‘ন বেদং বেদ ইত্যাহ বেদো ব্রহ্ম সনাতনম্’ এই বেদ ব্রাহ্মণেরই পাঠ্য। এই জ্ঞাত ক্রিয়া সকলেরই করা উচিত। জিহ্না করিলে ক্রিয়ার পর অবস্থার হৃদয়, প্রাণ, মন সব স্থির হয়, ইহাই যজ্ঞস্থত্রের তিন গ্রন্থি। তিনি পরম পবিত্র, অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্বের (পঞ্চতত্ত্বই মূল) অতীত হন। সেই আত্মা ‘সহজং’ অর্থাৎ জন্মের সহিত হইয়াছেন (স্বাসরূপে) এবং তাহা ‘পুরস্তাত্’—এই দেহপুর মধ্যে রহিয়াছেন। তিনি ‘প্রজাপতি’—তিনি সকলেরই উৎপত্তির বর্ত্তা, প্রাণ না থাকিলে কোন কিছুই উৎপত্তি হয় না। তিনি আবু এবং আয়ুঃস্বরূপ, যত দিন স্বাস ততদিন জীবন। ‘অগ্রাণ্য’—অগ্রভাবে অর্থাৎ বায়ু উর্দ্ধে মস্তকে গমন করিলে “বলমস্ত তেজঃ”—বল ও শক্তি তদ্বারা হউৎ, অর্থাৎ বল যোগবল সর্বব্যাপকত্ব ও সর্বজ্ঞত্ব ও সর্বশক্তিমত্তা প্রভৃতি শক্তি হয়।

পরে নিগুণ ব্রহ্ম যে পরব্যোম তাহাতে লীন হইয়া যায়। ক্রিয়ার পর অবস্থার রূপ অগোচর, অর্থাৎ সকল গুণ আছে অথচ নিগুণ; সেই গুণাতীত অবস্থায় এই সমুদ্রর বিশ্ব, তুমি, আমি, দ্রী, পুরুষ, বড়, ছোট সব এক হইয়া যায়, এক বলিবারও কেহ সেখানে থাকে না ॥ ১

অন্বয়। তন্ত্ৰ (তাহার) গুণপ্রবৃদ্ধাঃ (গুণসমূহের দ্বারা বিশেষরূপে বুদ্ধিপ্রাপ্ত) বিষয়-প্রবালাঃ (বিষয়রূপ পল্লব যুক্ত) শাখাঃ (শাখা সমূহ) অধঃ উর্দ্ধং চ (অধঃ ও উর্দ্ধ ভাগে) প্রস্থতাঃ (বিস্তৃত) মহত্ত্বা লোকে (মর্ত্ত্য লোকে) কর্ম্মানুবন্ধীনি (ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মানুবন্ধ) মূলানি (মূল সমূহ) অধঃ চ (নিম্নদিকেই বিশেষ ভাবে) অনুসন্তানি (বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে) ॥ ২

শ্রীধর। কিঞ্চ—অধশ্চৈতি। হিরণ্যগর্ভাদয়ঃ কার্য্যোপাধয়ো জীবাঃ শাখাস্থানীয়তেন উক্তাঃ। তেযু চ যে দ্রুততিনঃ তে অধঃ—পঞ্চাদিবোনিষু প্রস্থতাঃ—বিস্তারং গতাঃ। সূকৃতিনশ্চ উর্দ্ধং—দেবাদিবোনিষু প্রস্থতাঃ তন্ত্ৰ সংসারবৃক্ষ শাখাঃ। কিঞ্চ গুণৈঃ—সদ্যদ্বিরজিভিঃ জলসেচনৈরিব যথাযথং প্রবৃদ্ধাঃ—বুদ্ধিঃ প্রাপ্তাঃ। কিঞ্চ বিষয়াঃ—রূপাদয়ঃ, প্রবালাঃ—

পল্লবস্থানীয়া যাসাং তাঃ। শাখাশ্রস্থানীয়াভিঃ ইন্দ্রিয়বৃত্তিভিঃ সংযুক্তাঃ। কিঞ্চ অশ্বচ্চ, চ-শব্দাদুর্দ্ধং চ মূলানি অম্লসত্ত্বতানি—বিকৃতানি। মুখ্যং মূলম্ দৈবম্ এব। ইমানি তু অন্ত-
রালানি মূলানি তত্তত্তোগবাসনালক্ষণানি। তেষাং কার্যমাহ—মহুশ্লোকে কর্ম্মমুখ্যকীর্ণীত।
কর্ম্ম এব অম্লবন্ধি—উত্তরকালভাবি বেষাং তানি। উর্দ্ধাখোলোকেষু যদ্ উপভুক্ত-তত্তত্তোগ-
বাসনাদিভিঃ হি কর্ম্মক্ষেপেণ মহুশ্লোকেং প্রাপ্তানাং তত্তদম্লরূপেষু কর্ম্মসু প্রবৃত্তির্ভবতি।
তন্নিব্বেব হি কর্ম্মাদিকারো নাশ্লোকেষু, অতো মহুশ্লোকে ইত্যুক্তম্ ॥ ২

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন]—হিরণ্যগর্ভাদি কার্যোপাধিবিধিষ্ট জীবগণ
শাখাশ্রস্থানীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তাহাদেব মধ্যে বাহারা দুষ্কৃতিশালী তাহারা অধঃশাখা,
তাহারাই পশাদি বোনিতে বিস্তারপ্রাপ্ত। আর বাহারা স্বকৃতিশালী তাহারাই উর্দ্ধশাখা,
তাহারা দেবাদি বোনিতে বিস্তৃত, তাহারাও সেই সংসারবৃক্ষের শাখা। [এই সমস্ত শাখা]
সর্বাধিগুণের বৃত্তিরূপ জলসেচনদ্বারা যথাযথভাবে প্রবৃদ্ধ অর্থাৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। আর
শাখাশ্রস্থানীয় ইন্দ্রিয়বৃত্তির সহিত সংযুক্ত বলিয়া রূপসাদি (ইন্দ্রিয়বিষয়সমূহ) ‘প্রবাল’
অর্থাৎ কিশলয় বা নবপল্লব স্বরূপ। এই স্থলে “অশ্বচ্চ”—এই “চ” শব্দে (শুধু অধঃ নহে)
উর্দ্ধভাগেও মূলসকল ‘অম্লসত্ত্ব’ অর্থাৎ বিকৃত বা বিস্তৃত। মুখ্য মূল অবশ্য পরমেশ্বর,
কিন্তু এই অন্তরাল (অবাস্তব) মূলগুলিই ভোগবাসনা-স্বরূপ। তাহাদিগের কার্য কি
বলিতেছেন—‘মহুশ্লোকে কর্ম্মমুখ্যকীর্ণী’ অর্থাৎ কর্ম্মমাত্রেরই অম্লবন্ধি অর্থাৎ উত্তরকালভাবি
বলিতেছেন—‘মহুশ্লোকে কর্ম্মমুখ্যকীর্ণী’ অর্থাৎ উত্তরকাল কর্ম্ম। উর্দ্ধ এবং
বাহাদেব, তাহারা। (এই অন্তরাল মূলগুলির “অম্লবন্ধ” অর্থাৎ উত্তরকাল কর্ম্ম)। উর্দ্ধ এবং
অখোলোকে উপভুক্ত যে সকল ভোগনিচয় সেই সেই ভোগের বাসনাদ্বারা কর্ম্মক্ষেপে
মহুশ্লোকে প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ তত্তৎ বাসনামূলক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ উর্দ্ধ এবং
অখোলোকে তত্তৎ ভোগবাসনা উপভোগ করিয়া আবার যখন মহুশ্লোকে জন্মগ্রহণ করে,
তখন তাহাদেব সেই সেই বাসনারূপ কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। কর্ম্মাদিকার অখোলোকে
নাই, মহুশ্লোকেই আছে, এইজন্য মহুশ্লোকেব কথাই এখন বলিলেন ॥ ২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—অধঃ হইতে শাখা অর্থাৎ নাড়ীসর উপরে গিয়াছে
অর্থাৎ নাথার, গুণ অর্থাৎ ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না ভালরূপে বৃদ্ধিকে পাইয়াছে—
সেই কূটস্থের মধ্যে প্রবাল বর্ণ (গাঢ় রক্ত) যত দেখিতে পাওয়া যায় তাহারাই
কামিষ্করূপে কূটস্থের জ্যোতির মধ্যে নক্ষত্রের ভিতর দেখিতে পাওয়া যায়—অধঃ
হইতে উর্দ্ধেতে বাহিবার জন্য চেষ্টা পায় তাহারা ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম্ম করিতে
উজ্জত হইয়া মনুষ্যেরা আপন কর্ম্মেতেই আপন বন্ধ হইয়া যায়।—এই সংসার-
বৃক্ষটির সহজে এই শ্লোকে আরও বিশেষ করিয়া বলিতেছেন। এই সংসারবৃক্ষ বা এই
নরতমুর মধ্যে বাসনারূপ কাহারও গুণকর্মে প্রবৃত্তি কাহারও অন্তঃকর্মে প্রবৃত্তি হইতেছে।
এই সকলের মূল কারণ কূটস্থ ব্রহ্ম যিনি আজ্ঞাচক্রে এবং তদুর্দ্ধে রহিয়াছেন, কিন্তু উহাদের
অবাস্তব কারণ অসংখ্য নাড়ীর মধ্যে প্রাণের প্রবাহ এবং তদমুখ্য মন ও ভাস্কর কর্ম্মে
স্পন্দিত হব। কামাশ্রুয়ারী এই সকল নাড়ীর মধ্যে কর্ম্মোন্মুখী স্পন্দন সব প্রকাশিত হয়,
তদ্বারা জীব কর্ম্মমাত্রের আবদ্ধ হয়। নাড়ী সমূহ যখন স্পন্দিত হইয়া বেগবৃদ্ধ হয়, সেই

(বৈরাগ্য দ্বারা সংসারবৃক্ষ-ছেদন)

ন রূপমশ্বেহ তথোপলভ্যতে

নাশ্তো ন চাদিন চ সংপ্রতিষ্ঠা।

অশ্বখমেনং সুবিরুদ্ধমূল-

মসঙ্গশত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্বা ॥ ৩

বেগ প্রধানতঃ গুণত্রয় অর্থাৎ ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্নাই বেগ। কর্ম্ম দ্বারা ঐ সকল বেগ আরও
প্রবলতর হয়। এই জন্য উহারাই জীবকে কর্ম্মে বদ্ধ করে। ঐ নাড়ীগুলি অধোদিকে
মূলধার হইতে উর্দ্ধে আজ্ঞাচক্রে পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই কর্ম্মমুখ্য ধারাগুলি প্রধানতঃ দুই
প্রকারের। কতকগুলি উর্দ্ধমুখী, কতকগুলি অধোমুখী। অধোমুখী স্পন্দন হইতে যে সকল
কর্ম্মবাসনার উদয় হয়, তাহারা জীবকে আরও অধোগতি দান করে। অর্থাৎ বার বার জন্ম
যাতায়াত, এবং কখন কখনও পশাদি ইতিবোনিতেও জন্মগ্রহণ করিতে হয়। কারণ জন্ম
বাসনামূলকই সকলের হয়। উর্দ্ধমুখী স্পন্দন হইতে জীবের সবুগুণ প্রবৃদ্ধ হয়; এবং সে
স্পন্দন সুষুম্নার। সুষুম্নার স্পন্দন হইতে কূটস্থ জ্যোতির দর্শন হয়। এবং সেই কূটস্থ জ্যোতির
অভ্যন্তরে গুহার মধ্যে যে রক্তবর্ণ জ্যোতিঃসকল দেখা যায় তাহারাই ঋষি, ঐরূপ জ্যোতিষ্ক-
রূপে তাহারা কূটস্থ মধ্যে রহিয়াছেন। বাহিরেও যেমন শব্দস্পর্শরূপসাদি বিষয় ভোগ হয়,
অন্তরেও সেইরূপ হয়। তবে ভিতরে যতই ঐ সকল অপ্রাকৃত শব্দস্পর্শরূপসগন্ধের
অম্লভব হইতে থাকে, ততই সাধক অধ্যাত্ম ধগতের উচ্চতরে প্রবেশ করিতে থাকেন ॥ ২

অম্লম্। ইহ (এই সংসারে) অশ্ব (এই বৃক্ষের) রূপং (রূপ) ন উপলভ্যতে
(উপলব্ধ হয় না)। তথা (সেইরূপ) ন অন্তঃ ন চ আদিঃ (না অন্ত, না আদি) ন চ
সংপ্রতিষ্ঠা (না স্থিতি) [উপলব্ধ হয়] ; এনম্ (এই) সুবিরুদ্ধমূলম্ (সুদুর্দ্ধমূল) অশ্বখং
(অশ্বখকে) দৃঢ়েন অসঙ্গশত্রেণ (দৃঢ় বৈরাগ্যরূপ শস্ত্রদ্বারা) ছিত্বা (ছেদন করিয়া) [ব্রহ্মকে
জানিতে হয়] ॥ ৩

শ্রীধর। কিঞ্চ—ন রূপমিতি। ইহ সংসারে স্থিতিঃ প্রাণিভিঃ অশ্ব সংসারবৃক্ষস্ত তথা
উর্দ্ধমূলবৃদ্ধিপ্রকারেণ রূপং ন উপলভ্যতে, ন চ অন্তঃ—অবসানম্ অপর্ধ্যস্তদ্ব্যং, ন চাদিঃ
অনাদিভ্যং, ন চ সংপ্রতিষ্ঠা—স্থিতিঃ, কথং প্রতিষ্ঠীতি ন উপলভ্যতে। যস্মাৎ এবভূতোহয়ং
সংসারবৃক্ষো দুর্দ্ধছেতঃ অনর্থকবশত তস্মাৎ এনং দৃঢ়েন বৈরাগ্যেণ শস্ত্রেণ ছিত্বা তবজ্ঞানযতেত
ইত্যাহ—অশ্বখমেনমিতি সার্জন। এনম্ অশ্বখম্ সুবিরুদ্ধমূলম্—অত্যন্তবদ্ধমূলম্ সত্যম্, অসঙ্গঃ
—সঙ্গরাহিত্যম্ অহংমনতাত্যাপঃ তেন দৃঢ়েন শস্ত্রেণ সমাগ্ বিচারেণ ছিত্বা—পৃথক্ কৃত্বা ॥ ৩

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন]—ইহ সংসারস্থিত প্রাণিগণ এই সংসারের উর্দ্ধমূল-
বৃদ্ধিরূপে যে স্বরূপ তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না— ইহার অবসান উপলব্ধি হয় না,
যেহেতু সংসার অসীম, ইহার আদিও উপলব্ধি হয় না, যেহেতু সংসার অনাদি। এবং ইহার
স্থিতি অর্থাৎ সংসার যে কি ভাবে আছে—তাহাও উপলব্ধি হয় না। যেহেতু এবভূত এই

সংসারবৃক্ষ ছরবচ্ছেদ্য এবং অনর্থকর, অতএব ইহাকে দূত বৈরাগ্যরূপ শত্রুদ্বারা ছেদন করিয়া তবজ্ঞানলাভে যত্ন করা কষ্টব্য, ইহাই সার্কি শ্লোক দ্বারা বলিতেছেন। অত্যন্ত বদ্ধমূল এই অশ্বখকে অসঙ্গ অর্থাৎ সঙ্গরাহিত্য—অহংমমতাভ্যাগ, সেই ভ্যাগরূপ শত্রুকে সম্যক্ বিচার দ্বারা দূত করিয়া ছেদন করিতে হইবে ॥ ৩

আধ্যাত্মিক-ব্যাখ্যা—কোন ভূত ইহার লাভ করে না—ইহার অন্তও নাই আদিও নাই—কারণ সর্বত্র ব্রহ্মময় জগৎ—না সম্যক্ প্রকারে স্থিতি, ক্রমাগত চলিয়া যাইতেছে। এই ব্রহ্মাকার কলেবরের উপরে যে মূল মস্তক স্বরূপ আছে তাহাতে বিশেষরূপে আকৃষ্ট অর্থাৎ কোন কারণ বশতঃ না যাওয়া অথচ গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিয়া ক্রিয়া ক’রে চলা ইচ্ছারহিত হইয়া—যাহা অস্ত্র হইতেছে খুব মজবুদ রূপে ইচ্ছারহিত স্বরূপ অস্ত্র দ্বারা মূলে ছেদন করতঃ অর্থাৎ ক্রিয়া করতঃ যাহা গুরুবাক্য গম্য।—বস্তু-দৃষ্ট বস্তু স্বপ্নকালে দেখিতে পাইলেও উহা জাগ্রদবস্থায় থাকে না, স্তবতার স্বপ্নাবস্থায় যাহা পাওয়া গেল, তাহা তো থাকিল না, তবে সে বস্তু আছে কি করিয়া বলিব? স্তবতাং যে সংসারকে লোকে বুদ্ধির বিজয়ে এত জড়াইয়া ধরে, তাহাকে কিন্তু সে পায় না, একটু বিচার করিলেই উহা বুঝা যায়। ইহা সমস্তই ব্রহ্মজালিকের ইন্দ্রজাল মাত্র, মনের কল্পনায় যেন তাহা রূপ গ্রহণ করিয়া সম্মুখে দৃষ্টিয়া উঠে, কিন্তু আকাশে দৃষ্ট মূর্তি যেমন মেঘের গতির সহিত সেথায় মিলাইয়া যায়, তরুণ ক্ষণে ক্ষণে যাহার রূপ পরিবর্তিত হইতেছে সে সংসারকে সত্য বলিতে পারা যায় কি? ইহা কখন আরম্ভ হইয়াছে আর ইহাই সমাপ্তিই বা কখন হইবে, এবং ইহা বাস্তবিক আছে কি নাই কিছুই জানা যায় না। ক্রমাগত যে চলিতেছে তাহার আবার স্থিতির কল্পনা কিরূপে করিবে? এ সংসার-বৃক্ষ সত্য নহে, কিন্তু সত্যবৎ প্রতীয়মান হইতেছে,—সংসারকে এইরূপ সত্যবৎ দেখা কিরূপে ঘূচিবে? তাই বলিতেছেন—‘অসঙ্গশ্রেণ দৃঢ়েন চিহ্না’—মনের কল্পনা যাহা মন হইতে উদ্ভূত তাহা মন না গেলে যাইবে কিরূপে? তাই ইহাকে ছেদনের জন্য অসঙ্গ শত্রু চাই। ‘আমি ও আমার’ এই যে ভাব ইহাই সঙ্গ, এমন অবস্থা চাই যেখানে ‘আমি’ও থাকে না ‘আমার’ও থাকে না। গীতায় বহু স্থানে বলা হইয়াছে ‘মদ্রি জীবৎ কল্লিতং’—জীবতাব্য কুটস্থ চৈতন্যে কল্লিত হয় মাত্র। প্রাণের চাকল্যে এই জীবতাব্য কুটস্থ উঠে, যদি প্রাণের চাকল্য তিরোহিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে মনের কল্পনা মনেই লয় হইয়া যাইবে। মন থাকিবেই না তো তাহার কল্পনা উঠিবে কিরূপে? তাহা হইলে করিতে হইবে কি? এই বৃক্ষাকার কলেবরের মস্তকের ভাগে সহস্রারদল-কমল অবস্থিত, উহা আজ্ঞাচক্রের উর্দ্ধে। ক্রিয়া দ্বারা প্রাণ স্থির হইলে উহা আজ্ঞাচক্রের উর্দ্ধে স্থিত হয়, তখন যে ইচ্ছারহিত অবস্থা আসে তাহাই ত্রিগুণাতীত অবস্থা। ঐ অবস্থা প্রাপ্ত যোগী মুক্ত, তাহার দেহেন্দ্রিয়াদি সহিত কোন সম্পর্ক থাকে না। উহাই প্রকৃত পক্ষে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া। এই জেনন কার্য সম্পন্ন হয় ক্রিয়া দ্বারা। যে মন দিয়া ক্রিয়া করিবে সেই স্থির হইয়া ইচ্ছারহিত হইবে, তাহার আর দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত যোগ থাকিবে না। এই অসঙ্গ শত্রুই ইচ্ছারহিত অবস্থা। যে যত ক্রিয়া করিবে এবং যাহার মনঃপ্রাণ বত স্থির হইবে ততই সে সঙ্গরহিত হইবে। এই

(সংসার বৃক্ষের মূল—ব্রহ্মাহুসন্ধান)

ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং

যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ ।

তমেব চাত্মং পুরুষং প্রপত্তে

যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসূতা পুরাণী ॥ ৪

সঙ্গরহিত অবস্থা বাড়িতে বাড়িতে দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলেই, পরম পাবন-ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্তি হইবে। উহাই মুক্তি-পদ। স্বপ্নে প্রাণবায়ুর প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ স্থিতি হইলেই পরম স্থিরত্ব ভাবের উদয় হয়। উহাতেই ‘সর্বত্র ব্রহ্মময় জগৎ’ বোধ হয়। ইহাকেই যোগীরা তুর্য্যাবস্থা বলেন ॥ ৩

অর্থঃ। ততঃ (তদনন্তর) তৎ পদং (সেই বৈষ্ণব পদ) পরিমার্গিতব্যম্ (অন্বেষণ করিতে হইবে) যস্মিন্ গতাঃ (যে পদে প্রবিষ্ট হইলে) ভূয়ঃ (পুনর্বার) ন নিবর্তন্তি (সংসারে প্রত্যাবর্তন করে না) ; [কিরূপে অন্বেষণ করিতে হইবে?] তন্ম এব চ (সেই) আত্মং পুরুষং (আদি পুরুষকে) প্রপত্তে (শরণ গ্রহণ করিতেছি—এইরূপ বুদ্ধিযুক্ত হইয়া) যতঃ (যাহা হইতে) [এষা (এই)] পুরাণী (চিরন্তন) প্রবৃত্তিঃ (সংসার প্রবৃত্তি) প্রসূতা (নিঃসৃত হইয়াছে) ॥ ৪

শ্রীভগবৎ। তত ইতি। ততঃ তত্ত্বমূলভূতং তৎ পদং—বস্তু বৈষ্ণব পদং, পরিমার্গিতব্যম্—অন্বেষণ্য। কৌতূহলং? যস্মিন্ গতাঃ—যৎপদং প্রাপ্তাঃ সন্তো, ভূয়ো ন নিবর্তন্তি—ন আবর্তন্তে ইত্যর্থঃ। অন্বেষণপ্রকারমাহ—যত এষা পুরাণী—চিরন্তন, সংসার-প্রবৃত্তিঃ প্রসূতা—বিস্তৃতা, তমেব চাত্মং পুরুষং প্রপত্তে—শরণং ব্রহ্মান ইত্যেবম্ একান্তভক্ত্যা অন্বেষণ্যম্ ইত্যর্থঃ ॥ ৪

বঙ্গানুবাদ। তদনন্তর সেই সংসারের মূলভূত ‘তৎপদং’ সেই বস্তু যাহাকে বৈষ্ণবপদ বলে, তাহার অন্বেষণ করিতে হইবে। তৎপদটি কৌতূহল? যে পদ প্রাপ্ত হইলে পুনরায় আর সংসারে আবর্তন করিতে হয় না। অন্বেষণের প্রশালীটি কিরূপ হইবে তাহাই বলিতেছেন। ‘যাহা হইতে চিরন্তন সংসার প্রবৃত্তি বিস্তৃত হইয়াছে, সেই আদি পুরুষের শরণ গ্রহণ করিলাম’ এইরূপ একান্ত ভক্তির সহিত অন্বেষণ করিতে হইবে—ইহাই তাৎপর্য ॥ ৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—তাহার পর—পদ—অর্থাৎ ক্রিয়া ক’রে তৎ অর্থাৎ কুটস্থ ব্রহ্মের অনুর মধ্য প্রবেশ করিয়া চলে যাওয়া উচিত—যেখানে গেলে ফের ফেরে না পুনর্বার, অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা; তমেব চাত্মং তিনিই আদি পুরুষ কুটস্থের পর যাহাকে দেখা যায় তাহার চরণ অর্থাৎ ক্রিয়াতে ভালরূপে থাকা—যেখান হইতে সকল ভালরূপে মন অস্ত্র বস্তুরে আসক্তিপূর্বক দৃষ্টি করতঃ তরুণ হইয়া যায়—এইরূপেতে প্রকৃষ্টরূপে স্বজন সমুদয় বস্তুর হইয়াছে।—সেই পরমপদ অন্বেষণ করিবার কথা হইতেছে। সেই পরমপদ কি? সংসার ক্ষণভঙ্গর অনিত্য মনে কল্পনা করিলেও আমাদের ইন্দ্রিয়-মন তাহা ধরকার করে না। যেটুকু রস পায় তাহার জন্মই ইন্দ্রিয়-মন লোলুপ হইয়া সংসারকে আলিঙ্গন করিয়া পড়িয়া থাকে। এইজন্য যাহা মনুষ্য রসাল যাহা বাস্তবিকই মধুর সেই রস তাহাকে আশ্বাদন করাইতে না পারিলে

তাহার বিষয়-ভূমিটিতে না। বিষয়ের আসঙ্গ নিবৃত্ত হইবে না। এই জ্ঞান ক্রিয়া করিয়া সঙ্গমুক্ত হইতে হইবে, এই সঙ্গমুক্ত অবস্থায় প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মাণ্যেব হয়। ইহা একটু আশু চেষ্টার কৰ্ম নয় এইজ্ঞান সাধককে স্ববীর্য হইতে হইবে। যাহারা ক্রিয়ায় খুব পরিণাম করেন এবং মন দিয়া ক্রিয়া করেন তাহারা সেই বিষ্ণুর পরম পদকে দেখিতে পান—যোনিমুদ্রায় আকাশের মত এক চক্ষুর প্রকাশ হয়, তাহাই তাহারা সৰ্বদা দেখিতে পান। সেই চক্ষুর অগুর মধ্যে ত্রিলোক, সেই তিন লোকের মধ্যে মর্ত্যলোক, আবার আমি সেই মর্ত্যলোকে। সমুদ্রের মধ্যে আমি ও আমার মধ্যে সমুদ্র এ বড় আশ্চর্য ব্যাপার!! ক্রিয়ার পর অবস্থাই বিষ্ণুর পরম পদ, যাহারা মস্তকে সৰ্বদা থাকেন অর্থাৎ যাহাদের প্রাণ সহস্রারে গিয়া এত স্থির হইয়া যায় যে সেখান হইতে আর তাহাদের নামিতে ইচ্ছা করে না। সেখানে আমিও থাকে না। আমারও থাকে না। ব্রহ্ম তখন স্তম্ভ অগ্নিরূপে সৰ্বব্যাপক, সেই ব্রহ্মে যিনি লীন হইয়া থাকেন, তিনিও সব হইয়া সৰ্বত্রই থাকেন। আত্মা স্থির হইলেই ঈশ্বর, তখন ষট্‌দিক্‌ প্রকাশ পায়। যাহারা মস্তকে সৰ্বদা বাস করেন তাহাই দেবতা, যিনি কুটস্থ ব্রহ্ম থাকেন তিনিই ব্রাহ্মণ। কুটস্থই রাজা, ঋষি, দেবতা; তিনিই সাক্ষরূপে সংস্থিতা, আবার কুটস্থের মধ্যে যে দেবতা তিনিই উত্তমপুরুষ। এইরূপে ক্রিয়া করিয়া মূল্যধার হইতে ব্রহ্মরূপ পর্যন্ত যখন যায় স্থির হয়, তখনই ঐ পরম দেবতার পূজা হয়। যজুর্বেদে ৩১ অধ্যায়ে আছে “পণ্ড্যঃ ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রং তথা লোকান্ অকল্পয়ন”—ইডা-পিঙ্গলা এই দুই চরণ দ্বারা গমন করিতে কবিত্তে ভূমি অর্থাৎ মূল্যধারে গিয়া মস্তক পর্যন্ত স্থির থাকি, স্থির থাকিতে কাণেতে সমস্ত শোনা যায়, দূর শ্রবণ হয়। এই প্রকারে সমস্ত লোক সৃষ্ট হয়। মনন করিলেই স্বজন, মনে না করিলে বস্তুর প্রতি লক্ষ্য থাকে না; স্বতরাং তখন সৃষ্টি হয় না। কুটস্থেতে থাকিয়া যাহারা ক্রিয়া করেন, তাহারা ক্রিয়ার পর অবস্থায় বিস্তাররূপে ব্রহ্মকে অনুভব করেন। এইরূপ ব্রহ্মবিত্তার যাহারা দর্শন করেন তাহাদের নিকট বিভাগ কিছু থাকে না, সব এক হইয়া যায়। ক্রিয়া করিয়া ব্রহ্মপূর মধ্যে প্রবেশ করিয়া যিনি তত্ত্ব হইয়া যান, তাহার আর পুনরাবৃত্তি হয় না। আর সংসারের শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ তাহাকে টানিতে পারে না। মনের সঙ্কল্পও নাই সুতরাং কোন কিছু পাইবার ইচ্ছাও নাই, বুদ্ধি স্থির এই জ্ঞান সে অবস্থা হইতে নামিবার প্রয়োজন বোধও করেন না। কুটস্থের দর্শনের পর এইরূপ ক্রিয়ার পর অবস্থার সাক্ষ্যকার হয়। তিনিই আদি পুরুষ, তাহারই শরণাগত হইতে হইবে। কিরূপে শরণাগত হইবে? তাহার চরণ দুইটি ধরিতে হইবে। সেই চরণদ্বয়ই এই স্থান-প্রদান বাহ্য সৰ্বদা গমনাগমন করিতেছে। এই স্থানের ক্রিয়া যাহারা করেন, তাহারা যখন সেই স্থিরত্ব পদ লাভ করেন, তখনই বিষ্ণুর পরম পদকে তাহারা স্পর্শ করেন। এই পরম স্থান হইতেই পুরাণী প্রবৃত্তি প্রসূত হইয়া থাকে—অর্থাৎ এই পরম স্থান হইতে অনিচ্ছার ইচ্ছা যাহা কিছু সঙ্কল্প বা চেষ্টা হয়, তখনই তাহা পূর্ণ হয়, যাহা মনে করা যায় তখনই তাহা হয়, এইরূপে সমুদ্র বস্তুর স্বজন তথায় আপনা-আপনি হইয়া থাকে। এই মনঃপ্রাণের স্থিরতায় পরিপূর্ণ দৃষ্টি জগৎ শূন্য হইয়া যায়, আবার এই মনঃপ্রাণের স্থিরতায় ব্যতিক্রম ঘটিলেই এই দৃষ্টি প্রপঞ্চের প্রকাশ হয়। মন বহির্গত হইয়া দৃষ্টি প্রপঞ্চে আকৃষ্ট হইয়া তাহাতে বশ হইয়া পড়ে ॥ ৪

(পরম পদ প্রাপ্তির সাধনা)

নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা

অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ ।

দ্বৈতৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ-

গচ্ছন্ত্যমৃতাঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥ ৫ ॥

অর্থঃ । নির্মানমোহাঃ (মান ও মোহশূন্য), জিতসঙ্গদোষাঃ (ইন্দ্রিয়-সঙ্গরূপ-দোষশূন্য), অধ্যাত্মনিত্যাঃ (আত্মজ্ঞানে পরিনিষ্ঠা), বিনিবৃত্তকামাঃ (বিশেষকপে নিবৃত্তকাম) সুখদুঃখসংজ্ঞৈঃ দ্বৈতৈঃ (সুখ দুঃখ রূপ দ্বন্দ্ব হইতে) বিমুক্তাঃ (মুক্ত হইয়া), অমৃতাঃ (অমৃত অর্থাৎ বিবেকী পুরুষগণ), তৎ অব্যয়ং পদং (সেই অব্যয় পদ), গচ্ছন্তি (প্রাপ্ত হন) ॥ ৫ ॥

শ্রীধর । তৎ প্রাপ্তো সাধনাস্তরাণি দর্শয়ন আহ—নির্মানেনিতি । নির্গতো মানমোহো অহঙ্কার-মিথ্যাভিনিবেশো যেভ্যঃ তে । জিতঃ পুঞ্জাদিসঙ্গরূপো দোষো যৈঃ তে । অধ্যাত্ম—আত্মজ্ঞানে, নিত্যাঃ—পরিনিষ্ঠিতাঃ বিশেষকপে নিবৃত্তাঃ কান্যো যেভ্যঃ তে । সুখদুঃখসংজ্ঞায়াং সুখ দুঃখসংজ্ঞানি শীতোষ্ণাভৌনি দ্বন্দ্বানি, তৈঃ বিমুক্তাঃ । অতএব অমৃতাঃ—নিবৃত্তাবিচ্যাঃ সন্তঃ তৎ অব্যয়ং পদং বৈকল্যং গচ্ছন্তি ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ । [তাহার (ভগবানের) প্রাপ্তি বিষয়ে সাধনাস্তর দেখাইয়া বলিতেছেন] —

(১) ‘নির্মানমোহাঃ’—নির্গত হইয়াছে মান, অহঙ্কার, মোহ—মিথ্যাভিনিবেশ বাহ্য হইতে। (২) ‘জিতসঙ্গদোষাঃ’—পুঞ্জাদি সঙ্গরূপ দোষ জিত হইয়াছে যৎকর্তৃক অর্থাৎ সঙ্গদোষ বাহারা জয় করিয়াছে। (৩) ‘অধ্যাত্মনিত্যাঃ’—আত্মজ্ঞানে পরিনিষ্ঠিত অর্থাৎ তাহাতে নিষ্ঠাবান। (৪) ‘বিনিবৃত্তকামাঃ’—বিশেষরূপে নিবৃত্ত হইয়াছে কাম বাহাদের। (৫) ‘সুখদুঃখ সংজ্ঞৈঃ দ্বৈতৈঃ বিমুক্তাঃ’—সুখ-দুঃখের ভেদে বন্দিয়া সুখদুঃখ নামক যে শীতোষ্ণাভি দ্বন্দ্ব, তাহা হইতে যাহারা বিমুক্ত। [অতএব তাহারা] (৬) ‘অমৃতাঃ’—বাহাদের অবিকল নিবৃত্ত হইয়াছে। তাহারা সেই অব্যয় বৈকল্য পদ প্রাপ্ত হন ॥ ৫ ॥

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—মানরহিত অর্থাৎ কেহ আমাকে ভাল বলুক এ ইচ্ছা না থাকে—আমার বলিয়া না জানা—ইচ্ছারহিত—দিদারহিত—সুখ-দুঃখের ইচ্ছা রহিত হইয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া অষ্ট প্রহর—মৃত্যুলোক যাহারা ক্রিয়া করে না—তাহারা ক্রিয়া করে অব্যয় অনিনাশী পদকে পায়; অর্থাৎ ক্রিয়ার পর স্থিতি।—কি প্রকারের ব্যক্তিগণ এই পদ প্রাপ্ত হন, তাহাই এখানে ভগবান বলিতেছেন। প্রথমতঃ মান ও মোহ তাহাদের থাকিবে না, কেহ আমাকে মাগু করুক বা ভাল বলুক এই প্রকারের ইচ্ছা যখন অন্তঃকরণ হইতে মুছিয়া যাউবে। অর্থাৎ নিবহঙ্কার হইতে হইবে। অসত্য বস্তুর প্রতি আনন্দের যে অভিনিবেশ হয় তাহার কারণ অবিকল। অবিকল বা মোহ বশতঃই আমরা ‘আমার পুত্র, আমার গৃহ, আমার ধন’ ইত্যাদির জ্ঞান অহবহঃ ব্যাকুল হই। বৈকল্যপদ প্রাপ্ত পুরুষদের এ সব ভাব থাকে না। পুত্র, দার, ধনাদিতে জীবের যে আসক্তি সেই আসক্তিই দোষ। পুত্র, দার ও ধনাদি বশিত হইয়া

সম্বন্ধ রাখলে এই আসক্তি আসিবেই। এই আসক্তিই পরমপদ লাভের যোগ্য অন্তরায়। এই দোষ রহিত হইতে না পারিলে পরমার্থ চিন্তনে বহু বিষ উপাশ্রিত হয়। এই জগতই “অধ্যাত্ম-নিত্য” হইতে হইবে, অর্থাৎ আত্মজ্ঞানলাভে একান্ত নিষ্ঠা থাকা প্রয়োজন। পরমাত্মার স্বরূপ আলোচনা সর্বদাই করিতে হইবে। কিন্তু শুধু কথাই উচ্চাচার্য হইলে চলিবে না। শুধু পুঁথি পড়িয়া, পুঁথির কথা আলোচনা করিয়াই নিশ্চিত হইলে চলিবে না, বাহ্যতে স্বরূপের বোধ হয় এক্ষণে অষ্ট প্রহর নেশায় নস্ত হইয়া থাকিতে চাইবে। কিন্তু ক্রিয়া মন দিয়া অধিকক্ষণ না করিলে এ নেশা আসিবে না। এই নেশার ভাব যাহার যত বেশী হয়, সে ক্রিয়ার পর অবস্থা সেই পরিমাণে ভোগ করে। এ বড় কঠিন জিনিষ, পরমাত্মার প্রতি অগাধ ঐতি না থাকিলে ক্রিয়া করিবার এ উৎসাহ অধিক দিন স্থায়ী হয় না। *

এইরূপ আত্মজ্ঞানে পরিণিষ্ঠা যাহার যত বেশী অর্থাৎ ক্রিয়া করিয়া যে যত নেশায় থাকে, তাহার তত বিষয়ের অমৃতত্ব নিবৃত্ত হইতে থাকে। এই বিনিবৃত্ত-কাম হইতে শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব ভাবগুলি বিলুপ্ত হয়। সুতরাং যাহারা মৃত অর্থাৎ ক্রিয়া করে না, তাহাদের অজ্ঞানও নিবৃত্ত হয় না, পরমপদও প্রাপ্তি হয় না। সেইজন্য যাহারা অমৃত অর্থাৎ সাংসারিক সুখ-দুঃখের জগৎ যাহারা ব্যাকুল নহেন, তাহারা দিনরাত ক্রিয়ায় লাগিয়া থাকেন, এবং তাহার ফলে অবিনশী পদ অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে স্থিতি তাহাই

* মহাত্মা কবীর সাহেব বলিয়াছেন—

যহ তো ঘর গায় প্রেমকাঁ মাগি অগম অগাধ।

সির কাটে পলডা ধবে লাগে প্রেম সমাধ।

এ তো (এই দেহ, মনুষ্য জীবন) প্রেমের ঘর, কিন্তু সেই প্রেমের গাভী বড় অগম্য, সমস্ত যাতায়াত যায় না। কাবণ সমস্ত বস্তুই চঞ্চল বা গতিশীল, কেবল সেই প্রেমের ঘরে বাইরাণ বাগা অত্যন্ত স্থির, অচঞ্চল না হইলে সেখানে পৌঁছিয়া উপায় নাই। আব তাগ অগাধ অর্থাৎ বড়ই গভীর, তল পায়ো যায় না (ক্রিয়ার পর অবস্থার শেষ কোথায়?) কি করিয়া এই প্রেম লাভ হয়, তাহাই বলিতেছেন—মণ্ডক কাণ্ডিয়া পান্ডা ঠিক না করিলে প্রেম-সমাধি লাগিবে না। দুই দিকের পান্ডা সমান না করিলে হইবে না। যদি কোনটা এবচু উঁচু বা নীচু থাকে তবে তাহাতে অল্প কিছু বস্তু রাখিয়া পান্ডা ঠিক করিয়া নইতে হয়। দাড়ির উপরকার স্থানটা কাণ্ডিয়া দিলে পান্ডা হুট পড়িয়া যায়, এবং দাড়ি তাহার উপর থাকে, তরুণ ইডা পিললার পান্ডা একবার নীচু হইতেছে একবার উঁচু হইতেছে, অর্থাৎ কখনও ইডা চলে, কখনও পিললা চলে। যখন ক্রিয়া করিতে করিতে মণ্ডক নত হইয়া পড়ে এবং তাহাতে কোন বাগ চিন্তার উদবয় না (ইহাই মাথা কাটিয়া পান্ডা ঠিক করা), তখন দুই দিকের পান্ডা ইডা পিললা স্থিতি হইয়া যায়। ইডা-পিললা স্থিতি হইলেই হুমা তব্বে তব্বে চলিতে থাকে, তখনই পরমাত্মার সহিত মনের নিবিড় মিলন হয়, ইহাই প্রেমের সমাধি।

* ছিন পড়ে ছিন উত্তরে নো তো প্রেম ন চোর।

আট পহর লাখা রহে প্রেম ধরাবে দেয়। *

এই এখনই একটু নেশা হইল আবার মণ্ডপের তাগ চলিয়া গেল তাগকে প্রেম বলে না। প্রেম তখনই বলা যায়, যখন অষ্টপ্রহর নেশা সমান ভাবে লাগিয়া থাকে।

(অপূনরায়ত্তি ও পরম ধাম)

ন তদ্ভাসিত্যে সূর্যো ন শাশ্বজো ন পাবকঃ।

যদগ্গা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬

লাভ করেন। অব্যয়পদ—দেশ, কাল, বস্তু দ্বারা বাহ্য পরিচ্ছিন্ন নহে। এক ক্রিয়ার পর অবস্থাতেই দেশ-কালের বা নাম-রূপের টেউ থামিয়া যায় ॥ ৫

অময়। যৎ গতা (বাহ্য প্রাপ্ত হইয়া) ন নিবর্তন্তে (যোগিগণ প্রত্যাবর্তন করেন না), তৎ (তাহাই) মম পরমং ধাম (আমার পরম ধাম)। তৎ (তাহাকে—সেই পরমপদকে) সূর্য্যঃ ন তাস্মতে (সূর্য্য প্রকাশ করিতে পারে না), ন শাশ্বজঃ, ন পাবকঃ (চন্দ্রও পারে না, অগ্নিও পারে না) ॥ ৬

শ্রীধর। তদেব গন্তব্যং পদং বিশিনষ্টি—ন তদ্বিতী। তৎ পদং সূর্য্যাদয়ো ন প্রকাশয়ন্তি, যৎ প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে যোগিনঃ তৎ ধাম—স্বরূপং পরমং মম। অনেন সূর্য্যাদি-প্রকাশ-বিষয়ত্বেন জড়ত্বশীতোষ্ণাদি-দোষ-প্রসঙ্গো নিবৃত্তঃ ॥ ৬

বঙ্গানুবাদ। [সেই গন্তব্য পদ কিরূপ তাহা বিশেষরূপে বলিতেছেন]—সেই পদকে সূর্য্যাদি প্রকাশ করিতে পারে না, যোগিগণ যে পদ পাইয়া সংসারে পুনঃ প্রত্যাবর্তন করেন না, সেই ধামটি আমার পরম স্বরূপ। ইহা দ্বারা সেই পদম ধাম সূর্য্যাদিরও প্রকাশের বিষয় নহে, [অর্থাৎ তাহারও সেই পরম ধাম প্রকাশে অসমর্থ] বলা হইল, ইহাতে জড়ত্ব ও শীতোষ্ণাদি দোষের প্রসঙ্গও নিবৃত্ত হইল ॥ ৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সে বড় এক আশ্চর্য্য জায়গা—যাহা ক্রিয়াশ্রিত ব্যক্তির অনেকই দেখিতেছেন যাহা গুরুবক্তৃগণ্য কিন্তু লোক জনিলে পরিহাস করিবে না জানার দরুণ—সূর্য্যের কিরণ সেখানে নাই—চন্দ্ৰের রশ্মি নাই—অগ্নির দীপ্তি নাই—যেখানে গেলে পর ফের ফেরে না—সেই আমার পরম ধাম অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা।—সে জায়গা খুবই আশ্চর্য্যজনক স্থানই বটে, কিন্তু তাহা কানী, হরিদ্বারের মত স্থানবিশেষ নহে। জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মই, তাহার মন-রূপ উপাধি জগ্মিলে তখন তাহার দেশ-কালের ধারণা জন্মে। এই ধারণা হইতেই দেশ-কালাদির ব্যবধান, তাহা হইতে আবার পৃথক পৃথক স্থান ও বস্তুরূপ পরিণাম দৃষ্ট হয়। ক্রিয়ার পর অবস্থার অন্তঃকরণ বৃত্তি নিরুদ্ধ হইলেই জীব ব্রহ্মের ভেদ ভাব চলিয়া যায়, তখন জীবের স্বরূপে অবস্থান হয়, উহাই ব্রহ্মধাম। তাহা জীবের পক্ষে বড়ই আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার বটে। দেহে আত্মবোধ-বশতঃ যে মন এই বিরাট সংসারকে গড়িয়া তুলিয়াছে এবং তাহার সহিত শত বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আছে, যে সম্বন্ধ কখনও বাইবে বলিয়া জীব কল্পনাও করিতে পারে না—সেই সম্বন্ধ ও বিবিধ নামরূপময় এই জগৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় অন্তঃকরণ নিরুদ্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের প্রকাশও নিরুদ্ধ হইয়া যায়। ঘট যেমন মহাকাশকে খণ্ডিত করিয়া ঘটাকাশ উপাধি গ্রহণ করে, কিন্তু স্বরূপতঃ ঘটাকাশে মহাকাশে কোন ভেদ নাই, তরুণ অন্তঃকরণবৃত্তি

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।

মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ৭

দ্বারা যে আত্মভাবকে মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও তত্তৎ বিষয়রূপে দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল, সেই মনোরূপ ঘটোপাধি বিলীন হইয়া মাত্র, তাহার স্বরূপ প্রকাশ পায়, অর্থাৎ তাহা বাস্তবিক বাহ্য ছিল, তাহাকে তাহাই বলিয়া তখন বোধ হয়। এই অবস্থাকে বিষ্ণুর পরম পদ বলে। এই অবস্থা একবার পাইলে আর স্বরূপচ্যুতি হয় না। জগৎ-ব্রহ্ম একবার ভাঙ্গিয়া গেলে আর সে স্বপ্রদর্শনের পুনরাবৃত্তি হয় না, তখন যোগী সধা জাগ্রত। সেই অবস্থাই ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্নার অতীত অবস্থা। সেখানে আলোকও নাই, অন্ধকারও নাই; চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নি নাই অথচ স্বপ্রকাশ। সেখানে কূটস্থের নক্ষত্ররূপ গুহাতে ক্রিয়ায় অভ্যাসের দ্বারা গমন করিতে পারা যায়। সেখানে দেবতার আকাশ মূর্তিতে উঁকায় ধ্বনিত গান করিতেছেন অমৃতভব হয়। যাহারা ক্রিয়া করেন তাঁহারা এই আনন্দময় স্থানে যাইতে পারেন। প্রথমে প্রাণায়াম দ্বারা অনিল হ্রব হয়, সেই স্থিতিই অমৃতপদ বা ক্রিয়ার পর অবস্থা। তখন সাধকও সেই আনন্দময়ের সতিত এক হইয়া যান। ক্রিয়ার পর অবস্থার পর অবস্থাতে ইহা (আনন্দ) অমৃতভব হয়। তাঁহাকে না জানিতে পারিলেই তাঁহাকে বহুদূরে যেন মনে হয়। যে ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থা অমৃতভব করিয়াছে, সে জানে তাঁহাতেই সমুদ্র এক হইয়া আছে, তিনি সকলের মধ্যে এবং সকলের অন্তর বাহ্যে এক তিনি ছাড়া আর কিছুই নাই। “তদেজতি তন্নৈজতি তদদূরে তদন্তিকে তদন্তরন্ত সর্বশ্চ তদু সর্বশ্চ বাহুতঃ ॥” ৬

অর্থঃ। জীবলোকে (সংসারে) জীবভূতঃ (সংসারী বা জীবরূপে বাহ্য প্রসিদ্ধ) সনাতনঃ (এবং বাহ্য নিত্য) [সেই জীব] মম এব অংশঃ (আমারই অংশভূত); প্রকৃতিস্থানি (প্রকৃতিলীন) মনঃষষ্ঠানি ইন্দ্রিয়াণি (মন বাহ্যদের ষষ্ঠস্থানীয় সেই ইন্দ্রিয়গণকে) [প্রলয়ান্তে] জীবলোকে কর্ষতি (সংসারে আকর্ষণ করিয়া থাকে) ॥ ৭

শ্রীমদ্র। নহ চ ত্বরীয়ং ধামপ্রাপ্তাঃ সন্তঃ যদি ন নিবর্তন্তে, তর্হি “সতি সম্পদ্য ন বিদুঃ সতি নৃশম্ভামহে” ইত্যাদি শ্রুতে: সুসুপ্তি-প্রলয়সময়ে তৎপ্রাপ্তিঃ সর্বেবামস্তীতি কো নাম সংসারী জ্ঞাৎ ইত্যশঙ্ক্য সংসারিণং দর্শয়তি—মমৈবৈতি পঞ্চভিঃ। মম এব অংশঃ যোহয়ম্ অবিভক্তা জীবভূতঃ সনাতনঃ সর্বদা সংসারিত্বেন প্রসিদ্ধঃ। অসৌ সুসুপ্তি-প্রলয়ো: প্রকৃতৌ লীনতয়া, স্থিতানি মনঃ ষষ্ঠং যেবাং তানি ইন্দ্রিয়াণি পুনঃ জীবলোকে—সংসারে উপভোগার্থম্ আকর্ষতি। এতচ্চ কশ্চৈত্রিয়াণাং প্রাণস্ত চ উপলক্ষণার্থম্। অয়ং ভাবঃ—সত্যং সুসুপ্তি-প্রলয়োরপি মৎসংসারং সর্বশ্চাপি জীবনাত্মন্য ময়ি লয়াৎ অশ্রোষ মৎপ্রাপ্তিঃ। তথাপি অবিভক্তাত্মন্য সামুদ্রিকস্য সপ্রকৃতিকে ময়ি লয়ঃ, ন তু তদ্বৈ। তদুক্তং—“অব্যক্তাব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্তি” ইত্যাদিনা। অতঃ চ পুনঃ সংসারায় নির্গচ্ছন্ অবিদ্বান্ প্রকৃতৌ

লীনতয়া স্থিতানি যোপাধিভূতানি ইন্দ্রিয়াণি আকর্ষতি। বিদুষাং তু তদ্ব্যবস্থাপ্রাপ্তে: ন আরম্ভিরিতি ॥ ৭

বঙ্গানুবাদ। [যদি তোমার ধাম প্রাপ্ত হইলে পুনরাবৃত্তি না হয়, তবে “সতি অর্থাৎ ব্রহ্মে ‘সংপদ্য’ সম্পন্ন অর্থাৎ একীভূত হইলেও তাহারা জানিতে পারে না যে আমরা ত একীভূত হইয়াছি”—এই শ্রুতি দ্বারা সুসুপ্তি ও প্রলয় সময়ে তৎপ্রাপ্তি সকলেরই হয়, তবে সংসারী কে থাকিল? এই আশঙ্ক্য সংসারী যে কে তাহা পাঁচটি শ্লোকে বলিতেছেন]—আমার এই যে অংশ যিনি অবিভক্তা দ্বারা জীবভাব প্রাপ্ত তিনি সনাতন অর্থাৎ সর্বদা সংসারী বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই জীব সুসুপ্তি ও প্রলয়কালে প্রকৃতিতে লীন—ইন্দ্রিয়গণকে (মন হইয়াছে ষষ্ঠ বাহ্যদের সেই ইন্দ্রিয়গণকে) পুনরায় জীবলোকে সংসার উপভোগার্থ আকর্ষণ করে। [এই শ্লোকই “ইন্দ্রিয়” শব্দ কশ্চৈত্রিয় এবং প্রাণের উপলক্ষণার্থ ব্যবহৃত]। এই শ্লোকের ভাবার্থ এই—সত্য বটে সুসুপ্তি ও প্রলয়কালে মৎসংসারী মাত্রেবই আমাতে লয় প্রাপ্ত হওয়ার মৎপ্রাপ্তিই হয়, তথাপি অবিভক্ত সামুদ্রিক জীবের প্রকৃতিবিশিষ্ট যে জানি সেই আমাতেই লয় হয়, কিন্তু শুদ্ধ যে আমি সেই আমাতে লয় হয় না। তাই উক্ত হইয়াছে—“অব্যক্ত হইতে সকলেই ব্যক্ত হয়” ইত্যাদি। অতএব পুনরায় সংসারের জন্ত নির্গত হইয়া অবিদ্বান্ বা অজ্ঞানী জীব প্রকৃতিতে লীন ভাবে স্থিত নিজ উপাধিভূত ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করে। কিন্তু বিদ্বান্গণের শুদ্ধ স্বরূপ প্রাপ্তি হেতু পুনরাবৃত্তি হয় না ॥ ৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—আমারই অণুর অংশেতে সব জীবলোক জীব হইয়া শিশু স্বরূপ নিত্যই বর্তমান, কিন্তু পঞ্চৈন্দ্রিয় মন এই ছয়—শরীরের পঞ্চভূত, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার বাহ্যের প্রকৃতি হইতেছে তাহাতেই আত্মাতে আত্মায় না থেকে অর্থাৎ ক্রিয়া না করে—প্রকৃতির গুণের উপর বশীভূত হইয়া, অজ্ঞ বস্তুতে আসক্তি পূর্বক আকর্ষিত হইয়া অর্থাৎ বিষয়ের দিকে মন ইচ্ছার সহিত টেনে উপস্থিত করে।—যদিও সব জীবই শিবরূপ, কারণ সকল ঘেহের মধ্যে সেই ব্রহ্মাণু বহিয়াছেন, যাহার জ্ঞান এই দেহাধির প্রকাশ। সেই ব্রহ্মাণুর প্রতি সক্ষ্য না থাকায় প্রকৃতি মাত্র (দেওক্রিয়, মন, প্রাণ) বোধের বিষয় হইতেছে। নচেৎ ব্রহ্মাণুর পরিবর্তন নাই, পরিবর্তন হয় প্রকৃতিতে। এই প্রকৃতির মধ্যে বস্তুক্ষণ থাকিতে হইবে ততক্ষণ যতদূর আসার শেষ নাই। প্রাণের স্পন্দনই মন। সেই প্রাণ যতদিন চক্ষু থাকিবে ততদিন মনের বহির্গমনাগমন থাকিবেই। এই মনের গমনাগমনই সংসার—জন্মমৃত্যুর অভিনয়। কিন্তু যাহারা ক্রিয়া করিয়া প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়াছেন অর্থাৎ প্রাণের গমনাগমন নিবৃত্ত করিয়া দিয়াছেন, তাহাদের মন আর বিষয়ের দিকে আকর্ষিত হয় না। মাহুষ মরিয়া গেলেও তাহার স্বভাব নষ্ট হয় না। নিম্নিত ব্যক্তির সব সত্ত্ব ও চেষ্টা হৃদয় থাকে, নিম্নভক্তের পর আবার জাগ্রত হইয়া সে যেমন পূর্বকৃত কণ্ঠের অনুসরণ করে, তদ্রূপ জীব মরিবার পর তাহার সমস্ত দেহৈন্দ্রিয়াধির পরমাণু নিজ নিজ অধিষ্ঠাতৃ দেবতার মধ্যে লীন হয় বা প্রসুপ্ত থাকে, সেই জীবের ভোগ করা শেষ হইলে আবার যখন জগতে আদিবার সময় হয়, তখন প্রকৃতিতে লীন ভাবে অবস্থিত ইন্দ্রিয়াদিকে সে আকর্ষণ করে, এবং তদনুরূপ তাহার দেহাধি

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতাস্থরঃ ।

গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥ ৮

হয়। যাহারা কৰ্ম্মাক্ষয়ী অস্ত্র জীব, তাহাদেরই উপরোক্ত অবস্থা হয়, কিন্তু যাহাদের প্রাণ-
শক্তির সহিত মনঃ-শক্তি হইয়াছে, যাহাদের মনে সাংসারিক বাসনার তরঙ্গ থাকে না,
তাহাদের আর পুনরাবৃতি হয় না। প্রাণাপানের গতির সহিত সঙ্কল্প-বিকল্পের বৃদ্ধি বৃদ্ধি
ভাঙ্গিয়া উঠে। ততদিন এই সংসার চক্র বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতে থাকে, তাহার আর বিশ্রাস্তি
নাই। কিন্তু এই জীব ভাব স্পন্দনধর্মী সূত্রবাৎ বহির্গত, তাহা হইলেও এই স্থানের গতি
আরম্ভ হইতেছে, একটি গতিশীল স্থির অবস্থা হইতেই। এই স্থির অবস্থা না থাকিলে কাহাকে
অবলম্বন করিয়া প্রাণের বহির্গমনাগমন হইত? সূত্রবাৎ একটি স্থির অবস্থা আছে এবং সেই
স্থির অবস্থায় ও উর্দ্ধে অগতির গতি যিনি, যিনি পরম শিব, যিনি পুরুষোত্তম, যিনি
জগন্নাথ তিনি রহিয়াছেন। যদিও তিনি অমুপ্রবিষ্ট হইয়া সকলের মধ্যেই আছেন কিন্তু
তাঁহাতে লক্ষ্য না থাকায় তাঁহাকে কেহ অজ্ঞতব করিতে পারে না, সেই পরম স্থির অবস্থাই
নায়াতীত অবস্থা, “যায়া প্ৰেম সমা নিরন্তকুহকং”। সেই পরম ধামই এই সচকল, অচকল
সকল অবস্থারই জননী। তাহার আশ্রয় যে পাইয়াছে—তাহার আর পদাঙ্কন হয় না,
তাহাকে স্বস্থান হইতে চ্যুত হইতে হয় না। চ্যুত হইতে আছে—“অমাপ্রিতানানং বিপন্নবাণাং”
“রোগানশেবানপচংসি তুয়া”—হুম হুই হইলে অশেষ উপদ্রব নাশ করিয়া দ্যুত মা, তোমার
আশ্রয় যাহার। লইয়াছে, তাহাদের কখনও বিপদের সম্ভাবনা নাই। তখন জগজ্জননীর
অকচরী অবিষ্টা আর তাহাকে সংসার ভোগের গুণ আকর্ষণ করিতে পারে না। খাসট
তাঁহার চরণ, সেই চরণ ধরিয়া যে থাকে তাহাকে মা আপনার অঙ্গে—(ক্রিয়ার পর অবস্থা-
রূপ পরমানন্দ ধানে) উঠাইয়া লন ॥ ৭

অস্থর। আশয়াৎ (পুষ্পাদি স্থান হইতে) গন্ধান্ (গন্ধ সমূহকে) বায়ুঃ ইব (বায়ুর
জায়)। গ্রহণ করিয়া। ঈধরঃ (দেহাদির প্রভু জীবাত্মা) যৎ শরীরম্ (যে দেহ) অবাপ্নোতি
(প্রাপ্ত হয়) যৎ চ অপি (ও যে দেহ হইতে) উৎক্রামতি (উৎক্রমণ করে) [তদা তখন]
এতানি (এই ছয় ইন্দ্রিয়কে) গৃহীত্বা (গ্রহণ করিয়া) সংযাতি (গমন করে) ॥ ৮

* যাহা জীবলোকে হয় মনঃ-প্রাণ-শক্তি প্রভৃতি জীব-চাৰ্য্য প্রাপ্ত হয়, কিন্তু তাহাদের দেহাদির ক্ষয়-বৃদ্ধিতে
সেই স্থানীয় বিপন্ন নাই, ইহা দ্বিতীয় অধ্যায়ে বহুবার বলা হইয়াছে। সেই যাহা সমাভ্যাস, কেননা, উহা
ব্রহ্মরূপ সান্নিধ্যই অংশ, সূত্রবাৎ তাহা ব্রহ্ম ব্যতীত অস্ত কিছু নহে। তাহা হইলে এখানে প্রশ্ন উঠিলে ব্রহ্মের
যদি অংশ অস্ত পাকিত্য নয় তাহা হইলে ব্রহ্মের অংশের, সর্বব্যাপিত্ব ও অনন্তত্বের হানি হয়, অথবা ব্রহ্ম অংশ
হইতে পৃথক বস্তু হইলে এক ব্যতীত অস্ত বস্তুও প্রতিব আছে ইহা মানিতে হয়—তাহার এই ভাবে উক্তর দেওয়া
যাইতে পারে যে পূর্বে কেবলমাত্র আহার্য কণা বলা হইয়াছে, এবং পরমাত্মার পরা ও অপরা ভেদে দুই
প্রকারের কণাও বলা হইয়াছে। এখন শক্তিনা হইতে শক্তি যেমন শব্দও বস্তু নহে, তাহাদের সত্তা পৃথক, তদ্রূপ
পদার্থের প্রতি বা শক্তির তাহা হইতে ভিন্ন বস্তু নহে। অতএব মন অংশ জীব ও ব্রহ্মের আভিন্ন অবেদনের
— অবিষ্টা হইতে পারে।

শ্রীধর। তানি আকৃষ্ট কিং কয়োতি? ইত্যাহ—শরীরমিতি। যৎ—যদা, শরীরান্তরং
কৰ্ম্মবশাৎ অবাপ্নোতি, যতশ্চ শরীরাত উৎক্রামতি, ঈধরো—দেহাদীনাং স্বামী, তদা পূৰ্ব্ববশাৎ
শরীরাত, এতানি গৃহীত্বা তচ্ছরীরান্তরং সমাগৃযাতি। শরীরে সত্যপি ইন্দ্রিয়গ্রহণে দৃষ্টান্তঃ।
আশয়াৎ—স্থানাৎ কুস্থমাধেঃ সকাশাৎ গন্ধান্ গন্ধবতঃ স্তম্ভান্ অংশান্ গৃহীত্বা বায়ুঃ বধা
গচ্ছতি তৎ ॥ ৮

বঙ্গানুবাদ। [সেই ইন্দ্রিয়াদি আকর্ষণ করিয়া জীব কি করেন? তাহা বলিতেছেন]
—(জীব) যখন কৰ্ম্মবশে শরীরান্তর প্রাপ্ত হয় এবং যে শরীর হইতে উৎক্রমণ করে, ঈধর
অর্থাৎ দেহাদির স্বামী তখন পূৰ্ব্বশরীর হইতে এই সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে গ্রহণ করিয়া সেই
শরীরান্তর সমাগৃহণে প্রাপ্ত হন (অর্থাৎ শরীরান্তরে প্রবেশ করেন)। শরীর থাকিলেই যে
ইন্দ্রিয় গ্রহণ হয় তাহার দৃষ্টান্ত বলিতেছেন। আশয় হইতে অর্থাৎ কুস্থমাদির নিকট হইতে
গন্ধবিশিষ্ট স্তম্ভ অংশ সকলকে গ্রহণ করিয়া বায়ু যেমন গমন করে, সেইরূপ ॥ ৮

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—যাহা পাচ্ছে, যাহা ছাড়তে—শরীর—হৃদয়েতে ধারণা
করিয়া বিষয়াসক্ত হইয়া ইচ্ছার সহিত—অজানত যেমত গন্ধ লোকের
নাকে হঠাৎ অনুভব হয় কিন্তু কিসের দ্বারায় সে অনুভব হইল তাহা লোকে
প্রণিধান করে না, সে বায়ুর দ্বারা গন্ধ আসিয়াছে, তৌ কোন গন্ধ পরিত্যাগ
করিতেছে ও কোন গন্ধ গ্রহণ করিতেছে—তৎ অস্ত্র বস্তুতে আসক্তি পূর্বক
যাওয়া, ইচ্ছাই তাহার মূলোভূত হইয়াছে, অর্থাৎ চকল মন—আপনাতে আপনি
না থেকে বেড়াতে গিয়ে আপনা হ’তে আপনি আবদ্ধ!!! যেমত পাখী একটি
নদীতীরে পিপাসাশ্রিত হইয়া একটি দাঁড়ের উপর বসিয়া জলপান করিবে
এমত ইচ্ছায় বসিল—দাঁড়ের দুইদিকে দুই কাটা লম্বা উপরে দাঁড় সেই দাঁড়,
এক চোঙ্গার মধ্যে পাখী বসিলেই যেমত জল পান করিতে উজ্জত হইলেন
অমনি ঘুরে গেলেন—জোর করিয়া ছট্‌ফট্‌ করিয়া পুনর্বার উঠিলেন, আবার
জলপান করিতে গিয়া আবার পড়িলেন, এইরূপ করিতে করিতে পাখমারা
এসে অনান্যাসে ধরিয়া লইল—তদ্রূপ সংসারে ইচ্ছাস্বরূপ তৃষ্ণায় আবৃত
হইয়া ইড়া-পিঙ্গলা স্বরূপ দুই কাটীতে বসিয়া ছট্‌ফটানি—কর্মেতে আবৃত হইয়া—
যম এসে ধরলেন।—যিনি জীব নামে পরিচিত তিনি কৰ্ম্মবশে দেহত্যাগ করিবার সময়
স্বপ্নদেহকে গ্রহণ করিয়াই গমন করেন। যেমন বায়ুর সহিত মিলিয়া গন্ধ গমন করে।
আবার যখন দেহী পাপ-পুণ্যাদি কৰ্ম্মের বধাধৰ ফল ভোগ করিয়া তাহার আবার দেহান্তর
গ্রহণের সময় হয়, তখনও তাহার পূৰ্ব্বজন্মান্বিত প্রকৃতির অনুধারী দেহ গঠনের জন্য পূৰ্ব
দেহের ইন্দ্রিয়, মনঃ প্রভৃতিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া জন্মগ্রহণ করে। যে চিরদিন লোককে
হিংসা করিয়াছে, তাহার সেই হিংস্র স্বভাবের অনুরূপ বা পরজন্মে ব্যাঘ্র বা সর্পের দেহ
হইবেই, কারণ মনোময় স্বপ্ন দেহে রক্তমাংসাদি নাই, কেবল ভাবনাময় দেহ। যখন তাহার
সেই স্বপ্ন দেহ স্থল দেহের জন্য স্থল অণুসকলকে আকর্ষণ করিতে থাকিবে, তখন তাহার
ভাবনাময় দেহের অনুরূপ স্থল অণুসকল আকৃষ্ট হইবে। সূত্রবাৎ গত ভয়ে যে যেমন

চিন্তাহরক্ত, তাহার পরম্পরের দ্বৈত তত্ত্বরূপ হইবে। এইজন্য জীবের ভাবময় (স্থল) দেহকে পবিত্র চিন্তা দ্বারা পূত করিতে না পারিলে পরিশেষে তাহার বিষম পরিণাম ভোগ করিতে হয়!! হর্কিসহ বাতনাময় দেহ লাভ করিয়া তাহাকে পূর্বরূপে কর্ণেব ফল ভোগ করিতে হয়। বাহারা বুদ্ধিমান চতুর তাহার জীবের এই হর্গতির বিষয় অবগত হইয়া সাবধান হন, এবং যাহাতে অতঃপরে প্রাপ্তি না হয় তজ্জন্য শুভ কৰ্ম ও শুভ চিন্তা করিয়া থাকেন, তাহাদের আর এই সকল দুঃখ-হর্গতি পাইতে হয় না। বাহারা পরমার্থ চিন্তা করেন না, আত্মা কিছুই বুঝেন না, কেবল ইন্দ্রিয় ভোগে অহরহ তাহারা আত্মঘাতী, তাহাদের মূঢ় যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়।

“অসুখা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃত্তাঃ।

তাংস্তে প্রত্যভিগচ্ছন্তি যে কে চাস্তহনো জনাঃ॥”

দৈশোপনিষৎ।

যে অন্ধকার দ্বারা আচ্ছন্ন আলোকহীন সেই সমস্ত লোক বা ত্তরূপ জন্ম তাহারা প্রাপ্ত হয়। কাহারো? বাহারা আত্মঘাতী আত্মজ্ঞান-বিহীন তাহারা ই মৃত্যুর পর সেই সব অন্ধকারাবৃত্ত নিরয়াহিতে এবং পরে বৃক্ষ-পাষণ্ডরূপে জন্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এই জন্য নিজ নিজ মনকে শুদ্ধ করিবার চেষ্টা না করিলে বড় নিরুপায়!! কেবল আসক্তি, কেবল বাসনা লইয়া উহার বাব বাব দেহকে ছাড়ে ও গ্রহণ করে। লোকে হঠাৎ প্রবহমান বায়ু হইতে গন্ধ পাইল, কিন্তু জানে না কোথা হইতে সে গন্ধ আসিতেছে; এত পড়িয়া শুনিয়া, এত দেখিয়াও আমার বুদ্ধি কেন অসৎ কর্ণে প্রবৃত্ত হয়? বায়ুতে ফুলের গন্ধের মত ঐ পূর্বজন্মের দেহ মন হইতে সেই সুগন্ধ-দুর্গন্ধরূপ শুভাশুভ কৰ্ম্মাসক্তি একত্রে টানিয়া আনিয়াছে। তাই আমি অবশ হইয়া পূর্ব কৰ্ম্মাম্বরূপ যে প্রকৃতি লাভ করিয়াছি, তাহাঃই আদেশ মত চলিতে বাধ্য হইতেছি। এইখানে তুমি একটু ভাবিয়া দেখ, তুমি কি করিবে? তোমার চিত্ত শোধনের জন্য কি উপায় অবলম্বন করিবে? তুমি সংসদ কর, সংশাস্তি অধ্যয়ন কর, সঙ্গুত্তর অবেষণ কর। তুমি নির্জনে বসিয়া যোজন কর, আর ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর, তাহা হইলেই তুমি বল লাভ করিতে পারিবে; তুমি ইন্দ্রিয়সংযমের জন্য চেষ্টিত হইতে পারিবে। তুমি আর দাঁড়ের পাখীর মত মুখ বাড়াইয়া জল পান করিবার আশার একবার এদিকে একবার ওদিকে নুঁকিও না। জীব! তুমি বিষয় তৃষ্ণার ব্যাকুল হইয়া একবার ইড়ায় তোমার প্রাণের প্রবাহ ছুটিতেছে, তখন তুমি বিষয় চিন্তায় জর্জরিত হইতেছ, একবার প্রাণের প্রবাহ পিঙ্গলায় ছুটিতেছে, তখন তুমি নিজায়, আসক্তে, বুঝামোহে কেবল কালক্রয় করিতেছ!! এতদিন যে বিষয়-ভোগ করিলে, তৃষ্ণা কি মিটিল? বিষয়ের প্রতি আসক্তির নেশা কি ছুটিল? এইবার যে তোমার শিরের শমন দাঁড়াইয়া আছে। ওরে ভ্রাতৃ, ওরে উন্নত, এখনও তাহার আশ্রয় গ্রহণ কর, এখনও স্বরণের অন্ত্যাসে প্রবৃত্ত হও, যদি তোর প্রাণের প্রবাহ একবার স্তব্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলেও যে মরণ ভয় হইতে পরিভ্রাণ লাভ করিবে!! ৮

(জীব কিরূপে বিষয় ভোগ করে)

শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনং চ রসনং স্রোণমেব চ।

অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ ৯

অনুয়। অয়ং (এই জীব) শ্রোত্রং (কর্ণ), চক্ষুঃ (চক্ষু), স্পর্শনং (ত্বক্), রসনং (জিহ্বা) ভ্রাণম্ এবংচ (এবং ভ্রাণ) মনঃ চ (এবং মনকে) অধিষ্ঠায় (আশ্রয় করিয়া) বিষয়ান্ (শব্দাদি বিষয় সমূহ) উপসেবতে (উপভোগ করে) ॥ ৯

ত্রীণয়। তাহেব ইন্দ্রিয়ানি দর্শয়ন্, যদর্থঃ গৃহীত্বা গচ্ছন্তি তদাহ—শ্রোত্রমিতি। শ্রোত্রা-দীনি—বাহে ইন্দ্রিয়ানি মনশ্চ অন্তঃকরণম্ অধিষ্ঠায়—আশ্রিত্য, শব্দাদীন্ বিষয়ান্ অয়ং জীব উপভুক্তো ॥ ৯

বঙ্গানুবাদ। [সেই ইন্দ্রিয়গুলিকে দেখাইয়া (নামোচ্চ করিয়া) যেজন্য তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়া গমন করে তাহা বলিতেছেন]—শ্রোত্র, চক্ষু, ত্বক্, জিহ্বা ও নাসিকা এই বাহে-ইন্দ্রিয়গুলি ও অন্তঃকরণ মনকে আশ্রয় করিয়া শব্দাদি বিষয় সকল জীব উপভোগ করে ॥ ৯

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—প্রথমে লোকে শুনে যে ইহাতে বড় মজা—পরে দেখে—পরে ছোঁয়—তৎপরে চাকে—শোঁকে—এসকল কর্ম্মেরই প্রথমে মন চিন্তা বুদ্ধি দ্বির পরতঃ সমুদয় কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষার সহিত আপনায় আসল সেবা ক্রিয়া ছেড়ে উপসেবা অর্থাৎ ফাল্গুতো ভেদ্বির ছায় ক্রিয়ব্ধ্যায়ী ধৌকায় পতিত হয়—এরূপ ধৌকা কত খাইল—কিন্তু আপনি যে খোকা সেই খোকা কত বারই হইলেন।—জীব পূর্ব শরীর হইতে উৎক্রমণ কালে জীব মনঃ ও ইন্দ্রিয় (স্থল শরীর) সহ গমন করে। ঐ বাহেইন্দ্রিয় ও মনকে আশ্রয় করিয়া জীব শব্দ, স্পর্শ রূপ, রস ও গন্ধ প্রভৃতি বিষয় সমূহকে উপভোগ করে। পঞ্চভূত মিশ্রিত এই স্থল শরীরই আমাদের সর্বস্ব নহে। এই স্থল শরীর বিনষ্ট হইলেও সপ্তদশ অবয়বযুক্ত স্থল শরীর তখনও বর্তমান থাকে, জীব উৎক্রমণের সময় ঐ স্থল শরীর লইয়া পরলোকে গমন করেন; আবার জন্ম গ্রহণের সময় ঐ স্থল শরীর সঙ্গে সঙ্গে আসে। স্থল শরীরে প্রাণ মনঃবুদ্ধি সবই থাকে, এইজন্য জীবের পাপ-পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্মের সমস্ত সংস্কার ঐ স্থল শরীরে নিহিত থাকে। এ শরীরও দেখা যায়, কিন্তু স্থল প্রযুক্ত সকলেই দেখিতে পায় না।

এই স্থল ও স্থল শরীর জীবকে বড় ধৌকা দেয়, তাহারাই যেন জীবকে জীবত্ব-ভাবে ভাবিত করার এবং সেইজন্য জীবের বরুণামুস্কানে আগ্রহ জন্ম না। এই যন্ত্রগুলিতে আরু হইয়া জীব বিষয়ের রসাস্বাদ করে, এইজন্য ইহারা যে যে বস্তুকে স্বাদ বোধ করায় জীবও যেন সেই সকল বস্তুকে স্বাদ বলিয়া অনুভব করেন। তাহার ফলে বিষয় ভোগ করিয়া আশা ও আকাঙ্ক্ষা যেন কিছুতেই মিটে না, তাই আসলের সেবা ছাড়িয়া ফাল্গুতো বস্তুর পিছনে সময় নষ্ট করে। কতবার বিষয় ভোগ করিয়া কত দুঃখ পাইতেছে, তবুও আশার স্বপ্ন ভাঙে না। লোকে চেকিয়া শিখে, কিন্তু কতবার জীব কত তাপে ভাপিত হইল, কত কষ্ট পাইল, তবুও

অহং বৈখানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ ।

প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্ ॥ ১৪

বুধা কালক্ষয় হইয়া যায়। জীবিতের ছলে তাঁহারা ঘোর কৰ্ম্মে আপনাকে নিযুক্ত করিয়া পরিশেষে তাঁহারা কৰ্ম্মে আবদ্ধ হইয়া যুক্তি মার্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়েন ॥ ১৩

অনুব্র। অহং (আমি) বৈখানবঃ ভূত্বা (ষষ্ঠরাগ্নি হইয়া) প্রাণিনাং (প্রাণিগণের) দেহম্ আশ্রিতঃ (দেহকে আশ্রয় করি), প্রাণাপানসমাযুক্তঃ (প্রাণ ও অপান বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া) চতুর্বিধম্ অন্নং (চারিপ্রকার খাদ্য—চন্দা, চোণ্ড, লেহু, পেয়—এই চতুর্বিধ খাদ্য) পচামি (পরিপাক করি) ॥ ১৪

ক্রীধর। কিঞ্চ—অহমিতি। বৈখানবঃ—ষষ্ঠরাগ্নিঃ ভূত্বা প্রাণিনাং দেহম্ অন্তঃ প্রবিষ্ট প্রাণাপানাত্ম্যঃ তদুদাপকাত্ম্যং সাহিত্যঃ প্রাণিভিঃ ভুক্তং—ভক্ষ্যং ভোজ্যং লেহ্যং চোণ্ডং চোত চতুর্বিধং অন্নং পচামি। তত্র যৎ দৃষ্টং অবশ্যম্ অবশ্যম্ ভক্ষ্যতে অপূর্ণা—ভক্ষ্যং। যন্তু কেবলং জিহ্বয়া বিলোভ্য নিগীৰ্য্যতে পায়না—তদুদাপ্যং। যজ্জিহ্বায়াং নিক্ষিপ্য রসাস্বাদেন ক্রমশো নিগীৰ্য্যতে দ্রবীভূতং গুড়া—ভক্ষ্যং। যন্তু স্বংষ্ট্রাভিঃ নিক্ষীভ্য রসাস্বাদং নিগীৰ্য্য অবশিষ্টং ভোজ্যতে ইক্ষুদগাদি ভৎ—চোণ্ডমিতি চতুর্বিধোহস্ত ভেদঃ ॥ ১৪

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন—আমি বৈখানব অর্থাৎ ষষ্ঠরাগ্নি হইয়া প্রাণিদিগের দেহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া, [ষষ্ঠরাগ্নির] উদ্দীপক প্রাণ ও অপান বায়ুসহকারে প্রাণিদিগের ভুক্ত—ভক্ষ্য, ভোজ্য, লেহু, চুণ্ড—এই চতুর্বিধ অন্ন পরিপাক করি। তদ্বারা তাহাই ভক্ষ্য বাহ্য দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া ভক্ষণ করা যায়—যেমন পিষ্টকাদি। বাহ্য দ্বারা বিলোভন করিয়া গিলিয়া ফেলিতে হয় তাহাই ভোজ্য—যেমন পান্যাদি। বাহ্য দ্বারা নিক্ষিপ করিয়া রসাস্বাদনপূর্বক গলাধঃকরণ করিতে হয় তাহাই লেহু। যেমন দ্রবীভূত গুড়া। বাহ্য দ্বারা নিগীড়ন করিয়া রসাস্বাদন গলাধঃকরণ করিয়া অবশিষ্ট ফেলিয়া দিতে হয় তাহাই চোণ্ড—যেমন ইক্ষুদগাদি; এই চতুর্বিধ অন্নের ভেদ ॥ ১৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—শরীরে অগ্নিস্বরূপ আমার দেহের মধ্যে প্রাণ আর অপান সমানরূপে আটকে থাকিলেই চতুর্বিধ অন্ন—চন্দা, চোণ্ড, লেহু, পেয়—হজম করি; সেই অগ্নি যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই শরীরে আছে ততক্ষণ লোক জীবিত, জীবন গেলেই সে অগ্নি গেল (মরে গেছে—লোকে বলে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে) কিন্তু এমত রূপ অগ্নি এই শরীরে জাজল্যমান তথাপি ক্রিয়াতে—আত্মচিন্তনে—অনবধান, আগুন দিলেও যদি স্থান অবধান না হয় তবে যাতে খুসি তাতে লাগুক।—ভগবান্ ষষ্ঠরাগ্নিরূপে শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া চতুর্বিধ অন্নের পরিপাক করিতেছেন। কিরূপে পরিপাক করেন? প্রাণ ও অপান এই দুইটি বায়ুর সহিত যুক্ত হইয়া পরিপাক করেন। বাস্তবিক ভোজন একটি সাধারণ কার্য নহে। ভোজনের দ্বারাই জীব পুষ্ট হয়, বল লাভ করে। আধিভৌতিক শরীর যেমন অনাধিভৌতিক পরিপুষ্ট হয়, ইহার সার ভাগও তদ্রূপ আধ্যাত্মিক শরীর পরিপুষ্ট করে—যদি অন্ন পবিত্র হয় ও দেবোদ্যেশে উৎসৃষ্ট হয়।

এই অন্নের ভোজ্য কে? যেমন সর্ব কৰ্ম্মের ফল নারায়ণে অর্পিত হয়, এই অন্নও সেইরূপ পরম দেবতার উদ্দেশে অর্পণ করিতে হয়। সেই অন্ন গ্রহণ করিবার ক্ষমতা তিনি বৈখানবরূপে ষষ্ঠরে বসিয়া আছেন। একবার যেন সে কথা স্মরণ করিয়া প্রতি গ্রাসে তাঁহাকে ষাণ্ডাইতে পারি। দেবোদ্যেশে অন্ন ত্যাগ করিতে পারিলে তাহা একটি পবিত্র যজ্ঞে পরিণত হইতে পারে। তাই মহর্ষি মহু বলিয়াছেন—

“পূজয়েদশনং নিত্যং অত্মাক্ষৈতদকুংসয়ন।

দৃষ্টা হৃদয়েৎ প্রসীদেচ্চ প্রতিদন্দেচ্চ সর্বশঃ ॥”

অন্নই জীবন-ধারণের মূল—এই ভাবে অন্নকে ধ্যান করিবে। অন্নকে নিশা না করিয়া ভোজন করিবে। অন্ন দেখিয়া আনন্দিত হইবে, যদি অন্ন কোন কারণে মনে ভাপ থাকে, তাহাও অন্ন দেখিয়া পরিত্যাগ করিবে। এই অন্ন যেন প্রতিদিন প্রাপ্ত হই—এই বলিয়া অন্নকে বন্দনা করিবে।

প্রতিতে বলিয়াছেন—ভোজ্য বৈখানব অগ্নি, ভোজ্য অন্নই সোম—এই দুইটি মিলিয়াই অগ্নিসোম হয়। এই জগৎ অগ্নিসোমময়—এই প্রকার বাহার দৃষ্টি, তাহার পক্ষে সন্দেহ বলিয়া কিছু থাকে না।

এই প - পক্ষপী অগ্নিতে প্রত্যাহ ভোজ্যরূপ আছতি প্রদত্ত হইয়া থাকে। এই পরমাত্ম-রূপী অগ্নির প্রাণ ও অপানই আজ্যভাগ অর্থাৎ স্মৃত। এই প্রাণাপানরূপ স্মৃত ব্রহ্মাগ্নির মধ্যে ২৪ বন হইতেছে, তাহাতেই আমরা বাচিয়া আছি; সমস্ত কৰ্ম্ম, সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত চিন্তা বাহ্য আমাদের জীবনের দীপা তাহা হইতেই উৎপত্তি হইতেছে। কিন্তু সাবধান! কেবল বিষয় চিন্তায় যদি ঐ হবিঃ ভগ্নীভূত হইয়া যায়, তবে তাহাতে কেবল মাত্র ধুম উঠিবে—কেবল অজ্ঞান-অন্ধকার পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিবে, তিতরের সে প্রজলিত অগ্নির কোন সন্ধান পাওয়া যাইবে না। প্রাণাপানের বর্ষণেই অগ্নি প্রজলিত হইয়া উঠে, ক্রিয়ার দ্বারা এই প্রাণাপানের বর্ষণ হয়, ক্রিয়া পাইয়াও যদি অবধান না হয়, অর্থাৎ মনঃসংযোগ বা একাগ্রতা না হয়, তবে সে অগ্নি কামাগ্নি, ক্রোধাধিরূপে প্রজলিত হইয়া উঠিবে, এবং এই দেহ মনঃপ্রাণ তাহার ইন্ধনের কাজ করিবে। তাই আমরা অগ্নিরূপী পরমাত্মার নিকট আশ্রয়ের মনের বাসনাটি সামবেদের প্রথম মন্ত্র দ্বারা ব্যক্ত করি—

“ওঁ অন্ন আয়াহি বীতরে, গৃণানো হব্যদাতয়ে। নিহোতা সংসি বর্ষিষি।” হে অগ্নে, তুমি আমাদের জীবন যজ্ঞের আছতি গ্রহণের ক্ষমতা এস। তুমি যজ্ঞেশ্বর, জীবন-যজ্ঞের এই প্রাণরূপ হবিঃ তুমি গ্রহণ করিলেই, উহা চিরস্থির পরমানন্দ ধামে প্রবিষ্ট হইতে পারিবে। ঐ স্থির প্রাণ স্থির চিন্তাই দেবতাদের ভক্ষণীয় বা গ্রহণীয়। এতদিন অস্থির চঞ্চল মনঃপ্রাণ দ্বারা কেবল অস্থিরদিককেই ভোজন করান হইয়াছে, দেবতার উপাসনা আছেন। আজ হে অদ্বিকপ ভগবান্, তোমার রূপায় প্রাণ স্থির হইয়াছে, মনঃ স্থির হইয়াছে, এইবার উহা দেবভোগ্য বস্তুরে পরিণত হইয়াছে। তুমি হোতা হইয়া এই আত্মীর্ণ কুশের উপর উপবেশন কর। তুমি হোতা অর্থাৎ যজ্ঞকর্তা—এই প্রাণযজ্ঞের তুমিই কর্তা, তুমি আত্মীর্ণ কুশ অর্থাৎ

সর্ব্বশ্চ চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো

মন্তঃ স্মৃতিজ্ঞানমপোহনং চ ।

বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদো

বেদান্তকৃদেদবিদেব চাহম্ ॥ ১৫

মূলধারের উপরে স্বাধিষ্ঠানে নারায়ণরূপে অবস্থান করিতেছে, তোনাকে দেখিয়া আমি যেন নিজের কর্ত্তব্য বোধ ভুলিয়া যাইতে পারি ।

অগতের একমাত্র কর্ত্তা প্রভুই হইলেন পরমাত্মা তিনিই অগ্নি, আর যাহা কিছু এই ব্যবহারিক জগৎ—একটা সোম বা অন্ন, পবনাত্মা, ভোক্তা বা দ্রষ্টা আর 'ইদং সর্ব্বং' ভোজ্য বা দৃশ্য । এই দ্রষ্টা দৃশ্য বস্তুসমূহ মিলিত না হইবে—তাই এক না হইবে, বস্তুত্বিন জগৎখা কালিকাক্রমে “সব”—কে খাইয়া না খেলিলেন, তত্বত্বিন জগৎ-দর্শন বা লাস্তি-দর্শন খুঁচিবে না ॥ ১৪

অনুয় । অহং চ আমিই) সকল হৃদি (সকলের হৃদয়ে বা বুদ্ধিবৃত্তিতে) সন্নিবিষ্টঃ (প্রবিষ্ট আছি), মন্তঃ (আনা হইতে) স্মৃতিঃ জ্ঞানম্ অপোহনং চ (স্মৃতি, জ্ঞান এবং তাহা-
দের অভাব বা বিলোপ হয়), সর্ব্বৈঃ বেদৈঃ চ (সমস্ত বেদের দ্বারা) অহম্ এব বেদঃ (আমি-ই বেদ) । বেদাংকুং (বেদান্তার্থ প্রকাশক), বেদবিৎ, চ (এবং বেদার্থবেত্তা) অহমেব (আমিই) ॥ ১৫

শ্রীপর । কিঞ্চ সম্প্রাপ্তি । সর্ব্বজ্ঞ—প্রাণিজাত্য, যদি সম্যগন্তর্য্যামিরূপে প্রবিষ্টোহং, ততশ্চ মন্তঃ এব চেতোঃ প্রাণিনাত্রা পূষাভূতার্থব্যবস্থা স্মৃতিভবতি । জ্ঞানক বিবর্ত্তেদ্রব্যসংযোগজ্ঞঃ ভবতি । অপোহনঞ্চ তয়োঃ প্রমোখো ভবতি । বেদৈশ্চ সর্ব্বৈঃ ততঃ-বেদভাবরূপেণ অতনৈব বেদঃ । বেদাংকুং—তৎসম্প্রদায় প্রবর্ত্তকশ্চ জ্ঞানদো গুরুঃ অহমিত্যর্থঃ । বেদবিদেব চ—দ্ব্যর্থবিদপি অহমেব ॥ ১৫

বঙ্গানুবাদ । [আরও বলিতেছেন]—“আমি সকল প্রাণীর হৃদয়ে অন্তর্য্যামিরূপে সম্পূর্ণ-রূপে প্রবিষ্ট হইয়া আছি । অতএব আমি হইতেই (আমি থাকার জন্যই) প্রাণিনাত্রের পূষাভূত বিষয়ের স্মৃতি হয় । আমি হইতেই বিষয়োদ্রয়সংযোগজনিত জ্ঞান হইয়া থাকে । এবং অপোহন অর্থাৎ সেই স্মৃতি ও জ্ঞানের বিলোপ আমি হইতেই হয় । বেদ সকলের দ্বারা বেদ প্রতিপাদ্য) ততঃ দেবতারূপে আমিই বেদ এবং বেদান্তকুং অর্থাৎ বেদান্ত সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক জ্ঞান-দাতা গুরু আমিই, এবং বেদার্থবিদও আমিই ॥ ১৫

আপ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সকলের হৃদয়েতে নিঃশেষরূপে স্থিতি যাহা যোনিমুদ্রায় (গুরুবক্ত গম্য) - তদ্রূপ গলার মাদুলি প'রে অমৃত্রে ঢেঁড়রা পিটিয়ে বেড়াচ্ছেন, বকে বকে । ক্রিয়ার পর অবস্থার যে স্থিতি তাহাও হৃদয়েতে—তাহারই নাম জ্ঞান—যদিশ্রাং সব জানিতে ইচ্ছা কর—তো ক্রিয়ার পর অবস্থায় (স্থিতিতে) থাক কারণ, তখন কোন বিষয়ের ইচ্ছা থাকে না—জানিবারও ইচ্ছা থাকে না—তুমি

ব্যতীত অন্য কোন বস্তুও থাকে না, আর সব যখন এক হইয়া গেল আর সেই এক তুমি হইলে তখন সবই এক হইল । সুতরাং সবই জানা হইল । জানা জানা ক'রে লোকে খুন, সেই জানা—বাহা জানিবার যোগ্য—তাহা ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিলেই জানিতে পারিবে !!! জানা—জানা দুই বস্তু না হইলে হয় না—একজন জানবে আর এক জিনিসকে, ক্রিয়ার পর অবস্থাতে থেকে সব এক হ'য়ে, দুই তখন থাকিল না সুতরাং দুই না থাকিলেই জানিবার অন্ত করা হইল, অতএব বেদান্ত পড়ে শুনে যে অবস্থা প্রাপ্ত হতে হইবে তাহা এক পলভ্যের মধ্যে সমুদয় জানিবার অন্ত করে দেন । ওঁ ওঁ ওঁ তাহা জানিবার—যা জানা উচিত, তাহাও ক্রিয়ার পর অবস্থায় আপনা-আপনি জানিতে পারে । বেদ—বিদ্ ধাতু—জানা, সেই বেদ গুরুরূপা করিলে, অর্থাৎ, তুমি নিজে কৃপা করিলে এক পল ভরের মধ্যে জানিতে পারো । ওঁ এমনত উত্তম বস্তু হইতে লোকে বিমুখ রহিয়াছে—অন্তর্য্যামি-রূপে প্রতি জীবের হৃদয়ে “আমি” অবস্থিত রহিয়াছি । আমি হইতেই সমস্ত প্রাণীর পূষাভূত বিষয় স্বরণ হয়—“যা দেবী সর্ব্বভূতেশু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা” । আমার আমি আছি বলিয়াই জীবের বিষয়ে ক্রিয় সংযোগজনিত জ্ঞান হয় । আমার এই স্মৃতি ও জ্ঞানের অভাবও আমি হইতে হয়—“যা দেবী সর্ব্বভূতেশু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা” । বেদ হইতে সমস্ত দেবতার জ্ঞান হয়, আমিই সর্ব্বদেবময় সূতরাং সর্ব্ববেদের বেদও একমাত্র আমি । এবং সর্ব্ব জ্ঞানের গুরুও আমি । এখন যদি বলা যায় সবই যদি তুমি, তবে এ বক্তব্য তো তোমার এবং এতদ্ব্যতীত কণ্ঠফল ভোগ করিতে যায় কেন ? বাস্তবিক বস্তুতে সর্ব্বভ্রম কালেও যেমন সর্ব্বপণ বস্তুতে থাকে না, তজ্জপ এই কণ্ঠ আমাকে স্পর্শ করে না । অধুর উদগমের যেমন আলোক হেতুমাত্র, তাহার সহিত অধুরের মাধ্যম সঙ্কট নাই, তজ্জপ জীবের কণ্ঠাহরূপ ফলের উদয় হয় আশ্রয় স্থিতি হেতু, নচেৎ কণ্ঠের সহিত আশ্রয় কোন সঙ্কট নাই । কণ্ঠ অজ্ঞানজনিত জীবের ভাব মাত্র, আশ্রয়ে অজ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব—এতদ্ব্যতীত কণ্ঠ ও তজ্জনিত বন্ধন থাকিতে পারে না ।

অন্তর্য্যামিরূপে তিনি যে সকলের হৃদয়ে রহিয়াছেন, তাহা আমরা জানিতে পারি যোনিমুদ্রায় । বাহিরে অস্থি-মাংস-রক্ত-বিনির্ম্মিত এই দেহ-যষ্টি ব্যতীত আর তো কিছুই দেখা যায় না, কেন তবে ঐ অচেতন ইন্দ্রিয়েরা বিষয় অগ্রভব কার্যতে পারে, কেন মন মনন করে—“কেনেবিত্যং বাচমিমাং বহন্তি, চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উদেবো যুর্নাক্ত”—কোন্ দেবতা চক্ষু ও কর্ণকে স্ব স্ব কার্যে নিযুক্ত করেন ? কাহার অভিপ্রায়ে লোকে এই বাক্য উচ্চারণ করিতেছে ? তাহার উত্তরে উপনিষদ্ বলিতেছেন—

“শ্রোত্রস্ত শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্

বাচো হ বাচং স উ প্রাপ্ত প্রাণঃ ।”

তিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র অর্থাৎ কর্ণের শক্তি, তিনি মনের মন, তিনি বাক্যের বাক্য—

কখন-শক্তি, তিনি প্রাণের প্রাণ। শ্রীমদাচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—“শ্রবণেন্দ্রিয়কে সাধারণতঃ নিম্নবিষয় শব্দ গ্রহণ করিতে সমর্থ দেখা যায়, কিন্তু নিত্য অসংহত (নিরবয়ব) সর্বোত্তরস্থ আত্ম-জ্যোতিঃ বিজ্ঞান থাকিলেই শ্রবণেন্দ্রিয়ের সেই বিষয়াভিযুক্ত-সামর্থ্য থাকে, নচেৎ থাকে না।” “আত্মনৈবায়ং জ্যোতিষান্তে”, “তস্তা ভাষা সর্বমিদং বিভাতি”—এই পুরুষ আত্মজ্যোতিঃ দ্বারাই প্রকাশাক্রমে কার্য্য করিয়া থাকে—এই সমস্ত জগৎ তাঁহার দীপ্তিতেই প্রকাশিত হয়। আমাদের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট যিনি পরম জ্যোতিঃ-স্বরূপ বিজ্ঞান রহিয়াছেন, তাহা যোনিমুদ্রা দ্বারা জানা যায়। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে স্থিতি—তাহাও হৃদয়ে হইতেছে, “যতো নির্ঘাতি বিষয়ো বস্মিৎশৈব প্রলীয়তে। হৃদয়ং তদ্বিজানীয়ান্ননসঃ স্থিতিকারণম্॥” এই ক্রিয়ার পর-অবস্থার নামই প্রকৃত-জ্ঞান। কারণ প্রকৃত-জ্ঞানে দ্বৈতভাণ থাকে না, এই ক্রিয়ার পর-অবস্থায় আর কোন দ্বিতীয় বস্তু অস্তিত্ব হয় না, কারণ তখন “ইদং সর্বং” সমস্ত সেই এক অদ্বিতীয়ের মধ্যে আত্মসংগোপন করে, ছায়া তেজের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যায়। ইহাই—“অপোহনং” বাহ্যেন্দ্রিয়ের সংযোগজনিত জ্ঞান সমাধিক জ্ঞানের মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। তখন আর কোন বিষয়ের ইচ্ছা থাকে না। আমিই যে সেই এক অদ্বিতীয়ের সহিত অভিন্ন এ শক্তি-ধারা ক্রিয়ার পর-অবস্থায় পর-অবস্থায় উদয় হয়। ক্রিয়ার পর-অবস্থায় দ্বিতীয়ের বা জ্ঞাতার অভাবে কোন জ্ঞের বস্তু থাকিতে পারে না। সেই অদ্বয় পরমাত্মা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী মিথিল ব্রহ্মাণ্ডের সত্তা-স্বরূপ, এ জ্ঞান অহুমান্য থাকিলেও ইহার প্রত্যক্ষ অস্তিত্ব ক্রিয়ার পর-অবস্থাতেই হয়—ইহাই বেদবিদের অবস্থা। তবে মনে হইতে পারে, সব ভুলিয়া যাওয়াই কি তবে জ্ঞান হইল? আমাদের নিজার সময় বা মস্তিষ্কের বিকৃতি হইলে আমরা যেরূপ সব ভুলিয়া যাই, এ-সে-রূপ ভুলিয়া যাওয়া নহে। এক অখণ্ড অদ্বিতীয় সত্তার মধ্যে এই দৃষ্ট বৈচিত্র্যের—এই নামরূপ তরঙ্গের-আত্ম-সমুদ্রের মধ্যে বা নিজের মধ্যে নিমজ্জন। বাহার্য্য অনবরত জ্ঞান জ্ঞান বলিয়া ভ্যান ভ্যান করে, তাহার জ্ঞানে না তাহাদের এই সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কতটুকুই বা জ্ঞানলাভ হয়? কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে ভূষিতে পারে, সে যখন আবার ক্রিয়ার পর-অবস্থায় পর-অবস্থায় ব্যুথিত হয়—যখন তাহার বাহ্য চৈতন্য সম্পূর্ণ ফিরিয়া আসে না—কিন্তু তখন তাহার জানিবার ও বুঝিবার শক্তি এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়—সে অবস্থা হইতে ইচ্ছা করিলে সে এত জানিতে ও বুঝিতে পারে, বাহ্য জগতের সমুদয় জ্ঞানগর্ভ পুস্তক পড়িলেও তাহা হইবার নহে। বহু অমূল্যমান ও পরীক্ষা দ্বারা যে বাহ্য বস্তুর জ্ঞান লাভ হয় যোগীর সে জ্ঞান মুহূর্ত্ত মধ্যে হইতে পারে। বাহ্য জ্ঞানিলে সমুদায় জানা বাইতে পারে, বাহ্য জ্ঞানিলে এত পৃথক পৃথক ভাবে জ্ঞানলাভের প্রয়োজন হয় না—যে অবস্থা বেদান্তবিদ বহু শাস্ত্র পাঠ করিয়াও লাভ হয় না, সেই জাগ্রৎ-স্বপ্ন-শুশুপ্তির অতীত তুষ্টিবস্থা পলকের মধ্যে সাধকের আনিতে পারে, যদি সাধক আপনায় প্রতি আপনি রূপা করিয়া মন দিয়া সাধনা করেন, বিষয়ের হেয়ত্ব জানিয়া বিষয়-চিন্তা হইতে বিরত হন, তুষ্টি হইতে ইন্দ্রিয়দ্বিগকে ফিরাইয়া লন, প্রাণ ক্রিয়া করিয়া মনঃপ্রাণকে আত্মস্থ করিবার সার্বভৌম প্রাপ্ত হন—তবে “কা চিন্তা মরণে রণে?” ॥ ১৫

(ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ)

দ্বাবির্মো পুরুষৌ-লোকে ক্ষরশচক্ষর এব চ।

ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোহক্ষর উচ্যতে ॥ ১৬

অর্থঃ। ক্ষরঃ, ৮ অক্ষরঃ ৮ (ক্ষর ও অক্ষর) ইর্মো ধৌ (এই দুইটি) পুরুষৌ এব (পুরুষই) লোকে (সংসারে—প্রসিদ্ধ), [তন্মধ্যে] সর্বাণি ভূতানি (সমস্ত ভূত) ক্ষরঃ (নখর), কূটস্থঃ (ভোক্তা চেতন) অক্ষরঃ উচ্যতে (অক্ষর পুরুষ বলিয়া কথিত হন) ॥ ১৬

শ্রীধর। ইদানীং “তদ্ধাম পরমং মম” ইতি বহুতঃ তৎ স্বর্কীয়ং সর্বোত্তমত্বং বর্ণয়তি—দ্বাবিতি ত্রিভিঃ। ক্ষরশচ অক্ষরশ্চেতি দ্বাবির্মো পুরুষৌ লোকে প্রসিদ্ধৌ। তৌ এব আহ—তত্র ক্ষরঃ পুরুষো নাম সর্বাণি ভূতানি—ব্রহ্মাদি-স্থাবরাস্থানি শরীরানি। অবিবেকি-লোকস্ত শরীরবেধেব পুরুষত্বপ্রসিদ্ধেঃ। কূটঃ—রাশিঃ শিলারাশিঃ পর্কত ইব, দেহেবু নশ্বংসপি নির্জিকারতয়া তিষ্ঠতীতি কূটস্থঃ—চেতনো ভোক্তা। স তু অক্ষরঃ পুরুষঃ ইতি উচ্যতে বিবেকিভিঃ ॥ ১৬

বজ্রমুবাদ। [ইদানীং ৭ম শ্লোকোক্ত “তদ্ধাম পরমং মম”—এই শ্লোকোক্ত যে স্বর্কীয় সর্বোত্তমত্ব তাহা তিনটি শ্লোক দ্বারা দেখাইতেছেন]—ক্ষর এবং অক্ষর এই দুইটি পুরুষ জগতে প্রসিদ্ধ আছেন। তাহাদ্বিগকেই (তাঁহাদের সম্বন্ধেই) বলিতেছেন। তন্মধ্যে ক্ষর পুরুষ হইতেছেন সমস্ত ভূতগণ—ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্যন্ত সমস্ত শরীর। যেহেতু অবিবেকি লোকের শরীর সমূহে পুরুষত্বের প্রসিদ্ধি আছে। “কূট” শিলারাশিময় যেরূপ পর্কত (দেহ বিনষ্ট হইলেও পর্কত যেমন শিলারাশিরূপে থাকে) সেইরূপ দেহ বিনষ্ট হইলেও নির্জিকার হেতু যিনি বিজ্ঞান থাকেন—তিনিই কূটস্থ অর্থাৎ চেতন ভোক্তা। সেই চেতন ভোক্তাকেই বিবেকিগণ অক্ষর পুরুষ বলিয়া থাকেন ॥ ১৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—জুই পুরুষ এই লোকের মধ্যে, এক ক্ষর এক অক্ষর—অল্প দৃষ্টিতে আসক্তিপূর্বক যিনি রহিয়াছেন তাঁহার নাশ আর আত্মার থাকিয়া যিনি কূটস্থেতে রহিয়াছেন তিনি অক্ষর অর্থাৎ অবিনাশী; তন্নিমিত্তে বস্তু লোক সব নাশমান, কেবল কূটস্থেতে বাঁহারী অষ্টপ্রহর রহিয়াছেন তাঁহারাই অবিনাশী-বাহার স্থিতি ত্রিকুটিতে, বাহাকে কেহ দেখিতে পায় না, কেবল গুরুবক্ত গম্য—গুরুর চক্ষের দ্বারায় দেখিতে পাওয়া যায়—না দেখাইলে দেখিতে পাওয়া যায় না—ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত আচার্য্য শঙ্কর বাহা বলিয়াছেন—তাঁহার সেই ব্যাখ্যার অনুবাদ এখানে দিতেছি। “ভগবান্ দৈবঃ—বিনি নারায়ণ এই নামে প্রসিদ্ধ, সেই পরমাত্মা এক হইলেও তদীয় উপাধির নানাব আছে। ‘আদিত্যগত যে তেজ অখিল জগৎকে ভাসিত করে’—এই সকল শ্লোক দ্বারা সংক্ষিপ্ত ভাবে বিভূতির বর্ণনা করা হইয়াছে, এক্ষণে সেই ক্ষর এবং অক্ষর এই দ্বিবিধ উপাধি দ্বারা প্রবিভক্ত বলিয়া প্রতীত অথচ বাস্তবিক নিরুপাধিক যে ব্রহ্ম তাঁহারই প্রকৃত স্বরূপ নির্দ্বয়ণের দ্বন্দ্ব পরবর্তী শ্লোকগুলির আবৃত্তি করা হইতেছে। অতীত এবং অব্যবহিত পূর্ববর্তী

অধ্যায়ে যাহা কিছু বলা হইয়াছে, সেই সকল পদার্থকে তিন প্রকারে ভাগ করিয়া দেখাইতেছেন যে—পুরুষ দুই প্রকার। এই সংসারের পুরুষ বলিলে দুই প্রকার রাশিতে বিভক্ত দুই জাতীয় পদার্থ বুঝা যায়। এক প্রকার হইতেছে “ক্ষর” বাহ্য ক্ষরিত হয় অর্থাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, আর এক প্রকার পুরুষ বাহ্যকে “অক্ষর” বলা যায়। এই অক্ষর ক্ষর-রাশি হইতে বিপরীত পুরুষ, অর্থাৎ ইহাই ভগবানের মায়াক্রিয়া এবং এই অক্ষরই ক্ষর নামক পুরুষের উৎ-পত্তির পক্ষে বীজস্থানীয় কারণ। অনেক সংসারী জীবের এবং সংসার-সমূহের ইহাই একমাত্র আশ্রয়। কে নে ক্ষর এবং কেই বা সে অক্ষর, তাহাই ভগবান্ স্বয়ং বলিতেছেন যে, “ক্ষর” এই শব্দটির অর্থ সর্বভূত অর্থাৎ সমস্ত বিকারজাত বস্তুই ক্ষর। কূটস্থ যে পুরুষ, তাহাই অক্ষর শব্দের প্রতিপাদ্য অর্থ। কূটস্থ এই শব্দটির অর্থ এই—কূট শব্দের অর্থ রাশি; যিনি রাশির ভ্রাতৃ অপর্যবর্তনশীল হইয়া অবস্থিতি করেন, তাহাকেই কূটস্থ বলা হয়। অথবা কূট শব্দটির অর্থ মায়ী, বন্ধনা, জিজ্ঞাসা, কুটিলতা। সংসারের অনন্ত বীজস্বরূপ মায়াক্রিয়ার যিনি আশ্রয় এই কারণেও তিনি অক্ষর বা অবিনাশী।”

শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্যের মতে তাহা হইলে ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ কি হইলেন? কার্যোপাধিকৃত যাহা ভৌতিক ও বিনাশ্য পদার্থ—তাহাই ক্ষর, এবং কার্যোপাধিকৃত অবিনাশ্য মায়ী শক্তিই অক্ষর, পুরুষ। শ্রীশ্বর বলিলেন—ক্রমাদি স্থাবরাস্ত্র যে সমস্ত শরীর, যাহাকে অবলম্বন করিয়া চৈতন্যের প্রকাশ হয়, সেই ব্যক্তাবস্থার শরীর ক্ষর পুরুষ। আর দেহ বিনষ্ট হইলেও যিনি জ্ঞানমান দাঁকন, তিনি কূটস্থ অর্থাৎ চেতন ভোক্তা। এখন দেখা যাক—এই চেতন ভোক্তা অত্যন্ত কাপণ ও ব্যক্ত শরীররূপ কার্য কিরূপে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম-সত্তা হইতে উদ্ভূত হইল। আমাদের স্মৃতির চারিটি ভূমিকা আছে—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়া। আর একটি অবস্থা আছে তাহাকে বোগীয়া অতিতুর্য্যাবস্থা বলেন। যাহা হউক সাধকদিগকে স্মৃতির এই নিম্নভূমি হইতে উচ্চ, উচ্চতর ও উচ্চতম ভূমিতে উত্তোলন করাই যোগ সাধনের উদ্দেশ্য। স্মৃতি যতক্ষণ উচ্চতর ভূমিতে উত্তোলিত না হয় ততক্ষণ আমাদের পশুভাব, জীবভাবের পরিবর্তন হয় না। সর্বাধিক প্রজ্ঞা ব্যতীত কেহ দেবভাব বা শিবভাব পাইতে পারেন না। গীতার ব্যাখ্যায় পূর্বে বলা হইয়াছে জীব পরমাত্মার সহিত এক হইয়াও যেকোন ভাঁহা হইতে প্রাণ-প্রবাহের মধ্যস্থিয়া জাগ্রদবস্থায় বা স্থূল শরীরে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ঠিক বিপরীত মুখেই ইহাকে আবার স্বস্থানে দাঁব বেড়ে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইবে। এই প্রত্যাবৃত্ত হইবার পথানুসরণকেই সাধনা বলে। প্রথমতঃ জাগ্রৎ ভূমিকা—স্থূল দেহ, পরে স্বপ্নভূমিকা বা স্পন্দদেহ, পরে সুষুপ্তি বা কারণ দেহকে অতিক্রম করিয়া সাধককে চতুর্থ ভূমি বা তুরীয়াবস্থাতে ফিরিয়া আনিতে হইবে। স্থূল দেহে চৈতন্য সঞ্চার হইবার কালে স্পন্দ ও কারণ দেহে চৈতন্য সঞ্চারিত আছেই বুঝিতে হইবে। যখন স্থূল শরীরে এই চৈতন্য প্রকাশিত থাকে, তখন তাহাকেই আনন্দা জাগ্রদাবস্থা বলা। এই স্থূলদেহেই চৈতন্য—তাহাই প্রকৃত পক্ষে জ্ঞাতাত্মা—ইনিই অন্নমর কোথের বাসন; ইহাই অহংকার। এই চৈতন্য দেহেই অহং-জ্ঞানাত্মা জীব, স্থূল-দেহের ভোক্তা, এই স্থূল জগৎ ও স্থূল ভোগ ভাতা ও জড় উভয় মজুর পড়ে না। এই জড় হত্যাকে আশ্রয় স্থূল ভাব বা জড়ভাব দাঁত যায়। এই স্থূল ভাব বা জড়ভাব অত্যধিক মাত্রায় থাকিলে

মহুস্তের পশুত্বে প্রত্যাবৃত্ত হওয়াও কিছু মাত্র বিষমজনক ব্যাপার নহে। এই ভাব হইতে জীব যখন আধ্যাত্মিক উচ্চতরে আরোহণ করিতে প্রবৃত্ত করে, তখন সেই নিম্ন শ্রেণীর সাধকের ভাবকেই তত্তে “পশাচার” বলা হইয়াছে। এই পশাচার অন্তর্ধান হইতেই ভূতাত্মা জীবাত্মার মধ্যে প্রবিষ্ট বা নিমজ্জিত হয়। এই জীবাত্মাই পরমাত্মার কিরণ, ইহাই শুদ্ধ “অহং” রূপে কারণ শরীর, স্থূল শরীর ও স্থূল-শরীরকে প্রাণময় করিয়া তুলে। স্থূল ও কারণ-শরীরই ইহার বাহন অর্থাৎ এইখানে জীবাত্মাকে জ্যোতিঃরূপে (তৈজস) প্রত্যক্ষ করা যায়। এই কিরণ স্থূল শরীরে আপতিত না হইলে স্থূল-শরীরাত্মিনি “অহং” বিলুপ্ত হইয়া যায়, যেমন যন্ত্রে স্থূল শরীরে অভিমানে থাকে না। স্থূল, স্থূল, কারণ দেহ—এ সমস্তই প্রপঞ্চ। প্রপঞ্চাতীত আত্মা যখন এই সকল স্তরে (condition) প্রাণময়রূপে (স্থূতাত্মা) অবতরণ করেন, তখনই এই কারণ, স্থূল ও স্থূল দেহে প্রাণ সঞ্চার হয় ও সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল দেহে চৈতন্যের সঞ্চার হয়। এই প্রাণই মনের জনকস্থানীয়। “মনোনাথস্ত মাকৃতঃ”—এই স্থূতাত্মাই জীব, ইহাকেই বেদান্ত মতে চিদ্রাস বলা হয়। এই স্থূতাত্মাই স্বাসরূপে জীবের জীবন। এই জড় ফিরিবার পথে বোগীয়া এই স্বাস-প্রশাসকে দৃঢ় ভাবে অবলম্বন করিয়া থাকেন। যেমন তুষের মধ্যে চাউল আচ্ছাদিত থাকে, তজপ এই স্বাসের মধ্যে প্রত্যগাত্মা আচ্ছন্ন থাকেন। চাউলে তুষ থাকিলে তবে আবার তাহার অন্তর্য্যাস হইয়া থাকে, তুষ বাহির হইয়া গেলে আর অন্তর্য্যাসপতি হইতে পারে না, তজপ যতক্ষণ স্বাস-প্রশাস থাকে, ততক্ষণ তাহার বাসনা ও কর্ম এবং কর্মফলভোগের জড় জন্ম-মরণাদি হয়। সাধনের দ্বারা এই স্বাসের ক্ষয় হইয়া গেলে যাহা অবশিষ্ট থাকে—তাহা জন্ম-মরণের অতীত অবস্থা। এই স্থূতাত্মা প্রাণ সখকে প্রায়ো-পনিবেদ আছে :—

“প্রজ্ঞাপতিশ্চরসি গর্ভে, তমেব প্রতিজ্ঞায়সে।

তুভ্যং প্রাণঃ প্রজ্ঞাস্থিমা বলিঃ হরতি যঃ প্রাণৈঃ প্রতিতিষ্ঠসি ॥”

হে প্রাণ! তুমিই প্রজ্ঞাপতি হইয়া গর্ভে বিচরণ কর এবং মাতাপিতার অমুরূপ বা পূর্ণ-কর্ণের অমুরূপ হইয়া জন্মগ্রহণ কর। হে প্রাণ! যে তুমি প্রাণসমূহের সহিত অবস্থান কর, তোমার উদ্দেশে ইহার সকলে বলি-উপহার প্রদান করিয়া থাকে।

“যা তে তনূর্কাচি প্রতিষ্ঠিতা, যা শ্রোত্রে, যা চ চক্ষুষি।

যা চ মনসি সন্ততা, শিবাং তাং কুরু মোৎক্রমীঃ ॥”

হে প্রাণ! তোমার যে তনু বাক্যে প্রতিষ্ঠিত আছে, এবং যাহা শ্রোত্রে ও চক্ষুতে আছে, আর যাহা মনেতে সঙ্কল্প-ব্যাপারাদি দ্বারা নিয়ত ভাবে রহিয়াছে, সেই তনুকে শিব অর্থাৎ প্রশান্ত কর, উৎক্রান্ত হইও না অর্থাৎ দেহ হইতে বিহীন হইও না। কারণ প্রাণ স্থির হইলে উহা অন্তর্য্যাস হইতে পারে না। ছান্দোগ্যে আছে জ্ঞানীদেব প্রাণ উৎক্রমণ করে না।

“প্রাণশ্চেদং বশে সর্কং জিহ্বিবে যং প্রতিষ্ঠিতম্।

মাতের পুত্রান রক্ষত শ্রীশ প্রজ্ঞাঞ্চ বিদেহি ন ইতি ॥”

ত্রিলোকে যাহা অবস্থিত আছে, এ সমস্তই প্রাণের বশীভূত। হে প্রাণ! মাতা যেরূপ

পুত্রগণকে রক্ষা করেন, সেইরূপ আমাদের রক্ষা কর, এবং আমাদের সম্পদ ও হিতবুদ্ধি বিধান কর।

“আত্মন এষ প্রাপ্যো জায়তে। যথৈণা পুরুষে ছান্না, এতস্মিন্নেতদ্বাততং, মনোহধিকৃতেনা-
য়াত্যস্মিঞ্জীরে ॥” আত্মা বা পরমেশ্বর হইতে এই প্রাণ জন্ম লাভ করে। পুরুষ-দেহে
যে রূপ ছান্না সমুৎপন্ন হয়, সেইরূপ এই প্রাণও আত্মাতে আতত বা অমুগত থাকে, এবং মনঃ-
সম্পাদিত কোষাদি দ্বারা এই স্থূল শরীরে আগমন করে।

প্রত্যগাত্মা চিন্মাত্র—তিনিই কুটস্থ, জীবাত্মা হ'বারই কারণ মাত্র। এই চিৎকণ প্রত্য-
গাত্মাও শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তবসাব। এই চিৎকণ যে কত তাহার সংখ্যা নাই। এই চিৎকণগুলিই—
“একোহহং বহু আত্ম”-এর বহু। কিন্তু বহু হইয়াও উহা ঐ এক অদ্বিতীয়ের সহিত সর্করা
যোগ-যুক্ত। এই চিন্মাত্র পুরুষই অনন্ত চিদাকাশের বক্ষে প্রতিনিয়ত ছুটিয়া উঠিতেছে। সেই
চিদাকাশই অব্যক্ত পরব্রহ্মের কতকটা ব্যক্ত ভাব। যেন শিবের সহিত শিবানী মিলিত।
সেই অব্যক্ত ভাবকে কেহই আয়ত্ত করিতে বা বুঝিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু সেই ব্রহ্মযুক্ত
আত্মাশক্তি হইতে -

“সচ্চিদানন্দ-বৈভবাং সকলাং পরমেশ্বর্যং।

আশীজ্জিজ্ঞাক্তো নানো নাদাদ্ বিন্দুসমুদ্ভবঃ ॥”

সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মযুক্ত আত্মাশক্তি হইতে যে নাদ (মহৎ) উৎপন্ন হইয়াছে, সেই নাদ হইতে
বিন্দুর (অঙ্কুর তবের) উৎপত্তি হয়।

“বিন্দুঃ শিবাত্মকস্তর বীজং শক্ত্যাশ্রকং শ্রুতম্।

তথোর্থোণে ভবেন্নাদন্তোভ্যো জাতান্নিশক্তবঃ ॥”

বিন্দু শিবাত্মক, বীজ শক্ত্যাশ্রক ও নাদ শিব-শক্ত্যাশ্রক। এই বিন্দু, বীজ ও নাদ হইতে
ত্রিশক্তি—জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তি অর্থাৎ রূপ, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর উৎপত্তি হইয়াছে।

এই চেতন চোক্তা পুরুষই চিৎকণ। ইনিই অদ্বৈতমাত্র পুরুষ “জ্যোতিষিবাধ্বমকঃ”—
ধূমহীন জ্যোতিঃব আয়। ইনিই অন্তরাত্মা।

“অদ্বৈতমাত্রঃ পুরুষোহন্তরাত্মা

সদা জনানাং হৃদয়ে সংনিবিষ্টঃ।

তং বাচ্ছরীরং প্রবৃহৎ

মুগ্ধাদিবেদীকাং ধৈর্যোণ ॥” কঠঃ উঃ

অদ্বৈতমাত্র পুরুষ যিনি অন্তরাত্মা (জীবাত্মার আত্মা), গিনি জনগণের হৃদয়ে সদা সন্নিবিষ্ট,
তিনি শরীরের সহিত সংলিপ্ত রহিয়াছেন। মুগ্ধা হইতে যেমন দেবীকা পৃথক করা যায়,
সেইরূপ ঐ পুরুষকে স্বীয় শরীর হইতে পৃথক করিয়া দেয়া যায়।

পরে ঐ চিদংশও এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের মধ্যে যেন ডুবিয়া যায়। কারণ অসংখ্য ঘণ্টে একই

(পরমাত্মাই পুরুষোত্তম বা পরমেশ্বর)

উত্তমঃ পুরুষস্তৃত্বঃ পরমাভ্যুত্থাদাহতঃ।

যো লোকত্রয়মাবিশ্ত বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ১৭

স্বর্ঘ্যের অসংখ্য প্রতিবিম্ব পড়ে, অসংখ্য ঘণ্টাপাখির বিনাশের সহিত ঐ সকল চিদাভাসগুলির
কোন অস্তিত্ব থাকে না। তখন কেবল একই বর্তমান থাকে; এক বলিবারও কেহ থাকে না।

‘সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্’—(ছান্দোগ্য)। ইহাই মায়ার বা
চিৎকণের আত্ম-বিলোপন। যে খেলা আরম্ভ হইয়াছিল, সে খেলা তুরাইয়া গেল। ইহাই
কৈবল্যাবস্থা। যোগশাস্ত্রে আছে—“প্রসংখ্যানেনৈপ্যকুসীদন্ত সর্কথা বিবেকখ্যাতেধর্মমেষঃ
সমাধিঃ।” প্রসংখ্যানে বা বিবেকজ্ঞানেও বিরাগযুক্ত হইলে সর্কথা বিবেকখ্যাতি হইতে
ধর্মমেষ-সমাধি হয়। “ততঃ ক্লেশ-কর্ম নিবৃত্তিঃ”। এই ধর্মমেষ-সমাধি হইতে অবিদ্যাদি
ক্লেশ সকল মূলের সহিত নষ্ট হয়। পুণ্য ও অপুণ্য কর্মশায় সকল সমূলে হত হয়। ক্লেশ-
কর্মের নিবৃত্তি হইলে বিদ্বান্ জীবিত থাকিয়াও বিমুক্ত হন।

তাই পুণ্যপাদ লাহিড়ী মহাশয় ব্যাখ্যায় বলিলেন—পুরুষ দুই প্রকার। যাহাদের আসক্তি
পূর্নক বিষয়াদিতে দৃষ্টি রহিয়াছে, তাহারা দেহ-সম্বন্ধী বহুজীব, তাহাদের চৈতন্যমাত্র ভূতাত্মায়
পর্যাবসিত, তাহারা ইচ্ছা মৃত্যুর চরকীতে চড়িয়া বন্ বন্ করিয়। ঘুরিয়া মরিতেছে, আর
যাহাদের দৃষ্টি কুটস্থে নিবদ্ধ, তাহাদের মন দেহ-সম্বন্ধ হইতে উখিত হইয়া সেই প্রত্যগাত্মায়
নিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহাদের জীব অর্থাৎ মন প্রত্যগাত্মার সহিত মিলিত হইয়া পরে পরমাত্মার
সহিতও মিলিয়া যাইবে—এই জ্ঞত তাহারা অবিদ্যার পদ প্রাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং তাহারা
স্বয়ং অক্ষরবৎ হইয়া গিয়াছে। আর তাহাদের দেহে আত্মবোধ নাই, তাহাদের জিকৃষ্টিতে
পরম স্থিতিলাভ হইয়া গিয়াছে। তাহারা অভয় ও অমৃত পদ লাভ করিয়াছে ॥ ১৬

অর্থঃ। অতঃ তু (ঐ দুই প্রকার [ক্ষর ও অক্ষর] পুরুষ হইতে ভিন্ন) উত্তমঃ পুরুষঃ
(উত্তম পুরুষ) পরমাত্মা ইতি উদাহৃতঃ (পরমাত্মা বলিয়া কথিত হন), যঃ (যিনি) ঈশ্বরঃ
অব্যয়ঃ (ঈশ্বর ও অব্যয়) লোকত্রয়ম্ আবিশ্ত (লোকত্রয়ে প্রবিষ্ট হইয়া) বিভর্তি (সকলকে
পালন করিতেছেন) ॥ ১৭

ঈশ্বরঃ। যদর্থম্ এতৌ লক্ষিতৌ তমাহ—উত্তম ইতি। এতাব্য্যং ক্ষরাক্ষরাভ্যাম্ অতঃ
—বিলক্ষণঃ তু উত্তমঃ পুরুষঃ। বৈলক্ষণ্যেনৈব আহ পরমশ্চারণে আত্মা চেতি উদাহৃতঃ—
উক্তঃ প্রতিভিঃ। আত্মত্বেন ক্ষরং—অচেতনাদ্ বিলক্ষণঃ পরমত্বেন অক্ষরাজেতনাদ্ ভোক্ত-
বিলক্ষণঃ ইত্যর্থঃ। পরমাশ্রয়ণেনৈব দর্শয়তি—যো লোকত্রয়ম্ নতি। য ঈশ্বরঃ—ঈশ্বরশীলঃ
অব্যয়শ্চ—নির্বিকারঃ এব সন্ লোকত্রয়ম্ স্তব্ধং আবিশ্ত বিভর্তি—পালয়তি ॥ ১৭

বঙ্গানুবাদ। [যে জ্ঞত ক্ষর ও অক্ষর পুরুষদ্বয় লক্ষিত হইলেন তাহা বলিতেছেন]—
এই ক্ষর ও অক্ষর হইতে বিলক্ষণ অতঃ একটি পুরুষই উত্তম পুরুষ। তাহার বৈলক্ষণ্য কি
তাহা বলিতেছেন যে তিনি পরমাত্মা (তিনি পরম এইরূপ আত্মা) বলিয়া প্রতিষ্ঠিত কথিত
হইয়াছেন। তিনি আত্মা বলিয়া অচেতন ক্ষর হইতে বিলক্ষণ, আর পরমত্ব হেতু তেজা

অক্ষর পুরুষ হইতেও বিলক্ষণ এই তাৎপর্য। তাঁহার পরমাত্মত্বই দেখাইতেছেন যে, সেই ঈশনশীল ঈশ্বর অব্যয় এবং নির্মিত্য হইয়াও লোকত্রয়ের হৃদয়ে আবিষ্টি হইয়া (প্রাণিমাত্র কেই) পালন করিতেছেন ॥ ১৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সেই কূটস্থ দেখিতে দেখিতে পরে এক উত্তম পুরুষ দেখিতে পায়—যাঁহাকে পরমাত্মা শাস্ত্রে কহে, যিনি স্বর্গ মর্ত পাতাল ত্রিভুবন যাহা এই শরীরের মধ্যে (ব্রহ্মজুষ্ঠ হইতে নাভি পর্যন্ত সপ্তপাতাল, নাভি হইতে কণ্ঠ পর্যন্ত সপ্তদীপা বসুধরা পৃথিবী মর্তলোক, কণ্ঠ হইতে ব্রহ্মরক্ষ পর্যন্ত সপ্ত স্বর্গ) ইহাতে প্রবেশ করে চামড়ার জামা পরে আপনার ভরণ পোষণ বিশেষরূপে অর্থাৎ যাহার মন যাহা খাইতে ইচ্ছা হইতেছে সে খাইতেছে—তিনি অব্যয় অবিনাশী, কারণ সূক্ষ্মরূপে সর্বব্যাপী, তদ্যতীত অস্ত্র কোন বস্তু থাকিলে তবে পরিবর্তন হইত, যখন সবই এক তখন নাশ কার—তিনিই ঈশ্বর—কর্তা জীবস্বরূপ সর্বত্রোত্তে সব করিতেছেন অথচ কিছুই করিতেছেন না সূক্ষ্ম ব্রহ্মরূপে—করাকার কেবল স্থলরূপের জানিবে তাহা নিত্য নয়। ওঁ।—“হিরণ্যগর্ভ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্ত জাতঃ পতিব্রেক আসীৎ”—হিরণ্যগর্ভ কূটস্থই সর্বাগ্রে দেখা যায়, তাহা হইতেই সমস্ত ভূত জাত, তিনি সকলের একমাত্র পতি অর্থাৎ সকলের সৃষ্টিকর্তা। এই হিরণ্যগর্ভ কূটস্থের মধ্যেই পুরুষোত্তম রহিয়াছেন, কূটস্থ দর্শন করিতে করিতে তাহার মধ্যেই উত্তম পুরুষকে দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তমপুরুষের রূপ শরীরেরই মত, অর্ন্তমাত্র জ্যোতিঃস্বরূপ যাহা ক্রম মধ্যে দেখা যায়, আর চুলের এক হাজার ভাগের এক ভাগ, তিনিই জীব সুব্রাহ্মণ্যের মধ্যে আনিতোছেন ও যাইতেছেন, ও অত্যন্ত সূক্ষ্ম নক্ষত্রের মতন জ্যোতিঃ যাহা দেখা যায়। উত্তম পুরুষ ব্রহ্ম, তাঁহারই অধীনে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, অপ, পৃথিবী—এই পঞ্চ ভূত সেই উত্তম পুরুষ হইতেই হইয়াছে। সেই উত্তম পুরুষ ঈশ্বরই সকলের কারণ। তিনিই বিষয় ভোগ করিতেছেন এবং তিনিই ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিতেছেন। সেই স্বরূপের ঈশ্বরের তখন সেক্ষণও থাকে না, তখন “সর্ক্স ব্রহ্মময়ং জগৎ”, ক্রিয়ার পর অবস্থা, তখন আর কিছুই নাই। তিনিই সমুদয় জ্যোতিঃব জ্যোতিঃ, তিনি ব্রহ্ম, তাঁহার কোন দিহ নাই, তথাপি সেই আত্মা স্রষ্টা, শ্রোতব্য, মন্তব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য ইহা শ্রুতিতে বলেন। যজুর্বেদে আছে—“মরুতঃ শিবঃ মরুতঃ ব্রহ্ম” মরুতই শিব, মরুতই ব্রহ্ম। সেই মরুত যখন স্থির হইলেন তখন শিব এবং সেই মরুতই অস্ত্রদিকে মন দিয়া সৃষ্টি করিতেছেন।

ক্রিয়ার পর অবস্থাই শিব, যিনি সর্বভূতে রহিয়াছেন। তিনি প্রথমে জল, তন্মধ্যে বীজ, তাহার মধ্যে নারায়ণ, তাহার মধ্যে কূটস্থরূপ হেমাণ্ড আপনি সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনিই গায়ত্রী ও তিনিই নিত্যের নিত্য। যখন কূটস্থরূপ গায়ত্রী লয় তন, তখন তাহার শক্তি ক্রিয়ার পর অবস্থার মধ্যে থাকে। “দেবাত্মশক্তিং স্বপ্তৈমিগুণান্”—(খৈতাবঃ উঃ)—মায়াবীশ্বর পরমাত্মার আভূতা, অস্বতন্ত্র। সেই শক্তি স্বপ্তগুণ অর্থাৎ সমবর্তনমো নান্দক স্বকীয় গুণে ও স্বীয় কার্য দ্বারা নিগুণ অর্থাৎ আচ্ছাদিত। যখন সাধক কূটস্থ থাকেন তখন সমুদয় পাপ হইতে মুক্ত হন, তাহার মধ্যে যে গুণ আছে তাহাতে প্রবেশ করিয়া থাকেন, যেখানে

রাত্রি বা দিন কিছুই নাই—“অসম্বা ইদমগ্র আসীৎ, ততঃ বৈ সদজায়ত”, “তদাত্মানং স্বয়মকুণ্ড তত্খাৎ তৎস্কৃতমুচ্যতে”—ক্রিয়া করিয়া কূটস্থ দর্শন, তৎপরে ক্রিয়ার পর অবস্থা। ক্রিয়া করিয়া কূটস্থের মধ্যে যখন দেবতাদি দর্শন হয় তখনও কিন্তু দন্দ ভাব। ক্রিয়ার পর অবস্থাতে দর্শনাদি নাই, তখন নির্বন্দ ভাব; উহাই জ্ব, স্থির, অক্ষর, আর দর্শনাদি ব্যাপার অস্থির ও ক্ষর। যদিও এই শরীরের মধ্যেই কূটস্থ রহিয়াছেন কিন্তু প্রথমে তাহা দেখা যায় না। যোনিমুদ্রায় কূটস্থ দর্শন হয়। কূটস্থ দর্শন হইল, এবং তাহারও বহু পরে তন্মধ্যে ঈশনশীল সর্বজ্ঞ নারায়ণ দর্শন হয়। উহাই পুরুষোত্তম-রূপ। কূটস্থ মধ্যেই ১৭, অসং সমুদয় সৃষ্টি হইতেছে, সেই জন্ত তন্মধ্যে ত্রিলোক ও ত্রিলোকস্থ জীব সমুদয়কে দেখা যায়। পরে পুরুষোত্তম বা ঈশ্বর দর্শন। এই পুরুষোত্তমই ক্ষর-অক্ষরের সংযুক্ত ভাব, এখানে ক্ষরের প্রাণান্ত নাই, সেই জন্ত নারায়ণ প্রপঞ্চের অধীশ্বর, প্রপঞ্চ লইয়া খেলা করেন মাত্র, কিন্তু তথাপি প্রপঞ্চাতীত ভাবে সদা অবস্থিত। এই হিরণ্যগর্ভাখ্য নারায়ণই সর্বজীবের উপাস্ত। হিরণ্যগর্ভ, নারায়ণ, ঈশ্বর, বিষ্ণু—এই সকল একেরই নাম। তিনিই নবদ্বারবিশিষ্ট দেহে প্রবিষ্ট হইয়া সূক্ষ্মাত্মা, প্রাণ বা হংসরূপে নির্দিষ্ট হন। তখন তাঁহার বহির্গত বৃত্তি কুটিয়া উঠে এবং এই প্রপঞ্চ ব্যক্ত জগতের ব্যবহার চলিতে থাকে। তখন তাঁহাকে হৃৎপদ বলিয়া মনে হয়—নিজেকে নিজে যেন বিস্মৃত। এই সমস্ত দৃষ্ট পদার্থ সদা একভাবে থাকে না এইজন্ত উহাদিগকে ক্ষর বলা হয়। এই ক্ষর পদার্থও অক্ষর পুরুষের দ্বারা পরিব্যাপ্ত। কিন্তু গুরুপদে মৃত সাধনা দ্বারা যখন বাহু বায়ু স্থির হইয়া যায়, অতি সূক্ষ্মভাবে কেবল তত্ত্ব তত্ত্ব চলিতে থাকে তখন বাহু প্রকৃতি বা দেহকে আর অনুভব করা যায় না। তখন ক্ষর অক্ষরের মধ্যে প্রবেশ করে। তখন “হংস” বিপরীত ভাবে গমন করিয়া সমস্ত বিশ্ব প্রপঞ্চকে আত্মসাৎ করেন। তখন “সোহং, সোহং”—অর্থাৎ সমস্ত দৃষ্টই আত্মার দ্বারা অনুপ্রাণিত, আত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া মনে হয়।* সাধনার চরম ফল ক্রিয়ার

* তিনটি পুরুষ—ক্ষর, অক্ষর ও পুরুষোত্তম। ভূতস্রুতিতে সন্ধ্যায়িত যে চৈতন্য তাহাই ক্ষর পুরুষ। ঘটস্থ হৃদয় প্রতিবিশের মত। ঘটের পরিবর্তনে হৃদয়ের পরিবর্তন হয় না বা ঘটনাশে তাহা নষ্ট হয় না; কিন্তু ঘটনাশের সহিত ঘটস্থ্য প্রতিবিশিত চৈতন্যের অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু বাহ্য প্রতিবিশিত চৈতন্য নহে, বাহ্য শুদ্ধ চৈতন্য, বাহ্য ভূতপ্রকৃতি হইতে বিবিক্ত, দেহরূপ ঘট নষ্ট হইলেও বাহ্য থাকে, বাহ্য ঘটস্থ হইয়াও সর্বঘট্ট একই রূপ অর্থাৎ ‘মনঃহং মনোবাহ্য’ হইয়াও যিনি ‘মনোবর্জিতঃ’, বাহ্য অবিনাশী কূটস্থ—তাহাই অক্ষর পুরুষ। ইনিই ‘ঐশ্বর্যভূতাং মহাবাহো যয়েনং ধার্যতে জগৎ’—ইনিই পরা প্রকৃতি। বাহ্য না থাকিলে হৃদয় কিছই হইতে পারে না। যিনি প্রাণরূপে সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাত্মকে প্রাণনয় করিয়া রাখিয়াছেন। ইনি জল, শব্দ, অবিনাশী পুরুষ।

উত্তম পুরুষও এই অক্ষর পুরুষের সহিত অভিন্ন, কিন্তু তাহাতে আরও একটু বৈশিষ্ট্য আছে। বাহ্য অক্ষর পুরুষ নাই। ইহা অভিন্ন রহস্তমক তত্ত্ব। এ তত্ত্ব সকলে অবগত হইতে পারে না। জড় চৈতন্যের সহিত সংযুক্ত হইয়া, চৈতন্যবৎ বলিয়া বোধ হয়। শুদ্ধ চৈতন্য জড়সম্পর্ক-রহিত—তাহাতে মনোবর্ধ নাই, তাহা শুদ্ধ চৈতন্য মাত্র—জ্যোতিঃমাত্র। কিন্তু সেই জ্যোতিঃ স্বতন্ত্র পুরুষ, বাহ্যতে জড়ের বর্ধ নাই, বাহ্য শুদ্ধ চৈতন্য মাত্র হইয়াও—কর্তা ও ঈশান-ভাব সমন্বিত, যিনি সকলের হৃদয় হইয়াও হৃদয়-ভাব দ্বারা অনাবৃত বাধার নিকট আমার যেরূপ কথা বলিতে পারি, যিনি করুণা বিধাতা, যিনি আমার কথা শুনে, আমাকে জ্ঞানেন, আমাকে ভালবাসিতে পারেন এবং আমার ভালবাসা লইতে পারেন—তিনিই নবাকৃতি নারায়ণ পুরুষোত্তম বা জগদান।

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোহহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ ।

অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৮

পর অবস্থা সমুদিত হইলে তথায় আর দৃষ্ট-দর্শন নাই। সেই অবস্থায় সদা থাকার নামই মহানির্বাণ পদ; সেখানে কাল চক্রবৎ ভ্রমণ করেন না। এই অবস্থা পাইতে হইলে (১) প্রথম প্রয়োজন ক্রিয়া করা, (২) ক্রিয়া করিয়া নেশায় মত্ত হইয়া থাকা, (৩) প্রকৃতিস্থ হওয়া (অর্থাৎ ইড়া, পিঙ্গলা, সূর্য্যা এক হইয়া যাইলে এক প্রকার সমতা অহুভব হয় তাহাই), (৪) শান্তিপদ লাভ, (৫) সদা শান্তি পদে থাকা। তখন কথা বলিতে ইচ্ছা হয় না, মনে কোন সঙ্কল্পের উদয় হয় না, বস্তু-নিরপেক্ষ পরম শান্তির ভাব কুটিয়া উঠে ॥ ১৭

অক্ষরঃ । যস্মাৎ (যেহেতু) অহং (আমি) ক্ষরম্ অতীতঃ (ক্ষরের অতীত) অক্ষরায় অপি (অক্ষর হইতেও) উত্তমঃ চ (উত্তম), অতঃ (সেই হেতু) লোকে বেদে চ (লোকে এবং বেদে) পুরুষোত্তমঃ প্রথিতঃ অস্মি (পুরুষোত্তম বলিয়া খ্যাত হইয়াছি) ॥ ১৮

শ্রীধরঃ । এবজ্ঞতঃ পুরুষোত্তমম্ আত্মনঃ নাম-নির্বচনেন দর্শয়তি—যস্মাদিতি । যস্মাৎ ক্ষরং—জড়বর্গম্ অতিক্রান্তোহহং নিত্যযুক্তাৎ । অক্ষরায় চেতনবর্গাদপি উত্তমশ্চ নিয়ন্তৃৎ ॥ অতো লোকে বেদে চ পুরুষোত্তম ইতি প্রথিতঃ প্রখ্যাতোহস্মি । তথা চ শ্রুতিঃ—
“ন বা অয়মাত্মা সর্বস্ত বশী সর্বশ্রেষ্ঠানঃ সর্বস্তাধিপতিঃ সর্বমিদং প্রশান্তি” ইত্যাদি ॥ ১৮

বঙ্গানুবাদঃ । [স্বীয় নাম-নির্বাচন দ্বারা এবজ্ঞত পুরুষোত্তমম্ প্রমাণ করিতেছেন]—
যেহেতু ক্ষরকে অর্থাৎ জড়বর্গকে অতিক্রম করিয়া আছি তাহার কারণ আমি নিত্যযুক্ত, এবং আমি অক্ষর অর্থাৎ চেতনবর্গ হইতেও উত্তম, কাবণ আমি নিয়ন্তা। এজ্ঞা লোকে এবং বেদে আমি পুরুষোত্তম বলিয়া প্রখ্যাত। এ বিষয়ে শ্রুতি এই—“সেই এই আত্মা, ইনি সর্বলোকের বশীকরণে সমর্থ, সর্বলোকের দৈশান বা দৈবর, এবং তিনি এই সমস্তকে শাসন করেন” ॥ ১৮

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা - তন্নিমিত্তে কুটস্থ ক্ষরের অতীত কিনা পরে দেখা যায় তোমাতোই, তন্নিমিত্তে অক্ষরের পর উত্তম অর্থাৎ উর্দ্ধেতে একটি পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায়, তজ্জন্ম তুমি জানলে পর লোকের মধ্যে বলিতে পারিবে যে একটি উত্তম পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায়—জেনে শুনে ভাল লোকে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন—তাহাকেই বেদ কহে—ওঁ—সেই বেদ ওঁকার হইতে ক্ষর, অক্ষর সমস্তই ইঁহাব অন্তর্গত। ইঁহারই ভজনা হয়। ব্যস্ত ভাবের পর্যাণ্টা ভাব এই পুরুষোত্তম-ভাব। কিন্তু পবত্রক সমস্ত ব্যস্তভাবে অতীত। তাঁহারই একাংশ মাত্র এই বারগর্ভবায়ী আদি পুরুষ। ইনিই অগতের পরিপা নার্য অবতীর্ণ হন। পরস্পর স্বরূপ ইন্দ্রিয়-বন-বুদ্ধির রতীত, পুরুষোত্তম-ভাবও তন্মধ্যে নিমজ্জিত। তাঁহাকে ভাবিবার কোন উপায় নাই, তিনি সত্তমাত্র। সমস্ত বিশেষণ অপগত হইলে, সমস্ত নাম-রূপ মিটিয়া গেলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, যাহা হইতে সমস্তে তরঙ্গের ন্যায় অনন্ত স্রষ্ট উচ্ছিন্নিত হইতেছে অথচ যিনি স্বয়ং সমস্ত উচ্ছিন্ন-বিবর্জিত, যাহা ক্ষর, অক্ষর ও পুরুষোত্তমেরও আশ্রয়, যাহাকে পুণ্য নামেও অভিহিত করা যাইতে পারে না, যিনি সর্বজ্ঞও মনেন, অজ্ঞও নহেন—তিনিই ব্রহ্ম। উপনিষাদ এই ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইয়াছেন—
গনিগণ এই সত্তা মাত্র বস্তু। সত্যতা স্বীকার করিয়া আর সমস্ত বস্তুই অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন—
তিনিই পরব্রহ্ম।

নির্গত, আর সেই ওঁকারস্বরূপ এই শরীর—এই শরীর হইতে যাহা জানা যায় তাহার নাম বেদ ওঁ ওঁ ওঁ—অতএব জেনে শুনে সব শাস্ত্রেতে পুরুষোত্তমের বিষয় বলিয়া গিয়াছেন—যরেরই সব তাহারই নাম ইন্দ্রবব জানিলে যরেরই মতন বোধ হয়, না জানিলে ইন্দ্রবব কি জানি কত বড়ই হবে!!! অর্থাৎ গুরুবস্তু দ্বারায় জানিলেই সব সহজ—আর নামচন্দ্রকেই সহজ ক্রিয়াতেই পাওয়া যায় (যাহা গুরুবস্তু গম্য)।—
আমি পুরুষোত্তম; কেননা পূর্বেস্ত ঐ দুই প্রকারের পুরুষের উপরেই আমার স্থান। কার্য-রূপ এই শরীর বা জগৎ, তাহা হইতে উৎকৃষ্ট হইলেন কুটস্থ, তাহা হইতেও উত্তম—উত্তম-পুরুষ, তিনিই কুটস্থে প্রতিবিম্বিত হন। কুটস্থের মধ্যে, সাধনার পরিপক্যবস্থায় তাহাকে সাক্ষর্য দেখিয়া থাকেন। এখানে একটি কথা প্রনিধানযোগ্য, তাহা এই—ক্ষর পুরুষের অতীত তাঁহাকে বলা হইল এবং অক্ষর পুরুষ হইতে উত্তম তাঁহাকে বলা হইল কেন? তবে কি ক্ষর পুরুষের মধ্যে তিনি নাই? না, এখানে সে কথা বলা উদ্দেশ্য নহে। ক্ষরের অতীত, কেননা এই জড়বর্গ দেহাদি বড় স্থূল, বড় বহির্গুণ; যাহারা এই দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি জড়বর্গ লইয়াই থাকে, তাহারা রেহস্থিত কুটস্থ চৈতন্তের কোন সন্ধানই পায় না—এই জ্ঞাতাবূশ জনগণের তিনি অনধিগম্য, কিন্তু তিনি অক্ষর অপেক্ষাও উত্তম কেন? কারণ এই দেহের অভ্যন্তরে যে চিজ্যোতিঃ কুটস্থ মণ্ডল রহিয়াছেন, তাঁহাকে যাহারা গুরুরূপায় দেখিতে পান, তাঁহারাও সেই হিরণ্যবপু দ্ব্যত-শব্দ-চক্র যে পুরুষোত্তম নারায়ণ, তাঁহাকে বদ্বাচিৎ দেখিতে পান। এই হেমাণ্ড কুটস্থ জ্যোতিঃই যেন তাঁহার বাহ্য শরীর। তাহার অভ্যন্তরে সেই-পুরুষোত্তম নারায়ণ। এই উত্তম পুরুষই ক্রিয়ার পর-অবস্থায় অথও চিৎসত্তা হইতে অভিন্ন। এই পুরুষোত্তম-ভাবই সত্ত্ব ভাবের পরকীর্তা। নিগুণভাব একমাত্র ক্রিয়ার পর-অবস্থায় উপলব্ধি করা যায়। এই পুরুষোত্তম দর্শনের পরই সাধক ক্রিয়ার পর-অবস্থা (আপনাতে আপনি) সহজেই লাভ করিতে পারেন। উহাও ক্রিয়ার পর-অবস্থাই বটে, তবে উহা সত্ত্ব ভাব গুণাতীত ভাবই সর্বোত্তম অবস্থা। লোকে এই সকল কথা প্রথমে অভিজ্ঞ লোকের মুখে শুনিতে পায়, তাহার পর মহাপুরুষেরা আত্মসাক্ষ্যকার দ্বারা এবং নিজ সাধনার অভিজ্ঞতা দ্বারা যাহা জানিতে পারেন, তাহাই জগতের কল্যাণের জ্ঞান লিপিবদ্ধ করিয়া যান, তাহাই শাস্ত্র এবং বেদ। বেদের মূল প্রণব। এই দেহই প্রণব-রূপ। এই দেহকে যিনি জানিয়াছেন এবং দেহের মধ্যে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড যিনি অহুভব করিতে পারেন—তিনিই প্রকৃত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ। বাহ্য বিচার দ্বারা এই পুরুষোত্তমকে বুঝিতে গেলে নানারূপ বাদ-উপস্থিত হয়। এই পুরুষোত্তম-ভাবই “বহুত্বং হেতুদ্ব্যমম্”। বাস্তবিকই কত বড় বহুত্ব। যাহারা দেহ ব্যতীত কিছু বুঝিতে পারে না, কেবল বিচার দ্বারা ইহাতে চেতন পদার্থকে মাত্র লক্ষ্য করিতে পারে, সেই চেতন দ্বারা অনন্ত চিৎসত্তা হইতে আসিতে আসিতে কত রূপ গ্রহণ করিয়াছে, তাহা না জানিলে ঐ পরম বহুত্ব কি করিয়া বুঝা যাইবে? এই শরীরের মধ্যে একটি জ্যোতিঃ সদা সর্বদা ক্ষরণ দেখিতেছি, বন্ধুদ্বারা অচেতন ইন্দ্রিয়-মনাদি সচেতনের স্রাব ঘটে হইতেছে। যে স্রাবাত্মা প্রাণের প্রকল্পনে এই সমস্ত বিষয় বোধগম্য হইতেছে,

যো নামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্ ।

স সর্ববিভুজতি মাং সর্বভাবেন ভারত ॥ ১৯

সেই নিখিল জীবের জীবনস্বরূপ প্রাণ-শক্তি আরও কতই না রহস্যময়—সেই প্রাণ-ধারা যে এক চিৎকণ জ্যোতির প্রবাহমাত্র, সেই চিদংশ বা স্থির প্রাণ আবও কত রহস্যময়—তাহার উপরেও সেই পুরুষোত্তম নারায়ণ, হুতরাং তাহা যে রহস্য বিষয়ের মধ্যে উত্তম রহস্য হইবে তাহাতে আর বিস্তৃত হইবার কি আছে ? ॥ ১৮

অম্বয়। ভারত (হে ভারত!) এবম্ (এইরূপে) যঃ (যে) অসংমূঢ়ঃ (মোহহীন হইয়া) মাং (আমাকে) পুরুষোত্তমং জানাতি (পুরুষোত্তম বলিয়া জানে), সঃ (সেই) সর্বভাবেন (সর্বপ্রকারে) মাং ভজতি (আমাকে ভজনা করে), [তদনন্তর সে] সর্ববিং (সর্বজ হয়) ॥ ১৯

শ্রীধর। এবম্ভূতেশ্বরশ্চ জাতুঃ ফলমাহ—য ইতি। এবং—উক্ত প্রকারেণ, অসংমূঢ়ঃ—নিশ্চিতমতিঃ সন্ যো মাং পুরুষোত্তমং জানাতি, স সর্বভাবেন—সর্বপ্রকারেণ মাংসেব ভজতি, ততঃ সর্ববিং—সর্বজ্ঞো ভবতি ॥ ১৯

বঙ্গানুবাদ। [এবম্ভূত দৈবরূপে জানার কি ফল তাহাই বলিতেছেন—উক্ত প্রকারে নিশ্চিতমতি হইয়া যে ব্যক্তি আমাকে পুরুষোত্তমরূপে জানে, সে সর্বপ্রকারে আমাকেই ভজনা করে, তদনন্তর সে সর্ববিং অর্থাৎ সর্বজ্ঞ হয় ॥ ১৯

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—যে কেহ আমাকেই ভজনা করে (অর্থাৎ ক্রিয়া করে গুরুবাক্যের দ্বারা উপদেশ পাইয়া) সম্যক্ প্রকারে অর্চিতকৃত্য হইয়া [জগৎ ভুলিয়া; বিষয়ের প্রতি এই অনাসক্তি ভাবই ভগবানের প্রতি নিশ্চিতমতি করে] অর্থাৎ কখনও ভুলেও যায় না, সেই পুরুষোত্তমকে জানে অর্থাৎ দেখে—সে সব জানে—আর সব ভাবেতেই অর্থাৎ যাহাতেই মন লাগায় তাহাতেই উত্তম-পুরুষকে দেখে অর্থাৎ সর্বজ্ঞেতেই ব্রহ্মই দেখে, ক্রিয়ার পর অবস্থায় সর্বদা থাকে।—গুরুপদের মত যে অকৈতব ভাবে সাধনা করে, সাধনার উদ্দেশ্য কোন ফলপ্রাপ্তি নহে, কেবল তাঁহাকে প্রাপ্তি এইরূপ মনে ধারণা করিয়া ভজনা করে, সে জগতের অস্ত্র সব কথা ভুলিয়া যায়, তাঁহাকে ভিন্ন তাহার আর কিছুই মনে থাকে না—এই ভাবে ভজনা করিতে করিতে সে উত্তম পুরুষকে দেখিতে পায়, তখন সব বন্ধন তাহার মিটিয়া যায়, তখন সে সর্ববিদ্বৎ হয়। কারণ সকল বস্তুতেই তাঁহাকে দেখে। তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই, হুতরাং তাঁহাকে যে জানিল সেও ব্রহ্মরূপই হইয়া গেল—“ব্রহ্মবিদ্বৎ ব্রহ্মৈব ভবতি,” সর্বত্র ব্রহ্মদৃষ্টি না হইলে, সর্বের সহিত নিজেই না মিলাইতে পারিলে সর্বজ্ঞ হওয়া যায় না। তাই ব্রহ্মবিদ্বৎ ব্যতীত কেহ সর্বজ্ঞ হইতে পারেন না। সর্বজ্ঞ পুরুষই সর্বভাবে তাহার পূজা করিতে পারেন। চিত্ত একান্ত হইলে যখন তাহাতে অস্ত্র কোন স্থিতির উদয় নাই তখনই সর্বগত বাহুধেবের ভজনা হয়। সর্বভাবে ভজনা করিতে করিতে “সর্ব” অর্থাৎ নাম-রূপ মিটিয়া যায়; তখন দ্বিতীয়ের কোন ভাণ থাকে না, এমন কি জ্ঞাত-ভাবে পর্য্যাপ্ত থাকে না। প্রথমতঃ সর্বই তিনি নিজেকে

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং নয়ানব ।

এতবুদ্ধা বুদ্ধিমান্শ্রীং কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥২০

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাস্থপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে পুরুষোত্তম-যোগো নাম পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

দেখিতে পান, পরে সর্ব বলিয়াও কিছু থাকে না, সর্বের পৃথক্ অমুভবও মিটিয়া গিয়া—এক-মেবাদ্বিতীয়ঃ—মাত্র অবশিষ্ট থাকে, তখন সে ভাব বুদ্ধিবার ক্ষণও দ্বিতীয় কেহ থাকে না। ক্রিয়, করিতে করিতে ক্রিয়ার পর-অবস্থা অল্প অল্প উদয় হইতে থাকিলে একটা নেশার মত ভাব হয়, তাহাতে প্রথম প্রথম সব বস্তুই মনে পড়ে, কিন্তু কোনও বস্তুর প্রতি মন জমে না, ক্রমে আর কোন বস্তুই মনে পড়ে না, তখন সব হইতে মন সংহত হইয়া মনের মধ্যেই মন জমিয়া বসে, তখন আর সঞ্চল-বিকল্পের কোন চেষ্টা উঠে না। মন যে আছে সঞ্চল-বিকল্প না থাকায়, তাহাও বুদ্ধিতে পারা যায় না। পরে সে ভাবও ভুলিয়া যায়, তখন এক অবিজ্ঞাত-রাজ্যের পরদা খুলিয়া যায়। যে জ্ঞান পূর্বে ছিল না, যে দৃশ্য পূর্বে দেখা বাইত না, যে শব্দ পূর্বে কখনও শোনা যায় নাই, তাহাই বোধের বিষয় হয়। পরে সে অলৌকিক বোধও আর থাকে না। প্রথম সব বোধ একের মধ্যে প্রবেশ করিয়া এক হইয়া যায়, যেমন সব নদী সমুদ্রের মধ্যে প্রবিশি ২০৯ সমুদ্রই হইয়া যায়, তাহাদের আর পৃথক্ নাম রূপ থাকে না, তদ্রূপ উহাই গুণাতীত ব্রহ্মভাব,—“রূপং ভগবতো। যন্তম্মনঃকান্তং গুণাপহম্” ভগবানের সেই যে রূপ তাহা কোনও আকৃতি নহে, তাহাই অরূপের রূপ, মন বাহ্যকে দর্শন করিলে পরম ভূষিলাভ করে, বাহ্যতে সমস্ত শোক-তাপ দূর করে। তাই ভগবানের কোন মাদ্রিক রূপ দর্শনই সাধনার শেষ ফল নহে। তাঁহার স্বরূপে নিত্যস্থিতি ও সেই স্বরূপে নিজেই ডুবাওয়া দেওয়াই, ভক্তিভাবের পরাকাষ্ঠা, এবং সেই ভাবই নিজবোধরূপ, জ্ঞানস্বরূপ—তাহাতে স্থিতিলাভ করিতে পারাই ভগবন্তের সর্বোত্তম ফল। এই স্থিতির নামই ক্রিয়ার পর-অবস্থা। তাহার অলৌকিক শক্তিই কার্যরূপে এই দৃশ্যজগৎ ভাসিত হইতেছে, মন এই প্রপঞ্চকে প্রকাশিত করে ও ভোগ করে। কিন্তু সমস্ত দৃশ্যের মূলে যে একটি বিন্দু রহিয়াছে, সেই বিন্দু বা কেন্দ্রমূলে ফিরিয়া যাওয়াই কার্যজগতের অতীত বা পর-অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া। সেখানে আর নানাত্ব নাই। কল্পনার বহু-মুখে প্রকাশই বাহু জগৎ মনের স্বরূপ-চ্যুতি, সেই কল্পনার মূল মন স্বকল্পে ফিরিয়া গেলে তাহার বহুমুখী প্রকাশের অভাব হয়। ইহাই জ্ঞানের স্বরূপে অবস্থান বা যোগ। এই যোগাত্ম্য সর্ববলেরই কর্তব্য, যোগাত্ম্য ব্যতীত জ্ঞান-ভক্তি কিছুই জাভ হয় না। যোগাত্ম্য আত্মদর্শনের প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ উপায়। অস্ত্র কোন বলই যোগবলের তুল্য নহে। যোগবল বিহীন ব্যক্তিরই ইন্দ্রিয়রূপে অদম্ব হইয়া বিষয়ে নিমগ্ন হয় ॥২০

অম্বয়। অনব ভারত (হে নিষ্পাপ অর্জুন!) ইতি (এই প্রকারে) গুহ্যতমম্ (পবন গুহ্য) ইদং শাস্ত্রং (এই শাস্ত্র) ময়া উক্তং (মৎকর্তৃক কথিত হইল), এতদ্বুদ্ধা (ইহা জানিয়া) [লোকে] বুদ্ধিমান্ (জানী) কৃতকৃত্যঃ চ শ্রীং (ও কৃতার্থ হইয়া থাকে) ॥২০

শ্রীধর। অধ্যায়ার্থম্ উপসংহরতি—ইতীতি। ইতি অনেক সংক্ষেপপ্রকারেণ গুহ্যতমম্—অতিরহস্তম্ সম্পূর্ণ শাস্ত্রমেব ময়োক্তম্। ন তু পুনর্বিংশতিশ্লোকম্ অধ্যায়মাত্রং। হে অনঘ—ব্যসনশূন্য! অত এতৎ মহন্তঃ শাস্ত্রং বুদ্ধা বুদ্ধিমান—সম্যগজ্ঞানী স্তাৎ, কৃতকৃত্যচ্চ স্তাৎ। যোহপি কোহপি। হে ভারত! অং কৃতকৃত্যোহসি ইতি কিং বক্তব্যমিতি ভাবঃ ॥২০

সংসারশাখিনং ছিবা স্পষ্টং পঞ্চদশে বিভূঃ।

পুরুষোত্তমযোগাখ্যে পরং পদমুপাধিশৎ ॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতভাগবদগীতাতীকায়াম্ সুবোধিত্যং পুরুষোত্তমযোগো নাম পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ।

বঙ্গানুবাদ। [অধ্যায়ার্থের উপসংহার করিতেছেন]—ইতি অর্থাৎ এই সংক্ষেপ প্রকারে গুহ্যতম অর্থাৎ অতিরহস্তপূর্ণ সম্পূর্ণ শাস্ত্রই আমি বলিয়াছি। কিন্তু এই বিংশতি শ্লোকযুক্ত অধ্যায়মাত্র নহে, [ইহাতেই শাস্ত্রের সম্যক্ রহস্ত বলা হইল]। হে অনঘ অর্থাৎ ব্যসনশূন্য! এই মহন্ত শাস্ত্র বুঝিয়া কোন ব্যক্তি সম্যগজ্ঞানী হইতে পারিবে এবং কৃতকৃত্য হইবে, সুতরাং হে ভারত, তুমিও যে কৃতকৃত্য হইবে, সে বিষয়ে আর অধিক কি বলিব—ইহাই তাৎপর্য ॥২০

বিভূ ভগবান্ সংসাররূপ বৃক্ষ ছেদ করিয়া পুরুষোত্তমযোগ নামক পঞ্চদশাধ্যায়ে স্পষ্টরূপে পরম পদ বিষয়ে উপদেশ দিলেন ॥

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এই অত্যন্ত গুপ্ত যে শাস্ত্র তাহা বলিলাম আমি ইহা স্থির করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থার থেকে বুদ্ধিমান হও (ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে না থাকে সে বুদ্ধিমান হয় না) ও কৃতকৃত্য হও অর্থাৎ ক্রিয়া করে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাক।—এই অধ্যায়টি অত্যন্ত বহুস্তম। আচার্য শব্দ বলিয়াছেন—“সমগ্র গীতা শাস্ত্রের বাহা অর্থ, তাহা এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। সমগ্র বেদের অর্থ বাহা, তাহাও এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে বলা হইয়াছে—“যন্তং বেদ স বেদবিৎ”, “বেদৈশ্চ সর্কৈরহমেব বেদঃ”—ইত্যাদি বাক্য দ্বারাও ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। সকলের মধ্যেই এই পুরুষোত্তম রহিয়াছেন—ইহাকে জানিলে যে কোন লোকই হউক সেই কৃতকৃত্য হইতে পারে। কেবল যত্ন করিয়া সাধনাত্যাস করিতে হইবে। সাধনাত্যাসের ফলে এই দেহেই কুটস্থ ও তন্মধ্যে পুরুষোত্তমকে দর্শন করিয়া জীবন সকল করা যায়, কিন্তু জীব এত দুর্ভাগ্য, এত নিকোঁদ যে সমস্ত কর্ম করিয়া কেবল জালা ও তাপ সহ করিতে হয়, তাহাই পুনঃ পুনঃ করিবে, কিন্তু যে কর্মে সব জালা মিটিয়া যায়, অন্তঃকরণের সমস্ত বৃত্তি-রাশি নিবৃত্ত হইয়া অনন্ত শান্তি-পথের দ্বারকে উন্মুক্ত করিয়া দেয়, সেই সাধনা একটু পরিশ্রম করিয়া করিলেই হয়, কিন্তু সে পথে কেহ যাইবে না, অশচর্য্য, শোক-দুঃখের জ্বালায় জলিয়া পুড়িয়া থাকে হইয়া যাইতেছে। সেই বুদ্ধিমান যে ক্রিয়া করে, কারণ ক্রিয়া করিলেই ক্রিয়ার পরাবস্থা প্রাপ্তি হয়, তাহাতেই জীবন কৃতকৃত্য হয়। সমস্ত শাস্ত্র দ্বারা প্রতিপাদিত যে পুরুষোত্তম তাহাই এই সাধনাদ্বারা অবগত হওয়া যায় ॥ ২০

ইতি ভ্রামাচরণ-আধ্যাত্মিকদীপিকা নামক গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সমাপ্ত ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়ের সার সংক্ষেপ।

এই ব্রহ্মাকার কলেবর, ইহার মূল উপরে অর্থাৎ মস্তকে, এবং হস্তপাদাদি সমস্তই নীচের দিকে। হস্ত-পাদাদি কর্ণেদ্বিগ্ন এবং চক্ষু-কর্ণাদি জ্ঞানেদ্বিগ্ন প্রকৃতপক্ষে সব কাজ করে, কিন্তু ছকুম আসে মস্তক হইতে। যে সমস্ত কার্য জীবকে কর্মশূন্যে আবদ্ধ করে, সে সমস্তই গুণজয় হইতে উৎপন্ন। ইড়া, পিঙ্গলা, সূর্য্যার মধ্যেই। গুণ সব পুষ্ট হয় এবং তথা হইতে প্রস্ফুটিত হইয়া তাহার সংসার-মুখে প্রধাবিত হয়। এই অবস্থায় যে সকল কর্ম হয়, তাহা ফলাকাঙ্ক্ষা-যুক্ত বলিয়া তাহাতে জীবের বন্ধন হয়। সুতরাং দেহের উর্দ্ধে অর্থাৎ মস্তকে যদি প্রাণের স্থিতি না হয়, তাহা হইলেই বন্ধন দশা ভোগ করিতে হইবে। আজ্ঞাচক্রে উর্দ্ধে যে মূল রহিয়াছে তাহা কর্মাহবন্ধি নহে, সেই মস্তকে (মহশ্বারে) প্রাণের স্থিতি হইলেই গুণাতীত অবস্থা লাভ হয়। এই অখণ্ড রূপ (যাহা কাল পর্য্যন্ত থাকিবে কিনা সম্ভেদ) কলেবর যে পুষ্টলাভ করিতেছে অর্থাৎ বার বার জন্মমরণ-সঙ্কল যে দেহাদি ধারণ করিতেছে, বাসনা তাহার মূল; এই বাসনার মূলচ্ছেদ করিতে না পারিলে বার বার জন্ম-মৃত্যুর চক্র নিরন্তর হইবার নহে। মন দিয়া ক্রিয়া করিলে ক্রিয়ার পর-অবস্থা প্রাপ্তি হয় অর্থাৎ ইচ্ছারহিত অবস্থা লাভ হয়। উহাই সংসার-ব্রণের মূলচ্ছেদক অস্ত্র। ক্রিয়া করিয়া কুটস্থ ব্রহ্মের অগুর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলেই ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তাহাই অপুনরাবর্তি স্থিতি। তিনিই আদিপুরুষ, তাঁহাকে কুটস্থের পর দেখা যায়। ঐ অবস্থা হইতে নামিয়া আসিয়াই সব হইয়াছে, তখন মন অত্র বস্তুতে আসক্তির সহিত লক্ষ্য করিতে করিতে তদ্রূপ হইয়া এই বিশ্ব-প্রপঞ্চ প্রকাশিত করিতেছে। ক্রিয়ার পর স্থিতি সে বড় আশ্চর্য্য অবস্থা; সেখানে চক্রেয় দীপ্তিও নাই, স্বর্ষ্যেরও রশ্মি নাই, অথচ সে ধাম আপনাব মহিমায় সর্বদা প্রভাবিত, তাহাই পরমাত্মার পরম ধাম অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা। অষ্ট প্রহর এই অবস্থায় থাকিলেই ক্রিয়ার পর স্থিতিরূপ অবিনাশী পদকে পাওয়া যায়।

পরমাত্মার কিরূপে জীব-ভাব হয়, কিরূপে তিনি দেহ-মধ্যে আসেন ও বাহির হন, যাহারা ইন্দ্রিয়সক্ত অজ্ঞানী জীব, তাহার ঐহার রহস্য কিছুই বুঝিতে পারে না। আত্মাই ইন্দ্রিয় ও মনে অধিষ্ঠানপূর্বক কিরূপে বিষয়-ভোগ করিতেছেন, তাহা অতিশয় বিষয়কর ব্যাপার। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বাবতীর বিষয়ই দেহস্থ ঘটচক্রে দিয়া বিদ্যুৎবেগে দ্বিধলপদে মনঃস্থানে উপনীত হয়, পরে তখনই মহশ্বরূপে নীত হয়, তাহার পরে আমাদের বিষয়ের অনুভব হয়, কিন্তু সেই অনুভব হইতে স্বরূপও বিলম্ব হয় না। বাহ্যের ক্রিয়ার দ্বারা আজ্ঞাচক্রে স্থিতি হওয়ায় বুদ্ধি স্থির হইয়া যায়, তাহারাই এই সূক্ষ্ম অনুভব করিতে পারেন, যাহাদের বুদ্ধি স্থির নহে অর্থাৎ বিমূঢ়, তাহার ঐ সব কিছুই ধারণা করিতে পারে না। এই স্থিরবুদ্ধি হইতেই সর্বজ্ঞতা লাভ হয়।

এই দ্বিঘাট্ট তাঁহাদেরই হয়, যাহারা ধ্যান-ধারণা-সমাধি দ্বারা মনকে নিরোধ করিতে পারেন। যাহারা অকৃতাত্মা অর্থাৎ কুটস্থ ব্রহ্ম আটকাইয়া নাই তাহাদের উন্মত্তরূপ স্থিতি—দ্বিঘাট্ট হয় না। বাহিরের স্বর্ঘ্য কিরণে যেমন আগতিক বস্তু-সমূহ প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ কুটস্থ কিরণই এই শরীর ও ইন্দ্রিয়াদিকে প্রকাশময় করিয়া রাখিয়াছে। সেই তেজই

ব্রহ্মের রূপ, যাহা আকাশ হইতে আশিতোছে। এই আকাশের মধ্যেই পরব্যোম-স্বরূপ অণু, আবার সেই অণুর মধ্যে কত শত ব্রহ্মাণু রহিয়াছে, আবার এক একটি ব্রহ্মাণুর মধ্যে কত ব্রহ্মাণু যে তাহার সীমা নাই। এই অণুর জ্ঞান হইলেই ব্রহ্মজ্ঞান হয়।

আত্মা প্রাণরূপে সকল বস্তুতেই আছেন বলিয়া আমরা সকল বস্তুর অস্তিত্ব অনুভব ১৫শ অধ্যায়— করিয়া থাকি। এক একটি বস্তুর গুণ, এক একটি লতা পাতা ১২।১৩।১৪ প্রোক্ত। উদ্ভিদের মধ্যে কত গুণ রহিয়াছে, তাহা যোগীরা আত্ম-প্রাণ মুক্তিতে স্থির করিলেই সব জানিতে পারেন—কিন্তু ইচ্ছা করিয়া এ-সব জানা ভাল নহে, তাহাতে আত্ম-সাক্ষ্যকারের বির ঘটে। ফলে নিঃশেষরূপে স্থিতি হইলেই প্রকৃত জ্ঞান হয়, যদি সব জানিতে চাও তো ক্রিয়ার পর-অবস্থায় স্থির হইয়া থাক। তাহা হইলে যাহা কিছু জানিবার তাহাও জানিবে, এবং সব জানারও শেষ হইবে। সে অবস্থায় কোন ইচ্ছা থাকে না, তবে যাহা জানিবার যোগ্য, তাহা ক্রিয়ার পর অবস্থায় ইচ্ছা না করিলেও জানা যায়।

এই লোকে দুই রকমের পুরুষ আছেন, ক্ষর ও অক্ষর। অক্ষর পুরুষ কুটম্ব এবং এই ক্ষর ও অক্ষর প্রকৃতি এবং দৃশ্যমান বস্তু মাঝেই ক্ষর পুরুষ। যাহারা আসক্তি এবং উত্তর পুরুষ পুরুষ এই দেহাদি দৃশ্য পদার্থই দেখিয়া থাকেন, তাহাদের নাশ হয়, আত্মজ্ঞান বা শান্তিলাভ কিছুই হয় না। যাহারা কুটম্ব দৃষ্টি স্থাপন করিয়া অষ্টপ্রহর বসিয়া আছেন, তাহারাও অক্ষর পুরুষের সহিত এক হইয়া অবিনাশী পদ প্রাপ্ত হন। এই কুটম্ব দেখিতে দেখিতে আর একটি পুরুষের সাক্ষ্য লাভ হয়, তিনিই উত্তম পুরুষ, তাহাকেই শাস্ত্রে পরমাত্মা বলে। তিনিই চামড়ার জামা পড়িয়া সর্বত্র বিদ্যমান আছেন, তিনিই অব্যয় অবিনাশী, তিনিই দৈব ও কৰ্ত্তা এবং তিনিই জীবরূপে সর্বত্র সব কার্যই করিতেছেন। কিন্তু এ সব অনিত্য মাত্র। তিনিই ব্রহ্মরূপে আবার কিছুই করিতেছেন না কুটম্বের জ্ঞান হইলেই তাহা যে বিনাশশীল নয় অর্থাৎ ক্ষরের অতীত তাহা যোগীরা বেশ বুঝিতে পারেন। তদুর্দ্ধে যিনি রহিয়াছেন তিনিই পুরুষোত্তম।

“সর্বে দেবা যৎ পদমামনস্তি, তপা সি সর্বাণি চ বদ্বদন্তি।

যদ্বিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি, তস্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রহ্মোম্যোমিত্যভ্যন্তঃ ॥” বঠ ভঃ

এই ব্রহ্মপদই প্রাপ্য বলিয়া বেদ নির্দেশ করিয়াছেন, এবং যে ব্রহ্ম বা যাহার জ্ঞাত তপস্যা-সমূহ (প্রাণায়ামাদি সাধনা) অহুষ্ঠিত হয়, সাধকগণ যে ক্রিয়ার পর-অবস্থা বা ব্রহ্মপদ প্রাপ্তির জ্ঞান ব্রহ্মচর্য্য অহুষ্ঠান করিয়া থাকেন, সেই ব্রহ্মপদ সংক্ষেপে বলিতেছি যে তাহা “ও”। [ও-কারের বহস্য গীতার প্রথম ভাগে দেখুন।]

যিনি গুরু বাক্যে বিশ্বাস করিয়া দৃঢ় ভাবে ও অনুব্রাহ্মণের সহিত সাধনা করিবেন, তিনিই উত্তম পুরুষকে এই দেহাত্মকভাবেই দেখিতে পাইবেন, এবং ক্রিয়ার পর-অবস্থায় সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন করিয়া তাহাতেই স্থিতি লাভ করিতে পারিবেন। ইহা অতি গুপ্ত বহস্য, যাহারা মনুষ্যজীবন লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইতে চাহেন, তাহারা ব্রহ্মার সহিত ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় যেন থাকিবার চেষ্টা করেন। ও হরিঃ ও”।

ষোড়শোঃ অধ্যায়ঃ ।

(দৈবাসুরসম্পদবিভাগ যোগঃ)

শ্রীভগবানুবাচ ।

(দৈবী সম্পদ তত্ত্বজ্ঞানের অধিকার)

অভয়ং সত্ত্বসংস্কৃতজ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ ।

দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্ ॥ ১

অভয়ঃ। শ্রীভগবানু উবাচ (শ্রীভগবানু বলিলেন) অভয়ং (ভয়শূন্যতা) সত্ত্বসংস্কৃতিঃ (চিত্তশুদ্ধি) জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ (জ্ঞান ও যোগে নিষ্ঠা, অথবা আত্মজ্ঞানের উপায়ে পরিনিষ্ঠা) দানং (দান), দমঃ চ (দম), যজ্ঞঃ চ (যজ্ঞ) স্বাধ্যায়ঃ (শাস্ত্রপাঠ, ব্রহ্মযজ্ঞ বা জপযজ্ঞ), তপঃ (তপস্যা) আর্জবং (সরলতা) ॥ ১

শ্রীধরঃ।

আনুগম্য সম্পদং ত্যজ্যৈবৈবীমেবাপ্রিতা নরাঃ ।

মুচ্যন্ত ইতি নির্ণেহু তদ্বিববেকোহথ ষোড়শে ॥

পূর্বাধ্যায়ান্তে “এতদ্ভূত্বা বুদ্ধিমান্ শ্রীং কৃতকৃত্যশ্চ ভারত” ইত্যুক্তং, তত্র ক এতৎ তত্ত্বং বুধ্যতে, কো বা ন বুধ্যতে ইত্যপেক্ষয়াং তত্ত্বজ্ঞানে অধিকারিণঃ অনধিকারিণশ্চ বিবেকার্থঃ ষোড়শাধ্যায়শ্চ আরম্ভঃ। নিকপিতে হি কার্যার্থে অধিকারি-জিজ্ঞাসা ভবতি। তদুক্তং বট্টেঃ—

“ভাবো যো যেন বোচব্যঃ স প্রাপ্নোলোভিতো যদা।

তদা কন্তস্ত বোচেন্তি শকাং কৰ্ত্তুং নিরূপণম্ ॥” ইতি ।

তত্র অধিকারিবেশেষণভূত্যাং দৈবী সম্পদম্ আহ—অভয়মিতি ত্রিভিঃ। অভয়ং—ভয়া-ভাবঃ। সত্ত্বশ্চ—চিত্তশ্চ, সংস্কৃতিঃ—সুপ্রসন্নতা। জ্ঞানযোগে—আত্মজ্ঞানোপায়ে, ব্যবস্থিতিঃ—পরিনিষ্ঠা। দানং—স্বতোজ্যস্ত অন্নাদেঃ যথোচিতসংবিভাগঃ। দমঃ—বাহেজিয়সংযমঃ। যজ্ঞঃ—বধাধিকারঃ স্বর্গপোর্ণমানাদিঃ। স্বাধ্যায়ঃ—ব্রহ্মযজ্ঞাদিঃ জপজ্ঞো বা। তপঃ—উত্তরাধ্যায়ে বক্ষ্যমাণং শারীরাধি। আর্জবম্—অবক্রতা ॥ ১

বল্লাভসুবাচ। “আনুগম্য সম্পদং ত্যজ্যৈবৈবী সম্পদকে আশ্রয়কারী ব্যক্তির যে মুক্ত হন, ইহাই নির্ণয় করিবার জন্য ষোড়শ অধ্যায়ে তাহার বিচার করা হইতেছে।”

[পূর্বাধ্যায়ের অন্তে “হে ভারত! ইহা জানিয়া লোকে জানী ও কৃতকৃত্য হইয়া থাকে”—ইহা বলা হইয়াছে, তাহাতে এ তত্ত্ব কে বা বুঝিতে পারে এবং কে পারে না এই প্রশ্ন তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী ও অনধিকারীর নির্ণয়ার্থ এই ষোড়শাধ্যায়ের আরম্ভ। কার্যার্থ নিরূপিত হইলেই তাহার অধিকারী বিষয়ে জিজ্ঞাসা হয়। তাই কুমারিল ভট্ট বলিয়াছেন—“ভার যে বহন করিবে

সেই ভাবের বিবরণ পূর্বে যদি আলোড়িত হয় তবেই কোন ব্যক্তি তার বহন করিতে সমর্থ হইবে, নিরুপণ করিতে পারা যায়” ইতি। তদন্তে অধিকারি-বিশেষণরূপ দৈবীসম্পদ তিনটি শ্লোক দ্বারা বলিতেছেন—[অভয় শব্দে—ভয়াভাব, সত্য শব্দে—চিত্ত, সংশুদ্ধি—সুপ্রসন্নতা। জ্ঞানমেগে ব্যবস্থিতি—আত্মজ্ঞানোপায়ে পরিণিষ্ঠা। দান—স্বতোজ্য অন্নাদির যথোচিত সংবিভাগ। দন—বাহ্যেঞ্জিয় সংযম। যজ্ঞ—যথাধিকার দর্শপৌর্ণমাসাদি যজ্ঞ। স্বাধ্যায়—ব্রহ্মযজ্ঞাদি বা জপযজ্ঞ। তপঃ—শারীরাদি তপস্তা (পরের অধ্যায়ে বলিবেন)। আর্জুন—অবক্রতা (সরলতা) ॥ ১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—কুটুম্বের দ্বারা অনুভব হইতেছে—ক্রিয়ার পর অবশ্যর থেকে মরবার যে ভয় তাহা ক্রমশঃ যায়—সর্বদাই সুসুপ্তিতে থেকে সম্যক প্রকারে নির্মূল বুদ্ধি দ্বারায় সব দেখিতে পায়; জ্ঞান—যোনিমুদ্রাতে থাকা; ধারণা ধ্যান সমাধি করা, ক’রে বিশেষরূপে স্থিতি; ক্রিয়াদান, ইন্দ্রিয়াদির দমন, ও ক্রিয়া করা, আর বুদ্ধির পর পরাবুদ্ধিতে স্থির থাকা, কুটুম্ব থাকা, সরল হওয়া, কোন বিষয়ের ইচ্ছা থাকিলেই সরল কখনই হয় না ও হিংসারহিতও হ’তে পারে না, যাহা হওয়া উচিত—আপনাকে আপনি না দেখিলে কেমন করিয়া অন্তকে দেখিবেন, যে আপনাকে দেখিবেন সে সকলকে সমান দেখিবেন। ক্রিয়ার পর অবশ্যর থাকিলে, সব এক হওয়ার নিমিত্তে আপনাতেই আপনি তুষ্ট, তাহা ক্রিয়াহিত ব্যক্তির। দেখিতেছেন।—পূর্বে নবম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে জীব-গণের প্রকৃতি তিন প্রকার—(১) দৈবী, (২) আসুরী ও (৩) রাক্ষসী। আসুরী ও রাক্ষসী প্রকৃতি—বন্ধনের কারণ এবং দৈবী প্রকৃতিই মোক্ষলাভের অহঙ্কল। পূর্বাধ্যায়ের শেষে ভগবান্ বলিয়াছেন—“এই ওহন্তম জ্ঞান জানিয়া কৃতকৃত্য হও”—এখন এই তত্ত্ব জানিবার প্রকৃত অধিকারী কাহার, জানিতে পারিলে সেই অধিকার লাভের জন্য মুমুক্শু জীব প্রস্তুত হইতে পারে তাই সেই অধিকারের কথা এই অধ্যায়ে বলা হইতেছে। যাহারা মুমুক্শু তাহা দেব প্রয়োজন এক প্রকারের, যাহারা সংসারী তাহাদের প্রয়োজন অল্প প্রকারের। মুমুক্শুর যাহা প্রয়োজনীয় তাহাই দৈবী সম্পৎ, সংসারী অর্থাৎ বিষয়াসক্তের যাহা প্রয়োজনীয়—তাহাই আসুরী সম্পৎ। এখন অহংরের দ্বারাই জগৎ পরিপূর্ণ, তাই আসুরী সম্পদের জন্যই জীব লানায়িত, দৈবী সম্পদের দিকে কেহ ফিরিয়াও তাকায় না। যদ্বারা জীবকে মুক্তি-মার্গে অধিকারী করে তাহাই দৈবী সম্পৎ, এবং যাহা পৌকিক জ্ঞান—যদ্বারা জীবের কানোপভোগ পরিবর্তিত হয়—তাহাই আসুরী সম্পৎ। আসুরী সম্পদের দ্বারা জীবের পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর পথ কল্প হয় না, দৈবী সম্পদের দ্বারা জীবের মোক্ষমার্গস্থল প্রবৃত্তির উদয় হইয়া তাহাকে শান্তির পথে, সত্যের পথে লইয়া যায়। তাই এখানে দৈবী-সম্পদের অধিকারী যাহারা—তাহাদের কি লক্ষণ এবং কি গুণ থাকে, সেই সকল কথা ভগবান্ আর্জুনকে বলিতেছেন।

(১) অভয়—ভয়শূন্যতা। আমা ছাড়া দ্বিতীয় আর কেহ আছে—এই দ্বিতীয়ের অস্তিত্ববিশেষ বতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ অভয় লাভ হয় না।

ভগবানের পরমপদই প্রকৃত অভয় পদ। যাহা লাভ করিলে আর এই চিত্ত সংসারমুখী হইতে পারে না। তাই প্রতি আদেশ করিয়াছেন—“অভয়ং সর্কভূতেভাঃ”—সর্কপ্রাণী আমা হইতে যেন অভয় লাভ করে, এবং আমিও সর্কপ্রাণী হইতে যেন অভয় লাভ করি। কাহাকেও পর না ভাব। তাহা হইলেই আর কাহারও উপর হিংসা হয় না। অহিংসা প্রতিষ্ঠিত না হইলে বৈরত্যাগ হয় না। পরের উন্নতি দেখিয়া নিজেবও তরুণ উন্নতি হউক এইরূপ বাঞ্ছা করায় আত্মতার প্রতিষ্ঠিত হয় না। ইহাতে পরের মধ্যে নিজেকে দেখা হইল না, পর পরই হইয়া রহিল। পরকে আপনার করিতে হইলে বাসনাত্যাগের প্রয়োজন, বাসনাত্যাগ করিতে মনোনাশের প্রয়োজন। সর্কপেক্ষা জীবের বড় ভয় হইতেছে মৃত্যু-ভয়, মৃত্যু-ভয়ে জীব সদাই সঙ্কল্প। এই ভয় যায় কি প্রকারে এবং অভয় পরমপদই বা প্রাপ্তি হয় কি প্রকারে? যাহারা শঙ্কালু হইয়া ক্রিয়া করেন, এবং ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর-অবস্থা অল্প অল্প করিয়া অনুভব করিতে পারেন—তাঁহাদেরই স্বদুরোগ নষ্ট হয়, মরণের ভয় থাকে না, কারণ তাঁহারা প্রতি-দিনই মৃত্যুর স্বাদ (দেহ হইতে পৃথক হওয়া) কিছু কিছু পাইতেছেন, এবং তাহা যে কত আনন্দের অবস্থা ইহা জানিতে পারায় আর মৃত্যুর জন্য তাঁহাদের কোন আশঙ্কা বা ব্যাকুলতা থাকে না। মনের নিঃশব্দ অবস্থা—আমার পীড়া হইবে, কি সর্প-ব্যাঘ্র আক্রমণ করিবে, কে আমাকে দেখিবে—এই সব উদ্বেগ কিছুই থাকে না।

(২) সত্যসংশুদ্ধি—অন্তঃকরণের-অশুদ্ধিভাবের (যেমন প্রবঞ্চনা, মিথ্যা-ব্যবহার ইত্যাদি) পরিবর্তন। ভিতর বাহির সমান। যাহাদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ নহে, তাহারা কখনও ভয়শূন্য হইতে পারে না। বুদ্ধি নির্মল হয় কিরূপে? যাহারা প্রাণায়ামাদি যোগাত্মক করেন, তাহাদের নাড়ী-প্রবাহ বিশুদ্ধ হয়, নাড়ী বিশুদ্ধ হইলে তাহাদের স্পন্দনও বিশুদ্ধ হয়। স্পন্দন বিশুদ্ধ হইলে বৃত্তিও বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। যাহারা সর্কদা—সুসুপ্তিতে থাকেন, তাহাদের চিত্ত-স্পন্দন বিশুদ্ধ হইবে। সাধারণতঃ ইড়া-পিঙ্গলার প্রবাহে পড়িয়াই জীবের সংসার বাসনার উদয় হয়। এই প্রবাহ রুদ্ধ হইয়া যখন সুসুপ্তির পর্ব স্থলিয়া যায়, তখনই জীবের সত্যগুণ বুদ্ধি হয়, সত্যরায় বাসনা-তত্ত্ব হইয়া থাকে।

(৩) জ্ঞান এবং যোগে একান্ত নিষ্ঠা—শ্রীমদ্ আচার্য্য শরর বলিয়াছেন—জ্ঞান ও যোগ বিষয়ে তৎপরতা বা একাগ্রতাই হইল, প্রধান দৈবী সম্পৎ। কারণ জ্ঞান ও যোগ ব্যতীত সত্যসংশুদ্ধি হইবার উপায় নাই। আত্মা ও অনাত্মার জ্ঞানই জ্ঞান বটে, কিন্তু তাহা পুঙ্খক পড়িয়া হইবার নহে। আত্মার প্রত্যক্ষ অনুভব হয় যোনিমুদ্রায়। কুটুম্ব মণ্ডল হইতে পুরুষোত্তম দর্শন পর্যন্ত সমস্তই হয়, যিনি যোনিমুদ্রায় থাকিতে পারেন। এই যোনিমুদ্রাই প্রধান পীঠ স্থান। এইখানে অলৌকিক অধ্যাত্মজ্ঞান এবং বিশ্বরূপাদি সাধকের দর্শন হইয়া থাকে, এত বড় দৈবী সম্পৎ আর কিছুই নয়। আর যোগ—ক্রিয়ার পর-অবস্থার স্থিতি, অভ্যাসপটুতা দ্বারা ধারণা, ধ্যান, সমাধিতে স্থিতিলাভ করিতে পারা। এই যোগবস্থা প্রাপ্তির সাহায্য করে এবং জ্ঞানাবস্থা যোগপ্রাপ্তির সহায়তা করে।

(৪) দান—নিজস্ব অসক্তি পরিত্যাগ করিয়া তাহা পরার্থে উৎসর্গ করা ইহা দান। নিজ সামর্থ্যানুযায়ী অন্নাদির সংবিভাগ দ্বারাই ত্যাগ শিক্ষা হয়। বতক্ষণ পরার্থে নিজ চিত্ত, শক্তি,

সামর্থ্য ব্যয় করিতে না পারি ততক্ষণ চিত্ত স্বার্থভাবে কলুষিত থাকে। এইরূপ কলুষিতচিত্তে জ্ঞানলাভ বা যোগে নির্ভা কাহারও হইতে পারে না। সর্কাপেক্ষা বড় ত্যাগ বা দান ছীকে নংপথ—ভগবানের পথ দেখাইয়া দেওয়া। ক্রিয়াভ্যাসই ভগবন্তের প্রশস্ত উপায়—এইজ্ঞান ক্রিয়া-দানই সর্কশ্রেষ্ঠ দান।

(৫) দম—বাহ্যেজিয়-নিগ্রহ। যে নিজের ইন্দ্রিয়-দমনে অশক্ত, সে তো সমস্ত শক্তি ও অর্ধকে তাহার নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিরূপ বন্ধির ইন্ধনরূপে ব্যবহার করে, সে আর অপরের দুঃখ অভাবের কথা ভাবিবে কিরূপে? এইজ্ঞান অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির কখনও দান করিতে পারে না। বাহ্যার অভয় লাভ করিতে চান, তাঁহার এই জ্ঞানই ইন্দ্রিয় দমনে মনোযোগ করিবেন।

(৬) যজ্ঞ—বেদবিহিত দেবযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ—প্রভৃতি পঞ্চ মহাযজ্ঞ। মহত্ব জ্ঞানবামাত্রই পঞ্চযজ্ঞে ঋণী থাকে। এই সকল ঋণযুক্তি এই পঞ্চযজ্ঞ দ্বারা হইয়া থাকে। তাহা গীতার অগ্রাঙ্ক অধ্যায়ের ব্যাখ্যাকালে বলা হইয়াছে। এখানে আবার কিছু উল্লেখ করিতেছি। সাধকেরা, বিশেষতঃ দ্বিজাতির সন্ন্যাস-বন্দনার পরেই “দেবযজ্ঞ” করিবেন। দেবযজ্ঞ অর্থাৎ নিজ নিজ ইষ্ট-দেবতা ও গৃহদেবতার পূজা। প্রথমেই পঞ্চ দেবতার পূজা—

“আদিত্যং গণনাথক দেবীং কত্রং যথাক্রমং।

নারায়ণং বিত্তদাত্ত্ব্যমস্তে চ কুলদেবতাং ॥”

গণেশ, সূর্য্য, নারায়ণ, কত্র, দেবী ও শেষে কুল-দেবতার পূজা যথাক্রমে করিতে হইবে। পরে ইষ্ট ও গৃহ দেবতার পূজা করিতে হইবে

“অন্নেন স্তূমনোভিচ্চ গন্ধৈর্ধূতৈঃ প্রদীপটৈঃ।

গৃহস্থঃ পূজয়েন্নিত্যং স্বগৃহে গৃহদেবতাং ॥”

গৃহস্থ ব্যক্তি নিজগৃহ গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও অন্ন দ্বারা গৃহদেবতার পূজা করিবেন।

দেবপূজার পর—হোম। নিত্য হোমের অনুষ্ঠান এখন আমাদের দেশ হইতে প্রায় উঠিয়াই গিয়াছে। কিন্তু নিত্য হোমের অনুষ্ঠান করিতে পারিলে বড়ই ভাল হয়। ইহার উপকারিতা লোকে এখন আর বুঝিতে পারে না। এই নিত্য হোমের অনুষ্ঠান কিছু আড়ম্বরময় বা জটিল নহে। গৃহীর বাহা ধীর খাও—তাহাই দিয়া আচ্ছতির কার্য্য হইতে পারে।

বৈশ্বদেব—“যো বিশ্বং ভূনমাবিবেশ”—যে দেবতা বিশ্বভূবনে প্রবিশ্ট হইয়া রহিয়াছেন—সেই বিশ্বদেব বিশ্বের পূজা করিতে হইবে। শুধু “ও বৈশ্বদেবায় নমঃ”—বলিয়া প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে বৈশ্বদেবের পূজা ও আহুতি দিবে।—এই সকলই “দেবযজ্ঞের” মধ্যে।

শাস্ত্রাধ্যয়ন ও অধ্যাপনা দ্বারা ‘ঋষিযজ্ঞ’ সম্পাদিত হয়। তর্পণ ও প্রাজ্ঞা দ্বারা ‘পিতৃ-যজ্ঞ’ সম্পন্ন করিতে হয়।

বলি—ইহা দ্বারা সমস্ত প্রাণিগণকে অন্ন দ্বিবার ব্যবস্থা আছে—ইহাই ভূতযজ্ঞ। ‘দেবা মহন্তাঃ পশবো ব্যাসাশি’ হইতে “প্রোতাঃ পিশাচাস্তরবঃ সমস্তাঃ”।

“পিপীলিকা-কাঁট পতঙ্গকাছাঃ বৃদ্ধকিতাঃ কৰ্ম্মনিবন্ধবন্ধাঃ।

প্রয়াস্ত তে তৃপ্তিমিদং ময়ান্নং তেভ্যো বিস্তুষ্টং মুদিতা ভবন্ত ॥”

দেবতা, মহত্ব, কাঁট, পতঙ্গ, বৃদ্ধ এবং বন্ধুহীন ও পতিত বা পাপী আমার প্রদত্ত এই অন্নগ্রহণ করিয়া তৃপ্ত এবং মুদিত হউক।

অতিথি পূজা—নৃযজ্ঞ। “প্রিয়ো বা যদি বা দেব্যো মূখঃ পণ্ডিত এব বা।

সংপ্রাপ্তো বৈশ্বদেবাস্তে সৌহিত্তিঃ স্বর্গসংক্রমঃ ॥”

প্রিয় হউক, দেব্য হউক, মূখ হউক বা পণ্ডিত হউক—বৈশ্বদেব ক্রিয়ার অবসানে যে অতিথি প্রাপ্ত হইবে, সে সাক্ষাৎ স্বর্গপ্রদ।

“হিরণ্যগর্ভ বৃদ্ধা তং মন্তেভ্যোগ্যগতং গৃহী।” অভ্যাগত ব্যক্তিকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম! বলিয়াই মান্ত করিবে। অতিথির নাম, কুল, দেশ ও বিচার পরিচয় লওয়া শাস্ত্রে নিবেদ আছে। যদিও—“অন্তর্গাণ্ডিকা পূজা সর্কপূজাতমোত্তমা” তথাপি “বহিঃপূজা বিধাতব্য। যাবজ্জ্ঞানং ন জায়তে।”—এইজ্ঞান বাহ্য কৰ্ম্মাদির কথা এখানে বিস্তৃত ভাবে বলা হইল। কিন্তু যোগীদের আসল যজ্ঞ হইল ক্রিয়ার অভ্যাস। যোগ-যজ্ঞই সকল যজ্ঞের সার। প্রাণেতে অপান এবং অপানে প্রাণ-বায়ু হোমই প্রকৃত হোম। “ব্রহ্মার্কো হুয়তে প্রাণো হোমকৰ্ম্ম তদুচ্যতে।”

(৭) স্বাধ্যায়—বেদাদির অধ্যয়ন, বেদান্তাদি যোক্ষশাস্ত্রের আলোচনা। ইহা বাহ্যভাব। অধি+ই+অনট=অধ্যয়ন। ই ধাতু অর্থে গমন, অধি অর্থে উপরে। ক্রিয়া করিতে করিতে যখন প্রাণাপানের গতি উর্দ্ধে বা মস্তকে গিয়া স্থির হয়। “ইকারং পরমেশানি স্বয়ং কুণ্ডলী মুক্তিমান্” ইহাই পরমৈশ্বর্য্য; অধি মানে ঐশ্বর্য্য ও আধিপত্যও হয়। যখন কুণ্ডলিনী শক্তি সহস্রারে উখিত হইয়া তথায় স্থিতিলাভ করেন। সুতরাং পূজনীয় লাহিড়ী মহাশয় যে বলিয়াছেন “স্বাধ্যায়” অর্থে—বুদ্ধির পর পরা-বুদ্ধিতে স্থির থাকা, তাহা “স্বাধ্যায়ে”র ধাতুগুণটি অর্থ হইতে বেশ স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।

(৮) তপঃ—শারীর ক্রেশ, ইহার পরিচয় পরে দেওয়া হইবে।

“ন তপন্তপ ইত্যাহরন্ধ্রচর্য্যং তপোত্তমম্।

উর্দ্ধবেতা ভবেদ্ব্যস্ত স দেবো ন তু মাহুযঃ ॥”

ব্রহ্মচর্য্যই সর্বোত্তম তপস্যা। ব্রহ্মে বিচরণ অর্থাৎ ভাহাতে স্থিতিই আসল ব্রহ্মচর্য্য। কেবল মাত্র ভ্রক্ত ধারণেই উর্দ্ধবেতা হওয়া যায় না। বাহার রেতঃ উর্দ্ধগত হইয়াছে। কঠোর তপোমুষ্ঠান ব্যতীত কেহই উর্দ্ধবেতা হইতে পারে না। “রেতঃ” শব্দ “রী” ধাতু হইতে, বাহা করিত হয়; অর্থাৎ বাহা একস্থানে থাকে না, ক্রমাগতঃই বহির্গত হইয়া যায়। আমাদের “চিস্ত”ই সেই রেতঃ, এই চিস্ত যখন উর্দ্ধে উন্নীত হইয়া সেইখানেই স্থিত হয়—এমনটি বাহার হয়, তাহাকেই “উর্দ্ধবেতা” বলে।—উর্দ্ধবেতা ভবেদ্ব্যস্ত স দেবো ন তু মাহুযঃ”। এইজ্ঞানই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় তপের অর্থ করা হইয়াছে—“কুটস্থে ধাকা”।

(৯) আর্জ্জব—সরলতা। বাহার বাসনা অধিক সে সরল হইতে পারে না। লোভাতুর চিত্ত কি কখনও সরল হইতে পারে? এইজ্ঞান যতক্ষণ ইচ্ছা-কামনা জাগিয়া আছে ততক্ষণ বক্রতা থাকিবেই। আপনাতে আপনি তুষ্ট হই, অজ্ঞের অদৃষ্ট দেখিয়া তাহার দুঃখ হয় না, বরং অজ্ঞের সুখকেই নিজের সুখ বলিয়া মনে হয়। মনের স্বচ্ছতা থাকে—এইজ্ঞান লাভলাভের

অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্ ।

দয়া ভূতেষলোলুপ্তং মর্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥ ২

প্রতি দৃষ্টি থাকে না, হৃতরাং কাহাকেও হিংসা করিতে হয় না, এবং সেই ভাব গোপন রাখিবার জন্য ভাণ করিতে হয় না। বাহ্য বুদ্ধিতে আসে তাহা বলিয়া কেলে, হৃতরাং অগ্ধকেও ধোকা খাইতে হয় না ॥ ১

অনুয়। অহিংসা, সত্যম্, অক্রোধঃ (অহিংসা, সত্য, অক্রোধ) ত্যাগঃ শান্তিঃ (ত্যাগ ও শান্তি) অপৈশুনম্ (পরনিন্দাত্যাগ, অখলতা) ভূতেষু দয়া (সর্বভূতের প্রতি দয়া) অলোলুপ্তং (নিলোভ ভাব) মর্দবং (যুদ্ধতা) হ্রীঃ (কুর্কণ্ঠে লজ্জা) অচাপলম্ (অচাঞ্চল্য) ॥ ২

শ্রীধর কৃষ্ণ—অহিংসেতি। অহিংসা পরপীড়াবর্জনম্। সত্যং—যথার্থভাবণম্। অক্রোধঃ—তাড়িতম্যাপি চিত্তে ক্ষোভাহ্ব্যপত্তিঃ। ত্যাগঃ—ঔদার্যম্। শান্তিঃ—চিত্তোপরতিঃ। অপৈশুনম্—পৈশুনঃ পরদোষপ্রকাশনম্, তদ্বর্জনম্ অপৈশুনম্। ভূতেষু দয়া—দীনেষু দয়া। অলোলুপ্তং—লোভাভাবঃ (অবর্ণলোপঃ তু আর্ষঃ)। মর্দবং—যুদ্ধং, অক্রূততা। হ্রীঃ—অকার্য্য-প্রবর্ত্তো লোকলজ্জা। অচাপলং—ব্যর্থক্রিয়াবাহিত্যম্ ॥ ২

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন]—অহিংসা—পরপীড়াবর্জন। সত্য—যাহা ঠিক তদনুসরণ ভাবণ (যাহা যথার্থ তাহাই অসঙ্কোচে বলা)। অক্রোধ—কাহারও কর্তৃক তাড়িত হইলেও ক্রোধের অহ্ব্যপত্তি। ত্যাগ—ঔদার্য্য (যেমন দানে ক্রেশ বোধ না করা)। শান্তি—চিত্তের উপরতি। অপৈশুনম্—পরদোষ প্রকাশকে “পৈশুন” বলে, তাহার বর্জনকে অপৈশুন বলে। ভূতে দয়া—দীনের প্রতি দয়া। অলোলুপ্ত—লোভাভাব। অলোলুপ্ত—এই প্রকার শব্দের “প” এর “অ” কার লোপ হইয়া অলোলুপ্ত পদ হইয়াছে ইহা আর্ষ-প্রয়োগ। মর্দব—যুদ্ধতা, অক্রূততা। হ্রী—অকার্য্য করণে লোকলজ্জা। অচাপল্য—ব্যর্থক্রিয়া না করা ॥ ২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—হিংসা না থাকিলে ইচ্ছা থাকে না—ক্রিয়ার পর-অবস্থায় না থাকিলে ইচ্ছা নাশ হয় না—যত বস্তু দেখিতেছ সবই মিথ্যা, কারণ (যে) সবই দেখিতেছ ক্রিয়ার পর অবস্থায় কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না—অতএব সত্য সেই ব্রহ্ম; ক্রিয়ার পর-অবস্থায় আপনি আছি এরূপ বোধ হয় না, যখন আপনিই নেই তখন অগ্নও নেই, ক্রোধ কি প্রকারে কাহার উপরে থাকিবে? ক্রিয়ার পর অবস্থাতে কোন বিষয়ের ইচ্ছা থাকে না, কাজে কাজেই ইচ্ছাই নাই। তার ফল কি? ক্রিয়ার পর-অবস্থাতে আমিও কিছু নেই, আমারও কিছু নেই—আমিই নেই, তার খলতা করবো কার সঙ্গে—আমি মজাটা মারবো ও অন্যকে মজাটা মারতে দিই ইহারই নাম দয়া; ব্রহ্মব্যভূত অগ্ন বস্তু নেই, লোভ কিসে করবো—সকল লোকের কথার উপর টঙ্কা (টেকা)—ভিজ্ঞে ভান্নি কথা অর্থাৎ কাজের কথা কাহারও মুখ হইতে বাহির হয় না যাহা ক্রিয়ার পর-অবস্থায় হয়—তখন চঞ্চল থাকে না।—

(১০)—অহিংসা—প্রাণীদিগকে পীড়িত না করা। হিংসা বহির্ভূত জীবের স্বাভাবিক ধর্ম। পরপীড়ন না করিলে জীবিকা চলে না, এই জন্য জীব হিংসাপরায়ণ। যতদিন নিজের সুবেচ্ছা থাকিবে, ততদিন সেই ইচ্ছা পূরণার্থ অন্যকে পীড়ন না করিয়া উপায় নাই; এইজন্য ঐহিকের বাসনা সংযত হইয়াছে, নিজের সুখমভিলাষের দিকে দৃষ্টি নাই, তিনিই হিংসামূর্ত্ত হইতে পারেন। যতক্ষণ ইচ্ছার নাশ না হয়, ততক্ষণ এ অবস্থা আসে না। ক্রিয়ার পর-অবস্থাতেই সকল ইচ্ছার সম্যক নাশ হয়। পরাবস্থায় যাহারা থাকেন সেই সকল মহাপুরুষই আপনাতে আপনি স্তব্ধ। তাঁহাদের চিন্তামধ্যে হিংসায় চেউ খেলে না, তাই তাঁহাদের হৃদয় বিশ্বপ্রেমে পূর্ণ। কোন হিংস্রক জন্তুও তাঁহাদিগকে হিংসা করে না, বরং তাঁহাদের নিকটে আসিলে তাহাদের স্বীয় হিংস্র-স্বভাব পর্যন্ত শোধিত হইয়া যায়।

(১১) সত্য—যে বস্তু যাহা—তাহাকে সেই ভাবে ঠিক বলাই সত্য। রাখিয়া ঢাকিয়া বলা, বা যাহা নয় তাহাই বলা ইহার বিপরীত। মিথ্যা বোচক হইলেও বলা উচিত নহে, সত্য অপ্রিয় হইলে বা পরের পীড়াদায়ক হইলে সত্যও মিথ্যার সমান। ইহা হইল বাহিরের কথা। প্রকৃত কিস্ত সত্য অল্প বস্তু। “ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা”—ব্রহ্মই সত্য আর এ সমস্ত দৃশ্য পদার্থই মিথ্যা। ক্রিয়ার পর-অবস্থায় এই দৃশ্য পদার্থের অস্তিত্বই অসুভব হয় না, কিন্তু কোন আবস্থাতেই সত্য বা ব্রহ্ম-সত্তার অভাব হয় না।

(১২) অক্রোধ—অল্প কর্তৃক পীড়িত ও অপমানিত হইলেও মনে কোন অশ্রু ভাব না হওয়া; তখনও মনের শমতা নষ্ট হইতে না দেওয়া। ক্রিয়ার পর-অবস্থায় আপনি আছি কি নাই, অল্প কেহ আছে বা নাই—এ সব বোধই থাকে না; হৃতরাং কেহ আমাকে পীড়ন করিল এ কথা মনে উন্নয়ই হয় না, তবে ক্রোধ হইবে কাহার উপর? আমি বা অপর কেহ থাকিলে তবে তো ক্রোধ হইবে

(১৩) ত্যাগ—সর্ব কর্তৃক করিয়াও কর্তৃফল ইন্দ্রে সমর্পণ করাই ত্যাগ। এই ত্যাগই প্রকৃত সন্ন্যাস। সাংসারিক কোন ভোগের প্রতিই আসক্তি না থাকা। ক্রিয়ার পর-অবস্থাতেই এই ত্যাগ পূর্ণরূপে হুটিয়া উঠে, কোন বস্তুই স্পৃহা থাকে না।

(১৪) শান্তি—অন্তঃকরণের উপশম বা চিত্তের উপরতি। ক্রিয়ার পর-অবস্থায় এবং পরাবস্থার পরাবস্থাতেও এই শান্তি উপলব্ধি করা যায়। মন সঙ্কল্পশূন্য, হৃতরাং মন নাই, চিত্তের এই নিস্তরঙ্গ অবস্থাই শান্তির অবস্থা।

(১৫) অপৈশুন—পরের নিকট অপরের ছিত্ত প্রকাশ না করা, কাহারও দোষকীর্তন না করা। খলস্বভাবের লোকেরাই পরের দোষকীর্তনে শতমুখ হয়। ক্রিয়ার পর-অবস্থায়—আমিও থাকে না, আমারও থাকে না, হৃতরাং আমি নাই অল্প কেহও নাই, খলতা কে কাহার উপর করিবে?

(১৬) ভূতে দয়া—হুঃখিত বা ব্যথিত প্রাণীর প্রতি রূপা বা সহানুভূতি। আমি সাধন করিয়া শান্তি পাইতেছি, আনন্দ পাইতেছি, এই তাপিত জীবও বাহাতে সেই শান্তি উপভোগ করিতে পারে তজ্জন্য যে চেষ্টা। লোকে বাহাতে ক্রিয়া করে ও ক্রিয়া পায় তাহাই করা।

তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা ।

ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্ত ভারত ॥ ৩

বহিরের অত্যন্ত অর্থাদির দ্বারা নষ্ট হইতে পারে, কিন্তু মনে যে দিব্যাত্ম অশাস্তির চিত্তা জলিতেছে, তাহাই নির্দোষ করিবার উপায় ধরাইয়া দেওয়াই প্রকৃত “দয়া” ।

(১৭) অলৌকিকতা—বিষয় নিকটে আসিলেও ইন্দ্রিয়সমূহের অধিকৃতি । ব্রহ্মজ পুরুষের কোন বস্তু প্রতিই লোভ থাক না, কারণ তিনি জানেন এক ব্রহ্মপদার্থ ব্যতীত আর কোন বস্তুই নাই ।

(১৮) মার্দিব—মৃদুতা, অক্লমতা । দান্তিকতার অভাব, পরের প্রতি ব্যবহারে কোমল ভাব রক্ষা করা । পদে পদে চটখা না উঠা বা সামান্য কারণেই ব্যতিব্যস্ত না হওয়া ।

(১৯) লজ্জা—অকারণে অপ্রতি । সকলকে উপেক্ষা করা বড় গুণের সন্নিহিত । “যা দেবী সর্বভূতেষু লজ্জাক্রপেণ সংস্থিতা ।” এই লজ্জা না থাকিলে মানুষ পণ্ড অপেক্ষা হীন হইয়া যায়, কোন কুর্ধ্য করিতেই তাহার চিন্তে বাধা আসে না । আমি যাহার ক্রপালাভের জন্য ব্যাকুল, তাঁহার প্রিয় কার্য সাধনে তৎপর না হইয়া অকারণে প্রবৃত্ত হইলে, কোন মূল লইয়া তাঁহার নিকট দাঁড়াইব ? এইরূপ যে মনোবৃত্তি তাহাই “লজ্জা” । এমন সুকুমার বৃত্তি আর নাই । লজ্জা বাহার আছে—শ্রী, সৌন্দর্য্য তাহার চিরদিন থাকে, তাহার শোভায় সকলেই মুগ্ধ হয় ।

(২০) অচাপল্য—বিনা প্রয়োজনে থাক, পাশ বা পাদ প্রভৃতির ব্যাপার না থাকাই অচাপল্য । এই চাপল্যের আর অন্ত নাই । মানুষের মন, ইন্দ্রিয় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি সর্বদাই ব্যাপার যুক্ত । কি যে করিতেছে, কেন যে করিতেছে তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারে না । অথচ এই চাপল্যের হাপটে সমস্ত নরনারীই অধির—ঠিক পাগলের মত । যে প্রোত্যাহ নিয়মিত ভাবে মনোযোগ সহকারে ক্রিয়া করে তাহার এই চাপল্য ধীরে ধীরে হ্রাস হইয়া যায়, শেষে এত হ্রাস হয় যে তাহার চিত্ত ধ্যানাশ্রমশীলনের যোগ্যতা লাভ করে । ধ্যাননিষ্ঠ চিন্তেই সমাধি আসন্ন হয় ॥২

অময় । ভারত (হে ভারত !) তেজঃ, ক্ষমা, ধৃতিঃ শৌচম্ (তেজ, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ) অদ্রোহঃ (অদ্রোহ) নাতিমানিতা (অনতিমান) [এই গুণগুলি] দৈবী সম্পদম্ অভিজাতস্ত (দৈবী সম্পদের অভিমুখে জাত ব্যক্তির) ভবন্তি (হইয়া থাকে) ॥ ৩

শ্রীধর । কিঞ্চ তেজ ইতি । তেজঃ—প্রাগলভ্যম্ । ক্ষমা—পরিভবাহিষু উৎপন্নমানেষু ক্রোধপ্রতিবন্ধঃ । ধৃতিঃ—দুঃখাহিতিঃ অবসীদতঃ চিন্তস্ত স্থিরীকরণঃ । শৌচম্—বাহ্যভ্যন্তর-তৃষ্ণিঃ । অদ্রোহঃ—দ্বিবাংসারাহিত্যম্ । অতিমানিতা—আত্মনি অতিপূজ্যভিমানঃ, তদভাবঃ নাতিমানিতা । এতানি অভ্যাসানি বড়বিশংখিতপ্রকারানি দৈবীঃ সম্পদম্ অভিজাতস্ত ভবন্তি । দেবযোগ্যাং সাত্ত্বিকীং সম্পদম্ অভিলক্ষ্য তদাত্মিকমুখ্যেন জাতস্ত ভাবিকল্যাণস্ত পুংসঃ ভবন্তি ইত্যর্থঃ ॥ ৩

বঙ্গভূবাদ । [আরও বলিতেছেন]—তেজঃ—প্রাগলভ্য (তেজস্বিতা) । ক্ষমা—

পরাক্রমের উপস্থিতিতে ক্রোধ হইলেও সেই ক্রোধকে বাধা দেওয়া । ধৃতি—দুঃখাহি দ্বারা অবসাদগ্রস্ত চিত্তকে স্থিরীকরণ । শৌচ—বাহ্যভ্যন্তর তৃষ্ণি । অদ্রোহ—দ্বিবাংসারাহিত্য । নাতিমানিতা—আপনাতে অতি পূজ্যভিমানকে অতিমানিতা বলে, তাহার অভাব । অন্তর প্রকৃতি এই বড়বিশংখিতপ্রকার দৈবীসম্পদ অভিজাত ব্যক্তির হইয়া থাকে । দেব-যোগ্য সাত্ত্বিকী সম্পদ লক্ষ্য করিয়া বাহ্যের জ্ঞানগ্রহণ করে, এবং বাহ্যের জীবন ভাবী-কল্যাণময় সেই সকল পুরুষের এই সকল দৈবীসম্পদ জন্মিয়া থাকে ॥ ৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—তেজ অর্থাৎ মনের তেজ, বাহার দ্বারায় সমুদয় দেখিতে পায় ও করিতে পায়—কোন বিষয় গ্রাহ্য না করিয়া ক্ষমা করে—আপনা আপনি স্থির থাকে, সর্বদা ব্রহ্মতে থাকে—পরের অনিষ্ট জেনে করে না—অভিশয় মানের অভিলাষ থাকে না, অল্প স্বল্প থাকে যাহা আবশ্যক—ইহা সকল ক্রিয়ার পর-অবস্থায় থাকিতে থাকিতে ব্রহ্মতে সর্বদা থাকায় সম্যক প্রকারে এই সকল অবস্থা প্রাপ্ত হয়, ইহারই নাম দৈবীসম্পদ—

(২১) তেজঃ—এ তেজ বাহ্য যুগপৎ দীপ্তি নহে, এ তেজ মনের সাহস, স্বপ্নের বল ও উৎসাহ, এই তেজ বাহার থাকে সে কখনও কাম, লোভ প্রভৃতির দ্বারা পরাভূত হয় না, সহস্র বিপদপাতেও সত্য বা ধর্ম্মপথ হইতে বিচ্যুত হয় না । সাধনার দ্বারায় মনের এই তেজ এত বৃদ্ধি পায় যে তখন তাহাকে যোগবল বলা যায়, এই তেজ বাহার যথেষ্ট বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তিনি উদ্ধারায় বাহা দেখিতে ইচ্ছা করেন তাহাই দেখিতে পান এবং বাহা করিতে ইচ্ছা হয় তাহাই করিতে পারেন ।

(২২) ক্ষমা—কেহ গালি দিলে বা তাড়না করিলে সামর্থ্য সত্ত্বেও যিনি তাহা সহ করেন ক্রোধ হইতে বেন না, বড়ি বা ক্রোধ হয় তখনই মনের বেগকে প্রশমিত করিতে পারেন, তাহার মনোবিকার বাহিরে কেহ বুঝিতেও পারে না । ক্রিয়ার পরাবস্থায় পরাবস্থাতে ব্যোম্ভোলা হইয়া বসিয়া আছেন, কে কি তাঁহাকে বলিতেছে তাহা গ্রাহ্যও করেন না ।

(২৩) ধৃতি—শব্দ বলিয়াছেন—“দেহ ও ইন্দ্রিয়গণ অবসাদ প্রাপ্ত হইলে, তাহার প্রতিষেধের ক্ষমতা অস্তঃকরণের যে বিশেষ বৃত্তি তাহাই ধৃতি,” অর্থাৎ যে বৃত্তি দ্বারা দেহ ও ইন্দ্রিয়শক্তি উত্তেজিত হয়, অবসন্ন হইতে পারে না । ধৃতি প্রকৃত পক্ষে যোগ-ধারণা, এই ধৃতি যত বর্দ্ধিত হয় ততই যোগী আপনা আপনি স্থির হইয়া যান । মন বিক্ষেপশূন্য হয় বলিয়া সুখ-দুঃখ যোগীকে তখন চঞ্চল করিতে পারে না ।

(২৪) শৌচ—বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে ইহা দুই প্রকার । বৃত্তিকাদি জলাধির দ্বারা যে শৌচ তাহা বাহ্য, মন বুদ্ধির নির্মলতাই আভ্যন্তর শৌচ । এ শৌচ তখনই সম্পূর্ণ হয়, যখন ক্রিয়ার পর-অবস্থায় স্থিতি হয়;—তখনই ব্রহ্ম-ভাব, তখন আশ্রিত নাই ও সমস্তই এক বোধ হয় । আকাশই সর্বাপেক্ষা শুচি, সেই চিদাকাশে যিনি অবস্থিত তদপেক্ষা শুচি আর কে হইবে ?

(২৫) অদ্রোহ—লোকের সহিত বিরোধ না করা । জানিয়া শুনিয়া যোগী পরের অনিষ্ট করেন না, যাহাতে লোকের অনিষ্ট হয়, এরূপ কার্য ও চিন্তা হইতে যোগী বিরত থাকেন । যে উদাসীন তাহার সহিত কাহারও বিবাহ হয় না ।

(আত্মরী সম্পদ)

দন্তো দর্পোহি ভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুয্যমেব চ ।

অজ্ঞানং চাভিজাতস্ত পার্থ সম্পদমাসুরীম্ ॥ ৪

(২৬) অনতিমানিতা—অতিমান অর্থাৎ আমি অতিশয় পুণ্য এইরূপ অভিমান না থাকা । সাধনায় খুব অহুরাগ আছে, সাধনও বেশ করিয়া থাকেন, তবুও মনের অশুদ্ধতা নষ্ট হয় নাই ; তাই মনে হয় লোকে আমাকে সাধক বলিয়া জাহুক, আমার শক্তির প্রশংসা করুক ও সম্মান করুক । মনের এ ভাব থাকিলে সাধনায় প্রকৃত উন্নতি হইবে না । মন অতিশয় অভিলাষে পূর্ণ থাকে ;—যাহা না থাকিলে নয়, সেই স্বল্পমাত্র অভিলাষ তাঁহার থাকে । অতি অল্পে বাহার সন্তোষ, তাঁহার আবার লোকের নিকট বড় হইবার জন্য ইচ্ছা থাকিবে কেন ?

বাহার পূর্বজন্মের স্মৃতি কলে এই সকল দৈবীসম্পদের অধিকারী হইয়াই জন্মগ্রহণ করেন, তাহাদের উপরোক্ত গুণ সকল স্বাভাবিক হয় । শ্রুতি বলিয়াছেন—“পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্তব্যঃ ভবতি পাপঃ পাপেন”—পূর্ব পূর্ব জন্মের পুণ্য দ্বারা পুণ্যময়ী বাসনা হেতু জীব উত্তরোত্তর পুণ্যবান্ ও পাপ বাসনা দ্বারা পাপযুক্ত হইয়া থাকে ॥ ৩

অন্থর । পার্থ (হে পার্থ !) দন্তঃ (ধর্মধ্বজিত) দর্পঃ অভিমানঃ ক্রোধঃ চ (দর্প, অভিমান ও ক্রোধ) পারুয্যম্ (নিষ্ঠুরতা) অজ্ঞানং চ এব (ও অজ্ঞান) আসুরীং সম্পদম্ অভিজাতস্ত (আত্মরী সম্পদ অভিযুক্ত জাত ব্যক্তির) [হইয়া থাকে] ॥ ৪

শ্রীধর । আসুরীং সম্পদমাহ—দন্ত ইতি । দন্তঃ—ধর্মধ্বজিতঃ । দর্পঃ—ধনবিচাধি-নিমিত্তঃ চিন্ত্য উৎসেকঃ । অভিমানঃ—ব্যাখ্যাত এব । ক্রোধঃ প্রসিদ্ধঃ । পারুয্যম্—নিষ্ঠুরতম্ । অজ্ঞানম্—অবিবেকঃ । আসুরীম্ ইতি উপলক্ষণম্ । অসুবাণং রাক্ষসানাঞ্চ বা সম্পৎ তান্ অভিলক্ষ্য জাতস্য এতানি দন্তাদীন ভবন্তি ইত্যর্থঃ ॥ ৪

বঙ্গানুবাদ । [আত্মরী সম্পদ বলিতেছেন]—দন্ত-ধর্মধ্বজিতঃ । দর্পঃ—ধনবিচাধি-নিমিত্তঃ চিন্তের উৎসেক অর্থাৎ অভিমান । অভিমানের ব্যাখ্যা পূর্বেই করা হইয়াছে (অতি পূজ্যের অভিমান) । ক্রোধঃ প্রসিদ্ধ অর্থেই ব্যবহৃত অর্থাৎ যাহাকে ক্রোধ বলা যায় । পারুয্যম্—নিষ্ঠুরতা । অজ্ঞান—অবিবেক । বাহার আসুর রাক্ষসী সম্পৎ লক্ষ্য করিয়া জন্মিয়াছে তাহাদিগের ঐ দন্তদর্পাদি হইয়া থাকে ॥ ৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—মনে মনে কুলীন বলিয়া দোমাক্ করা—জোর আছে বলিয়া বুক চাড়া দিয়া চলা—যত মান আবশ্যক তাহার অপেক্ষা জেয়াদা প্রার্থনা করা—সর্বদা রেগেই থাকা—নিষ্ঠুর বচন বলা—আর আত্মাতে না থাকা অর্থাৎ ক্রিয়ানা করা—ইহা সকল আসুরী সম্পদ অর্থাৎ ক্রিয়া যারা করে না তাহাদিগের এইরূপ স্বভাব আপনা আপনি হয় ।—(১) দন্ত—ধাত্মিকত্ব ব্যাপনের জন্য ধর্মগ্রহণ, তাহাকে ধর্মধ্বজী বলে । হাতে মালা ফিরাতেছে, কিন্তু মন অন্য স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে । মনে মনে বিষয় চিন্তাই হইতেছে, কিন্তু নিকটে

(দৈবী ও আত্মরী সম্পদের ফল)

দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধ্যাসুরী মতা ।

মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতেশ্চি পাণ্ডব ॥ ৫

লোক কেহ আসিতেছে দেখিলে অমনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানের ভাগ করা । নিজে অত সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এইরূপ বিশ্বাস, কিন্তু যুধে একবারে বিনয়ের পরাকাষ্ঠা । নিজেই খুব বড় কুলীন বলিয়া অভিমান আছে, কিন্তু কার্যে মেথরের অধম । এইরূপ পরবন্ধনাই দন্ত ।

(২) দর্প—ধনে, মানে, বিচার্য বৃত্তিতে আমার তুল্য কেহ নাই এইরূপ ধারণা । ধন-জনের গর্বে মাটিতে পা পড়ে না । চলিবার সময় সর্বদা বুক চাড়া দিয়া চলে । অত কাহারও কথা বলিবার সময় সর্বদা নাক সিটকাই এবং অত তাহাঁপেক্ষা কত ছোট আকার ইচ্ছিতে ইহাই প্রকাশ করে । নিজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে অবমাননা করিতে সঙ্কচিত হয় না । কেহ তদপেক্ষা বেশী জানে বা বিচার্য জানে বড়—ইহা শুনিতেই পারে না । সবজ্ঞতা ভাব—এই সবই দর্প ।

(৩) অভিমান—আমি পুণ্য, সর্ববিষয়ে আমি শ্রেষ্ঠ এইরূপ ধারণা । কিন্তু অভিমান সকলেরই থাকে । কিছু অভিমান থাকা সকল সময়ে বাধাপও নহে, কিন্তু অধিক অভিমান ভাল নহে । কাহারও হয়তো পাণ্ডিত্য আছে, কিন্তু তজ্জ্ঞান অভিমানে আর সকলকেই বুদ্ধ বোধ করা ইহাই অভিমান, আর পাণ্ডিত্য মোটেই নাই অথবা বৎসামাত্র আছে কিন্তু তাহারই অভিমানে ক্ষীণ হইয়া থাকাই দর্প ।

(৪) ক্রোধ—সর্বদা রাগিয়া থাকা, এতটুকু নিজের মতলবের বাহির হইলেই উত্তেজিত হওয়া । ক্রোধীকে লোকে ভয় করে ও ঘৃণা করে ।

(৫) পারুয্যম্—নিষ্ঠুর বচন বলা, লোকের মর্মে আঘাত দিয়া কথা বলা । লোকের জাতি কুল বা অঙ্গহীনতাদির জন্য বিক্রপ করা । জীবকে অথবা কষ্ট দিবার প্রবৃত্তি ।

(৬) অজ্ঞান—অবিবেক, কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে মিথ্যা ধারণা । যোগন নিজে আলস্ত বশতঃ কিছুই করিব না, যুধে বলিব ভগবান্ যেরূপ করাইতেছেন সেইরূপই করিতেছি, তাহার ইচ্ছা বাস্তবী কিছু হয় না ইত্যাদি । ক্রিয়া করিলে বা সাধনা করিলে প্রকৃত মঙ্গল হইবে, আত্মপ্রতিষ্ঠা হইবে, শান্তিলাভ হইবে, কিন্তু অত কে করে—এইরূপ প্রমাদ এবং আলস্তে কালক্ষয় করা । বাহার সাধন করে না তাহাদের বুদ্ধি আরও বিকৃত হয় । পূর্ব-জন্মের সাধনা বাহার থাকে তাহার এরূপ দুর্গতি হয় না, সাধনাতে তাহার প্রবৃত্তি যতঃই হইয়া থাকে । কিন্তু বাহারের পূর্ব পূর্ব জন্মে কিছু করা না থাকে, তাহাদেরই বুদ্ধিতে এই সব বিপরীত ভাব আসিয়া থাকে । আত্মরী সম্পদ ভোগ করিবার জন্য বাহারের জন্ম তাহাদেরই দন্ত দর্প প্রবৃত্তি হইয়া থাকে ॥ ৪

অন্থর । দৈবী সম্পদ (দৈবী সম্পদ) মোক্ষায় (বিমোক্ষের নিমিত্ত) আত্মরী (আত্মরী সম্পদ) নিবন্ধ্য (বন্ধনের নিমিত্ত) মতা (অভিপ্রেত) : পাণ্ডব (হে পাণ্ডব !) মা শুচঃ

22

প্রবৃত্তিঃ চ নিবৃত্তিঃ চ জনা ন বিদুরাস্থরাঃ ।

ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেবু বিদুতে ॥ ৭

শ্রীধর । আসুরী সম্পৎ সর্বাশ্রম্য বর্জয়িতব্য ইত্যেতৎ অর্থম্ আসুরী সম্পৎ প্রপঞ্চয়িত্ব-
মাহ—দাবিতি । যৌ—বিপ্রকারো ভূতানাং সর্গো মে মঘচনাং শৃণু । আসুররাক্ষসপ্রকৃত্যোঃ
একীকরণো যৌ ইত্যুক্তম্ । অতঃ “রাক্ষসীমাসুরীকৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতা”—ইত্যাদিনা
নবমাধ্যায়োক্ত প্রকৃতিত্রৈবিধ্যেন অবিরোধঃ । স্পষ্টম্ অন্তঃ ॥ ৬

বঙ্গানুবাদ । [আসুরী সম্পৎ যে সর্বতোভাবে বর্জনীয় এতদর্থে আসুরী সম্পদের কথা
বিস্তৃতভাবে বলিতেছেন]—ভূতগণের যে দুই প্রকার সৃষ্টি তাহা আমার বাক্য হইতে প্রবণ
কর । আসুর ও রাক্ষস প্রকৃতিকে এক করিয়া ধরা হইল, এই দ্রুত সৃষ্টি দৈব ও আসুর এই
দুই প্রকার বলিয়া বর্ণন করা হইল । অতএব নবম অধ্যায়ে “রাক্ষসীমাসুরীং” ইত্যাদি শ্লোকে
যে ত্রিবিধ প্রকৃতির কথা বলা হইয়াছে তাহার সহিত বিরোধ হইল না । অপর অংশ স্পষ্ট
অর্থঃ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই ॥ ৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—দুই রকমের লোক, এক দৈবী ও এক আসুরী—দৈবীর
বিষয় অনেক বলিয়া আসিয়াছি, ক্রিয়া যারা না করে তাহাদিগের মন
কোন কোন বস্তুতে থাকে তাহা এক্ষণে বলিতেছি ।—মহুগুণের সৃষ্টি ‘ভূতসর্গ’ ।
এই ভূতসর্গ দুই প্রকার । সৃষ্ট মহুগুণ মাত্রেই—হয় দৈবীসম্পদযুক্ত কিম্বা আসুরসম্পদযুক্ত । দৈবী
ভূতসর্গের পরিচয়—ষষ্ঠীয় অধ্যায়ে হিতপ্রজ্ঞ পুরুষের লক্ষণ বর্ণনায়, ষাটশ অধ্যায়ে ভক্তের
লক্ষণ ব্যাখ্যায়, ত্রয়োদশ অধ্যায়ে জ্ঞানের বিষয় বলিয়া দিয়া, চতুর্দশ অধ্যায়ে গুণাতীতের
লক্ষণ বর্ণনা কালে এবং ষোড়শ অধ্যায়ে “অভয়ং সত্যসংক্রান্তিঃ” প্রভৃতি বাক্য—বিস্তৃত ভাবে
বলা হইয়াছে, এইবার আসুর ভূতসর্গের বিষয় ভগবান্ বলিবেন, কারণ আসুরের গুণসাহিনী
ভান্দেই জীব সেই ভয়ঙ্কর আসুর ভাব ভ্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইতে পারে । অর্থাৎ আমি কোন
প্রকৃতির লোক তাহা মিলাইয়া লওয়া বাইতে পারে এবং আপনাকে আপনি সংশোধন করা
বাইতে পারে । ক্রিয়া করাবই বা কি ফল তাহাতো অনেক পূর্বে বলিয়াছি, এখন ক্রিয়া না
করাই কি ফল, ক্রিয়াহীনের মন কিরূপ বিষয়ে আবদ্ধ থাকে—তাহাই বলা হইতেছে, যদি
তাহা শুনিয়া আসুর প্রকৃতির লোকেরা সাবধান হয় ও নিজ নিজ চরিত্রের সংশোধনে
প্রবৃত্ত হয় ॥ ৬

অর্থঃ । আসুরাঃ জনাঃ (আসুর স্বভাবের লোকেরা) প্রবৃত্তিঃ চ নিবৃত্তিঃ চ (প্রবৃত্তি
এবং নিবৃত্তি) ন বিদুঃ (জানেন না) ; তেবু (তাহাদের মধ্যে) ন শৌচং (শৌচ নাই) ন চ
আচারঃ (আচারও নাই) ন অপি সত্যং বিদুতে (আর না সত্যই বিদ্যমান আছে) ॥ ৭

শ্রীধর । আসুরীং বিদুরশঃ নিরুপয়তি—প্রবৃত্তিঃ চেত্যাঃ দ্বাদশভিঃ । ধর্মে প্রবৃত্তিঃ
অর্থঃ নিবৃত্তিক আসুরস্বভাবা জনা ন জানন্তি । অতঃ শৌচম্ আচারঃ সত্যং চ তেবু
নাভ্যেব ॥ ৭

বঙ্গানুবাদ । [‘প্রবৃত্তিঃ চ’ হইতে দ্বাদশটি শ্লোকে আসুরী সম্পৎ বিদুতপূর্বক নিরূপণ

করিতেছেন]—আসুর স্বভাবগ্ন ব্যক্তির ধর্মে প্রবৃত্ত আর ধর্মে নিবৃত্ত হইতে জানে
না । অতএব তাহাদের মধ্যে, শৌচ নাই, আচার নাই এবং সত্যও নাই ॥ ৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—একবার মনে হয় করি আবার মনে হয় করবো না—
এই ক্রিয়া যারা করে না তাহাদিগের এইরূপ ভাব হয়—তাহারা ব্রহ্মোত্তে
ধাকে না অর্থাৎ কোন বিষয়েরই নিশ্চয় নাই—কোন এক আচারে থাকে না—
মিথ্যা ভিন্ন সত্য বলতে জানে না—সত্য তাদের কাছে একেবারে নাই ।—ধর্ম
দুই প্রকার প্রবৃত্তিমূলক ও নিবৃত্তিমূলক । প্রবৃত্তিমূলক ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা লোকের স্বকৃতি
সঞ্চয় হয়, এবং নিবৃত্তিমূলক ধর্ম্ম দ্বারা জীব মুক্তিমার্গে অগ্রসর হয় । কিন্তু এ সমস্তই
স্বেচ্ছামূলক নহে, সমস্তই শাস্ত্রবিধি দ্বারা শাসিত । স্বতরাং উভয়েতেই শাস্ত্রানুগত পুরুষার্ধ
করিবার প্রয়োজন হয় । এইদ্রুত শাস্ত্রবিধি কি তাহা জানা আবশ্যক । শাস্ত্রীয় বিধি-নিবেশ
না জানিলে তদনুগত হইয়া কার্য করিবার উপায় নাই । এই সকল আসুর প্রকৃতির
লোকদের ধর্মে প্রবৃত্তি নাই, স্বতরাং ধর্ম্মশাস্ত্রের শাসন তাহারা জানেও না, গ্রাহও করে না,
অর্থম্ হইতেও তাহাদের নিবৃত্তি নাই, স্বতরাং নিবৃত্তি মার্গে যাইবার মত তাহাদের মানসিক
শক্তিরও নিত্য অভাব । কি যে ধর্ম্ম আর কি যে অধর্ম্ম এ সব অহুসঙ্কান করিয়া দেখিবার
মত তাহাদের সামর্থ্যও নাই ইচ্ছাও নাই । যাহারা এইরূপ ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানশূন্য তাহাদের শৌচ
সদাচারই বা কিরূপ থাকিবে ? তাহাদের মধ্যে এই দ্রুত সত্যও থাকিতে পারে না । ইন্দ্রিয়-
ভোগ-সুখাদিতে তাহারা এত উন্মত্ত, যে সেই সকল ভোগ্য বস্তু প্রাপ্তির দ্রুত সহস্র সহস্র মিথ্যা
প্রবঞ্চনা যদি করিতে হয় তাহাও তাহারা করিতে প্রস্তুত । এই সকল মিথ্যাবাদী কপট ও
বঞ্চকের নিকট আবার সত্যই বা কি, শৌচ-সদাচারই বা কি ? আপনার অভিপ্রায় সিদ্ধ
হইলেই হইল । তাহারা যদি সাধন গ্রহণও করে এবং করিব বলিয়া গুরু নিকট প্রতিজ্ঞাও
করে, তবু সে প্রতিজ্ঞা বাধিতে পারে না, কত রকম মিথ্যা ছল করে । যদি বা কখনও মনে হয়
সাধন করি, কিন্তু এত ভোগাসক্তচিত্ত যে ভোগের বস্তু পাইলেই সাধন মাধ্যম রহিয়া যায় ।
আধ্যাত্মিক বিষয়ে নিশ্চয় প্রত্যয় তো তাহাদের নাই, তবুও লোক দেখানো কিছু অনুষ্ঠান
করিলেও তাহাতে স্থির বিশ্বাস হয় না । যদি কাহাবও নিকট গুনিতে পায় যে ওরূপ অভ্যাসে
শরীর অস্থির হইবে, অমনি ভয় পাইয়া সাধন ছাড়িয়া দিল । অথবা যদি কেহ বলে এমন
একটি সাধু আসিয়াছে যিনি মন্ত্রের দ্বারা সুবর্ণ প্রস্তুত করিতে পারেন, তবে চলিল তখনই
তাঁহার নিকট সুবর্ণ প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিক্ষা করিতে ; এইরূপ তাহাদের মনোভাব ।
এই সব দুর্বলচেতারা কি আর সত্যের মর্যাদা রক্ষা করিতে পারে ? প্রবৃত্তি অর্থে ইষ্টসাধন
সম্বন্ধে যত বিশেষ—ইহাকেই সাধনা বা ক্রিয়া বলে, আর এই ইষ্টসাধন বা ক্রিয়া করিয়া
ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে মনের বিরাম বা বিশ্রাম হয়, তাহাই নিবৃত্তি । যাহারা শ্রম নহে—
অশ্রম অর্থাৎ বাহ্যের চিত্তে রাস্তিক ও তামসিক ভাব অভ্যস্ত প্রবল, তাহারা ক্রিয়া লয়ও
না, করেও না, ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে শান্তি তাহা তাহারা আরো অবগত নহে । স্বতরাং
ব্রহ্মরূপ সং বস্তুর বিষয়ে তাহাদের কোন অহুসঙ্কানই নাই, এবং তদনুযায়ী জীবনকে চালাই-
বার প্রণালী বা আচারও তাহারা অবগত নহে ; এবং তাহাদের উহা ভালও লাগে না ॥ ৭

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহরনীশ্বরম্ ।

অপরম্পরসত্ত্বং কিমন্তং কামহৈতুকম্ ॥ ৮

অনুসন্ধান। তে (তাহারা) জগৎ (জগৎকে) অনন্তম্ (মিথ্যা অর্থাৎ বেদাদি প্রমাণশূন্য) অপ্রতিষ্ঠম্ (ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ ব্যবস্থাবিহীন অর্থাৎ স্বাভাবিক) অনীশ্বরম্ (ঈশ্বরশূন্য) অপরম্পর-সত্ত্বতম্ (স্ত্রীপুরুষসংযোগ ভাত) কিমন্তং (ইহার অন্ত কোন কারণ নাই) [কেবল] কামহৈতুকম্ (কাম ভোগার্থ মাত্র) আন্তঃ (বলিয়া থাকে) ॥ ৮

শ্রীধর। নহু বেদোক্তযোঃ ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ প্রবৃতিং নিবৃতিং চ কথং ন বিদুঃ ? কুতো বা ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ অনন্তীকারে জগতঃ সৃষ্টিঃ বাহি ব্যবস্থা শ্রাৎ, কথং বা শৌচাচারাদিবিষয়ম্ ঈশ্বরাজ্ঞা অতিবর্ত্তেরন ? ঈশ্বরানন্দীকারে চ কুতো জগদুৎপত্তিঃ শ্রাৎ ? অত আহ—অসত্যমিতি । নাস্তি সত্যং—বেদপুরাণাদি প্রমাণং যস্মিন্ তাদৃশং জগৎ আন্তঃ—বেদাদীনাম্ প্রামাণ্যং ন মনস্তে ইত্যর্থঃ । তদন্তং—“ত্রয়ো বেদস্ত কর্ত্তারো ধূর্ত্তভণ্ডনিশাচরাঃ” ইত্যাদি । অতএব নাস্তি ধর্ম্মাধর্ম্মরূপা প্রতিষ্ঠা—ব্যবস্থাহেতুঃ যন্ত তৎ । স্বাভাবিকং জগদৈচ্ছিত্র্যম্ আহরিতার্থঃ । অতএব নাস্তি ঈশ্বরঃ কর্ত্তা ব্যবস্থাপকশ্চ যন্ত তাদৃশং জগৎ আন্তঃ । তর্হি কুতোহন্ত জগতঃ উৎপত্তিঃ বদন্তি ? ইতি অত আহ—অপরম্পরসত্ত্বমিতি । অপরম্পরশ্চ পরশ্চেতি অপরম্পরম্ । অপরম্পরতঃ—অন্তোহন্তঃ স্ত্রীপুরুষমিথুন্যং সত্ত্বতম্ জগৎ । কিমন্তং ? কারণমন্ত নাস্তি অন্তং কিঞ্চিৎ । কিন্তু কামহৈতুকমেব—স্ত্রীপুংসয়োঃ উভয়োঃ কাম এব প্রবাহরূপেণ হেতুরন্ত ইতি আন্তঃ ইত্যর্থঃ ॥ ৮

বঙ্গানুবাদ। [যদি বল বেদোক্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম, প্রবৃতি-নিবৃতি কি জন্ত (অস্বরস্বভাব ব্যক্তির) জানে না, এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম অঙ্গীকার না করিলে জগতের সৃষ্টিঃ বাহি ব্যবস্থা (কেহ স্বর্ষী কেহ বা দুঃখী কেন ?) কিরূপে হয় ? এবং তাহারা শৌচ ও আচার বিষয়ে ঈশ্বরাজ্ঞা (বেদোক্তি) কিরূপে অতিক্রম করে ? আর ঈশ্বর অঙ্গীকার যদি না করে তবে জগদুৎপত্তি কি হইতে হয় ? অতএব বলিতেছেন]—অসত্যং—বেদপুরাণাদি প্রমাণরূপ সত্য নাই বাহ্যতে, জগৎকে তাদৃশ বলে । অর্থাৎ বেদাদির প্রামাণ্য মানে না । এইরূপ (তাহাদের কর্ত্তক) উক্ত হইয়াছে—তিন বেদের কর্ত্তা—ধূর্ত্ত, ভণ্ড ও নিশাচর । অতএব “অপ্রতিষ্ঠ” অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ ব্যবস্থাবিহীন বাহার, জগৎকে তাদৃশ বলে । জগৎবৈচ্ছিত্র্য স্বাভাবিক (কোন কারণের অধীন নহে), ইহাই তাহারা বলে । অতএব অনীশ্বর অর্থাৎ ব্যবস্থাপক কর্ত্তা নাই বাহার, জগৎকে তাদৃশ বলে । তবে কিরূপে এই জগতের উৎপত্তি হয় ? সেই-জন্ত তাহারা বলে—অপর ও পর এই অপরম্পর অর্থাৎ অন্তোহন্ত ; তাহা হইতে অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষ এই দুই হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে । “কিমন্তং” অর্থাৎ ইহার অন্ত কারণ কি ? অন্ত কিছু কারণ নাই, কিন্তু কামহৈতুক অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষ এই উভয়ের যে কাম সেই কামই প্রবাহরূপে এই জগতের হেতু ॥ ৮

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—মিথ্যাই তা’রা স্থির করেছে—এ জগতে বলে তা’রা যে ঈশ্বর কেও নেই, আপনি আপনি হইয়াছে—বেশ্যামনের তুল্য আর কিছুই নাই ।—আত্ম প্রকৃতির লোকেবা জগৎকে অসত্য বলিবা ই স্থির করিয়াছে । জানীরা যেহেতু

এতাং দৃষ্টিমবর্ত্তন্ত্য নষ্টাশ্বানোহল্লবুদ্ধয়ঃ ।

প্রভবন্ত্যগ্রকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোহহিতাঃ ॥ ৯

জগৎকে মিথ্যা বলেন, তাহাদের কিন্তু সে ধারণা নহে । জানীরা বলেন এই নামরূপময় জগতের নাম-রূপটা সত্য নহে, কিন্তু বাহ্যকে আশ্রয় করিয়া এই নাম-রূপ দুটিয়া উঠিয়াছে, সেই আশ্রয় পদার্থ অসত্য নহে—তাহাই পরম সত্য । বজ্জুতে সর্পত্রম হয়, সে সর্প মিথ্যা কিন্তু সর্পজ্ঞানের অধিষ্ঠানভূত বজ্জ মিথ্যা নহে ; সেইরূপ নামরূপময় জগৎ মিথ্যা হইলেও উহাদের অধিষ্ঠানভূত চৈতন্ত সত্তা নিত্য সত্য পদার্থ । আত্মপ্রকৃতির এ ভাবে জগৎকে মিথ্যা বলে না, তাহারা বলে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ ব্যবস্থা এ জগতে নাই । থাকিলে একজন তার নিয়ন্তা থাকিতেন, হয়, কিন্তু জগতে সেরূপ কোন নিয়ন্তা নাই । সেরূপ নিয়ন্তা থাকিলে তাহাদের বড় বিপদ, কারণ শুভাশুভ কর্ম্মের ফল বিধান করিবার কেহ থাকিলে তাহাদের তজ্জনিত দণ্ডাদি ভোগ অনিবার্য্য, এইজন্য তাহারা আপনাব মনকে বুঝাইয়া রাখে সেইরূপ কেহ নিয়ন্তা বা কারণ জগতের নাই, সেইজন্য তাহাদের স্বেচ্ছাচারের আর সীমা নাই । তবে এ জগৎ-জীব হয় কোথা হইতে ? তাহাদের প্রেরক কে ? ইহার উত্তরে তাহারা বলে—কামসুখাভিলাষী স্ত্রী পুরুষের পরম্পর সমাগমের এই ফল । ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট বা ঈশ্বর ইহার কারণ নহে । “একো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্”—জীবহুল এই জগতের সকল জীবেরই সমস্ত ভোগ্য যিনি বিধান করিতেছেন—তিনি এক অদ্বিতীয়—ইহা আত্ম প্রকৃতির লোকেবা কিছুতেই স্বীকার করিতে চাহে না । তাহারা বলে মনের এই যে বিবিধ সঙ্কল্প-বিকল্প—বেশ্যাম মত অবিরত একটা ছাড়িয়া আর একটাকে ধরিতেছে—সেই মনই ভাল । মন না থাকিলে সুখ কোথায় ? ইহার বিক্ষেপ আছে—সে তো ভাসই, নচেৎ কামভোগ্য বস্তু ভোগ হইবে কিরূপে ? কামনা-ত্যাগ, মনকে শাস্ত করা, ভগবান্কে ভজন্য করা, এ সব পাগলের কর্ম্ম । এই সকল সঙ্কল্পসুখবাদিগণকেই নাস্তিক বলে ॥ ৮

অনুসন্ধান। এতাং দৃষ্টিম্ (এইরূপ দৃষ্টিকে—মত বা বুদ্ধিকে) অবষ্টন্ত্য (আশ্রয় করিয়া) নষ্টাশ্বানঃ (নষ্টবস্তাব, মলিনচিত্ত) অল্লবুদ্ধয়ঃ (ক্ষুদ্রমতি) উগ্রকর্মাণঃ (ক্রুরকর্ম্ম) অহিতাঃ (জগতের শত্রু বা অমঙ্গলকারী ব্যক্তিগণ) জগতঃ ক্ষয়ায় (জগতের বিনাশের জন্তই) প্রভবন্তি (জন্মগ্রহণ করে) ॥ ৯

শ্রীধর। কিঞ্চ—এতামিতি । এতাং লোকায়তিকানাং দৃষ্টিং—দর্শনম্ আশ্রিত্য, নষ্টা-শ্বানো—মলীমসচিত্তাঃ সন্তঃ, অল্লবুদ্ধয়ঃ—দৃষ্টার্ধমাত্রমতয়ঃ । অতএব উগ্রং—হিংস্রং কর্ম্ম বেবাং জে, অহিতা—বৈরিণঃ হুবা জগতঃ ক্ষয়ায় প্রভবন্তি—উদ্ভবন্তি ইত্যর্থঃ ॥ ৯

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন]—লোকায়তিক চার্কাকগণের (নিরীশ্বরবাদি-দিগের) এই দর্শনকে আশ্রয় করিয়া মলীমসচিত্ত হওয়ায় দৃষ্ট বিষয়ে যেরূপ মতি হয় [তাদৃশ প্রভবকারী অল্লবুদ্ধি জনেরা] অতএব হিংস্রকর্ম্ম বৈরিগণ, জগতের ধ্বংসের জন্তই তাহারা জন্মগ্রহণ করে ॥ ৯

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এইরূপ লক্ষ্য—থেকে বাহারা আপনাতে আপনি

কামমাপ্রিত্য ছুপ্পং রং দন্তমানমদাবিতাঃ ।

মোহাদ্ গৃহীত্বাসদ্ গ্রাহান্ প্রবর্তন্তে হৃদ্যচিহ্নতাঃ ॥ ১০

থাকে না অর্থাৎ ক্রিয়া করে না—কিছুতেই বুদ্ধি স্থির রাখিতে পারে না—উগ্রকর্ষ মেরে ফেলা ইত্যাদি জগতের ক্ষয় হেতু হয়—বাহাতে মন্দ পরের হয় তাহা করে।—যাহারা সাধন করে না, তাহারা কেহই আত্মাকে বুঝিতে পারে না। দেহটাকেই সব মনে করে, এই ভুল দেহটাকে পোষণ করিবার জন্যই তাহারা সমগ্র জীবন ব্যয় করে এবং এমন অকর্ষ নাই বাহা করে না। এই সকল লোকদের বুদ্ধি সাধারণতঃ তমসাজন্যই থাকে, তাই শৃগল কুঙ্করের তায় পূরীষযুক্তভাবে এই দেহটাকে ভুলেই তাহারা শস্যব্যস্ত থাকে। তাহাদের বুদ্ধি অল্প, এইজন্য তাহাদের জ্ঞানের বিষয়ও অল্প, সুতরাং অপরিমিত জ্ঞান-বস্তু বা আত্মার ধাব দিয়াও তাহারা যায় না। তাহারা ইন্দ্রিয় অর্থাৎ শ্রীশঙ্কর উপদেশ মত আপনাতে আপনি থাকে না, থাকার উপায় বা কৌশলও অবগত নহে। এই সকল লোকদের প্রকৃতি প্রায়ই হিংস্র প্রবণ হয়, শাস্ত্রনিবদ্ধ কার্য করিতে কখনও সঙ্কোচ বোধ করে না। ইহাদের এ ভয় তো এই ভাবেই গেল, পরজন্মেও হিংস্র স্বভাববশতঃ সর্পাদি হিংস্রকুলে জন্ম গ্রহণ করে। তখন আবার জগৎজীবের অহিতাচারণ করিয়া লোককে উত্যক্ত করে ॥ ২

অন্থর। [তে—তাহারা] ছুপ্পং (ছুপ্পরীয়) কামম্ আশ্রিত্য (কামকে আশ্রয় করিয়া) দন্তমানমদাবিতাঃ (দন্ত, মান ও মদোন্মত্ত হইয়া) মোহাৎ (মোহবশতঃ) অসদ্ গ্রাহান্ (অসৎ আগ্রহ বা অন্তত সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া—অমুক মন্ত্র লপ করিয়া এইরূপ সিদ্ধিলাভ করিব ইত্যাদি অশাস্ত্রীয় মনগড়া সিদ্ধান্ত) গৃহীত্বা (গ্রহণপূর্বক) অন্তচিহ্নতাঃ (অন্তচিহ্ন অর্থাৎ নিরয় গুনোপযোগী কর্ণে) প্রবর্তন্তে (প্রবৃত্ত হয়) ॥ ১০

শ্রীধর। অপি চ—কামমাপ্রিত্যেতি। ছুপ্পং—প্রয়িত্বম্ অশক্যং কামম্ আশ্রিত্য—দন্তাদিভিঃ বৃত্তাঃ সন্তঃ, ক্ষুদ্রদেবতারাদিভিঃ প্রবর্তন্তে। কথং? অসদ্গ্রাহান্ গৃহীত্বা—অনেন মত্রেণ এতৎ দেবতাম্ আরাধ্য মহানিধীন সাধয়িত্বাম ইত্যাদীন দ্রুতগ্রাহান্ মোহমাজেণ স্বীকৃত্য প্রবর্তন্তে। অন্তচিহ্নতাঃ—অন্তচীনি মন্তমাংসাদিবিষয়াণি ব্রতানি যেষাং তে ॥ ১০

বঙ্গানুবাদ। [আরও]—তাহারা ছুপ্পং (যাহা পূর্ণ করিতে পারা যায় না) কামনাতে আশ্রয় করিয়া দন্তাদিভুক্ত হইয়া ক্ষুদ্র দেবতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়। কিরূপ? অসদ্-গ্রাহনকলকে গ্রহণ করিয়া—অর্থাৎ এই মন্ত্র দ্বারা এই দেবতার আরাধনা করিয়া মহানিধি সাধন করিব অর্থাৎ প্রচুর ধনবস্তু লাভ করিব—এইরূপ দ্রুতগ্রহ সকলকে মোহবশতঃ স্বীকার করিয়া [উক্ত কার্যে] প্রবর্তিত হয়। অন্তচিহ্নতাঃ—অন্তচিহ্ন যে মন্তমাংসাদি বিষয় তাহাই যাহাদের ব্রত (সেব্য) তাহারা ॥ ১০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—মৈথুন করাটাই ভাল ইহারই দোষাক করে—বুকাড়া মোহেতে সদ্ বস্তু গ্রহণ করে না অর্থাৎ সংকে একেবারে খেয়ে ফেলেছে। ব্রহ্ম ব্যতীত যে সকল বস্তু তাহাতেই প্রবৃত্ত—ওঁ ওঁ—সেই

চিন্তামপরিমেয়াং চ প্রলয়ান্তমুপাশ্রিতাঃ ।

কামোপভোগপরমা এতাবদিত্তি নিশ্চিতাঃ ॥ ১১

উগ্রকর্ষা ব্যক্তির কি করে, তাহারই পরিচয় দিতেছেন। তাহারা ছুপ্পং কামনার বশবর্তী হইয়া দন্ত, মান এবং মদ এই তিনটির সহিত সর্করা যুক্ত হয়। তাহারা অপূরণীয় দ্রুতগ্রহ বশে দন্ত অভিমান ভরে শাস্ত্রবিরুদ্ধ দ্রুতগ্রহ অবলম্বন করিয়া কার্যে প্রবৃত্ত হয়—যেমন অমুক দেবতার আরাধনায় ধনলাভ হইবে, কিবা কোন নারিক-সিদ্ধি লাভ করিয়া কামভোগার্থ জীবন পাওয়া যাইবে—এই সব দ্রুতগ্রহ উদ্ভ্রান্তমতি কত দেবতারই আরাধনা করে, কত মন্ত্রাদি লপ করে; কিন্তু তাহারা অন্তচিহ্নতা, তাহাদের দ্বারা কোন সাস্ত্রিক কার্য হইবার নয়। কোন উত্তম বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে অনেক নিয়ম পালন করিতে হয়। সেই সব ব্রত পালনে শরীর মন পবিত্র হয়, সন্তোষ বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, মন বিক্লেপশূন্য হয়, হৃদয়ে সাস্ত্রিক বলের সঞ্চার হয়। তাহার মুখমণ্ডলেও এমন একটি স্নিগ্ধতা থাকে যে দেখিলেই মনে প্রশান্ত উদয় হয়। আর যাহাদের আচরণ ও নিয়ম-নিষ্ঠা ইহার বিপরীত, তাহারা ই অন্তচিহ্নতা। তাহাদের আহারও যেমন তমোণ্ডিত, তাহাদের ব্যবহারও তদ্রূপ। তাহাদের চিন্তা, তাহাদের কার্য ও তাহাদের সঙ্গ সকল বিষয়েই সাস্ত্রিকতার অভাব। ভাল কোন বিষয়েই তাহাদের প্রবৃত্তি নাই; কোন সং কার্য করিতে তাহারা জানে না, কেবল বাহাতে লোকের অনিষ্ট হয় তাহাই করে। লোককে ভয় দেখাইয়া তাহাদের বিস্ত্র অপহরণের চেষ্টা করে। এই সকল বোর তামসিক প্রবৃত্তির লোকেরা কোন অপকর্ষ করিতেই বা কী রাখে না। ইন্দ্রিয়-ভোগার্থ তাহাদের মন সদাই উত্তত, কিন্তু প্রকৃত হিত কিসে হইবে, কিরূপে চিন্ত ব্রহ্মভাবনায় ভাবিত হইবে সে পথে তাহারা কিছুতেই চলিলে না ॥ ১০

অন্থর। প্রলয়ান্তম্ (মৃত্যুকাল পর্যন্ত) অপরিমেয়াং (অপরিমিত) চিন্তাম্ উপাশ্রিতাঃ (চিন্তাকে আশ্রয় করিয়া) কামোপভোগপরমাঃ (কামভোগপরায়ণ) এতাবৎ ইতি নিশ্চিতাঃ (কামভোগই পরম পুরুষার্থ এরূপ যাহাদের নিশ্চয়) ॥ ১১

শ্রীধর। কিঞ্চ—চিন্তামিতি। প্রলয়ঃ—মরণম্ ন এব অন্তঃ যন্ত তাম্। অপরি-মেয়াং—পরিমাতং অশক্যং, চিন্তাম্ আশ্রিতাঃ—নিত্য চিন্তাপরা ইত্যর্থঃ। কামোপভোগ-এব পরমো যেযং তে। এতাবদিত্তি—কামোপভোগ এব পরমঃ পুরুষার্থো নাত্নং অন্তীতি কৃতনিশ্চয়াঃ। অর্থসঙ্করান্ দৈহন্তে ইত্যন্তব্রণে অধঃ। তথা চ বার্ষ্পত্যস্বত্বঃ—“কাম-এবৈকঃ পুরুষার্থ ইতি চৈতন্তবিশিষ্টঃ কায়ঃ পুরুষ ইতি চ” ॥ ১১

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন]—মৃত্যুকাল পর্যন্ত, পরিমাণ করিতে পারা যায় না এইরূপ চিন্তাকে যে সকল লোকেরা আশ্রয় করিয়াছে অর্থাৎ নিত্য চিন্তাপর, কাম উপ-ভোগই পরম পুরুষার্থ, কামোপভোগ ব্যতীত অন্য কিছুই নাই—এইরূপ কৃতনিশ্চয় ব্যক্তির। মুকর্ষদ্বারা অর্থসঙ্কর ইচ্ছা করে—এই পর শ্লোকের সহিত অর্থঃ। বার্ষ্পত্য স্বত্বে আছে—কামনাই পুরুষার্থ, আর চৈতন্তবিশিষ্ট যে কায় বা দেহ তাহাই পুরুষ শব্দ ব্যাচ্য ॥ ১১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—চিন্তার আর সীমা নাই, মহাপ্রলয়ের সময় যেকরূপ চিন্তা

আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ ।

ঈহন্তে কামভোগার্থমন্ত্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্ ॥ ১২

তক্রপ, ভোজন আর মৈথুন বিনে আর কিছুই ভাল না ইহাই নিশ্চয় ।—আশুরী প্রকৃতির মনুষ্যদের কামিনী-কাকনই পরম পুরুষার্থ, হুতরাং তাহারা সর্বদা কাম উপভোগের চিন্তা লইয়াই থাকে । মরণ কাল পর্যন্ত তাহাদের এই প্রকার অল্পশ চিন্তার আর বিরাম হয় না । তাহারা এই সৈন্তসমূহ দেখটাকেই পুরুষ এবং কামোপভোগকেই পুরুষার্থ বলিয়া মানে । তাহাদের ধারণা দেহান্তের সঙ্গে সঙ্গেই সব শেষ, দেহান্তের পর কাহাকেও কোন কর্মফল ভোগ করিতে হইতে হইবে না, নিজ কর্মের জন্য কাহারও নিকট জবাবদিহি করিতে হইবে না । এইজন্য তাহারা নিজের অভিল্য চরিতার্থ করিবার জন্য কোন অকর্মই বাদ দেয় না । ভগবানের শরণ গ্রহণ করা বা তাহার ভজনাকে নিষ্কল চেষ্টা ও মস্তিস্কের দুর্লভতা বলিয়া তাহারা মনে করে ॥ ১১

— — —

অর্থঃ । আশাপাশতৈঃ (শত শত আশারূপ পাশে) বদ্ধাঃ (আবদ্ধ) কামক্রোধপরায়ণাঃ (কাম/এবং ক্রোধপরায়ণ ব্যক্তিগণ) কামভোগের (কামভোগের জন্য) অন্ত্যায়েন (অসং উপার্জে) অর্থসঞ্চয়ান্ (অর্থসঞ্চয়) ঈহন্তে (ইচ্ছা করে) ॥ ১২

শ্রীধর । অতএব—আশেতি । আশা এব পাশাঃ তেষাং শতানি তৈঃ বদ্ধা ইত্যন্ততঃ আক্ৰম্যমাণাঃ । কামক্রোধপরায়ণাঃ—কাম-ক্রোধো পরময়নঃ অশ্রয়ো যেষাং তে । কাম-ভোগার্থং অন্ত্যায়েন—চৌধ্যাদিনা, অর্থান্যং সঞ্চয়ান্ রাশীন, ঈহন্তে—ইচ্ছন্তি ॥ ১২

বঙ্গানুবাদ । আশারূপ যে শত শত পাশ তাহা দ্বারা বদ্ধ—অর্থাৎ ইত্যন্ততঃ আক্ৰম্যমাণ, এবং কাম-ক্রোধের পরম আশ্রয় স্বরূপ যাহারা, সেই সকল ব্যক্তিগণ কামভোগার্থ চৌধ্যাদি দ্বারাও অর্থ রাশি সংগ্রহে ইচ্ছা করে ॥ ১২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—মানারূপ আশাতে বদ্ধ—শত শত অশ্রায়ে টাকা উপার্জন করে অর্থাৎ কাকেও মেরে ফেলে টাকা নেয়—কাম আর ক্রোধেতেই যুক্ত—সেই টাকা নিয়ে মৈথুন আর ভোজন করে ।—শত শত আশাপাশে এই সকল লোক আবদ্ধ । যাহা কিছু লোকের দেখে বা শুনে তাহাতেই আকৃষ্ট হয় এবং আমারও সেইরূপ কিলে হয় তাহারই চেষ্টায় আপনাকে নিযুক্ত করে । যদি যৈবাং আশা সকল না হয় বা কোনরূপ বিষ বটে, তবে রাগিয়া আশ্বস্ত হয়, এমন কি আশা ও লোভের বশে মানুষকে খুন করিয়া ফেলে এবং নিজ নরকের পথ পরিষ্কার করে । পরম অপহরণে এবং দেবতা-ব্রাহ্মণের অব্যাদি বলপূর্বক গ্রহণে ইহাদের মনে কোন দ্বিধা উৎপন্ন হয় না । বেশ ধনসংগ্রহ ও শুদ্ধারা কামোপভোগই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, এইজন্য সেই সকল দুর্ভক্তেরা লোককে ঠকাইয়া তাহাদের ধনাদি আত্মসাৎ করে, এবং তাহারা এতদূর কামুক হয় যে পরজীকেও বলপূর্বক গ্রহণ করিতে পশ্চাৎপদ হয় না ॥ ১২

(ধনতৃষ্ণা—লোভ)

ইদমন্ত ময়া লক্ষ্মিমং প্রাপ্যো মনোরথম্ ।

ইদমন্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥ ১৩

অসৌ ময়া হতঃ শক্রঃইনিম্নে চাপরানপি ।

ঈশ্বরোহহমহং ভোগী সিদ্ধোহহং বলবান্ সুখী ॥ ১৪

অর্থঃ । অত (আজ) ইদং (ইহা) ময়া লক্ষ্যং (আমা কর্তৃক লক্ষ্য হইল—অর্থাৎ আমি পাইলাম) ইদং মনোরথম্ (এই অভিলষিত বা ইষ্টবস্তু) প্রাপ্যো (আমি পাইব), ইদম্ মে অস্তি (ইহা আমার আছে), পুনঃ (পুনরাব) ইদং ধনম্ অপি (এই ধনও) ভবিষ্যতি (হইবে) ॥ ১৩

শ্রীধর । তেষাং মনোরথং কথম্ নরকপ্রাপ্তিমাং—ইদমন্তেতি চতুর্ভিঃ । প্রাপ্যো—প্রাপ্যামি । মনোরথং মননঃ প্রিয়ম্ । স্পষ্টমন্তঃ । এতেষাং চ ত্রয়াণাং শ্লোকানাম্—ইতি অজ্ঞানবিমোহিতাঃ সন্তো নরকে পতন্তীতি চতুর্ধেন অর্থঃ ॥ ১৩

বঙ্গানুবাদ । [তাহাদের মনোরথ বর্ণন করিয়া চারিটি শ্লোকে তাহাদের নরকপ্রাপ্তির বিষয় বলিতেছেন]—[আমি অত এই ধন লাভ করিলাম । আমার এই অভিলষিত বস্তুটি পরে পাইব, বা আমার এই মনোরথটি সিদ্ধ হইবে । আমার এই ধন আছে, আরও এইরূপ ধন আমার হইবে ।] ‘প্রাপ্যো’—পাইব । মনোরথ—মনের প্রিয় । এই শ্লোকত্রয়ের “ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ সন্তো নরকে পতন্তি”—অর্থাৎ এই অজ্ঞান-বিমোহিত হইয়া নরকে পতিত হয়—এই চতুর্থ শ্লোকের বাক্যের সহিত অর্থঃ ॥ ১৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—আজ ২৫ পেয়েছি, আরও ৫০ পাবো এক জনকে মেরে—এই ৭৫ হ'ল—আরও ২৫ পাব, আর ২৫ কি পাব না ? তাহলেই ১০০ হইবে ।—আমি প্রকৃতির লোকদের ধনতৃষ্ণাও বড় প্রবল হয় । তাহারা কেবল মনে মনে ভাবে—এই সব ধন তো এখন পাইলাম, আরও মনের মত কত ধন লাভ করিব । এই তো এত টাকা আমার জমিয়া গিয়াছে, আগামী বৎসরে আরও আমার এত লাভ হইবে । আরও কিছু পাইলে আমার মনোরথ পূর্ণ হয়, আমি লক্ষপতি হইয়া যাই, লোকে তাহা হইলে আমাকে কত মাত্ত করিবে । অবশিষ্ট টাকা কি কোন বকমে সংগ্রহ করিতে পারিব না ? পারিতেই হইবে কোন প্রকারে । লোকে আমাকে যাই বলুক ।

লোককে নিরয়গামী করিতে এই ধনেষণার মত আর কিছুই নাই । ধনমদে মত্ত ব্যক্তির হৃদয় এত ক্ষুদ্র হইয়া যায় যে অর্থের জন্য সে পিশাচের অভিনয় করিতেও পশ্চাৎপদ হয় না । ধন যেমন মানুষকে মত্ত করে এমন আর কিছুতেই নহে । ধন মনুষ্যের চিত্তকে প্রস্তুতবৎ করিয়া তাহাকে মহত্ত্ববহীন করিয়া তুলে ॥ ১৩

অর্থঃ । অসৌ শক্রঃ (ঐ শত্রু) ময়া হতঃ (মং কর্তৃক হত হইয়াছে) অপরান্ অপি চ (ও অতীত শত্রুকেও) ইনিম্নে (হনন করিব), অহং ঈশ্বরঃ (আমি ঈশ্বর অর্থাৎ

আচ্যোহভিজ্ঞানবান্মসি কোহন্তোহস্তি সদৃশো ময়া ।

যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥ ১৫

সকলের নিয়ন্তা বা প্রভু) অহং ভোগী (আমি ভোগী) অহং সিদ্ধ (আমি সিদ্ধ বা কৃতকৃত্য) বলবান্ সুখী (আমি বলবান্ ও সুখী) ॥ ১৪

শ্রীধর। কিঞ্চ—অসৌ ইতি। সিদ্ধঃ—কৃতকৃত্যঃ। স্পষ্টমন্তঃ ॥ ১৪

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন]—সিদ্ধ—কৃতকৃত্য। আর সব স্পষ্টই আছে। [আমি এই শত্রুকে নাশ করিয়াছি। অতীত শত্রুদিগকেও বিনাশ করিব, আমিই ঈশ্বর, আমি ভোগী, আমি সিদ্ধ, আমি বলবান্ ও আমিই একমাত্র সুখী, অতীত লোকেরা শুধু পৃথিবীর ভার বাড়াইবার জন্য] ॥ ১৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এবার তো শত্রু মেরেই ফেলেছি—আরও যে ব্যাটা আসবে তাকেও মারবো—আমিই ঈশ্বর, আমিই ভোগী আমিই সিদ্ধ, আমিই বলবান্, সুখী।—ইহারা লোকের কাছে বুক ফুলাইয়া বলিয়া বেড়ায়—আমাকে কেও কেটা মনে করিও না। অমুক লোক জ্ঞান তো কিরূপ স্পর্কিত ও ধনবান্ ছিল, আমি তাহার স্পর্ক চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছি, আমার বিপক্ষে যে থাকিবে তাহার কিছুতেই নিস্তার নাই, তাহাকে বিনাশ করিবই করিব। আর অমুক অমুক যে সব শত্রু আছে তাহাদের তো উকুনোর মত টপিয়া মারিয়া ফেলিব। তাহারা যত চেষ্টাই করুক আমার কিছুই করিতে পারিবে না—আমার লাঠির বল কত তাহারা তা কি জানে? আমিই ঈশ্বর, আবার অস্ত্র নিয়ন্তা কে আছে? আমি যাহা করিব তাহাই হইবে। এমন মূল্যবান ভোগ্য বস্তু আর কাহার আছে? আমি এই সকল বস্তু নিত্য ভোগ করি—অমুক লোক পাতা চাটিয়া বেড়ায়, উহাঃ সন্ধে আমার আবার তুলনা? আমি সিদ্ধ পুরুষ—আমার কাছে চালাকি নয়, এখনই উহার প্রাসাদ তুল্য ঘর ভূমিসাৎ করিয়া দিব। আমাকে মন্দ বলা সহজ নহে; দেখিতেছ তো আমার বিরুদ্ধে কথা বলিয়া কি রকম তাহার সর্বনাশ হইয়া গেল! আমার মঙ্গলশক্তির প্রভাব তো জানে না! একেবারে ভিটার ঘুচুচাইয়া দিব। অমুক লোকের কি সর্বনাশ করিয়া দিলাম! আমাকে আবার ধরাইয়া দিবার চেষ্টা করাইয়াছিল, জানে না তো আমার সিদ্ধি-শক্তির কত বড় প্রভাব। আমাকে ধরিতে এলেই আমি তখন পক্ষী হইয়া আকাশে উড়িয়া যাইব। আমার সংসার সুখের সংসার। আমার কত ক্ষমি, ক্ষমিদারী-ধর-ইমারত, আমার বাড়ীতে কত লোক খাটে, কত লোক খায়, আমার ছেলেমেয়েগুলি সবই দীয়ার টুকরা। এত তেজ এত স্বর্থ আর কাহারো ভাগ্যে নাই ইত্যাদি ॥ ১৪

অর্থ। [আমি] আচ্যঃ (ধনবান্) অভিজ্ঞানবান্ (কুলীন) অসি (হই), ময়া সদৃশঃ (আমার তুল্য) অতঃ কঃ অস্তি (আর কে আছে?) যক্ষ্যে (আমি যজ্ঞ করিব), দাস্যামি (দান করিব), মোদিষ্যে (আনন্দিত হইব) ইতি (এই প্রকারে) অজ্ঞান বিমোহিতাঃ (অজ্ঞানে বিমোহিত) ॥ ১৫

শ্রীধর। কিঞ্চ—আচ্য ইতি। আচ্যঃ—ধনাদিসম্পন্নঃ। অভিজ্ঞানবান্—কুলীনঃ। যক্ষ্যে—বাগাভ্যাসুষ্ঠানেনাপি দীক্ষিতান্তরেভ্যঃ সকাশাৎ মহতীং প্রতিষ্ঠাং প্রাপ্যামি। দাস্যামি

(মুচ্যে অব্যবহিকগণের নরক গতি)

অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমারুতাঃ ।

প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেহশুচৌ ॥ ১৬

স্তাবকেভ্যঃ। মোদিষ্যে—হর্ষং প্রাপ্যামি ইত্যেবং অজ্ঞানেন বিমোহিতা—মিথ্যাভিনিবেশঃ প্রাপিতাঃ ॥ ১৫

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন]—আচ্যঃ—(আমি) ধনাদি সম্পন্ন, অভিজ্ঞানবান্—কুলীন। যক্ষ্যে—বাগাভ্যাসুষ্ঠান দ্বারা অতীত দীক্ষিতগণ অপেক্ষা বা তাহাদের নিকট মহতী প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইব। স্তাবক নটাদি প্রভৃতিকে দান করিব। মোদিষ্যে—আমোদ করিব, ক্ষুতি করিব—এইরূপ অজ্ঞানবিমোহিত হয়, অর্থাৎ মিথ্যাভিনিবেশ প্রাপ্ত হয় ॥ ১৫

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—আমি সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, আমার চের লোক আছে, আমার তুল্য কেউ নেই, এইরূপ অজ্ঞানেতে মোহিত হইয়া।—এই সকল আসুর প্রকৃতির লোকেরা লোকের নিবট বলিয়া বেড়ায়—ধনে, মানে, কুলে, শীলে আমার মতন এ তল্লাটে আর কেহ নাই। আমি এমন ধুমধামের সহিত বাগ-যজ্ঞ আরম্ভ করিব যাহা দেখিয়া লোকের তাক লাগিয়া যাইবে। তাহাদের বলিতেই হইবে এমন যজ্ঞ তাহারা আর কোথাও দেখে নাই; ধীন দুঃখী ব্রাহ্মণকে এমন দানও পূর্বে কেহ করে নাই। দেখিবে তখন কত লোক আসিয়া আমার তোষামোদ করিবে, নট প্রভৃতির আমার কত গুণগান করিবে। আমিও তাহাদের প্রচুর ধন দিব, আমার বশে সমস্ত দেশ ভরিয়া যাইবে। বন্ধু-বান্ধবের সহিত কত আফ্রাদ পান ভোজন চলিবে—এইরূপ অজ্ঞানবিমোহিত মুঢ়েরা হবিধ চিন্তা করিয়া থাকে ॥ ১৫

অর্থ। অনেকচিত্তবিভ্রান্তা (বহু প্রকার কল্পনায় বিভ্রান্তচিত্ত) মোহজালসমারুতাঃ (মোহজালে সংবদ্ধ), কামভোগেষু প্রসক্তাঃ (বিষয়ভোগে অত্যন্ত আসক্ত) [ব্যক্তিগণ] অন্তর্গত নরকে (ক্লেশময় বা অপবিত্র নরকে) পতন্তি (পতিত হয়) ॥ ১৬

শ্রীধর। এবমুতাৎ প্রাপ্তবস্তি তচ্ছৃণু—অনেকেতি। অনেকের মনোরথের প্রবৃত্তি চিন্তা অনেকচিত্ত, তেন বিভ্রান্তা—বিক্ষিপ্তাঃ তেনৈব মোহময়েন জালেন সমারুতাঃ—মৎস্ত ইব মৃত্তময়েন জালেন যন্তিতাঃ। এবং কামভোগেষু প্রসক্তাঃ—অভিনিবিষ্টাঃ সন্তঃ, অন্তর্গত নরকে—কদাচৈব নরকে পতন্তি ॥ ১৬

বঙ্গানুবাদ। [এই প্রকারের লোকেরা যাহা প্রাপ্ত হয় তাহা শ্রবণ কর]—অনেক চিত্তবিভ্রান্ত—অনেক মনোরথ চিন্তা প্রবৃত্ত, স্তবরাং তদ্বারা বিক্ষিপ্ত। মোহজালসমারুত—মৎস্ত যেরূপ মৃত্তময় জালে যন্তিত হয় সেইরূপ মোহময় জাল দ্বারা তাহারা সমারুত। কামো-পভোগে প্রসক্ত—অর্থাৎ অভিনিবিষ্ট হইয়া ক্লেশবৃত্ত বে নরক তাহাতে পতিত হয় ॥ ১৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—চিত্তের অনেক রকম ভ্রান্তি ও মোহজালেতে আবৃত হইলে—কাম আর ভোগেতে আসক্ত হইলে নরকেতে পড়ে থাকে অর্থাৎ দুঃখী হয়।—উক্ত প্রকারের লোকের চিন্তা বহুবিধ বন্ধন দ্বারা পরিপূর্ণ, অর্থাৎ এক বস্ততে

তানহং দ্বিভতঃ ক্রুরান্ সংসারেবু নরাধমান্ ।

ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীশ্বেষ যোনিবু ॥ ১১

হয়, এই দ্বন্দ্ব ‘প্রদ্বিভতঃ’ এইরূপ বলিলেন । ‘অভ্যাস্যকাঃ’—তাহারা সন্মার্গবর্ত্তিদের গুণেতে দোষারোপকারী হয় ॥ ১৮

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ইহার আশ্রয় ক’রে অন্য ব্যক্তির প্রতি হিংসা করে ।—[“অহঙ্কার—অহং করণ । বিদ্যমান এবং অবিদ্যমান গুণ সকল আত্মাতে অধ্যারোপ করিয়া ভাবে যে এই সকল গুণ আমার—ইহাই অহঙ্কার । এই অহঙ্কারকেই অবিজ্ঞা বলা হয় । অজ্ঞান দোষ অপেক্ষা এই অহঙ্কার দোষই সর্বাধিক । ক্রোধপ্রকার অনর্থকর প্রবৃত্তি ও দোষের ইহাই মূল । দর্প - বাহার উদ্ভব হইলে লোকে ধর্ম অতিক্রম করে, অন্তঃকরণ আশ্রিত এই দোষকে দর্প বলে । কাম—দ্রী প্রতৃতি ভোগ্য বস্তুর প্রতি যে অভিলাষ তাহাই কাম”—শঙ্কর] ।

‘বট বট বিরাজে রাম’—প্রতি দেহঘটে যে এক আত্মারাম বিরাজ করিতেছেন—এই দেহাত্মাব্যবহায়ে ক’রা জানেনও না, মানেও না । তাই তাহারা সর্বদেহে অবস্থিত, সর্ব কর্ণের সাক্ষী আমাকে (আত্মাকে) প্রিয়বোধ করিতে পারে না, বরং বিদেহ করিয়া থাকে । ভগবানের প্রতি বিদেহ কিরূপ ? বেদ-শাস্ত্রাদিতে ভগবানের যে আজ্ঞা রহিয়াছে সেই আজ্ঞাকে অবজ্ঞা করিয়া অবহেলা করে । সূত্রবাং সাধু ক্রিয়াবানেরা যে প্রত্যহ আমাকে স্মরণ মনন দ্বারা আমার শরণাপন্ন হয় তাহা ঐ বিদেহকারিগণ সহ করিতে পারে না । তাহারা ঐ সকল সজ্জনবর্গের নিন্দা করিয়া বেড়ায় এবং নিজেদের মদ-মাংসাদি বিভোর হইয়া সকলকেই তুচ্ছ তাক্সিলা করিয়া থাকে ॥ ১৮

অল্পয় । তান্ (সেই সকল) দ্বিভতঃ (দেবপরবশ) ক্রুরান্ (ক্রুর) নরাধমান্ (নরাধম) অন্ততান্ (অন্ততকর্ষকারিগণকে) সংসারেবু (সংসারে) আসুরীষু যোনিবু এবং (আসুরী যোনিসমূহেই) অজস্রং (পুনঃ পুনঃ) ক্ষিপামি (নিক্ষেপ করি) ॥ ১১

শ্রীধর । তেবাং চ কদাচিৎ অপি আসুরবৃত্তাবপ্রচ্যুতিঃ ন ভবতি ইত্যাহ—তানিতি দ্ব্যভ্যাহ । তান্ অহং মাং দ্বিভতঃ ক্রুরান্ সংসারেবু—জন্মমৃত্যুমার্গেণ তত্রাপি আহুরীশ্বেষ অতিক্রুরাং ব্যাভ্রসর্পাদিযোনিষু অজস্রং অনবরতং ক্ষিপামি—তেবাং পাপ-কর্ষণং তাদৃশং কলং ধর্মানীত্যর্থঃ ॥ ১১

বঙ্গানুবাদ । [তাহাদের কখনই আসুরবৃত্তাব দূর হয় না—ইহাই দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন]—আমার বিদেহকারী সেই ক্রুরগণকে জন্মমৃত্যুমার্গ সংসারে, তাহাতেও আবার আসুরী অর্থাৎ অতিক্রুর ব্যাভ্রসর্পাদি যোনিতে ‘অজস্র’ অনবরত নিক্ষেপ করি । সেই পাপকর্ষাদের পাপের সদৃশ ফল দান করি ॥ ১১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এমন রকম ক্রুর লোকদের ঐ আসুরী জন্মেতে ফেলে দিই, যাহারা নরের মধ্যে অধম—ম শব্দে মণিবন্ধ কুটস্থ, তাহার নীচে যে থাকে অর্থাৎ কুটস্থে যে না থাকে সেই অধম !!!—ভগবান্ দশম অধ্যায়ে বলিয়াছেন

“অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশ্রয়স্থিতঃ”—আমি সর্বভূতগণের আশ্রয়ে অর্থাৎ অন্তঃকরণে আত্মরূপে অবস্থিত । তাহা হইলে এই “অহং” ই কুটস্থ চৈতন্য বা ক্ষেত্রজ পুরুষ । ইহার যেস্তও কেহ নাই প্রিয়ও কেহ নাই, তবে তিনি ক্রুরকর্ষাদিগকে কেন আসুরী যোনিতে নিক্ষেপ করেন ? তাহার যেস্ত প্রিয় কেহ নাই বটে, কিন্তু তিনি কর্ষফল বিধাতা; জীব নিজ নিজ কর্ষানুযায়ী ফলভোগ করে, এই ফলের বিধান কর্তা তিনিই । নিজ নিজকৃত কর্ণের ফলভোগ সকলকেই করিতে হয় বটে, কিন্তু অচেতন কর্ণ ফল দিতে পারে না, যদি কর্ণের সহিত কর্ণফলের সংযোগ করিয়া দিবার ক্ষমতা কোন চৈতন্য-কর্তা না থাকেন । অবশ্য তিনি মানুষের মত রাগদ্বেষের অধীন হইয়া যে এইরূপ দৃষ্টবিধান করেন তাহা নহে, তাহার সত্তাপ্রভাবে কর্ণসমূহ ফলোৎপাদন করে এবং জীব কর্ষানুরূপ ফল ভোগ করে । নচেৎ ভগবানের কেহ যেস্ত বা কেহ প্রিয় থাকিতে পারে না । তিনি সর্বজ্ঞই সম । তবে তিনি দৃষ্টদিগকে আসুরী জন্মে নিক্ষেপ করেন কিরূপে ? তাহার কারণ ইহায়া সাধুপ্রকৃতির লোক তাহাদের মন আজ্ঞাচক্রে এবং তদুর্দ্ধে থাকে, এবং এই সকল আত্মার প্রকৃতির লোকদের চিত্ত আজ্ঞাচক্রে নীচে থাকে; সূত্রবাং তাদৃশ লোকেরা আদিত্তির সহিত কর্ণ করিয়া আপনাপনিই অযোগ্যি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । যাহারা আজ্ঞাচক্রে কুটস্থে না থাকে তাহারা ই অধম । এই সকল লোকের এইরূপ মনোবৃত্তি থাকায় তাহারা মৃত্যুকালেও উচ্চভাবে ভাবিত হয় না, কাজে কাজেই তাহাদের চিত্তের বৃত্তির অনুরূপ আবার দেহ লাভ হইয়া থাকে । কে কিরূপ কর্ণে কিরূপ ফলভোগ করিবে বা ঐ সকল ব্যক্তির পরজন্মে কিরূপ গতি হইবে, এ সমস্তই ঈশ্বরের সর্ব-নিয়ন্তৃত্ব শক্তিই জীবের কর্ণের সহিত অনুরূপ ফল সংযোগ করিয়া দেয় । তাহা কি প্রকার, ভগবান্ ১৫শ অধ্যায়ে ১৫শ শ্লোকে বলিয়াছেন—

“সর্বস্ত চাহং যদি সন্নিবিষ্টো মন্তঃ স্তুতিজ্ঞানমপোহনঞ্চ” ।

সর্ব প্রাণীর বৃত্তি বৃত্তিতে অন্তর্ধানরূপে আমি অধিষ্ঠিত, আমা হইতেই পূর্বানুভূত বিষয় জনিত স্তুতি, এবং বিষয়েশ্রিয়-সংযোগজনিত জ্ঞান এবং তদুভয়ের বিলোপ সাধিত হইয়া থাকে । সূত্রবাং তিনি স্বয়ং কিছু না করিলেও তাহার অন্তিমই দেবতা, মানুষ ও ইতর সকলকেই স্ব স্ব কর্ণে নিয়ন্ত্রিত করে । ভগবানের এই বিরাট শাসনের অধীন সকলেই । দেবতারাও ইহার অন্তর্গত করিতে পারেন না । সেই পারমেশ্বরী নিয়মের বশবর্তী হইয়া জীবের কর্ণই অনুরূপ ফলোৎপাদনে সমর্থ হয় । ভগবানের যেস্ত বা প্রিয় কেহ নাই—ফলভোগ করে জীব নিজ বর্ষা-নুযায়ী । একটা নিয়ম শৃঙ্খলা না থাকিলে এই বিরাট জগত চলিবে কিরূপে ? ঈশ্বরেচ্ছ তেই প্রকৃতির নিয়ম দুর্গজ্য—যে যেমন কর্ণ ও চিন্তা করে, তাহার মনোভাব মৃত্যুর সময়েও তদনুরূপ থাকে, এবং সেই মনোভাব অনুরূপ তাহার উচ্চ বা নীচ যোনিতে জন্ম গ্রহণ হইয়া থাকে । ছান্দোগ্য্যাপনিষদে আছে—“অথ য ইহ কপূরচরণা অভ্যাশো হ যন্তে কপূরাং যোনি-মাপত্তেবন্ যোনিং বা শূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা”—(৫।১০।৭) । পশুস্তবের অনু-শয়গণের মধ্যে অর্থাৎ চন্দ্রমণ্ডল হইতে প্রত্যাগত জীবগণের মধ্যে ইহা বা অন্ততকর্ষা তাহারাও অবিলম্বে নিজ কর্ষানুসারেই কুণ্ডলিতযোনি প্রাপ্ত হন—কুণ্ডলযোনি কিংবা

আত্মরীং যোনিমাপন্ন্য মূঢ়া জন্মনি জন্মনি ।

মামপ্রাপ্যৈব কোন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥ ২০

শূকরযোনি অথবা চণ্ডালযোনি লাভ করেন। বাহারা ক্রিয়া করিয়া দেহাতীত বা প্রকৃতির অতীত ক্রিয়ার পরা অবস্থা প্রাপ্ত হন, তাহাদের দেহাভিমান না থাকায় দেহজনিত কৰ্ণে আবদ্ধ হইতে হয় না। হইলেও দেহাতীত অবস্থায় দেহের ফলভোগ তাহারা বুঝিতে পারেন না। এইজন্য মন বাহাতে আচ্ছাদিত বা তদুর্দ্ধে থাকিতে পারে তজ্জন সাধনার অভ্যাস করা আবশ্যক। বাহাদের মন আচ্ছাদিতের নীচে থাকে তাহারা আসক্তির সহিত কৰ্ম করিয়া দেহ ও জুর বুদ্ধি সম্পন্ন হইয়া অন্ততকর্মই পুনঃ পুনঃ করিতে থাকে। তাহার ফলে তাহারা জুর ও নীচ যোনিতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করে ॥ ১৯

অন্বয়। কোন্তেয় (হে কোন্তেয়!) মূঢ়াঃ (মূঢ়গণ) জন্মনি জন্মনি (অন্য জন্মে) আত্মরীং যোনিম্ (আত্মরীং যোনি) আপন্ন্যঃ (প্রাপ্ত হইয়া) মাম্ (আমাকে) অপ্রাপ্য এব (না পাইয়া) ততঃ (তদপেক্ষাও) অধমাং গতিং যান্তি (অধম গতি প্রাপ্ত হয়) ॥ ২০

ত্রিধর। ক্রি—আত্মরীমিতি। তে চ মাম্ অপ্রাপ্যৈব ইতি এব-কারণ মৎপ্রাপ্তি-শঙ্কাপি কৃতস্তেযাম্? মৎপ্রাপ্ত্যুপায়ং সম্ভার্যম্ অপ্রাপ্য ততোহপি অধমাং ক্রমিকীটাদিগতিং যান্তি ইত্যুক্তম্। শেষং স্পষ্টম্ ॥ ২০

বঙ্গানুবাদ। [আরও বলিতেছেন]—“মামপ্রাপ্যৈব”—এই এব-কারণ দ্বারা বলিলেন যে তাহাদের মৎপ্রাপ্তির সম্ভাবনা পর্যন্ত কোথায়? কারণ মৎপ্রাপ্তির উপায়রূপ যে সম্ভার্য তাহা না পাওয়ায় তদপেক্ষা আরও অধম ক্রমিকীটাদি গতি প্রাপ্ত হয় ॥ ২০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এই রকম আত্মরী জন্ম হ'য়ে হ'য়ে পরে ডোম চামার হয়।—পূর্বে জন্মের সংস্কার বশতঃ এই সকল লোকেরা এ জন্মেও ঐ সকল দুই কার্য করিতে প্রবৃত্ত হয়। তাহার ফলে তাহাদের প্রকৃতি অতিমাত্র দূষিত হইয়া যায়, এবং দূষিত প্রকৃতিতে সংকর্ষের প্রবৃত্তিই থাকে না। জন্ম-জন্মান্তর ঐ সকল নীচ কার্য করিতে করিতে শেষে ডোম-চামারের ধরে জন্ম হয়। চিন্তা-ভক্তির অভাবে ভগবদ্-প্রাপ্তির পথ তাহারা জানিতে পারে না, জানিলেও তাহা তাহারা গ্রহণ করে না বরং উপহাস করে, এই সকল কারণে তাহারা সাধুমাগ প্রাপ্ত হয় না। আত্মক্রিয়াতে তাহারা আত্ম স্থাপন করিতে পারে না সুতরাং তাহা করা অনাবশ্যক মনে করে। বাহাতে বুদ্ধি ভাল হয়, ভগবদ্‌মুখী হয়, সে দিকে ইহাদের কোন চেষ্টাই থাকে না। সুতরাং স্বীয় দূষিত প্রকৃতিরও সাংশোধন হয় না। যেচ্ছা-হার-বিহারী হইয়া আত্মরী সম্পদ ত্যাগ করিতে পারে না; এবং উচ্চকূলে বা উচ্চ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া চিন্তা ভক্ত করিবার সামর্থ্যও থাকে না। এইরূপে কত জন্মই তাহাদের নষ্ট হয়, বার বার গর্ভবাস ক্লেশ পাইতে হয়; ইহা যে কিরূপ বিপজ্জনক অবস্থায় জীবকে নিক্ষেপ করে জীব যদি একটু চিন্তা করিয়া দেখে তাহা হইলে প্রাণ দৈবীসম্পদ লাভের জন্ত ব্যাভুল না হইয়াই থাকিতে পারে না ॥ ২০

(নরকের ত্রিবিধ দ্বার)

ত্রিবিধং নরকসোদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ ।

কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥ ২১

(কাম-মুক্ত পুরুষের শ্রেয়ঃ সাধনে সামর্থ্য)

এতৈর্বিকৃতঃ কান্তেয় তমোদ্বারৈস্তিভিনরঃ ।

আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২২

অন্বয়। কামঃ ক্রোধঃ তথা লোভঃ (কাম, ক্রোধ ও লোভ) ইদং ত্রিবিধং (এই তিনটি) নরকস্ত দ্বারং (নরকের দ্বার) আত্মনঃ নাশনং (আত্মার নাশক); তস্মাৎ (অতএব) এতৎ ত্রয়ং (এই তিনটিকে) ত্যজেৎ (ত্যাগ করিবে) ॥ ২১

ত্রিধর। উক্তানাম্ আত্মরোধোদগাণং মধ্যে সকলদোষমূলভূতং দোষত্রয়ং সর্বধা বর্জনীয়ম্ ইত্যাহ—ত্রিবিধমিতি। কামঃ ক্রোধো লোভশ্চ ইতি ইদং ত্রিবিধং নরকস্ত দ্বারং অতএব আত্মনো নাশনং—নীচযোনিপ্রাপকং। তস্মাৎ এতত্রয়ং সর্বাত্মনা ত্যজেৎ ॥ ২১

বঙ্গানুবাদ। [উক্ত আত্মরোধোদগাণের মধ্যে সর্বদোষের মূলভূত যে দোষত্রয়, তাহা সর্বধা পরিত্যজ্য ইহাই বলিতেছেন]—কাম ক্রোধ ও লোভ এই তিনটি নরকের দ্বার, অতএব আত্মনা। তর্ক্য নীচযোনিপ্রাপক। সেই জন্য এই তিনটি সর্বধা বর্জন করিবে ॥ ২১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—কাম ক্রোধ লোভ এই তিনেতে থাকিলেই আত্মার ধাকা হয় না, তন্নিমিত্ত ইহা ত্যাগ করা উচিত—ত্যাগ শব্দার্থে ফলাকাজ্জনা-স্বহিত।—আত্মরী সম্পদের প্রকাব অনন্ত হইলেও কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিনটিই মূখ্য। এই তিনটিকে ত্যাগ করিতে পারিলে আত্মরী সম্পদ পরিহার করা যায়। ইহারা আত্মজ্ঞানের নাশক। এই তিন বৃত্তি দ্বারাই আত্মজ্ঞান আচ্ছাদিত থাকে। বাহারা আত্মজ্ঞানহীন, তাহাদের নীচযোনি প্রাপ্তি হয়। এই তিনটিকে লইয়া বাহারা মগ্ন থাকে তাহাদের আত্মাতে ধাকা হয় না, মাথায় কোন জ্যোতির প্রকাশ হয় না, সুতরাং বিশেষ চেষ্টা করিয়া যুগ্ম সাধকগণের এই তিনটিকে ত্যাগ করা কঠব্য। ফলাকাজ্জনাহিত্যই প্রকৃত ত্যাগ, কিন্তু ক্রিয়ার পর-অবস্থা ব্যতীত ফলাকাজ্জনা ত্যাগ হয় না। ফলাকাজ্জনাহীন সাধকের সহসং কোন কৰ্ণেই প্রবৃত্তি থাকে না। স্বাভাবিক যখন যে ভাবের উদয় হয়, তদনুরূপ তাহাদের কৰ্ম-চেষ্টা হয়। তবে বাহারা যুগ্ম মাত্র তাঁদের এই তিনটির উপর বিশেষ লক্ষ্য থাকা আবশ্যক। আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন—নরক প্রাপ্তির এই তিনটি দ্বার, যে দ্বারে প্রবিষ্ট হইলে আত্মা নাশ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ আর কোন পুরুষার্থের যোগ্য হইতে পারে না। এই তিনটিতে যে ভ্রুবিয়া থাকে, মোক্ষপথ তাহার নিকট এক প্রকাব অবকল্লই থাকে। এ তিনটি আসক্তি থাকিতে, ইচ্ছা হইলেও মোক্ষমার্গে বাইবার কোন উপায় হয় না। সেইজন্য যুক্তিমার্গে গমনেচ্ছু পুরুষের এই তিনটির সংযমে বিশেষ লক্ষ্য থাকা আবশ্যক ॥ ২১

অন্বয়। কোন্তেয় (হে কোন্তেয়!) এতৈঃ ত্রিভিঃ (এই তিন) তমোদ্বারৈঃ (নরকের দ্বার

যঃ শাস্ত্রবিধিযুঃস্বজ্য বর্তত কামচারতঃ ।

ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥২৩

হইতে) বিযুক্তঃ (মুক্ত হইয়া) নরঃ (মনুষ্য) আত্মনঃশ্রেয়ঃ (আপনার মঙ্গল) আচরতি (সাধন করে) ততঃ (তাহা হইতে) পরাং গতিং যতি (পরমা গতি প্রাপ্ত হয়) ॥ ২২

শ্রীধর । ভ্যাগে চ বিশিষ্ট-ফলমাহ—এতৈবিত্তি । তমসঃ—নরকস্ত দ্বারভূতঃ এতৈঃ ক্রিতিঃ কামাদিত্যঃ বিযুক্তো নরঃ আত্মনঃ শ্রেয়ঃসাধনং—তপোযোগাদিকম্ আচরতি । ততশ্চ মোক্ষং প্রাপ্নোতি ॥ ২২

বঙ্গানুবাদ । [দ্বোষত্রয় ভ্যাগে যে বিশেষ ফল হয় তাহা বলিতেছেন]—“তমসঃ”—অর্থাৎ নরকের দ্বারভূত যে কামাদি দ্বোষত্রয় তাহা হইতে বিযুক্ত নর আত্মা শ্রেয়ঃসাধন তপোযোগাদি আচরণ করে, তদনন্তর মোক্ষ প্রাপ্ত হয় ॥ ২২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এই তিনকে ছেড়ে আত্মাতে সর্বদা থেকে শুদ্ধবাক্যের দ্বারা ক্রিয়া করে উত্তম গতি প্রাপ্তি হয়।—চিত্ত উপজবশু না হইলে কেহই শ্রেয়ঃ সাধনে কৃতকার্য হয় না। কাম, ক্রোধ ও লোভের প্রাবল্য হেতুই মুহুর্ত নিজেই শ্রেয়ঃ আচরণে বঞ্চিত হয়। যাহারা ঐ ত্রিবিধ উপজব হইতে মুক্ত, তাহাদেরই মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। দেহ-ইন্দ্রিয়াদির বিষয় মুখে গতি হইতেই নরকের পথ প্রশস্ত হয়। মন দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত মিলিত হইয়া কাম-লোভাদির বাসনাকে চরিতার্থ করে। যাহারা এই চরিতার্থতাই উপভোগ করিতে চায়, তাহাদের দৃষ্টি বিষয়েন্দ্রিয়াদির সীমা অতিক্রম করিতে পারে না। তাহাদের প্রাণের গতি ইড়া-পিঙ্গলাতেই পুনঃ পুনঃ প্রবাহিত হয়, সুতরাং চিত্ত বিশেষভাবে বহির্গত হইয়া যায়। তাহাতে কেবল ত্রিতাপের জ্বালা উদ্ভিত হইয়া মানবকে দুঃখের সাগরে নিমজ্জিত করে। এই দেহেন্দ্রিয়ের কল চালাইতেছে প্রাণাদি বায়রা। তাহাদেরই বিশেষ বিশেষ প্রবাহ হইতে এই কাম-ক্রোধ-লোভাদি সমুদ্ভূত হয়। সুতরাং প্রাণকে ঠাণ্ডা করিতে না পারিলে এই ত্রিপুত্রের বশ হইতে কিছুতেই অব্যাহতি নাই। নৃগুরু উপদেশ মত প্রাণ-ক্রিয়া করিলে প্রাণের গতি ইড়া-পিঙ্গলা হইতে প্রত্যাবর্ত্ত হইয়া সুস্থায় প্রবেশ করিবে। এই সুস্থায় প্রাণের গতি হইতেই পরা গতি লাভ হয় অর্থাৎ সহজাবে স্থিতি হয়। ইহাই জীবের সর্বোত্তম গতি। তখন কাম-ক্রোধ-লোভাদিকে আর চেষ্টা করিয়া দূর করিতে হয় না, তাহারা প্রাণের স্থিরতার সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং-ই নির্কাপিত হইয়া যায় ॥ ২২

অনুব্র । যঃ (যে ব্যক্তি) শাস্ত্রবিধিঃ উৎসৃজ্য (শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া) কামচারতঃ (বেচ্ছাচারী হইয়া) বর্ততে (কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হয়), সঃ (সেই ব্যক্তি) সিদ্ধিঃ (সিদ্ধি) ন অবাপ্নোতি (লাভ করিতে পারে না), ন সুখং ন পরাং গতিং (না সুখ, না পরা গতি প্রাপ্ত হয়) ॥ ২৩

শ্রীধর । কামাদিত্যাগশ্চ স্বধৰ্ম্মাচরণঃ বিনা ন সম্ভবতীত্যাহ—য ইতি । শাস্ত্রবিধিঃ—বেদ-বিহিতঃ ধৰ্ম্মঃ, উৎসৃজ্য, যঃ কামচারতঃ—যথেষ্টং বর্ততে, স সিদ্ধিঃ—তত্ত্বজ্ঞানং ন প্রাপ্নোতি, ন চ সুখং—উপশমং, ন চ পরাং গতিং মোক্ষং প্রাপ্নোতি ॥ ২৩

বঙ্গানুবাদ । [কামাদিত্যাগও স্বধৰ্ম্মাচরণ বিনা সম্ভব হয় না, ইহাই বলিতেছেন]—যে ব্যক্তি বেদবিহিত ধৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যথেষ্টভাবে থাকে (অর্থাৎ বেচ্ছাচারের অন্তর্ভুক্ত হইয়া কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হয়) সেই ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হয় না ; সুখ অর্থাৎ উপশম এবং পরাগতি অর্থাৎ মুক্তি প্রাপ্ত হয় না ॥ ২৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—শাস্ত্রের বিধি অর্থাৎ বিশেষরূপে স্থিতি ক্রিমার দ্বারায় না হইয়া ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত যে কোন কৰ্ম্ম করে তাহার সিদ্ধি হয় না—সুখ ও পরম গতি প্রাপ্তি হয় না—পরম গতি অর্থাৎ স্থিতি।—শাস্ত্র কি ? শাস্ত্র বলিতে বেদকেই বুঝায়, এবং বেদাহুগত স্মৃতি-পুৰাণকেও শাস্ত্র বলে ; কিন্তু স্মৃতি-পুৰাণ যদি কোনস্থানে বেদ-বিরুদ্ধ হয়, তবে তাহার প্রামাণ্য পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন না। যাহা অজ্ঞাত বস্তু, শাস্ত্র তাহার জ্ঞাপক। যে বস্তু আছে, অথচ আমরা জানিতে পারি না—শাস্ত্রই তাহার সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দেয়; আবার সেই অজ্ঞাত বস্তুকে জানিবার জ্ঞাত কতকগুলি বিশেষ বিধি বা সাধনা থাকে, সেই বিধির বোধকও হইতেছেন—শাস্ত্র বা বেদ। শাস্ত্র হইতেই আমরা সেই বিধি অবগত হইতে পারি। এই বিধি “অপূর্ব নিয়ম ও পরিসংখ্যা” ভেদে তিন প্রকার। সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বিষয়ের যে উপদেশ—তাহাই “অপূর্ব বিধি”। যেমন “স্বর্গকামী ব্যক্তি অগ্নিহোত্র করিবে” কিবা “প্রতিদিন সন্ধ্যা করিবে”। অগ্নিহোত্রের অগ্ৰষ্ঠানে স্বর্গলাভ যে হয়—তাহা আমরা কেহ অবগত নহি, কিন্তু আমরা তাহা মানিয়া চলি। কেননা—বেদের উপদেশ, এই উপদেশই “অপূর্ব”। আর যাহা আংশিক অজ্ঞাত এবং আংশিক জ্ঞাত—তাহাকে “নিয়ম” বলে। যেমন ধাতুকে নিভুব করিয়া অন্ন হয়—তাহা আমরা জানি, কিন্তু ধাতুকে নিভুব করিবার অনেক উপায় আছে ; তন্মধ্যে উদ্বৃৎলে কুটির। যে অন্ন হইবে, তাহাতেই বজ্র করিতে হইবে,—এই যে আংশিক অজ্ঞাত বিষয়ের বিধি—তাহার নামই “নিয়ম”। স্বভাবতঃ মানুষ আপনার কচিমত অনেক বিষয় অগ্রদত্ত হয় যেমন—পুত্রমাস ভক্ষণ। কিন্তু শাস্ত্রের উপদেশ যে—“পঞ্চমখ” প্রাণী ব্যতীত অন্ন পুত্র মাস খাইবে না—এই বিধির নাম “পরিসংখ্যা”। বেদোক্ত কৰ্ম্ম বা উপাসনা এই তিন প্রকার বিধির দ্বারা শাসিত। বেদে কৰ্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড আছে। কৰ্ম্মকাণ্ডের বিধি অল্পদ্বারে কৰ্ম্ম করিয়া পোকে স্বর্গাদি উচ্চলোক লাভ করে, জ্ঞানকাণ্ডের বল অল্পরূপ। তাহা আলৌকিক জ্ঞান, স্বদ্বারা জীবের নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ মুক্তি লাভ হয়। এইজন্ত বেদ সর্বপথেরই প্রদর্শক। বেদ ব্যতীত জীবের মুক্তি লাভ হইতে পারে না—তাই চণ্ডীতে বলিয়াছে—

“শকাশ্রিকা স্মবিমলর্গ্ যজুযাং নিধান—

মুদগীতরম্যপদ-পাঠবতাক্ষ সান্নাম্ ।

দেবী ত্রয়ী ভগবতী ভবভাবনায়

বার্তা চ সর্বজগতাং পরমার্তিহরী ॥”

তুমি শব্দ ব্রহ্মরূপা, তুমি বিত্ত জ্ঞানপ্রদ ঋক্ ও যজুর্বেদের আশ্রয়, তুমি উদাত্তাদি স্বরযোগে রমণীয় পদযুক্ত সামবেদেরও আশ্রয়। অতএব তুমিই ত্রয়ী অর্থাৎ বেদরূপা। তুমি সর্বার্থ-প্রকাশিকা; তুমিই সর্বকৈর্য্যযুক্তা; তুমিই সংসার-প্রবাহের বক্ষণার্থ কুবিশাণিছাদি বৃত্তিরূপা। তুমি নিখিল জগতের পরমদুঃখ-নাশিনী।

এইজ্ঞান বাহারা শুভকর্ষ করে না বা করিলেও শাস্ত্র-বিধি চর্চন করিয়া দেখাচাতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা সিদ্ধিলাভ, সুখলাভ বা মোক্ষ—কিছুই লাভ করিতে পারে না। কিন্তু শাস্ত্র অসংগত তাহাতে বিধিও অনন্ত, সুতরাং সকলেই যেসকল শাস্ত্র মানিয়া চলিতে পারিলে তাহার সন্তোষ কোথায়? শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ এত অধিক এবং তাহারা পদস্পর্শ এত দিক্‌বদ্ধতাপন্ন, যেতাঁহা মানিয়া চলা কাহারও পক্ষে সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। কারণ সব বিধি-সব সময়ে সকলের জন্য নহে, কাহার পক্ষে কখন কোন্ বিধি প্রদত্ত হইবে, তাহা বলিয়া দিতে হইলেও শাস্ত্রে অগাধ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। শুধু শাস্ত্র-জ্ঞান থাকিলেও হইবে না, জিজ্ঞাসুর পক্ষে কোন্ বিধি যুক্তিযুক্ত—ইহা বুঝিতে হইবে যে মেধার প্রয়োজন, তাহা থাকা আবশ্যক, কিন্তু তাহা সকলের থাকে না, এবং শুধু মেধা মাত্র থাকিলেও চলিবে না, সে মেধা “বিদিতাধিলশাস্ত্র-সার্বা” হওয়া চাই—যদ্বারা সর্বশাস্ত্রের সারভূত ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায়—ইহা সাধকের বহু সাধনার ফলে যে সিদ্ধি লাভ হয়—সেই সাধনসিদ্ধি না থাকিলে তিনি কাহার পক্ষে কিরূপ সাধনা উপযোগী তাহা বলিয়া দিবেন কিরূপে? সুতরাং বাহ্যভাবে কেবল শাস্ত্রাঙ্গীলনেও কোন ফল হইবে না। বরং বহুশাস্ত্রাভ্যাস ও বহুশাস্ত্র-আলোচনার নিষেধও আছে। সেইজ্ঞান ভগবান্ বলিয়াছেন—“শব্দব্রহ্মণি নিষ্কাতঃ ন নিক্ষীয়ান্ পরে যদি। শ্রমশ্চ ত্বা জ্ঞেয়ঃ হৃদেহু-মিব রক্ষতঃ॥”—যিনি শাস্ত্রে অভিজ্ঞ কিন্তু পরনিষ্কাত নহেন অর্থাৎ পরব্রহ্মের ধ্যান-ধারণাদি করেন না, তাহার শাস্ত্রপাঠ কেবল শ্রমমাত্র, যেরূপ বন্ধা-গাভীপালকের রথা শ্রম হয়। তাই—

“অনন্তশাস্ত্রং বহু বেদিতব্যং স্বল্পঞ্চ কালো বহুবচ বিদ্যাঃ।

বৎ সারভূতঃ তদুপাসিতব্যং হংসো যথা ক্ষীরমিবাসু মিশ্রন্ ॥”

শাস্ত্র অনেক, জ্ঞাতব্যও বিস্তর, কিন্তু আয়ুঃ স্বল্প এবং বিদ্য বহু, সুতরাং যাহা সারভূত—তাহাই উপাসিতব্য; যেমন হংস জলমিশ্রিত দুগ্ধের সারভাগ গ্রহণ করে সেইরূপ শাস্ত্র হইতে সারভাগ লইতে হইবে। যদিও আত্মতত্ত্ব সুবিজ্ঞেয় নহে, শাস্ত্রাঙ্গীলনেই তাহার অঙ্গুসন্ধান করিতে হইবে, কিন্তু স্বেচ্ছাচারে শাস্ত্রাঙ্গীলনও সমূহ ক্ষতি করে। কিন্তু আত্মকাল আমরা তাহা মানি কই? এই শ্লোকের বাহ্য অর্থও অতিশয় উপায়ে, কিন্তু ইহার মধ্যে যে একটি আধ্যাত্মিক তত্ত্ব রহিয়াছে তাহার অঙ্গুসন্ধান করিয়া দেখা যাক।

শাস্ত্র অর্থে বেদ এবং বেদের অর্থ জ্ঞান। বেদ অপৌরুষেয়, পুরুষের চেষ্টার ফলে জ্ঞান হয় না। জ্ঞান নিত্য সিদ্ধ বস্তু, যেমন স্বতঃ প্রকাশিত সূর্যের সাময়িক আবরণক মেঘ, তজ্জপ নিত্য-সিদ্ধ জ্ঞান-বস্তুর সাময়িক আবরণক অজ্ঞান। এই অজ্ঞান আত্মদৃষ্টির অভাব সূচিত করে। আত্মদৃষ্টির অভাব হইলে আমাদের কতকগুলি ভ্রম উৎপন্ন হয়, পুনরায় আত্মদৃষ্টিসম্পন্ন হইলে সে ভ্রম থাকে না। ভ্রম মানেই যাহা সত্য নহে, তাহাকে সত্য বলিয়া ধারণা করা। যে বস্তু যাহা—তাহাকে তাহা না জানিয়া অন্য বস্তু মনে করাই ভ্রম। আত্মদৃষ্টির অভাবস্বতঃ এই ভ্রম আমাদের সর্বদাই হইতেছে। কিন্তু আমাদের ভ্রম হয় বলিয়া যে সত্য বস্তুর কোন্ দিকার ঘটে—তাহা নহে, যেমন বজ্জতে সর্পভ্রম হইলেও বজ্জ বজ্জই থাকে, তজ্জপ নিত্য দিকার ঘটে—তাহা নহে, যেমন বজ্জতে সর্পভ্রম হইলেও বজ্জ বজ্জই থাকে, তজ্জপ নিত্য সত্য ব্রহ্ম বস্তুতে জগদাদি অসং বস্তুর ভ্রম হইলেও, যাহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য—তাহার সত্যরূপের

কখনও কোন ব্যক্তির হয় না। সুতরাং আমরা জানিতে বা বুঝিতে না পারিলেও আত্মার স্বরূপে কোন বিকার হয় না, তাহা সর্বদাই একরূপ। এই একত্বের দর্শন হয় না কেন? কারণ—সূর্যের কোলে মেঘের মত, সত্য-জ্ঞানের কোলে কিছু আবরণ পড়ে,—ঐ আবরণই অজ্ঞানের জনক। সেই আবরণ সরিয়া গেলে দর্শন-যন্ত্রের আবরণের অভাবে আমরা তখন সূর্যের স্বতঃ প্রকাশকে অমুভব করিতে পারি। কিন্তু আমাদের জানিবার পূর্বেও তাহার স্বতঃ প্রকাশের কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই। এইজ্ঞান পুরুষের চেষ্টার ফলে যে জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়—তাহা নহে, পুরুষের চেষ্টার ফলে জ্ঞানের আবরণ সরিয়া যায় মাত্র। এই জ্ঞানের আবরণ প্রকৃতি বা ক্ষেত্র। মন সেই প্রকৃতিব মধ্যে যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ সে বিষয় অমুভব করে, নানাব্য দেখে, জন্ম-মৃত্যুর খেলা দেখতে থাকে, জ্ঞান ঢাকা পড়িয়া যায়। সেই জ্ঞানকে লাভ করিতে হইলে শাস্ত্রাঙ্গীলন করিতে হয়। শাস্ত্র অর্থে—শাসন বা আজ্ঞা। কাহার শাসনে এই শরীর বদ্ধ চলিতেছে? “বাধ্যতা শরীরিণাম্”—বায়ুই এই শরীরের বিধাতা বা শাসক। বায়ুর বলেই এই ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি বা সমগ্র প্রকৃতি-কার্য পরিচালিত হইতেছে। সেই সকল বায়ুর মধ্যে প্রাণই মুখ্য। এই প্রাণের আজ্ঞাতেই সব কার্য হইতেছে। তাই বায়ুই শরীরের শাস্তা বা শাস্ত্র। এই শাস্ত্রের শরণাগত হইয়া চলিতে পারিলেই এই সমগ্র প্রকৃতি তাহার অধীন হয়। তখন সে প্রকৃতির অধীশ্বর পুরুষকেও অবগত হইতে পারে। এই প্রকৃতি-পুরুষকে অবগত হইলেই জীব জন্মমরণরহিত হইয়া যায়। তাই তৈত্তিরীয় উপনিষদ বলিলেন—“নমস্তে বায়ো নৃমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মসি”—এই বায়ুই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম, হে বায়ো তোমাকে নমস্কার। “প্রাণায়াম এবৈতন্মিন্ পুরে জাগ্রতি”—এই দেহরূপ পুরে প্রাণরূপী অগ্নি জগ্নিই সর্বদা জাগরিত থাকে। প্রাণপতি বলিয়াছেন—যজ্ঞের সহিতই প্রাণাসকল সৃষ্ট হইয়াছে। এই প্রাণবজ্জই সেই যজ্ঞ। সেই করিতে পারিলে তবে আত্মোন্নতি লাভ হয়। ইহাই সকলকে অভীষ্ট ভোগ প্রদান করে।

এই বায়ু সচঞ্চল হইয়া মনকে উৎপন্ন করে এবং মনের দ্বারা বিষয় ভোগ হয়। এই বায়ু স্থির হইলে মন প্রাণের সহিত মিলিয়া এক হইয়া যায়, তখনই ব্রহ্ম দর্শন হয়। প্রাণায়ামের দ্বারা এই বায়ু আয়ত্ত হইলে অপরোক্ষানুভূতি হইয়া থাকে। এই বায়ুর সাধনই জ্ঞাতব্য বস্তু। প্রাণোপনিষদে এ সম্বন্ধে ঋষি বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। বায়ু সকলের শাসক বলিয়া সেই ক্রিয়া স্বত্বীয় যে নিয়ম বা বিধি আছে, তাহাই শাস্ত্রবিধি। এই বায়ুর ক্রিয়াকেই ব্রহ্ম-বিদ্যা বলে। ক্রিয়া দ্বারা মূল্যধার হইতে সহস্রাব পৰ্য্যন্ত সমস্ত চৈতন্যপ্রাপ্ত হইলে তখনই বেদজ্ঞান হয়। এই বেদজ্ঞান সম্পূর্ণ হইলে সাধক বেদাতীত চরম জ্ঞান লাভ করেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান্ অর্জুনকে কিন্তু “ত্রেগুণ্যবিষয়া বেদা নিত্রেগুণো ভবাজ্জুন”—বেদ ত্রেগুণ-স্বক, তুমি গুণাতীত হও বলিলেন কেন?—এই বাক্যে বেদকে অবহেলা করিতে বলা হয় নাই (২য় অঃ, ৪৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা দেখ)। বেদ-বিধি দ্বারা প্রকৃতপক্ষে নিত্রেগুণ্যের অবস্থা লাভ করা যায়। বেদবিধিই হইল—মেরুদণ্ডের মধ্যে ষট্চক্রের ক্রিয়া। জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞেয়কে জানিতে পারিলে যেমন আর জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না, তজ্জপ ষট্চক্রে প্রাণায়ানাদি ক্রিয়া করিলে শেষে যে বিশেষরূপে স্থিতি লাভ হয়, এই গুণাতীত অবস্থা

(শাস্ত্র কার্য্যাকার্য্যের প্রমাণ)

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ ।

জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কৰ্ম্ম কৰ্ত্তুমিহাসি ॥ ২৪

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিভাগ্যং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণাৰ্জুন-সংবাদে

দৈবাসুরসম্পদবিভাগযোগো নাম ষোড়শোঃধ্যায়ঃ ।

লাভের পর আর ক্রিয়ার আবশ্যকতা হয় না। এই জন্মই প্রথম প্রথম শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া (মনকে ঘটক্রয়ের মধ্যে না বাগিয়া বাহিরের বস্তুতে রাখাই শাস্ত্র-বিধির উল্লঙ্ঘন) স্বেচ্ছাচারী হইতে নিষেধ করা হইয়াছে। সহস্রারে প্রাণের স্থিতি হইলেই ক্রিয়ার শেষ হয়। এইজন্ম ঘটক্রয়ের ক্রিয়াই বেদের কৰ্ম্মকাণ্ড এবং সহস্রারে স্থিতিই জ্ঞানকাণ্ড—“জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে” জ্ঞানেই সমস্ত সমাপ্ত হয়। এই বিশেষ স্থিতি দ্বারাই মনের চাক্ষুশ্য তিরোহিত হয়, মন পরম শাস্ত হইয়া পরমানন্দ-রূপ আত্মাতে চিরদিনের জন্য নিমগ্ন হইয়া যায়। ক্রিয়া প্রথমে ইড়া-পিঙ্গলাতেই আবৃত্ত করিতে হয়, কারণ উহাই তখন প্রত্যক্ষ। ক্রিয়া করিতে করিতে ইড়া-পিঙ্গলায় কাজ বন্ধ হইয়া সুষুম্নায় কাজ হয়। সুষুম্নায় প্রাণবায়ুর প্রবাহ থাকিলেই নির্মল সবুজের অবির্ভাব হয়। পরে সাধক গুণাতীত হইয়া বান। যে ক্রিয়া করে না—তাহার ইড়া-পিঙ্গলায় গতি শুদ্ধ হয় না, সুতরাং পরমা স্থিতি লাভ না হওয়ায় তাহার যথার্থ হৃথ বা পরম-গতি (নির্দোষ মোক্ষ) লাভ হইতে পারে না ॥ ২৩

অন্থয় । তস্মাৎ (সেই হেতু) কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ (কর্তব্য ও অকর্তব্যের নিরূপণে) শাস্ত্রং তে প্রমাণম্ (শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ) [সুতরাং] ইহ (কৰ্ম্মাধিকারে বর্তমান থাকিয়া) শাস্ত্রবিধানোক্তং (শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে বিধান—তাহা) জ্ঞাত্বা (বিদিত হইয়া) কৰ্ম্ম কৰ্ত্তম্ (কৰ্ম্ম করিতে) অহসি (যোগ্য হও) ॥ ২৪

শ্রীধর । ফলিতমাহ—তস্মাদ্ভিত্তি । ইহং কৰ্ম্মম্ ইহং অকৰ্ম্মম্—ইতি অস্যাং ব্যবস্থায়াম্ তে—তব, শাস্ত্রং—ঐতিহ্যত্বিত্তিপূরণাধিকমেব প্রমাণম্ । অতঃ শাস্ত্রবিধানোক্তং কৰ্ম্ম জ্ঞাত্বা ইহ—কৰ্ম্মাধিকারে বর্তমানঃ যথাধিকারং কৰ্ম্ম কৰ্ত্তম্ অহসি, তন্ম লভ্যং সমস্তদ্বিসম্যগ্-জ্ঞানবৃত্তীনাম্ ইত্যর্থঃ ॥ ২৪

দেবদৈতয়সম্পত্তিসংবিভাগেন ষোড়শে ।

তত্ত্বজ্ঞানেধিকারস্ত সাত্ত্বিকস্যোতি দর্শিতম্ ॥

ইতি শ্রীশ্রীধরশামিকৃতভাষ্যঃ ভগবদ্গীতানীকায়াম্ সুবোধিন্যাম্

দৈবাসুরসম্পদবিভাগযোগো নাম ষোড়শোঃধ্যায়ঃ ॥

বঙ্গানুবাদ । [ফলিতার্থ বলিতেছেন]—ইহা কার্য্য, ইহা অকার্য্য—এই ব্যবস্থায় (অর্থাৎ ইহা নিরূপণের জন্ম) ঐতিহ্য তত্ত্বিত্তিপূরণাধিকমেব প্রমাণম্ । অতএব শাস্ত্র-বিধানোক্ত কৰ্ম্ম অগত হইয়া কৰ্ম্মাধিকারে বর্তমান যে ভূমি তোমার যথাধিকার কৰ্ম্ম করাই উচিত। কাবণ সমস্তদ্বি, সম্যক্ জ্ঞান এবং যুক্তি লাভের মূলই কৰ্ম্ম ॥ ২৪

ষোড়শাধ্যায়ে দৈবী ও অসুরী সম্পত্তির সংবিভাগ দেখাইয়া সাত্ত্বিকের যে তত্ত্বজ্ঞানে অধিকার তাহা প্রদর্শিত হইল ॥

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—তন্নিমিত্তে শাস্ত্রে যেরূপ বলেছে বিশেষরূপ বুদ্ধির পর পরা বুদ্ধিতে স্থির হইয়া কর্তব্য যে কৰ্ম্ম অর্থাৎ ক্রিয়া করা উচিত—বিশেষ রূপে স্থিতি হইয়া যাহা ক্রিয়ার পর অবস্থা।—কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ। শাস্ত্রাচার জানা থাকিলে আর স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্তি হয় না। যতদিন শাস্ত্র ঠিক জানা না যায়, ততদিন গুরুর উপদেশ মত সাধনপথে চলাই কর্তব্য। “ইহ” অর্থাৎ এই কৰ্ম্মাধিকার ভূমিতে ভূমি বর্তমান, অতএব তোমার পক্ষে শাস্ত্রনির্দিষ্ট পথেই চলা উচিত। শাস্ত্র প্রথমে ঠিক মত বুঝা যায় না, পড়িলেই যে শাস্ত্রজ্ঞান হইবে—তাহাও নহে, তবে শাস্ত্রে প্রদত্ত থাকা আবশ্যক। সাধকের পক্ষে শাস্ত্রের যে কি অর্থ তাহা পূৰ্ব্বান্ন্যাকে বলিয়াছি।

কৰ্ম্মাধিকার কি তাহাই বলিতেছি। যোগিগণ প্রাণায়াম দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া কুটস্থে লক্ষ্য করিলেই জাতব্য কি তাহা জানিতে পারেন এবং কর্তব্য কি তাহা বুঝিতে পারেন। শরীরে কোন্ গুণ প্রবল এবং ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চ তত্ত্বের মধ্যে কোন্ তত্ত্বের ক্রিয়া চলিতেছে—তাহা বুঝিবার কৌশল আছে। সমস্ত জগতের সংবাদ এই কুটস্থে লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়। তিনটি বিন্দুর কথা পূর্বে বলিয়াছি। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ ত্রিকোণাকারে তিনটি বিন্দুরূপে লক্ষিত হয়। রজঃ বিন্দুটি বাম কোণে বজ্রভার দ্বারা দৃষ্ট হয়, তমঃ বিন্দুটি দক্ষিণ কোণে কৃষ্ণভাৱা সদৃশ দৃষ্ট হয়, সত্ত্ব বিন্দুটি উর্দ্ধকোণে শুভ্র কিরণের দ্বারা বোধ হয়। ইহাদ্বিগকেই যথাক্রমে বামা, রোদ্রী ও জ্যোষ্ঠা বলে—ইহারা সকলেই শক্তিরূপ। ক্ষিতি তত্ত্বের বর্ণ হরিদ্রাবৎ, জল তত্ত্বের বর্ণ ফিকে সবুজ তেজস্তত্ত্বের বর্ণ জলন্ত অজারবৎ, মরুতের বর্ণ জ্বাল এবং ব্যোমতত্ত্বের বর্ণ আকাশ সদৃশ। এইতিন বিন্দু মিলিয়া এক হইয়া গেলে ত্রিকোণের মধ্যস্থলে শ্রী বিন্দুর ঘর্শন হয়, উহাই যুক্তিহীনী শক্তি।

এ সমস্তই শরীরস্থ বায়ুর শক্তি। প্রাণায়ামাদি যোগ ক্রিয়া দ্বারা এই সমস্ত বায়ুর বহু বহুজ্ঞানিতে পারা যায়। যেমন করিয়াই হউক বায়ুকে আয়ত্ত করিতে হইবে, এই বায়ুর গতি অনুসারেই জীব শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাদিতে আসক্ত হইয়া বহির্গুণ ও বন্ধ হয়, বায়ুর ক্রিয়া দ্বারা এই বায়ুকে আয়ত্ত করিলেই জীবের অন্তর্লক্ষ্য আরম্ভ হয়। ক্রিয়া বতই অধিক করিবে বায়ুর শক্তিতে অন্তস্তবন্ধ নাড়ী সমুদয় ততই বিস্তৃত বা মলমূল হইবে। নাড়ীমুখে বায়ুর গতি অনুসারেই শুভাশুভ ইচ্ছা বা সঙ্কল্প সকল সমুদ্ভূত হয়। নাড়ী যত শুদ্ধ হইবে ততই মনের গতিপ্রবাহ শুদ্ধ ও নির্মল হইতে থাকিবে। কিন্তু ক্রিয়া আবৃত্ত করিবামাত্রই নাড়ী শুদ্ধ হয় না। যাহার বতটা অধিকার তাহার অধিকারাহুয়ারী ততটা উন্নতলাভ হয়। শ্রীমৎ আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—এই শ্লোকস্থ “ইহ” শব্দটি দ্বারা “কৰ্ম্মাধিকার ভূমি” প্রদর্শিত হইয়াছে। এই শরীরটি কর্ম্মের ক্ষেত্র বা ভূমি, ইহাতে কর্ম্মের অধিকারাহুয়রূপ ফল দেয়।

শাস্ত্রবিধি—শাস্ত্র শাস্থ্যাত্ম হইতে, যিনি শাসন করেন বা আজ্ঞা দেন। বাহ্যই এই

দেহেন্দ্রিয়কে শাসন করিয়া তাহাদিগকে স্বৰ্গ কর্ষে নিযুক্ত করে—(প্রমোদনিবদ) ; হুতরাং বায়ুগুলিই শাস্ত্র । বিধি—বি পূৰ্ণক ধা ধাতু হইতে—যাহার অর্থ বিশেষরূপে ধারণ করা । তাহা হইলে শাস্ত্র-বিধির অর্থ—বায়ু বিশেষরূপে যখন স্থির হইয়া মস্তকে স্থিত হয়, তাহাই শাস্ত্র-বিধি—যাহাকে ক্রিয়ার পর অবস্থা বলে ।

সেই বিধি পালনের যে নিয়ম গুরু বলিয়া দেন সেই নিয়ম অহুসাবে চলিলেই সাধক উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করেন । তখন সাধক যে সোপানে আশ্রিত হইয়াছেন তদনুসারে ক্রিয়ারও নানারূপ বিধান আছে, গুরু তাহা বলিয়া দেন । সাধনে যাহার স্বত্বটা অধিকার, তাহাই তাহার স্বভাবজ কর্ষ, ইহাই শাস্ত্রবিধানোক্ত কর্ষ । এ কর্ষ করিলে সাধকের ক্রমশঃ উন্নতি লাভ হইতে থাকে ; ও পথে নানা বিঘ্ন বাধা আসিয়া উপস্থিত হইলেও অধিকারীরাহরূপে যে সাধন করিয়া যাইতে পাবে তাহার প্রাণ ধীরে ধীরে স্থির হইয়া আসে, পরে বিশেষরূপে স্থিতি হইলেই ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্তি হয় । এই অবস্থা লাভ করিতে পারিলেই মহত্ত্ব ধীরে ধীরে যাহা চরম লক্ষ্য সেই লক্ষ্যস্থলে উপনীত হইতে পারা যায় । অতএব ক্রিয়ার ক্ষেত্র এই শরীরকে লাভ করিয়া ক্রিয়া করিতে কখনও অবহেলা করিও না । ইহাই ভগবদ্ বাক্যের অভিপ্রায় ॥ ২৪

ইতি শ্রামাচরণ-আধ্যাত্মিকদীপিকা নামক গীতা বোড়শ অধ্যায়ের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সমাপ্ত ।

সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।

(শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগ-যোগঃ)

অৰ্জুন উবাচ ।

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়াশ্রিতাঃ ।

তেষাং নির্ণা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহোরজস্তমঃ ॥ ১

অর্থঃ । অৰ্জুন উবাচ (অৰ্জুন বলিলেন) । কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ !) যে (যাহারা, শাস্ত্রবিধি মুৎসৃজ্য) শাস্ত্র বিধি পরিত্যাগ করিয়া তু (কিন্তু) শ্রদ্ধয়াশ্রিতাঃ (শ্রদ্ধাবৃত্ত হইয়া) যজন্তে (দেবদেবী সকলকে পূজা করে) তেষাং নির্ণা কা ? (তাহাদিগের নির্ণা কিরূপ ?) সত্ত্বমঃ (সাত্ত্বিকী ?) রজঃ (রাজসী ?) আহো তমঃ (অথবা তামসী ?) ॥ ১

শ্রীধর । উক্তাধিকার-হেতুমাং শ্রদ্ধা মুখ্যা চ সাত্ত্বিকী ।

ইতি সপ্তদশে গোঁশ্রদ্ধাভেদস্ত্রিষোচ্যতে ॥

পূৰ্ব্বাধ্যায়ান্তে “যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্জ্যে কামচারতঃ । ন স সিদ্ধিমবাশ্রোতি” ইত্যনেন শাস্ত্রোক্ত বিবিধ উৎসৃজ্য কামচারেণ বর্জমানস্ত জ্ঞানে অধিকারো নাস্তি ইত্যুক্তং । তত্র শাস্ত্র-বিধিমুৎসৃজ্য কামচারং বিনা শ্রদ্ধয়া বর্জমানানাং কিম্ অধিকারোহস্তু নাস্তি বেতি বুভুৎসয়া অৰ্জুন উবাচ—যে শাস্ত্র ইতি । অত্র চ শাস্ত্রবিধিম্ উৎসৃজ্য যজন্ত ইত্যনেন শাস্ত্রার্থং বুদ্ধা তন্ম উল্লঙ্গ্য বর্জমানা ন গৃহ্যন্তে, তেষাং শ্রদ্ধয়া যজ্ঞমাহুপপত্তেঃ । আত্মিক্যবুদ্ধির্হি শ্রদ্ধা । ন চাসৌ শাস্ত্রবিকল্পে অর্ধে শাস্ত্রজ্ঞানবতঃ সম্ভবতি । তান্ এষ অধিকৃত্য “ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা”, “যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্” ইত্যাদ্যন্তরাহুপপত্তেঃ । অতো নাত্র শাস্ত্রোল্লঙ্গিনঃ গৃহ্যন্তে । অপিতু ক্লেববুদ্ধ্যা বা আলস্তাধা শাস্ত্রার্থজ্ঞানে প্রযত্নম্ অকৃত্বা কেবলম্ আচারপরম্পর্যাবশেন শ্রদ্ধয়া বচিদেবতারাদিনা হৌ প্রবর্তমানা গৃহ্যন্তে । অতোহয়মর্থঃ—যে শাস্ত্রবিধিম্ উৎসৃজ্য দ্বঃখবুদ্ধ্যা আলস্তাধা অনাবৃত্য কেবলম্ আচারপ্রমাণেন শ্রদ্ধয়াশ্রিতাঃ সন্তো যজন্তে, তেযাং তু কা নির্ণা ? কা স্থিতিঃ ? ক আশ্রয়ঃ ? তামেব বিশেষণ পৃচ্ছতি—কিং সত্ত্বম্ ? আহো কিং বা রজঃ ? অথবা তম ইতি ? তেযাং-তাদৃশী দেবপূজাদিশ্রুতিঃ কি সত্ত্বসংশ্রিতা ? রজঃসংশ্রিতা বা ? তমঃসংশ্রিতা বা ? ইত্যর্থঃ । শ্রদ্ধায়াঃ সাত্ত্বিকত্বাৎ ক্লেববুদ্ধ্যা আলস্তেন চ শাস্ত্রানাদরত্ব রাজসতামসত্বাৎ ত্রিধা সম্বেহঃ । যদি সত্ত্বসংশ্রিতাঃ তর্হি তেযামপি সাত্ত্বিকত্বাদ্ যথোক্ত্যন্তজ্ঞানে অধিকারঃ স্ত্যং অতথা ন ইতি প্রশ্নত্যাংপর্য্যার্থঃ ॥ ১

বজ্রমুবাচ । [“উক্ত ভবজ্ঞানে অধিকারের হেতু সৃষ্টির মধ্যে সাত্ত্বিকী যে শ্রদ্ধা তাহাই মুখ্য, এইজন্য সপ্তদশঅধ্যায়ে তিন প্রকার গোঁশ্রদ্ধার ভেদ কথিত হইতেছে ।” পূৰ্ব্বাধ্যায়ের শেষে ‘যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য’ ইত্যাদি শ্লোকে শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া যথেষ্টভাবে কর্ষে প্রযত্ন ব্যক্তিগণের জ্ঞানে অধিকার নাই—ইহা বলা হইয়াছে । ইহাতে শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া কামচার (যথেষ্টাচার) ব্যতিরেকে শ্রদ্ধা পূৰ্বক কর্মাহুষ্ঠানে প্রবর্তমান ব্যক্তির (তত্ত্বজ্ঞানে)

শ্রীভগবানুবাচ ।

(মুখ্যশ্রদ্ধা সাত্বিকী, গৌণশ্রদ্ধা ত্রিবিধা)

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা ।

সাত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥ ২

অনুয়। শ্রীভগবানু উবাচ (শ্রী ভগবানু বলিলেন) । দেহিনাং (দেহিগণের) সা শ্রদ্ধা (সেই শ্রদ্ধা) স্বভাবজা (স্বাভাবিক, অর্থাৎ পূর্ব জন্ম-সংস্কারপ্রসূত) এব চ (আর তাহা) সাত্বিকী, রাজসী, তামসী চ (সাত্বিকী, রাজসী ও তামসী) ইতি ত্রিবিধা ভবতি (এই তিন প্রকারই হয়) তাং শৃণু (তাহা শুন) ॥ ২

শ্রীধর। অত্র উক্তং শ্রীভগবানু উবাচ—ত্রিবিধেতি । অর্থমর্থঃ—শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞানতঃ প্রবর্তমানানাং পরমেশ্বর-পূজাবিষয়া সাত্বিকী একবিধেব ভবতি শ্রদ্ধা । লোকাচারমাত্রেণ তু প্রবর্তমানানাং দেহিনাং যা শ্রদ্ধা সা তু সাত্বিকী রাজসী তামসী চেতি ত্রিবিধা ভবতি । তত্র হেতুঃ স্বভাবজাঃ—স্বভাবঃ পূর্বসংস্কারঃ, তস্যাং জাতা । স্বভাবম্ অশ্রুত্বা কর্তুং সূনর্থঃ হি শাস্ত্রোক্তং বিবেকজ্ঞানং । তত্ত তেষাং নাস্তি । অতঃ কেবলং পূর্বস্বভাবেন ভবতীতি শ্রদ্ধা ত্রিবিধা ভবতি । তামিমাং ত্রিবিধাং শ্রদ্ধাং শৃণু । তদ্বক্তৃঃ—“ব্যবসায়াদ্বিকা বুদ্ধিরেবেত কুরুনন্দন” ইত্যাদিনা ॥ ২

বঙ্গানুবাদ। [ইহার উত্তর]—শ্রীভগবানু বলিলেন । শ্লোকের অর্থ এই যে শাস্ত্র ও তত্ত্বজ্ঞানানুযায়ী কর্তব্য প্রবৃত্ত জনগণের পরমেশ্বর পূজাবিষয়া একমাত্র সাত্বিক শ্রদ্ধাই হইয়া থাকে ; কিন্তু লোকাচারানুযায়ী কর্তব্য প্রবৃত্ত জনগণের যে শ্রদ্ধা—তাহাই সাত্বিকী, রাজসী ও তামসী—এই তিন প্রকারের হইয়া থাকে । তাহার কারণ—তাহাদের শ্রদ্ধা “স্বভাবজা” অর্থাৎ পূর্বসংস্কার-জাত । স্বভাবকে অশ্রুত্বা করিতে শাস্ত্রজনিত বিবেকজ্ঞানই সমর্থ, তাহা তাহাদের লোকাচারানুযায়ী যাহারা কর্তব্যস্থান করে) নাই, অতএব কেবল পূর্ব-স্বভাবানুযায়ী (বা সংস্কার বশতঃ) যে শ্রদ্ধা হইয়া থাকে, তাহা তিন প্রকার । সেই ত্রিবিধা শ্রদ্ধা সম্বন্ধে শ্রবণ কর । তাই দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবানু বলিয়াছেন—“নিশ্চয়াদ্বিকা বুদ্ধি একত্ব ইয়া থাকে” ॥ ২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—কুটস্থ দ্বারায় অনুভব হইতেছে—তিন রকমের শ্রদ্ধা হইতেছে—সাত্বিকী, রাজসিক, তামসিক ।—শ্রদ্ধা তিন প্রকারের, এবং তাহা প্রাণিগণের স্বভাবজ—অর্থাৎ পূর্বজন্মে অমুষ্ঠিত যে ধর্ম্মাদি সংস্কার এবং বাহ্য মরণকালে অভিব্যক্ত হয় । সেই পূর্বসংস্কারই বর্তমান দেহে স্বভাব বলিয়া কথিত হয় । সেই শ্রদ্ধা সাত্বিকাদি প্রকৃতি-ভেদে তিন প্রকারে হইয়া থাকে । এই স্বভাব লইয়াই মনুষ্য জন্মিয়াছে । বাহ্যর বৈচিত্র্য পূর্বসংস্কার, তাহার তদ্ব্যবস্থা শ্রদ্ধা শিক্ষা না পাইলেও হইবে । এইরূপ শ্রদ্ধাও প্রকৃতি অনুসারে যে ত্রিবিধ হয়, তাহারই কথা এখানে ভগবানু বলিতেছেন । শাস্ত্রাদি পাঠ, সাধুসঙ্গ ও সাধন-জনিত যে সাত্বিকী শ্রদ্ধা সাধকদিগের জন্য থাকে, তাহার কথা এখানে বলিতেছেন না । মনে অনবরত তিনটি গুণ ধোলা করিতেছে, মন যখন যে গুণে অবস্থিত করে, তদনুসারে তাহার শ্রদ্ধা—সাত্বিকী, রাজসী অথবা তামসী হইয়া থাকে । এই গুণত্রয়ীর প্রকৃতি—

(পুরুষ শ্রদ্ধাময়)

সদ্বানুকূপা সর্বশ্রু শ্রদ্ধা ভবতি ভারত ।

শ্রদ্ধাময়োহয়ং পুরুষো যো বহুধঃ স এব সঃ ॥ ৩

৩তরাং শ্রদ্ধাও প্রকৃতির ভাবানুযায়ী তিন প্রকারের হইবে-ই । শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনে এই তিন গুণের অবিরত পরিবর্তন হেতু শ্রদ্ধারও অনবরত পরিবর্তন হইতেছে । স্বাস্থ্য-ইচ্ছা-পিঙ্গবাণ থাকিলে, শ্রদ্ধাও তদনুযায়ী বাঞ্ছনিক বা তামসিক হইতে থাকিবে । সুখায়োগ্য বহিলেই তখন সাত্বিকী শ্রদ্ধাও উদয় হইয়া থাকে । স্বাভাবিক শ্রদ্ধা পূর্বকর্তৃমানুযায়ী হইয়া থাকে, কিন্তু সাত্বিকী শ্রদ্ধা—সাধন-ভজন, সাধুসঙ্গ ও শাস্ত্রালোচনা দ্বারা তৈয়ারী করিয়া লইতে হয় ॥ ২

অনুয়। ভারত (হে ভারত!) সর্বশ্রু (সকলের) শ্রদ্ধা (শ্রদ্ধা) সদ্বানুকূপা ভবতি (নিজ অন্তঃকরণের অনুরূপ হইয়া থাকে); অয়ং পুরুষঃ শ্রদ্ধাময়ঃ (এই জীব-শ্রদ্ধাময়), যঃ (যিনি) বহুধঃ (বহুরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত) সঃ এব সঃ (তিনি সেইরূপই) ॥ ৩

শ্রীধর। নহু চ শ্রদ্ধা সাত্বিকী এব সর্বকার্য্যেষু যৈব ভগবতা উক্তং প্রতি নির্দিষ্টবাং । যথোক্তং—

“শ্রোমোদমস্তিতিক্ষেপা তপঃ সত্যং দয়া শ্রুতিঃ ।

ভূতীত্যাগোহপ্ৰহা শ্রদ্ধা ব্রীর্দয়াহিঃ স্নিহুর্ভুতিঃ ॥”

ইত্যোক্তাঃ সর্বশ্রু বৃত্তয় ইতি । অতঃ কথং তত্ৰাঃ ত্রৈবিধ্যম্ উচ্যতে? সত্যম্ । তথাপি বহুভূতমোদমস্তিতিক্ষেপেষু বহুভূতমোদমস্তিতিক্ষেপেষু সত্যম্ ত্রৈবিধ্যং শ্রদ্ধায়া অপি ত্রৈবিধ্যং ঘটতে ইত্যাহ—সংবতি । সদ্বানুকূপা—সদ্ব্যবহারতম্যানুসারিণী, সর্বশ্রু—বিবেকিনঃ অবিবেকিনো বা লোকশ্রু শ্রদ্ধা ভবতি । তস্যাং অয়ং পুরুষো লৌকিকঃ শ্রদ্ধাময়ঃ—শ্রদ্ধাবিকারঃ, ত্রিবিধ্যা শ্রদ্ধা বিক্রিয়তে ইত্যর্থঃ । তদেবাহ—‘যো বহুধঃ’—যাদৃশী শ্রদ্ধা যস্ত, “স এব সঃ”—তাদৃশঃ শ্রদ্ধাযুক্তঃ । যঃ পূর্বং সত্যোৎকর্ষণে সাত্বিকশ্রদ্ধা যুক্তঃ পুরুষঃ স পুনঃ তাদৃশসবসংস্বারেণ সাত্বিকশ্রদ্ধা যুক্ত এব ভবতি । যস্ত বহুস উৎকর্ষণে রাজসশ্রদ্ধাযুক্তঃ স পুনঃ তাদৃশ এব ভবতীতি । লোকাচারমাত্রেণ প্রবর্তমানেনু এবং সাত্বিক-রাজস-তামস-শ্রদ্ধাব্যবস্থা । শাস্ত্রজনিতবিবেকজ্ঞানযুক্তানাং তু স্বভাববিজয়ের সাত্বিকী একেব শ্রদ্ধেতি প্রকরণার্থঃ ॥ ৩

বঙ্গানুবাদ । [সত্য বটে শ্রদ্ধা সাত্বিকীই হয়, যেহেতু হে ভগবনু তুমিই উক্তবকে বলিয়াছ যে—শম, দম, তিতিক্ষা, বিবেক, তপস্যা, সত্য, দয়া, শ্রুতি, ভূতি, ত্যাগ, অপ্ৰহা, শ্রদ্ধা, লজ্জা, দয়াদি ও আত্মনির্ভুতি—ইহারা সকলেই সত্যগুণের বৃত্তি । অতএব কিরূপে (শ্রদ্ধাকে) ত্রিবিধ বলা সঙ্গত হয়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন যে, এ কথা সত্য, তথাপি সত্য, প্রজ্ঞা ও তমের মিশ্রণে সত্য ত্রিবিধ হয় বলিয়া, শ্রদ্ধারও ত্রিবিধতা ঘটে—ইহাই বলিতে-ছেন]—সদ্বানুকূপ অর্থাৎ সত্ত্বের ভারতম্যানুসারে বিবেকী ও অবিবেকী—সকলেরই শ্রদ্ধা হইয়া থাকে । সেই জন্ত এই লৌকিক পুরুষ শ্রদ্ধাময় অর্থাৎ ত্রিবিধ শ্রদ্ধার দ্বারা বিকার প্রাপ্ত হয় । তাই বলিতেছেন, “যো বহুধঃ” অর্থাৎ বাহার যাদৃশী শ্রদ্ধা “স এব সঃ”

সে তাদৃশ শ্রদ্ধাযুক্ত হয়। যে পূর্বে সন্তোষকর্ষতা হেতু সাধিক শ্রদ্ধাযুক্ত ছিল, সে সেই সংস্কার হেতু পুনরায় সাধিক-শ্রদ্ধাযুক্তই হয়। যে পূর্বে পূর্বে রমোক্তগণের উৎকর্ষতা হেতু রাজস-শ্রদ্ধাযুক্ত ছিল, সে পুনরায় সেইরূপ রাজস শ্রদ্ধাযুক্ত হয় এবং তমোক্তগণের উৎকর্ষতা হেতু যে তামস-শ্রদ্ধাযুক্ত ছিল, সে পুনরায় তামস শ্রদ্ধাযুক্তই হইয়া থাকে। এই জ্ঞান লৌকিক আচারানুযায়ী কর্মে প্রযুক্ত ব্যক্তিদের জ্ঞানই এই প্রকার সাধিক, রাজসিক ও তামসিক শ্রদ্ধার ব্যবস্থা। কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞানজনিত বিবেকযুক্তের স্বভাব-বিভিন্ন্যহেতু একমাত্র সাধিকী শ্রদ্ধাই হইয়া থাকে। এই প্রকরণের ইহাই অর্থ ॥ ৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সত্ত্বগুণে অর্থাৎ ক্রিয়াকরে ব্রহ্মের অণুতে থেকে এই পুরুষোত্তম ইনিই ব্রহ্মায়—ক্রিয়াকর পর অবস্থায় যিনি থাকেন তিনিই ব্রহ্ম।—বিশিষ্টসংস্কারযুক্ত অন্তঃকরণকেই “সত্ত্ব” বলে। অন্তঃকরণের প্রকাশস্বভাবহেতুই উহাকে “সত্ত্ব” বলা হয়। যে অন্তঃকরণে যে প্রকারের সংস্কার প্রবল থাকে, সেই সংস্কার অরূপই তাহার শ্রদ্ধা হইয়া থাকে। গুণ সংমিশ্রণহেতু অন্তঃকরণেরও তারতম্য হইয়া থাকে—সেই হেতু শ্রদ্ধারও বৈচিত্র্য ঘটে। শ্রদ্ধা—অন্তঃকরণের স্বর্গ, এইজ্ঞান কেহই একেবারে শ্রদ্ধাহীন হইতে পারে না। জীবের মধ্যে যে গুণই প্রবল থাকুক, সত্ত্বগুণ কিছু থাকেই, সুতরাং শ্রদ্ধাও কিছু থাকিবেই। তাই জীবকে “শ্রদ্ধাময়” বলা হইয়াছে। অবশ্য অন্ত্যন্ত তমঃপ্রধান ব্যক্তিদের মধ্যে সত্ত্বগুণ অন্ত্যন্ত অক্ষুট থাকে বলিয়া তাহাদের মধ্যে সাধিকী বৃত্তির কার্য অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বাহ্যার কেবল লোকাচার-মাত্র অনুসরণ করিয়া কার্য করে তাহাদের শ্রদ্ধার উৎকর্ষ হয় না। শ্রদ্ধার উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে শাস্ত্রজ্ঞান ও সাধনার প্রয়োজন। গুরু ও বেদান্ত-বাক্যে দৃঢ় প্রত্যয়ই শ্রদ্ধা কিন্তু অন্তঃকরণ অন্তঃকথাকিলে সাধিকী দৃঢ়-শ্রদ্ধার উদয় হয় না। সাধকের দৃঢ়-শ্রদ্ধা হইতেই সাধনবিষয়ে তাহাদের চিত্ত দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ হয়। গীতা বলিয়াছেন—শ্রদ্ধাবানেরা অর্থাৎ বাহ্যার তৎপর ও সংযতক্রিয় তাহারাই জ্ঞান লাভ করেন এবং জ্ঞানলাভের পরই পরম-শান্তির উদয় হয়। ক্রিয়া মন দিয়া যিনি যত অধিক করিবেন, ততই তাহার সন্তোষশক্তি হইবে; সুস্থায়ের মধ্য দিয়া প্রাণধারা প্রবাহিত হইলে ব্রহ্মাণ্ডে স্থিতিলাভ হইবে, এবং পরে ক্রিয়ার পর অবস্থায় সাধক ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া বাইবেন।

ক্রিয়ার পর-অবস্থায় ব্রহ্মভাব ব্যতীত অন্য কোন ভাব থাকে না, তখন সাধক গুণাতীত হইয়া যান। কিন্তু ক্রিয়ার পর-অবস্থা হইতে নামিয়া আসিলে অথবা ক্রিয়া করিতে করিতে স্বধন মন কিছু স্থির হইয়াছে, কিন্তু সম্পূর্ণ নিরোধ-অবস্থা প্রাপ্তি হয় নাই, তখন মনে বিষয় চিন্তা না থাকায় উহা সত্ত্বগুণের অবস্থা বটে, এবং ঐ অবস্থা প্রাপ্তি হইলে তখন সাধনায় যে উগ্র শ্রম হয়, তাহা হইতে ধ্যানও ধ্যান হইতে সমাধি আসন্ন হয়। বৃত্তির জ্ঞান স্তীত্র ইচ্ছা হেতু মোক্ষলাভে যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাই সাধিকী শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা ‘চেতসঃ সম্প্রসাদঃ’—এই শ্রদ্ধা হইতে চিত্তের প্রশমতা হয় অর্থাৎ চিত্তে তখন মল-ভাগ বেশী না থাকায় ঐশ্বর্যেতে প্রবৃত্তির আধিক্য হয়, প্রবৃত্তির আধিক্য হইতে চিত্ত মহাস্থিরতার মধ্যে প্রবেশ করে। সমুদ্রের গভীর অতলে ডুব দিয়া যেমন লোকে বস্তু সংগ্রহ করে, সেইরূপ সমাধিমগ্ন যোগী জ্ঞানবস্তু

(শ্রদ্ধার দৃষ্টান্ত—গুণ ভেদে পূজার প্রকার ভেদ—

সাধিক, রাজসিক ও তামসিক ব্যক্তির পূজা)

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ ।

প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চাত্তে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥ ৪

লাভে কৃতকৃত্য হন। সত্ত্বগুণ যত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ততই অসদৃশ ব্রহ্ম অনুভূত হইতে থাকে। এই সাধিক, রাজসিক ও তামসিক গুণ হইতে সত্ত্বত যে প্রকৃতি—তাহা ব্রহ্মেরই বিকার। ক্রিয়া যত বেশী করিবে ততই তুমি গুণ অতিক্রম করিয়া গুণাতীত অবস্থায় পৌছিতে পারিবে। সাধনার ক্রম ও তাহার ফল নিয়ে লিখিত হইল—

কুটস্থই দেবতা, সেই কুটস্থ-মধ্যে নারায়ণ, কুটস্থে মন রাখিলে কুটস্থ যেমন সর্বব্যাপক, সাধকের মনও সেইরূপ সর্বব্যাপক হয়। কুটস্থই ব্রহ্ম, গুরু ও আচার্য্য; কুটস্থে থাকিলে চিত্তের প্রশমতা হয়, তাহাই সত্ত্বসংগতি ও চিত্তের সত্ত্বগুণে অবস্থিতি। পরম পর আত্মাতেই রহিয়াছে, যিনি বিষয়ের মধ্যে থাকিয়াও সর্বদা কুটস্থে মন রাখিতে পারেন—তিনিই ঋষি। আত্মায় লক্ষ্য রাখিবার অভ্যাস হইতেই আত্মাতে মনের স্থিতি হয় ও মন আত্মার সহিত এক হইয়া যায়। আত্মাই কুটস্থ এবং ব্রহ্মাণ্ড। ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ত্রিলোক বর্তমান, ক্রিয়ার পর-অবস্থায় ব্রহ্মের অণুর মধ্যে প্রবেশ করিলে—স্বর্গ, মর্ত সর্বত্রই গমনাগমন করা যায়। কারণ স্বর্গ মর্ত সমস্তই সেই ব্রহ্মের অণুর মধ্যে, সাধক সেই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিলে তিনিও যে সর্বত্রই যাইতে পারিবেন, বা থাকিতে পারিবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি? কুটস্থের মধ্যেই পুরুষোত্তম রহিয়াছেন, যিনি শক্তির সহিত সাধন করেন, তিনি এই শরীরের মধ্যেই তাহাকে দেখিতে পান। তিনিই প্রকৃষ্টরূপে শরীর ধারণ করিয়া জয়গ্রহণ করেন। তিনি সর্বত্রই এই জ্ঞান তাহাকে “বিষ্ণু” বলে, তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যবান্ বলিয়া তাহার নাম “ভগবান্”। আবার কুটস্থের মধ্যে তিনি পরম নির্মল পুরুষোত্তম—এই জ্ঞান তাহার নাম শিব। ক্রিয়ার পর-অবস্থায় তিনি আপনাতে আপনি। তিনি সকল বসের বস অথচ স্বয়ং অরস। ক্রিয়ার পর-অবস্থাই বিজ্ঞানময় অবস্থা, সেখানে আলোকও নাই—অন্ধকারও নাই—তখন তিনি সর্বময়, কারণ “সর্ব” তাহারই প্রকাশ। এই জ্ঞান ক্রিয়ার পর-অবস্থায় যে থাকে—সে সর্বজ্ঞ হয় ॥ ৩

অর্থঃ। সাত্ত্বিকাঃ (সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ) দেবান্ যজন্তে (দেবগণের পূজা করেন) রাজসাঃ (রাজসিকগণ যক্ষরক্ষাংসি (যক্ষ রাক্ষসদিগকে), অত্বে (অপর) তামসাঃ জনাঃ (তামসিক ব্যক্তিগণ) প্রেতান্ ভূতগণান্ চ যজন্তে (প্রেত ও ভূতগণের পূজা করে) ॥ ৪

প্রীদয়ঃ। সাত্ত্বিকাদি ভেদমেব কার্যভেদেন প্রপঞ্চয়তি—যজন্তে ইতি। সাত্ত্বিকা জনাঃ সত্ত্বপ্রকৃতিন্থে যোজনেব যজন্তে—পুণ্যস্তি। রাজসাস্ত বজঃপ্রকৃতীন্থ যজন্তে—রাক্ষসাস্ত বজঃপ্রকৃতীন্থ যজন্তে। এতেভ্যঃ অত্বে বিলক্ষণাঃ তামসাঃ জনাঃ তামসানেব প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চ যজন্তে। সদ্ধাদি প্রকৃতীন্থ তত্ত্বদেবাদীনাম্ পূজারূপিত্বং তত্ত্বপূজকানাং সাত্ত্বিকাদিভ্যঃ জ্ঞাতব্যানিত্যার্থঃ ॥ ৪

বঙ্গানুবাদ। [সাত্ত্বিকাদি গুণভেদে তাহাদের কার্য-ভেদের দ্বারা দেখাইতেছেন]—সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ সত্ত্বপ্রকৃতি দেবগণের পূজা করেন। রাজসব্যক্তি বজঃপ্রকৃতি যক্ষরাক্ষস-

(আশ্রমিকের পূজা)

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ ।

দস্তাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলাঘিতাঃ ॥৫

গণের পূজা করেন। এতদ্ব্যতীত হইতে বিলক্ষণ বা ভিন্ন যে তামসিকগণ তাহারা তমঃপ্রকৃতি প্রেত ও ভূতগণের পূজা করে ॥ ৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—দেবতা অর্থাৎ কূটস্থের উপাসনা সত্ত্বগুণাবলম্বীরা করে রজোগুণেতে ধনের উপাসনা করে—এবং ভোগ ও তমোগুণেতে মৃত্যুর ও পঞ্চভূতের উপাসনা করে—যাহাদের সত্ত্ব-প্রকৃতি স্বাভাবিক তাঁহারা দেবগণের পূজা করেন। কূটস্থই পর-দেবতা, এই জন্ত কূটস্থের দর্শনাদি যাহাদের নিত্য হইয়া থাকে, বৃত্তিতে হইবে তাঁহারা সাত্ত্বিক। এই সাত্ত্বিকদিগুণ কোন ব্যক্তির মধ্যে রহিয়াছে, তাহা এইরূপে বুঝা যায়—একই সাধন সকলকে বলা হইল, একজন কত প্রকার সহকারে করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার প্রত্যহ কূটস্থ দর্শন ও স্থিরতার অহুভব হইতে লাগিল। শকন্ত যাহারা রাজনিক, তাহারা অর্থ ও ভোগ চায়, হুতরাং তাহারা ক্রিয়া করিয়া ফল পাইতে চাহে। ক্রিয়া করিয়া কিরূপে অন্ততঃ দুই চারিটা ছোট ছোট অনায়াসলভ্য সিদ্ধি লাভ হয়, তাহার দিকেই তাহাদের বেশী লক্ষ্য থাকে। যাহারা ক্রিয়া করে না, তাহারা সুবৈরাগি বন্ধগণকে ও নৈশ্চল্যাদি বাক্যগণকে পূজা করিয়া ধন-লাভের আশা করিয়া থাকে। ইহার ফলে তাহারা আরও কামলালে জড়িত হইয়া মোক্ষের পথকে অবরুদ্ধ করে। যাহারা তমোগুণী, তাহারা ভূত প্রেতাদির পূজা করে। অনেক অসভ্য জাতিরা—এইরূপ দেবতাকেই পূজা করে। আবার সভ্য জাতির মধ্যেও অনেক পুরুষ বুজবুজি দেখাইয়া লোকের উপর প্রভুত্ব স্থাপনের জন্ত ভূত-পিশাচাদির উপাসনা করে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সিদ্ধিলাভও করে, কিন্তু সেই সিদ্ধির ফলে তাহাদের আরও অধোগতি হয়। আবার কেহ কেহ ভূত-পঞ্চকের উপাসক, তাহাদের দৃষ্টি স্থল; সেইজন্য জল, অগ্নি প্রভৃতি পঞ্চীকৃত ভূতাদির উপাসনায় তাহারা কালক্ষেপ করে, কিন্তু জল-অগ্নির মধ্যে যে একমাত্র পর-দেবতা রহিয়াছেন তাহা বৃত্তিতে পাবে না; এই জন্ত তাহারা অমৃতত্ব লাভ না করিয়া মৃত্যুলোক প্রাপ্ত হয়। মৃত্যুর পর সেই সকল স্বর্গদ্রষ্ট প্রেতাদির উপাসকগণ বায়ুময় দেহ ধারণ করিয়া উজ্জ্বল-কট-পুতনাধি নামক প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৪

অনুব্র। দস্তাহঙ্কারসংযুক্তাঃ (দস্ত ও অহঙ্কার সংযুক্ত) কামরাগবলাঘিতাঃ (কামনা, আসক্তি ও বলযুক্ত) যে অচেতনঃ জনাঃ (যে সকল অবিবেকী জন) অশাস্ত্রবিহিতং (শাস্ত্রবিরুদ্ধ) ঘোরং তপঃ (ভয়ঙ্কর তপস্বী) তপ্যন্তে (তপঃ আচরণ করে) ॥ ৫

শ্রীধর। রাজন-তামসোপি পুনর্জিহোষাং—অশাস্ত্রবিহিতমিতি স্বাক্ষর্যম্। শাস্ত্র-বিধিঃ অজ্ঞানস্তোহপি কেচিৎ প্রাচীন-পুণ্যসংস্কারেণোক্তন্যঃ সাত্ত্বিকীঃ এব ভবন্তি। কেচিৎ তু মধ্যমা রাজসা ভবন্তি। অধ্যাত্ম তামসা ভবন্তি। যে পুনঃ অত্যাশ্রম মন্দভাগ্যাঃ তে গতানুগত্যা পাবণসদেন চ তদাচারানুষ্ঠানঃ সন্তঃ অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং—ভূতভয়ঙ্করং তপঃ তপ্যন্তে

কর্শরতঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতনঃ ।

মাং চৈবান্তঃশরীরস্থং তদ্বিক্যাস্তরনিশ্চয়ান্ ॥ ৬

—কর্শরতঃ। তত্র হেতবঃ দস্তাহঙ্কারাভ্যাং সংযুক্তাঃ। তথা কামঃ—অভিলাষঃ, রাগঃ—আসক্তিঃ, বলম্—আগ্রহঃ। এতৈরধিতাঃ সন্তঃ, তান্ আহরনিশ্চয়ান্ বিদ্ধি ইত্যন্তর্যেণ অবয়ঃ ॥ ৫

বঙ্গানুবাদ। [রাজস ও তামসগণের মধ্যেও বিশেষত্ব আছে, তাহা দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন]—শাস্ত্রবিধি না জানিয়াও কেহ কেহ প্রাচীন পুণ্যসংস্কার বশতঃ যাহারা উত্তম এইরূপ ব্যক্তিই সাত্ত্বিক হয়। কেহ কেহ বা মধ্যম, তাহারা রাজস হয়; কিন্তু যাহারা অধম তাহারা তামস হইয়া থাকে। যাহারা আবার অতি মন্দভাগ্য তাহারা গতানুগতিক ভাবে পাবণ সঙ্গ পড়িয়া তদাচারানুবর্তী হইয়া অশাস্ত্রবিহিত ঘোর অর্থাৎ ভূতভয়ঙ্কর তপস্তা করে। তাহার কারণ এই যে, তাহারা দস্ত ও অহঙ্কার সংযুক্ত এবং কাম (অভিলাষ), রাগ (আসক্তি) আর বল অর্থাৎ আগ্রহ দ্বারা অধিত হইয়া থাকে। “তাহাদিগকে আশ্রম-নিশ্চয় বলিয়া জানিবে” এই উত্তর শ্লোকের সহিত অবয় ॥ ৫

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ক্রিয়া না করে যে ঘোর তপস্তা করে পঞ্চতপাদি, দেমাক অহঙ্কারের সহিত ইচ্ছা এবং ক্রোধ ও বলপূর্বক।—দস্ত ও অহঙ্কারের সহিত যাহাদের নিত্যসম্বন্ধ তাহারা কাম, রাগ ও বলে উন্নত হইয়া অশাস্ত্রবিহিত ঘোর তপস্তা করে—শরীরকে শুদ্ধ করে অর্থাৎ অতি ক্ষীণ করিয়া ফেলে। ইন্দ্রিয়গুলিকে বাহ্য উপায় দ্বারা অচৈতন্ত্য করিয়া রাখে, আবার এক এক সময়ে ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনায় পাবণের মত ঘোর অত্যাচার করে। স্বাভাবিক ভাবে ইন্দ্রিয়কে প্রক্ষীণ করিলেই সংযম অভ্যাস হয় না, এবং সংযমের ফলও লাভ করিতে পারে না। তাহারা মনে করে এই সকল অস্বাভাবিক উপায়ে তপস্তা করিলে শীঘ্রই তপস্তার ফল লাভ হইবে। কাহারও কাহারও এইরূপ তপস্যার ফল লাভও কিছু হয়, কিন্তু বিবেক বৈরাগ্য না থাকায় অহঙ্কার-অভিমান বশতঃ শাস্ত্র-ওক্ত-দেবতাব্যবহেলন করিয়া তাহারা ঘোর নরকের পথ পরিকার করে। পূর্বকালে হিরণ্য-কশিপু, রাবণাদিও ঘোর তপস্তা করিয়াছিল, তপস্তার ফল লাভ ঐশ্বর্য, শক্তি ও সমৃদ্ধি তাহাদের প্রচুর পরিমাণে হইয়াছিল। কিন্তু বিবেক-বৈরাগ্যের অভাবে অসংসারাদির জন্ত তাহারা অচিরেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল। এইজন্য আশ্রমী তপস্তা করিয়া বিশেষ লাভ নাই। যাহাদের শরীর ইন্দ্রিয় খাড়াভাবে দুর্বল হইয়া যায়, তাহাদের বিষয়াসক্তি কম হয় না। লোভ বশতঃ তাহারা সকল তপস্যায় আত্মনিয়োগ করে। এতদ্বারা মনোবুদ্ধি আরও বিমলিন হওয়ায় তাহারা আত্মদর্শনের অধুঃসুক্ত হইয়া যায় ॥ ৫

অনুব্র। অচেতনঃ [জনাঃ] (অবিবেকী ব্যক্তিগণ) শরীরস্থং (দেহস্থিত) ভূতগ্রামং (পঞ্চভূত সমূহকে) অহঃশরীরস্থং মাং চ (এবং শরীরমধ্যস্থিত আত্মস্বরূপ আমাকে) কর্শরতঃ (ক্লিষ্ট করিয়া) [যে তপস্চরন্তি—যাহারা তপস্তা করে] তান্ (তাহাদিগকে) আহর-নিশ্চয়ান্ (আহর-নিশ্চয় অর্থাৎ অহরের জায় যাহাদের নিশ্চয়) বিদ্ধি (জানিও) ॥ ৬

শ্রীধর । কিং—কর্শয়ন্ত ইতি । শরীরস্থং—আবস্তকভেদে দেহে স্থিতং, ভূতানাং—
পৃথিব্যাদীনাং গ্রামং—সমূহং কর্শয়ন্তঃ—বৃথৈব উপবাসাদিভিঃ ক্লেশং কুর্যন্তঃ, অচেতসঃ—
অবিবেকিনঃ মাংস অন্তর্ধ্যামিতয়া অন্তঃশরীরস্থং, দেহমধ্যে স্থিতং মদাজ্ঞালজ্ঞবনেনৈব কর্শয়ন্তো
যে তপঃ চরন্তি তান্ আশ্রয়নিশ্চয়ান্—আশ্রয়ঃ অতিক্রুরো নিশ্চয়ো যেষাং তান্ বিদ্ধি ॥ ৬

যজ্ঞানুবাদ । [আরও বলিতেছেন]—শরীরস্থ অর্থাৎ শরীরারস্তকরূপে দেহে অবস্থিত
ভূতপ্রায় অর্থাৎ পৃথিব্যাদি ভূতসমূহকে, রূপা উপবাসাদি দ্বারা ক্লেশ করিয়া অবিবেকিগণ
অন্তর্ধ্যামিরূপে দেহমধ্যে স্থিত বে আমি সেই আমাকেও আমার আত্মা লক্ষ্যন দ্বারা ক্লেশ
দিয়া তপস্করণ করে, তাহাদিগকে অতিক্রুর-নিশ্চয় বলিয়া জানিবে ॥ ৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—শরীর শুকিয়ে ফেলে ইঞ্জিয়ারদি সকলকে অচেতন্ত
রেখে অর্থাৎ কুটস্থে না থেকে, যে শরীর মধ্যে আমিই আছি, আমাকে একরূপ
ক্লেশ দিয়া যে তপস্তা করে সে আশ্রয়ী তপস্তা হইতেছে অর্থাৎ ভাল নয়—
সকাম ।—দেহান্তরে আত্মা সাক্ষীরূপে অবস্থান করিতেছে, আশ্রয়বুদ্ধি বা সেই
আত্মাকেও ক্লেশ করে । আত্মাকে ক্লেশ করার অর্থ ইহা নহে যে আত্মা দেহাদির জায় ক্ষীণ
বা দুর্বল হইয়া যান । আত্মা ক্লেশ তখনই হন যখন দৈববাক্য অবহেলা করা হয় । শাস্ত্রাদি
না মানা বা তদনুসারে কার্যাদি না করিলেই দৈববাক্য অবহেলা করা হয় ; এবং তাহা
হইতে আত্মসংযমী জ্ঞান আত্ম হইয়া যায় । আত্মার উপর এইরূপ আবরণ যত পড়িবে
ততই আমাদের মনঃবুদ্ধি আর আত্মার স্বপ্রকাশ ভাবকে অসুভব করিতে পারিবে না,
ইহাই আত্মাকে ক্লেশ করা । “সূধ্যকোটিপ্রতিকামং চন্দ্রকোটিহীনতলম্”—যোগীশ্বা আত্ম-
জ্যোতিঃর প্রকাশ ঐরূপই অসুভব করেন ; কিন্তু বাহারা অনাচারী বা অত্যাচারী তাহারা
সাধনভক্তের কঠোর নিয়মাদি পালন করিতে পারে না । মনে প্রকৃত বৈরাগ্যের উদয় না
হওয়ায় বিষয়-ভোগে অতিবিক্ত রুচির হৃদয় ঘটে না, ইহার ফলে দেহেইঞ্জিয়ারদি ক্ষীণ ও
দুর্বল হয়, সুতরাং জ্যোতিঃর ব্যরক দেহাদি বলশূন্য হওয়ায় আত্মার প্রতিবিম্ব ঐ সকলের
মধ্য দিয়া স্ফুর রূপে প্রতিবিম্বিত হইতে পারে না । যেমন কাচ ও শিলার মধ্যে স্বচ্ছতার
ভাবভাব হেতু জ্যোতিঃর প্রকাশের ভাবভাব ঘটে, তজ্জপ দেহেইঞ্জিয়ারদি সবভাবাপন্ন না হইলে
তদ্ব্যবস্থায় আত্মজ্যোতিঃরও প্রকাশ ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয় । এইজন্য বাহারা পাপাদি কর্ম দ্বারা
শরীর-ইঞ্জির-মনকে কলুষিত করে, তাহাদের মধ্যে আত্মজ্যোতিঃর প্রকাশও তজ্জপ তেজোহীন
হয়, ইহাই “আত্মস্বরূপে আমাকেও ক্লেশ করে” বলার উদ্দেশ্য । সংযম মোটেই নাই, অথচ
যোগী হইবার ইচ্ছা যেরূপ হাত্তোদীপক, সেইরূপ কুটস্থে না থাকিয়া গায়ের ঘোরে তপস্বী
সাজিতে যাওয়াও ঐরূপ অস্বাভাবিক ও নিষ্ফল চেষ্টা মাত্র । অনেক মনে করেন তত্ত্বমতে
সাধনাদিও বেদবিরুদ্ধ ব্যাপার । কেন ? তত্ত্বের মত বেদেও কি পণ্ড-হননাদির উপদেশ
নাই ? বেদকে অমাত্র করা এক ভিনিষ, এবং বেদবিধি পালনে অকমতা প্রযুক্ত শিবোক্ত
তত্ত্বানুসারে কার্য করা ‘অশাস্ত্র-বিহিতকার্য’ নহে । তত্ত্বেরও দৃঢ়মত উদ্দেশ্য বোঝোক্ত
মার্গকে রক্ষা করা । যখন মানুষ কালঘোরে চুষ্ট রোগগ্রস্ত হইয়া অসমর্থ হইয়া পড়ে, সেই
অসমর্থ জীবকুলকে পুনরায় ধর্মে প্রবর্তিত করিতে হইলে তাহাদের ব্যাধিকে উপশম করিবার

আহারস্তপি সর্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ ।

যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমাং শৃণু ॥ ৭

চেষ্টা করাই সর্ব প্রথম কর্তব্য, নচেৎ স্বর্গ-পালন করিবে কে ? তাই হবারোগ্য কলি-
দ্বোষ-দুষিত ব্যাধিকে উপশম করিবার জন্যই জগদগুরু মহাদেব জীবের কল্যাণার্থ তত্ত্বশাস্ত্রের
প্রণয়ন করিয়াছেন । সুতরাং তত্ত্বশাস্ত্রমতে সাধন করিলেই যে ‘অশাস্ত্রবিহিত যোর তপস্তা’
হয় তাহা নহে । “ত্বয়া কৃতানি তত্ত্বানি জীবোদ্ধারণ-হেতবে”—জীবের নিত্যতার
নিমিত্তই তত্ত্বশাস্ত্র আপনি প্রবর্তিত করিয়াছেন । তত্ত্বে যে ভোগ-সাধন বস্তু লইয়া সাধনার
রূপা আছে, তাহারও উদ্দেশ্য তত্ত্বোক্ত ক্রিয়ার অভ্যাস দ্বারা ক্রমশঃ ভোগবাসনা নিবৃত্ত করিয়া
দেওয়া । পরে নিবৃত্তির পথ অবলম্বন করিয়া সাধক মোক্ষলাভের উপযুক্ত হইয়া থাকে ।
সেই জন্য তত্ত্ব বলিয়াছেন—

“যজ্ঞান্তি ভোগো ন চ তত্র মোক্ষঃ যজ্ঞান্তি মোক্ষো ন চ তত্র ভোগঃ ।

দেবীপদান্তোজ সমাপ্রিতানাং ভোগস্ত মোক্ষস্ত করস্ব এব ॥”

যিনি ভোগী তিনি মোক্ষ লাভ করিতে পারেন না, মুখস্থ ব্যক্তিরও ভোগ লাভ হইতে
পারে না । যিনি জগন্নাথার চরণ-পদ্ম আশ্রয় করিয়াছেন অর্থাৎ যিনি তত্ত্বোক্ত বিধানমত
উপাসনা করেন, তিনি ভোগ ও মোক্ষ দুই প্রাপ্ত হন । এইজন্য তত্ত্বোক্ত পঞ্চ মকারের
সাধনা প্র ক্রিষ্ট হইয়াছিল । ইহার মধ্যেও যোগাভ্যাস বিহিত হইয়াছে ; যাঁহারা তত্ত্বাধেয়ী
তাঁহারা পঞ্চ মকারের গুণ উদ্বেগ অরগত হইয়া সাধনা করিলেই আর কোন গোলযোগ হয়
না ; আর যাঁহারা তাহা না করিয়া স্থলভাবের সাধন করিতে অভ্যস্ত হইয়া থাকেন, তাঁহারাও
যদি প্রকৃত লগুগুরু পদাশ্রয় করিয়া থাকেন তবে তাঁহার নির্দেশ মত চলিলে তাঁহারাও
কৃতকৃত্য হইতে পারিবেন । স্বামাংস-হোম বা ব্রাহ্মণ-বক্ত দ্বারা হোম করিয়া যে ইষ্টদেবতার
তর্পণ বিধি আছে—তাঁহার অর্থ সাধারণে জানে না, এই জন্য গুরুমুখে তত্ত্বাদি শাস্ত্র জানিয়া
পড়িতে হয় । মহাত্মারও টীকাকার শ্রদ্ধাম্পদ নীলকণ্ঠ জৈনধর্মাবলম্বী ছিলেন, তিনি তত্ত্বের
প্রকৃত রহস্য ও তত্ত্বের সাক্ষাতিক অর্থ অংগত না হইয়া ঐ সকল কথায় জীবহত্যার সূচনা
হইয়াছে মনে করিয়া তাহাকে অশাস্ত্রবিহিত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন । কিন্তু বাস্তবিক
তত্ত্বোক্ত মতে সাধন অশাস্ত্রবিহিত হইতে পারে না । জীবহত্যার বিষয় বৈদিক যজ্ঞেও আছে,
কিন্তু তাহারও আধ্যাত্মিক অর্থ আছে ; বাহু অর্থ মাত্র লইয়া বিচার করিলে স্বয়ং বেদও
“অশাস্ত্রীয়” হইয়া পড়েন ।

কুটস্থে থাকাই প্রকৃত তপস্তা, তাহা না জানিয়া বাহারা ভক্তি সহিত কেবল বাহ্যহুষ্ঠানে
আসক্ত হয় তাহাদের তপস্তারও কিছু ফল হয় ; কিন্তু বাহারা বাহ্যভঙ্গরপূর্ণ অহুষ্ঠানে রত
হইয়া শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করে, এবং একটা কিছু ফল পাইবার আশায় তপস্তার রত হইয়া
শরীর-মনকে ক্ষীণ করিয়া ফেলে, সে তপস্তা আশ্রয়িক তপস্তা, তাহাতে কুটস্থ দর্শনও হয় না,
ক্রিয়ার পর-অবস্থাও লাভ হয় না, তাহা প্রকৃত আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়া সম্পূর্ণ নিষ্ফল
প্রয়াস বলিয়া মনে হয় ॥ ৬

অশ্রয় । সর্বস্ত (সকল প্রাণীর) আহারঃ তু অপি (আহারও) ত্রিবিধঃ প্রিয়ঃ ভবতি

(সাত্ত্বিক আহার)

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যস্থখপ্রীতিবিবৰ্দ্ধনাঃ ।

রস্ভাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮

(তিন প্রকার প্রিয় হয়); তথা (সেইরূপ) যজ্ঞ: তপঃ দানঃ (যজ্ঞ, তপস্শ্রা ও দান)
[তিন প্রকারের হইয়া থাকে] তেবাং (তাহাদের) ইমং ভেদঃ (এই প্রভেদ) শৃণু
(শ্রবণ কর) ॥ ৭

শ্রীধর। আহাৰাদি-ভেদাদপি সাত্ত্বিকাদিভেদং দর্শয়িতুমাহ—আহারস্ত ইত্যাদি
ত্রয়োদশভিঃ। সৰ্বস্তাপি জনস্ত য আহারঃ—অন্নাদিঃ, স তু যথাযথং ত্রিবিধঃ প্রিয়ো ভবতি।
তথা যজ্ঞতপোদানানি চ ত্রিবিধানি ভবন্তি। তেবাং চ বক্ষ্যমাণং ভেদমিমং শৃণু। এতচ্চ
রাজন-তামসাহার-যজ্ঞাদি-পরিভাষ্যেণ সাত্ত্বিকাহার-যজ্ঞাদি-সেইয়া সত্ত্ববুদ্ধৌ যজ্ঞঃ কৰ্ত্তব্য
ইত্যেতদৰ্থং কথ্যতে ॥ ৭

বঙ্গানুবাদ। [আহারাদির ভেদ হইতে সাত্ত্বিকাদি গুণভেদ দেখাইবার জন্য ১৫টি শ্লোকে
বলিতেছেন]—সকল লোকেরই যে আহার “অন্নাদি”—তাহা যথাযথ ত্রিবিধ ভাবে প্রিয়
হইয়া থাকে; সেইরূপ যজ্ঞ, তপস্শ্রা ও দানও ত্রিবিধ হইয়া থাকে। তাহাদের নিম্নোক্ত ভেদ
শ্রবণ কর। ইহা হইতে রাজন-তামস আহার পরিভাষ্য করিয়া সাত্ত্বিক আহার ও সাত্ত্বিক
যজ্ঞাদি সেবা দ্বারা সত্ত্ববুদ্ধি করা কৰ্ত্তব্য—ইহাই বুঝাইবার জন্য বলিলেন ॥ ৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—আহার, যজ্ঞ, তপস্শ্রা, দান তিন প্রকার তাহা
বলিতেছি।—সমস্ত মনুজেরই নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে আহার, যজ্ঞ, তপস্শ্রা এবং দানও
ত্রিবিধ হইয়া থাকে, তাহাই ভগবানু এইবার বলিবেন। কে সত্ত্বনিষ্ঠ, কে রজোনিষ্ঠ এবং
কে-ই বা তমোনিষ্ঠ—তাহাদের বিশেষ বিশেষ আহার্যের প্রতি প্রীতি দেখিয়াই বুঝা যায়।
সাত্ত্বিক আহাৰাদি করিলেও প্রকৃতি কতকটা সৰ্ব-ভাবাপন্ন হয়, অতএব বাহাতে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি
হয়, তজ্জন্ম সাধকের সাত্ত্বিক আহার গ্রহণ, এবং রাজস ও তামস আহার পরিবৰ্দ্ধন করিতে
হইবে। এই সকল বিষয়ে লক্ষ্য করাইবার জন্যই সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক আহাৰাদির
ভেদ ভগবানু এইখানে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিতেছেন ॥ ৭

অমর। আয়ুঃ সত্ত্ব বলারোগ্য স্থখ প্রীতি বিবৰ্দ্ধনাঃ (আয়ুঃ, সত্ত্ব, বল, আরোগ্য,
চিন্তপ্রসাদ ও রুচি-বৃদ্ধিকর) রস্ভাঃ (সরস) স্নিগ্ধাঃ (স্নেহ-স্বতাস্বদুক্ত) স্থিরাঃ (যাহার
সারাংশ দেহে স্থায়ী হইতে পারে) হৃদ্যাঃ (প্রীতিকর) আহারাঃ (আহার সকল) সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ
(সাত্ত্বিকগণের প্রিয়) ॥ ৮

শ্রীধর। তত্র আহার-ত্রিবিধ্যমাহ—আয়ুরিত ত্রিভিঃ। আয়ুঃ—জীবিতম্, সৰ্বম্—
উৎসাহঃ, বলঃ—শক্তিঃ, আরোগ্যং—রোগরাহিত্যম্, স্থখং—চিন্তপ্রসাদঃ, প্রীতিঃ—অভিরুচিঃ।
আয়ুর্দানানাং বিবৰ্দ্ধনাঃ বিশেষণ বৃদ্ধিকর্যঃ। তে চ রস্ভাঃ—বসবন্তঃ, স্নিগ্ধাঃ—স্নেহবৃত্তাঃ,
স্থিরাঃ—দেহে সংরাম্ভেণ চিরকালাবস্থায়িনঃ, হৃদ্যাঃ—দৃষ্টিমাত্রাদেব হৃদয়দমাঃ। এবমুক্তা
আহারাঃ—ভক্ষ্যভোজ্যাদয়ঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮

(রাজসিক আহার)

কটুপ্লবণাত্যাক্তীক্ষরুক্ষবিদাহিনঃ ।

আহার্য রাজসসৌষ্ঠ্য দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯

বঙ্গানুবাদ। [আহারের ত্রিবিধতা তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন]—আয়ুঃ অর্থাৎ জীবন-
স্বখ অর্থাৎ উৎসাহ, বল—শক্তি, আরোগ্য—রোগরাহিত্য, স্থখ অর্থাৎ চিন্তপ্রসাদ, প্রীতি
অর্থাৎ অভিরুচি—ইহাদের বিশেষরূপ বৃদ্ধিকর, অথচ (সেই সব আহার্যগুলি) রসবন্ত, স্নেহবৃত্ত
এবং যাহার সারাংশ দেহে চিরকালাবস্থায়ী হয়, এবং তাহা হৃদয় অর্থাৎ দৃষ্টিমাত্রাদেব হৃদয়দম
অর্থাৎ মনের আনন্দ হয়—এইরূপ যে ভক্ষ্য-ভোজ্যাদি, তাহা সাত্ত্বিকগণের প্রিয় ॥ ৮

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—আয়ুর্বৃদ্ধি হয় ক্ষীরে, সত্ত্বগুণ ঘূতে, বল-ভূক্ষে, আরোগ্য
তিক্তে, স্থখ মধু, প্রীতি পায়স-রসাল জিনিষ ঠাণ্ডা; স্থিরাঃ—হবিষ্যন্ন, হৃদ্যাঃ—পায়স
ঘৃত মধু মিশ্রিত—এই সকল সাত্ত্বিক আহার।—সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের
যাহা প্রিয় আহার এবং যাহা সত্ত্বগুণবর্দ্ধক তাহা কিরূপ হওয়া উচিত—তাহাই বলিতেছেন।
(১) একরূপ আহার করিবে যদ্বারা আয়ুঃ বৃদ্ধি হয়—যেমন ক্ষীর। (২) যদ্বারা মনের উৎসাহ
ও শরীরের অবসাদ দূর হয় এবং সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি করে—যেমন ঘৃত। (৩) যাহাতে বল বৃদ্ধি
হয়—যেমন ভূক্ষ। (৪) যদ্বারা পীড়া থাকিলে আরোগ্য প্রাপ্তি হয়—যেমন তিক্ত দ্রব্য।
(৫) যদ্বারা স্থখ লাভ হয়—যেমন মধু। (৬) যাহা ভোজন মাছেই তৃপ্তি লাভ হয় যেমন
পায়স। (৭) যাহা রসযুক্ত বস্তু—যেমন মিষ্টফল ও রসাদি;—রসাল বস্তু ভোজনে শরীর-ঠাণ্ডা
থাকে। (৮) যাহা স্নিগ্ধ বস্তু—যেমন মাখন, তুক্র (মাঠা) প্রভৃতি। (৯) যাহা স্থিরাঃ—যাহার
সারাংশ দেহে স্থায়ী ভাবে থাকে—যেমন হবিষ্যন্ন। (১০) যাহা হৃদ্য—যে সকল বস্তু
দেহিবা-মাত্র হৃদয় মনোরম বোধ হয়, কোন অপবিত্রতা বাহাতে নাই—যেমন পায়স, ঘৃত,
মধুমিশ্রিত আহার—ইহা হইবে সাত্ত্বিক আহার। যাহারা যোগাত্ম্যাসে রত, তাহাদেরও প্রথম
প্রথম আহারীয় বস্তু সাত্ত্বিক না হইলে সাধনায় অনেক বিষয় হয়। সাধনায় যাহা হৃদ্য
লাভ করিয়াছেন এবং বহুক্ষণ ধরিয়া প্রতিদিন সাধনা করেন তাহাদের খাসেই স্নিগ্ধতা বৃদ্ধি
হয় এবং স্থিরাঃ বৃদ্ধির সহিত তাহাদের আহারের পরিমাণ ক্রমশঃই কমি হইয়া যায় কিন্তু
তাহাতে শরীর দুর্বল বা রোগগ্রস্ত হয় না ॥ ৮

অমর। কটুপ্লবণাত্যাক্তীক্ষরুক্ষবিদাহিনঃ (অতি কটু, অতি অন্ন, অতি প্লবণাত্ম, অতি
উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, অতি রুক্ষ, অতি বিদাহী) দুঃখশোকাময়প্রদাঃ (দুঃখ, শোক ও বেগজনক)
আহারাঃ (আহার সকল) রাজসস্ত (রাজস ব্যক্তিগণের) ইষ্টাঃ (প্রিয়) ॥ ৯

শ্রীধর। তথা কটুতি। অতিশব্দঃ কটুাদিনু সপ্তমপি সন্ধ্যতে। তেন অতি কটু-
নিষাদিঃ। অত্যন্নঃ, অতিপ্লবণঃ, অত্যক্ষুচ প্রসিদ্ধঃ। অতি তীক্ষ্ণ—মরীচাদিঃ। অতি
রুক্ষঃ—কঙ্ককোদ্রাদিঃ। অতিবিদাহী—সর্বপাদিঃ। অতিকটুদয় আহারা রাজসস্য ইষ্টা-
প্রিয়াঃ। দুঃখং—তাৎকালিকং হৃদয়সজ্ঞাপাদি। শোকঃ—পশ্চাত্তাপি ঘোষণাম্। অময়ঃ
রোগঃ। এতান্ প্রদত—প্রবন্ধতীতি তথা ॥ ৯

(তামসিক আহার)

যাতযামং গতরসং পুতিপর্যুষিতং চ যৎ ।

উচ্ছিকমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥ ১০

বজ্রানুবাদ । [আরও বলিতেছেন]—(এই শ্লোকে যে “অতি” শব্দ আছে তাহা কটু প্রভৃতি পঞ্চ শব্দের সহিত সংযুক্ত) । সেইজন্য—অতি কটু যেমন নিষাদি । অতি অন্ন, অতি লবণ ও অতি উষ্ণ - দ্রব্যাদি প্রসিদ্ধ । অতি ভীক্ষু যেমন মরীচাদি । অতি রুক্ষ—যেমন কঙ্ক [কাকনি খাওয়া, পীততত্ত্বা—ইহা মধুর-কষায় রস] ও কোদ্রব [কোদো নামক ঋতু বিশেষ] অতি বিদাহী—সর্ষপাদি । অতি কটু প্রভৃতি আহার রাজসগণের প্রিয় । তাহা দুঃখ—তাত্‌কালিক হৃদয়সন্তাপপ্রদ, শোক—পশ্চাদ্‌দ্ব্যত দোষানন্ত বা অপ্ৰসন্নতা এবং আময়—বোগপ্রদ ॥ ২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—কষা, অন্ন, লবণ, উষ্ণ, ঝাল, রুক্ষি করে যে সকল দ্রব্য, লঙ্কা, মরীচ—ইহা রাজসিক আহার—খেলে দুঃখ আর শোক হয়—ভালরূপে ।—যে সকল বস্তুর সেবনে দুঃখ, শোক এবং ব্যাধি উৎপন্ন হয়, এবং যাহা—(১) অতি কটু—যেমন নিষ, চিরেতা ইত্যাদি, (২) অতি অন্ন—কাঁচা ভেঁতুল, চালতা, আমড়া ইত্যাদি, (৩) অতি লবণ (অতিশয় লবণবৃত্ত না হইলে কেহ কেহ খাইতে পারে না), (৪) অতি উষ্ণ—যেমন আগজলন্ত ভাত, দুধ ইত্যাদি যাহাতে জিহ্বা পুড়িয়া যায়, (৫) অতি ভীক্ষু—ঝাল, লঙ্কা, মরীচ প্রভৃতি, (৬) অতি রুক্ষ—যে সকল দ্রব্য রুক্ষি করে—কাউনি, কোদো প্রভৃতি স্নেহহীন দ্রব্য চালভাঙ্গা, ছোলাভাঙ্গা ইত্যাদি । (৭) বিদাহী—যাহা খাইলে মুখের ভিতর, পেট, বুক, গলা জলিয়া উঠে—যেমন সর্ষপ প্রভৃতি । এই সমস্ত দ্রব্যই রাজসগণের প্রিয় । ইহারা ভোজনকালেও দুঃখপ্রদ, কারণ শরীরে কষ্ট অনুভব হয় ; ইহার পরিণামও দুঃখজনক, কারণ এতদ্বারা ব্যাধি উৎপন্ন হয় । এই সকল বস্তু সেবনে শরীর অসুস্থ হয় এবং সাধনে বিঘ্ন উৎপন্ন করে, সেইজন্য ক্রিয়াবানেরা এ বিষয়ে সতর্ক থাকিবেন ॥ ২

অনুব্র। যাতযামং (অর্ধপক বা যাহা এক প্রহর পূর্বে পাক হইয়াছে, শৈত্যাবস্থা প্রাপ্ত) গতরসং (রসশূন্য বাহার সার তুলিয়া লওয়া হইয়াছে) পুতিপর্যুষিতং চ (পূর্কদিন পক, বাসি ও দুর্গন্ধবৃত্ত) উচ্ছিকমপি (এবং অপরের ভুক্তাবশিষ্ট) অমেধ্যং চ (এবং অপবিত্র) যৎ ভোজনং (যে ভোজ্যবস্তু) [ভৎ—তাহা] তামসপ্রিয়ম্ (তামসগণের প্রিয়) ॥ ১

শ্রীধর । তথা—যাতযামমিতি । যাতঃ যামঃ—প্রহরো বস্তু পকস্ত ওহনাধঃ তদ্ যাতযামং—শৈত্যাবস্থা প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ । গতরসং—নিম্পীড়িতসারং, পুতি—দুর্গন্ধং, পর্যুষিতং—দিনান্তরপকম্, উচ্ছিকমপি—অভুক্তাবশিষ্টম্, অমেধ্যং—অতস্ক্যং কলঙ্গাদি । এতত্ত্বং ভোজনং—ভোজ্যং তামসস্ত প্রিয়ম্ ॥ ১০

বজ্রানুবাদ—যাতযামং—পকবস্তু প্রভৃতি ভোজনের পূর্বে প্রহরাতীত হওয়ায় যাহা শৈত্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে । গতরসং—নিম্পীড়িতসার, বাহার সারংশ বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে । পুতি—দুর্গন্ধময় । পর্যুষিত—দিনান্তরের পক । উচ্ছিক—অস্তের ভুক্তাবশিষ্ট ।

অমেধ্য—অতস্ক্য কলঙ্গাদি (বিষাক্রবিক্ত পল্লপক্ষ্যাদির মাংস)—এইরূপ ভোজ্য তামসগণের প্রিয় ॥ ১০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—দশ এগার দশ রাঁধা ভাত, পচা পাস্তা, উচ্ছিষ্ট, অপবিত্র এই সকল তামস ভোজন ।—গুণতত্ত্বে আহারের ভেদ হইবেই । সত্ত্বগুণ বাহার প্রবল তিনি রাজসিক বা তামসিক আহার গ্রহণ করিতে পারেন না ; গ্রহণ করিলে তাহার শরীর ও মন অসুস্থ হইয়া পড়িবে । এইরূপ তামস বা রাজস প্রকৃতির লোকেরা সাত্বিক আহার করিলে তাহারও পীড়াগ্রস্ত হইবে । অবশ্য রাজসিক ও তামসিকেরা যদি ধীরে ধীরে সত্ত্বগুণবৃত্ত আহার গ্রহণ করিতে থাকেন ও সত্ত্বাহরূপ কার্য ও চিন্তাদির অভ্যাস করিতে থাকেন, তবে তাহাদের নিজ স্বভাবও ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইয়া যায় । কিন্তু সহসা করিতে গেলেই অনর্থ উৎপন্ন হয় । ইহাদের প্রাণ সুসুন্মার্গে প্রবাহিত হয় তাহাদের পক্ষে অসম্ভব আহার বিপজ্জনক । এইজন্য যোগীদের অশুদ্ধ আহার গ্রহণে সাবধানতা আবশ্যক, নচেৎ বিপরীত ফল হয় ॥ ১০*

* গদ আছে—সিদ্ধদাশক শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যকে কোন চতাল নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, এবং তাহাকে ভোজন করাইবার জন্য তাহাদের ষাচ শূকরের মাংস পাক করিয়া রাখিয়াছিল । তাহাদের উদ্বেগ ছিল যে তিনি যে সমুদ্রই ব্রহ্ম বলেন, ইহা তাহার অন্তরের কথা কি বৌদ্ধিক কথা দেখিতে হইবে । শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য শূকরের বেশে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন । কিন্তু চতালেরা তাহাকে চিনিতে না পারিয়া শূকরবেশধারী শঙ্করাচার্য্যকে ভাড়াইয়া দেয় । পরে তাহার স্বামীর দ্বারা অপেক্ষা করিয়া তিনি না আসায় বড়ই দুঃখিত হয়, পরে আচার্য্যের নিকট তাহার গিয়া বলে—আপনি মিথ্যা কথা কেন বলিলেন ? আপনি আমাদের অন্ন গ্রহণ করিবেন না তাহা আমরাও জানি, পূর্বে সে কথা আমাদেরিগকে বলিলেই হইত, আমরা আপনার ভৃত্য আয়োজন করিয়া অপেক্ষা করিতাম না । আর আপনি যে ব্রাহ্মণ ও চতাল, মহাত্ম ও পণ্ড সকলকেই ব্রহ্মময় বলেন, আপনার এ কথাও কপট বাক্য মাত্র বলিয়া বুঝিতে পারিলাম । পরে তাহাদিগকে সমাদর করিয়া বিদায়পূর্বক বলিলেন—‘তাই, আমি তো ভোজন করিবার জন্য তোমাদের গুহানে উপস্থিত হইয়াছিলাম, তোমরা আমাকে ভোজন করিতে দিলে কেন ?’ তাহারা বলিল, আমরা সকলেই আপনার অপেক্ষা করিতেছিলাম, আপনি তো আসেন নাই, আপনি আসিলে আমরা একজনও কি আপনারকে দেখিতে পাইতাম না ? হতবাক আপনার আসা কখনই সত্য নহে । তাহাতে আচার্য্য বলিলেন—তোমাদের এ কথা ঠিক, কিন্তু আমিও অন্তর্য বলিতেছি না । আমি মহাত্মবেশে তোমাদের নিকট যাই নাই, তাহার কারণ তোমরা আমাব ভৃত্য যে ভ্রম ও দ্বন্দ্ব করিয়াছিলে তাহা আমার শরীরের অমূল্য নহে, অথচ তোমাদের নিমন্ত্রণ যখন গ্রহণ করিগছি, তখন তাহা রক্ষা করিতেই হইবে । এইজন্য যে শরীরে উষ্ণ আহার পরিপাক করা যাইতে পারে, আমি তদনুসারে বৃত্তবর বেশে তোমাদের গৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ উপস্থিত হইয়াছিলাম, তোমরা তো আমাকে খাইতে দিলে না, বরং লজ্জান্বিত করিয়া ভাড়াইয়া দিলে । এই কথা শুনিয়া অশ্রু চতালেরা অত্যন্ত লজ্জিত হইল ।

আর একবার বৃদ্ধদেবের সমরও এইরূপ ঘটনা হইয়াছিল । বৃদ্ধদেবের ভৃত্য চতাল তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া শূকর মাংস খাইতে দিয়াছিল । কল্যাণময় বৃদ্ধদেব চতাল প্রাপ্ত শূকর মাংস গ্রহণ করিয়া রোগগ্রস্ত হইয়াছিলেন, এমন কি তাহাতেই তাঁহার দেহাবসান হয় । বৃদ্ধদেব বলিয়াছিলেন—এই শূকর মাংস চতাল প্রিয় মাংস, তাহাই সে আমাকে দিয়াছিল, কিন্তু আমার শরীরে উষ্ণ সহ হইল না, আদ্য তাহারই ফলে ‘আনাগ দেহ নষ্ট হইতে বলিয়াছে ।

* আহারভক্ষ্যে সর্বভক্ষিঃ বটে, এবং শ্রীমদাচার্য্য শঙ্কর যে ইচ্ছিতমাত্র বিদায়পাই আগের বলিয়াছেন তাহাও

(সাত্ত্বিক যজ্ঞ)

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্বজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে ।

যচ্চব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ ॥১১

অর্থঃ। অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ (ফলাকাঙ্ক্ষাহীন ব্যক্তিগণ কর্তৃক) বিধিদিষ্টঃ (যথাসাধু)

অতি সত্য, কাৰণ রোগ, বেদ, মোহ ত্রিবিধ দোষবর্জিত হইয়া ইন্দ্রিয় বিষয় গ্রহণ করিতে না পারিলে চিত্ত প্রশান্ত হয় না, নির্মলও হয় না । সেরূপ ভাবের যিনি অধিকারী তাঁহার পক্ষে উহার ঋণ এইরূপই ; কিন্তু যাহাদের সে উচ্চ অধিকার ভুলে নাই, যাহারা অধ্যাত্মমার্গে অবতীর্ণ হইয়া, তাহাদের পক্ষেও আহার (যদুারা শরীর পুষ্ট ও সুরক্ষা পক্ষে) যথাসম্ভব পরিচর্য হওয়া আবশ্যক । কাৰণ কৰ্ম্ম অন্ন গ্রহণে আত্মা স্থায় হয়, শরীর রোগ-গ্রস্ত হয় এবং অকালমৃত্যু হইয়া থাকে । মন্ত্ৰস্থতিতে আছে—“অন্নভ্যাসেন তু বেদানাম্ আচারস্ত চ বর্জনাৎ । অলভ্যং অন্নদোষাত কালো বিপ্রান্ ভিখ্যাসতি”—(৫ম অধ্যায় ৪৭ শ্লোক) ।

দেহ-মন শুদ্ধ না থাকিলে অন্নভ্যাস ভগবৎস্তুতির উদয় হয় না, হৃতবাৎ দেহ-মন শুদ্ধির জন্য অন্নদোষবর্জিত হইতে হইবে, এবং আচার বর্জন করিলেও অন্ন-শুদ্ধির হানি হইয়া থাকে ; হৃতবাৎ আচার সর্বদা অবর্জনীয় ।

শ্রীমৎ আচার্য্য রামানুজও যজ্ঞের ত্রিবিধ দোষ পরিহার করিতে বলিয়াছেন । (১) জাতিদোষ, (২) আশ্রয়দোষ, (৩) নিমিত্তদোষ । জাতিদোষের অর্থ এই যে নীচ জাতির বা কুকর্ষাসক্ত লোকের অন্ন গ্রহণ করিলে না । এখনও সে আচার ঐ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবলভাবেই বর্তমান রহিয়াছে । সংস্পর্শ দোষও খুব বড় দোষ—কিন্তু এ যুগের লোকেরা সে কথা আর মানিতে চাহেন না, সম্ভোগের অভাবই ইহার একমাত্র কারণ । এখনকার কালেও চিকিৎসকেরা উৎকট ব্যাবিপিড়িত স্থানের প্রবাদটি গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়া থাকেন । যদি ব্যাবিপিড়িত স্থানের অন্ন গ্রহণে দোষ হয় (স্থূল শরীরের পক্ষে দূষিত স্থানের অন্ন গ্রহণে ব্যাপি হওয়া প্রায় অনিবার্য্য)—তবে শুদ্ধ শরীর (অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, অহংকার, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদি) যে হীনজাতি ও হীন কৰ্ম্মকারীর অন্ন দূষিত হইবে তাহাতে আর আশঙ্ক্য কি ? প্রতিতে বলিয়াছেন—সন্ন্যাসী প্রাণ-মন-বুদ্ধিরূপে পরিণাম লাভ করে—হৃতবাৎ যাহারা যে আরে পুষ্ট হইবে তাহাদের মন-বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়-চেষ্টাও তদ্রূপ হইতে বাধ্য । জ্ঞান-দৃষ্টসম্পন্ন ব্যক্তিরা সেইজন্যই হিন্দুসমাজের মধ্যে আহার সৎকালে এত কড়াভাবে নিয়ম প্রচলিত করিয়াছিলেন । ইহা কাহারও প্রতি বিবেচনিত নহে, বিপুল রক্ষার জন্যই তাঁহারা এরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন । আজকালও Segregation camp আছে, প্রোগ্রাম হইলে নগর মধ্যে বাত্মিকে একাএক ঘাইতে না দিয়া আটক করিয়া রাখা হয় । মদন ইচ্ছা প্রণোদিত হইয়াই এরূপ ব্যবস্থা করা হয় । আমরা সরকার বা মিউনিসিপালিটির আদেশ মান্ত করিয়া চলিতে কোন আপত্তি করি না, কিন্তু শাস্ত্র-বাক্য মানিব না—তাহার কারণ প্রকৃত অজ্ঞান । যাহারা এই প্রাচীন পদ্ধতি মান্ত করিয়া চলেন তাহাদের অগত্যই রান্নাঘরের মধ্যেই কিছু কিছু ধর্ম্মকে রাখিতে হয় বৈকি ? আহার তো প্রস্তুত হইবে সেখানে । রন্ধনকর্তা ও রন্ধন-সামগ্রীর স্থান রান্নাঘরেই, হৃতবাৎ রান্না-ঘরকে বাদ দিয়া ধর্ম্মরক্ষা করা কঠিন । যজ্ঞের সংঘম করিতে হইলে যদি স্থানের সংঘম করা অসম্ভব বা অস্বস্তিকর হয়, তবে ধর্ম্মকে রান্নাঘরের পুরিলেই উহা কিরূপে জড়বাহ হয় তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন । অবশ্য জ্ঞানের অভাববশতঃ আমরা অনেক সময় সত্যকে বাদ দিয়া তাহার উপরে খোসাটিকেই আঁকিয়া ধরিয়া থাকি বটে, কিন্তু উহা একেবারে ছাড়িয়া দিলেই কি আমরা জড়াতীত অবস্থার পৌছিতে পারিব ? মনুষ্য সমাজ প্রাচীন হইলেই তাহার ধর্ম্মবৃত্তগুলি সমাজের সকলে প্রাণ দিয়া না করিতে পারিলেও অনেকেরই তাহা প্রাণ দিয়া পালন করেন এবং তাহা জ্ঞানপূর্ব্বকও তাঁহারা করিতে পারেন, যদি সকল লোকে সেরূপভাবে আচারবান হইতে নাও পারে, কিন্তু আচার বর্জিত হইলে তাহারা যে অধিকারভেদ হইয়া নষ্ট হইয়া যাইবে, এ কথা কেন আমরা ভাবিয়া দেখি না ? মন্ত্ৰ বলিয়াছেন—“আচার্য্যং বিচুতো বিপ্রো ন বেদকলমশ্চ তে” ।

(দ্বাত্তিকের রাজস যজ্ঞ)

অভিসন্ধায় তু ফলং দস্তার্থমপি চৈব যৎ ।

ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তৎ যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্ ॥১২

নিশ্চিত) যঃ যজ্ঞঃ (যে যজ্ঞ) যচ্চব্যম্ এব (অবশ্যই অল্পভেষ্য) ইতি মনঃ সমাধায় (এইরূপ মনঃ সমাধান করিয়া) ইজ্যতে (অহুত হইয়া) সঃ সাত্ত্বিকঃ (তাহা সাত্ত্বিক যজ্ঞ) ॥ ১১

শ্রীধর । যজ্ঞোহপি ত্রিবিধঃ, তত্র সাত্ত্বিকং যজ্ঞমাহ—অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ ত্রিভিঃ । ফলাকাঙ্ক্ষাবহিতৈঃ পুরুষৈঃ বিধিনা দ্বিষ্ট—আবশ্যকতয়া বিহিতো যঃ যজ্ঞঃ ইজ্যতে—অঃস্ট্রী-রতে স সাত্ত্বিকে যজ্ঞঃ । কথম্ ইজ্যতে ? যচ্চব্যমেবেতি—যজ্ঞাহুষ্ঠানমেব কার্য্যং নাশ্রয় ফলং সাধনীয়মিত্যোবং মনঃ সমাধায়—একাগ্রং কৃত্বা ইত্যর্থঃ ॥ ১১

বঙ্গানুবাদ । [যজ্ঞ যে ত্রিবিধ তাহা তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন । তন্মধ্যে সাত্ত্বিক যজ্ঞের বিষয় এখন বলিতেছেন]—ফলাকাঙ্ক্ষাবহিত পুরুষগণ কর্তৃক বিধি দ্বারা দ্বিষ্ট অর্থাৎ আবশ্যক বলিয়া বিহিত যে যজ্ঞের অহুষ্ঠান হয়, সেই যজ্ঞই সাত্ত্বিক । কিরূপে তাহারা যজ্ঞাহুষ্ঠান করেন ? যজ্ঞাহুষ্ঠানই আমার কর্তব্য, অতঃ ফল সাধনীয় নহে, এইরূপ মনকে একাগ্র করিয়া ॥ ১১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ফলের আকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া ক্রিয়া করা—বিশেষ রূপে বুদ্ধি স্থির ক্রিয়ার পর হইয়া কর্তব্য কর্ম্ম বলিয়া এইরূপ মনেতে করিয়া ধারণা, ধ্যান, সমাধি পূর্ব্বক যে করে সে সাত্ত্বিক ।—ত্রিবিধ যজ্ঞের মধ্যে সাত্ত্বিক যজ্ঞটি কেমন তাহাই বলিতেছেন । এই যজ্ঞ ফলাকাঙ্ক্ষাবহিত হইয়া করিতে হয় । সব যজ্ঞেই তো ফলের আকাঙ্ক্ষা আছে, ফলাকাঙ্ক্ষাবহিত যজ্ঞ তবে কোন্টি ? ভগবৎপ্রীতি-কামনায় অবশ্য কর্তব্য বাবে যাহা অহুত হইয়া তাহাও সাত্ত্বিক যজ্ঞ বটে, কিন্তু আর এক প্রকারের যজ্ঞ আছে যাহাতে মোটেই ফল কামনা থাকে না । তাহাই প্রকৃত পক্ষে সাত্ত্বিক যজ্ঞ । ইহাকে ব্রহ্মযজ্ঞও বলে, কারণ ব্রহ্মনাড়ীর মধ্যে প্রাণকে লইয়া গেলেই বুদ্ধি বিশেষ-রূপে স্থির হয় । তাহাই একমাত্র কর্তব্য কর্ম্ম, কারণ সে কর্ম্ম ব্যতীত জীবের উদ্ধারের আর কোন উপায় নাই । অতঃ যত কর্তব্য আছে, তাহা করিলে তদনুরূপ সংস্কার মনেতে থাকিবা যাইবেই, মনকে সংস্কার-শূন্য না করিতে পারিলে প্রকৃত কামনা-শূন্য হওয়া যায় না । প্রাণের মধ্যে যে কর্ম্মের সংস্কার বা ভাগ পড়িয়া যায়, তাহা মুছিয়া ফেলা অসম্ভব যদি প্রাণের শোধন না হয় । প্রাণ শুদ্ধ হইয়া স্থির হইলেই মন শুদ্ধ হয় । শুদ্ধমনে আর সংকল্পের চেষ্টা উঠে না । সংকল্পশূন্য অবস্থাতেই সমাধিপ্রাপ্তির উদয় হয় । তাই সমাধিপ্রাপ্তির জন্য ধারণা-ধ্যানাদি আবশ্যক । আবার ধারণা-ধ্যানের জন্য প্রাণায়ামাদি যে পুরুষার্ধ সাধন—তাহাই সাত্ত্বিক যজ্ঞ । তাহাই আবার বিধিদিষ্ট ভাবে করিতে হইবে । সাধনার জন্য যে শাস্ত্রের নিয়মাদি পালন—তাহাই বিধিদিষ্ট যজ্ঞ । নিজের খেয়াল মত সাধন করিলে চলিবে না—শুভর উপদেশ ও আদেশ মত করিতে হইবে এবং তাহাও প্রতিদিন নিয়ম পূর্ব্বক করিতে হইবে ॥ ১১

অর্থঃ । তু ফলম্ অভিসন্ধায় (কিন্তু ফলে অভিসন্ধি করিয়া) অপি চ (এবং) দস্তার্থম্

(শ্রদ্ধাহীন তামস যজ্ঞ)

বিবিধীনমসৃষ্টানং মদ্রহীনমদক্ষিণম্ ।

শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥ ১৩

এব (দত্তের দ্বারা অর্থ্যাৎ নিজ ধার্মিকত্ব বা মহাব প্রকাশের দ্বারা) যৎ ইচ্ছাতে (যে যজ্ঞ অসৃষ্ট হয়) তং যজ্ঞং (সেই যজ্ঞকে) রাজসং বিদ্ধি (রাজস বলিয়া জানিবে) ॥ ১২

শ্রীধর । রাজসং যজ্ঞমাহ—অভিসন্ধ্যেতি । ফলম্ অভিসন্ধ্য—উদ্দিষ্ট, যৎ ইচ্ছাতে—যজ্ঞঃ ক্রিয়তে । দত্তার্থঃ—স্বমহত্ত্বাপনার্থং, তং যজ্ঞং রাজসং বিদ্ধি ॥ ১২

বঙ্গানুবাদ । [রাজস যজ্ঞের বিষয় বলিতেছেন]—ফল অভিসন্ধি করিয়া অর্থ্যাৎ ফলোদ্দেশ্যে, এবং স্ব-মহত্ত্বাপনার্থং যে যজ্ঞ করা হয়, তাহা রাজস বলিয়া জানিবে ॥ ১২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত ও দেমাকের সহিত যে এরূপ করে তাহাকে রাজসিক যজ্ঞ বলে ।—ফললাভ কামনা করিয়া কিংবা আমি ধার্মিক ইহা লোকে জাহ্নক—এই প্রকার বাসনা লইয়া যে যজ্ঞ বা ক্রিয়াদি করে, তাহা রাজসিক । অনেক সাধন করেন এই উদ্দেশ্যে—যে উহাতে তাঁহার রোগ আরাম হইবে এবং লোকে তাঁহাকে যোগী বলিবে । এইসব উদ্দেশ্য লইয়া যাহারা ক্রিয়া করেন, তাঁহাদের ক্রিয়া ভাল-কপ হয় না । দান্তিক লোকেরা প্রকৃত বড় না হইয়া লোকের নিকট সম্মান-প্রতিষ্ঠা চায় । হয়তো লোকে একটা বিশেষ কক্ষোপলক্ষে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে, তিনি ধরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া আছেন, লোককে জানান হইতেছে, তিনি সময় ধরিয়া পূজা করেন । কিন্তু পূজা হয়তো কিছুই করেন না, কোন পূজার ভাণ করিয়া ঠাকুর ঘরে বসিয়া থাকেন এবং চোলে ॥ ১২

অধ্যায় । বিবিধীনং (শাস্ত্রোক্ত বিধিশূন্য) অসৃষ্টানং (সংপাদ্যে অন্নদানশূন্য) মদ্রহীনম্ (মদ্রবর্জিত) অদক্ষিণম্ (দক্ষিণাশূন্য), শ্রদ্ধাবিরহিতং (শ্রদ্ধাশূন্য) যজ্ঞং (যজ্ঞকে) তামসং পরিচক্ষতে (তামস বলিয়াছেন) ॥ ১৩

শ্রীধর । তামসং যজ্ঞমাহ—বিধীতি । বিবিধীনং—শাস্ত্রোক্তবিধিশূন্য । অসৃষ্টানং—ব্রাহ্মণাভিভ্যঃ অসৃষ্টং ন নিপ্পাদিতং অন্নং বস্মি তং । মদ্রহীনং—মদ্রহীনং । অদক্ষিণম্—যথোক্তদক্ষিণারহিতং চ শ্রদ্ধাশূন্যং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে—কথয়ন্তি শিষ্টাঃ ॥ ১৩

বঙ্গানুবাদ । [তামস যজ্ঞের বিষয় বলিতেছেন]—শাস্ত্রোক্ত বিধিশূন্য যে যজ্ঞে ব্রাহ্মণা-দির উদ্দেশ্যে অসম্পাদিত অন্ন, মদ্রহীন, যথোক্ত দক্ষিণারহিত ও শ্রদ্ধাবিরহিত ও শ্রদ্ধাশূন্য যজ্ঞকে শিষ্টগণ তামস বলিয়া থাকেন ॥ ১৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ক্রিয়ার পর বিশেষরূপে বুদ্ধি স্থির না করিয়া ও ক্রিয়া না করিয়া ও ওঁকার ক্রিয়া না করিয়া, যে কিছু করে সমুদয় তামসিক কর্ম অর্থ্যাৎ ক্রিয়াগুরুবাক্যের দ্বারায় লাভ করিয়া সমুদয় কর্ম করিবে, অচেৎ সব বুঝা ।—ক্রিয়া বিবিধীন কখন হয় ? যখনই উহা অনিয়মিত রূপে করা হয়, সময়ের ঠিক নাই,

তপস্তা তিন প্রকার—শারীর, বাটিক ও মানস ।

(শারীর তপ)

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জ্জবম্ ।

ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥ ১৪

স্থানের ঠিক নাই, “ব্যাগার ঠেলার মত” কাজ করা । তাহা ছাড়া বাঁহারা নিয়মিত ভাবেও প্রত্যাহ করেন, তাঁহারা যদি ক্রিয়া সমাপ্ত করিয়াই ধড় মড় করিয়া আসন হইতে উঠিয়া পড়েন, তবে উহা বিবিধীন হয় । উহার নিয়ম বা বিধি এই যে মন দিয়া ক্রিয়া করার পরেও ধানিকক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া থাকা ; যতক্ষণ মন চঞ্চল না হয় । এইরূপ স্থিতিভাবে বসিয়া থাকিবার অভ্যাস করিলে ক্রিয়ার পর অবস্থার আশ্বাসন হয় ।

অস্থায়—অন্ন-প্রাণ ; অ+স্থ—মিলিত বা যুক্ত অর্থ্যাৎ যে প্রাণ যুক্ত বা মিলিত নহে অর্থ্যাৎ সচঞ্চল । ক্রিয়া করিয়া স্থিরত্ব অবস্থাকে অস্থায় করিতে না পারা ।

ময়হীন—শাসনই ময়, নিঃশাস প্রশাস লইয়া প্রাণায়ামাদি যে ক্রিয়া করা হয়, তাহা না করাই ময়হীন যজ্ঞ । সকল পূজার প্রারম্ভেই প্রাণায়াম করিতে হয়, তাহা না করিয়া পূজা করা ।

অদক্ষিণ—দক্ষিণা—ক্রিয়ার শেষ ফল অর্থ্যাৎ পর অবস্থা, তাহার অপ্রাপ্তিই দক্ষিণা-বিহীন যজ্ঞ ।

শ্রদ্ধাবিরহিত—শ্রদ্ধা = ভক্তিভাব, বিশ্বাস, মনের নির্মলতা । এই সকল না থাকাই শ্রদ্ধা বিরহিত ভাব । যাহার ক্রিয়াতে ভক্তি নাই, বিশ্বাস নাই, এবং অনাদরের সহিত করে বলিয়া ক্রিয়া করিয়াও মন নির্মল হয় না বা সঙ্কল্প-শূন্য হয় না—তাহাই শ্রদ্ধা-বিরহিত যজ্ঞ ।

ক্রিয়া পূর্বোক্ত দোষশূন্য ভাবে করিতে হইবে, এবং গুরু নিকট উপদেশ পাইয়া করিতে হইবে, কেবল পুস্তক দেখিয়া সাধন করিলে চলিবে না । গুরু বাহা যাহা উপদেশ দিবেন, সেইগুলি ঠিক ঠিক মত করিয়া যাইতে হইবে । তাহা না করিলে পরিশ্রম মাত্রই সার হইবে ॥ ১৩

অধ্যায় । দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং (দেবতা, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ ব্যক্তির অর্চনা), শৌচম্ (শৌচ), আর্জ্জবম্ (সরলতা) ব্রহ্মচর্যম্ (ব্রহ্মচর্য), অহিংসা চ (ও অহিংসা) শারীরং তপঃ (শরীরসাধ্য তপস্তা) উচ্যতে (কথিত হয়) ॥ ১৪

শ্রীধর । তপসঃ সাত্বিকাদিভেদং দর্শয়িতুং প্রথমং তাবৎ শারীরাদিভেদেন তস্ত ত্রৈবিধ্যমাহ—দেবেত্যাদি ত্রিভিঃ । প্রাজ্ঞাঃ—গুরুব্যতিরিক্তা অস্তেহপি তৎকবিদঃ । দেব-ব্রাহ্মণাদিপূজনং শৌচাদিকং চ শারীরং—শরীরনির্মল্যং তপঃ উচ্যতে ॥ ১৪

বঙ্গানুবাদ । [তপস্তার সাত্বিকাদি ভেদ দেখাইবার দ্বারা প্রথমতঃ শারীরাদি ভেদে তপস্তা যে ত্রিবিধ, হযা তিনটি লোকে বলিতেছেন]—দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ (অর্থ্যাৎ গুরু ব্যতিরিক্ত অস্তেহপি) ব্যক্তির পূজা, ও শৌচাদি, আর্জব (সরলতা), ব্রহ্মচর্য এবং

অহিংসা—এইগুলি শারীর তপস্তা বলিয়া কথিত হয়। শারীর তপস্তা অর্থাৎ বে তপস্তা শরীর দ্বারা সম্পাদ্য ॥ ১৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—দেহতা কূটস্থতে ধ্যান, ক্রিয়াদ্বিত ব্যক্তির নিকট যাওয়া, আত্মাতে থাকা, বিশেষ চৈতন্য ক্রিয়ার দ্বারায় হইয়াছে যাহার তাহার নিকট যাওয়া, “পূজনং” ক্রিয়া করা—ব্রহ্মোক্তে থাকা, “আর্জবং” সরল হওয়া অর্থাৎ যাহা মনে তাহাই বলা, “ব্রহ্মচর্যং” ব্রহ্মোক্তেই থাকা, অস্ত্রের জালতে কাতর না হওয়া এই শারীরিক তপস্যা।—তপস্তা ত্রিবিধ; তন্মধ্যে শারীর তপস্তার কথা এখানে বলিতেছেন। (১) দেবতার পূজা—পুষ্প ধূপ নৈবেদ্যাদির দ্বারা যথাশাস্ত্র-বিহিত দেবার্চনা—ইহাই বাহ পূজা, কিন্তু যাহারা যোগাভ্যাস-নিরত, তাহাদের পূজা হইল কূটস্থতে ধ্যান। কূটস্থের ধ্যান কিরূপে করিতে হয়, তাহা সদ্গুরুর নিকট শিখিতে হয়। (২) দ্বিজ—বাহ্য দৃষ্টিতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের সংকার, অন্তর্লক্ষ্যে দ্বিজ হইলেন—ক্রিয়াবান ব্যক্তি, যাহার কূটস্থ দর্শন হইয়াছে একরূপ ব্যক্তির সঙ্গ করা এবং তাহার সহিত সাধন বিষয়ে আলোচনা করা। ক্রিয়াবানদ্বিগকে দ্বিজ বলা যায় এই জন্য যে তাহাদের দুইবার জন্ম হইয়াছে। প্রথম জন্ম—মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া, দ্বিতীয় জন্ম—গুরু বধন কূটস্থ দর্শন করাইয়া দিয়া কূটস্থ দর্শনের উপায় বলিয়া দেন। অর্থাৎ যে “আমি কে” ভুলিয়া যাওয়ায় জীবের দেহাত্মবোধই প্রবল হয়, যখন গুরু রূপা করিয়া আমার “আমি” কে দেখাইয়া দেন, তখন যে আত্মস্বত্বের উদয় হয়, সেই স্বত্ব হেতু “আত্ম” সম্বন্ধে যে ধারণা জন্মে—তাহাই সংস্কার। (৩) গুরু পূজা—বাহ্যভাবে পিতা, মাতা, আচার্য্য-গণের পূজা। অন্তর্লক্ষ্যে—যিনি আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত, তাহার পূজাই গুরুপূজা। আত্মাই প্রকৃত গুরু। “আত্মা ইব গুরুরেকঃ”—আত্মাই একমাত্র গুরু। (৪) প্রাজ্ঞ-পূজা—ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির পূজা। ১৬শ ও ১৭শ তো পূজা করিতেই হইবে, কিন্তু গুরু না হইলেও বা ব্রাহ্মণ না হইলেও যদি তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও গুরু ব্যক্তি হন, তবে তিনি যে কোনো বর্ণেরই হউন তাহার পূজা কর্তব্য। আবার অন্তর্লক্ষ্যে তিনিই প্রাজ্ঞ, যিনি ক্রিয়া দ্বারা বিশেষ উচ্চাবস্থা লাভ করিয়াছেন অর্থাৎ স্মৃষ্টি যাহার চৈতন্যযুক্ত হইয়াছে, যিনি এ পথের বহু দূরের কথা জ্ঞাত আছেন—তাদৃশ মহাত্মাদের সহিত সঙ্গ করা ও তাহাদ্বিগকে সংকার করা আবশ্যক। (৫) শৌচ—মুঞ্চলাহির দ্বারা শরীর-তত্ত্ব, এবং প্রাণায়ামাদির দ্বারা যে মনঃস্থির হয়, তাহাই শুদ্ধি অর্থাৎ ব্রহ্মোক্তে থাকিবার চেষ্টা। (৬) আর্জবম্—অকপট ভাব, মনে যাহা আসে—তাহাই বলা, মনের ভাব গোপন না করা। অন্তর্লক্ষ্যে যখন মন, ইন্দ্রিয় ও বাক্য সংযত হইয়া গিয়াছে। (৭) ব্রহ্মচর্য—শাস্ত্রনিষিদ্ধ মৈথুন ত্যাগ। অন্তর্লক্ষ্যে—মন যখন ব্রহ্মভ্যাসে রত হয় এবং ব্রহ্মোক্তেই থাকে, তখনই প্রকৃত ব্রহ্মচর্য হয়। এই ব্রহ্মব্রত পুরুষকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে—“ন দেবো ন তু মামৃষঃ”। (৮) অহিংসা—প্রাণি-পীড়ন পরিভ্যাগ, অস্ত্রের ভাল দেখিয়া ব্যথিত না হওয়া। ঋতি বলেন—“মা হিংস্যাং সর্বভূতানি” প্রাণিগণকে হিংসা না করা। তাহাদের জীবন নাশ করাই গুরু হিংসা নহে। পরকে পীড়া দেওয়া, মর্শভেদী কথা বলা—এ সবও হিংসা। মানুষ বতদিন স্বার্থপর থাকিবে, ততদিন কোন না কোন প্রকারে

(বাহ্য তপস্তা)

অনুদ্বৈগকরণ বাক্য সত্য প্রিয়হিতং চ যৎ ।

স্বাধ্যায়াত্যসনং চৈব বাহ্যং তপ উচ্যতে ॥ ১৫

সে অত্কে হিংসা করিবেই। যম সাধনের মধ্যে অহিংসাই সর্বোত্তম। হিংসা-দেহই ব্রহ্ম-ভাব প্রতিষ্ঠার পরিপন্থী। যে সকলকে আপনায় মনে করিতে না পারে, এবং অস্ত্রের উপকারের জন্য নিজের স্বার্থত্যাগ করিতে না পারে, তাহার ভগবদ্ভক্তি হয় না, ভগবৎ-দর্শন বা জ্ঞান হওয়া দূরের কথা। এগুলি শরীরসাধ্য তপস্তা, শরীর না থাকিলে হয় না। ইহার অন্তর্লক্ষ্য ও বহির্লক্ষ্য উভয়ের প্রতিই সাধকের লক্ষ্য থাকা আবশ্যক। বাহ্য ও অন্তর উভয় ভাবই আয়ত্ত করিতে না পারিলে প্রকৃত আত্মোন্নতি হইতে পারে না, এই জন্য উভয় ভাবেই এগুলি অমুষ্ঠেয় ॥ ১৪

অনুদ্বৈগকরণ (অনুদ্বৈগকরণ) সত্যং (সত্য) প্রিয়হিতং চ (প্রিয় ও হিতজনক) যৎ বাক্যং (যে বাক্য) স্বাধ্যায়াত্যসনং চ এব (ও বেদাভ্যাস) বাহ্যং তপঃ (বাচিক তপস্তা) উচ্যতে (কথিত হয়) ॥ ১৫

শ্রীধর । বাচিক তপ আ—অনুদ্বৈগকরণমিতি । উদ্বৈগ ভয়ং ন করোতীতি অনুদ্বৈগকরণ বাক্যং, সত্যং—শ্রোতুঃ প্রিয়ম্, হিতঞ্চ—পরিণামে সুখকরং, স্বাধ্যায়াত্যসনং—বেদাভ্যাসসম্, বাহ্যং—বাচ্য নির্বর্ত্ত্যং তপঃ ॥ ১৫

বঙ্গাশুবাঙ্গ । [বাচিক তপস্তা বলিতেছেন]—উদ্বৈগ শব্দে ভয়, তাহা করে না যে বাক্যে—তাদৃশ বাক্যই অনুদ্বৈগকরণ, আর যাহা শ্রোতার প্রিয় ও হিত অর্থাৎ যাহা পরিণামে সুখকর এইরূপ সত্যবাক্য এবং বেদাভ্যাস—এইগুলি বাক্য দ্বারা নির্বর্ত্ত্য অর্থাৎ বাহ্য তপস্তা ॥ ১৫

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—যাহাতে অল্প কাহারও উদ্বৈগ না হয় এমন কথা বলা—সত্য—প্রিয় ও হিত বাক্য—স্বাধ্যায়—বুদ্ধির সহিত ক্রিয়া করা, ইহাকে বাহ্য তপস্তা কহে—শ্রীমদ্ আচার্য্য শরৎ এই শ্লোকের ব্যাখ্যার সঙ্গে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে এই—অনুদ্বৈগকরণ, প্রিয়ম্, হিতম্ এবং সত্যম্ এই চারিটি ধর্মের সহিত বাক্যের সম্বন্ধ থাকাই চাই, ইহাই বুঝাইবার জন্য “চ” এই সমুচ্চয়বাচক শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে।

যদি বাক্য সত্য হয় অথচ তাহা উদ্বৈগকরণ অথবা অহিত কিম্বা অপ্রিয় হয় তাহা হইলে ঐ বাক্যকে বাহ্য তপঃ বলা যাইবে না। আবার যদি বাক্য হিত ও অনুদ্বৈগকরণ হয়, কিন্তু সত্য না হয় তাহা হইলেও ঐ বাক্য বাহ্য তপঃ হইতে পারে না। এই প্রকার প্রিয় বাক্যও যদি সত্য, হিত ও অনুদ্বৈগকরণ না হয়, তাহা হইলেও তাহা বাহ্য তপস্তার মধ্যে পরিগণিত হইবে না। সুতরাং এই বাচিক তপস্তাও সহজ নহে।

আধ্যাত্মিকভাবে—ক্রিয়ার পর অবস্থার পর অবস্থার—যোগী যে সকল বাক্য উচ্চারণ করেন, তাহা কখনও অসত্য হয় না, তাহা ভগবতের কল্যাণজনক ও প্রিয় হইবেই।

স্বাধ্যায়—স্ব=জীব, অধি=অতিক্রম করা, ই=গমন করা, যখন জীবিতাব অতিক্রম

(মানসিক তপস্তা)

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ ।

ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে ॥ ১৬

করিয়া গমন করে। এ অবস্থা কখন হয়, যখন বুদ্ধির সহিত ক্রিয়া করা হইয়া থাকে। এই গমন করে কে? মূল্যায়নস্থিত কুণ্ডলিনী কৌবশক্তি। কোথায় গমন করেন?—পরম'নন্দরূপ সহস্রারে শিবের সহিত স্থিতি হয়। “ই” শব্দের অর্থ—“ইকারং পরমেশানী স্বয়ং কুণ্ডলী মূর্ত্তিমান্ ।”

ইহাকে বাহ্য তপস্তা কেন বলা হইল? বাক্যের মূল প্রাণ, প্রাণ স্থির হইলে আপনা-আপনি বাক্য সংঘম হইয়া যায়। সাধক ইহাতে সংযতবাক্ হন বলিয়া ইহাকে বাহ্য তপস্তাও বলা যাইতে পারে ॥ ১৫

অর্থঃ। মনঃপ্রসাদঃ (মনের প্রশস্ততা) সৌম্যত্বং (সৌম্যভাব—যুগ্মের প্রশস্ততা প্রভৃতি দ্বারা অন্তঃকরণের যে বৃত্তিবিশেষ অন্তর্নিহিত হয় তাহাই “সৌম্যত্ব”—শব্দ) মৌনং (মৌনভাব) আত্মবিনিগ্রহঃ (অন্তঃকরণের নিরোধ) ভাবসংশুদ্ধিঃ (অকপটতা—স্বয়ংস্বত্ব) ইতি এতৎ (এইগুলি) মানসং তপঃ (মানসিক তপস্তা) উচ্যতে (বলা হয়) ॥ ১৬

শ্রীধর। মানসং তপ আহ—মনঃপ্রসাদ ইতি। মনঃপ্রসাদঃ—স্বচ্ছতা, সৌম্যত্ব—অকুরতা, মৌনং—মুনের্ভাবঃ মননমিতার্থঃ, আত্মবিনিগ্রহঃ—বিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহারঃ, ভাবসংশুদ্ধিঃ—ব্যবহারে মায়াবাহিত্যম্। ইত্যেতন্মানসং তপঃ ॥ ১৬

বঙ্গানুবাদ। [মানসিক তপস্তার বিষয় বলিতেছেন]—মনঃপ্রসাদ- মনের স্বচ্ছতা। সৌম্যত্ব—অকুরতা। মৌনং অর্থে মূনির ভাব অর্থাৎ মনন। আত্মবিনিগ্রহ—মনের বিনিগ্রহ অর্থাৎ বিষয় হইতে প্রত্যাহার। ভাবসংশুদ্ধি—ব্যবহারে মায়াবাহিত্য। এই গুলিকেই মানস-তপঃ বলে ॥ ১৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ক্রিয়ার পর অবস্থায় থেকে মনের সমুদ্রভা লাভ করা, স্থির থাকা, তৃপ্ত থাকা, আত্মায় ব্রহ্মেতে থাকা আটকিয়ে, এই মানস তপস্তা।—ক্রিয়ার শেষে এক প্রকার মানসিক প্রশস্ততা আসে, তখন কোন উৎসে থাকে না। মানসিক তপস্তার সর্বোচ্চ ফলই মনন বা ধ্যান—যখন কোন সঙ্কল্প থাকে না। “সৌম্যত্ব”—ইহা মনের প্রশস্ততা চিত্ত, বাহ্য সাধকের মুখ দেখিলেই বুঝা যায়, একটা অপূর্ণ স্থিরতা, মন তখন আত্মার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সংলীন হইয়া যায়। “মৌনং”—ক্রিয়ার পর-অবস্থা প্রাপ্তি হেতু মনের ক্রিয়া থাকে না। ‘এই মন এত স্থির হইয়া যায় যে, যখন যোগী ব্যাখিত হন তখনও তাঁহার নেশার ঘোর কাটে না, মন থাকিলেও মনের বিচেষ্টা থাকে না। বাহ্যের বিবিধ উৎপাতেও সে স্থির ভাবের বিচ্যুতি ঘটে না। “আত্মবিনিগ্রহঃ”—চিত্তবৃত্তির নিরোধ, আপনাতে আপনি থাকা বা ব্রহ্মেতে আটকিয়া থাকা। “ভাবসংশুদ্ধিঃ”—যে অবস্থায় মনের অন্তর্ভুক্ত থাকে না, মনের অন্তর্ভুক্তিই তো নত বিকার, সেই বিকার থাকে না, তখন কাহাকেও পর বা শত্রু মনে হয় না। কাম, ক্রোধ, লোভ না থাকায় তখন চিত্তে কোন ছল বা কপট ভাব থাকে না।

(সাধিক তপস্তা)

অকুরা পরয়া তপ্তং তপস্তত্রিবিধং নরৈঃ ।

অকলাকাম্মিভিরু ত্তৈঃ সাধিকং পরিচক্ষতে ॥ ১৭

(বাহ্য তপ)

সংকারমানপূজার্থং তপো দত্তেন চৈব যৎ ।

ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্বম ॥ ১৮

ইহাই আত্মভাবে প্রতিষ্ঠা। ইন্দ্রিয়ের বিষয় হেঁচিয়া মন আর তখন উল্লফন করে না। এই গুলিকে মানস তপস্তা বলা হয়। এখানে কেবল মনকে আটকাইবার বিষয়ই বিশেষ ভাবে আলোচনীয় ॥ ১৬

অর্থঃ। অকুরা কাম্মিভিঃ (ফলাকাম্মিভিঃ) যুক্তৈঃ (যোগযুক্ত বা একাগ্রচিত্ত) নরৈঃ (ব্যক্তিগণ কর্তৃক) পরয়া শ্রদ্ধয়া (পরম শ্রদ্ধার সহিত) তপ্তং (অগ্নিষ্ঠিত) তৎ (পূর্বোক্ত) ত্রিবিধং তপঃ (ত্রিবিধ তপস্তাকে) সাধিকং পরিচক্ষতে (সাধিক বলা হয়) ॥ ১৭

শ্রীধর। তত্ত্বং শরীরবানোতিঃ নির্মল্যং ত্রিবিধং তপো দর্শিতং । তপ্ত ত্রিবিধস্তাপি তপসঃ সাধিকাদিভেদেন ত্রৈবিধ্যমাহ—শ্রদ্ধয়েত্যাতি জিহ্বাঃ । তৎ ত্রিবিধমপি তপঃ শ্রেষ্ঠয়া শ্রদ্ধয়া ফলাকাম্মিভিঃ যুক্তৈঃ—একাগ্রচিত্তৈঃ নরৈঃ তপ্তং তৎ সাধিকং কথয়ন্তি ॥ ১৭

বঙ্গানুবাদ। [এইরূপে শরীর, বাক্য ও মনের দ্বারা সম্পাদিত ত্রিবিধ তপস্তা দর্শিত হইল। সেই ত্রিবিধ তপস্তাও সাধিকাদি-ভেদে যে ত্রিবিধ, তাহাই তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন]—উত্তম শ্রদ্ধার দ্বারা ফলাকাম্মিভিঃ ও একাগ্রচিত্ত মনুষ্য কর্তৃক সম্পাদিত যে ত্রিবিধ তপস্তা তাহাকে সাধিক বলে ॥ ১৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এইরূপ ক্রিয়ার পর-অবস্থায় ব্রহ্মেতে থেকে ফলাকাম্মিভিঃ রহিত হইয়া আটকিয়া থাকার নাম সাধিক।—কায়িক, বাচিক ও মানসিক তপস্তার কথা বলিয়া গুণভেদে যে তাহাও তিন প্রকার, সেই কথা এইবার বলিতেছেন। পূর্বোক্ত তপস্তাগুলি কখন সাধিক হয়? যখন চিত্ত ফলাকাম্মিভিঃ হইয়া, তখনই তাহা একাগ্র হইয়া নিরোধমুখা হয়, তাই শিষ্টব্যক্তিগণ ইহাকে সাধিক তপস্তা বলিয়া থাকেন। প্রাণায়ামই পরম তপস্তা, এই প্রাণায়াম করিতে করিতে সাধকের প্রাণ দ্বারা যখন সূক্ষ্মায় চালিত হয়, তখনই চিত্ত একাগ্র হয় ও বহিঃশাস ক্ষীণ হইতে হইতে সম্পূর্ণ রূপ হইয়া যায়, ইহাই ফলাকাম্মিভিঃ সাধিক তপস্যার লক্ষণ ॥ ১৭

অর্থঃ। সংকারমানপূজার্থং (সংকার, মান ও পূজা পাইবার জন্য) দত্তেন চ (এবং দত্তপূর্বক) যৎ এব তপঃ (যে তপস্তাই) ক্রিয়তে (অগ্নিষ্ঠিত হয়) তৎ ইহ (তাহা) ইহলোক-সর্বত্র অর্থাৎ ইহলোকে ফলপ্রসূ (হুতবৎ) চলম্ (অল্পকালস্থায়ী), [অতএব] অধ্বমং (অনিশ্চিত) [তৎ তপসঃ—সেই তপস্তা] রাজসং প্রোক্তং (রাজস বলিয়া কথিত হয়) ॥ ১৮

শ্রীধর। রাজসমাহ—সংকারেতি। সংকারঃ—সাধুকারঃ—সাধুরয়মিতি তাপসোহয়ম্

(তামসিক তপস্তা)

মূঢ়গ্রাহণোক্তনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ ।

পরসোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ১৯

ইত্যাদি বাক্যপূজা। মানঃ—অভ্যুত্থানোত্তিষ্ঠনাদিঃ দৈহিকী পূজা। পূজা—অর্থলাভাদিঃ।
এতদর্থং দণ্ডেন চ যৎ তপঃ ক্রিয়তে। অতএব চলং—অনিয়তং, অগ্রবন্ধ—ক্ষণিকং। যৎ
এবমুত্থং তপঃ তদ্বিহ রাজসং প্রোক্তম্ ॥ ১৮

বঙ্গানুবাদ। [রাজস তপস্তার কথা বলিতেছেন]—সৎকার অর্থাৎ সাধুকার। লোককে
বলিবে ইনি সাধু, ইনি তাপস—ইত্যাদি বাক্য পূজা। মান - অভ্যুত্থান ও অভিবাধনাদির
দ্বারা যে পূজা, তাহাই দৈহিক পূজা। পূজা—অর্থলাভাদি; অর্থদানের দ্বারা যে সম্মান
প্রদর্শন। এই নিমিত্ত—অর্থাৎ “সৎকার”, “মান”, “পূজা” লাভ করিবার জন্য এবং
দণ্ডসহকারে যে তপস্তা করা হয়, ইহলোকে সে তপস্তার ফল অনিয়ত বা অনিত্য, এবং
অগ্রব অর্থাৎ ক্ষণিক—এবমুত্থং যে তপস্তা—তাহা এখানে রাজস বলিয়া কথিত ॥ ১৮

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ভাল কর্ম, মান এবং পূজার নিমিত্ত দণ্ডপূর্বক তপস্যায় যে
করে সে রাজসিক—লোককে আমাকে তপস্বী বলিবে, নিরাহারী বলিবে, আমাকে দেখিলে
সকলে অভিবাধন করিবে, কাহারও গৃহে বাইলে সে গাত্রোত্থান করিয়া সম্মান করিবে,
উত্তম ভোজন দিবে, বহু দান করিবে—এই সব আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া দণ্ডের সহিত যে
তপস্তার অহুষ্ঠান তাহা রাজস তপস্তা। এই সব তপস্তার ফল অনিয়ত অর্থাৎ চঞ্চল, কোন
স্থায়ী ফল লাভ হয় না, এবং সেই অল্প ফল লাভও যে ক্রব তাহাও নহে; বিনা সাধনায়
কাকি দিয়া যে নাম কেনা হয়, তাহা আর কতকাল থাকে? অতএব এইরূপ লোক-দেখানো
তপস্তাতে লৌকিক ও পারমাণবিক উভয় প্রকার ফল হইতেই শেষ পর্যন্ত বঞ্চিত হইতে হয় ॥ ১৮

অন্বয়। মূঢ়গ্রাহণ (অবিবেক বশে) আত্মনঃ-পীড়য়া (নিজেকে কষ্ট দিয়া—দেহেহিং-
গ্রাহির পীড়া দ্বারা) পরস্ত উৎসাদনার্থং বা (অথবা পরের বিনাশার্থ) যৎ তপঃ ক্রিয়তে (যে
তপস্তা করা হয়) তৎ তামসম্ উদাহৃতম্ (তাহাকে তামস তপস্তা বলে) ॥ ১৯

শ্রীধর। তামসং তপ আহ—মুঢ়েতি। মূঢ়গ্রাহণ—অবিবেকরূপে দুরাগ্রাহেণ আত্মনঃ
পীড়য়া যৎ তপঃ ক্রিয়তে। পরসোৎসাদনার্থং বা—অন্তস্ত বিনাশার্থম্ অভিচাররূপং, তৎ
তামসম্ উদাহৃতম্—কথিতম্ ॥ ১৯

বঙ্গানুবাদ। [তামস তপস্তার কথা বলিতেছেন]—অবিবেকরূপে দুরাগ্রাহে অবলম্বন
করিয়া আত্মপীড়ার অথবা অন্তের বিনাশার্থ অভিচাররূপ যে তপস্তা করা হয় তাহা তামস
বলিয়া কথিত ॥ ১৯

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—আপনাকে ক্রেশ দিবে (উপবাসাদি) যে কর্ম করে—
পরের (না) ভাল হওয়ার নিমিত্ত—তাহাকে তামস ক্রিয়া কহে।—যেমন পর দ্বারা
রাজ্য হইবার আশায় পঞ্চতপাদি ক্রেশসাধ্য তপস্তার অহুষ্ঠান, অথবা কোন ব্যক্তির সর্বনাশ
সাধন বা তাহার বিনাশের জন্য মারণ। উচ্চাটন প্রভৃতির যে অহুষ্ঠান, তাহাই তামসিক

দানের প্রকার ভেদ

(সাত্ত্বিক দান)

দাতব্যমিতি যদানং দীয়তে হনুপকারিণে ।

দেশে কালে চ পাত্রে চ তদানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥ ২০

তপস্তা। আমরা একজন তপস্বীর কথা শুনিয়াছিলাম যিনি কোন লোককে নিরর্থক করিবেন
বলিয়া শীতকালে সারা দিনরাত জলে পড়িয়া থাকিতেন, এবং গ্রীষ্মের সময় সূর্যের দিকে
যুগ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন। এইরূপ মনোবৃত্তিই দুষ্টবীর। আমার কথা শুনিল না বা
আমার মনের মত হইল না বলিয়া যে একজনের সর্বনাশ করিতে হইবে তাহার মানে কি?
আমি অন্তের নিকট হইতে কিরূপ আচরণ প্রত্যাশা করি সেই কথা মনে রাখিয়া আমাকেও
লোকের সহিত তদ্রূপ ব্যবহার করিতে হইবে। তবে কখনও কখনও লোককে দণ্ড দেওয়া
আবশ্যক হয়, তাহাতে দণ্ডনীর লোকের এবং অন্তেরও প্রকৃত উপকার হয়। কখনও কখনও
কথিরা ক্রোধ করিয়া দুষ্ট লোককে সেই ভাবে অভিশাপ দিতেন। তাহাতে কিন্তু দুষ্কর্মকারীর
পাপের দণ্ড হইত এবং ভবিষ্যতের জন্য তাহাকে এবং অন্তকে সচেতন করিয়া রাখিত।
যেমন দক্ষের প্রতি ও ইন্দ্রের প্রতি দুর্জাসার অভিশাপ। ইহা তামসিকতা নহে, এরূপ ক্রোধ
লোকস্থিতির জন্য প্রয়োজন ॥ ১৯

অন্বয়। দাতব্যম্ ইতি (দেওয়া কর্তব্য এই বুদ্ধিতে; অনুপকারিণে (প্রতাপকারে
অসমর্থ ব্যক্তিকে) দেশে (উপযুক্ত স্থানে, বা পুণ্য দেশে) কালে চ (পুণ্য কালে বা উপযুক্ত
সময়ে) পাত্রে চ (ব্রাহ্মণাদি সংপাত্রে অথবা উপযুক্ত পাত্রে) যৎ দানং দীয়তে (যে দান দেওয়া
হয়) তৎ দানং (সেই দান সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ (সাত্ত্বিক বলিয়া উক্ত হয়) ॥ ২০

শ্রীধর। পূর্ণ প্রতিজ্ঞাতমেব দানস্ত ত্রৈবিধ্যমাহ দাতব্যমিতি। দাতব্যমেব ইত্যেব
নিশ্চয়েন বদানং দীয়তে অনুপকারিণে—প্রতাপকারাসমর্থায়। দেশে কুরুক্ষেত্রাদৌ।
কালে—গ্রহণাদৌ। পাত্রে চেতি দেশকাল-সাহচর্যাৎ সপ্তমী প্রযুক্তা। পাত্রে—পাত্রভূতায়
তপঃ-শ্রুতাদি সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ্য ইত্যর্থঃ। যঃ পাত্র ইতি চতুর্থী এত্বেবা। পাত্রে ইতি তৃত্বন্তঃ;
রক্ষায় ইত্যর্থঃ। স হি সর্বথাৎ আপদগণাৎ দাতারং পাতীতি পাত্ৰা, তস্মৈ যদেবভূতং দানং
তৎ সাত্ত্বিকম্ ॥ ২০

বঙ্গানুবাদ। [পূর্ণ প্রতিজ্ঞাত দানের ত্রৈবিধ্য বলিতেছেন]—“দান করাই উচিত
এই রূপ নিশ্চয় পূর্বক উপকারে অসমর্থ ব্যক্তির উদ্দেশ্যে যে দান দেওয়া যায়—কুরুক্ষেত্র
প্রভৃতি পুণ্যদেশে, গ্রহণাদি সময়ে এবং পাত্রভূত তপস্তা ও ক্রতিসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে যে দান
করা যায়—তাহাই সাত্ত্বিক দান। [“পাত্রে”—এইস্থলে চতুর্থী না হইয়া বিবক্ষায় সপ্তমী।
পাত্র শব্দে পাত্রভূত অর্থাৎ তপস্তা ও ক্রতিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ। অথবা পাত্রে—এই পদেও চতুর্থী
(পাত্র শব্দেও চতুর্থীর একবচন)। তাহার অর্থ রক্ষকের উদ্দেশ্যে। সর্ব প্রকার আপদগণ
হইতে দাতাকে যে রক্ষা করে, তাহার উদ্দেশ্যে যে দান তাহা সাত্ত্বিক” ॥ ২০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—যাহার দ্বারায় কোন উপকার হবে না, দেশ কাল পাত্র
৩৫

(রাজসিক দান)

যত্ন প্রত্যাশারার্থং ফলমুদ্दिष्ट বা পুনঃ ।

দীয়তে চ পরিক্রিষ্টং তদানং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ২১

অর্থঃ । যৎ তু (বাহ্য) প্রত্যাশারার্থং (প্রত্যাশারের আশায়) বা পুনঃ ফলম্ উদ্दिष्ट (অথবা ফললাভের জন্য) পরিক্রিষ্টং চ (এবং ক্রেশের সহিত বা অনিচ্ছার সহিত) দীয়তে (দেওয়া হয়) তৎ দানং (সেই দানকে) রাজসং স্মৃতম্ (রাজস বলা হয়) ॥ ২১

শ্রীধর । রাজসং দানমাহ—যত্ন ইতি । কালাস্তরে অয়ং মাং প্রত্যাশকরিয়াতি ইত্যেবং অর্থঃ—ফলং বা স্বর্গাদিকম্ উদ্दिष्ट যৎ পুনঃ দানং দীয়তে, পরিক্রিষ্টং—চিন্তাক্রেশযুক্তং যথা ভবতি এবত্নতঃ যৎ তৎ দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ২১

বঙ্গানুবাদ । [রাজস দানের কথা বলিতেছেন]—কালান্তরে এই ব্যক্তি আমার উপকার করিবে এই আশায়, অথবা স্বর্গাদি ফললাভের উদ্দেশ্যে ক্রেশযুক্ত চিন্তে যে দান তাহাকে রাজস দান বলে ॥ ২১

অধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—প্রত্যাশকের নিমিত্তে ও ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত দেওয়ার সময় ক্রেশে দেয়—তাহার নাম রাজসিক দান—যেমন বেষ্ঠাকে দেওয়া ।—যে দান প্রত্যাশারের আশায় করা যায়, যে সময় বিশেষে এ লোক আমার অনেক কাজে লাগিবে, অথবা ফললাভের আশায়—এই যে দান করিতেছি এতদ্বারা আমার স্বর্গস্থত ভোগ হইবে, অথবা খেদযুক্ত হইয়া যে দান কবা যায়—বাহ্য দিয়া মনে অহুতাপ হয়, একবারে এত দান না করিলেই হইত এইরূপ খেদযুক্ত চিন্তে যে দান তাহাকে রাজস দান বলে । সাধন

উপত্র বিদ্যুত হইয়া বাহ্যতে সে সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়া যাঁতে পারে—দুঃখী জীবকে সেই পথ দেখাইয়া দেওয়া, তাহাকে সেই পথে পরিচালনা করা, তাহার সেই অনন্ত জীবন ব্যাপি অভাব মিটাইবার পন্থা ধরাইয়া দেওয়াই সর্বশ্রেষ্ঠ দান । বাসনার নিদাক্ষণ সুবাক নিবৃত্ত কবিবার উপায় যিনি বলিয়া দেন তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা । তাঁহার দানই সর্বোচ্চ দান বলিয়া স্থিরা বিশ্বাস করিতেন—তাই তাহার সেই দান কোথায় করিতে হইবে, সে দান গ্রহণের কেই বা যোগ্য পাত্র, এবং দাতাই বা সেই দান কি ভাবে দান কবিবেন—তাহাই এই জ্ঞানময়ী গীতাগ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে । ব্রাহ্মণকে সেই জন্ত সর্বশ্রেষ্ঠ পাত্র বলিয়াছেন কেন ? কারণ ব্রাহ্মণ ব্রহ্মবিদ্যার ভাগ্যবান । যিনি জগৎ-দ্বীপের ভবরোগেব জালা নিবারণের অমোঘ ঔষধ দানে সমর্থ, তিনি কিন্তু আপনার গ্রাসজ্বাদনের জন্ত উদাসীন, তিনি লেভশূন্য, পরহিতব্রতে সমর্পিত জীবন—শান্ত ভাদ্র মধ্যাহ্নাদিগকেই তো দানেব যোগ্যতম পাত্র বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । বিস্ত্র হায়, এখন আর এ দেশে সে ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না । বর্তমান যুগে ধারাবা সন্ধ্যাদপ-বিবিক্ত, সংঘমহীন, তপস্তাহীন, অবিরান্, কপটচাণী নামমাত্র ব্রাহ্মণ—সেই পাত্র ব্যক্তিকে দান কবা তো পাত্র নিষেধ করিয়াছেন । অত্রিন্যহিতায় আছে—

“অত্রত্যাগদায়ান্য যত্র ভৈক্ষ্যচরা দিভাঃ ।

তং গ্রামং দণ্ডয়েদ্রাজা চৌবতন্ত্রপ্রদং বৈঃ ॥”

যাহা ব্রহ্মচর্য ও বিদ্যাশিক্ষা না কবে, তাহাদিগকে যে গ্রামের লোক ভোজন করায়, রাজা সেই গ্রামেব চৌবোচিত দণ্ড বিধান কবিবেন ।

মা—বিধানের প্রাপ্য অন্ন অবিদ্যান ও অতপক লোকে গ্রহণ কবিলে তাহার পবনাপহরণ হয় এবং বাহ্যার তাহাদিগকে দান কবে তাহা দেই অন্য কাণ্ডেব প্রত্নমতাতা বলিয়া তাগরাও দণ্ডা ।]

(তামসিক দান)

অদেশকালে যদানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে ।

অসংকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২

দ্বিবার মত উপযুক্ত পাত্র নহে, কিন্তু তাহাকে সাধনা দিলে আনন্দের দলে একজন ধনীলোক হইবে, তাহার দ্বাৰা ভবিষ্যতে আমাদেব অনেক উপকারের সম্ভাবনা আছে, এই সব হিসাব করিয়া যে মনুষ্যযুক্ত ব্যক্তিকে সাধনা দেওয়া হয় তাহা রাজস দান । পাত্রের বিচার না করিয়া সাধন দেওয়া হইল, পরে তাহার ব্যবহারে অহুতপ্ত হইয়াও তাহাকে যে কিছু কিছু শিক্ষা দেওয়া হয়—সে সবই বাজসিক দান ॥ ২১

অর্থঃ । অদেশকালে (অপূণ্য দেশে বা অচিহ্নানে এবং অশৌচাদি সময়ে; অপূণ্য-জনক কালে) অপাত্রেভ্যঃ চ (ও মূর্খ, তন্দ্র ও নটাদি অপাত্রে) অসংকৃতং (সংস্কার না করিয়া); অবজ্ঞাতং (অবজ্ঞাপূর্বক) যদানং দীয়তে (যে দান দেওয়া হয়) তৎ (তাহা) তামসং উদাহৃতম্ (তামস বলিয়া কথিত হয়) ॥ ২২

শ্রীধর । তামসং দানমাহ—অদেশেতি । অদেশে—অচিহ্নানে । অকালে—অশৌচাদি সময়ে । অপাত্রেভ্যঃ—বিটনটনর্ভকাদিভ্যঃ, যদানং দীয়তে । দেশকালপাত্রসম্পাত্তবপি অসংকৃতং—পাদপ্রক্ষালনাদি সংস্কারশূন্য । অবজ্ঞাতং তিরস্কারযুক্তম্ । এবত্নতঃ দানং তামসং উদাহৃতম্—কথিতম্ ॥ ২২

বঙ্গানুবাদ । [তামসিক দানের কথা বলিতেছেন]—অচিহ্নানে, অশৌচাদি সময়ে, অপাত্র অর্থাৎ বিট (বুট) নট (জায়াজীবী বা বর্ণসঙ্কর) এবং নর্ভকাদিকে যে দান করা যায় তাহা তামস দান । দেশ, কাল ও সৎপাত্রের সম্পত্তি অর্থাৎ প্রাপ্তি সম্ভাবনা নহেও (উপযুক্ত দেশ কাল পাত্র হইলেও) অসংকৃত অর্থাৎ পাদপ্রক্ষালনাদি সংস্কারশূন্য ও অবজ্ঞাত অর্থাৎ তিরস্কারযুক্ত ভাবে যে দান দেওয়া হয়—এরূপ দান তামস বলিয়া কথিত ॥ ২২

অধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—দেশ কাল না বিবেচনা করিয়া অপাত্রেতে ও কুকর্ষ করিতে দেয়—তাহা তামস দান—যেমন কাছাকে মেয়ে ফেলবার নিমিত্ত টাকা দেওয়া ।—দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা করিয়াই দান করিতে হয়, কিন্তু যে দান অপূণ্য দেশে, অকালে এবং মূর্খ, তন্দ্র ও নটাদিকে দেওয়া হয় তাহা তামসিক দান । যদি বা উপযুক্ত দেশ ও উপযুক্ত পাত্রও হয় কিন্তু দাতা যদি দানগ্রহণকারীকে প্রিয়সম্ভাষণ বা সমাদর না করিয়া অবজ্ঞাপূর্বক (ব্যাটা) দেহি দেহি করে জালিয়ে খেলে, দাতা ওকে একটা টাকা ফেলে দান করিয়া থাকেন—তাহা তামসিক দান । সেইজন্য শাস্ত্রে বলিয়াছেন—“শ্রদ্ধয়া দেয়ম্ অশ্রদ্ধয়া ন দেবম্” । গ্রহীতার অনামর্থ্য জামিষাও চরিত্রহীন, হুট লোকদিগকে যে সাধন দেওয়া হয়, তাহাতে তাহার কোন উপকার তো হয়ই না, বরং সে সাধন লইয়া সকলের সমক্ষে সাধনাকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলে, ঠাট্টা বিক্রপ করিলে, তাহার অকল্যাণই হয় । তাহার তামস প্রকৃতির লোক, তাহাদিগকে ক্রিয়া দিতে নাই ॥ ২২

(ব্রহ্মের নির্দেশ)

ও তৎসদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ ।

ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতা পুরা ॥ ২৩

অন্থয় । ও তৎসৎ ইতি (এই) ত্রিবিধ (তিন প্রকার) ব্রহ্মণঃ নির্দেশঃ (ব্রহ্মের নাম) স্মৃতঃ (শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে) । তেন (তদ্বারা) ব্রাহ্মণাঃ (ব্রাহ্মণাদিত্রিবিধ) বেদাঃ চ (বেদ সকল) যজ্ঞাঃ চ (ও যজ্ঞসমূহ) পুরা (পূর্বকালে বা সৃষ্টির আদিতে) বিহিতাঃ (সৃষ্ট হইয়াছে) ॥ ২৩

অন্থয় । নহু এব বিচার্যমাণে সৰ্বমপি যজ্ঞতপোহানাদি বাঙ্গলতামসপ্রায়মেবেতি বার্থো যজ্ঞাদি প্রয়াসঃ ইত্যাদিশ্চ তথাবিধস্তাপি সাত্ত্বিকতাপাদনপ্রকারং দর্শয়িতুমাহ—ওমিতি । ও তৎসৎ ইতি ত্রিবিধো ব্রহ্মণঃ—পরমাত্মনো, নির্দেশো—নাম ব্যপদেশঃ, স্মৃতঃ শ্রুতিঃ । তত্র তাবৎ “ওমিতি ত্রিবিধব্রহ্ম, ইত্যাদি শ্রুতিপ্রসিদ্ধরোমিতি ব্রহ্মণো নাম । দ্বগৎ-কারণত্বেন অতিপ্রসিদ্ধত্বাৎ, পরস্কাছাচ্চ । তৎ শব্দোহপি ব্রহ্মণো নাম । পরমার্থস্বসাদুত্বপ্রশস্ত্যাদিভিঃ সং-শব্দোহপি ব্রহ্মণো নাম । “সদেব সৌম্যোদমগ্র আদীৎ” ইত্যাদি শ্রুতেষু । অয়ং ত্রিবিধোহপি নামনির্দেশো বিগুণমপি সগুণীকর্তৃ সমর্থ ইত্যাদয়েন স্তোতি । তেন ত্রিবিধেন ব্রহ্মণো নির্দেশেন ব্রাহ্মণাশ্চ, বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ পুরা—সৃষ্টাদি বিহিতাঃ—বিহিতা নিশ্চিতাঃ সগুণীকৃত্য ইতি বা । যদা যজ্ঞায়ং ত্রিবিধো নির্দেশঃ তেন পরমাত্মনা ব্রাহ্মণাদয়ঃ পবিত্রতম্যঃ সৃষ্টাঃ । তস্মাৎ তস্তায়ং ত্রিবিধো নির্দেশঃ অতি প্রশস্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৩

বজ্রানুবাদ । [যদি বল একরূপ বিচারে তো সমস্ত যজ্ঞ তপস্তা দানাদিই ব্রাহ্মণ বা তামস-প্রায় হয়, অতএব ব্রাহ্মণের ক্ষত্র প্রয়াস বুঝা—এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে তথাপি ইহিলেও, তাহাদের সাত্ত্বিকত্ব উপপাদনোপায় অর্থাৎ তাহাদিগকে সাত্ত্বিক করিবার উপায় আছে । সেই উপায় কি, তাহাই বলিতেছেন]—ও তৎসৎ এই তিনটি পরমাত্মার নির্দেশ অর্থাৎ নাম দ্বারা ব্যপদেশ শিষ্টগুণকর্তৃক কথিত । তন্মধ্যে অকার, উকার, মকার স্বরূপ এই যে ত্রিবিধ ওঁকার ইহা শ্রুতিপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মের নাম । দ্বগৎকারণ বলিয়া অতি প্রসিদ্ধ এবং অবিদ্বান ব্যক্তিদিগের পরোক্ষ(অগোচর) বলিয়া “তৎ” শব্দও ব্রহ্মেরই নাম; আর, পরমার্থ সত্তা সাধু ও প্রশস্ততা প্রভৃতি বুঝায় বলিয়া “সৎ” শব্দও ব্রহ্মেরই নাম । শ্রুতিতেও আছে—“সদেব সৌম্যোদমগ্র আদীৎ” এই ত্রিবিধ নাম বিগুণকেও সগুণ করিতে পারে—এইরূপে প্রশংসা করিতেছেন । এই ত্রিবিধ ব্রহ্মের নাম দ্বারা সৃষ্টির আদিতে ব্রাহ্মণ, বেদ এবং যজ্ঞ বিহিত অর্থাৎ বিহিতা কর্তৃক নিশ্চিত বা গুণাধিত করা হইয়াছে । অথবা যে ব্রহ্মের এই ত্রিবিধ নাম সেই পরমাত্মা কর্তৃক পবিত্রতম ব্রাহ্মণাদি সৃষ্ট হইয়াছেন । অতএব ব্রহ্মের এই যে ত্রিবিধ নির্দেশ বা নাম ইহা অতি প্রশস্ত ॥ ২৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ও তৎসৎ ব্রহ্মের তিন স্থান—১) ওঁ কার—এই শরীর রূপ; (২) তৎ—কূটস্থ; (৩) সৎ—ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মেতে যিনি থাকিবেন, তিনি শরীরে প্রথমে ক্রিয়া করিবেন যাহার নাম যজ্ঞ । দান—ক্রিয়া করিবার

পর মন দেওয়া অর্থাৎ স্থিতি তপোব্রহ্মেতে থাকা । ক্রিয়া করিলেই ব্রাহ্মণ । ক্রিয়া করিয়া স্থিতি হইলেই জানিতে পারে, সেই জানার নাম বেদ—আত্মা ব্রহ্মেতে লীন করার নাম যজ্ঞ অর্থাৎ ক্রিয়ার পর স্থিতি ।—শাস্ত্রবিহিত কর্মাদির অনুষ্ঠানেও সময়ে সময়ে অন্ধহানি হইতে দেখা যায়, সেইজন্য ভগবান বৈগুণ্য নিবারণের উপায় বলিয়া দিতেছেন । প্রকৃত সত্য আচ্ছাদিত রহিয়াছে । সত্যকে অন্বেষণ করিতে গিয়া বাহা অন্ত্য, প্রমাদবশতঃ অনেক সময় তাহাকেই সত্য বলিয়া মনে হয়, এ ভুল বাহাতে না হয় ভগবান তাহারই উপায় নির্দেশ করিতেছেন । স্বর্গের আলোকসম্পাতে যেমন সমুদায় বস্তুই আলোকিত হইয়া উঠে তদ্রূপ আত্মার প্রকাশ এই ঘেহেন্দ্রিয়-মনোবুদ্ধির মধ্যে প্রকাশ আনিয়া দিয়াছে, তাহাতেই এই সকলকে চৈতন্যযুক্ত বলিয়া ভ্রম হয় । এখন বতদিন এই চৈতন্যতাকে ধরিতে পারা না যায় ততদিন আত্মতত্ত্ব বস্তুকেই আত্মা বলিয়া ভ্রম হয় । প্রকাশের আধার অনন্ত, কিন্তু প্রকাশময় বস্তুটি এক অধিতীয় । বাহা কিছু ইন্দ্রিয়গোচর হইতেছে এবং অতীন্দ্রিয় সত্তা সমস্তই তাহার রূপ বা প্রকাশ । “সর্বস্বরূপে সর্বশে সর্ব-শক্তিসমধিতে” বাহা কিছু সব তিনি, আবার সকলের নিয়ন্তাও তিনি । সমস্ত নামরূপের মধ্যে তাহার স্বরূপ সত্তা যে আবৃত হইয়া রহিয়াছে সেই আবরণ উন্মোচিত না হইলে তিনি যে কি তাহা কেহ বুঝিতে পারে না । “হিরণ্যয়েন পাত্রেণ সত্যাত্মাপিহিতং মুখম্ । তৎ অং পূর্যমপ্যবু সত্য বর্ণায় দৃষ্টয়ে” —সত্যের অংশদ্বারা আমার জ্ঞানলাভের দ্রব্য হে পরমাত্মন “তৎ” সেই চৈতন্য-স্বরূপকে উন্মুক্ত অর্থাৎ প্রকাশ কর । সেই সত্য-স্বরূপ ব্রহ্মের চৈতন্যভাব জ্যোতির্গুণ পাত্রে দ্বারা আবৃত রহিয়াছে ।—ইহাই প্রাচীনতম জ্ঞানীদিগের প্রাণের ঐকান্তিক কামনা । যেই পরমধামের চতুর্দিকে যে জ্যোতিঃপুঞ্জ বিচ্ছুরিত হইতেছে সেই জ্যোতিঃ বাহ্যের তত্ত্বতা, তাহাকেই যেন সেই জ্যোতিঃ বা বিবিধ প্রকাশ আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, যাহাতে তন্মধ্যে চৈতন্য-স্বরূপকে বুঝিতে পারা যায়—হে প্রভু, সেই আবরণ তুমি উন্মোচন করিয়া দাও । জ্যোতির জড়ত্ব ঘূচিবা তাহাতে যেন চৈতনের স্ফূরণ হয়, জ্যোতির অন্তরালে যে তুমিই রহিয়াছ ইহা যেন আমি বুঝিতে পারি । এখানে সেই উপায়টি ভক্ত সুহৃদ ভগবান ভক্তকে বলিয়া দিতেছেন । ভগবান যেন ভক্তকে বলিতেছেন—আকার অন্বেষণে তোমাকে এখানে ওখানে কোথাও যাইতে হইবে না । তোমার মধ্যেই আমি রহিয়াছি, তাহায়া দেখ তুমি আমারই প্রকাশমাত্র । একবার দিব্য চক্ষু উন্মীলন করিয়া বুঝিয়া লও যে সাধ্য ও সাধক একই বস্তু । তুমি যে শরীরটাকে দিনরাত বহন করিয়া বেড়াইতেছ বুঝিতে পার কি সে কাহার চৈতন্যে চৈতন্যযুক্ত হইয়া রহিয়াছে ? এই স্থূল শরীর, ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতি সবই তো জড় । তাহারাই চৈতনের ভাণ করিয়া তোমার সম্মুখে আনিয়া দাঁড়াইয়াছে, তুমি তাহাদিগকে দেখিতে দেখিতে-বিমুগ্ধ হইয়া গিয়াছ, তাহারা যে জড় তাহা ভুলিয়া গিয়াছ । এখন যদি সেই জড়াতীতকে অনুভব করিতে চাও তবে এই দেহসমষ্টিকে ভুলিবার চেষ্টা কর । প্রথমে এই স্থূল দেহের অন্তঃস্থিত সূক্ষ্মদেহকে বুঝিবার চেষ্টা কর, তন্মধ্যে আরও সূক্ষ্ম কারণ দেহ রহিয়াছে তাহাকে অন্বেষণ কর । একসঙ্গে সব জড়াজড় করিয়া আছে,—এই ত্রিবিধ দেহকে বুঝিলেই তন্মধ্যে দেহাতীত ব্রহ্ম চৈতন্যকেও বুঝিতে পারিবে । সেই ব্রহ্মের প্রকাশ

স্থান তিনটি, তন্মধ্যে স্থূলতম প্রকাশ যন্মধ্যে হয় তাহাই এই ত্রিধেহের সমষ্টি বা ত্রিপুর—
উহাই ঐ শব্দবাচ্য। ঔকার ব্রহ্মের নাম; নামের দ্বারা যেমন ব্যক্তির পরিচয় হয়, এই ত্রিবিধ
শরীরস্থ চৈতন্য এই ত্রিবিধ শরীর দ্বারাই আমাদের নিকট পরিচিত, তাই ইহাও ব্রহ্মের
নাম। ইহাই ব্রহ্মের কার্যরূপ নাম, উহার কারণরূপ নামও আছে। গৃহমধ্যস্থ পুরুষকে
দেখিতে হইলে যেমন সেই গৃহে পৌঁছিয়া তাহাকে দেখিতে হয়, তদ্রূপ এই ত্রিপুর-সম্বিত
দেখটিকেই তাঁহাকে অবেষণ করিবার প্রথম অবলম্বন রূপে গ্রহণ করিতে হইবে। সাধনার
জ্ঞান তাই এই দেখটিকেই প্রথম ও প্রধান অবলম্বন রূপে গ্রহণ করিতে পারিলে তবে সত্য
বস্তুর সন্ধান পাওয়া যাইবে। এই ত্রিপুর দেখই ঔকারের রূপ বা ঔকারময়। ঔ—অ+উ+ম্।
অ=স্থূলশরীর, উ=সূক্ষ্মশরীর, ম্=কারণ শরীর। এই তিনের বিকাশ নাম বিন্দু কলা
হইতে। “৬” যাহার সঙ্কেত। এই নাড়, বিন্দু, কলা তিনে মিলিয়াই প্রকৃতিরূপিনী ভগবাতার
রূপ—ইহাই আত্মশক্তি বিষ্ণুরূপা—ইহাই চিৎস জীবের সংজ্ঞা—ইহাই “তৎ” শব্দপের
বাচ্য—ইহাই “এতত্ত্ব মহতো ভূতত্ত্ব নাম”—ইহাই কারণ সৃষ্টি। “সৎ”—ব্রহ্ম, ইহা কার্য
কারণের অতীত সত্তাময় ভাব—“সদেব সৌম্যোদয়মগ্র আনীৎ”—সৃষ্টিব পূর্বে এই “সৎ”ই
ছিলেন, ইনিই তুরীয় ব্রহ্ম বা ক্রিয়ার পর অবস্থা দ্বারা উপলক্ষিত।

এই ব্রহ্মই জীবের চরম গতি, “নিধানং বীজমব্যয়ম্”। এই ব্রহ্মভাবকে অমুভব করিতে
হইলে প্রথমে এই শরীরে ক্রিয়া করিতে হইবে। সে ক্রিয়া যদিও আপনা-আপনিই হইতেছে,
সাধককে কেবল তাহার পানে লক্ষ্য রাখিতে হইবে—উহারই নাম যজ্ঞ। সাধন দ্বারা প্রাণকে
জ্বরে রাখিতে পারিলে আত্মজ্যোতিঃ দর্শন হয়, সেই জ্যোতিঃতে স্থির লক্ষ্য হইতে হইতো
যেয় বস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। তদ্বারা প্রজালিত আত্মসংযমরূপ অগ্নি দ্বারা প্রাণের হিরাবস্থ
হয় এবং ইন্দ্রিয়বৃষ্টির তিরোধান হয়। ইহাই আত্মসংযমরূপ যোগাগিতে প্রাণের হোম
করা। “ব্রহ্মার্ণো হুয়তে প্রাণো হোমকশ্চ তদুচ্চতে”। এই যজ্ঞ যিনি করেন তিনিই
সামগ্নিক ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণই বেদপারগ অর্থাৎ সর্কবিষয়-বেত্তা। ক্রিয়া দ্বারা স্থিতিপদ লাভ
হইলেই সেই সাধকের কোন কিছুই অজানা থাকে না—এই জ্ঞান বা জ্ঞানের নামই বেদ।
সাধক এইরূপ যজ্ঞমুগ্ধান দ্বারা প্রথমে ভূতময় প্রাকৃত দেহকে ব্রহ্মে লীন করিবেন।
ভূতশুদ্ধি ইহাকেই বলে।

“ও তৎ সৎ” এই তিনটিই পরমাঙ্গার নাম। এই তিন স্থানে তাঁহাকে বুঝিতে হয়।
ব্রহ্মাদি দেহগুলিকে যখন জানিলাম তখন “ও”কারকে বুঝা হইল, পরে যখন কূটস্থ
চৈতন্যকে সাধক বুঝিতে পারিলেন তখন তাঁহার “তৎ” নামটি বুঝা হইল। “তৎ”কে
বুঝিলেই সাধক ব্রাহ্মণ্য লাভ করিবেন। পরে আরও উচ্চ অবস্থায় পৌঁছিয়া সাধক যখন
বামরূপয় জগৎ ও আপনারও নামরূপ বিস্তৃত হইলেন, যখন তাঁহাতে ভূবিয়া “অন্তঃ গচ্ছন্তি
নামরূপে বিহায়”—সব এক হইয়া গেল, তখনই তাহা গুণাতীত অবস্থা, ইহাই “সৎ” শব্দের
বাচ্যার্থ। এই তিনে মিলিয়াই সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হয়। যখন তিনের প্রকাশ থাকে না
কেবল একমাত্র “সৎ” থাকেন, তখন সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কিছুই থাকে না। এই তিন

দ্বাবে মিলিয়া ব্রহ্মের লীলা-বিলাস হইয়া থাকে। সেই জ্ঞান এই তিনটি নামের মত পাবন আর
কিছুই নাই। ব্রহ্মের এই পবিত্র নামত্রয় দ্বারাই তাঁহার স্বরূপ অবগত হওয়া যায়।

এই ব্রহ্ম নাম অবাচ্য হইলেও ইহার এক প্রকার ধ্বনি আছে যাহা প্রাকৃত শব্দের মত না
হইলেও উহা এক প্রকার ধ্বনি। উহা অশব্দের শব্দ। উহা কর্ণরঞ্জে শুনা না গেলেও শুনার
মত অমুভব হয়। এই প্রণবের ত্রিমাাত্রা স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণরূপ, এবং প্রণবের অর্ধমাাত্রা (৬)
বিশ্বকারণ অনাত্ম প্রকৃতিরূপ, তদুর্দ্ধে পরব্যোম বিদেহরূপ অবাচ্যাবস্থা। প্রণবের সপ্তা-
বয়বের মধ্যে মূলধার হইতে বিশুদ্ধ (গুহ্যদ্বার হইতে কণ্ঠ) পর্য্যন্ত প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র।
আজ্ঞাচক্র বা ভ্রমর্য প্রকৃতিপুরুষের মিলন স্থান, এবং ব্রহ্মরূপ বা সহস্রার নিরঞ্জন ব্রহ্মের
স্থান। উহা কৈবল্য জ্ঞান দেহেরও উর্দ্ধে অতিতুর্ধ্যাবস্থা বা বিদেহতাব।

এই প্রণবকে জানিতে হইলে বা ইহার স্বল্প পবিত্র ধ্বনির সহিত পরিচিত হইতে হইলে
সাধন শিক্ষার প্রয়োজন হয়। জীবজন্মে যেমন অবিশ্রান্ত “লব ডপ” শব্দ হইতেছে যাহা
জীবজন্ম হইতে সর্কাদে রক্তস্রোত বা জীবনধারাকে পরিচালনা করিতেছে, বাহিরের
ঐ শব্দটি সেই আত্যন্তরিক শব্দের অতিব্যক্তি মাত্র। এই শব্দ হইতেই সমুদায় সৃষ্টি
হইয়াছে, এইজন্ম এই শব্দটি সমস্ত সৃষ্টি পদার্থের জন্মের সহিত গাঁথা আছে। বিধের
সমুদায় চেতন ও অচেতন পদার্থের মধ্য হইতে এই স্বর নিয়ত নির্গত হইতেছে, একটু
স্থির হইলেই তাহা শুনা যায়। প্রত্যেকে জীব জন্মের এই “লব ডপ” শব্দ যেমন তাহার
জীবনের পরিচায়ক, তদ্রূপ বিশ্বরূপ ভগবানের জন্মের মধ্যে যে একটি অক্ষুট কোমল নাড়
স্বল্পত্ব হইতেছে তাহাই প্রণবধ্বনি। মানুষের জন্মের “লব ডপ” শব্দ যেমন তাহার
জীবনের পরিচায়ক, এই প্রণবধ্বনি বা নাড়ও তদ্রূপ বিশ্বাত্মার অস্তিত্বের আরক চিহ্ন।
এইজন্ম প্রণবই সকল মন্ত্রের প্রধান মন্ত্র, এবং এই মন্ত্রের সাহায্যেই বহুজীব ভবাবুধি উত্তীর্ণ
হইয়া যায়। যোগীরা এই প্রণবধ্বনিকেই ত্রীকৃষ্ণের বাণীধ্বনি বলেন। বিশ্বাত্মা পরমেশ্বরের
জন্মের সহিত যে সাধকের জন্ম মিলিয়া যায় সেই সাধক তখন প্রণবধ্বনি শুনিয়া কৃতকৃত্য
হইয়া থাকেন, এবং এই ধ্বনির সাহায্যেই সাধক নিজের জন্মকে পরমাত্মার জন্মের সহিত
মিলাইয়া দিতে পারেন। প্রণবকে এইজন্মই ঈশ্বরের বাচক বলা হইয়াছে। আমার
জন্মের অক্ষুট ধ্বনির (লব ডপ) বাচ্য বা সঙ্কেত যেমন আমার জীবন বা “আমি”, তদ্রূপ
প্রণবধ্বনির বাচ্য সেই মহাচৈতন্য অবাচ্য, বিদেহ বা অগোচর ব্রহ্ম। ইহাই একমাত্র “সৎ”
পদার্থ, আর যাহা কিছু সমস্তই “অসৎ” বা পরিণামী। বিশ্বপ্রাণ ঔকারকে যে বুঝিতে
পারে সে আপনাকে সর্কভূতস্থ বলিয়াও বুঝিতে পারে। এই জ্ঞানই প্রকৃতপক্ষে বেদ জ্ঞান।
এই জ্ঞান যাহার হয় তাহারই মন্ত্র চৈতন্য হয়। তখন “ও তৎ সৎ” ভাবনা করিলেই
একেবারে বিশ্বাত্মাকে মনে পড়ে, আর অভিমানযুক্ত “আমির” কর্তৃত্বাভিমান লোপ পায়।
তখনই চরমচর সমস্ত বিশ্বই বাসুদেবময় বলিয়া বোধ হয়।

তিনটি স্থানে ব্রহ্মের পরিচয় হয়, সেইজন্ম ব্রহ্ম নিরীশেষ হইলেও এ তিনটি স্থানে জ্ঞান-
প্রকাশেরও পার্থক্য হওয়ায় যেন ঐ তিনটি স্থানে নিরীশেষ ভাব ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে।
এইজন্ম ভক্তনশীল ব্যক্তির ভগবানকে “ত্রিভঙ্গ ভক্তিরূপে” অমুভব করিয়া থাকেন। জ্ঞান

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃ ক্রিয়াঃ ।

প্রবর্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥ ২৪

স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থায় একই চৈতন্যের তিনটি বিভাব বৃত্তিতে পারা যায়। আবার বিলোম ভাবে দেখিলে (১) “সৎ” স্বরূপ ব্রহ্ম বাহ্য নীত্য সত্য অবিনাশী সত্তা তাহাই পরে নামিতে নামিতে বা কৃষ্টিতে কৃষ্টিতে (২) “তৎ” অর্থাৎ কূটস্থ জ্যোতিঃ, পরে আরও স্থূলভাবে (৩) এই ত্রিপুর সমন্বিত দেহ বা প্রকৃতি। সেই জ্ঞান ব্রহ্মকে জানিতে হইলে এই দৃষ্ট স্থূল শরীরকে অবলম্বন করিয়াই সাধন আরম্ভ করিতে হইবে। নিবিড় ভাবে সাধন করিতে করিতে যত মন ডুবিয়া যাইবে ততই স্থূলভাবের বিস্তৃতি হইবে। ইহাই নিজেকে ধোওয়া বা তাঁহার চরণে আশ্রয়সমর্পণ। এই আশ্রয়সমর্পণ যত নিবিড়ভাবে হইতে থাকিবে ততই তপোলোকে কূটস্থ অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রে স্থিতিলাভ হইবে। এই স্থিতির পরিমাণের নানাবিকার ঘাই হইতে নির্ণয় হয়। যাহাদের এই স্থিতি অত্যন্ত অধিক তাহারা ই সাধন রাজ্যের ব্রাহ্মণ। এইরূপ ব্রাহ্মণের পদ-রঞ্জেই মানবের ভবব্যাদির শান্তি হইয়া থাকে ॥ ২৩

অনুয়। তস্মাৎ (সেই জ্ঞান) ওঁ ইতি (ওঁ এই শব্দ) উদাহৃত্য (উচ্চারণ করিয়া) ব্রহ্মবাদিনাং (ব্রহ্মবিদগণের) বিধানোক্তাঃ (শাস্ত্রোক্ত) যজ্ঞদান তপঃ ক্রিয়াঃ (যজ্ঞ, দান ও তপসাদি কৰ্ম) সততং (নিরন্তর) প্রবর্তন্তে (অনুষ্ঠিত হয়) ॥ ২৪

শ্রীধর। ইমানীং প্রত্যেকং ওক্তারাদীনাম্ প্রাশস্ত্যং দর্শয়ন্তু ওক্তারস্ত ভবেদাহ—তস্মাদিতি। যস্মাদেবং ব্রহ্মণো নির্দেশঃ প্রাপ্তঃ তস্মাৎ ওমিতি উদাহৃত্য—উচ্চারণকৃত্য বেদবাদিনাং যজ্ঞাচ্চাঃ শাস্ত্রোক্তাঃ ক্রিয়াঃ সততং—সর্বদা অঙ্গবৈকল্যেইপি প্রকর্ষণে বর্তন্তে। সগুণা ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৪

বঙ্গানুবাদ। [এক্ষণে ওক্তারাদির (শব্দজয়ের) প্রত্যেকের প্রাশস্ত্য প্রদর্শন করাইবেন, তজ্জ্ঞ প্রথমে ওক্তারের (প্রাশস্ত্য) বলিতেছেন]—যেহেতু ব্রহ্মের এইরূপ নির্দেশ প্রাপ্ত অতএব “ওঁ” এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া বেদবাদীদিগের যজ্ঞাদি শাস্ত্রোক্ত যে ক্রিয়া তাহার অঙ্গ বৈকল্য হইলেও প্রকৃষ্ট হয় [অর্থাৎ ওক্তার উচ্চারণের ফলে সগুণ হয়] ॥ ২৪

‘আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—তন্নিমিত্তে এই শরীরের দ্বারাই আত্মক্রিয়া করিলেই দেখিতে পাইবে যে আত্মা ক্রিয়ার পর আপনা-আপনি স্থির হইয়াছে এবং আত্মা ব্রহ্মতে অর্পণ হইয়াছে ও স্বরূপে কূটস্থ ব্রহ্মে অবস্থিত হইয়াছে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা—এই রকম কৰ্ম্মেতে ব্রহ্মবাদী যাঁরা সদা সর্বদা থাকেন—ব্রহ্মবিবরক আলোচনা এবং ধ্যান ধারণা করিয়া যাহারা ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করিয়াছেন সেই সকল আত্মাবিষয় পুরুষেরা বলিয়া থাকেন—এই শরীরের দ্বারাই আত্মক্রিয়া করিবে। বাস্তবিক “ওঁ” শব্দ মুখে বলিলে শুধু হইবে না, ইহা অমুচ্চাৰ্য্য, এই ওঁকার যেশরীর-দ্বয়ে তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। তৎসম্বন্ধীয় একটি সাধন আছে যে সাধন অভ্যাসের ফলে শরীরে যে অহং জ্ঞান আছে তাহা তিরোহিত হয়। ক্রিয়াভ্যাস করিলেই আপনা-আপনি সেই স্থিরাবস্থা আনে, যেখানে আমিও থাকে না, আমারও থাকে না; তখনই সমস্ত কৰ্ম্ম

(তৎ)

তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ ।

দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাজ্জিহতিঃ ॥ ২৫

ব্রহ্মার্ণ হইও স্বরূপে অবস্থান হয়। তাহাদেরই যজ্ঞ-দানাদি অর্থাৎ ক্রিয়া করা ও ক্রিয়া-দানও এই অবস্থায় হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা হয় এবং সেই যজ্ঞ-দানাদি যে কি তাহা ভাষায় বুঝাইবার উপায় নাই। এই ওক্তারের সাধনাই কিন্তু ব্রহ্মে সর্বকৰ্ম্ম-সমর্পণের উপায় ॥ ২৪

অনুয়। তৎ ইতি (তৎ এই শব্দ) [উচ্চারণ করিয়া] ফলম্ অনভিসন্ধায় ফলের অভিসন্ধি না করিয়া) মোক্ষকাজ্জিহতিঃ (মুমুকুগণ কর্তৃক) বিবিধাঃ (অনেক প্রকার) যজ্ঞতপঃ ক্রিয়াঃ দানক্রিয়া চ (যজ্ঞক্রিয়া তপঃক্রিয়া ও দানক্রিয়া) ক্রিয়ন্তে (করা হয়) ॥ ২৫

শ্রীধর। দ্বিতীয় নাম প্রস্তোতি—তদিত্যি। উদাহৃত্য ইতি পূর্বস্ত অমুচ্চাঃ তদিত্যি উদাহৃত্য—উচ্চারণ শুদ্ধিচিহ্নঃ মোক্ষকাজ্জিহতিঃ পুরুষৈঃ, ফলাভিসন্ধিম্ অকৃৎষা যজ্ঞাচ্চাঃ ক্রিয়াঃ ক্রিয়ন্তে। অতঃ চিত্তশোধনদ্বাৰেণ ফলসম্বন্ধভাষ্যেনৈব মুমুকুতসংপাদকভাৱং তচ্ছব্দনির্দেশঃ প্রশস্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৫

বঙ্গানুবাদ। [দ্বিতীয় নামের (তৎ) প্রশংসা করিতেছেন]—পূর্বলোকস্থ “উদাহৃত্য” এই শব্দের সহিত “তৎ” পদের অমুচ্চ অর্থাৎ অবয়ব। “তৎ” এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া শুদ্ধচিত্ত মোক্ষকাজ্জী পুরুষগণ ফলাভিসন্ধান না করিয়া যজ্ঞাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠান করেন। অতএব চিত্তশোধনদ্বাৰে (চিত্ত শুদ্ধি দ্বারা) ফলসম্বন্ধভাষ্য দ্বারা মুমুকুতসংপাদকভাৱং হেতু (অর্থাৎ ফল-কামনা ত্যাগ মোক্ষসাধক বলিয়া এই জ্ঞান) “তৎ” শব্দ নির্দেশ প্রশস্ত ॥ ২৫

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—কূটস্থেতে প্রবেশ করে ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত ক্রিয়া করে—ব্রহ্মে থেকে—দান ও বিবিধ রকমের অনুষ্ঠান মোক্ষকাজ্জী লোক—ক্রিয়া করেন। মোক্ষার্থীরা কূটস্থে লক্ষ্য রাখিয়া বাস্তবী ক্রিয়া করিয়া থাকেন, তাহার ফলে তাহারা কূটস্থে প্রবেশ করিয়া ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া যান। যেমন তিলের মধ্যে তৈল, ধূবির মধ্যে ঘৃত, কাঠের মধ্যে অগ্নি, সব বর্ষণে হয়, তজ্জন ক্রিয়া করিলে আত্মার প্রকাশ অমুভব হয়। যে আত্মাকে এমনই দেখিবার, বুঝিবার উপায় নাই, আছেন কি নাই এ সম্বন্ধে হইতে পারে, কিন্তু তিনি যে আছেন, তিনি যে সত্য তাহাই কূটস্থে থাকিতে থাকিতে অমুভব হয় যেন তাহাকে দেখিতেছি। তিনি সর্বব্যাপী সেই আত্মাকে জানার মূল কিন্তু কূটস্থে থাকে। ব্রহ্ম অচিন্ত্য শক্তি প্রভাবে হৃদয়স্থ হইয়াও আনবাগ-কেশ পর্যন্ত সকল শরীরে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। সেই অণুব্রূণ আত্মাই অস্তের শরীরেও ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। এইজ্ঞ অণুবে যাহা মনে করে, নিঃস মনে তাহা অমুভব হইতে পারে। সাধারণতঃ অমুভব হয় না মন চঞ্চল বলিয়া। চঞ্চল মন স্থির হইলে সকলকার মনের ভাব নিজের মনের মধ্যে বৃত্তিতে পারা যায়। কিন্তু এ অবস্থাতে জানা, না জানা, এ মন সে মন প্রভৃতি পৃথক্ ভাবে রহিয়াছে, কিন্তু ওক্তার ক্রিয়ার দ্বারা পরব্যোমতে আয়োজন করিতে পারিলে আর নানাত্বের উপলব্ধি নাই, কারণ সেখানে ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই ॥ ২৫

(সৎ)

সত্তাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুক্ত্যতে ।

প্রশস্তে কর্ণণি তথা সচ্ছন্দঃ পার্থ যুক্ত্যতে ॥ ২৬

অর্থঃ । পার্থ (হে পার্থ !) সত্তাবে (সৎ অর্থাৎ আছে, অস্তিত্ব বুঝাইতে) সাধুভাবে চ (সাধুভাবে বা শ্রেষ্ঠ অর্থ বুঝাইতে) সৎ ইতি এতৎ (সৎ এই শব্দ) প্রযুক্ত্যতে (প্রযুক্ত হয়) তথা (এবং) প্রশস্তে কর্ণণি (মাদ্গলিক কর্ণেও) সচ্ছন্দঃ (“সৎ” শব্দটি) যুক্ত্যতে (ব্যবহৃত হয়) ॥ ২৬

ত্রিধর । সচ্ছন্দঃ প্রশস্ত্যমাহ—সত্তাব ইতি স্নাত্যাম্ । সত্তাবে—অস্তিত্বে ; দেবদত্তত্ব পুত্রাদিকম্ অস্তি ইতি অগ্নিরর্থে সাধুভাবে চ সাধুত্বে দেবদত্তত্ব পুত্রাদি শ্রেষ্ঠমিতি অগ্নিরর্থে, সদিত্যেতৎ পদং প্রযুক্ত্যতে । প্রশস্তে—মাদ্গলিকে বিবাহাহি কর্ণণি চ সদিৎ কর্ণেতি সচ্ছন্দো যুক্ত্যতে—প্রযুক্ত্যতে সচ্ছন্দ ইতি বা ॥ ২৬

বঙ্গানুবাদ । [দুইটি শ্লোক দ্বারা “সৎ” শব্দের প্রশস্ত্য বলিতেছেন]—“সত্তাব” অর্থাৎ (১) অস্তিত্ব অর্থে—যেমন দেবদত্তের পুত্র আছে এইরূপ অর্থে এবং (২) “সাধুভাবে” অর্থাৎ সাধুত্বে যেমন দেবদত্তের পুত্রাদি শ্রেষ্ঠ, এইরূপ অর্থে “সৎ” এই শব্দের প্রয়োগ হয়, এবং (৩) প্রশস্ত কর্ণ অর্থাৎ মাদ্গলিক বিবাহাহি কর্ণেও এই কর্ণটি সৎ—এইরূপ “সৎ” শব্দের প্রয়োগ সঙ্গত হয় ॥ ২৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সত্তাবে ব্রহ্মতেই কেবল থাকে আটকিয়ে—সাধন ক্রিয়াতেই অনবরত লেগে থাকেন তাঁহারাই ক্রিয়া করিতে করিতে ব্রহ্মতে লীন হন । প্রকৃষ্টরূপে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থেকে শান্তিপদ অবস্থায় কর্ণ তার কিছুই থাকে না তন্নিমিত্তে ব্রহ্ম ব্যতীত অজ্ঞ কিছুতেই মনকে যোজন্য করেন না ।—সত্তাব অর্থাৎ ব্রহ্মতাব । সত্তাব তখনই হয় যখন সাধক কেবল ব্রহ্মতেই আটকিয়া থাকেন, অর্থাৎ সাধারণতঃ সকলের মন সংসারেই আটকাইয়া থাকে, যাহাদের মন কেবল ব্রহ্মতেই আটকাইয়া থাকে তাহাই “সত্তাব” বা কৈবল্যস্থিতি । তখন ব্রহ্ম ব্যতীত অজ্ঞ কোন বিষয়ের প্রত্যয় উদ্ভিত হয় না । সাধুতাব—সাধন ক্রিয়াতে যিনি অবিরত লাগিয়া আছেন, তাঁহার কার্ণই সাধু অর্থাৎ সম্যক্, আর সমস্ত কর্ণই বিষম কর্ণ, এ সমস্ত কর্ণ দ্বারা সমতা আসিতে পারে না । কেবল প্রাণকর্মে যিনি লাগিয়া থাকেন, তাঁহারই চিত্ত ব্রহ্মলীন হয় । এইজন্য এই প্রাণকর্মেও “সৎ” বলা হয় । যাহা ব্রহ্মপ্রাপ্তির কারণ তাহা ব্রহ্মই । প্রশস্ত কর্ণও সৎ কর্ণ । প্র + শন্ + ত = প্রশস্ত, অর্থাৎ প্রশংসার যোগ্য কর্ণ, মঙ্গলকর্ণ । সর্বাংগে মঙ্গলজনক ও প্রশংসাযোগ্য অবস্থা কি ? ক্রিয়ার পর অবস্থা, কারণ এই অবস্থায় চিত্তে সংসারতাব থাকে না, ইহাই পরম শান্তির অবস্থা সুতরাং এতদপেক্ষা আর কিছুই মঙ্গলজনক হইতে পারে না । লোকে সংসারের তাপে প্রভু হইয়া কেবলই হাহাকার করিতেছে । চিত্তের বহুমুখী বৃত্তিই সংসার, কিন্তু এ অবস্থায় আর বৃত্তি থাকে না, কোন কর্ণও থাকে না, এই নৈকর্ষ্য অবস্থায় মন কেবল ব্রহ্মেই যুক্ত হইয়া থাকে, অজ্ঞ কোন বিষয়ে মন লাগিতেই পারে

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে ।

কর্ষচৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥ ২৭

না । উহাই শান্তিপদ, সেখানে প্রাণ স্থির হুতরাং কর্ণ কিছুই থাকে না । এই পরম মঙ্গল-ময় অবস্থা যে সাধনার দ্বারা প্রাপ্তি হয় সেই কর্ণও সৎ এবং বাহ্যরা এই কর্ণে সর্বাংগ লাগিয়া থাকেন তাঁহারাই সাধু ॥ ২৬

অর্থঃ । যজ্ঞে, তপসি দানে চ (যজ্ঞে, তপস্যায় এবং দানে) স্থিতিঃ (যে নিষ্ঠা বা তৎপরতা) সৎ ইতি চ (সৎ বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হয়) । তদর্থীয়ং (তদর্থের উদ্দেশ্যে) কর্ণ চ এব (কর্ণও) সৎ ইতি এব অভিধীয়তে (সৎ বলিয়া কথিত হয়) ॥ ২৭

ত্রিধর । কর্ণ—যজ্ঞ ইতি । যজ্ঞাধিষু বা স্থিতিঃ—তাৎপর্যেণ অবস্থানং তদপি সন্নিহিত্যচ্যতে । যজ্ঞ চেৎ নামদ্রব্যং স এব পরমাত্মা—অর্থঃ—ফলং যজ্ঞ তৎ তদর্থং কর্ণ—পূজোপহার-গৃহাঙ্গন-পরিমার্জনাং উপলপন-রক্ষ-মাদ্গলিকাদিক্রিয়া, তৎ সিদ্ধয়ে যদন্তং কর্ণ ক্রিয়তে উচ্চান-শালিক্ষেত্র-ধনামার্জনাং বিধয়ঃ তৎ কর্ণ তদর্থীয়ঃ । তচ্চ অতিব্যবহিতমপি সন্নিহিত্যেণ অভিধীয়তে । যজ্ঞাৎ এবং অতিপ্রশস্তম্ এতন্মাত্রং, তন্মাত্রং এতৎ সর্বকর্ষসাদ্-গুণার্থং কীর্তয়েৎ ইতি তাৎপর্যার্থঃ । অত্র চ অর্থবাদানুপপত্ত্যা বিধিঃ কল্প্যতে । “বিধেয়ং স্তুষতে বস্ত” ইতি জ্ঞায়াৎ । অপরে তু “প্রবর্তন্তে বিধানোক্তাঃ” “ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাজ্জিভিঃ” ইত্যাদি বর্তমানোপদেশঃ “নমিষো যজতি” ইত্যাদিবৎ বিধিতয়া পরিণমনীয় ইত্যাহঃ । তত্ত “সত্তাবে সাধুভাবে চ” ইত্যাদিষু প্রাপ্ত্যর্থত্বাৎ ন সংগচ্ছত ইতি পূর্বোক্তক্রমেণ বিধিকল্পনৈব জ্ঞায়সী ॥ ২৭

বঙ্গানুবাদ । [আরও বলিতেছেন]—যজ্ঞাদিতে অর্থাৎ যজ্ঞ, তপস্যায় ও দানে যে স্থিতি—তাৎপর্য বা তৎপরতারূপে যে অবস্থান তাহাও সৎ বলিয়া কথিত হয় । ‘ও তৎ সৎ’ এই নামদ্রব্য যাহার তিনিই পরমাত্মা সেই পরমাত্মা হন “অর্থ” অর্থাৎ ফল যাহার এইরূপ যে কর্ণ—তাহাই তদর্থীয় কর্ণ—যেমন পূজোপহার-সংগ্রহ, দেবগৃহাঙ্গন-পরিমার্জন, উপলপন, চিত্তবিচিক্রকার্য ইত্যাদি যে মাদ্গলিক কর্ণ, এবং এই কর্ণগুলি সিদ্ধির অজ্ঞ করা হয় যে পুষ্পোচ্চান, ধাতুক্ষেত্র ও ধনামার্জনাদিরূপ যে কর্ণ—তাহাই তদর্থীয় কর্ণ ; সেই কর্ণ অতিশয় ব্যবহিত হইলেও “সৎ” এই বলিয়া কথিত হয় । যেহেতু (ও তৎ সৎ) এই নামদ্রব্য অতি প্রশস্ত, সেইজন্য সকল কার্য সদ্গুণযুক্ত করিতে হইলে এই নামদ্রব্য কীর্তন করাই বিধি—ইহাই তাৎপর্যার্থ । এ বিষয়ে অর্থবাদ (প্রশংসা) অনুপপত্তি হয় বলিয়া বিধি কল্পনাই উচিত । কারণ “বিধেয়ং স্তুষতে বস্ত”—বিধেয় বস্তুর স্তুব করা হইয়া থাকে, এই জ্ঞানানুসারে বিধি-কল্পনাই উচিত । অপর কেহ বলিয়া থাকেন যে “প্রবর্তন্তে বিধানোক্তাঃ” “ক্রিয়ন্তে মোক্ষ-কাজ্জিভিঃ” ইত্যাদি শ্লোকোক্ত বর্তমান উপদেশ “নমিষো যজতি” ইত্যাদিব জ্ঞানবিধিরূপে পরিণমনীয় অর্থাৎ বিধিরূপে পরিণত করিতে হইবে । তাহা কিন্তু সঙ্গত নহে, কারণ “সত্তাবে সাধুভাবে” এই শ্লোকে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া পূর্বোক্তরূপে বিধি-কল্পনাই শ্রেষ্ঠ । অর্থাৎ “ও তৎ সৎ” কেবল অর্থবাদ বা প্রশংসার ব্যবহার হয় না, উহা কীর্তন করাই বিধি ॥ ২৭

অশ্রদ্ধয়া হৃতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতং চ যৎ ।

অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ শ্রেত্য নো ইহ ॥ ২৮

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসম্প্রদায়নিবন্ধে ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে

শ্রদ্ধাভ্রয়বিভাগযোগো নাম সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ক্রিয়া করবার সময় কুটস্থেতে থাকিবার সময় এবং ক্রিয়াদানের সময় কেবল ব্রহ্মেরই উদ্দেশ্য থাকে, এইরূপ স্থিতি সদাসর্বদা ব্রহ্মেতে, যিনি আছেন, থাকেন, তিনিই ব্রহ্মস্বরূপ, কিম্বা কোন কর্ম অর্থাৎ বাহ্য কিছু করেন সেই ব্রহ্মকেই দেখিয় এবং তাঁহারই উদ্দেশ্য করিয়া ব্রহ্মই সর্বদা স্থির বুদ্ধিতে রাখেন অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা।—“যজ্ঞে অর্থাৎ যজ্ঞকর্মে যে স্থিতি, তপস্তাতে যে স্থিতি এবং দানে যে স্থিতি তাহারই নাম সৎ । এবং তদর্থীয় অর্থাৎ ‘ও তৎ সৎ’ এই ‘তিনি’ শব্দের প্রতিপাত্ত যে পরমেশ্বর তাঁহার জ্ঞান যে যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম অনুষ্ঠিত হয় সেই সকল কর্মই তদর্থীয় কর্ম । সৎ এই শব্দটির দ্বারা তদর্থীয় কর্মও অভিহিত হইয়া থাকে”—(শঙ্কর ভাবের অনুবাদ) । যজ্ঞ অর্থাৎ ক্রিয়া করিয়া যে স্থিতি, বা তপোলোক বা কুটস্থে থাকিবার সময় যে স্থিতি, এবং ক্রিয়াদানের সময় অর্থাৎ জীবের কল্যাণার্থ ক্রিয়ার উপদেশের সময় যে স্থিতি—ইহা সমস্তই সৎভাব বা ব্রহ্মভাব । কারণ যিনি সদাসর্বদা ব্রহ্মেতে থাকেন তিনি যে অবস্থাতেই থাকুন, সেই অবস্থায় তাঁহার সমস্ত কার্যই ব্রহ্মোদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয় । তিনি ব্রহ্মকে বাদ দিয়া কিছু করিতে পারেন না । সকল কাজেই তাঁহার ব্রহ্মোদ্দেশ্য থাকে । যেমন নদী মস্তকে কলসী বাঁধিয়া হাবতাব দেখায়, নৃত্য-গীতাদি করে, কিন্তু তাহার লক্ষ্য থাকে সেই কলসীর উপর, তজ্জপ যোগীর ক্রিয়াজনিত যে স্থির বুদ্ধি হয়, সেই স্থির বুদ্ধিতে একমাত্র ব্রহ্মই লক্ষিত হন, ততরাং তাঁহার সমস্ত কার্যাদি স্থিরবুদ্ধিতে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া হয় । ইহা কিরূপে হয় তাহা যোগী ব্যতীত কেহ বুঝিতে পারিবেন না । খাস সুষুম্নায় প্রবাহিত না হইয়া যে ইড়া-পিঙ্গলায় চলিতেছে ইহাই কর্মের বৈগুণ্য । এই বৈগুণ্য সমাধানার্থ ‘ও তৎ সৎ’ এর উপদেশ । ইহা মুখে উচ্চারণ করাও পুণ্যজনক, কারণ ঐ মন্ত্র সত্যভাব ও সাধুভাবের উদ্দীপক । কিন্তু কেবল ঐ মন্ত্র উচ্চারণ মাত্র করিয়াই চূর্ণ থাকিলে উহার সম্যক ফল লাভ হইবে না । সেইজন্ত আত্মহিতেন্দ্রু ব্যক্তি ইহার প্রকৃত রহস্ত ও সাধনা সৎজ্ঞান নিকট জানিয়া লইবেন । এই সাধনে যিনি সিদ্ধ তিনিই প্রকৃত সাধু, তাঁহার বুদ্ধিসর্বদা স্থির ও ব্রহ্মে যুক্ত থাকে, স্ততরাং তিনি যাহা করেন বা বলেন সমস্ত কার্যই তিনি ব্রহ্মে তন্ময় হইয়াই করেন, তাই তাঁহার কর্ম ও বাক্য সমস্তই ব্রহ্মভাবময় ও সত্যময় হইয়া থাকে ॥ ২৭

অনুয় । অশ্রদ্ধয়া (অশ্রদ্ধাসহকারে) হৃতং (হোম), দত্তং (দান), তপঃ তপঃ (অনুষ্ঠিত তপস্তা), যৎ চ কৃতং (এবং অস্ত বাহ্য করা হয় [সে সমস্ত] অসৎ ইতি উচ্যতে (অসৎ কথিত হয়), পার্থ (হে পার্থ !) তৎ (তাহা) ন ইহ (না ইহলোকে) ন শ্রেত্য (না পরলোকে) [কোন কাজে লাগে] ॥ ২৮

শ্রীধর । ইদানীং সর্বকর্মসু অদ্বৈত প্রবৃত্ত্যর্থম্ অশ্রদ্ধয়া কৃতং সর্বং নিন্দতি—অশ্রদ্ধয়েতি । অশ্রদ্ধয়া হৃতং—হবনং, দত্তং—দানং, তপঃ তপঃ—নিবর্তিতং । যজ্ঞ—অন্যদপি কৃতং কর্ম । তৎ সর্বং অসৎ ইত্যুচ্যতে । যতঃ তৎ শ্রেত্য—লোকান্তরে ন ফলতি বিগুণত্বাৎ । নো ইহ—ন চাশ্মিন্ লোকে ফলতি অশ্রদ্ধায়ত্বাৎ ॥ ২৮

ব্রহ্মসমোদয়ীং তাত্কা শ্রদ্ধাং সন্তময়ীং শ্রিতঃ ।

তত্ত্বজ্ঞানেহধিকারী শ্রাদ্ধিতি সপ্তদশে স্থিতম্ ॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতায়াম্ ভগবদ্গীতাটীকায়াম্ সুবোধিতাঃ

শ্রদ্ধাভ্রয়বিভাগযোগো নাম সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥

ব্রহ্মসমোদয় । [ইদানীং সকল কর্মে প্রবৃত্তি উৎপাদনের জন্ত অশ্রদ্ধাকৃত কর্মসকলের নিন্দা করিতেছেন]—অশ্রদ্ধাপূর্বক হৃত অর্থাৎ হবন, দত্ত অর্থাৎ দান, আর তপ্ত অর্থাৎ সম্পাদিত তপস্তা ; আর অস্ত বাহ্য কৃত কর্ম, সে সমস্তই অসৎ বলিয়া কথিত হয় । যেহেতু তাহা অদ্বৈতগুণ্য হেতু লোকান্তরে কোন ফল দান করে না, আর অশ্রদ্ধার হেতু ইহলোকেও ফলপ্রদ হয় না ॥ ২৮

শ্রীধরস্বামী এই অধ্যায়ের সারার্থ বলিতেছেন—

ব্রহ্মসমোদয়ী শ্রদ্ধা ত্যাগ করিয়া সন্তময়ী শ্রদ্ধার যে আশ্রয় করে, সে তত্ত্বজ্ঞানে অধিকারী হয়—ইহাই সপ্তদশ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে ॥

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ব্রহ্মেতে না থেকে হোম করা (উৎকারের ক্রিয়া), দেওয়া (ক্রিয়া দান), তপস্তা করা অর্থাৎ কুটস্থে থাকা—ব্রহ্মেতে না থেকে করিলেই অসৎ হইল, তাহার ইহকাল ও পরকালে কল্যাণ নাই।—কর্ম যদি তদর্থীয় না হয় তবেই অসৎ হইল । কর্ম কিরূপে তদর্থীয় হয় ? শ্রদ্ধার সহিত সাধন করিলেই অভিমান নষ্ট হইয়া যায়, অভিমানের সহিত কর্ম যদি ভালও হয় তবুও তাহা শুভফল প্রদান করে না । গুরুর উপদেশ, শাস্ত্রোপদেশ অমান্য করিয়া যাহারা বেচ্ছাচার বশে কার্য করে তাহাদের কার্য কখনও সাধিক হয় না । অর্থাৎ সে কার্যের দ্বারা কখনও সুষুম্নায় প্রাণ প্রত্যাবর্তন করে না । সুষুম্নায় প্রাণ পরিচালিত হইলে তবে যে কার্যাদি অনুষ্ঠিত হয় তাহা সমস্তই সাধিক কর্ম । এইরূপে যে কর্ম সাধিক নহে, তাহাতে প্রবৃত্তির প্রাবল্য থাকায় তাহা ইহকালেও আনন্দজনক হয় না, এবং পরকালেও মঙ্গল-দায়ক হইতে পারে না । কেন সাধিক ভাবে কর্ম হওয়া আবশ্যিক ? সাধিকভাব অর্থাৎ সুষুম্নায় প্রাণ প্রবাহিত না হইলে কাহারও আত্মপ্রত্যক্ষ হয় না, এবং স্থূল শূন্য দেহাদির অতীত হওয়া যায় না । স্থূল ও শূন্য দেহরূপ উপাধি থাকিতে কাহারও প্রকৃত জ্ঞান-ভক্তির উদয় হয় না । ইড়া-পিঙ্গলায় যাহাদের খাস বহে তাহারা জ্ঞানলাভের অধিকারী নহে, সেইজন্ত খাস যাহাতে সুষুম্নায় প্রবাহিত হয় এইরূপ ভাবে সাধনায় প্রযত্ন করা কর্তব্য । তাহা হইলে ব্রহ্মে স্থিতি লাভ হইবে । ব্রহ্মে স্থিতি লাভ না করিয়া উৎকার ক্রিয়াই কর, আর কুটস্থেই থাক বা সহস্র সহস্র লোককে ক্রিয়াদানই কর তাহাতে কোন প্রকৃত কল্যাণ লাভ হইবে না । ঐ সকল ক্রিয়া করিলে তজ্জনিত কিছু বাহ্যিক সিদ্ধি হইতে পারে, কিন্তু

তাহা কামোপভোগকে অতিক্রম করিতে পারে না বলিয়া তাহা অসৎ অর্থাৎ সে ক্রিয়ায় প্রকৃত কল্যাণ হয় না। কিন্তু যিনি জাগতিক লাভালাভের কথা ছাড়িয়া দিয়া প্রাণের টানে শ্রীতির সহিত নিত্য নিয়মিত ভাবে ক্রিয়া করেন, তাহার সেই পরিশ্রম সফল হয়, অর্থাৎ তাহা ভগবদ্ভীত্যর্থ হয় বলিয়া তাহাতে জাগতিক ফলের দিকে দৃষ্টি থাকে না, তাহা শুদ্ধ অচ্যুতের চরণ লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া যায়—এইরূপ সাধকের সমস্ত কর্মই ভগবদ্বাদেশে সাধিত হয়, হুতরাং তৎকৃত আহার বিহার পূজা সাধন-করা ও সাধন-দেওয়া প্রভৃতি সমস্ত কর্মই শাস্তিক হইয়া যায়। এইরূপে যোগী সবশুদ্ধির অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তিনি ভক্তি ও জ্ঞান লাভের অধিকার লাভ করেন। এই অধিকার লাভের জন্যই ভগবান্ “ওঁ তৎ সৎ” এই মন্ত্রের উপদেশ করিলেন। এই মন্ত্র যে জানে এবং ইহার সাধন করে তাহারই অধিকার প্রাপ্তি হইতে পারে, নচেৎ লোকদেখানো সাধন করিলে কোন ফলই হইবে না ॥ ২৮

ইতি শ্রীমাদচরণ-আধ্যাত্মিকদীপিকা নামক

গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা

সমাপ্ত।

অষ্টাদশোঃধ্যায়ঃ

(মোক্ষ-যোগঃ)

অর্জুন উবাচ।

সন্ন্যাসস্ত মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুम्।

ত্যাগস্ত চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিহীন ॥ ১

অর্থঃ। অর্জুন উবাচ (অর্জুন বলিলেন)। মহাবাহো (হে মহাবাহো !) হৃষীকেশ (হে হৃষীকেশ !) কেশিনিহীন (হে কেশিনিহীন !) সন্ন্যাসস্ত ত্যাগস্ত চ তত্ত্বং (সন্ন্যাস ও ত্যাগের তত্ত্ব) পৃথক্ (পৃথকরূপে—পরস্পর বিভক্ত ভাবে) বেদিতুন্ ইচ্ছামি (জানিতে ইচ্ছা করি) ॥ ১

শ্রীধর।

স্নানত্যাগবিভাগেন সর্কগীতার্থসংগ্রহম্।

স্পষ্টমষ্টাদশে প্রাচ পরমার্থ-বিনির্ঘয়ে ॥

অত্র চ “সর্ককর্ণাণি মনসা সন্ন্যাস্তে স্ত্বং বশী।”-৫।১৩, “সংস্রাসযোগবৃত্তাস্তা”-৯।২৮, ইত্যাদি কৰ্মসংস্রাস উপদিষ্টঃ, তথা—“ত্যাগ্। কৰ্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিব্রাজ্যঃ”-৪।২০, “সর্ক-কৰ্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাস্ববান্”-১২।১১, ইত্যাদি চ ফলমাত্রত্যাগেন কৰ্মাহুষ্ঠানম্ উপদিষ্টম্।। ন চ পরস্পর-বিরুদ্ধঃ সর্কজঃ পবনকাক্ষনিকো ভগবান্ উপদিষ্টেৎ।। অতঃ কৰ্ম-সংস্রাস্ত তদহুষ্ঠানস্ত চ অবিরোধপ্রকারঃ বুভুৎসুঃ অর্জুন উবাচ—সংস্রাসস্তেতি। ভো হৃষীকেশ—সর্কদ্রিয়নিয়ামক, হে কেশিনিহীন—কেশি নাম্নো মহতো হয়াক্রুতে: দৈত্যস্ত যুদ্ধে যুধং ব্যাধায় ভক্ষয়িতুন্ আগচ্ছতঃ অত্যন্তং ব্যাভে যুধে বামবাহুং প্রবেশ তৎক্ষণমেব বিবৃদ্ধেন তে নৈব বাজনা কৰ্কটিকাফলবৎ তং বিদ্যার্থ নিশ্চয়িতবান্। অতএব হে মহাবাহো ইতি সম্বোধনম্। সংস্রাস্ত ত্যাগস্ত চ তত্ত্বং পৃথক্—বিবেকেন বেদিতুন্ ইচ্ছামি ॥ ১

বঙ্গানুবাদ। [পরমার্থ-বিনির্ঘয় যে ষষ্ঠাদশ অধ্যায় তাহাতে সন্ন্যাস ও ত্যাগের বিভাগ কখন দ্বারা সমগ্র গীতার্থসংগ্রহ স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন]

[১ম অধ্যায়ের ১৩শ শ্লোক “সর্ককর্ণাণি মনসা” এবং ৯ম অধ্যায়ের ২৮শ শ্লোক “সন্ন্যাস-যোগবৃত্তাস্তা” প্রভৃতির দ্বারা কৰ্মসংস্রাস উপদিষ্ট হইয়াছে। আবার চতুর্থ অধ্যায়ের “ত্যাগ্। কৰ্মফলাসঙ্গং” এবং ১২শ অধ্যায়ের “সর্ককৰ্মফলত্যাগং” প্রভৃতি শ্লোকে ফলমাত্র ত্যাগ কৰ্মাহুষ্ঠান করিতেও উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু পবন কাক্ষনিক সর্কজ ভগবান্ পরস্পর-বিরুদ্ধ বাক্যের উপদেশ কখনই দিতে পারেন না, অতএব কৰ্মসংস্রাস ও কৰ্মাহুষ্ঠান এতদ্বয়ের বিরোধ বাহাতে না হয় তাহাই বুঝিবার জন্য ইচ্ছুক] অর্জুন বলিতেছেন—হে হৃষীকেশ অর্থাৎ হে সর্কদ্রিয়ের নিয়ামক! হে কেশিনিহীন কেশী নামক বৃহৎ অধাক্রুতি এক দৈত্যের বিবৃত্ত যুধে বাম বাহু প্রবেশ করাইয়া দিয়া তৎক্ষণাৎ আমার সেই হস্তকে বিরুদ্ধ করিয়া সেই বাহু দ্বারা কৰ্কটিকা (কাকুড়) দলের দ্বায় তাহাকে

বিদীর্ণ করিয়া বধ করিয়াছিলেন। এবং এই জন্তই ক্রীড়কে মহাবাহু বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। অর্জুন বলিতেছেন, হে ক্রীড়ক! সন্ন্যাস ও ত্যাগের তত্ত্ব পৃথক্ বিচার পূর্বক (অর্থাৎ তাহাদের পার্থক্য) জানিতে ইচ্ছা করি ॥ ১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—শরীরের ভেজের দ্বারা প্রকাশ হইতেছে—সন্ন্যাস আর ত্যাগের পার্থক্য কি?—যদি শ্রেণীত শাস্ত্রে বিজ্ঞাতের জ্ঞান বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের পক্ষে চতুর্থাশ্রমই বিহিত হইয়াছে। চতুর্থাশ্রম বধাক্রমে (১) ব্রহ্মচর্য্য, (২) গার্হস্থ্য, (৩) বানপ্রস্থ ও (৪) সন্ন্যাস। প্রত্যেক পরবর্তী আশ্রমের যোগ্যতা লাভ করিতে হয় তাহার পূর্ববর্তী আশ্রম হইতে, সুতরাং কোন আশ্রমটিকেই ত্যাগ করা চলে না। আনন্দের বর্তমান শিক্ষাগারগুলিতে পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণী বিভাগ আছে, এবং প্রত্যেক পাঠার্থীকে এক একটি শ্রেণীতে পাঠাত্যাস করিয়া পরবর্তী শ্রেণীর পাঠ্য পড়িবার যোগ্যতা লাভ করিতে হয় এবং যোগ্যতা লাভ হইয়াছে কিনা তজ্জ্ঞ পরীক্ষা দিতে হয়, পরীক্ষার পর যোগ্য বিবেচিত হইলে ছাত্রকে উচ্চ শ্রেণীতে পাঠের অধিকার দেওয়া হয়। ভারতবর্ষীয় বর্ণাশ্রম বিভাগকেও উক্তরূপ শ্রেণীবিভাগের অনুরূপ বলা বাইতে পারে। পার্থক্য এই যে শিক্ষাগারের শ্রেণী-বিভাগ সংখ্যা বহু হইলেও তাহা কয়েক বৎসরের চেষ্টাতেই অতিক্রম করা যায়, কিন্তু যুগের বর্ণাশ্রম বিভাগের উন্নত শ্রেণীর অধিকার লাভ কতিপয় বর্ষের মধ্যে কুলায় না, এমন কি বহু জন্ম লাগিতে পারে। জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া এই সংসার-পাঠাগারে পাঠাত্যাসের জগৎ জীবনমূহ প্রেরিত হয়; যেমন পাঠাত্যাসে নিপুণতা লাভ করিতে থাকে, শিক্ষার্থিগণ পরজন্মে তদনুরূপ উচ্চ হইতে উচ্চতর শ্রেণীতে আসিয়া মিলিত হয়। উদ্দেশ্য আরও উচ্চতর শিক্ষালাভ। এই সংসারানুযায়ী জীব অগামী জন্মের জন্ত প্রস্তুত হইতে থাকে। যাহার বৈশিষ্ট্য অধ্যাস ও চেষ্টা সে তদনুরূপ ফল লাভ করে। এই শিক্ষার চিহ্ন প্রতি জন্মেই সংসাররূপে প্রত্যেক জীবের শরীরে, ইন্দ্রিয় ও মনে লাগিয়া থাকে। তাহারই ফলে চারি প্রকারের জীব জগতে দেখিতে পাওয়া যায়। (১) মুক্ত, (২) মুমুক্শু, (৩) সংসারী ও (৪) পাম্বু। প্রথম—মুক্ত পুরুষ—ই হারা জানী, ইহাদের পাঠ শেষ হইয়া গিয়াছে। মোক্ষরূপ পরমানন্দের অধিকারী হওয়ার তাঁহাদের আর কর্ণের সহিত বাধ্য-বাধকতা নাই, সুতরাং কর্ণলোপও আর তাঁহাদের থাকিতে পারে না। (২) মুমুক্শু, (৩) সংসারী ও পাম্বু—এই তিন শ্রেণীর অভ্যাসের নিমিত্ত কর্ণের ব্যবস্থা আছে—এবং বর্ণবিভাগও তাঁহাদের কর্ণের অহঙ্কুলের জন্তই ব্যবস্থিত। সাধারণতঃ ব্রাহ্মণেরা মুমুক্শু, ক্ষত্রিয়েরা মুমুক্শু ও সংসারী, বৈশ্যেরা সংসারী এবং নীচবৃত্তিবৃত্ত কুর পাণ্ডুরাই মূঢ় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সর্বনিম্নশ্রেণীবাও কর্ণানুযায়ী ক্রমোন্নতি লাভ করিতে পারিবে, শাস্ত্রে তাহার ব্যবস্থা আছে; এই ক্রমোন্নতির ফলে তাঁহারা সংসারী ও মুমুক্শু হইয়া পরিশেষে ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ করিবে, এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ ও শুদ্ধজ্ঞানপরায়ণ গৃহস্থ হইয়া বর্ণবিহিত গৃহস্থপ্রমের নিয়মাদি প্রতিপালন করিয়াও সাধনায় সফলকাম হইবার জন্ত পূর্ণরূপে আত্মবল প্রয়োগের জন্ত তাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থপ্রম ও আপনাকে উপযুক্ত বোধ করিলে সন্ন্যাসপ্রম পর্যন্ত গ্রহণ করিতে পারিতেন। এখন যেমন অধিকার থাক না থাক, ইচ্ছা হইলেই সন্ন্যাসী হওয়া যায়, পূর্বকালে এইরূপ বৈজ্ঞানিক সন্ন্যাস গ্রহণের

উপায় ছিল না। এইজন্য তখন চতুর্থাশ্রমে লোকের সংখ্যা খুবই পরিমিত ছিল। তাহা ছাড়া তিনটি আশ্রমের কার্য শেষ করিতে করিতেই অনেকের আত্মজ্ঞান কুরাইয়া যাইত। তখনকার লোকের একটা বিচার ছিল যে তাঁহারা অনুপযুক্ত হইয়া উচ্চতর আশ্রম গ্রহণ করিতেন না। সুতরাং ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ্যপ্রম ব্যতীত অন্য কোন আশ্রমেই সংখ্যাতিরিক্ত লোকের সমাগম হইতে পারিত না। যেমন যেমন সাধনায় দ্বারা জ্ঞান বিকশিত হইত তদনুযায়ী তাঁহারা উচ্চপ্রম গ্রহণ করিতেন। সন্ন্যাসব্রতের কর্ণফলই উচ্চবর্ণের মধ্যে জন্মলাভের কারণ বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল। এখনকার মত বইপড়া বিদ্যা তাঁহাদের সম্বল ছিল না। বোড়াইয়া উঠু হইবার প্রবৃত্তি কাহারও ছিল না, সেদুপ প্রবৃত্তি থাকিলেও রাজশাসন তাহাকে বধা-স্থানে সংস্থাপন করিয়া দিত—সুতরাং আধুনিক সময়ের মত অনধিকারী প্রবেশ করিয়া কোন আশ্রমকেই অবধা কলঙ্কিত করিত না। অবশ্য স্রুতিতে এরূপ আদেশও আছে—“বহুব্রতের বিরুদ্ধে তদ্বৎসব প্রব্রজ্যে”—যখনই বৈরাগ্য হইবে তখনই প্রব্রজ্যপ্রম গ্রহণ করিতে পারিবে। এই নিয়মের ফলে ব্রহ্মচর্য্য সমাপান করিয়াও কেহ কেহ চতুর্থাশ্রম গ্রহণ করিতেন, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা খুব স্কন্নই ছিল। এইভাবে চতুর্থাশ্রম গ্রহণ তাহার পক্ষেই বিহিত ছিল যাহার প্রবল বৈরাগ্য উপস্থিত হইত। এবং সে বৈরাগ্য ভাবের গতি কেহ বোধ করিতে পারিত না, কোন বাহ্যিক আকর্ষণই সেদুপ বৈরাগ্যবানকে আর টানিয়া রাখিতে পারিত না; সুতরাং তাহার পক্ষে প্রতি আশ্রমের যে শিক্ষা তাহা আর প্রয়োজন হইত না। এখনও যেমন উৎকৃষ্ট মেধাবী ছাত্রকে বিশিষ্ট উন্নীত করিয়া (double promotion) দেওয়া হয়, শাস্ত্রে উপযুক্ত লোকের জন্ত সে ব্যবহারও অভাব ছিল না। কিন্তু তাঁহা বৈরাগ্য ব্যতীত এই ধরণের উন্নতি লাভ কাহারও পক্ষে সম্ভব হইত না। তখন রাজ-শাসন ও সমাজ-শাসন শাস্ত্র-শাসনের অনুবর্তী ছিল, সুতরাং শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘিত না হয় এ বিষয়ে মনোবী মাজেই একটি হত্যাক দৃষ্টি ছিল। তখন অনধিকার প্রবেশ ছিল না বলিলেই হয়। বৌদ্ধ বিপ্লবনের পর বৌদ্ধবিধি সুবিস্তৃত ও সমাজ সুপরিচালিত করিবার জন্ত লোকশিক্ষকদিগের বিশেষ ভাবে প্রয়োজন হওয়ার আচার্য্য শব্দ সন্ন্যাসী সমাজের আয়তন বিস্তৃত করিবার জন্ত উপরোক্ত বৈধিকের আশ্রয় করিয়া সমাজে সন্ন্যাসীর সংখ্যা বাড়াইয়া দেন। অবশ্য তখনও লোকে শাস্ত্রবিধি বধালাঘ্য পালন করিবার চেষ্টা করিত। বর্তমান যুগের মত শাস্ত্রবিধি-বন্ধিত বৈজ্ঞানিক-প্রবোধিত সন্ন্যাসীর সংখ্যা তখনকার ফালে একেবারে অবিরল না হইলেও এখনকার মত যে তাহাদের মাজাদিক্য ছিল না তাহা নিশ্চয়। সুতরাং তখনকার দিনে যখন ভগবান্ অর্জুনকে গীতার উপদেশ দিতেছিলেন—সেই যুগে তাহাদের তত্ত্বজ্ঞান জন্মে নাই, জ্ঞানের অভিলাষও জন্মে নাই—তাহাদের জন্ত সন্ন্যাস বিহিতই ছিল না—সুতরাং সেই সব শ্রেণীর লোকদিগের কর্ণসন্ন্যাসের ব্যবস্থা জন্ত যে সন্ন্যাসের অতিরিক্ত আর একটি ত্যাগীর শ্রেণী বিভাগ করিতে হইয়াছিল তাহা বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। তাহাদের জ্ঞানের অভিলাষই নাই, তখন তাহাদের পক্ষে ত্যাগ বা সন্ন্যাস কিরূপে সম্ভব হইবে বুঝিয়া উঠা যায় না। আত্মসাম্যকার ও মোক্ষপ্রদ জন্তই সন্ন্যাসপ্রম; যখন সে ইচ্ছাই তাঁহাদের জন্মে নাই তখন তাহাদিগকে সন্ন্যাসী বা ত্যাগীর মধ্যে টানিয়া আনিবার প্রয়োজনই বা কি? স্রুতি

বলেন, “জ্ঞানাদেব তু কৈবল্যম্”—জ্ঞান হইলেই কৈবল্য লাভ হয়। এই জ্ঞান সহজলব্ধ নহে। পুঁথি পড়িয়া জ্ঞানের উচ্চ উচ্চ কথা আউড়াইলেই জ্ঞানী হওয়া যায় না। উহার আধিকারী হইতে হয়। যে জ্ঞানে সমস্ত অনৈক্য বা ভেদকে এক করিয়া দেয় তাহা বহু সাধনার ফলে কোনও ভাগ্যবান্ লাভ করিয়া থাকেন। যাহার জ্ঞানান্তিলাষ আছে, তাহাকে প্রথমে আধিকারী হইতে হইবে। এ ক্ষত্র সাধনাভ্যাস চাই। সাধনাভ্যাস দ্বারা জয় কথঞ্চিৎ শুদ্ধ হইলে তবে স্বপ্নে বৈরাগ্যের অগ্নি জলিয়া উঠে। সেই প্রজ্জ্বলিত বৈরাগ্যানলে সমস্ত বিষয় বাসনা হবিরূপে প্রদত্ত হইলে তখন আত্মসাক্ষাৎকার ঘটিতে পারে। যে সাধনাভ্যাস আত্মসাক্ষাৎকারের উপায় তাহাও আধিকারী ভেদে চারি প্রকারের হইয়া থাকে। প্রথম বহিঃপূজা, দ্বিতীয়, অব্যব-কীর্তনাদি। তৃতীয় পূজা—প্রাণতত্ত্বের সহিত পরিচিত হওয়া। প্রাণায়ামাদি যোগাভ্যাস দ্বারা প্রাণ স্থির হইলে তখন মন ও ইন্দ্রিয়াদি স্থির হইয়া অন্তর্মুখী হয়। এই সময় হইতে অন্তর্পূজা আরম্ভ হয়। বহিঃপূজার মত সেখানেও পুষ্প, ধূপ, দীপ, অঙ্কলি ও আরতি সবই আছে, তবে তাহাতে আর কায়ক্লেশ নাই, কেবল স্থির মনের দ্বারা এই পূজা সম্পাদিত। এইরূপে ভূতাত্মা ও সূত্রাত্মার পূজা সমাপ্ত হইলেই ভূতে ভূতে বিনি প্রকাশিত রহিয়াছেন সেই একমাত্র প্রকাশ স্বরূপের পূজাই তৃতীয় আধিকারীর পূজা—তখন “ব্রহ্মময়ীর পূজায় পূজক ব্রহ্মময়”। ইহা কেবল স্থির মনে ধ্যেয় বস্তুর ধ্যান বা তন্মধ্যে তন্মগ্ন হইয়া যাওয়া। চতুর্থ আধিকারে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণের অতীত হইয়া আত্মাকারে বা স্ব-স্বরূপে অবস্থান। ইহাই প্রপঞ্চাতীত অবস্থা, এই আধিকারে মায়াব লেশমাত্র থাকে না; উহা শুদ্ধ অঐতানন্দ বা ব্রহ্মত্ব বা ক্রিয়ার পরাবস্থা।

যাহারা পূর্ব-স্মৃতি বশে বৈরাগ্যবান্ হইতে পারিয়াছেন, সূত্রায় যাহারা মুমুক্শু তাঁহাদের জ্ঞান পরিপাকার্থে সন্ন্যাসকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। (১) বিবিধিবা সন্ন্যাস, (২) বিধং সন্ন্যাস। যাহারা পূর্ব সংস্কারভ্যাগে মুমুক্শু হইতে পারিয়াছেন সূত্রায় ঐহিক সুখ-সম্পদের প্রতি অতিমাত্রায় উদাসীন তাঁহাদের অতীতকাল সাধনাই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে, কারণ তাঁহাদের চিত্ত স্বাভাবিকই সংসারের লাভালাভের প্রতি উদাসীন, তাঁহাদের চিত্তমল বৎসামাত্র থাকার অল্পদিনের সাধনাতেই তাঁহাদের প্রাণ ও তৎসহ মনের স্থিরতা সহজেই হইয়া থাকে। যাহাদের প্রাণ অন্ন্যাসেই সুস্থায় প্রবেশলাভ করে তাহারা শব্দই ব্রহ্মত্ব-ভাবিত বা ক্রিয়ার পরাবস্থা প্রাপ্ত বা আত্মস্থ হইতে পারেন। এইরূপ যাহাদের চিত্ত প্রকৌণ-দশা প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃত জ্ঞানাদিকার প্রাপ্ত হইয়াছে—তাঁহাদের মন হইতে জীর্ণত্বের মত কর্মাসক্তি খলিত হইয়া যায়—এইরূপ সাধকে প্রদেয় ক্ষত্র যে সন্ন্যাস তাহাই স্বাভাবিক সন্ন্যাস, তাহাকেই “বিধং” সন্ন্যাস বলা হইয়া থাকে। এ সন্ন্যাসের ক্ষত্র কোন বিধিবিধান বা আয়োজন নাই। ফল অতিশয় পক্ক হইলে যেমন আপনিই বৃত্তচ্যুত হয়, সেইরূপ সংসার হইতে তাঁহাদের মন স্বাভাবিক ভাবেই মুক্ত হওয়া যায়। ইহার ক্ষত্র কোন পাঠশালে নাম লিখাইবার আয়োজন হয় না। কিন্তু যাহারা সেরূপ আধিকারী নহেন অথচ মুমুক্শু-ভাব আছে, সংসারে অনাসক্তিও কতক পরিমাণে আছে, তাঁহাদের শম দমাদি ও অনাসক্তি-ভাবকে পুষ্ট ও বর্দ্ধিত করিবার ক্ষত্র কতকগুলি শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা আছে, সেই বিধি-ব্যবস্থাগুলিকে শাস্ত্রানুমোদিত

ভাবে গ্রহণ করাকেই “বিবিধিবা” সন্ন্যাস বলে। ইহা প্রকৃতপক্ষে সন্ন্যাস নহে, ইহা সন্ন্যাসের শিক্ষা নবিশী মাত্র।

এই অধ্যায়ে “ত্যাগ” ও “সন্ন্যাস” বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই দুইটি শব্দের ধাতুগত অর্থ একই, কিন্তু “ত্যাগ” শব্দটি একটি বিশিষ্ট অর্থে গৃহীত হইয়াছে। এই “ত্যাগ” কথাটির অলোচনায় দেখা যায় “ত্যাগ” শব্দটি ভগবদগীতার নিজস্ব ও সন্ন্যাস হইতে উহার যে বৈশিষ্ট্য আছে তাহাও বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জীবের কল্যাণের ক্ষত্র ত্যাগের একটি বিশিষ্ট পন্থা উদ্ভাবন করিয়া যেন লোকচক্ষুর সম্মুখে উহাকে নুতন করিয়া ধরিলেন। ইহা বোধবিবুদ্ধ নহে, কিন্তু তখনকার সমাজে উহা অবিজ্ঞাত ও অপ্রচলিত ছিল বলিয়াই মনে হয়। বহুপূর্বে কৃত-যুগাদিতে ত্যাগ ও সন্ন্যাসকে পৃথক্ করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু কালচক্রের বিড়ম্বনায় জীবের মতিগতি যখন হীন ও অন্তর্ভুক্ত হইয়া বাইতেছিল, তখন আবার এই সন্ন্যাস ও ত্যাগের কথা জনসমাজে প্রচার করার প্রয়োজন হইয়াছিল। সন্ন্যাস ও ত্যাগের ধাতুগত অর্থ যে একই তাহা আমরা পূর্বে বলিয়াছি, কিন্তু কালক্রমে সন্ন্যাসের একটা রূঢ় অর্থ সমাজে প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল। যদিও সন্ন্যাসী বলিতে প্রকৃত পক্ষে বুঝায়— “সদম্মে বা কধম্মে বা লোষ্ট্রে বা কাঞ্চনে তথা।

সমবুদ্ধিঞ্চ শখং স সন্ন্যাসীতি কীর্তিতঃ ॥”

সর্বত্র সমবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিই প্রকৃত সন্ন্যাসী, কিন্তু পরে সন্ন্যাসীর বেশ গ্রহণটাই যেন বড় হইয়া পড়িয়াছিল। যথা :—দণ্ডকমণ্ডলং বস্ত্রবস্ত্রমাত্রঞ্চ ধারয়েৎ।

নিত্যপ্রবাসী নৈকত্র স সন্ন্যাসীতি কীর্তিতঃ ॥”

সন্ন্যাসীর এই শেখোক্ত অর্থই যখন বিশেষভাবে প্রবল হইতে লাগিল, তখন সন্ন্যাসীর মধ্যেও বিবিধ ভেদ ও বিবিধ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইতে লাগিল। কিন্তু অতি প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থায় উহা অশুমোদিত ছিল না বলিয়াই মনে হয়। সন্ন্যাসের আসল কথা তো ঘর-বাড়ী ছাড়িও নহে, বেশভূষা পরাও নহে। সন্ন্যাসের প্রকৃত কথা বুদ্ধির সমতা। সমবুদ্ধিভাবাপন্ন হইয়া কেহ যদি সদৃগৃহ বা ব্রহ্মচারীও হন তবে তিনি বেশধারী সন্ন্যাসী না হইলেও যথার্থ-রূপে তিনিই সন্ন্যাসী। মুনীশ্বর বৈপায়ন বেদব্যাস বা শুকদেব কেহই গৃহত্যাগী ছিলেন না, তথাপি তাঁহারা সন্ন্যাসী। গীতায় ভগবান্ এইরূপ অভিপ্রায়ই প্রকাশ করিয়াছেন—

“জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন ঘেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।

নির্ধন্দো হি মহাবাহো স্ত্বং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥” ৫।৩

যিনি দেখ করেন না, আকাঙ্ক্ষা করেন না, তাহাকে কর্মাসক্তান কালেও সন্ন্যাসী বলিয়া জানিবে। যেহেতু, হে মহাবাহো, বাগদেবাদিশূত্র শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি অন্যায়সে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করেন।

যষ্ঠ অধ্যায়ে ভগবান্ আবার বলিয়াছেন—

“অনাস্থিতঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ।

স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরয়ির্নচাক্রিয়ঃ ॥” ৬।১

যিনি ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া কর্তব্য বোধে বিহিত কর্তব্য করিয়া থাকেন, তিনিই সন্ন্যাসী এবং তিনিই যোগী। নিরসি অসিলাধ্য যজ্ঞাদি কর্তব্য্যাগী) অথবা অক্রিয় (অনসিলাধ্য কর্তব্যি ত্যাগী) সন্ন্যাসীও নহেন, যোগীও নহেন।

এখানে ভগবান্ স্পষ্টতঃ প্রচলিত সন্ন্যাসের প্রতিবাদ করিলেন। সন্ন্যাসাত্মক ধারাপ বলিয়া যে প্রতিবাদ করিলেন তাহা নহে, অত্যাশ্রমী বা সন্ন্যাসীরাই সর্বোৎকৃষ্ট, কিন্তু অনধিকারে এই আশ্রম গ্রহণ করার সন্মানে বিপ্লব উপর হইবে এই আশঙ্কায় তিনি সাজা সন্ন্যাসীদের শিক্ষা করিলেন। উপযুক্ত সন্ন্যাসীদের সহিত ত্যাগী গৃহস্থ যোগীদের সমান আসন প্রদান করিলেন।

সন্ন্যাসীরা জ্ঞান-বৈরাগ্যসম্পন্ন ও গৃহত্যাগী এবং ত্যাগীরা ভক্ত, জ্ঞানী ও কর্মী, কিন্তু গৃহী; সেই সকল জ্ঞানসম্পন্ন কর্তব্যযোগীদের কর্তব্য কিরূপে সন্ন্যাসে পরিণত হয় ভগবান্ এই কথাই গীতার বিশেষভাবে বুঝাইবার প্রয়াস করিয়াছেন।

সন্ন্যাসী বলিলেই একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়কে বুঝাইয়া থাকে, সেইজন্য ষাঠার গৃহত্যাগী নহেন অথচ জ্ঞান-বৈরাগ্যযুক্ত ভক্ত সার্বক, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া সম-অর্থবোধক “ত্যাগী” শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। এই শব্দটি ব্যবহার করিলে বিশিষ্ট আশ্রমভুক্ত “সন্ন্যাসী” বলিয়া ভ্রম হইবে না, কিন্তু সন্ন্যাসীর সম-উদ্দেশ্যবোধক অর্থ হইবে। অর্থাৎ অত্যাশ্রমী না হইয়াও লোকে সংসারে থাকিয়াও সন্ন্যাসীর মত সমবুদ্ধিবিশিষ্ট হইতে পারেন, ভগবান্ “ত্যাগী” শব্দ দ্বারা সেই সব ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থদিগের যেন স্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন। “সন্ন্যাস ও ত্যাগ” যে পৃথক উদ্দেশ্যবোধক তাহা তিনি এই অধ্যায়ের ২য় শ্লোকে অতি স্পষ্টভাবে উভয়ের পার্থক্য নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। “ত্যাগী” শব্দটি প্রাচীন হইলেও ভগবান্ গীতার আবার নূতন করিয়া লোকসমক্ষে উহার প্রচার করিলেন। তাই তাহার সংজ্ঞা নির্ধারণও করিয়া দিলেন। সমাজে তখন এমন সব নবনীতী পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল যাঁহারা সংসারী হইয়াও সন্ন্যাসী ছিলেন; তাঁহারা সংসারও ত্যাগ করেন নাই অথচ ত্যাগের উচ্চ দৃষ্টান্ত তাঁহাদের জীবনে বর্তমান ছিল, হয়তো কাহারও কাহারও সন্ন্যাসীর স্বাভাবিক অধিকারও ছিল না, কিন্তু তাঁহাদের ত্যাগের সমুজ্জল দৃষ্টান্ত অত্যাশ্রমীদের পক্ষেও অনুকরণীয় ছিল—যেমন ভীষ্ম, ধৃতিষ্ঠির, বিদুর প্রভৃতি। তাঁহাদেরই স্থান নির্দেশের জন্য এই “ত্যাগী” শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে এবং গীতার এই অধ্যায়ে তাহার লক্ষণাদি ও সন্ন্যাসীর লক্ষণ হইতে যেটুকু তাহার পার্থক্য তাহাও ভগবান্ বলিয়া দিয়াছেন। “সিদ্ধাসিদ্ধোঃ সনো ভূষা, সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ, ব্রহ্মণ্যধার কর্ম্মাশি” ইত্যাদি শ্লোকে ফলাসক্তি ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মে কর্তব্য সমর্পণ করিতে পারিলে, এবং সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে হর্ষবিষাদবিহীন ব্যক্তির কর্তব্য-বন্ধন হয় না ইত্যাদি উপদেশের দ্বারা অত্যাশ্রমী না হইয়াও তিনি যে সন্ন্যাসীর উচ্চ পদবীতে উঠিতে পারেন এইসব শ্লোকে ভগবান্ স্পষ্টতঃ আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। ভগবান্ ভাগবতেও উক্তবকে মোক্ষের তিনটি উপায় বলিয়াছেন—জ্ঞান, ভক্তি ও কর্তব্য। “নির্লিপ্তানাম্ জ্ঞানযোগঃ তাদিনাম্ ইহকর্ম্মহু” — হৃৎ-বুদ্ধিতে কর্তব্যে বিরক্ত অতএব সেই সকল কর্তব্যত্যাগীদের জন্যই জ্ঞানযোগ — ইহাই সন্ন্যাস-প্রমের পালনীয় ধর্ম্ম। “তেষাংনির্লিপ্তচিত্তানাম্ কর্তব্যযোগঃ কামিনাম্” — হৃৎবুদ্ধিশূন্য কলে

শ্রীভগবান্‌বাচ।

(কাম্যকর্ম্ম বর্জনই সন্ন্যাস)

কাম্যানাং কর্তব্যং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।

সর্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাপ্ত্যগং বিচক্ষণাঃ ॥ ২

অবিরক্ত পুরুষের জন্যই কর্তব্যযোগ। আর “যদৃচ্ছয়া মৎকথার্থো জাতশ্রদ্ধঃ তু যঃ পুনান্। ন নির্ধিরঃ নাতিসক্তো ভক্তিযোগোহস্ত সিদ্ধিঃ ॥” যদৃচ্ছাক্রমে মৎকথার্থে জাতশ্রদ্ধ যে পুরুষ বিরক্ত নহে, আর অত্যন্ত আসক্তও নহে, তাহার পক্ষে ভক্তিযোগই সিদ্ধিপ্রদ। অর্থাৎ যে কামে আসক্ত কর্তব্যযোগই তাহার আশ্রয় স্থান, আর যে মৎকথায় জাতশ্রদ্ধ, সর্বকর্ম্মে নির্ধির ও কামকে হঃস্বাক্ষক বলিয়া বুঝিলেও তাহা পরিভাগ করিতে অসমর্থ তাহার পক্ষে ভক্তিযোগই ভেদ্য বলিয়া জানিবে, পরন্তু যে কামকে সম্পূর্ণ বর্জন করিতে পারিয়াছে, জ্ঞানযোগ তাহারই অবলম্বনীয়।

বর্তমান কালে মনুষ্যচরিত্র আলোচনা করিলে জানা যায় যে ভাস্কর্য্যমার্গই বর্তমান কালের অধিকাংশ লোকের অবলম্বনীয় পথ, তাই ভগবান্ বিশেষ করিয়া ত্যাগী ও ভক্ত হইবার জন্যই অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া জগৎকে উপদেশ করিয়াছেন। ইহাতে সন্ন্যাসের কঠোরতা নাই অথচ ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য ব্যাকুলতা আছে, জ্ঞানের অগাধ গাভীর্ষ্য ও তৎসহ জ্ঞানের উজ্জলতার পরাকাষ্ঠা না থাকিলেও, পরার্থে আত্মত্যাগ ও ভগদ্বক্তির যুগ্মমুখ হিল্লোলে সাধকের শ্রাণ এখানে নিরস্তর হিল্লোলিত। বর্তমান যুগের তথাকথিত বৈষ্ণবদিগের ভ্রায় কর্তব্যের দ্বিক্ মাড়াইবে না, বা জ্ঞানের আলোচনা পর্য্যন্ত করিবে না—এই সব অসার কথার কোন অবতারণা এখানে নাই। ভগবান্‌কে নিভ্রজন বোধে বা আত্মতুল্য বোধে ভালবাসার শিক্ষাই ইহার শেষ কথা, সেইজন্য ভগবানের দিকে মনকে একাগ্র করিয়া রাখিবার উপদেশই ইহার সাধনা, কারণ যে ভগবদ্ভক্ত সেই সমবুদ্ধিসম্পন্ন হয় এবং পরিশেষে তাহার নানাত বোধ মিটিয়া যায়। কেহ যোগাভ্যাসই করুক, অথবা বেদান্তলোচনাই করুক, অথবা জপপূজাদিতেই মনকে নিবিষ্ট করুক—যে উপায়েই হউক ভগবানের দিকে মনকে একাগ্র করিয়া রাখিতে পারাই জীবনের অপরূপ পার্থক্যতা ও সাফল্য—এই কথা জগজ্জীবকে সনাইবার জন্যই কৃপাশূ জগদগুরু যেন বহুপত্রিকর হইয়াছেন, তাই সন্ন্যাসের ব্যবস্থা সবেও ত্যাগের মহিমা কীর্তন করিয়া উপযুক্ত জ্ঞানী ও ভক্ত গৃহীদের আসনকে বঞ্চিত উচ্চ করিয়া দিয়াছেন। যে ভাবে জীবনকে পরিচালিত করিলে অনধিকারীরও একদিন অধিকার লাভ হয়, মায়ানিবদ্ধদৃষ্টি সংসারীও ভগবদ্-কৃপায় একদিন এই বিধের মধ্যে সর্বত্র ভগবান্‌কে এবং তাঁহার মহিমাকে উপলব্ধি করিতে পারিবে এবং সে শুভসংযোগ তাহার নিকট একদিন আসিবেই যখন সে বিধের সহিত নিজ আত্মার ঐকান্তিক যোগ বা একাত্মতা বৃদ্ধিতে পারিয়া আপনাব জন্ম-জীবনকে কৃতকৃত্য বোধ করিতে পারিবে। এই সকল ত্যাগাভ্যাসীরা সকলেই আধ্যাত্মিক মার্গের এক স্থানে দণ্ডায়মান নহেন বলিয়া তাঁহাদের মধ্যেও যে বিবিধ ভেদ থাকিবে অনিবার্য ভগবান্‌ সেই সকল ভেদের কথা ও তাহার লক্ষণাদিও এই অধ্যায়ে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন ॥

অর্থঃ। শ্রীভগবান্‌ উবাচ (শ্রীভগবান্‌ বলিলেন)। কবয়ঃ (পণ্ডিতগণ) কাম্যানাং

কৰ্মণাং (কাম্যকৰ্মসমূহের) ন্যাসং (ত্যাগকে) সন্ন্যাসং বিদুঃ (সন্ন্যাস বলিয়া জানেন) ।
বিচক্ষণাঃ (পণ্ডিতগণ) সৰ্ব্বকৰ্মফলত্যাগং (সকল প্রকার কৰ্মের ফলত্যাগকেই) ত্যাগং প্রাছঃ
(ত্যাগ বলিয়া থাকেন) ॥ ২

শ্রীধর । তত্র উক্তং শ্রীভগবানুবাচ—কাম্যানামিতি । “পুলকামো যজ্ঞতঃ” “বর্গকামো
যজ্ঞতঃ” ইত্যাদিকামোপবন্ধেন বিহিতানাং কাম্যানাং কৰ্মণাং ন্যাসং—পবিত্র্যাগং
সংক্রান্তং কবয়ো বিদুঃ, সম্যক্ ফলৈঃ সহ সৰ্ব্বকৰ্মণামপি জ্ঞানং—সংক্রান্তং পণ্ডিতা বিদুঃ—
জ্ঞানন্তি ইত্যর্থঃ । সৰ্ব্বেষাং কাম্যানাং নিত্যনৈমিত্তিকানাং চ কৰ্মণাং ফলমাত্রত্যাগং প্রাছঃ
ত্যাগং বিচক্ষণাঃ—নিপুণাঃ । ন তু স্বরূপতঃ কৰ্মত্যাগম্ ।

নহু নিত্যনৈমিত্তিকানাং ফলাশ্রবণাৎ অবিদ্যমানস্ত ফলস্ত কথং ত্যাগঃ স্তাৎ ? ন চি
বন্ধ্যয়াঃ পুত্রত্যাগঃ সম্ভবতি ।

উচ্যতে—যতপি স্বর্গকামঃ পুত্রকাম, ইত্যাদিবৎ “অহরহঃ সন্ধ্যাযুগাসীত”, “যাবজ্জীবনমগ্নি-
হোত্রং জুহোতি”—ইত্যাদিবিধি ফলবিশেষো ন শ্রবতে, তথাপি অপুরুষার্থে ব্যাপারে প্রেক্ষাবস্তাৎ
প্রবর্তয়িতুং অশ্রুবন্ বিধিঃ “বিশ্বজিতা যজ্ঞতঃ” ইত্যাদি ইব সামান্যতঃ কিমপি ফলম্
আক্ষিপত্যেব । ন চ অতীত গুরুমতশ্রদ্ধয়া স্বসিদ্ধিরেব বিধেঃ প্রয়োজনং ইতি মন্তব্যম্ ।
পুরুষপ্রবৃত্তি-অনুপপত্তেঃ দৃষ্টপরিহারস্য । অস্ম্যতে চ নিত্যাদিযু অপি ফলং “সৰ্ব্বৈ এতে
পুণ্যলোকা ভবন্তি” ইতি, “কৰ্মণা পিতৃলোকঃ” ইতি, “ধৰ্ম্মেণ পাপম্ অপমুদন্তি” ইত্যেব-
মাদিষু । তস্মাদ্ যুক্তমুক্তং “সৰ্ব্বকৰ্মফলত্যাগং প্রাহন্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ” ইতি ।

নহু ফলত্যাগেন পুনরপি নিম্নলিখিত কৰ্মসু অপ্রবৃত্তিরেব স্তাৎ । তস্মৈ সৰ্ব্বেষামপি কৰ্মণাং
সংযোগপৃথক্ ন বিবিধিবার্হতয়া বিনিয়োগাৎ । তথাচ শ্রুতিঃ—“তমেতন্ আত্মানং বেদাশ্র-
যচনেন ব্রাহ্মণ্যং বিবিধিযন্তি বজ্রেন দানেন তপসাহনাশকেন” ইতি । অতঃ শ্রুতিপদোক্তং
সৰ্ব্বং ফলং বন্ধকত্বেন ত্যক্তা বিবিধিবার্হং সৰ্ব্বকৰ্ম্মাহুষ্ঠানং ঘটত এব । বিবিধিযা চ
নিত্যানিত্যাবস্থাবিবেকেন নিবৃত্তদেহাভিমানতয়া বুদ্ধেঃ প্রত্যক্ প্রবণতা । তাবৎ পর্য্যন্তং চ
সত্ত্বগুণার্থং জ্ঞানাবিরুদ্ধং যথোচিতম্ আবশ্যকং কৰ্ম কুর্ততঃ তৎফলত্যাগ এব কৰ্ম্মত্যাগো
নাম, ন স্বরূপেণ । তথাচ শ্রুতিঃ—“কুর্ত্নেবেহ কৰ্ম্মাণি জিহ্মীবিষেচ্ছতং সমাঃ” ইতি । ততঃ
পরং তু সৰ্ব্বকৰ্ম্মনিবৃত্তিঃ স্বত এব ভবতি । তদুক্তং নৈকৰ্ম্মাসিদ্ধৌ—

“প্রত্যক্ প্রবণতাং বুদ্ধেঃ কৰ্ম্মাণ্যুপাভ্যুত্তিতঃ ।

কৃতার্থাভ্যুত্তমায়ান্তি প্রায়ুভ্যন্তে ধনা ইব ॥”

উক্তং চ ভগবতা “যদ্বাশ্রয়তিবেদাস্তাৎ” ইত্যাদি । -বশিষ্ঠেন চোক্তং—

“ন কৰ্ম্মাণি ত্যজেদ্ বোণী কৰ্ম্মভিত্ত্যজ্ঞাতো হসৌ ।

কৰ্ম্মণৌ মূলভূতস্ত সংকল্পস্তৈব নাশতঃ ॥” ইতি

জ্ঞাননিষ্ঠাবিক্ষেপকত্বম্ আলক্ষ্য ত্যজেদা, তদুক্তং শ্রীভাগবতে—

“তাবৎ কৰ্ম্মাণি কুর্ত্বীত ন নির্মিত্তেত যাবতা ।

মৎকথা-শ্রবণার্হো বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥

জ্ঞাননিষ্ঠো বিরতো বা মন্ততো বানপেক্ষকঃ ।

সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্তা চরেদবিধিগোচরঃ ॥”

ইত্যাদি । অলমতি প্রসঙ্গেন, প্রকৃতমহাস্বামঃ ॥ ২

বঙ্গীশুবাচ । [এই প্রশ্নের উত্তরে]—শ্রীভগবান্ বলিতেছেন ।

“পুত্রকামনায় যাগ করিবে”, “বর্গকামনায় যাগ করিবে”—ইত্যাদিরূপ কামনায় জন্ত যে
কাম্যকৰ্ম বিহিত তাহাদের জ্ঞান অর্থাৎ পবিত্র্যাগকে সন্ন্যাস বলে, অর্থাৎ সম্যক্ ফল সহ
সৰ্ব্বকৰ্মের যে জ্ঞান তাহাকেই পণ্ডিতগণ সন্ন্যাস বলিয়া জানেন—ইহাই তাৎপর্য । আর
বিচক্ষণ অর্থাৎ নিপুণ ব্যক্তির কাম ও নিত্যনৈমিত্তিকাদি কৰ্মের ফলমাত্র ত্যাগকেই ত্যাগ
বলিয়া থাকেন, স্বরূপতঃ কৰ্ম্মত্যাগকে তাহার ত্যাগ বলেন না ।

যদি বল নিত্যনৈমিত্তিক কৰ্মের ফলশ্রুতি না থাকায় অবিদ্যমান ফলের ত্যাগ কি
প্রকারে সম্ভব হয় ? বন্ধ্যায় পুত্রত্যাগ তো সম্ভবপর নহে । ইহার উত্তরে বলিতেছেন যে
—যতপিও “বর্গকামঃ” বা “পুত্রকামঃ” ইত্যাদির মত “প্রতিদিন সন্ধ্যা করিবে” “যাবজ্জীবন
অগ্নিহোত্র যাগ করিবে”—ইত্যাদি স্থলে ফলবিশেষের কথা শ্রুতিতে উল্লেখ নাই, তথাপি
অপুরুষার্থব্যপারে (প্রয়োজন উদ্দেশ্য ভিন্ন কৰ্মে) জ্ঞানী ব্যক্তিকে প্রবৃত্ত করিতে, বিধি অশক্ত
হয় বলিয়া “বিশ্বজিত নামক যাগ করিবে”—এইরূপ স্থলে বিধিতে ফলের কথা উক্ত না
থাকিলেও যেমন কিছু ফলের কথা কল্পনা করিতে হয় তদ্রূপ “প্রতিদিন সন্ধ্যা করিবে”—
ইত্যাদি স্থলেও কিছু ফল আছে বুঝিতে হইবে । এবং শুরু মতে অতিশয় শ্রদ্ধাবশতঃ স্বসিদ্ধিই
বিধির প্রয়োজন, সূত্ররূপে বিধি কোন ফলের অপেক্ষা করে না—এইরূপ মন্তব্যও ঠিক নহে,
যেহেতু পুরুষের প্রবৃত্তির অনুপপত্তি দৃষ্টপরিহারণীয় হয় বলিয়া (অর্থাৎ পুরুষের ঐরূপ নিফল
কৰ্মে প্রবৃত্তি হওয়া অসম্ভব) আর নিত্যকৰ্ম্মাদিতেও ফলশ্রুতি দেখা যায়, যথা—“ইহা হইবে
সকলের পুণ্যলোক প্রাপ্তি হয়,” “কৰ্ম্মদ্বারা পিতৃলোকে যায়,” “ধৰ্ম্মের দ্বারা পাপ অপনোদিত
হয়”—ইত্যাদি । [উক্ত শ্রুতিসকলেও নিত্যকৰ্মের ফলোন্মেষ রহিয়াছে] অতএব সকল
কৰ্মের ফলত্যাগকেই যে পণ্ডিতেরা ত্যাগ বলেন—ইহা যুক্তিস্কৃতই ।

যদি বল ফলত্যাগ করিলে লোকের তৎ কৰ্মে প্রবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা নাই, না—তাহা
নহে । যেহেতু “সংযোগপৃথক্ প্রকারে”—সকল কৰ্ম দ্বারাই বিবিধিযা অর্থাৎ তবজ্ঞানেন্দ্রা
উৎপন্ন হয়—ইহা বলা হইয়া থাকে । এ বিষয়ে শ্রুতি এই যে “ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ,
দান, তপস্যা ও অনাশক (ভোগাদিহীনতা বা সন্ন্যাস) দ্বারা সেই-আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা
করেন । কৰ্ম ফলবন্ধক, অতএব কৰ্মের ফলত্যাগ করিয়া বিবিধিবার্হ (তত্ত্বজ্ঞানেন্দ্রা) সকল
কৰ্মেরই অহুষ্ঠান করণীয় হইতে পারে । নিত্যানিত্য বস্তুর বিবেক দ্বারা দেহাদিতে অহংবুদ্ভি
নিবৃত্ত হইয়া বুদ্ধির প্রত্যক্ প্রবণতা জন্মে, ইহাই বিবিধিযা শব্দের অর্থ । সম্ভবতঃ জন্ত জ্ঞানের
অবিরুদ্ধ যথোচিত আবশ্যক ততটুকু মাত্র বা ততদিন পর্য্যন্ত কৰ্ম করিয়া তাহার ফলত্যাগ
করিতে পারাই প্রকৃত কৰ্মত্যাগ, স্বরূপতঃ কৰ্মত্যাগ (অলমের মত আদৌ কৰ্ম না করা)
কৰ্মত্যাগ নহে । শ্রুতিতে আছে—“ইহলোকে কৰ্ম্মাণি করিয়া শতবর্ষ পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে
ইচ্ছা করিবে”—পরে (চিন্তের প্রত্যক্ প্রবণতাদ্বারা বিবিধিযা জন্মিলে) যতঃই কৰ্ম্মসকল নিবৃত্ত

হয়। তাই নৈকৰ্ম্ম্যসিদ্ধিতে বলিতেছেন যে কৰ্ম্মসকল চিন্তাশক্তি দ্বারা বুদ্ধির প্রত্যাক্ষ প্রবণতা উৎপাদন করাইয়া কৃতার্থ করে। তখন কৰ্ম্ম আপনিই অন্তপ্রাপ্ত হয়, যেমন মেঘ প্রাবৃটের (বর্ষার) শেষে আপনা-আপনি অন্ত প্রাপ্ত হয়। আর ভগবান্ তৃতীয় অধ্যায়ে বলিয়াছেন—যিনি আশ্রয় তি ও আশ্রয়তৃপ্ত তাঁহার কোন কৰ্তব্য কৰ্ম্ম থাকে না। যোগবশিষ্ঠে বশিষ্ঠও বলিয়াছেন—“যোগী ব্যক্তির কৰ্ম্মের মূলভূত সঙ্কল্প নষ্ট হয় বলিয়া কৰ্ম্মসবলকে আর তাঁহার ত্যাগ করিতে হয় না, কৰ্ম্মই তাঁহাকে ত্যাগ করে। অথবা জ্ঞাননিষ্ঠার বিক্ষেপকত্ব দেখিয়া যোগী কৰ্ম্ম ত্যাগ করেন। শ্রীমদ্ভগবতে ১১শ স্কন্ধের ২০শ অধ্যায়ে ভগবান্ উদ্ভবেকে বলিতেছেন—“যতদিন না বৈরাগ্য জন্মে, অথবা যতদিন মৎকথ শ্রবণে শ্রদ্ধা উৎপন্ন না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত কৰ্ম্ম (নিত্য নৈমিত্তিক) করিতেই হয়। জ্ঞাননিষ্ঠ বিবর্ত পুত্র অথবা মন্তস্তগণ অপেক্ষক হইয়া থাকেন (অর্থাৎ কৰ্ম্মের অপেক্ষা রাখেন না)। তাঁহার লিপ্ত ও আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া অবিধিগোচর হইয়া (অর্থাৎ বিধিপত্রভুক্ত না হইয়া), যথেষ্টা বিচরণ করিবেন। আর বিস্তার করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই, এইবার শ্রুত বিহয়ের অন্তরণ করা যাউক ॥ ২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—কুটম্ব দ্বারা প্রকাশ হইতেছে—বর্তমান অবস্থায় ইচ্ছা রোকার নাম সন্ন্যাস, আর ভবিষ্যতে ইচ্ছা রোকার নাম ত্যাগ সকল কৰ্ম্মের।—কাম্য কৰ্ম্ম ত্যাগ করাকেই সন্ন্যাস বলে এবং সমস্ত ফলের ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া কৰ্ম্ম করাকে ত্যাগ বলে। ইহাই নৈকৰ্ম্ম্যসিদ্ধি বা ইচ্ছারহিত অবস্থা। অল্প বাসনা সত্ত্বেও ত্যাগী হওয়া যায় না। যিনি ভগবানের উপর সম্পূর্ণ আশ্রয়সমর্পণ করিতে পারিয়াছেন, ঐহার প্রাণ একেবারে আটকাইয়া গিয়াছে যিনি সৰ্ব্বদা ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিতে পারেন, এবং সেইখানে থাকিয়া অনিচ্ছার ইচ্ছায় সংসারধৰ্ম্ম ও বাবতীয় কার্য করিয়া যান তিনিই যথার্থ ত্যাগী। সন্ন্যাসীরা বর্তমানের ইচ্ছা ত্যাগ করেন, বর্তমানের ইচ্ছা বা সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া ক্রিয়া করিতে না পারিলে ক্রিয়ার ফল যে ক্রিয়ার পর অবস্থা বা শান্তি তাহা পাইবেন কিরূপে? অতএব ক্রিয়ার পর অবস্থা বা শান্তি পাইবার আশায় ঐহার বর্তমান সঙ্কল্প বা ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া খুব মন দিয়া ক্রিয়া করেন তাহারাই “সন্ন্যাসী”। বাহ্যের সন্ন্যাসকেও সমস্ত কৰ্ম্ম, অন্তর্ধান প্রভৃতি ত্যাগ করিতে হয়, কিন্তু তাঁহার মোক্ষের ইচ্ছা থাকে। ত্যাগীর এই মোক্ষের ইচ্ছা থাকে না, কারণ তিনি পরাবস্থা-প্রাপ্ত। পরাবস্থা তাঁহারই হয় ঐহার কোন ইচ্ছা থাকে না। অতঃপর ইচ্ছা থাকিলে মন একাগ্র হইতে পারে বটে, কিন্তু রুদ্ধ হয় না। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধাদি সমস্তই কাম্য বস্তু; এগুলির দিকে মন দৌড়াইলে মন একাগ্রভূগিকারে পৌছাইতেই পারে না, সেইজন্য ঐহার মনের উপরাম বা শান্তি চান তাহার প্রাণ-বায়ুকে ব্রহ্মমার্গে একগুণ সতর্কতার সহিত পরিচালনা করিবেন যেন মন বাহ্যবস্তুর প্রলুব্ধ হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত না হয়, বিক্ষিপ্ত হইলে শান্তিলাভ ঘটিবে না। ব্রহ্মমার্গ বা সূর্য্যায়-মনসহ প্রাণবায়ুকে প্রবিষ্ট করাইতে হইলে মনের সাধু অসাধু সমস্ত সঙ্কল্প-বিবরণই পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং কুটম্ব লক্ষ্য রাখিয়া ব্রহ্মমার্গ সূর্য্যায় মধ্যে কেবল মনসহ বায়ুকে চালনা করিতে হইবে। অথবা তখন আশ্রমক্ষেত্র বা বিষ্ণুপদে মনের লক্ষ্য থাকিবেই। সব লক্ষ্যকে ছাড়িয়া

দিয়া শেষ লক্ষ্যের পানে চাহিয়া থাক। বা সেই একমাত্র লক্ষ্যটিকে ধরিয়া থাকার নামই সন্ন্যাস। কিন্তু বর্তমান অল্প সমস্ত লক্ষ্যের প্রতি উদাসীন হইতে না পারিলে চরম লক্ষ্যটিকে মন দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকিতে পারে না, এবং লক্ষ্যটিকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া না থাকিলেও আশ্রমক্ষেত্র ভেদ হইবে না। ইহাই সন্ন্যাস—ইহাতে অল্প কোন বস্তু প্রাপ্তির প্রতি লক্ষ্য নাই বটে, কিন্তু পরাবস্থার স্থিতির জন্য সম্পূর্ণ ইচ্ছা আছে। ত্যাগীরা এ অবস্থার উপরে আশ্রম : সর্ব কৰ্ম্মের ফলত্যাগই তাঁহাদের স্বাভাবিক অবস্থা হয়। সন্ন্যাসীদের মত কৰ্ম্ম জোর করিয়া ছাড়িতে হয় না। কাম্যের মত তাঁহার মনে অবিরত সংকল্পের টেউও উঠে না, যাহা কিছু সমস্তই সহজভাবে আপনা-আপনি তাঁহার মন হইতে গলিয়া পড়ে। সন্ন্যাসীদের মত ক্রিয়ার পরাবস্থার দিকেও টান নাই, কারণ উহা তখন তাঁহার সহজ অবস্থা, সূতরাং মনস্থির হওয়ার আর আশ্রমক্ষেত্র মন রাখিবার তাঁহার আবশ্যক হয় না। সর্ব সঙ্কল্প তখন আপনা হইতেই ছুটিয়া যায় অথচ প্রাণক্রিয়া স্বভাবের সূর্য্যায় চলিতে থাকে। এইরূপ স্থিতি প্রাপ্ত হইলে যোগীর নিত্য-নৈমিত্তিক কৰ্ম্মও বাধা উৎপন্ন করে না। ত্যাগীর ইহাই স্বাভাবিক লক্ষণ, এ অবস্থা তাঁহারাই জ্ঞানেন ঐহার “বিচক্ষণ” অর্থাৎ ঐহার বাহিরে দৃষ্টি নাই।

কলোদেশ করিয়া যজ্ঞ, জপ, দানাদি বাহ্য করা যায় সে সমস্তই কাম্য কৰ্ম্ম। দেহেন্দ্রিয়াদিতে যতক্ষণ অহং বোধ থাকিবে, ততক্ষণ কাম্যকৰ্ম্ম ত্যাগ হওয়া অসম্ভব। ফলাকাঙ্ক্ষা মনে থাকিতে নিকাম ভাবে কৰ্ম্ম হইতে পারে না। ইষ্ট সাধনের সঙ্কল্প হইতেই কাম বা ইচ্ছা জন্মে। পুনঃ পুনঃ জন্ম-মাতায়াতের কারণই হইল এই কাম সঙ্কল্প। কাম্যকৰ্ম্মও বেদবিহিত কৰ্ম্ম, তাহা অমুষ্ঠাতাকে পরলোকে বর্ণিদি স্থান দান করিয়া থাকে, কিন্তু ইহাতে জন্মমৃত্যু ঘুটিতে পারে না। কামনা চরিতার্থ করিবার জন্য যে সকল কৰ্ম্ম অমুষ্ঠেয় বলিয়া শাস্ত্রে বিহিত আছে, সেই সকল কৰ্ম্ম পরিত্যাগের নামই সন্ন্যাস। কিন্তু একবারে সমস্ত কাম্যকৰ্ম্ম ত্যাগ করা যায় না, অল্প কোন সঙ্কল্প না থাকিলেও মোক্ষের ইচ্ছা থাকিবেই। একটু কামনা থাকিতেও গুণের খেলা বোধ করা যায় না। তবে সঙ্কল্প বোধের উপায় কি? শাস্ত্র বলিলেন—যদি কৰ্ম্ম-ত্যাগ করিতে না পার তবে বিষ্ণু জীতির জন্য কৰ্ম্ম কর। কৰ্ম্ম করিতে করিতে মনে মনে বল—হে ভগবন্! আমার এই কৰ্ম্ম যেন তোমার শ্রীতিলোভ হয়, তুমি প্রসন্ন হইলেই আমার কৰ্ম্ম সার্থক হইবে। বিষ্ণু সকলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অন্তর্য্যামিনরূপে রহিয়াছেন। নিজের অন্তঃ-করণের মধ্যে এই অন্তর্য্যামিকে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে। যেখানে মনেন্দ্রিয়াদির সমস্ত চাকলা মিটিয়া গিয়া পরাস্থিতি বা পরমানন্দ মাত্র অবশিষ্ট থাকে তাহাই বিষ্ণুর পরমপদ। ঐহার অল্প বাহ্য কৰ্ম্মাদিতে আসক্তি নাই, কিন্তু এই পরমানন্দধামে প্রবেশ লাভের জন্য ব্যাকুলতা আছে, তিনিই সন্ন্যাসী। ক্রমে ক্রমে তাঁহার সমস্ত বাহ্যচেষ্টা নিবৃত্ত হইয়া যায়। উহাই পরমপদ, নিশ্চলস্থিতি বা অবরুদ্ধরূপ। তখন আর কিছুই সহিত কোন সঙ্কল্প থাকে না। ইহাই সন্ন্যাসের দ্বারা অত্যন্তশুদ্ধ সত্ত্বশুদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া—“নৈকৰ্ম্ম্যসিদ্ধিঃ পরমাঃ সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি”। ইহার বিস্তৃত বিবরণ এই অধ্যায়ের ৫১ঃ২১ঃ৩০ঃ৩১ঃ৫৫ প্রোকে ভগবান্ বলিয়াছেন। এই অবস্থা পরিপক্ব হইলে তবে ত্যাগী হওয়া যায়, তখন বাহ্য সন্ন্যাস ব্যতীতও সাধক পরমহংস অবস্থায় প্রবেশ করিতে পারেন। সমাধি অবস্থা লাভের পর মন-বুদ্ধি সমস্তই

(সাংখ্য ও মীমাংসক মত)

ত্যাগ্যং দোষবদিত্যেকৈ কৰ্ম প্রাহ্মনীষিণঃ।

যজ্ঞদানতপঃকৰ্ম ন ত্যাগ্যমিতি চাপরে ॥ ৩

নির্ণয় হইয়া যায়, তাহাতে আর বিষয়ের ছাপ পড়ে না। তখন মন কুটস্থে আটকাইয়া থাকিলেও সাধকের অনিচ্ছার ইচ্ছায় সব কাজই চলিতে পারে, কুটস্থ বা বিকুপ হইতে বিচলিত না হইয়াও তিনি সকল প্রকার কৰ্ম করিতে পারেন। সব কাজই তাঁহার হয় কিন্তু তাহাতে নিজের কামনা কিছুই থাকে না। ইহাই প্রকৃত পক্ষে সৰ্ব্বকৰ্মফল-ত্যাগের অবস্থা। ইহাই সৰ্ব্বোচ্চ বা সৰ্ব্বোত্তম অবস্থা। সৰ্ব্ব কৰ্ম করিয়াও—‘নৈব কিকিৎ কৰোতি সঃ’। ইহাই বিদ্বৎ সন্ন্যাস; চিন্তাশুদ্ধি মনোনাশ হই-ই হইয়া গিয়াছে। কিন্তু “কৰ্মযোগং বিনা জ্ঞানং কশ্চিৎ মৈব দৃশ্যতে”—ক্রিয়াযোগ ব্যতীত একপ জ্ঞান হইতে কাহারও দেখা যায় না। কুটস্থে লক্ষ্য রাখা যখন সম্ভব হইয়া যায় তখন সমস্ত পাপ দূর হইয়া যায়, তাঁহার মনে আর পাপ জন্মিতে পারে না, তখনই প্রকৃত জ্ঞান লাভ বা ব্রাহ্মীস্থিতি হইয়া থাকে। “জ্ঞানং উৎপত্ততে পুংসাং ক্ষমাং পাপস্ত কৰ্মণঃ।” এই জ্ঞান উৎপন্ন হইলে কৰ্মে অকৰ্ম দেখিবার সামর্থ্য লাভ হয়। তাই সমস্ত কৰ্মের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াও যোগীর কৰ্মবন্ধন হইতে পারে না। এই সকল মহাপুরুষের সমস্ত কৰ্ম বিকৃ-প্রীত্যর্থ হইয়া থাকে, এবং তাঁহার দ্বারা বাহ্য কিছু হয় সবই ভগবৎ ইচ্ছায় সম্পাদিত হইতেছে বলিয়া তাঁহার মনে হয়। এই সকল পুরুষের প্রতি লক্ষ্য করিবার ভগবান্ বলিয়াছেন—“জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দেষ্তি ন কাঙ্ক্ষতি”। ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত বলিয়া ইহাদের কালের সীমা নির্দেশ থাকে না, তাঁহারা কালাতীত বা ‘অকাল’ পুরুষ। কৰ্ম করিবার বা কৰ্ম না করিবার কোন ইচ্ছাই থাকে না। সুখাভিলাষ বা হঃসত্যাগ, জীবিতোচ্ছা বা মরণভয় তাঁহাদের কিছুই থাকে না। এই সকল পুরুষেরা হৃদাতীত অবস্থা লাভ করিয়া চিরদিনের জন্য মুক্ত হইয়া গিয়াছেন ॥ ২

অর্থঃ। একে মনীষিণঃ (কোন কোন পণ্ডিতগণ) কৰ্ম দোষবৎ (কৰ্ম দোষবিশিষ্ট) ইতি ত্যাগ্যং (এইজন্য ত্যাগ্য) প্রাহ্মঃ (বলেন); অপরে চ (আবার কেহ কেহ) যজ্ঞদান-তপঃকৰ্ম (যজ্ঞ, দান ও তপস্করূপ কৰ্ম, ন ত্যাগ্যম্ ইতি, ত্যাগ্য নহে এইরূপ বলেন) ॥

শ্রীধরঃ। অবিদ্বৎ: কৰ্মত্যাগমাত্রম্ এব ত্যাগশব্দার্থঃ ন কৰ্মত্যাগ ইতি। এতদেব মতান্তরনিবাসেন দূতীকর্তৃত্বং মতভেদং দর্শয়তি—ত্যাগ্যমিতি। দোষবৎ হিংসাদোষবৎস্বেন কেবলং বন্ধকম্ ইতি হেতোঃ সৰ্ব্বমপি কৰ্ম ত্যাগ্যমিত্যেকৈ—সাংখ্যঃ প্রাহ্মঃ মনীষিণ ইতি। অত্র অয়ং ভাবঃ—‘মা হিংস্তাং সৰ্ব্বা ভূতানি’ ইতি নিবেদ্য, পুরুষত্ব অনর্থহেতু হিংসা ইত্যাহ। “অগ্নিযোমীয়ং পত্তমালভেত” ইত্যাদি প্রাকরণিকো বিধিঃ হিংসার: ক্রতুপকারকত্বম্ আহ। অতো ভিন্নবিষয়ত্বেন সামান্যবিশেষজ্ঞানযোগেচরত্বাৎ বাধ্যবাধকতা নান্তি। ত্রব্যাসাধ্যৈশ্চ সৰ্ব্বৈষপি কৰ্মম্ হিংসাদে: সম্বন্ধাৎ সৰ্ব্বমপি কৰ্ম ত্যাগ্যমেবেতি। তদুক্তং “দৃষ্টবদামুশ্রবিক: স হৃবিশুদ্ধিক্রিয়াতিশয়যুক্ত:” ইতি। অস্তার্থঃ—উপায়ো জ্যোতিষ্টোমাদি:, সোহপি দৃষ্টোপায়বৎ,

গুরুপাঠাৎ অমুশ্রয়তে ইতি অমুশ্রবো বেদ: তদ্বোধিত:। তত্র অবিদ্বদ্ধিঃ—হিংসা, তথা ক্ষয়:—বিনাশ:। অগ্নিহোত্রজ্যোতিষ্টোমাদি-জ্ঞান-স্বর্গেষু ভারতম্যং চ বর্ততে। পরোৎকর্ষস্ত সৰ্ব্বান্ দুঃখী কৰোতি।

অপরে তু মীমাংসক। যজ্ঞাদি কৰ্ম ন ত্যাগ্যমিতি প্রাহ্মঃ। অয়ং ভাবঃ—ক্রতুর্থাপি সতি ইয়ং হিংসা পুরুষেণ এব কৰ্তব্য্যা, সা চ অন্তোদ্দেশেনাপি কৃত্য পুরুষস্ত প্রত্যবায়ং হেতুবেব। যথা হি বিধি: বিধেয়স্ত তদুদ্দেশেন অমুষ্ঠানং বিধতে। তাদর্শ্যলক্ষণত্বাৎ শেষতস্ত ন তু এবং নিষেধো নিষেধ্যস্ত তাৎপর্যম্ অপেক্ষতে, প্রাপ্তিমাাত্রাপেক্ষিতত্বাৎ। অত্রথা অজ্ঞানপ্রমাদাদি-ক্রতে দোষাতাবশ্রমত্বাৎ। তদেবং সমানবিষয়ত্বেন সামান্যশাস্ত্রস্ত বিশেষেণ বাধ্যং নান্তি দোষবত্ত্বম্। অতো নিত্যং যজ্ঞাদি কৰ্ম ন ত্যাগ্যমিতি। অনেন বিধিনিষেধয়ো: সমানবলতা বার্থ্যতে সামান্য বিশেষজ্ঞানং সম্পাদয়িত্বম্ ॥ ৩

বঙ্গাভুবাদঃ। [অবিদ্বান্ ব্যক্তির নিকট ফলত্যাগমাত্রই ত্যাগ শব্দের অর্থ, কৰ্মত্যাগ (প্রকৃত) ত্যাগ নহে—মতান্তরনিবাসনাদি ইহার দূতীকরণার্থ মতভেদ দেখাইতেছেন]—দোষবৎ—হিংসাদি দোষযুক্ত বলিয়া (কৰ্মমাত্রই) বন্ধনের হেতু, এইজন্য কোন কোন মনীষী (অর্থাৎ সাংখ্যাদিগণ) সকল কৰ্মই ত্যাগ্য বলিয়া থাকেন। ইহার ভাবার্থ এই যে—‘মা হিংস্তাং সৰ্ব্বভূতানি’—অর্থাৎ ভূতমাত্রকেই হিংসা করিবে না। এই নিষেধ-বিধিতে হিংসাকে পুরুষের অনর্থহেতু বলা হইল, আবার—‘অগ্নিযোমীয়ং পত্তমালভেত’—অগ্নিযোমীয়া যজ্ঞে পত্তমালসা করিবে—ইত্যাদি হিংসাবিষয়ক এই যে বিধি ইহাতে হিংসাকে যজ্ঞক্রিয়ার অঙ্গ-রূপে বলা হইয়াছে। অতএব উক্ত বিধির ভিন্ন বিষয়ক বলিয়া সামান্য বিশেষজ্ঞানের বিষয় হইতেছে না, অতএব হিংসা অনর্থসাধক নহে—ইহা বলা যায় না। ত্রব্যাসাধ্য সকল কৰ্মই হিংসার সঙ্গাবনা থাকার কৰ্মমাত্রই পরিত্যাগ্য। এই সম্বন্ধে উক্তি (সাংখ্যের) এই যে—‘দৃষ্টবদামুশ্রবিক: স হৃবিশুদ্ধিক্রিয়াতিশয়যুক্ত:’—অর্থাৎ আমুশ্রবিক (বা বেদবোধিত) উপায় যে জ্যোতিষ্টোমাদি তাহাও দৃষ্টোপায়ের মতই অবিদ্বদ্ধি বা হিংসাদ্বারা যুক্ত। তদুপ লক্ষ্যযুক্ত, এবং অতিশয় অর্থাৎ অগ্নিহোত্র, জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের জন্য যে স্বর্গ হয় তাহার মধ্যেও ভারতম্য আছে। পরের উৎকর্ষে অপরকে দুঃখী করে।

[আমুশ্রবিক—গুরুর মুখ হইতে যাহা শ্রুত হয় তাহার নাম আমুশ্রব অর্থাৎ বেদ, তদ্বোধিত যাহা তাহাই আমুশ্রবিক।]

অপরে অর্থাৎ মীমাংসকেরা বলিয়া থাকেন যে যজ্ঞাদি কৰ্ম পরিত্যাগ্য নহে। তাহার ভাবার্থ এই যে, যজ্ঞার্থ হিংসা হইলেও সে কৰ্মে পুরুষের প্রত্যবায় হয়। যেমন বিধি হইলেই বিধেয় কৰ্ম বাহার উপকারক হয় তাহার উদ্দেশ্যই সেই বিধেয় কৰ্মের অমুষ্ঠান বিধান করে, যেহেতু যাহা বিধেয় তাহা উদ্দেশ্যের শেষ অর্থাৎ অঙ্গ। কিন্তু নিষেধবিধি-নিষেধ্য যে হিংসাদি তাহার তাৎপর্যকে অপেক্ষা করে না, অর্থাৎ নিষেধ্য কাহারও উপকারক হইতেছে কিনা তাহার অপেক্ষা করে না, শুধু নিষেধের প্রাপ্তিমাত্র থাকিলেই হইল। অতএব হিংসা করিত না বলিলে যে কোনরূপ হিংসা তাহাই নিষেধের বিষয় হইতেছে। ইহা স্বীকার না করিলে অজ্ঞানক্রতু বা প্রমাদজনিত হিংসার দোষাতাব হয়। আবার যজ্ঞার্থ হিংসা করিবে

[illegible]

বাম নাম হুমিবন করে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ ।
 কহ কবীর হুমিবন করে, নারদ গুণ অক শেষ ॥
 সনকসিক হুমিবন করে, নামা প্রব প্রজ্ঞাপ ।
 জন কবীর হুমিবন করে, ছাঁড়ি সজন বকবার ॥

জন কবার স্থানবন করে, হাড় বানায়।
 হুতরাং সর্বাঙ্গানহাতেও অরণ চলে কিন্তু অরণ তাঁহাদের জোর করিয়া করিতে হয় না,

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম ।

ত্যাগো হি পুরুষব্যাভ্র ত্রিবিধঃ সম্প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৪

ইহা তাঁহাদের আপনা-আপনিই হয়। কিন্তু ঐহাদের চিত্ত এখনও স্থির হয় নাই, তাঁহাদের পক্ষে কৰ্ম ভাঙ্গ্য নহে। বরং ত্যাগ করিলে মোক্ষমার্গ অবরুদ্ধ হইয়া যায়।

যাঁহারা মনকে নিজ গনে আনিতে পারিয়াছেন তাঁহাবাই মনীষী। তাঁহাদের প্রাণ স্থির হওয়ায় তাঁহারা ব্রাহ্মী-স্থিতি লাভ করিতে পারিয়াছেন। কোনরূপ বাহ্য কৰ্ম তাঁহাদের পক্ষে আর করা সম্ভব নহে। তাঁহাদের প্রাণ বিনা চেষ্টাতেই তখন স্থির হইয়া থাকে, হৃৎকরাংটানা ফেলার আর প্রয়োজনই হয় না। যজ্ঞ, দান, তপস্বীত্যাখ্যা নহে—এ উপদেশ তাঁহাদের পক্ষেই বৃথিতে হইবে যাঁহাদের প্রাণ আচ্ছাদিত বা তদুর্দ্ধে স্থির থাকে না। ক্রিয়ার পবাবস্থা যাঁহারা স্থায়ীরূপে প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহারা ক্রিয়ার অন্তঃসংছাড়িয়া দিলে তাঁহাদের নির্দিধ্যাসন (ধ্যান) দুটয়া উঠিবে না। সাধনাধারা আশ্রয়ণ না হওয়া পর্যন্ত সাধন ঠিক ঠিক মত চালাইতে হইবে। অসময়ে ক্রিয়া ত্যাগ করিলে তাহার দুফলই নষ্ট হয়। সেইজন্যই মীমাংসকেরা সকামীদের (বেহমত্বদী) ক্রম কৰ্মের বিধান করিয়া গিয়াছেন, পরে জ্ঞানলাভের যোগ্যতা লাভ করিবেন বলিয়া। যাঁহাদের প্রশংস্যান লাভ হইয়াছে বা যাঁহারা যোগাক্রম তাঁহাদের কৰ্ম করিবার আর আবশ্যকতাই নাই। নদীর পর পারে পৌঁছিয়া আর নৌকার প্রয়োজন হয় না বটে, কিন্তু তৎপূর্বে নহে ॥ ৩

অল্পম্ । ভরতসত্ত্বং (হে ভরতশ্রেষ্ঠ !) তত্র ত্যাগে (সেই ত্যাগ বিষয়ে) যে নিশ্চয়ং
(আমার নিশ্চয় অর্থায় সিদ্ধান্ত) শৃণু (শ্রবণ কর) । পুরুষব্যাজ (হে পুরুষশ্রেষ্ঠ !)
ত্যাগঃ হি ত্রিবিধঃ (ত্যাগ ত্রিবিধ বলিয়া সংপ্রকীৰ্ত্তিতঃ (কথিত হয়) ॥ ৪

শ্রীধর। এবং মতভেদে উপপত্ত্য স্বমতঃ কথয়িতুমাহ—নিশ্চয়মিতি। তত্রৈবঃ
 বিপ্রতিপদ্যে ত্যাগে নিশ্চয়ঃ মে বচনাৎ শৃণু। ত্যাগস্ত্য লোকশ্রুতিস্বভাৎ কিমত্র শ্রোতব্যম্ ?
 ইতি মা অবশংস্থা ইত্যাহ। হে পুরুষতঃ—পুরুষশ্রেষ্ঠ! ত্যাগোহয়ং হৃকোষঃ। হি—বস্মাৎ
 অয়ং কথ্যত্যাগঃ তববিস্তিঃ তামসাধিভেদেন ত্রিবিধঃ সমাগ্ বিবেকেন প্রকীৰ্ত্তিতঃ। ত্রৈবিধ্যাঃ
 চ “নিয়ন্তস্ত তু সংশ্রাসঃ কর্দধঃ” ইত্যাদিনা বক্ষ্যতি ॥ ৪

বঙ্গানুবাদ। [এইরূপ মতভেদ প্রদর্শন করিয়া এক্ষণে স্বীয় মত প্রকাশ করিতেছেন]
—এইরূপ বিস্কন্ধরূপে প্রতিপন্ন ত্যাগ বিষয়ে সিদ্ধান্ত কি তাহা আমার বাক্য হইতে শ্রবণ কর।
ত্যাগের অর্থ লোকপ্রসিদ্ধ অর্থানুসারেই জানে, অতএব তদ্বিষয়ে আর সন্দেহের কি আছে
—এরূপ অবজ্ঞা করিও না। তাই বলিতেছেন—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, ত্যাগ বড় দুষ্কর্য্য বিষয়,
যেহেতু এই কর্তৃত্যাগ তত্ত্বদর্শিগণ কর্তৃক সমাক্ষেপিত বিবেচনা পূর্ব্বক তামসাধি ভোদ্য জিবিধ
বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই জৈবিধা ‘নিয়ন্তৃত্ত্ব সন্মায়নঃ’ ইত্যাদি শ্লোকে বলিবেন ॥ ৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-ভ্যাগী ব্যক্তি সকল ইচ্ছাকেই খেয়ে ফেলেছে বর্তমান ও ভবিষ্যতের, তন্মিষিতে সে ব্যাঘ্রের মতন পুরুষ। তাহা তিন প্রকারের।—
ভ্যাগটি সুবিজ্ঞাত বিষয় নহে। সুতরাং তদ্বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক, তাই ভগবান

(যজ্ঞ, দান ও তপ অমুঠেয়— কারণ উহার পাবন)

যজ্ঞদানতপঃ কৰ্ম ন ত্যাজ্যং কার্ষমেব তৎ ।

যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥ ৫

অৰ্জুনকে বলিতেছেন ত্যাগ সাংখ্যিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে তিন প্রকারের হইয়া থাকে । প্রথমতঃ জানলাভ করিলে সাধকের যে ত্যাগ স্বভাবতঃই হইয়া থাকে তাহাই শ্রেষ্ঠ ত্যাগ, এই ত্যাগেব জ্ঞান মনের উপর কোন ক্ষোভ জবরদস্তি করিতে হয় না । দ্বিতীয় প্রকারের যে ত্যাগ তাহা সাধকের স্বাভাবিক নহে, তাহা অজ্ঞিত, অর্থাৎ তাহা স্বদেশ-মননাদি সাধন প্রভাবে ও বিচারের দ্বারা ধীরে উৎপন্ন হয়, এবং তজ্জ্ঞ সাধকেও অনেক পরিশ্রম করিতে হয় । ত্রুপ ত্যাগ নিষ্ঠুর না হইলেও সাংখ্যিক । সাংখ্যিক ত্যাগে অভ্যস্ত না হইলে কেহই জ্ঞানের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে সক্ষম হন না । তৃতীয় প্রকারের যে ত্যাগ—তাহা স্কাং বা রাজসিক, তখনও চিত্ত অন্তঃ, তাই ইহাদের দ্বারা কিছু ত্যাগ তাহা কাম্যবস্ত্র প্রাপ্তির দ্বারা । অনেকে সাধনা করেন, যোগাভ্যাস করেন আত্মদর্শনের দ্বারা নহে, শুধু কিছু ঐশ্বর্য লাভের দ্বারা, তাহাতে চিত্তকে উন্নত ও উদার করিতে পারে না, আর দ্বারা সাধনার প্রধান নক্ষা আত্মদর্শনকার তাহা এই শ্রেণীর সাধকের কদাচিৎই ঘটিয়া থাকে । রাজ্যপ্রাপ্তির দ্বারা প্রবের গৃহত্যাগ ও তপস্যা এই শ্রেণীর ত্যাগের মধ্যে গণ্য । আর একপ্রকারের ত্যাগ আছে দ্বারা চতুর্থ শ্রেণীর ত্যাগ—উহাই তামসিক ত্যাগ । ইহা বৈরাগ্যবশতঃ ত্যাগ নহে, কৰ্ম ক্রেশমাধ্য বলিয়া ভ্রান্তিবশতঃ যে কৰ্ম ত্যাগ তাহাই তামসিক ত্যাগ । যেমন উপার্জনে অক্ষম হইয়া বা গৃহে ভৎসিত হইয়া মনের যে নিকেষ তাব হয়, তজ্জ্ঞ পুত্রকলত্রগৃহাদির যে ত্যাগ তাহাই নিকৃষ্ট ত্যাগ । প্রকৃত ত্যাগী যিনি তাঁহার কোন ইচ্ছা বা সঙ্কল্প থাকে না—ইহার আর প্রকার ভেদ নাই, ত্যাগী মাত্রেরই একই রকম অবস্থা ॥ ৪

— — —

অম্বয় । যজ্ঞ-দান-তপঃ কৰ্ম (যজ্ঞ, দান ও তপস্কারূপ কৰ্ম) ন ত্যাজ্যং (ত্যাজ্য নহে) তৎ (তাহা) কার্ষ্যম্ এব (করাই কর্তব্য) । যজ্ঞঃ দানং তপঃ চ এব (যজ্ঞ, দান এবং তপস্যা) মনীষিণাং (বিবেকী বা মুহুগুণের) পাবনানি (চিত্তশুদ্ধিকারক) ॥ ৫

শ্রীধর । প্রথমং তাং নিশ্চয়মাহ যজ্ঞেতি দ্বাত্যাম্ । মনীষিণাং—বিবেকিণাং, পাবনানি—চিত্তশুদ্ধিকারিণি ॥ ৫

বঙ্গানুবাদ । [প্রথমতঃ দুইটি শ্লোকদ্বারা সেই নিশ্চয়টি বলিতেছেন] যজ্ঞ, দান ও তপস্যা এই ত্রিবিধ কৰ্ম পরিত্যাজ্য নহে, কিন্তু অমুঠেয়, কারণ উহা বিবেকিগণের চিত্ত-শুদ্ধিকর ॥ ৫

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ক্রিয়া, ক্রিয়া দেওয়া, ব্রহ্মেতে থাকা কর্তব্য কৰ্ম, ইহাতে মন পবিত্র হয় ।—মন পবিত্র না হইলে জ্ঞানোৎপত্তি হয় না । মনের পবিত্রতা যে কি তাহা পূর্ব পূর্ব অব্যয়ে অনেক বার বলা হইয়াছে, অর্থাৎ যে মনে কোন সঙ্কল্পের উদয় হয় না, সেই মনই পবিত্র মন । স্থিরাবস্থাই মনের সে পবিত্র ভাব । ক্রিয়া দ্বারা মন

(কিন্তু তাহা অমুঠান করিলে নিত্যকৰ্ম পাবন হইয়া থাকে)

এতান্যপি তু কৰ্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ ।

কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥ ৬

শুদ্ধ হইতে হইতে এতদূর শুদ্ধ হইয়া যায় যে তাহাতে আর সঙ্কল্পের উদয়ই হয় না । এই সঙ্কল্পশূন্য মনকেই শুদ্ধচিত্ত বলা হয়, তখনই উহা আত্মার সহিত মিলিয়া এক হইয়া যায় । ক্রিয়া দ্বারা মন সঙ্কল্পশূন্য হয় এইজন্ত চিত্তশুদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত ক্রিয়া করাই কর্তব্য । ক্রিয়াদানও চিত্তশুদ্ধির সহায়তা করে । অতঃ উপকারার্থ যে ত্যাগ তাহাতে স্বেচ্ছা হইবারই কথা । সকল দানের অপেক্ষা ইহাই বড় দান । ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর-অবস্থায় অন্ন অন্ন করিয়া থাকিতে পারিলেও সে চিত্ত নিশ্চয়ই শুদ্ধ হইয়া থাকে । যে সকল ক্রিয়াবান্দের ক্রিয়ার পর-অবস্থায় আরও হইয়াছে, তাহাদের মন আর অবিশুদ্ধ হয় না । ছান্দোগ্যে বলিয়াছেন—“ত্রয়ো ধর্মস্বজ্ঞা যজ্ঞোহধ্যয়নং দানমিতি”—যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান—এই তিনটি ধর্মের স্বজ্ঞ । “দর্শক এতে পুণ্যলোকা ভবন্তি”—এই সকল কর্মের দ্বারা লোকে পবিত্র হয় । যে সকল কর্ম সদ্ভাবের উদ্দীপক তাহাতেই জ্ঞানোৎপত্তির সহায়তা করে । সুতরাং প্রাণায়ামাদি ক্রিয়াযোগগুলি দ্বারা শাস্তাংভাবে জ্ঞানের উৎপাদক, তাহা কখনই পরিত্যাজ্য হইতে পারে না ॥ ৫

অম্বয় । পার্থ (হে পার্থ !) তু (কিন্তু) এতানি কৰ্ম্মাণি অপি (এই সকল কর্মও) সঙ্গং (আসক্তি) ফলানি চ (ও ফলাকাঙ্ক্ষা) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) কর্তব্যানি (করা উচিত) ইতি মে (ইহাই আমার) নিশ্চিতং উত্তমং মতং (নিশ্চিত উত্তম মত) ॥ ৬

শ্রীধর । যেম প্রকারেণ কৃতানি এতানি পাবনানি ভবন্তি তং প্রকারং দর্শয়ন্ আহ—এতান্যপি ইতি । যানি যজ্ঞাদানি কৰ্ম্মাণি ময়া পাবনানি ইত্যুতানি এতানি এব কর্তব্যানি । কথং ? সঙ্গং—কর্তৃত্বাভিনিবেশং ত্যক্ত্বা কেবলং দৈখ্যাদানতয়া কর্তব্যানি ইতি । ফলানি চ ত্যক্ত্বা কর্তব্যানীতি চ মে মতং নিশ্চিতং । অতএব উত্তমম্ ॥ ৬

বঙ্গানুবাদ । [যে প্রকারে কৃত হইলে এই সকল কর্ম পাবন অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধিকর হয়, তাহারই প্রকার (ভেদ) দেখাইবার দ্বারা বলিতেছেন]—যে সকল যজ্ঞদানাদি কর্মকে আমি পাবন বলিবাছি সেই সকল কর্মই করা উচিত । কর্ম কি ভাবে করিলে চিত্তশুদ্ধিকর হইবে তাহাই বলিতেছেন । সঙ্গ অর্থাৎ কর্তৃত্বাভিনিবেশ ত্যাগ করিয়া এবং ফল-কামনা ত্যাগ করিয়া কেবল দৈখ্যাদানতয়া রূপে কর্ম করা উচিত—ইহাই আমার নিশ্চিত অভিমত, অতএব ইহা উত্তম । [অর্থাৎ এইভাবে কর্ম না করিলে কর্ম পাবন হইবে না, সেইজন্ত উহা উত্তম] ॥ ৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এ সকল কর্ম ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া কর্তব্য ; এই আমার মত ।—কর্তৃত্বাভিনিবেশ ও ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া ক্রিয়া করিতে না পারিলে ক্রিয়ার ফল যে ক্রিয়ার পর-অবস্থা, তাহা লাভ করা যায় না । কেন লাভ করা যায় না—তাহা বলিতেছি । ক্রিয়াতে আসক্তি থাকা যে ধারাপ তাহা নহে, কিন্তু

(নিত্যকর্মের সংজ্ঞাস অর্থে)

নিয়তস্ত তু সন্ন্যাসঃ কর্মণো নোপপত্ততে ।

মোহান্তস্ত পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ৭

কলাকাক্ষা-হেতু যে ক্রিয়াতে আসক্তি তাহা ভাল নহে । কারণ ঐ ভাব লইয়া যে ক্রিয়া করে তাহার চিত্ত শুদ্ধ হয় না বা মনঃস্থির হয় না । সুতরাং ও ভাবে ক্রিয়া করা না করারই সমান দাঁড়ায় । সেইজন্য সাধকের মনে থাকি চাই-তিনি যে ক্রিয়া করিতেছেন, তাহা কোন জাগতিক লাভ বা প্ৰভুত্বের জন্ত নহে । যেহেতু ক্রিয়া করা গুরুত্ব আদেশ, সেইজন্যই ক্রিয়া করিতে হইবে । ফল কিছু নাই বলিয়া যে তাহাতে অবহেলা আসিবে তাহা হইলেও চলিবে না । সর্বান্তঃকরণ দিয়াই ক্রিয়া করিতে হইবে । সর্বান্তঃকরণ দিয়া ক্রিয়া করিলেই চিত্ত-মল অপনোদিত হয় এবং তাহাতেই চিত্ত বিশুদ্ধ হয় । নির্মল চিত্তেই জ্ঞান সমুৎপন্ন হয় । অন্তঃকরণ অল্প বিষয় দ্বারা অধুষিত না হইলে যেজ্ঞান সমুদিত হয়, তাহাই বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানই জীবের মুক্তির কারণ ॥ ৬

অন্বয় । তু (কিন্তু) নিয়তস্ত কর্মণঃ (নিত্যকর্মের) সন্ন্যাসঃ (ত্যাগ) ন উপপত্ততে (যুক্তিযুক্ত নহে) । মোহাৎ (মোহবশতঃ) তস্ত পরিত্যাগঃ (সেই নিত্য কর্মের পরিত্যাগ) তামসঃ পরিকীর্তিতঃ (তামস বলিয়া কথিত হয়) ॥ ৭

শ্রীধর । প্রতিজ্ঞাতং ত্যাগস্ত ত্রৈবিধ্যং ইদানীং দর্শয়তি—নিয়তস্তেতি ত্রিভিঃ । কাম্যস্ত কর্মণো বন্ধকত্বাৎ সংজ্ঞাসঃ যুক্তঃ । নিয়তস্ত তু—নিয়তস্ত পুনঃ কর্মণঃ সংজ্ঞাসঃ—ত্যাগঃ ন উপপত্ততে । সর্বশুদ্ধিধারা মোক্ষহেতুত্বাৎ । অতঃ তস্ত পরিত্যাগঃ উপাদেয়েহপি ত্যাগ্য ইতি এবং লক্ষণাৎ মোহাদেব ভবেৎ । স চ মোহস্ত তামসত্বাৎ তামসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ৭

বঙ্গানুবাদ । [প্রতিজ্ঞাত ত্যাগের ত্রিবিধ্য এগুন তিনটি শ্লোকে দেখাইতেছেন]—কাম্য কর্ম বন্ধনের হেতু, এজন্য তাহার ত্যাগ যুক্ত অর্থাৎ উচিত, কিন্তু নিত্য কর্মের ত্যাগ উপপন্ন নহে অর্থাৎ অসুচিত, কারণ সর্বশুদ্ধির বলিয়া উহা মুক্তির হেতু হব । [সর্বশুদ্ধি দ্বারা মোক্ষ হয়, কিন্তু কর্ম সর্বশুদ্ধির বাধক] অতএব নিত্য কর্মেরও পরিত্যাগ উপাদেয় এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত ভাব মোহবশতঃই হইয়া থাকে । মোহের তামসতা আছে বলিয়া একপ পরিত্যাগকেও তামস বলা হইয়া থাকে ॥ ৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—নিঃশেষরূপে ধারণা, ধ্যান, সমাদিপূর্বক ইচ্ছারহিত হওয়া আপনা-আপনি, তাহার নাম সন্ন্যাস । মোহেতে ত্যাগ করা সে তামস ত্যাগ অর্থাৎ সকল মনে গিয়েছে সেই মোহেতে কাশীতে এসে সন্ন্যাসী—মহন্ত-প্রকৃতি পূর্বস্বভাব-বশতঃ পাপকর্মে লিপ্ত হয় । নিত্য কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা সেই সংস্কার রুদ্ধ হয় । নিত্যকর্ম ত্যাগে পাপপ্রবৃত্তি বৃদ্ধি লাভ করে । কাম্যকর্ম ত্যাগ হইলেও চিত্তশুদ্ধির অভাব-বশতঃই প্রায় সকলেই কাম্যকর্ম করিতে উৎসুক হইয়া থাকে । নিত্যকর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তের এই অশুদ্ধি ক্ষয় হয়, সুতরাং যতদিন জ্ঞানলাভ না হয় ততদিন নিত্যকর্ম (সাধন, সন্ধ্যা-বন্দনাদি) ত্যাগ্য নহে । সংসারাসক্তির জ্ঞানের পরিপন্থী, বিচারের দ্বারা সেই আসক্তি কিছু

(বাঙ্গল ত্যাগ—উহাতে মোক্ষ লাভ হয় না)

দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম কায়ক্লেশভয়াভ্যাজেৎ ।

স কৃৎস্না রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥ ৮

কিছু হ্রাস হয় বটে কিন্তু সম্পূর্ণ ভাবে যায় না । ব্রহ্মচর্য্য পালনের ও তৎসহ সাধনাত্যাস দ্বারা প্রাণ, মন ও বুদ্ধি স্থির হইলে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের অনুভূতি হয় । সমস্ত সংসারাসক্তির মূল দেহ ও দেহে আত্মবোধ । দেহাতীত অবস্থার সাধনা না হওয়া পর্য্যন্ত এই দেহাত্মবোধ কিছুতেই বিলুপ্ত হয় না । এই দেহাত্মমান নষ্ট করিবার প্রচেষ্টাই মুমুক্শুদের সর্বপ্রধান সাধনা । ধারণা, ধ্যান, সমাদি ব্যতীত এই দেহাত্মমান নষ্ট হইবার নহে । প্রাণায়াম সাধন দ্বারা দেহস্থ বায়ু স্থির হইলে মন অন্তর্মুখ হইতে থাকে—উহাই ধারণা; এই বোগ-ধারণা যত অধিক হইতে থাকে, ততই মূল্যধারণিত্তা মুগ্ধা কুণ্ডলিনী জাগ্রত হইয়া সাধককে অনাস্বাদিত নেশায় বিভোর করিয়া রাখে—ইহাই ধ্যান । এই ধ্যানাবস্থা প্রগাঢ় হইতে হইতে তাহা সমাধিতে পরিণত হয় । এই অবস্থাতে কোনরূপ ইচ্ছা না থাকায় সাধক দেহ-সম্বন্ধরহিত হন—ইহাই ঐখ্য ত্যাগের অবস্থা; সাময়িক উত্তেজনা-বশতঃ যে আমরা সংসার ত্যাগ করি, তাহা তামস ত্যাগ, তদ্বাচ্য জীবের প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় না, সংসার-সংস্কার নষ্ট হয় না । একমাত্র সমাদি অভ্যাসের দ্বারা প্রকৃত ত্যাগ হইতে পারে ।

“আত্মাণ্ডানমাজ্জায় যুক্তো ভবতি মানবঃ” আপনার দ্বারা আপনাকে জানিতে পারিলে তবে মানব মুক্তি লাভ করে । এই আপনাকে আপনি জানিবার জন্য “সহজ” সাধনা অভ্যাস করিতে হয়; বাহ্য জন্মের সহিত পাওয়া গিয়াছে, তাহাই “সহজ” সাধনা । সেই সাধনা করিতে করিতে চিত্ত-মল ক্ষালন হয়, তখন একমাত্র শুদ্ধ চৈতন্ত্যে প্রাণের স্থিতি হয় । এই চিত্ত-মল মাজ্জিত না হইলে কাহারও দ্বিবাচক্ষু লাভ হয় না । দ্বিবাচক্ষু লাভ না হইলে যিনি অখণ্ডমণ্ডলাকারে সর্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, তাঁহাকে বুঝিবে কি করিয়া? মন অত্যন্ত চঞ্চল থাকিতে এই নিত্য বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায় না । প্রাণের চাকলা বিদূষিত করিতে হইলে খাসের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে তাই বুঝি চণ্ডীদাস বলিলেন—

“প্রেমের বাঞ্ছন, শুন সর্বজন, অতি সে নিগূঢ় রস ।

যখন সাধন করিবে তখন, ইড়ায় টানিবে খাস ।

তাহা হ'লে পরে মনবায়ু সে যে আপনি হইবে বশ ॥” ৭

অন্বয় । দুঃখ ইতি (দুঃখকর বলিয়া) [যিনি] কায়ক্লেশ ভয়াৎ (দৈহিক ক্লেশের ভয়ে) যৎ কর্ম ত্যাজেৎ (যে কর্মের ত্যাগ করেন) সঃ (তিনি) রাজসং ত্যাগঃ কৃৎস্না (রাজস ত্যাগ করিয়া) ত্যাগফলং ন এব লভেৎ (ত্যাগের ফল লাভ করিতে পারেন না) ॥ ৮

শ্রীধর । রাজসং ত্যাগনাহ—দুঃখমিতি । যঃ কৰ্ত্তা আত্মবোধঃ যিনা কেবলং দুঃখমিত্যেব জ্ঞাতা শরীরবাসনয়াং নিত্যং কর্ম ত্যাজেৎ ইতি যৎ তাদৃশঃ ত্যাগঃ রাজসঃ, দুঃখস্ত রাজসত্বাৎ । অতঃ তং রাজসং ত্যাগং কৃৎস্না রাজসঃ পুরুষঃ ত্যাগস্ত ফলং জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণং নৈব লভত ইত্যর্থঃ ॥ ৮

(সাত্ত্বিক ত্যাগ)

কার্যমিত্যেব যৎ কৰ্ম নিয়তং ক্রিয়তেহজ্ঞান।

সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলং চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥ ৯

বঙ্গানুবাদ। [রাজসত্যাগ কাহাকে বলে তাহাই বলিতেছেন]—যে কর্মকর্তা আত্ম-বোধ ব্যতীত কর্মকে দুঃখকর জানিয়া শারীরিক ক্লেশের ভয়ে কর্মত্যাগ করে তাহার তাদৃশ যে ত্যাগ তাহা রাজস, কারণ দুঃখটিই রাজস। অতএব সেই রাজস ত্যাগ করিয়া রাজস পুরুষ জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণরূপ ত্যাগফল লাভই করে না—ইহাই অর্থ ॥ ৮

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—যে কর্ম করিতে বড় দুঃখ, শরীরের বড় ক্লেশ হবে—আর ভয় কি রকমে বা ক’রে উঠিবো—এইরূপ যে ত্যাগ করে সে রাজসিক ত্যাগ—সে ত্যাগের ফল নাই।—যে কর্ম দুঃখবোধে ত্যাগ করা হয় তাহা রাজস ত্যাগ, উহাতে ত্যাগের ফল যে শাস্তি তাহা লাভ হয় না। অনেকের সাধন-ভজন বা সঙ্কোপাসনাদি করিবার একটু একটু ইচ্ছা আছে কিন্তু শীতের ভয়ে বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে পারে না, বা গ্রীষ্মকালে দ্বারকণ উত্তাপ বশতঃ স্নানাদি না হওয়ায় শয্যা হইতে উঠিবার যে অনিচ্ছা এবং তজ্জন নিত্যকর্মের যে ত্যাগ—তাহা রাজসিক ত্যাগ। তাহার কারণ এই প্রকার ত্যাগের এক অভিনব হেতু অবস্থার পরিয়া থাকেন। তাহার বলিয়া থাকেন, এই নিত্যকর্ম যে তাহার করেন না, তাহা ঘেববশতঃ বা অনিচ্ছাবশতঃ নহে, এ সকল কর্মের আর তাহাদের প্রয়োজন নাই, এইজন্যই এ সকল কর্ম আর তাহার করেন না। কিন্তু আসল ত্যাগের কারণ যে আলস্য বা প্রমাদ এ কথা থাকার করিতে তাহার লজ্জা অশুভব করেন। তাই লোকের নিকট খুব দোষ গলায় বলিয়া থাকেন—“এখন আর ও সব কোশা ঠকঠক করিবার প্রয়োজন অশুভব করি না”, বা “তিনি যত্ন ধরে মেরুদণ্ড সোজা করে বসে থাকে বা আয়াম-সাধ্য প্রাণায়ামাদি সাধনের আর কোন আবশ্যকতা নাই, ও সব খাটখাটির সময় অতীত হইয়া গিয়াছে।” আবার কেহ কেহ অতি চতুর ব্যক্তি বলিয়া থাকেন—“অচর্কাৎ প্রবুদ্ধনামজ্ঞানাং ব্রাহ্মণীভূতং” ব্রহ্মাকারী বৃত্তির নিশ্চলতা সম্পাদনই প্রকৃত প্রাণায়াম, আর বাহারি অজ্ঞ তাহাদের এই নাক টেপাই প্রাণায়াম, কিন্তু এই সকল মৌখিক ব্রহ্মজ্ঞানীরা ত্যাগের ফল যে স্থিতি—যাহা ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর-অবস্থায় অশুভব হয়—তাহা তাহার কখনই লাভ করিতে পারেন না। কায়ক্লেশের ভয়ে যাহারা সাধন ত্যাগ করে, তাহাদের ত্যাগকে রাজসিক ত্যাগ বলে ॥ ৮

অর্থ। অজ্ঞান (হে অজ্ঞান!) সঙ্গ (কর্তৃত্বাভিমান বা আসক্তি) ফলং চ এবং (এবং ফল-কামনা) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) কার্যম্ ইতি এবং (ইহা কর্তব্য এইরূপ ভাবনা করিয়া) যৎ (যে) নিয়তং কর্ম (শাস্ত্রবিহিত নিত্যকর্ম) ক্রিয়তে (অনুষ্ঠিত হয়) সঃ ত্যাগঃ (সেই ত্যাগ) সাত্ত্বিকঃ মতঃ (সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত হয়) ॥ ৯

শ্রীধর। সাত্ত্বিক ত্যাগমাহ—কার্যমিতি। কার্যম্ ইত্যেব বুদ্ধা, নিয়তং—অবশ্যকর্তব্য-তয়া বিহিতং কর্ম, সঙ্গঃ ফলং চ ত্যক্ত্বা। ক্রিয়তে ইতি যৎ—তাদৃশঃ ত্যাগঃ স সাত্ত্বিকো মতঃ ॥ ৯

(সাত্ত্বিক ত্যাগের লক্ষণ)

ন দ্বৈতাকুশলং কর্ম কুশলে নানুবজ্জতে।

ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১০

বঙ্গানুবাদ। [সাত্ত্বিক ত্যাগের কথা বলিতেছেন]—“অবশ্য কর্তব্য”—এই বুদ্ধিতে আসক্তি এবং ফলত্যাগ করিয়া যে বিহিত কর্ম করা যায়, তাদৃশ ত্যাগকেই সাত্ত্বিক ত্যাগ বলা যায়। [রাজসিক ও তামসিক ত্যাগীরা কর্মকেই ত্যাগ করিয়া বসে, কিন্তু সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ কর্মত্যাগ করেন না, তাহার ফলাকাঙ্ক্ষা মাত্র ত্যাগ করেন। সাত্ত্বিকদের ত্যাগ কর্মত্যাগ নহে, ফলমাত্র ত্যাগই তাহাদের লক্ষ্য। প্রশ্ন হইতে পারে—নিত্য কর্মের দ্বারা শাস্ত্রে কোন ফলোল্লেখ নাই, তবে তাহার ত্যাগ কিরূপে সম্ভব হইবে? সঙ্কোপাসনাদি নিত্য কর্ম যথা-বিহিত ভাবে করিলে সকল কর্মের দ্বারা তাহাতেও কিছু ফল হয়। কোন যক্ষ ফল পাওয়া না যাইলেও, তাহার ছায়া না চাহিলেও, যেমন পাওয়া যায়, তজ্জন নিত্যকর্মের অন্ত কোন ফল না থাকিলেও, তাহাতে যে পাপক্ষয় হয় এবং তাহা হইতে যে চিন্তাশুদ্ধি হইয়া থাকে তাহা শাস্ত্রসম্মত। সুতরাং কর্মফলে লোভ না রাখিয়া যে বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান, তাহাই সাত্ত্বিক ত্যাগ। সলকামনা দ্বারা ইহা বন্ধ হইয়া থাকে এবং ফলাকাঙ্ক্ষা থাকিতে জ্ঞানোৎপত্তি হয় না, এই জন্যই যুক্তগুণ ফলাভিসন্ধানবহিত চর্চয়া নিত্যকর্ম করিয়া থাকেন। সঙ্কোপাসনাদি বিহিত কর্মে ফল-কামনা না থাকিলেও অনুষ্ঠাতার একটি ফল হইবেই। তাহা এই যে, ত্রিগুণের তাড়নাবশতঃ জীব অবিরত শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষা-বহিত নিত্যকর্মের অনুষ্ঠানে জীবের পাপ-প্রবৃত্তির বেগ হ্রাস হইয়া যায় ॥ ৯

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—কর্তব্য কর্ম, তাহা সব করা চাই—ফলাকাঙ্ক্ষারহিত নিঃশেষরূপে সংযত হইয়া করিবে—সব করিবে—ইহার নাম সাত্ত্বিক ত্যাগ।—সংসারের সমস্ত কর্তব্য এবং শাস্ত্রবিধি অনুসারেও যে সকল বিহিত কর্ম আমাদেরকে প্রতি-দিন করিয়া যাইতে হয়—তাহা সমস্তই করিতে হইবে। কোন কর্ম বাদ দিলে চলিবে না। কর্মে ঘেব বুদ্ধি থাকিলে সে কর্ম না করাই স্বাভাবিক। যোগীর কোন কর্মেই ঘেব নাই, সেজন্য কোন কর্ম করিতে তাহার মন বিচ্যোহী হয় না, আবার আসক্তিবশতঃ কর্মে যত্নশীল হওয়াও তাহার পক্ষে অসম্ভব। তিনি সব কর্মই করিয়া যান, অথচ তাহার কোন সঙ্কল থাকে না। যেমন শ্বাসপ্রশ্বাসরূপ কর্ম অবিশ্রান্ত চলিতেছে অথচ তাহাতে যেমন সঙ্কল নাই, ঠিক তজ্জন। ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন কর্মই থাকে না, ক্রিয়ার পর-অবস্থায় পরাবস্থায় কর্ম হয়, কিন্তু কর্তৃত্বাভিমান থাকে না;—এইরূপ ফলাভিসন্ধানশূন্য অবস্থাতেই প্রকৃত সাত্ত্বিক ত্যাগ হয়। নচেৎ মনে করিয়া ত্যাগ করিতে হইলে প্রকৃত সাত্ত্বিক ত্যাগ হয় না, একটু ফলের গন্ধ তাহাতে থাকিবেই। কিন্তু প্রাণ সুস্থায় চলিলে অভ্যাস ও সংসার বশতঃ নাহেল্লিয়ার দ্বারা কিছু কিছু কর্ম হইলেও, তাহাতে আসক্তি আরো থাকে না। অনিশ্রান্ত ভগবৎ-স্মরণে যোগীর চিন্তা মন্ত মাতালের মত হইয়া যায়, সে অবস্থায় আর সঙ্কল করিবার কোন কর্ম করা চলে না ॥ ৯

অর্থ। সত্ত্বসমাবিষ্টঃ (সবগুণসম্পন্ন) মেধাবী (স্থিরবুদ্ধি) ছিন্নসংশয়ঃ (সংশয়রহিত)

ত্যাগী (ত্যাগী ব্যক্তি) অকুশলং কৰ্ম (অকল্যাণকর । দুঃখকর কৰ্ম) ন বেষ্টি (ঘেব করেন না) [এবং] কুশলে (সুখকর বা কল্যাণকর কৰ্মে) ন অমুযজ্জতে (আসক্ত হন না) ॥ ১০

শ্রীধর । এবহুতসাত্তিকত্যাগপরিণিষ্ঠিতস্ত লক্ষণমাহ—ন বেষ্টিত্যাগি । সত্ত্বসমাবিষ্টঃ—সদেব সংবাপ্তঃ সাত্তিকত্যাগী, অকুশলং—দুঃখাবহং—শিশিরে প্রাতঃস্নানাদিকং, কৰ্ম ন বেষ্টি । কুশলে চ—সুখকর কৰ্মশি—নিদ্রাবে মধ্যাহ্নানাদৌ, ন অমুযজ্জতে—শ্রীতিং ন করোতি । তত্র হেতুঃ, মেধাবী—স্থিরবুদ্ধিঃ যত্র পরপরিভবাদি মহদপি দুঃখং সহতে, স্বর্গাদি সুখঞ্চ তাদ্ভতি, তত্র কিয়দেতৎ তাৎকালিকং সুখং দুঃখঞ্চ—ইত্যেবম্ অমুসন্ধানবান্ ইত্যর্থঃ । অতএব ছিন্নঃ সংশয়ঃ—মিথ্যাজ্ঞানং দৈহিকসুখং দুঃখয়োঃ উপাধিৎসা-পরিমিহীর্ষালক্ষণং যন্ত সঃ ॥ ১০

বঙ্গানুবাদ । [এই প্রকার সাত্তিকত্যাগ-পরিণিষ্ঠ ব্যক্তির লক্ষণ বলিতেছেন]—সদ্বাসাবিষ্ট—সদ্ব দ্বারা সমাক্ষ ব্যাপ্ত অর্থাৎ সত্ত্বগুণসম্পন্ন ত্যাগী ব্যক্তি অকুশল অর্থাৎ দুঃখাবহ কৰ্ম্মকে (যেমন শীতকালে প্রাতঃস্নানাদি) ঘেব করেন না, আর কুশল বা সুখকর কৰ্ম্মে (যেমন গ্রীষ্মকালে মধ্যাহ্নানাদিতে) শ্রীতি করেন না । তাহার কারণ এই যে, তিনি মেধাবী অর্থাৎ স্থিরবুদ্ধি ;—যে অবস্থায় পরিভবাদি মহৎদুঃখও সহ করিতে পারেন এবং স্বর্গাদি সুখকেও ত্যাগ করিয়া থাকেন, তদবস্থায় তাৎকালিক সুখঃদুঃখকে ক্ষণিক বলিয়া যিনি মনে করেন, তাহার আর সেই সুখ-দুঃখের জ্ঞান মনে অমুসন্ধান আসিবে কেন ? [অর্থাৎ কেন সুখ আসিল বা দুঃখ কেন হইল, তাহার কারণ কি—এ সকল বিষয়ে তাহার মনে বিন্দুমাত্রও অমুসন্ধান আসে না], অতএব তিনি ছিন্নসংশয় অর্থাৎ দৈহিক সুখ-দুঃখের গ্রহণেচ্ছা বা পরিহারেচ্ছারূপ লক্ষণ তাহার থাকে না তিনিই ছিন্নসংশয় ॥ ১০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ভাল কৰ্ম্ম করিতে ঘেব করেন না—ভাল কৰ্ম্মের ইচ্ছাও করেন না—সকল কৰ্ম্মেরই ফলের আকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া করে—ক্রিয়াতে থেকে (বাহ্য গুরুপদেশগম্য) তাহাতেই আটকিয়ে থেকে সব কৰ্ম্ম করা—এইরূপ স্থিরবুদ্ধি হইয়া ভিতরে ভিতরে ধারণাপূর্বক আটকিয়ে থেকে সমুদয় কৰ্ম্ম করে সংশয় রহিত হইয়া—প্রাণকৰ্ম্মই “ব্রতাবনয়িত কৰ্ম্ম” তাহা “সহজ কৰ্ম্ম” ও “ব্রতাবজ কৰ্ম্ম” । প্রতিক্ষেপে আনন্দা খাস ত্যাগ ও গ্রহণ করিয়া থাকি অথচ তাহাতে কোন ইচ্ছা থাকে না—এই ব্রতাবনয়িত কৰ্ম্মে লক্ষ্য রাখিতে রাখিতে যিনি ইচ্ছারহিত হইয়া যান, তিনি সাংসারিক সকল কৰ্ম্ম করিলেও কোন বিশেষ কৰ্ম্মের প্রতি তাঁহার শ্রীতি বা ঘেব হয় না । অকুশল কৰ্ম্মের উপরও বিদেব থাকে না এবং কুশল কৰ্ম্মের প্রতিও আসক্তি থাকে না । তিনি যাহা কিছু মনে করেন সমস্ত কৰ্ম্মই ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া করেন । তাহার কারণ—তিনি সাধন করিতে কবিত্তে সত্ত্বসমাবিষ্ট হন ; অর্থাৎ মন দিয়া অধিকক্ষণ ক্রিয়া করিলে খাসের গতি হ্রাস হয় এবং সুস্থবাবাহী হইয়া থাকে ; তাহার ফলে সত্ত্বগুণ তাহাকে অধিক পরিমাণে ব্যাপ্ত করে, সুতরাং তাহার বুদ্ধিও স্থির হয় অর্থাৎ তিনি মেধাবী হন । আত্মজ্ঞানরূপ প্রজ্ঞাই মেধা, এই মেধা বত বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়, ততই তাহার

(দেহাভিমানীর কৰ্ম্মত্যাগ হয় না, ফলত্যাগই মুখ্য ত্যাগ)

নহি দেহভূতা শক্যং ত্যক্তুং কৰ্ম্মাণ্যশেষতঃ ।

যন্ত কৰ্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যাভিধীয়তে ॥ ১১

আত্মরূপে স্থিতি লাভ হয়, এই স্থিতিলাভ হইতেই মনের সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইয়া যায় । কৃষ্ণে লক্ষ্য ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে তাহার লক্ষ্য থাকে না, সুতরাং তাহার চিন্তের লয়-বিক্ষেপ দূরীভূত হওয়ায় তাহার আত্মা ও অনাত্মা-সম্বন্ধীয় সমস্ত সংশয় শূন্য হইয়া যায় । ক্রিয়ার পর-অবস্থাতে থাকাই পরমার্থ আর দেহাদিতে আসক্ত থাকাই অনর্থ—ইহা তিনি জ্ঞানেন, এবং তাহা জ্ঞানেন বলিয়াই তিনি কুশল কৰ্ম্ম করিয়াও তাহাতে আসক্ত হন না । এবং যদিও অকুশল কৰ্ম্মও কখন করেন না তবুও তাহাতে কোনরূপ ঘেববুদ্ধি থাকে না । এই জন্ত মেধাবী হওয়া আবশ্যক । ক্রিয়ার পর-অবস্থাই আসল মেধা, তাহাতে তাহার মন সর্লক্ষ্য আটকানো থাকে, সুতরাং দেহে-দেহিয়া দ্বারা কৰ্ম্ম করিলেও কোন কৰ্ম্মের দাগ তাহার চিন্তে পড়িতে পারে না, ইহার নামই ভগবদপিপিত চিন্ত । এ চিন্তে আর ভাল-মন্দেব বিচার আসে না । নেশাধোবের মত তাহার মন নেশায় সর্লক্ষ্য ভৌ হইয়া থাকে, করিতে হয় তাই করেন, তাহাতে ভাল হইবে কি মন্দ হইবে—এ সব তরঙ্গ তখন মনেই উঠে না । তাহার মনই নাই, স্বতরাং তাহাতে সংকল্পের ঢেউ উঠারও সম্ভাবনা নাই । দেহে-দেহিয়ার সহিত সধন্যুক্ত মনেই বিবিধ সংশয় উৎপন্ন হয়, সেই মন প্রাণায়ামাদি সাধন-সাহায্যে সমস্ত প্রাপ্ত হইলেই দেহে-দেহিয়ার সহিত সধন্যুক্ত রহিত হইয়া যায়, তখন মন আর মর্কটের মত বিষয়-বুদ্ধির শাখায় শাখায় ঘুরিয়া বেড়ায় না । এইরূপে চিন্ত স্থিরতার পরাকাষ্ঠী প্রাপ্ত হইলেই আত্মার স্ব-রূপে অবস্থানরূপ যোগ সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ১০

অর্থ । দেহভূতা (দেহধারী বা দেহাভিমানী জীব) কৰ্ম্মাণি (কৰ্ম্ম সকল) অশেষতঃ ত্যক্তুং (অশেষ প্রকারে ত্যাগ করিতে) ন হি শক্যং (সমর্থ হয় না) । যঃ তু (কিন্তু) যে ব্যক্তি) কৰ্ম্মফলত্যাগী (কৰ্ম্মফলত্যাগী) । সঃ ত্যাগী ইতি অভিধীয়তে (সেই ত্যাগী বলিয়া অভিহিত হয়) ॥ ১১

শ্রীধর । নহ এবহুতসাত্তিকত্যাগাদ্ বরং সর্লক্ষ্যত্যাগঃ তথা সতি কৰ্ম্মবিক্ষেপা-ভাবেন জ্ঞাননিষ্ঠাসুখং সম্পত্ততে শুভ্রাহ—নহীতি । দেহভূতা—দেহাভিমানবতা । নিঃশেষেণ সর্লক্ষ্য কৰ্ম্মাণি ত্যক্তুং ন হি শক্যং । তদুত্তম—“ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠতাকৰ্ম্মকৃতং” ইত্যাদিনা । তস্মাদ্ যন্ত কৰ্ম্মাণি কুর্কন্ অপি কৰ্ম্মফলত্যাগী স এব মুখ্যঃ ত্যাগী ইত্যভিধীয়তে ॥ ১১

বঙ্গানুবাদ । [তাহা হইলে তো এইরূপ কৰ্ম্মফলত্যাগ অপেক্ষা সর্লক্ষ্যত্যাগই শ্রেষ্ঠ । তাহাতে বিক্ষেপের অভাববশতঃ জ্ঞাননিষ্ঠারূপ সুখ পাওয়া বাইতে পারে—তাহাতেই বলিতেছেন]—দেহাভিমানী জীব নিঃশেষে সর্লক্ষ্য কৰ্ম্ম ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না ;—তৃতীয় অধ্যায়ে “ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি” ইত্যাদি শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, অতএব যে ব্যক্তি সকল কৰ্ম্ম করিয়াও কৰ্ম্মের ফলত্যাগী হন, তিনিই মুখ্য ত্যাগী বলিয়া কথিত হন ॥ ১১

(কৰ্মের ত্রিবিধ ফল—এই ত্রিবিধ ফল কাহার হয় ?)

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রং চ ত্রিবিধং কৰ্মণঃ ফলম্ ।

ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং কচিৎ ॥ ১২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এই দেহ ধারণ করে সম্পূর্ণরূপে বিনা কৰ্ম করিয়া থাকিতে পারে না—সমুদয় কৰ্ম করিয়া ফলের আকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া যে সমুদয় কৰ্ম করে তাহারই নাম ত্যাগী—স্থির বুদ্ধির সহিত—অন্তলোকে স্থির বুদ্ধির সহিত না ত্যাগ করিয়া চঞ্চল স্বভাব প্রযুক্ত পুনর্ব্বার গ্রহণও করে—বাহ্যদের বুদ্ধি স্থির হয় নাই, তাহার “আমি কৰ্ত্তা নহি” মুখে বলিলেও তাহাদের কৰ্মের উপর অভিমান থাকে । যেখানে দেহাভিমান রহিয়াছে, সেখানে যেহেতু কৰ্মের উপর অভিমান থাকিবেই । ক্রিয়ার পর-অবস্থাশ্রাণ্ড যোগীর দেহে অভিমান কেন, দেহ যে তাহার আছে, সে বোধও থাকে না, তবে তাঁহার কৰ্ম কি ভাবে হয় ? (কারণ তাঁহাকেও কৰ্ম করিতে দেখা যায়) । তিনি কৰ্ম করেন বটে, কিন্তু সাধারণ মনুষ্য যেরূপ আসক্তির সহিত কৰ্ম করে তিনি সে ভাবে কৰ্ম করিতে পারেন না । প্রয়োজন না থাকিলে কেহ কৰ্ম করিতে পারে কি ? জ্ঞানী পুরুষের কোনও প্রয়োজন নাই—এইজন্য তাঁহার পক্ষও সাধারণ লোকের মত কৰ্ম করা সম্ভব নহে । তবে যে তাহাকে কৰ্ম করিতে দেখা যায়, তাহা এই ভাবে হয় ;—সর্পের খোলসটা (ইচ্ছা না থাকিলেও) বায়ুবশে যেমন ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হয়, তরুণ যোগীর সঙ্কল্প না থাকায় কৰ্মপ্রবৃত্তির বেগ থাকা সম্ভব নহে, কিন্তু বায়ুতড়িত নিখোঁকেব তায় প্রারম্ভবশে তাঁহার কৰ্মসকল সম্পন্ন হয়, অথচ কৰ্মে আসক্তি না থাকায় কৰ্মের ভাল-মন্দ ফলে তিনি আবদ্ধ হন না ;—জ্ঞানীর কৰ্মত্যাগ এই ভাবেই হইয়া থাকে । কিন্তু দেহ যতদিন আছে, নিঃশেষে সৰ্ব্বকৰ্ম-ত্যাগ কাহারও হইতে পারে না । তাই ভগবান্ বলিতেছেন—যখন কৰ্ম না ক্রিয়া থাকিবার উপায় নাই, তখন বাহ্যের কৰ্মও করেন অথচ কোন ফলাকাঙ্ক্ষা করেন না—তাঁহারাই প্রকৃত ত্যাগী । কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কৰ্ম করিব মনে করিলেই যে তাহা করিতে সক্ষম হইবে, তাহা মনে করিও না । যে মনের খেয়ালে বিষয়াদি ত্যাগ করে, তাহার পক্ষে পুনরায় বিষয় গ্রহণ করাও কিছু আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে । সুতরাং কামনা-ত্যাগের জ্ঞান সাধনা করিতে হইবে । প্রাণায়াম সাধনা দ্বারা বাহ্যের শ্রাণ ও তৎসংগমন এবং বুদ্ধি স্থির হইয়া গিয়াছে, তাহাকে আর কিছুতেই বিচলিত বা লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে পারে না । অভিমান ত্যাগ অত কোন কোশলে হইতে পারে না, শ্রাণ স্থির হইলেই তাহা সহজলভ্য হইয়া থাকে ॥ ১১

অর্থ—অনিষ্টং (অকল্যাণকর) ইষ্টং (কল্যাণকর) মিশ্রং চ (এবং ইষ্টানিষ্ট মিশ্র) ত্রিবিধং (তিনপ্রকার) কৰ্মণঃ ফলম্ (কৰ্মের ফল) অত্যাগিনাং (সকাম ব্যক্তিগণের) প্রেত্য (পরলোকে যাইয়া) ভবতি (হইয়া থাকে) । তু (কিন্তু) সন্ন্যাসিনাং (ফলত্যাগি-গণের) ন কচিৎ (কখনও হয় না) ॥ ১২

তীর্থদর । এবভূতত্ব কৰ্মফলত্যাগস্ত ফলমাহ—অনিষ্টমিতি । অনিষ্টম্—নারকিকম্, ইষ্টং—দেবদং, মিশ্রং—মহুগ্ধম্ । এবং ত্রিবিধং পাপস্ত পুণ্যস্ত চোভয়মিশ্রস্ত চ কৰ্মণো ধং ফলং

প্রসিদ্ধং, তৎ সৰ্বং অত্যাগিনাং—সকামানামেব, প্রেত্য—পরত্র ভবতি । তেবাং ত্রিবিধকৰ্ম-সম্বাৎ, ন তু সন্ন্যাসিনাং কচিদপি ভবতি । সন্ন্যাসি-শব্দেনাত্ম ফলত্যাগসাম্যাৎ প্রকৃতঃ কৰ্মফলত্যাগিনঃ গৃহ্যন্তে, “অনাশ্রিতঃ কৰ্মফলং কার্য্যং কৰ্ম করোতি যঃ । স সন্ন্যাসী চ যোগী চ” ইত্যেবমার্দো কৰ্মফল-ত্যাগিণু সন্ন্যাসি-শব্দপ্রয়োগদর্শনাৎ । তেবাং সাধিকানাং পাপাসম্বাৎ দ্বৈতরূপেণ চ পুণ্যফলস্ত তত্ত্বত্বাৎ ত্রিবিধমপি কৰ্মফলং ন ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১২

বঙ্গাশুবাদ । [এই প্রকার কৰ্মফলত্যাগের ফল কি তাহা বলিতেছেন]—অনিষ্ট অর্থাৎ নারকিক, ইষ্ট অর্থাৎ দেবদং মিশ্র অর্থাৎ মহুগ্ধ—সেই তিন প্রকার পাপ, পুণ্য ও উভয়-মিশ্র কৰ্মের—এই ত্রিবিধ ফল প্রসিদ্ধ । সেই সব অত্যাগীদের অর্থাৎ সকামকৰ্মীদের পরকালে গিয়া হইয়া থাকে । যেহেতু তাহাদেরই ত্রিবিধ কৰ্মের সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু সন্ন্যাসীদিগের ঐ সকল ত্রিবিধ কৰ্মের কখনও সম্ভাবনা হয় না । ফল-ত্যাগবিষয়ে তুল্যতাবশতঃ সন্ন্যাসীশব্দে এখানে প্রকৃত কৰ্মফলত্যাগীকেই গ্রহণ করা হইয়াছে । বঠাধ্যায়ে “অনাশ্রিতঃ কৰ্মফলং” ইত্যাদি শ্লোকে কৰ্মফলত্যাগীতে সন্ন্যাসীশব্দের প্রয়োগ দেখা যায় । ঐ সকল সাধিকগণের পাপের সম্ভাবনা নাই এবং দ্বৈতরূপে-হেতু পুণ্যফল তৎকর্তৃক পরিত্যক্ত, সুতরাং তাহাদের পক্ষে ত্রিবিধ কৰ্মফলই নাই—ইহাই তাৎপৰ্য্য ॥ ১২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ভাল, মন্দ, আর ভাল-মন্দ মিশ্রিত, তিন রকমের কৰ্মের ফল—এই তিনই ঐ কৰ্মের ফল যাছারা ত্যাগ করিয়াছে—বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যতে যে ত্যাগী—সেই এ তিনেরই ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু সন্ন্যাসী, যিনি কেবল বর্তমান অবস্থায় ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি কখনই ঐ তিনকে ত্যাগ করিতে পারেন না—কারণ তাঁহার ভবিষ্যতের মোক্ষপদাদির ইচ্ছা রহিয়াছে ।—কৰ্ম তিন প্রকার অনিষ্ট, ইষ্ট এবং উভয়-মিশ্রিত । বাহ্যের ত্যাগী নহেন অর্থাৎ বাহ্যের সংসারসক্ত তাঁহাদের এই সকল কৰ্মের ফল হুত্বের পরে বা অন্যভাবে ভোগ করিতে হয় । ইষ্টকৰ্মের দ্বারা দেবলোকে, অনিষ্ট কৰ্মের দ্বারা ভীষণগুণানিতে এবং মিশ্রকৰ্মের ফলে মহুগ্ধলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় । এই তিন প্রকারের কৰ্মই ত্যাগ না করিতে পারিলে জন্মান্তর-পরিগ্রহ ও তজ্জনিত দুঃখ-দুঃখাদি ভোগ অনিবার্য্য । এই জন্ম বিবেকসম্পন্ন পুরুষ বাহ্যের, তাঁহার এই কৰ্মের বন্ধন কাটাইতে চান । কিন্তু কৰ্মবন্ধন কাটাইতে চাহিলেই যে কৰ্মবন্ধন কাটে—তাহা তো নহে । কারণ পূর্বাভ্যাসজনিত সংসার ও স্বভাব মনুষ্যকে অনিচ্ছা-সত্ত্বেও কৰ্মে প্রবর্ত্তিত করে, এবং তাহাকে বাধ্য হইয়া ফলাভোগ করিতে হয় । কৰ্মফল-ভোগে ভীত হইয়া বাহ্যের সংসারগতি হইতে মুক্তিলাভ করিতে চাহেন, তাঁহাদের ত্যাগ অভ্যাস করিতে হয় । বাহ্যের এই ত্যাগ অভ্যাস করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগের বৈরাগ্য হইয়াছে, অর্থাৎ বিষয় তাঁহাদের নিকট স্বাদু বোধ হয় না বৃত্তিতে হইবে । এই ত্যাগ শ্রাবটিকে স্মৃতি করিবার জন্ম যে উপায় অবলম্বিত হয়, শাস্ত্র তাহাকেই “বিবিধিবা সন্ন্যাস” বলেন । এই বিবিধিবা সন্ন্যাসে সংসার অমুপাদেয় অথবা হেয় বিবেচিত হয়, এবং তাঁহাদের লক্ষ্য থাকে—কি প্রকারে এই সংসারগতি রুদ্ধ হয় ? কিন্তু আশ্র-জ্ঞান ব্যতীত সংসারগতি রুদ্ধ হয় না । এইজন্য বিবিধিবা-সন্ন্যাসের প্রধান সাধন—বিচার ।

আত্মানুবিবেক না হইলে অনাশ্রয় বস্তুর তাগ হইতে পারে না। তাই যে মন পূর্বে কেবল বিষয়াধি গ্রহণে ব্যাপ্ত থাকিত, এখন সেই মনকে বিষয় হইতে দিয়াইয়া ব্রহ্মব্রহ্মপের ব্যবস্থা করাইবার চেষ্টা করিতে হয়। ইহার উপায়—শ্রবণ ও মনন। এই শ্রবণ ও মনন হইতে সংসার-বিষয়ে আসক্তির হ্রাস হয় ও ব্রহ্মবিজ্ঞানের দৃঢ় সমধিক আগ্রহ হয়। শাস্ত্রানুমোদিত সন্ন্যাস এমন একটি আশ্রম—যে আশ্রমে অল্প কোন কর্তব্য নাই, তাই যাহারা বিরক্ত পুরুষ তাঁহারা এই চতুর্থাশ্রম গ্রহণ করিয়া শ্রবণ-মনন দ্বারা বৈশ্যপ্যতাবকে পুষ্ট করেন এবং সাধনাধি দ্বারা ঐকান্তিকভাবে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য সচেষ্ট থাকেন। কিন্তু তখনও তাঁহার মনে সংসারের প্রতি বিবেক ও মোক্ষের প্রতি আগ্রহ থাকে। এই গ্রহণ ও ত্যাগেচ্ছা যতদিন মনোমধ্যে বিরাজ করে, ততদিন তিনি সন্ন্যাসী হইলেও তাঁহাকে ত্যাগী বলা যাইবে না। কারণ তখনও তিনি সম্যক জ্ঞানী বা ত্যাগী পদবীতে আরূঢ় হন নাই। সর্বকৰ্ম-ত্যাগী বা সর্বভাবনা-বিনিমুক্ত যাহারা হইতে পারেন না, এই অবস্থায় তাঁহাদের মৃত্যু হইলে তাঁহাদের পুনরুৎপত্তি রুদ্ধ হইবে না। কিন্তু যাহারা ত্যাগী অর্থাৎ সন্ন্যাস না লইয়াও পরমার্থ-সন্ন্যাসী হইয়াছেন, তাঁহাদের আর পুনরুৎপত্তি হয় না, এইজন্য ত্রিবিধ কৰ্মের কলভোগ তাঁহাদিগকে কখনই করিতে হয় না। ইচ্ছা-যেষ যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ আমরা প্রকৃতি বা মহামায়ার শাসনক্ষেত্রে হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারি না, ততদিন জন্ম-মরণ ও কৰ্মভোগও দুরায় না। এক কথায় যাহাদের অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ হইয়াছে তাঁহাবাই ত্যাগী—তাঁহারা গৃহেই থাকুন বা অরণ্যেই থাকুন, এই ত্যাগভাব সূচক হওয়ায় তাঁহাদের মনে আর কোন সঙ্কল্পের তরঙ্গ উদ্ভিত হয় না, ইহাদের রাগ-যেষ ক্রীণ হইতে হইতে একেবারে ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। ইহাদের স্থিতিকেই ব্রাহ্মী স্থিতি বলে। তাঁহাদের বর্তমানে বা ভবিষ্যতের কোন কামনা বা সঙ্কল্প থাকে না। হেহেজিয়-মনের সঙ্গে যতদিন সংঘ থাকে ততদিন সংসার গেল কি করিয়া? সুতরাং মুক্তিলাভের সম্ভাবনা কোথায়? সংসারে আনন্দা বাঁধা পড়িয়াছি কেন? আমাদের ইচ্ছা ও যেষ হইতে যে সকল কৰ্ম সমুদ্ভূত হয় তাহার ভোগ ও প্রতিবিধানের দৃঢ় তত্ত্ব বিষয়ের নিকট আমরা বাঁধা পড়ি। ইচ্ছা-যেষ প্রকৃতি বন্দ্যভাব এই ত্রিপুর বা দেহাদিতে অভিমান বর্তমান থাকিতে বিনষ্ট হয় না। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ দেহই ত্রিপুর; এই ত্রিপুরে অভিমান থাকিতে মুক্তিলাভ অসম্ভব। এই ত্রিপুর বা প্রকৃতি হইতে আত্মা যে ভিন্ন—তাহা বুদ্ধিতে হইবে এবং তাহার একমাত্র উপায়—স্থির প্রাণের উদ্বোধন। প্রাণ চঞ্চল হইয়া মনকে, মন ইন্দ্রিয়গণকে এবং ইন্দ্রিয়গণ দেহকে কৰ্মে বিনিমুক্ত করে, সুতরাং প্রাণের চাঞ্চল্য থাকিতে সন্ন্যাস লইলেও সর্বকৰ্ম-ত্যাগ হইতে পারে না। কিন্তু যিনি ত্যাগী তিনি কৰ্মফলে আকাঙ্ক্ষাশূন্য, ব্রহ্মলক্ষ্যে তিনি সর্বদা অবস্থিত, তাই জাগতিক লাভালাভ ভালমন্দ কিছুতেই তাঁহাকে চঞ্চল করিতে পারে না। এই ত্যাগীর আসনই সর্বাপেক্ষা উচ্চ। ত্যাগী হইতে হইলে মনকে সম্পূর্ণ নিবোধ করিতে হইবে এবং মন তখনই নিরুদ্ধ হওয়া সম্ভব যখন প্রাণ স্পন্দনশূন্য হইবে। প্রাণের এই নিস্পন্দন-ভাব ত্যাগীর স্বাভাবিক। সন্ন্যাসীর অস্ত ইচ্ছা না থাকিলেও মোক্ষের ইচ্ছা থাকে, কিন্তু ত্যাগীর মোক্ষলাভের আশাও থাকে না। প্রাণ স্পন্দিত হয় পূর্বকর্মানুসারে,

(কৰ্মের কারণ—পাঁচটি)

পট্টতানি * মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।

সাক্ষ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্বকৰ্মণাম্ ॥ ১৩

সেই প্রাণ স্পন্দিত হইলেই মন ও সমস্ত ইন্দ্রিয় স্পন্দিত হইয়া উঠে। এই স্পন্দনের নামই কৰ্ম-চেষ্টা। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে—এই কৰ্ম-চেষ্টার বেগ আসে প্রাণ হইতে, সেই প্রাণকে সুযুধ্যযুধী করিতে পারিলেই মুপাধারস্থ জীবশক্তি আত্মাচক্রে নিরুদ্ধ হইয়া যায়। এই নিবোধভাবের দ্বারা মন-ইন্দ্রিয়ের বিষয়গতি নিরুদ্ধ হয়। যাহার এই নিবোধভাব সম্যক ও সহজ হইয়াছে, বিষয়-তাগও তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক ও সহজ হয়। এই অবস্থায় অবস্থিত সাধকেই ত্যাগী বলে। তিনি যে ইচ্ছা করিয়া ত্যাগ করেন তাহা নহে, ত্যাগ তাঁহার আপনা-আপনি হয়। সে ত্যাগে তাঁহার কোন কষ্ট নাই। মন স্বভাবতঃই অচঞ্চল হইয়া আর বিষয় গ্রহণ করে না—ক্রমে ত্যাগীর গ্রহীতৃ-গ্রহণ-ভাবও থাকে না। গ্রহীতৃ-গ্রহণ-ভাব ক্রীণ হইলে গ্রহণের বিষয়ও থাকে না। সুতরাং কি লইয়া আর মনের স্পন্দন হইবে? ইহাবাই নাম সমতা বা সমাধি। এখন যাহাকে জীবাত্মা বলিতেছে, তখন তাহা পরমাত্মার সহিত অভিন্নভাবে স্থিতিলাভ করে ॥ ১২

অশ্রয়। মহাবাহো! (হে মহাবাহো!) সর্বকৰ্মণাম্ সিদ্ধয়ে (সকলপ্রকার কৰ্ম সম্পাদনের জন্য) কৃতান্তে সাধ্যো (কৰ্মের পরিসমাপ্তিসূচক বেদান্ত বা সাংখ্যশাস্ত্রে) প্রোক্তানি (কথিত বা বর্ণিত, ইমানি (এই) পঞ্চকারণানি (পাঁচটি কারণ) যে নিবোধ (আমার নিকট অবগত হও) ॥ ১৩

শ্রীধর। নমু কৰ্ম কুর্ততঃ কৰ্মফলং কথং ন ভবেৎ ইত্যশঙ্ক্য সঙ্গত্যাগিনো নিবহকারস্ত সতঃ কৰ্মফলেন লেপো নাস্তি ইতি উপপাদয়িতুমাহ—পঞ্চৈতি পঞ্চভিঃ। সর্বকৰ্মণাম্ সিদ্ধয়ে—নিস্পত্তয়ে, ইমানি—বক্ষ্যমাণানি পঞ্চ কারণানি, যে বচনাৎ নিবোধ—জানীহি। আত্মনঃ কর্তৃত্বাভিমাননিবৃত্ত্যর্থম্ অবশ্যম্ এতানি জ্ঞাতব্যানি ইতি এবং, তেবাং স্তব্যার্থমেরাহ—সাংখ্য ইতি। সম্যক্ ধ্যায়তে—জ্ঞায়তে পরমাত্মা অনেনেতি সাংখ্যং—তত্ত্বজ্ঞানম্, তস্মিন্। কৃতং—কৰ্ম, তন্ত্ৰ অস্তঃ—সমাধিঃ অস্মিন্ ইতি কৃতান্তঃ তস্মিন্ বেদান্তসিদ্ধান্ত ইত্যর্থঃ। বধ্য সাংখ্যায়ন্তে গণ্যন্তে তস্মান অস্মিন্ ইতি সাংখ্যম্। কৃতঃ অস্তঃ—নির্ণয়োঃস্মিন্নিতি কৃতান্তং—সাংখ্যশাস্ত্রমেব, তস্মিন্ প্রোক্তানি। অস্তঃ সম্যক্ নিবোধ ইত্যর্থঃ ॥ ১৩

বজ্রানুবাদ। [যে ব্যক্তি কৰ্ম করে, তাহার কৰ্মফল হইবে না কেন? এই প্রশ্নকার উত্তরে সঙ্গত্যাগী নিবহকার ব্যক্তির যে কৰ্মলেপ হয় না—ইহাই পাঁচটি স্নোক্ত দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন]—(হে মহাবাহো!) সর্বকৰ্মের নিস্পত্তির জন্য এই বক্ষ্যমাণ পাঁচটি কারণ আমার বাক্য হইতে জানিয়া লও। আত্মার কর্তৃত্বাভিমান নিবৃত্তির জন্য এই সকল কারণগুলি অবশ্য জ্ঞাতব্য। এইরূপে সেই সকল কারণের স্তব্যার্থ বলিতেছেন। সম্যকরূপে ধ্যাত বা জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় যাহাতে—তাহাই সাংখ্য অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান। কৃত অর্থে কৰ্ম তাহার অস্ত অর্থাৎ সমাপ্তি হয় যাহাতে—তাহাই কৃতান্ত, তাহাতে অর্থাৎ বেদান্ত সিদ্ধান্তে। অথবা সাংখ্যাত

বা গণিত হয় তব্ সকল বাহাতে—তাহা সাংখ্য, আর কৃত হয় অন্ত অর্থাৎ নির্ণয় বাহাতে—
তাহাই সাংখ্যশাস্ত্র-তাহাতে প্রকৃষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে। অতএব তাহা সম্যকরূপে জ্ঞাত হও ॥১৩

আধ্যাত্মিক বাখ্যা—এখন সকলে যে কৰ্ম্ম করে তাহার পাঁচটি কারণ কথিত
হইয়াছে। সেই সকল কারণ জ্ঞাত কৰ্ম্ম সিদ্ধির নিমিত্ত করিতেছে।—কৰ্ম্ম সম্পাদনের
জ্ঞান যে পাঁচটি কারণ আছে, তাহা জ্ঞাতব্য বলিয়া বলিতেছেন। তাহা জ্ঞাতব্য এইজন্যই,
—যে আত্মার কর্তৃত্বাভিমান জ্ঞান এই সংসারলীলা চলে, সেই সংসার নিবৃত্ত হয় না এই
কর্তৃত্বাভিমান নিবৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত। এই আত্মবস্তই সত্য, উহা এক ও অবিভীয়া।
আত্মার এইরূপ সত্য পরিচয় থাকে না বলিয়াই আত্মাকে বহু বলিয়া মনে হয়, আত্মাতে জন্ম-
মৃত্যু স্বপ্ন-জাগরণ সংসার অধ্যারোপিত হয়। আত্মার বাহ্য স্বরূপ, সেই সত্যজ্ঞান না হইয়া
অজ্ঞ বোধ হয় কেন? অনাত্মবস্ত—যাহা মিথ্যা, তাহাকে সত্যবোধ করিয়া অনাত্মবস্ততে
আত্মবোধ ও মিথ্যাবস্ততে যে সত্যবোধ হইয়া থাকে উহাই অবিজ্ঞার কার্য। এই অবিজ্ঞা নষ্ট
না হইলে আত্মার স্বরূপ বোধ হয় না। অবিজ্ঞা নষ্ট হয় বিজ্ঞা দ্বারা। অসংখ্য তরঙ্গের অভিঘাত
হেতু যেমন সমুদ্রের স্থিরত্বকে লক্ষ্য করা যায় না, তরঙ্গ অবিজ্ঞার অসংখ্য তরঙ্গ-ভঙ্গ হেতু স্থির
আত্মাকে উপলব্ধি করা যায় না। এইজন্য আত্মজ্ঞানের বাহা যাহা আবশ্যক, তৎসম্বন্ধে জ্ঞান
আবশ্যক। সেই জ্ঞানলাভ যে শাস্ত্রদ্বারা হয় তাহাকে সাংখ্যশাস্ত্র বলে। এইজন্য সাংখ্যকে
কৃতান্ত বলি হয়। ক্রিয়া করিতে করিতে ক্রিয়ার পর-অবস্থা প্রাপ্তি হইলে কৰ্ম্মের পরি-
সমাপ্তি হয়। তখনই আত্মার সম্যক্ ব্যাতি বা প্রকাশ হইয়া থাকে। কৃত অর্থাৎ কৰ্ম্মের অন্ত
বা পরিসমাপ্তি। ক্রিয়ার পর-অবস্থাতেই ক্রিয়ার পরিসমাপ্তি হয়। কিন্তু এ অবিজ্ঞার খেলা
যতদিন রুদ্ধ না হয়, ততদিন কৰ্ম্মের গতিও রুদ্ধ হয় না, এবং কৰ্ম্মের গতি রুদ্ধ না হইলে
জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার-খেলাও নিরন্তর প্রবহমান থাকে। আত্মজ্ঞানের দ্বারা অবিজ্ঞা
নিবৃত্ত হইলে অবিজ্ঞাভিনীত কৰ্ম্মও নিবৃত্ত হয়, এবং জন্ম-মৃত্যুরূপ যে কৰ্ম্মের ফল—
তাহাও বিলুপ্ত হয়। ক্রিয়ার পরাবস্থাই সম্যক্ জ্ঞান সে অবস্থায় কোন ক্রিয় থাকে না।
ইড়া-পিঙ্গলায় বতরূপ শ্বাস বহিতে থাকে ততক্ষণই অবিজ্ঞা। সে সময় কৰ্ম্মও থাকে,
কৰ্ম্মের ফলও থাকে। ইহাই অনাত্ম দৃষ্টি বা মিথ্যাজ্ঞান। এই মিথ্যাজ্ঞানের বাহা কারণ,
সেই কারণ পঞ্চ সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা হইলে আর অবিজ্ঞার উৎপত্তিই হইতে পারে না।
যেমন সতর্ক থাকিলে চোর চুরি করিতে পারে না, তরুণ মিথ্যাজ্ঞানের কারণগুলিকে
জানিলে আর মিথ্যাজ্ঞান জন্ম যুদ্ধ হইতে হয় না। “ক্রিয়া, কারণ এবং ফল অজ্ঞানের দ্বারা
আত্মাতে আরোপিত হয়, যে অজ্ঞ সে অধিষ্ঠান প্রভৃতি ক্রিয়াসম্পাদক কারণগুলিকেই আত্মা
বলিয়া বুঝে তাহার পক্ষে অশেষরূপে কৰ্ম্মসম্মান সম্ভব হয় না”—(শঙ্কর)। ভগবান্
বলিতেছেন—এই অনাত্মজ্ঞান যাহার উপর দাঁড়াইয়া আছে, সেই কারণগুলিকে বিশেষভাবে
জানা আবশ্যক। ইহা সম্যক্ জানা থাকিলে আর আত্মবিস্তৃতি ঘটবার সম্ভাবনা থাকে না।
ভগবান্ গীতাতে পূর্বেরও বলিয়াছেন—“সৰ্ব্বং কৰ্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে”; বিজ্ঞ
শুকার-ক্রিয়ার সাহায্যে স্বয়ংগ্রহি ভেদ না হওয়া পর্য্যন্ত কেহই “তৎ” কে ও “সৎ” কে
লক্ষ্যই করিতে পারে না। “তৎ” ও “সৎ”এর অভেদ জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান ॥ ১৩

(কারণ পঞ্চ)

অধিষ্ঠানং তথা কৰ্ত্তা করণং চ পৃথগ্ধিম্।

বিবিধান্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্ ॥ ১৪

অর্থঃ। অধিষ্ঠানং (দেহ) তথা কৰ্ত্তা (আর অহঙ্কার) পৃথক্বিধং চ করণং (কৰ্ম্মসাধন
বিবিধ ইন্দ্রিয়) বিবিধাঃ (নানাবিধ) পৃথক্ চেষ্টাঃ চ (পৃথক্ পৃথক্ চেষ্টা বা ব্যাপার),
অত্র (এই কারণ সমূহের মধ্যে) দৈবম্ এব চ (দৈব—ইন্দ্রিয়াদিঃ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বা
বর্ষাধর্মরূপ সংস্কার বা সর্বপ্রেরক অন্তর্ধ্যামী) পঞ্চমং (পঞ্চম স্থানীয়) ॥ ১৪

তীর্থঃ। তাত্বেব আহ—অধিষ্ঠানমিতি। অধিষ্ঠানং—শরীরং, কৰ্ত্তা—চিহ্নচিহ্ন গ্রহিঃ
অহঙ্কারঃ। পৃথগ্ধিম্—অনেকপ্রকারং করণং—চক্ষুঃশ্রোত্রাদি। বিবিধাঃ—কার্যভঃ
স্বরূপতঃ, পৃথগ্ ভূতাঃ চেষ্টাঃ—প্রাণাপানাদীনাং ব্যাপারঃ। অত্র—এতেন্ এব দৈবং চ
পঞ্চমং কারণং—চক্ষুঃশ্রোত্রাদিহ কৰ্ম্মপ্রেরকোহন্তর্ধ্যামী বা ॥ ১৪

বঙ্গাঙ্কুবাদঃ। [সর্বকৰ্ম্ম সম্পাদনের সেই কারণগুলি কি তাহাই বলিতেছেন]—(১)
অধিষ্ঠান—শরীর, (২) কৰ্ত্তা—চিৎ অস্তিত্বের গ্রহিরূপ অহঙ্কার, (৩) করণম্—অনেকপ্রকার
করণ চক্ষুঃশ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণ, (৪) কার্যভঃ ও স্বরূপতঃ ভিন্ন ভিন্ন চেষ্টা অর্থাৎ প্রাণ-পঞ্চের
ব্যাপারাদি; (৫) দৈবম্—অত্র অর্থাৎ ইহার মধ্যে দৈবই পঞ্চম অর্থাৎ চক্ষুঃশ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ার
অন্তর্ধ্যাহক বা সহকারী সূর্য্যাদি, অথবা সর্বপ্রেরক অন্তর্ধ্যামী। [দৈব অর্থাৎ অহুগ্রাহক
দেবতা। শ্রোত্র, বক্, চক্ষু, জিহ্বা এবং শ্রোত্রে দিক্দেবতা বায়ুদেবতা, অর্কদেবতা, বরুণ-
দেবতা ও অগ্নীকুমার প্রেরণা করেন। অগ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র যম ও প্রাণাশক্তি যথাক্রমে
বাক্, পার্শ্ব, পাদ, পাদু ও উপহৃ এই পঞ্চ কৰ্ম্মেন্দ্রিয়কে প্রেরণা করেন। চক্ষু, ত্রীক্ষা, শব্দ ও
বিষ্ণু—যথাক্রমে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্তকে নিয়ন্ত্রিত করেন। পঞ্চ প্রাণ—প্রাণ, অপান,
সমান, উদান ও ব্যান—এই পঞ্চপ্রাণের দেবতা যথাক্রমে সংজ্ঞাত, বামনদেব, অধোর,
তৎপুরুষ ও দিশান। এই সমস্ত দেবতাগণ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া এই সকল ইন্দ্রিয়াদি স্থূল
বিষয় অহুত্তব করেন। বর্ষাধর্মরূপ সংস্কারকেও কেহ কেহ দৈব বলেন] ॥ ১৪

আধ্যাত্মিক বাখ্যা—প্রথমম্ এই একটা কৰ্ম্ম মনে মনে স্থির করে সে কৰ্ত্তা
বলিয়াই স্থির করে—স্থির ক'রে করিতে আরম্ভ দেয়—করিতে আরম্ভ ক'রে
নানাপ্রকার চেষ্টা করে—করিলে কি হইল—দৈবের দ্বারায় বা কিছু হবার তাই
হয়—অতএব বুদ্ধি, অহঙ্কার করা, বিবিধ চেষ্টা, ও দৈব এই সকল কৰ্ম্মের কারণ
হইতেছে। তবে সমুদয় কৰ্ম্মেরই কারণ মনেই, সেই মনকে ক্রিয়ার দ্বারায় স্থির
করিলেই কোন কৰ্ম্মই নাই—কলাকান্ডকার্য সহিত।—কোন কৰ্ম্ম কার্যতে হইলে
প্রথমে মনে সঙ্কল্প হয়, সঙ্কল্পের উদয় মন হইতেই হয়, এবং বুদ্ধি কর্তব্যাকর্তব্য স্থির করে—
ইহাই অস্তঃকরণের কার্য। মনের সঙ্কল্প (১) ইন্দ্রিয় যন্ত্রের দ্বারা পার্শ্বচালিত হইয়া কার্য উৎপন্ন
করে। এই যন্ত্রগুলি পরিচালনা করেন (২) প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু। এই সকল ক্রিয়া নিম্পত্তির
জ্ঞান সমস্ত ইন্দ্রিয়াদির দ্বারক একটি আধারের প্রয়োজন, (৩) এই আধার বা অধিষ্ঠানটি হইল

হইয়া থাকে। শরীরাদি দ্বারা যে ধর্ম্য বা অধর্ম্য কর্ম মানুষ করিয়া থাকে, সেই সকল কর্মের
এই পাণ্ডটিই হেতু ॥ ১৫

এই পাঁচটিই হেতু ॥ ১৫ ॥

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এই সকল কারণের হেতু পাঁচ। এ শরীর রহিয়াছে বলিয়া মনস্থিরপূর্বক অন্তরিক দৃষ্টি করে—সে দৃষ্টি বাক্যের দ্বারা শুনিয়া—অমুক বস্তু এই—বড় ভাল, সে ভাল আছে, সে ভালই থাকুক—কিন্তু তাহা না বিবেচনা করিয়া আমি সেই জিনিসের কর্তা হইব, অর্থাৎ সে জিনিস আমার অধীন হয়—তাহার পর মন সেই জিনিস পাবার জন্য চলিলেন—চলিবার নিমিত্ত জুতা কাপড় চাদর লওয়া হইল এবং পাদব্রজন হইতে লাগিল—দোকানের নিকট পর্য্যন্ত গেলেন—গিয়া লেডিকেনি আছে? দৈবক্রমে লেডিকেনি ফুরিয়ে গিয়াছে—এটা বিপরীত কর্ম্ম। ইহা না লইয়া অন্য জিনিস নিতে পারেন—অতএব শরীর, বাক্য, মন দ্বারার দ্বারা কর্ম্ম বা বিপরীত কর্ম্ম—সকল কর্ম্মের হেতু এই পাঁচ হইতেছে।—নব্বছ যাহা কিছু কার্যিক বাচিক, মানসিক কর্ম্ম করে, ঐ পাঁচটিই তাহার হেতু। তাহা শুধু জীবের মোক্ষ সম্ভাবনা কোথায়? জীবের সঙ্গে এই পঞ্চাশ সঙ্কল্প দ্বারা কথিয়া দেয়। জীব যখন চিদংশ স্বত্ত্বরূপ তাহার কর্ম্ম নাই। প্রকৃতি কর্ম্ম করে, জীব প্রকৃতির কমে জ্ঞানান কারিয়া সুখ-দুঃখাদিতে জড়িত হয়। জীব প্রকৃতির কর্ম্মে অভিমান না করিলেই সুখ-দুঃখাদিতে সংলিপ্ত হয় না। জীবকে কর্তা না বলিয়া তবে অহঙ্কারকে কর্তা বলা হয় কেন? অহঙ্কার যদিও প্রাকৃত বস্তু, কিন্তু ব্রহ্মের চৈতন্যে সে চেতনবৎ প্রতীত হইয়া থাকে। ষট্‌স্থ জ্বলে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব পড়ে, এইজন্ম জ্বলমধ্যে চন্দ্র দেখা যাইলেও বাস্তবিক চন্দ্র জ্বলের সহিত যুক্ত হন না। তরুণ অহঙ্কাররূপ জ্বলে ব্রহ্মচৈতন্যের প্রতিবিম্ব পড়িয়া অহঙ্কারকে চৈতন্যযুক্ত করে। জ্বলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের দ্বারা মায়াতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই জীব। সেই মায়া বা অজ্ঞান নাশ হইলে জীবভাবও নষ্ট হইয়া যায়। যদি বলা যায় অজ্ঞান নাশ হইলেও জীবভাব নষ্ট হয় না, তবে মুক্তি সিদ্ধ হইবে কিরূপে? অজ্ঞানশূন্য জীবভাব নিত্য বলিয়া স্বীকার করিলে, পূর্ণজ্ঞানসম্পন্ন জীবকেও ঈশ্বরের দ্বারা সর্বশক্তিমান বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে বহু জীবের যখন মুক্তির কথা শুনা যায়, তখন ঈশ্বরও বহু হইবেন না কেন? কিন্তু তাহা সত্য নহে। অজ্ঞান জ্বলই জীবভাব কল্পিত হয়, অজ্ঞান নষ্ট হইলে তৎসহ জীবভাবও নষ্ট হইয়া যায়। ষট্‌ভয়ে ষট্‌কাশের যেমন পৃথক সত্তা থাকে না, অজ্ঞান নষ্ট হইলে জীবেরও তরুণ পৃথক সত্তা থাকিতে পারে না। ব্রহ্ম তো সর্বদাই জ্ঞানস্বরূপ, তবে এই জগদ্বাদি প্রপঞ্চ উৎপন্ন হয় কিরূপে, এবং উৎপন্ন হইয়া তাহার স্থিতিই বা হয় কিরূপে? ব্রহ্মের অবচননশূন্যপটীয়াই নাশশক্তি দ্বারা এই বিশ্বলীলা পুনঃ পুনঃ অহস্তিত হইতে থাকে। এই মায়াশক্তি নিত্যশূন্য হুস্তরা, কিন্তু তবুও জীবের যখন মুক্তি হয় বলিয়া শাস্ত্র বলিতেছেন, তখন বুঝিতে হইবে এই মায়া হুস্তরা হইলেও নিত্য নহে। ভগবান্ প্রকৃতি-পুরুষের নিয়ামক ত্রিগুণের অধীশ্বর এবং সংসারস্থিতি ও মোক্ষপ্রাপ্তি উভয়েরই তিনিই হেতু। স্বত্ত্বরূপ ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিলে জীবের সংসার-বন্ধন মোচন হয়। শ্রুতি বলিতেছেন—

“म विश्वकुक्षिभविद्याश्रयोनिः

श्रुः कामकारो शुनी सर्वविद् यः ।

প্রধান ক্ষেত্রক পতিষ্ঠা পেশ:

সংসার মোক্ষ স্থিতিবদ্ধ হেতু: ॥”

তিনি বিখ্যাত, বিশ্ববিদ, যিনি সকলের আত্মা ও যৌনি অর্থাৎ কারণ, যিনি চেতন, কালের প্রবর্তক, অশত পাপাহারিণীশূণসম্পন্ন ও সর্ববিষয়ক জ্ঞানসম্পন্ন। অধিকন্তু তিনি প্রকৃতি ও পুণ্যের নিয়ামক, ত্রিগুণের অধীশ্বর, এবং সংসার স্থিতি, মোক্ষ-প্রাপ্তি ও বন্ধনের হেতুভূত। এই এক অদ্বিতীয় পরমাত্মাই সকলের নিয়ন্তা।

একো হি কদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তসুঃ ।”

যেহেতু পরমাণ্বা একই সেইজন্ত পূর্বমার্থদর্শী ব্রহ্মবিদগণ অপর কোন বস্তুর অপেক্ষা করেন না। মূলে তিনিই একমাত্র সত্তারূপে বিद्यমান, আর এই নামরূপ বিশিষ্ট জগৎ ইন্দ্রজালের দ্বায় মায়াবদ্ধিত।

ব্রহ্ম স্বয়ং অধিকারী হইলেও তাঁহার মায়াশক্তিই জগত প্রপঞ্চাকারে পরিণত হয়। অর্থাৎ চৈতন্যময়। তিনি সৃষ্টি স্থিতির কারণ রূপে উল্লিখিত হন। কিন্তু ক্রিয়ায় পর অবস্থারূপ ব্রহ্ম ভাবের মধ্যে আবণ্ড নাই, জগৎও নাই; মায়াকে আশ্রয় করিলে তবে ব্রহ্মের ইশনভাব হয় অর্থাৎ তখন তাঁহাকে দৈব বলি যায়। আবার মায়া হইতে অবিচ্ছিন্ন উৎপন্ন হইয়া সেই চৈতন্যই জীবভাবে সংসারী হইয়া বন্ধনযুক্ত হইয়া থাকেন। বাহ্যে পরাবস্থা প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া জীবরূপে জন্মমৃত্যুর অধীন হইয়া দুঃখ ও শোকগ্রস্ত হইতেছেন। জীব-ভাবের দ্বিক হইতে বিচার করিয়া দেখিতে গেলে এই বাহ্য প্রপঞ্চ একেবারে মিথ্যা নহে ক্রিয়ায় পর অবস্থায় জীবভাব মিটিয়া গেলে আর এই প্রপঞ্চের কোন সাড়া পাওয়া যায় না তাই যোগীরা শিব শক্তির একত্র সম্মিলন করিয়া এই মায়াবন্ধন হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। জড় চেতনের মিলনস্থান এই জীব ও জীব। জড়ত্বের দ্বিক থাকিলে আপনাকে আপনি বন্ধ মনে হয়, আবার দৃষ্টি চৈতন্যমুখী হইলেই বন্ধন খসিতে আরম্ভ করে।

“সংযুক্তমেতৎ স্বরমকরক

ব্যক্তাব্যক্তং ভূতে বিশ্বমীশঃ ।

অনীশচান্দ্রা বধ্যতে ভোক্তৃভাবাৎ

জ্ঞানী দেবং যুষ্মতে নক্সিপাটৈঃ ॥” শ্বেতঃ উ:

সেই পরমেশ্বরই এই স্বর ও অস্বর, ব্যক্ত ও অব্যক্তনয় বিশ্বকে পোষণ বা ধারণ করিয়ে থাকেন। যান্নাধীন জীব ভোক্তাভাব হেতু আবদ্ধ হয়, জীব ইষরে ভেদ উপাধিকৃত, উপাসনা দ্বারা যোগ্যতা লাভ হইলে নিরুপাদিক পরমেশ্বর বিষয়ে জ্ঞান হয়—তখন জ্ঞানজালেশ্বর প জীবভাব তিরোহিত হইলেই মুক্তিলাভ হয় ॥ ১৫

(আত্মা “অকর্তা” “কেবল”)

ভৈরবং সতি কৰ্ত্তারমাস্তানং কেবলং তু যঃ ।

পশ্চত্যকৃতবুদ্ধিহীন স পশ্চতি দুৰ্দ্ধতিঃ ॥ ১৬

অর্থঃ । তত্র এবং সতি (যখন সকল কৰ্ম্মের হেতুই ঐ পাঁচটি তখন) যঃ তু (যে ব্যক্তি) কেবলং (নিঃসঙ্গ) আত্মানং (আত্মাকে) কৰ্ত্তাং পশ্চতি (কৰ্ত্তা বলিয়া দেখে) অকৃত-বুদ্ধিহীনং (অসংস্কৃতবুদ্ধি হেতু) সঃ দুৰ্দ্ধতিঃ (সেই দুৰ্দ্ধতি) ন পশ্চতি (সম্যকরূপে দর্শন করে না) ॥ ১৬

শ্রীধর । ততঃ কিম্ ? অত আহ—তত্রৈতি । তত্র—সদৃশিন্ কৰ্ম্মণি এতে পঞ্চ হৈতবঃ ইতি । এবং সতি কেবলং—নিরূপাধিকন্ অসঙ্গং আত্মানং তু যঃ কৰ্ত্তাং পশ্চতি, শাস্ত্রাচার্যঃ উপদেশত্যাগেন অসংস্কৃতবুদ্ধিহীনং, দুৰ্দ্ধতিঃ অসৌ সম্যক ন পশ্চতি ॥ ১৬

বঙ্গানুবাদ । [তাহাতে কি হয় ? ইহার উত্তর বলিতেছেন] সেই কৰ্ম্ম সকলের ঐ ১টি হেতু হইলেও নিরূপাধি অসঙ্গ আত্মাকে যে মূঢ় কৰ্ত্তা বলিয়া দেখে, শাস্ত্র এবং শাস্ত্রোপদেশ ত্যাগ করায়—অতএব তাহার বুদ্ধি পরিমার্জিত না হওয়ায়, সেই ব্যক্তি নাকি দর্শনে অসমর্থ ॥ ১৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এ সকল কৰ্ম্মেরই কৰ্ত্তা আত্মা হইতেছে তাঁহাকেই ক্রিয়া করায় দেখা যায়, ধরা যায়, ক্রিয়ার পর অবস্থায়—যে কেহ আত্মার ক্রিয়া না করে সে দেখিতে পায় না—কাজে কাজেই আত্মা হইতে অস্তিত্বের মন আসক্তিপূর্বক যায় ।—আত্মাকে কৰ্ত্তা বলিয়া দেখাই আমাদের দুৰ্দ্ধতি, আত্মা কৰ্ত্তা নহেন, কৰ্ম্মাদি সম্পাদন পূর্বক পাঁচটি হেতু দ্বারা হয়—এই সকল কথা প্রাচীন ভাষ্যকার ও টীকাকারেরা বলিয়াছেন, কিন্তু লাহিড়ী মহাশয় একটু নূতন কথা বলিলেন । পূর্ব শ্লোকে কথিত পাঁচটি হেতুই কৰ্ম্মের কৰ্ত্তা স্বীকার করি, কিন্তু তাহাতেই কি আত্মার প্রকৃত কর্তৃত্ব বিলুপ্ত হইল ? আত্মা না থাকিলে ঐ পঞ্চের কৰ্ম্ম করিবার সাধ্য কোথায় ? সুতরাং আত্মা কোন কৰ্ম্ম করুন বা নাই করুন প্রকৃত কৰ্ত্তাই কিন্তু আত্মা । কিন্তু আত্মা কৰ্ত্তা হইয়াও যে অকর্ত্তা—বাহার ক্রিয়া করে না তাহার উহা জানিতে পারে না, তাই বাহার দুৰ্দ্ধতি তাহার অসঙ্গ আত্মাকে কৰ্ত্তা মনে করে, তাহার বলিয়া থাকে আত্মাই আসক্তি-পূর্বক যেন সমস্ত করিতেছেন; আত্মার আসক্তি না থাকায় কোন কৰ্ম্মতেই তাহার অভিমান হয় না—এইটি বুঝিতে না পারাই দুৰ্দ্ধতি, নচেৎ আত্মাই তো সব, সুতরাং তিনি যে সকল কৰ্ম্মেরই কৰ্ত্তা—ইহা মনে করা বোধের হইতে পারে না । আত্মার শক্তিতেই ঐ পঞ্চজন কাজ করে বটে, কিন্তু আত্মা নিঃসঙ্গ মূক্ত, তাঁহাকে কৰ্ম্ম স্পর্শ করিতে পারে না, কিন্তু বাহার মন বুদ্ধির কর্তৃত্বের আত্মাতে আরোপ করে, তাহার আত্মার অকর্তৃত্বের বিরুদ্ধে তাহা বুঝিতে পারে না । তিনি কাজ করিয়াও কাজ করেন না, চলিয়াও চলেন না, বলিয়াও বলেন না । কঠোপনিষদ্ বলিতেছেন—“আসীনো দূরং ব্রজতি শযোনো যাতি সর্বতঃ, কন্তং মহামধং ধ্বং নদভো জাতুমর্হতি ॥”

আত্মা স্থির থাকিয়াও গমন করেন, নিশ্চেষ্টবৎ হইয়াও সর্বত্র গমন করেন স্বর্ঘ্যস্ত ও স্বর্ঘ্যহীন—এইরূপ স্বপ্রকাশ আত্মাকে আমি ব্যতীত আর কে জানিতে সমর্থ হয় ? অর্থাৎ এইরূপ আত্মার জ্ঞাতা আত্মাই অথবা আত্মজ পুরুষ । এই আত্মাকে দেখিতে পাওয়া যায় । প্রমাণ—“যং পশ্চতি বতয়ঃ ক্লীণদোষাঃ” । ক্লীণদোষ হইলেই অর্থাৎ মনের চাকলা মিটিলেই বা মনের বিষয় গ্রহণ প্রস্তুতি থাকিলেই যোগী পুরুষেরা সেই আত্মাকে দেখিতে পান । ক্রিয়ার পর অবস্থায় যখন সব এক হইয়া যায় সেই অবস্থায় আত্মাকে বুঝিতে পারা যায়, তাহার সহিত মিলিতে পারা যায় । কিন্তু বাহার “অকৃতবুদ্ধি”—অর্থাৎ বাহার ক্রিয়া করিয়া স্থির হইতে না পারে, তাহার প্রকৃত বুদ্ধি নাই, ক্রিয়ার পর অবস্থা ব্যতীত স্থির-বুদ্ধি হইবার উপায় নাই, বাহার বুদ্ধির স্থিরতা হয় নাই, তাহার অকৃতবুদ্ধি, সুতরাং তাহার আত্মাকে দেখিতে পার না, এবং আত্মা সকল বিষয়ের কৰ্ত্তা হইয়াও তিনি যে নিলিপ্ত তাহা বুঝিতে পারে না । সুতরাং ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থা না পাওয়া পর্যন্ত বুদ্ধি স্থিরতার প্রাপ্ত হয় না, অতএব তাহার আত্মদর্শন হয় না ।

আত্মা ব্যতীত অল্প কিছু বস্তু নাই, অন্য আত্মা বলিয়াও কোন বস্তু থাকিতে পারে না । আত্মবৃষ্টির অভাব হেতুই জড় পরার্থের উপলব্ধি হয় । চক্ষু নিরাময় না থাকিলে যেমন এক বর্ণকে অল্প বর্ণ বলিয়া বোধ হয় তদ্রূপ মনের বিকৃত অবস্থায় জড় অজড়ের ভেদ বোধ হয় । আত্মা ব্যতীত আর কিছু নাই বলিয়াই আত্মা অসঙ্গ । ক্রিয়ার পর অবস্থায় যখন কিছুই থাকে না তখনই আত্মাকে অসঙ্গ বলিয়া উপলব্ধি হয় । প্রকৃতপক্ষে যদি অল্প কিছু থাকিত, আত্মা অসঙ্গ হইতে পারিতেন না । অবিশ্রা প্রভাবের এক আত্মাকে জগদাদি নানা রূপে দেখিতে পাওয়া যায় । বাস্তবিক জগৎ বলিয়া কোন সত্য বস্তু নাই । নানা বস্তুর দর্শন কালেও সেই এক আত্মাই অসংখ্য ভাবে বুদ্ধির গোচর হন । বুদ্ধি স্থির না হওয়ায় মরীচিকাকে বস্তু বলিয়া ভ্রম হয় । বাহার শাধন করে না তাহার বুদ্ধি স্থিরতার প্রাপ্ত হয় না । ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয় মুখে বলিলেও এ ভ্রম নষ্ট হয় না বা বহু এক হইয়া যায় না । একমাত্র ক্রিয়ার পর অবস্থাতে বুদ্ধি যখন স্থির হইয়া যায় তখন নানাত্বের কোন অস্তিত্বই বুঝিতে পারা যায় না । ইহার নামই সম্যক দর্শন । আত্মা ব্যতীত অল্প বৎ দেখাই অসম্যকদর্শন । বতক্ষণ মন চঞ্চল, বাহ্যদৃষ্টিসম্পন্ন, ততক্ষণ অবিশ্রাব খেলা নিবৃত্ত হয় না, সংসারদর্শনও লুপ্ত হয় না, ততক্ষণ শত সহস্র ভেদ বর্তমান, তখন জীবও আছেন, ব্রহ্মও আছেন । জীব বতক্ষণ জীব, ততক্ষণ তিনি অনীশ, অর্থাৎ কৰ্ত্তা নহেন । কর্তৃত্ব তখন মায়ার শব্দিত দৃষ্টির । সেই দৃষ্টিকে কৰ্ত্তা মনে না করিয়া যে আপনাকে কৰ্ত্তা মনে করে সে দুৰ্দ্ধতি । খেলা মিথ্যা বা স্বপ্নমাত্র হইলেও বতক্ষণ তাহা আছে ততক্ষণ তাহা দৃষ্টবে অধ্যাসিত । যেই স্বপ্নদর্শন ভঙ্গ হয়, তখন কণ্ঠ থাকে না, কৰ্ত্তাও থাকে না, থাকেন এক পরমাত্মা, ইহাকেই আত্মার স্বরূপে অবস্থান বলে বা ব্রহ্মত্ব বলে । আত্মা যদিও সত্য শুদ্ধ, কিন্তু মায়াতে স্বীকার করিলে তাহার যে ভাব হয়—উহাই চিদ্রূপের মিশ্রণ, উহাকেই অজ্ঞতা বলে । মায়াধীন জীব না হইলে এই অজ্ঞতা বহিয়াছে । ক্রিয়ার পর অবস্থায় অজ্ঞতা যেমন তিরোহিত হয়, জীব তখনই অকর্ত্তা ও নিঃসঙ্গ বলিয়া কথিত হন । তখন আর জীবও থাকে না, তাহার শিবত্ব লাভ হয় । জীবাবস্থায়

(কাহার কর্ণলেপ হয় না ?)

যশ্চ নাহঙ্কতো ভাবো বুদ্ধির্বাস্য ন লিপ্যতে ।

হৃদ্যপি স ইমান্লোকান হন্তি ন নিবন্ধ্যতে ॥১৭

নিজ মহিমা অবিজ্ঞাত থাকে বলিয়াই তাহাকে চেতন করিলেও তাহার চৈতন্ত হয় না। তখন সে নিজেবও অধীন নহে ঈশবেরও অধীন নহে, তখন সে দুই-অবস্থাবিহীন রথের মত ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বের প্রেরণায় কেবল ভোগ সুখের জন্ত লালায়িত হইয়া ভোগ্যবস্তুর পানেই ছুটিয়া বেড়ায়।

ব্রহ্ম এক, সেখানে দ্বিতীয় বস্তু নাই, তবে এই যে জগৎ দর্শন হয় কাহার ? দ্বিতীয় বস্তু আসে কোথা হইতে ? ইহা ব্রহ্ম কোন পৃথক সত্তা নহে, একমাত্র সত্তার মধ্যেই এই বিচিত্র শক্তি রহিয়াছে, তাহাই কখন কখন প্রকট হয় মাত্র। ইহাই ব্রহ্মের নিজের মধ্যে নিজ শক্তির স্ফূরণ। বর্ষও শিব এক, তথাপি তাঁহার নিজশক্তির যখন স্ফূরণ হয় তখন একের মধ্যেই দ্বিতীয়কে যেন দেখা যায়। ইহাই শিবশক্তি-সম্মিলিত ভাব। একদিক দিয়া দেখিতে গেলে যেন দুইটি সত্তা রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ভাল করিয়া দেখিলে দেখা যায় একটি অস্ত্রটির সহিত অস্ত্রের সখন্ধে সম্মিলিত, একবারে অভিন্ন। পরে শক্তির সাক্ষ্যের স্ফূরণ বা বহিস্কৃতি ভাব—“একোহং বহুত্বাম্”—ইহাই ব্রহ্মের সঙ্কল্প বা মায়াত্ম্য। ইহা হইতে প্রাণ শক্তির স্ফূরণ, আবার প্রাণ হইতে মন, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সম্প্রসারণ ভাব। “প্রাণো হ্যেবং যঃ সর্বভূতৈর্জিতাতি বিজ্ঞানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী”—যুক্ত। যঃ—যে পরমাত্মা, সর্বভূতৈঃ বিভাতি—ব্রহ্মাদি ভূত পৰ্য্যন্ত সমস্ত পদার্থেই প্রকাশ পাইতেছেন, এষ হি প্রাণঃ—তিনিই আমাদের অচকল স্থির প্রাণ, বিজ্ঞানন্—ইহাই ক্রিয়ার পর অবস্থার জ্ঞানিতে পারিয়া, বিদ্বান্—জ্ঞানী সাধক, অতিবাদী ন ভবতে—আত্মাবিভক্ত আর কিছু পদার্থ আছে বলিবারও তাঁহার স্যামর্থ্য নাই।

যাহা এক ছিলো তাহাই আবার বহুরূপ ধারণ করিল। ইহাই ভগবৎ মায়। এই শক্তি প্রভাবে আত্মবিশ্বত আত্মা আত্মাকে বহু বলিয়া মনে করে, এবং একের সহিত অপরকে ভিন্ন বলিয়া ভ্রম করে—এইখানে আত্মদর্শনের লোপ হয়, চৈতন্তের ক্ষীণতা ও জড়ের প্রসারতা লভ হয়। সংস্র হইতে ব্রহ্মশক্তি অবতরণ করিতে করিতে প্রাণ সত্তায় স্পন্দমান হইয়া পরিশেষে জগদাদিরূপে পরিলক্ষিত হয়। পরিশেষে মূলধার পৰ্য্যন্ত অবতরণ করিয়া নিম্নিত হইয়া পড়ে। এইখানেই জীব অজ্ঞানোচ্ছন্ন হইয়া থাকে। আত্মাচক্র পৰ্য্যন্ত যে স্পন্দন তাহাতে মায়। তত প্রাচ্ছন্ন করে না, সেখানে মায়। আছে, কিন্তু মায়।ধীন ভাব নহে। তখনও জ্ঞানের পূর্ণতা। তখন পৰ্য্যন্ত ঐশ্বরিক সৃষ্টি। কণ্ঠ অনাহত, নাভি পৰ্য্যন্ত বৈকারিক ভাব, নাভির নীচে মায়িক সৃষ্টি, তখন একবারে আত্মবিশ্বত ভাব। প্রাণ তখন স্পন্দিত হইয়া মনকে, এবং মন ইন্দ্রিয়গণকে বহিস্কৃতি পরিচালিত করে, ইহাতেই অনন্ত খেলা ও অনন্ত জীব জগতের সম্প্রসারণ হইয়া অনন্ত জগত লীলা চলিতে আরম্ভ করে ॥১৬

অমর। যশ্চ বাহার) অহংকৃতভাবঃ (আমি কর্তা এই ভাব) ন (নাই), যশ্চ বুদ্ধিঃ (বাহার বুদ্ধি) ন লিপ্যতে (লিপ্ত হয় না), সঃ (তিনি) ইমান্ লোকান্ (এই সকল লোককে) হৃদ্যপি (হৃদয়) হনন করিয়াও) ন হন্তি (হনন করেন না), ন নিবন্ধ্যতে (যুক্তরূপে আবদ্ধ হন না) ॥ ১৭

শ্রীপর। কঃ তর্হি হুমতিঃ ? যশ্চ কর্ণলেপো নাস্তি ইত্যুক্তম্ ইতি অপেক্ষায়াম্ আহ—যশ্চেতি। অহমিতি কৃতঃ অহংকর্তা ইতি এবমুক্তো ভাবঃ—অভিপ্রায়ো যশ্চ নাস্তি। যশ্চ অহংকৃতঃ—অহংকারশ্চ ভাবঃ—স্বভাবঃ কর্তৃত্বাভিনিবেশো যশ্চ নাস্তি। শরীরাদীনামেব কর্ণ-কর্তৃত্বালোচনারিহ্যর্থঃ। অতএব যশ্চ বুদ্ধিন্ লিপ্যতে—ইষ্টানিষ্টবুদ্ধ্যা কর্ণহ্ ন সঙ্কতে। সঃ—এবমুক্তো দেহাদিব্যতিরিক্ত আত্মদর্শী ইমান্ লোকান্—সর্বানপি প্রাণিনো লোকদৃষ্ট্যা হৃদ্যপি বিবিজতয়া বুদ্ধ্য্যা ন হন্তি। ন চ ভৎকলৈঃ নিবন্ধ্যতে—বন্ধনঃ প্রাপ্নোতি। কিং পুনঃ সযশ্চ দ্বিধারা পরোক্ষ জ্ঞানোৎপত্তিহেতুভিঃ কর্ণভিঃ তত্র বন্ধশঙ্কা ইত্যর্থঃ। তদুক্তং—

‘ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ণাণি সঙ্গং ত্যক্তা কুরোতি যঃ।

লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাস্তসা ॥ ইতি ॥ ১৭

বঙ্গানুবাদ। [তবে স্মৃতি কে ? (ইহার উত্তর)—গাহার কর্ণলেপ নাই—ইহা বলা হইল। এতদ্বর্থে বলিতেছেন—] অহমিতিকৃত অর্থাৎ আমি কর্তা বাহার এইপ্রকার ভাব বা অভিপ্রায় নাই। অথবা শরীরাদিই কর্ণের কর্তা এইরূপ আলোচনা হেতু বাহার অহংকৃতভাব (অর্থাৎ আমি কর্তাভাব বা কর্তৃত্বাভিনিবেশ) নাই, অতএব বাহার বুদ্ধি লিপ্ত হয় না (ইষ্টানিষ্ট-বুদ্ধিধারা কর্ণসমূহে যিনি আসক্ত হন না) এইরূপ দেহাদি হইতে ব্যতিরিক্ত আত্মদর্শনকারী ব্যক্তি লোকদৃষ্টিতে সমস্ত প্রাণিগণকে হত্যা করিয়াও শুদ্ধভাবে আত্মদৃষ্টিতে কাহাকেও হনন করেন না। না সেই হনন ফলেই আবদ্ধ হন—অর্থাৎ বন্ধন প্রাপ্ত হন না। সেই লোক যে সযশ্চ দ্বিধারা অপরোক্ষ জ্ঞানের উৎপত্তি হেতু কর্ণ করিয়া বদ্ধ হইবে, এ আশঙ্কাও নিশ্চয়োজন—ইহাই তাৎপর্য। সেইজন্য বলা হইয়াছে—যে ব্যক্তি কলাসক্তি ত্যাগ করিয়া ভগবদর্পিতচিত্তে কর্ণ করিয়া থাকে পদ্মপত্র যেমন জলধারা লিপ্ত হয় না, তিনিও সেইরূপ পাপপুণ্যময় কর্ণে লিপ্ত হন না। কেন কর্ণ লেপ হন না ? তাহার কারণ—“কর্ণচোদনা” ও “কর্ণসংগ্রহ” সমস্তই ত্রিগুণাত্মক। নিগুণ আত্মার সহিত ইহাদের সঙ্গ নাই, অতএব আত্মজ ব্যক্তি যিনি নিরহঙ্কার, তাঁহার কর্ণলেপও সেইরূপ সম্ভব নহে] ॥ ১৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ক্রিয়ার পর অবস্থার থেকে যখন আপনাতে আপনি থেকে-ও নেই—সেই আশ্চর্য্যদর্শন থাকিয়া আর কোন বিষয়েতে আসক্তিপূর্বক স্থির বুদ্ধির দ্বারায় লিপ্ত হয় না—সে সমুদয় লোককে মেরে ফেলেনও সে হনন করে না—না সে হনন করবার জন্ত আবদ্ধ হইতে পারে—কারণ, সে আপনাতে আপনি ছিল না—সে ব্রহ্মের নেশাতে যেমন মাতাল মদের নেশায়।—আত্মার সম্বন্ধে উপনিষদ-বলিয়াছেন—“প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমঐতৎ চতুর্থং মনস্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ—(মাণ্ডুক্য ৭ম মন্ত্রঃ)। প্রপঞ্চোপশমং—জগদ্বিকাশের নিরন্তররূপ অর্থাৎ জাগ্রৎ-স্বপ্ন-শূপ্তি সম্বন্ধস্থ শান্তং—বিকারশূন্য, অবস্থান্তর প্রাপ্তি তাঁহার হয় না, শিবং : জ্ঞানময়, ঐতৎ—বিত্তিরের অভিনিবেশশূন্য, চতুর্থং—জাগ্রদাদি পাদত্রয় হইতে ভিন্ন, সঃ আত্মা—তিনিই আত্মা মনস্তে—বাহার জ্ঞাত আছেন, তাঁহার্য বসেন সঃ বিজ্ঞেয়ঃ—তিনিই জ্ঞেয়, তাঁহাকেই জানিতে হইবে। ইহাই আসল জ্ঞান। এই জ্ঞান তাহার হয়—যিনি ক্রিয়ার পর-অবস্থার থাকেন, সে অবস্থার ক্রিয়া থাকে না, সেখানে কর্তাও থাকে না। সে এক আশ্চর্য্য অবস্থা, নিজ

অমৃতবরূপ। এই অবস্থার বুদ্ধি স্থির থাকে, অর্থাৎ আত্মাকারা হইয়া যায়, স্তবরাং ইন্দ্রিয়াদির কর্মে বুদ্ধি লিপ্ত হয় না। অহংকার বা কর্তৃত্বাভিমান থাকিলেই কখনো বুদ্ধি লিপ্ত হয়। বাঁহা অহংভাবে নাই তাঁহার কর্তৃত্বভাবে থাকে না। স্তবরাং সে অবস্থায় কর্ম করিলে কর্মজনিত সুখ দুঃখকপ ফলে আবদ্ধ হইতে হয় না। বাঁহা অপবোদ্ধতা হইতে হয় নাই, তিনি একগুণ অনাসক্তভাবে কর্ম করিতে পারেন না। মুখে অনাসক্তি দেখানো বা সেইভাবে কর্ম করিতে যাওয়া—সেও অহংকারেরই নামান্তর। যোগবশিষ্ঠে বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন—“হে রাম, তুমি বাহিরে রাধা সাজিয়া রাজ্য শাসন কর, কিন্তু ভিতরে অকর্তা বলিয়া আপনাকে বুঝিও”। পুনঃ পুনঃ ক্রিয়া পর-অবস্থায় থাকিয়া থাকিয়। বাহ্যের গতি বা বুদ্ধি শুদ্ধ বা স্থল হইয়াছে, তাহাদের “আমি কর্তা” এই প্রকার ভাবনাই আসিতে পারে না, তাহাদের বুদ্ধি কর্মে লিপ্ত হয় না বলিয়া তাহারা কর্মজনিত কলে হস্ত বা তাপবৃত্ত হয় না। তাহার বুদ্ধি তো শরীর ইন্দ্রিয়ের আচারের সহিত মিলে না; সেইজন্য মাতাল যেরূপ মনের নেশায় দেহাভিমান শূন্য হয়, তজ্জপ বুদ্ধিও অভিমানরহিত হইয়া যায়—ইহাকেই নিরহংকার ভাব বলে। আত্মার কোনরূপ অবস্থান্তর হয় না বলিয়া বুঝিতে হইবে। আত্মা অল্প কাহারও সহিত তদ্ ভাবাপন্ন হইতে পারেন না। কাজেই হনন বা অহনন কোনরূপ কর্মেই তিনি লিপ্ত হন না। অবশ্য “আমি কর্তা” ইহাও যেরূপ মনোভাব, “আমি কর্তা নহি” ইহাও সেইরূপ আর একটি মনোভাব, অহংকার-বিবর্জিত আত্মজ পুরুষের এ দুই ভাবই থাকে না। আত্মার শুদ্ধরূপে কিছু অধ্যাস নাই, এই জন্য সে অবস্থায় এ দুই ভাবের কোন ভাবই থাকে না। দেহেন্দ্রিয়া-দ্বিতে তখন অহংভাব না থাকায় দেহাদি-কৃত হনন কার্যের তিনি হস্তা হন না, এবং বুদ্ধিও আত্মস্থ বলিয়া ঐ সকল কার্যে বুদ্ধিও লিপ্ত হইতে না পারায় তৎকাল কার্যে আত্মা বদ্ধ হইতে পারে না। এখন আবার সেই একই প্রশ্ন মনে উদয় হয়, তবে এ-সব কাণ্ড করে কে? এ ভোক্ত-বাজী দেখায় কে? কেই বা কর্ম করিয়া দণ্ড পুরস্কার লাভ করে? দণ্ড পুরস্কার তাহাকে দেয়ই বা কে? ‘সু’ বা ‘কু’ কর্ম করিতে তাহাকে বলেই বা কে? নিষেধই বা কে করে? ঈশ্বর-সকলের বুদ্ধি হইয়া সকলকে সব কর্ম করাইতেছেন, ইহারই বা অর্থ কি? যদি ঈশ্বরই সব করান তবে আমরা কল ভোগ করিয়া মরি কেন?

এখন কে ভোগ করে এবং কেই বা ভোগ করায়—ইহা বুঝিতে গেলেই “আমি কে” এবং আমার “স্বরূপ কি” বুঝিতে হইবে। একটা কথা অতি সত্য; শুভাশুভ যে কোন কর্মই আমরা করি না কেন, তাহা আমরা করিতেই পারিতাম না—যদি আমাদের মধ্যে কোন চেতন বস্তু বা আত্মা না থাকিতেন। চেতনের অধিষ্ঠান বা প্রেরণা ভিন্ন কোন অচেতনবস্তুই প্রবৃত্তি বা কার্য হইতে পারে না। সকল প্রবৃত্তির মধ্যেই একটি চেতনের প্রেরণা বহিয়াছে, সেই চেতন প্রেরকই আত্মা বা ব্রহ্ম। অতএব আত্মাকে অকর্তা বলিয়া টেলিয়া রাখিলে চলিবে কেন? “সর্বস্ব বুদ্ধিরূপে জনস্ত হৃদি সংস্থিতে” তুমি প্রাণিন্যায়ের স্বরূপে বুদ্ধিরূপে অবস্থিত, কালবশে বাহা কিছু রূপান্তরিত হইতেছে, কালের সে শক্তি ভগবান হইতেই। আবার গীতাতে ইহাও আছে—“ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্যেশেহর্জুন তিষ্ঠতি।

ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যজ্ঞাক্রামি মায়ায়া।

হে অর্জুন, সর্বভূতানামী ঈশ্বর স্বকীয় মায়াশক্তি-প্রভাবে শরীররূপ যন্ত্রে আকৃষ্ট জীবগণকে পরিভ্রমণ করাইয়া তাহাদের স্বরূপে অবস্থিত আছেন, অর্থাৎ ঈশ্বর হৃদ্যেশে অবস্থান পূর্বক শরীরযন্ত্রে আকৃষ্ট জীবগণকে নানা কর্ম করাইতেছেন—সেই কর্ম না করিয়া জীবের অত্যা কোন উপায় তো নাই। যদি এই চরকীর পাক হইতে বাঁচিতে চাও তবে তোমাকে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইতে হইবে। তিনি যদি প্রমত্ত হন, তবেই তুমি যুক্তিলাভ করিয়া শাস্তি পাইবে। আবার তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবান বলিয়াছেন যে জীব স্বীয় প্রকৃতি অর্থাৎ প্রাক্তন-জন্মের সংস্কাররূপ কর্ম করিতে বাধ্য হয়, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ করিয়াও কিছু হইবে না। কুর্কর্মের ফল জানিয়াও তাই পূর্বসংস্কার-বশে জীব কুর্কর্ম করিতে বাধ্য হয়। স্তবরাং জীবের মত এত বড় নিরাশ্রয় আর কে আছে? কিন্তু জীবের স্বরূপে কর্মের মূল সেই ব্রহ্মের নক্ষর—‘একোহং বহু শ্রাম’—এক আমি বহু হইব। সেই তিনিই বহু জীব হইয়া তাহার নক্ষরের ফল ভোগ করিতেছেন তিনিই জীব হইয়া ভুগিতেছেন। ঈশ্বরস্বভাব জীবের কখনো হইতে পারে না, তাই তিনি ত্রিগুণের জাল নির্মাণ করিয়া নিজেই নিজে আবদ্ধ হইয়াছেন। কি অমৃত কাণ্ড তাহার! আবার এই কর্ম করিতে যতদিন ভাল লাগে, জীবরূপে আনন্দেই তিনি সেই কর্ম করিয়া যান। কিন্তু ধীরে ধীরে কর্মের বিবিধ কল উৎপন্ন হইয়া যখন জীবকে বিকৃত ও প্রপীড়িত করে, তখন আবার জীবের জাগরণ হয়, ধীরে ধীরে তাহার মোহ-নিদ্রা ভাঙ্গিবার উপক্রম হয়। জীব শকটবাহী বলীবর্দ্ধের মত শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া তখন নিজের স্বরূপ বন্ধন খসাইবার জন্য ব্যাকুল হয়। কিন্তু ইচ্ছা করিলেও তখন তখন সে স্বরূপের স্মরণ নামাইতে পারে না। কারণ তখন জীব অনীশ্বর ভাবাপন্ন। যদিও মৃত্যু-বশতঃ অহঙ্কারে মগ্ন হইয়া নিজের ভার নিজেই নামাইতে পারিবে বলিয়া মনে করে, কিছু দিনের চেষ্টায় সে বুঝিতে পারে যে, উহা তাহার সামর্থ্যের বাহিরে, এতদিন যে বৃথা আশ্বালন দেখাইতেছিল, উহাই তাহার দুর্ভাগ্য। কিন্তু বাব বাব বিফল প্রয়াস তাহাকে তাহার নিজ-সামর্থ্যের উপর সম্বন্ধ উৎপন্ন করিয়া দিয়াছে, এখন সে যেন কাহারও শরণ লইতে চায়। বুঝিতে পারিয়াছে—এতদিন চক্ষে ঠুলি পরিয়া সে তাহার নিজ কর্তৃত্ব, অতিমানকেই বড় বলিয়া ভাবিয়াছিল, আজ তাহার সে বিশ্বাস চলিয়া গিয়াছে। সে এখন বুঝিয়াছে—তাহাকে স্বতন্ত্রতার জায় যিনি ঘুরাইতেছেন, তিনিই তাহার মালিক, তিনিই ঈশ্বর, সে স্বয়ং শক্তি-সামর্থ্যহীন একটি অহঙ্কৃত বদ্ধ জীব, তাহার বোঝনই সার কিন্তু কিছু করিবার ক্ষমতা নাই। ভয়ব্যাকুলিত চিত্তে জীব তখন কাঁদিয়া উঠে এবং বলে “প্রভো! এই শরণাগত হীন আত্মকে রক্ষা কর”। তখন শ্রীভগবানই শ্রীগুরুরূপে আসিয়া তবিসিদ্ধিতে নিমজ্জনোন্মুখ তাহার দেহ-তবর্ণীর কাণ্ডারী হন। জীব প্রথমে নিজের স্বরূপ বুঝিতে অসমর্থ—তাহার বাহা কিছু সনাতনই তাহার দেহ-প্রকৃতি। সেই প্রকৃতির সহিত সে তাহাভাবাবে মিলিত, এখন কিছুতেই আর প্রকৃতি হইতে সে আপনাকে পৃথক করিয়া দেখিতে পারে না। প্রকৃতির মোহে বদ্ধ জীব সমস্ত কর্মে আপনার কর্তৃত্ব দেখে, সেই জন্য তাহার বুদ্ধি সকল কর্মে লিপ্ত হইয়া যায় এবং তাহার সুখ-দুঃখকপ ফলভোগ করিতে সে বাধ্য হয়। দেহাভাবাবে মগ্ন জীব আর কাহাকেও দেখিতে পায় না, স্তবরাং সকল কর্মের কর্তা সাজিয়া পুনঃ পুনঃ এই জগতে যাতায়াত করিতে

ধাকে, এবং জন্মমৃত্যুর পাশে বদ্ধ হইয়া কেবল যোজন করিতে থাকে। শ্রীকুরু আসিয়া যখন তাহার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেন, তখন জীব বুঝিতে পারে—এই দেহেজিয়ৎ প্রকৃতি হইতে সে কত ভিন্ন,—প্রকৃতি অথ, সে যে অধারোহী! প্রকৃতির কর্তৃত্ব মানিয়া এতদিন জীব কি ভুলই করিয়াছিল, কোথায় অধঃক্ষে আকৃষ্ট হইয়া সে আনন্দে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবে, তা না হইয়া সে নিজেই অধঃক্ষে লইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে! জীব যখন বিচার করিয়া নিজের অবস্থা বুঝিতে পারে, তখনই তাহার স্বরূপ-সন্ধান আরম্ভ হয়। তাহার প্রকৃতি সর্ব-রসঃ-ভোমালিত, জীব ঈশ্বর্যং হইয়াও এই গুণের সহিত জড়িত হইয়া গুণ হইতে আপনাকে কখন অতিরিক্ত বা পৃথক মনে করিতে পারে না। তগবানের চৈতন্যময়ী প্রাণময়ী শুদ্ধশক্তি দ্বারা আসিয়া ঐশভাবে অল্পপ্রাণিত হইয়া বর্তমান থাকেন আবার ঐ শক্তি যখন নাস্তির নীচে মুখাধারায়িত অবতরণ করিতে থাকেন, তখন জীব-ভাবে বদ্ধ হইয়া আপনি আপনার স্বরূপকে ভুলিয়া যান। ইহাকেই মায়াদ্বারা ব্যাপ্ত হওয়া বলে। তখন সূক্ষ্ম জগতের বা সূক্ষ্ম শক্তির কথাও মনে পড়ে না, কেবল স্থূলভাবে লক্ষ্য থাকে, এবং সেই অবস্থায় থাকিতে থাকিতে নিজেকেই তখন স্থূল বলিয়া মনে করে, একেবারে নিজের স্বরূপ ভুলিয়া অনাধার ভাবে দিন যাপন করে। যে স্পন্দন প্রথমে আজ্ঞাচক্রে প্রাহুভূত হইয়াছিল, তাহাই পুনঃ স্পন্দিত হইয়া স্বরূপদেশে অবতরণ করে, তখনও তাহার সম্যক্ জ্ঞান বিলুপ্ত হয় নাই, কিন্তু যখন অধঃকরণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া স্থূল্যাবদ্ধ তরুর মত সেই বেগ নাস্তির নীচে অবতরণ করিতে লাগিল, তখন তাহার মধ্যে জ্ঞানের উজ্জল প্রভা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণ হইয়া একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল, তখন তাহার যে ঐশী শক্তি ছিল, তাহা স্তম্ভবৎ হইয়া প্রচ্ছন্ন হইয়া গেল। তখন জীব মায়ার ঘোর নিদ্রাচ্ছন্ন হইয়া জড়বৎ হইয়া গেল। জীব যখন এক অদ্ভুত ইন্দ্রজাল-বিবচিত মায়াজালে আবদ্ধ হইয়া জীবতাবের খেলা আরম্ভ করিয়া দিল, তখন যে সে কে কোথায় সে, এবং কাহার খোঁজে ফিরিতেছে, কি খেলা গেলিয়া দিন কাটাইতেছে—এ সমস্ত তাহার চিত্তপট হইতে কে যেন মুছিয়া ফেলিয়া দেয়। মায়াজিভূত বদ্ধজীব প্রথম প্রথম রাগ, দ্বেষ, কাম ক্রোধ লইয়াই ব্যাপ্ত থাকে। যে দিন হইতে আবার গুরুকৃপায় তাহার স্মৃতি জাগিয়া উঠে, সেদিন নূতন পথ পাইয়া যেন সে নূতন দেশের লোক হইয়া যায়—সেদিন হইতে তাহার চিরাত্যন্ত মার্গ চাড়িয়া দিয়া সে নূতন পথের যাত্রী হয়—একেবারে উন্টাপথ ধরে। এই উন্টা পথই নির্মুক্তি মার্গ, তাহার স্বস্থানে ফিরিবার পথ। এ পথে যে চলে তাহার সত্ত্বগুণ হওয়া অনিবার্য, সত্ত্বগুণ যত অধিক হইতে থাকে, ততই সে নিজ নিত্য-নিকেতনের সন্নিকটে উপনীত হইতে থাকে। এখনও পথ বহু বিঘ্ন পূর্ণ, সেই বিঘ্নবহুল মার্গে চলিতে চলিতে তাহাকে অপ্রত্যাশিত অনেক বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়। স্থূল জগতে স্থূল বিষয় সমূহকে এতদিন নিজেই মনে করিয়া কত কষ্ট পাইতে হইয়াছে, এখন আবার সূক্ষ্মজগতের সূক্ষ্ম বিষয়সমূহকে তত্ত্বজ্ঞানকে তত্ত্বিকর বোধ হইতে লাগিল, এবং সেই সকল শক্তিকে আপনার মনে করিয়া নিজেই বৃত্ত-রসঃ বোধ করিতে লাগিল। তখন কত শক্তি সত্ত্বকিরণোদ্ভাসিত হইয়া তাহার মধ্যে প্রকাশিত হইতে লাগিল, সেই সকল শক্তি যেন তাহারই অধীন ভাবিয়া জীব অধীর হইয়া উঠিল। আবার

জীবকে আঘাতের পর আঘাত ধাইতে হইল, এইরূপে তাহার মধ্যে আবার সত্যের প্রকাশ হইতে লাগিল। সত্যের আলোকে সে আপনার স্থান নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়া আবার সাধনাতে প্রাণপণ ব্রত করিয়া নিজ অন্তঃপুংগবের অভিমুখে ছুটিতে লাগিল। এইবার তাহার বহুদিনের আশা সকল হইবার সম্ভাবনা হইল, ভগবৎকৃপায় স্থূলের নেশা তাহার ছুটিয়া গেল, তখনই অধ্যাত্মব্যাক্ষের দ্বার খুলিয়া গেল। সাধকের অন্তঃকরণ তখন যত শুদ্ধমত্ব ভাবে পূর্ণ হইতে লাগিল, ততই পরা বৈরাগ্যের উদয় হইতে লাগিল। তখন আর ভুল হয় না, কিন্তু এখনও বিভীষিকা দেখা শেষ হয় না, তাই আর কোথাও যায় না, কিছুই চাহে না, নিজের মধ্যে নিজে স্তব্ধ হইয়া থাকে,—ইহাই সর্বধর্ম-সম্যাস। ইহাই সর্বধর্ম-পরিত্যাগ করিয়া স্বরূপে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ! এইবার সব কর্মাকর্ষ এবং তাহারে সমস্ত ফলাফল নিবৃত্ত হইয়া যায়। ইহাই স্বরূপগ্রহি ভেদ, প্রপঞ্চের উপশম! এইখানেই ঈশ্বরের সহিত জীবের তাৎপাত্যভাবে মিলন বা স্বরূপ-কেন্দ্রের সহিত নিজ-কেন্দ্রের (অহঙ্কারের) সন্মিলন হয়। যখন ঐশ শক্তির সহিত জীবশক্তি মিলিয়া এক অতির হইয়া যায়, সেই শুভ মুহূর্তে নাথক সহস্রারে পরব্যোমে উথিত হইয়া আপনাকে আপনি হারাইয়া ফেলে। সেট শিব-শক্তির সন্মিলনক্ষেত্রে জীব নিজের স্বরূপাবস্থা লাভ করে সে বাহা ছিল আবার তাহাই হইয়া যায়। তখন সেই সহস্রারে মীল-পীত-পদ্মের উপরে সর্বভ্রান্তাভীত নিবাকার পরমাত্মার সহিত এক হইয়া সোহং ব্রহ্ম বা সর্ববেদ-অগোচর বিদেহ ভাব প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্ম-নিবন্ধনরূপে জন্মমৃত্যুর অতীত অবস্থা লাভ করেন।

এই সময় মায়োপহিত চৈতন্য ঈশ্বরও মায়াজীত হইয়া অন্তর্হিত হান। অহঙ্কার সে প্রকৃতির পরিণাম, অহঙ্কার সেই প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতি পরমাত্মার সহিত এক হইয়া যান। ইহাই “অবকল্প ভাব”। এখানে আত্মাই আত্মা, আত্মকিরণোদ্ভীপ্ত শুদ্ধ সত্ত্বভাবও গুণাতীত ভাবে পর্যাবসিত হয়। তখন উপাস্ত-উপাসক সম্বন্ধও বিলুপ্ত হয়।

“নির্দোহমোহপদবীতি ন মে বিকল্পো, নিঃশোকশোকপদবীতি ন মে বিকল্পঃ।

মনো ন বুদ্ধির্ন শরীরমিন্দ্রিয়ং তন্মাজভূতানি ন ভূতপঙ্কজম্।

অহঙ্কৃত্যপি বিঘ্নং স্বরূপকং তমীশমাআনমূপৈতি শাস্ততম্ ॥

ন তং ন মে ন মনো ন গুরুর্ন শিত্রঃ।

সচ্ছন্দরূপ-সহজঃ পরমার্থতবং, জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোহবন্ ॥”

অবধূতগীতা

মনঃ বুদ্ধিঃ, শরীরঃ, ইন্দ্রিয় পঙ্কজম্ অ বা পঙ্কমহাভূত—আত্মা এ সকলের কিছুই নয়। সেখানে না ভূমি না আমি, সেখানে মনঃ বলিয়াও কিছু নাই, সেখানে গুরুও নাই শিত্রও নাই। সেই পরমার্থতব সহজ ও সচ্ছন্দ অর্থাৎ কোন আয়াসপূর্নক্ জ্ঞানিতে হয় না। জ্ঞানামৃত সমরসপূর্ণ আত্মা, একমাত্র তাহার তুলনা গগন, আমি সেই গগন সদৃশ।

জীব যখন নিজ নিকেতনের দিকে যাত্রা করে, তখন হইতেই তাহার ভাব শুদ্ধ হইতে থাকে। ক্রমে যত অগ্রগত হইতে থাকে, ততই সে শুদ্ধ হইতে শুদ্ধতর হইতে থাকে,—এইরূপ বিত্তকৃত্যর উচ্চত্তরে প্রতিষ্ঠিত হইলেই সে বিত্তকৃত্যের মধ্য হইতেই সর্কাত্তর্যামী ঈশ্বরের

মাড়া পাওয়া যায়। তখন সাধক বৃত্তিতে পাবেন বাহা কিছু জগতে হইতেছে—সে সব তাঁহার ইচ্ছাতেই হইয়া থাকে। ঈশ্বরের আশ্রয় পাইয়াই জীবের জড়ত্বের বন্ধন খসিয়া যায়। কাম, ক্রোধ, রাগ, দ্বেষাদি পঞ্চভাব সমস্তই তখন বিগলিত হইয়া যায়। সাধনার দ্বারা ইহা যেরূপে সম্ভব হয়, তাহাই ক্রমে লিখিত হইতেছে। ক্রিয়াধারা ক্রিয়ার পর-অবস্থা প্রাপ্তি হয়, সেই অবস্থায় থাকাই সন্ধ্যা। সন্ধ্যা—সন্ধ্যাকরূপ ধারণা তখনই হয়। প্রাণের নিরোধ হইতেই এই ধারণা হয় “সুখং বদ্ বায়ু-ধারণম্”—ইহাই স্থিতি বা অবরুদ্ধরূপ বা ক্রিয়ার পর-অবস্থা। অভ্যাস করিতে করিতে এই অবরুদ্ধভাবে সহজে থাকা যায়। ইহাই প্রকৃত ধ্যান-সন্ধ্যা, যাহাতে কায়ক্লেশ কিছু নাই। এইরূপ ব্রহ্মভাব-ভাবিত চিত্তই সকল ভূতের সহিত মিলিয়া এক হইয়া যায়। সাধন করিতে করিতে সাধকের যখন সুস্থতার মধ্যে প্রাণের গতি হইতে থাকে, তখন সেই সাধককে “একহতি” বলা হয়। তখন ইড়া পিঙ্গলা ছাড়িয়া প্রাণ সুস্থরায় থাকে, এবং সুস্থরায় থাকিতে থাকিতে সাধকের সুস্থতার অতীত অবস্থা লাভ হইলেই তাঁহার “সর্বং বধিৎ ব্রহ্ম” অনুভবের বিষয় হয়। এই অব্যক্ত ব্রহ্মসিদ্ধ হইতেই সমুদ্রে হিম্মোলের মত আত্মা হইতে প্রাণ উৎপন্ন হয়। “অব্যক্তাৎ জায়তে প্রাণঃ”। বেরূপ পুরুষের ছায়া সেইরূপ প্রাণের ছায়া মন, এবং মন হইতে ইন্দ্রিয় ১১ শরীর প্রকাশিত হয়। এইরূপে আত্মা স্থূল হইতে স্থূলতম পিণ্ডে পরিণত হ’ন। আমার যখন স্থূল হইতে সূক্ষ্ম বাইতে হয়, তখন উণ্টা পথ ধরিতে হয়, এইরূপে উণ্টা পথে চলিতে চলিতে “আমি”র সঙ্গীতবোধ চলিয়া গিয়া “আমি”র ব্যাপক ভাবের বোধ হয়। তখন স্থূল জাগ্রদাবি ভাবও থাকে না। স্থূলবোধ রহিত হইবার পরে সূক্ষ্ম স্বপ্নবোধও রহিত হইয়া যায়। তাহার পর সূক্ষ্মাবস্থায় জানের সব পার্থক্য মিটিয়া যায়, সমস্ত পৃথক জ্ঞান একীভূত হইয়া যায়, তখন আর প্রকাশের নানাত্ব ভাবও থাকে না। “বজ্র সুপ্তো ন কখন কামং কাময়তে, ন কখন স্বপ্নং পশ্যতি তৎ সুপ্তম্। সুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানধন এবানন্দময়ো হানন্দভূক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞভূতীয় শাশ্বতঃ” অর্থাৎ ক্রিয়ার পর-অবস্থাতে যে সুস্থিতি হইয়াছে, সেখানে আর স্বপ্নদর্শন নাই, মন সেখানে একাগ্র হইয়া নিরোধমুখী হইয়াছে; স্মৃতিসংসারের তরঙ্গ নাই বলিয়া সেখানে মনও নাই। সেই সুস্থিতিস্থানে থাকিতে থাকিতে নিজে নিজেই ব্রহ্মরূপ হইয়া যায়, সব দৃশ্যপ্রপঞ্চ তিরোহিত হইয়া এক ব্রহ্মনাত্র অবশিষ্ট থাকে। এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া মাণ্ডুক্যোপনিষৎ বলিয়াছেন—“এষ সর্বেশ্বর এষ সর্বজ্ঞ এবোহমুপাধ্যায়ো যোনিঃ সর্বস্ত প্রভবাধ্যায়ো হি ভূতানাম্”—ইনিই সর্বেশ্বর বা সর্ব জগতের ঈশ্বর বা শাসনকর্তা, ইনিই সর্বজ্ঞ, ইনিই অন্তর্যামী, ইনিই সকলের যোনি অর্থাৎ উৎপত্তি স্থান, ইনিই চরাচর জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের কারণ।

ক্রিয়ার দ্বারা যখন এই প্রজ্ঞান যেন অবস্থা লাভ হয়, তখন সেই অবস্থায় সাধক সবই জানিতে পাবেন। ক্রিয়াধারা ক্রিয়ার কলঙ্করূপ প্রথমে স্বেচ্ছা আসিয়া উপস্থিত হয়। অধিকক্ষণ স্থায়ী ঘটাদি ধ্বনির স্মৃতি হয়, এবং সেই ঘটাদি ধ্বনির অধিককাল স্থায়ী হইলেই স্বেচ্ছাভাব বৃদ্ধি পায় এবং সেই পরমানন্দ ভোগ করিতে করিতে সাধক আনন্দময় হইয়া যান। এইখানেই সাধক ব্রহ্মের ভূতায় পাবেন সহিত পরিচিত হইয়া “প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম” কি বৃত্তিতে পাবেন। এই

(কণ্ঠের প্রবর্তক ও ক্রিয়ার আশ্রয়)

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্মচোদনা।

করণং কর্ম কর্তেতি ত্রিবিধঃ কর্মসংগ্রহঃ ॥ ১৮

অবস্থাপ্রাপ্ত সাধককেই প্রাজ্ঞ বলা হয়। পরে হৃদয়গ্রন্থি ভেদ করিলেই “সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ” ভাবের বোধ হয়। সেখানে মন, ইন্দ্রিয়বৃত্তি সমস্ত ব্রহ্মলীন হয়। প্রাণায়ামাদি সাধনদ্বারাই এই নিরোধশক্তি বর্দ্ধিত হয়। প্রাণনিরোধ হইলেই মন আপনাপনি নিরুদ্ধ হয়। মন প্রাণেরই ছায়া। বাম নাড়ী ইড়া ও দক্ষিণ নাড়ী পিঙ্গলাই সোম ও সূর্য্য বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। প্রাণচেষ্টা যখন এই দুই মার্গকে ত্যাগ করে তখনই সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়, সুস্থরায় তখন স্থিতি হইয়াছে বৃত্তিতে হইবে। চিত্তও তখন আর ইতঃসুতঃ ধাবিত হয় না। প্রাণ সুস্থরায় প্রবেশ করিয়া স্থির হইলেই রাগ-দ্বেষাদি পঞ্চগুণ থাকে না—এইজন্য সর্ব গুণত্যাগের উপদেশ এই অধ্যায়ে ভগবান দিবে, কারণ সাধককে ইড়া-পিঙ্গলা সুস্থরায় অতীত হইয়া বাটতে হইবে। এই অবস্থাকেই “অমাবস্তা” বলে, এই অমাবস্তাতেই মহাকালী জগন্মাতার পূজা প্রশস্ত। যখন চন্দ্র সূর্য্যের সহিত এক রাশিতে একত্রে যাস করেন, তখনই অমাবস্তা হয়। “অমা সহ বনতঃ চন্দ্রাকৌ অত্র” সূর্য্যই প্রাণ, এবং চন্দ্রই মন। এই দুই নাড়ীতে প্রাণ যখন প্রবাহিত হয়, তখনই জীবভাব বা বদ্ধ ভাব। চন্দ্র মন এবং সূর্য্য প্রাণ—ইহারা পৃথক থাকিতে আর দেহাত্মবোধ নষ্ট হয় না। যখন চন্দ্র-নাড়ীস্থ (ইড়া) শক্তি সূর্য্যনাড়ীস্থ (পিঙ্গলা) শক্তির সহিত মিলিয়া যায়, অর্থাৎ যখন মন ও প্রাণ এক হইয়া যায়, তখন সৃষ্টি ক্রিয়া নিরুদ্ধ হয়,—ইহার নামই প্রলয়। এই শিব-শক্তিসম্মিলিত অবস্থাই অমাবস্তায় কালীপূজা বা সাধকের চিহ্নাক্ষেপ স্থিতি। এই স্থিতি হইলেই তিনি স্বয়ং আনন্দরূপ হইয়া পরমানন্দ সমরস-সিদ্ধিতে নিমজ্জিত হন। ইহাই পরম গুরুর নিজ-শক্তির সহিত সংযুক্ত হওয়া। ইহাই পঞ্চ-মকারের মৈথুনভাব। এই মৈথুনভাব হইতেই পরম শিব সাম্যরসোদ্ভূত অমৃতদ্বারা জীবশক্তি পরিপ্লুতা হইয়া শক্তি শিবের সহিত এক হইয়া যান। তখন আর সৃষ্টিক্রিয়া থাকে না। ইহাই বাধা-ক্লেশের যুগল মিলন। এই মিলন-রসকে অমৃতত্ব করিবার জন্য বৈষ্ণবেরা শ্রীবাধিকার অমৃগা হইয়া সাধন করেন। সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি অন্তর্যুগী হইয়া যখন অলঙ্কার দেশে গমন করে, তখনই গোপালনারূপ ইন্দ্রিয়গণ কৃষ্ণাভিসারে প্রবৃত্ত হন। এই অভিসার সম্পূর্ণ হইলেই বাস্তব জীবনের পরিসমাপ্তি হয়,—ইহাই অদীমের সহিত সদীমের মিলন ॥ ১৭

অময়ঃ। জ্ঞানং, জ্ঞেয়ং, পরিজ্ঞাতা (জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতা) ত্রিবিধা কর্মচোদনা (কর্মপ্রবৃত্তির এই তিন প্রকার হেতু); করণং, কর্ম, কর্তা (করণ, কর্ম এবং কর্তা) ইতি ত্রিবিধঃ কর্ম-সংগ্রহঃ (এই তিনটি কর্ম-সংগ্রহ বা ক্রিয়ার আশ্রয়) ॥ ১৮

ক্রীড়নং। “হত্বাপি ন হন্তি ন নিবধ্যতে” ইতি এতদেব উপপাদয়িতুং কর্মচোদনায়ঃ কৃষ্ণাশ্রয়ত্ব চ কর্মকলারীনাং চ ক্রিগুণাশ্রয়ত্বাৎ নিগূঢ়ত্ব আত্মনঃ তৎসংকো নাতি ইত্যভি-প্রায়েণ কর্মচোদনায়ঃ কর্মশ্রয়ত্বাহ—জ্ঞানমিতি। জ্ঞানম্—ইষ্টসাধনমেতৎ ইতি বোধঃ। জ্ঞেয়ম্—ইষ্টসাধনং কর্ম। পরিজ্ঞাতা—এবমুক্তজ্ঞানাত্মকঃ। এবং ত্রিবিধা কর্মচোদনা। চোদতে

প্রবর্তিতে অনয়া ইতি চোদনা—জ্ঞানাদি ত্রিতয়ং কৰ্মপ্রযুক্তিহেতুবিভার্যঃ। যথা চোদনেতি
বিধিঃ উচ্যতে। তদুক্তং ভট্টেঃ—“চোদনা চোপদেশশ্চ বিধিষ্টক্যর্থবাচিনঃ” ইতি।

ততশ্চায়মর্থঃ—উক্তলক্ষণং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানাদিত্রয়ম্ অবলম্ব্য কৰ্মবিধিঃ প্রবর্ততে ইতি।
তদুক্তং—“ত্রেণুগ্যবিষয়া বেদাঃ” ইতি। তথাচ করণং—সাধকতমম্। কৰ্ম চ—
কৰ্ত্তৃরীপিততমম্। কৰ্ত্তা—ক্রিয়া-নির্কৰ্ত্তকঃ। কৰ্ম সংগৃহ্যতে অস্মিন ইতি—কৰ্ম সংগ্রহঃ।
করণাদি ত্রিবিধং কারকং ক্রিয়াশ্রয় ইত্যর্থঃ। সম্প্রদানাদি কারকত্রয়স্ত পরম্পরয়া ক্রিয়াপ্রযুক্তক
মেবঃ কেবলং, ন তু সাক্ষাৎ ক্রিয়ায়া আশ্রয়ঃ। অতঃ করণাদিত্রয়মেব ক্রিয়াশ্রয় ইত্যুক্তম্ ॥ ১৮

বঙ্গানুবাদ। [কৰ্মতে কৰ্ত্তৃহাতিমান যাহার নাই এবং যাহার বুদ্ধি কৰ্মে লিপ্ত হয় না—
তাহার বন্ধন হয় না, তিনি কাহাকেও বিনাশ করিয়াও বিনাশ করেন না আর বন্ধন
প্রাপ্ত হন না।—এই পূৰ্ব্বোক্ত বিষয়টির প্রমাণ বলিতেছেন যে—কৰ্মচোদনা, কৰ্মাশ্রয় ও
কৰ্মফলাদয় ত্রিগুণাত্মকতা হেতু নির্ভূর্ণ আত্মার সহিত এগুলির কোন সম্বন্ধ নাই—এই
অভিপ্রায়ে কৰ্মচোদনা ও কৰ্মাশ্রয় কি তাহা বুঝাইতেছেন]—(১) জ্ঞান—ইহা ইষ্ট-সাধন—
এইরূপ যে বোধ। (২) জ্ঞেয়—ইষ্ট-সাধন যে কৰ্ম—তাহাই জ্ঞেয়। (৩) পরিজ্ঞাতা—এবজ্ঞুত
জ্ঞানের যিনি আশ্রয়—তিনিই পরিজ্ঞাতা। এই ত্রিবিধই কৰ্মচোদনা অর্থাৎ কৰ্মপ্রযুক্তির হেতু।
চোদনা শব্দের অর্থ—যাহার দ্বারা প্রবর্তিত হয় অর্থাৎ জ্ঞান, জ্ঞেয়, পরিজ্ঞাতা—এই ত্রিতয়
কৰ্মপ্রযুক্তির হেতু। অথবা চোদনা শব্দে বিধি বুঝায়। ভট্ট তাহাই বলিয়াছেন যে “চোদনা
উপদেশ ও বিধি—এই তিনটি একার্থবাচী”।

তাহা হইলে এইরূপ অর্থ হইল—উক্তরূপ লক্ষণযুক্ত ত্রিগুণাত্মক জ্ঞানাদি ত্রয়কে অবলম্বন
করিয়া কৰ্মবিধি প্রবর্তিত হয়। ইহাই দ্বিতীয় অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে—“ত্রিগুণাত্মক সাকাম
পুরুষদিগের জ্ঞান বোধ কৰ্মফল প্রতিপাদন করিয়াছেন” ইত্যাদি। “করণ”—ক্রিয়া-সাধক,
“কৰ্ম”—কৰ্ত্তার ইপিততম। (অর্থাৎ অতিশয় অভিলষিত), এবং “কৰ্ত্তা”—ক্রিয়া-নিবর্তক বা
সম্পাদক। “কৰ্মসংগ্রহ”—ক্রিয়া সম্যক্রূপে ইহাতে গৃহীত হয়, অতএব করণাদি ত্রিবিধ
কারকই ক্রিয়াশ্রয়। সম্প্রদানাদি কারকত্রয় সাক্ষাৎভাবে ক্রিয়া-নির্কৰ্ত্তক নহে, পরম্পররূপে
কেবল ক্রিয়া প্রবর্তক মাত্র। অর্থাৎ সাক্ষাৎ ক্রিয়াশ্রয় নহে, এজন্য করণাদিত্রয়কেই
ক্রিয়াশ্রয় বলা হইল ॥ ১৮

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—(১) জ্ঞান—(২) জানিবার বস্তু ব্রহ্ম—(৩) আর যিনি
জানিবেন এই আত্মা—এই তিন কৰ্ম কথিত হইয়াছে অর্থাৎ ক্রিয়া ক’রে কুটস্থ
ব্রহ্মের জ্ঞান—আপনারই হওয়া অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা এই হ’ল কৰ্ম। করণ
মানে ক্রিয়া করা, কৰ্ম ক্রিয়া ক’রে কুটস্থ ব্রহ্মেতে যাওয়া, ঐ আত্মার যিনি কৰ্ত্তা
বলিয়া মানেন।—ক্রিয়ার পর-অবস্থায় “আমি” নাই, “তুমি” নাই, “ক্রিয়া” নাই
সুতরাং কৰ্ত্তাও নাই। কিন্তু তথাপি ব্যবহারিক অবস্থায় কৰ্ম আছে, সুতরাং তাহার
কৰ্ত্তাও আছে। সে কৰ্ত্তা আত্মা কিনা? আত্মা না থাকিলে কিছু হয় না বটে,
এবং সে হিসাবে আত্মা কৰ্ত্তা হইলেও কৰ্মের দোষ তাহাতে হয় না—এজন্য কৰ্মের সহিত
আত্মার সংশ্রব নাই বলিয়াই মানিতে হইবে। তবে কৰ্ম-সমূহের প্রবর্তক কাহাকে মানা

যাইবে? সুতরাং জ্ঞান, (যাহার দ্বারা বিষয় সমূহ প্রকাশিত হয়) জ্ঞেয় (যাহা কিছু
জ্ঞাতব্য), পরিজ্ঞাতা (বুদ্ধিরূপ উপাধি দ্বারা বিশেষিত অবিভাকল্পিত ভোক্তা)—এই
তিনটিই সামান্যভাবে সকল কৰ্মের প্রবর্তক, সুতরাং কৰ্মচোদনা ত্রিবিধ। জ্ঞান, জ্ঞেয়,
পরিজ্ঞাতা—এই তিনের সংযোগ হইতে কৰ্মের আরম্ভ হইয়া থাকে, ইহারাই কৰ্মের প্রবর্তক
এবং কৰ্ত্তা, কৰ্ম ও করণ—ইহারাই ক্রিয়ার আশ্রয়।

মনে কর—আমি যোগতত্ত্বটি জানিতে চাই ও যোগাত্মক করিতে চাই। তাহা হইলে
প্রথমে “যোগ” বিষয়টি কি তাহা আমাকে জানিতে হইবে। যোগ কত প্রকার ও কোন
পদ্ধতিটি আমার অবলম্বনীয়—এ সমস্ত জানিতে হইবে। এতৎ সন্দেহ সাধুরা কি বলেন, শাস্ত্র
কি বলেন, তাহারও ধারণা থাকা আবশ্যক, নচেৎ যোগের নামে অল্প কিছু অভ্যাসও
করিতে পারি। যোগসংস্কৃতীয় আবশ্যকতা বুঝাই হইল জ্ঞান। যোগপন্থা বা যোগক্রিয়াটি জ্ঞেয়
বস্তু, উহার সাধনা কি প্রকার—তাহা আমার এক্ষণে জানা নাই, উহাই গুরুর নিকট হইতে
আমাকে জানিয়া লইতে হইবে। সুতরাং সাধনমার্গ ও ক্রিয়ার ফলাদি হইল “জ্ঞেয় বস্তু”
—যাহা না জানিলে ক্রিয়ায় উৎসাহ আসিবে না। জ্ঞেয় বস্তুটি সন্দেহ যাহার জ্ঞান আছে,
তিনিই তাহার পরিজ্ঞাতা। ক্রিয়ার পরিজ্ঞাতা ব্যতীত কে আমাকে ক্রিয়ার উপদেশ দিবে?
আবার আমি যখন উপদেশ পাইলাম, তখন আমিও ক্রিয়ার জ্ঞাতা হইলাম। এই জ্ঞান, জ্ঞেয়,
জ্ঞাতাই কৰ্মের চোদনা—ইহা হইতেই ক্রিয়া করিবার জ্ঞান প্রেরণা আসে। তাহার পর
কৰ্ত্তা, কৰ্ম, করণ,—ইহার কৰ্মসংগ্রহ বা ক্রিয়ার আশ্রয়। এই তিনটি বস্তুতেই সকল কৰ্ম
একত্রিত হয়, এইজন্য এই তিনটিকে কৰ্মসংগ্রহ বা ক্রিয়ার আশ্রয় বলে। ক্রিয়া হইবে
কাহাদের দ্বারা তৎসংস্কন্ধেও জ্ঞান থাকা আবশ্যক। আমাদের বুদ্ধি এত তমসাক্ষর যে, গুরু
তো ক্রিয়া দিলেন রূপা করিয়া, এখন ক্রিয়া করাইয়া দিতে হইবেও তাঁহাকে। এত অপস,
এত অনিত্য বস্তুতে যুদ্ধ যে আমাদেরগকে শিঙের মত কাশে ধরিয়া পাঠে বসাইয়া দিতে
হইবে, পাঠ কর্ত্ত্ব করাইয়া দিতে হইবে। ইহার কারণ আর কিছু নহে, ক্রিয়া করার
আবশ্যকতা পর্য্যন্ত হৃদয়কম করিতে পারি নাই। নিম্ন-শরীরের বা পুত্রের ব্যাধি হইলে ঔষধ
খাইব, ডাক্তার ডাকিব—কিন্তু এ ভবব্যাদির প্রতিকার ঔষধ নির্দোষ, ঔষধ খাওয়া—এ
সমস্তই গুরু করিবেন! তবু যদি গুরুতে সেরূপ শ্রদ্ধাভক্তি থাকিত। এ সমস্তকেই অজ্ঞান
মোহ বলে, ইহা পরিপূর্ণ তামসিকতারই ফল। প্রথমে জ্ঞান, জ্ঞেয়, পরিজ্ঞাতা দ্বারা ক্রিয়ার
প্রয়োজনীয়তা বুঝিলাম, ক্রিয়ার ফল কিরূপ হয় তাহা বুঝিলাম, এবং যাহাকে ক্রিয়া করিতে
হইবে, সেই পরিজ্ঞাতা যে আমি—এই তিনে মিলিয়া সাধন কৰ্মে আমাকে নিয়োগ করিবে।
সাধনার প্রয়োজনীয়তা যখন ঠিক হইয়া গেল, তখন সাধন কাহার কাহার উপর নির্ভর
করিয়া সম্পন্ন হইবে—তৎসংস্কন্ধেও জ্ঞান থাকা আবশ্যক। (১) যাহাদের দ্বারা ক্রিয়া সাধিত
হয়, সেইগুলি করণ—জ্ঞানেত্রিয়, কৰ্মেত্রিয়গুলি ও প্রাণ এখানে করণ, উহাদের সাহায্যেই
ক্রিয়া সম্পন্ন হইবে। (২) কৰ্ত্তার অভিলষিত প্রাণায়ামাদি যোগক্রিয়াগুলি কৰ্ম। (৩) আর
যিনি ক্রিয়া করিবেন—অন্তঃকরণ বা অহং অভিমানী জীব—তিনিই কৰ্ত্তা। এই তিনটির
উপর ক্রিয়া করা নির্ভর করে এজন্য এই তিনটি ক্রিয়ার আশ্রয়। ক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা জ্ঞান

ও ক্রিয়া কিরূপে করিতে হয়, সে সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকিলেও যেমন ক্রিয়া হয় না। তেমনই ক্রিয়ার আশ্রয় না থাকিলে বা আশ্রয়গুলি দ্বোবড় হইলেও ক্রিয়া সাধন হইবার উপায় নাই। ক্রিয়ার জ্ঞাতা বা ক্রিয়া করিবার কর্তা—হুই এক জন, ইহাই আমাদের ‘অহং’ এর সহিত তাদাত্ম্যবৃত্ত অস্তঃকরণ বা মনোবুদ্ধি বা অহং-অভিমানী জীব।

সংক্ষেপে আবার বলিতেছি—(১) প্রথম যাহাকে জানিব তৎসম্বন্ধে জ্ঞান বা ধারণা, তাহাকে জানিবার আবশ্যকতা উপলব্ধি, (২) যাহা জানিবার বস্তু—তিনিই হির প্রাণ বা ব্রহ্ম (৩) আব যিনি জানিবেন—তিনিই চঞ্চল আত্মা, বিষয়বিমূঢ় আত্মা, বা জীব। ইনিই প্রকৃত “অহং” বা “আমি”র সহিত তাদাত্ম্যবৃত্ত। তাহার পর ক্রিয়ার আশ্রয়—(১) যিনি ক্রিয়া করিবেন, (২) যে সকল হি প্রিয় মনঃপ্রাণাদি যন্ত্রদ্বারা ক্রিয়া করিতে হইবে, (৩) ক্রিয়া—যদ্বারা কূটস্থ ব্রহ্মেতে যাওয়া যায়। আসল কর্তাই এই কূটস্থ ব্রহ্ম। এই কূটস্থ ব্যতীত কিছুই হয় না, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহার যোগ না থাকিলেও, আসল কর্তাই তিনি।

আত্মাকেই জ্ঞেয় বলা হয়। “আত্মাই জানিবার বস্তু, তিনি নিত্যসর্বব্যাপক চৈতন্যবস্তু। চঞ্চলত্বপ্রযুক্ত আপনাতে আপনি না থাকায় অচৈতন্য (জীবভাব), সেইজন্য আপনি যে কে—তাহা জানি না স্তবরাং নিম্ন-বোধ হয় না। এই আত্মাই অস্মিক মন দেওয়ার অচৈতন্য এবং ক্রিয়ার পর-অবস্থায় থাকাই চৈতন্য। জীব আপনার স্বরূপ তখনই বৃত্তিতে পারে, যখন ক্রিয়ার পর-অবস্থায় থাকে, উহাকেই পরমাত্মা বলে। ক্রিয়া করিতে করিতে যোনিমুদ্রার মণির অণুর দ্বায় সেই ব্রহ্মের অণু কূটস্থের মধ্যে প্রকাশ হইয়া থাকে। সেই অণুর পরিমাণ দৃষ্ট হওয়ার তাহা ব্রহ্ম কিরূপে হইবে—সন্দেহ আসে, কারণ পরিমাণ থাকিলেই আকার হইল কিন্তু ব্রহ্ম নিরাকার। কিন্তু যতক্ষণ সব আছে, ততক্ষণ সবের মধ্যে তাঁহার প্রবেশও আছে—এই অণু-স্বরূপে ব্রহ্ম সর্ব-ব্যাপক, সর্বত্র ও সবের মধ্যে সেই অণু। যোগশিখোপনিষদে আছে,—

“দ্বিতীয়ং সুব্রাহ্মারং পরিশুদ্ধং বিসর্গিতম্।

কপালংসং পুটং ভিষা ন তু পশুস্তি তৎপরম্ ॥”

মেরুদণ্ডের মধ্যে সুব্রাহ্মার অতি সূক্ষ্ম দ্বাবের বিস্তাররূপ গমন হইলে পরিশুদ্ধ অর্থাৎ মন ভূপ্ত হয়। তখন কপালে দণ্ডবৎ ভাব বোধ হইবে, তাহার পর বায়ুর দ্বারা ভেদ হইলে আর কিছুই দেখা যায় না, কারণ তখন ইন্দ্রিয় সকল ও মন আত্মার সহিত মিলিত হইয়া ব্রহ্মেতে লীন হওয়ায় ‘সর্বত্রব্রহ্মময়ং অণং’ হয় অর্থাৎ জানিবার যে বস্তু তাহাই হইয়া যায়। তখন আর নিজে থাকিল না, স্তবরাং সেই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়। তখন ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই। যোগশিখোপনিষদে আছে,—‘আদিত্যমণ্ডলং দ্বিব্যং রশ্মিজালসমাবুলম্।

তন্ত মধ্যগতো বহ্নিঃ প্রাকালে দীপবত্তিৎ ॥”

কূটস্থের মধ্যে ভাল রকমের জ্যোতির্বিদ্যুৎ আকাশের মণ্ডল, চারিদিকে সেই আকাশ-মণ্ডলের মধ্যে প্রদীপের সলিতার দ্বায় আলো জ্বলিতে থাকে, তাহারই মধ্যে ত্রিলোক। সেই ত্রিলোক সমস্তই ব্রহ্মময় এবং ত্রিলোকস্থিত চরাচর ও বস্তু কণ্ঠ—সমস্তই ব্রহ্ম।

“যোনিমুদ্রাতে খেতবীপনিবাসী পরব্যোমস্বরূপ ব্রহ্মমধ্যে অগ্নিশিখা দেখিতে যে সময় লাগে, পরমেস্বর পুরুষোত্তমকে দেখিতেও সেই সময় লাগে। যোগীরা এইরূপে সূর্য্য—কূটস্থ ব্রহ্মকে ভেদ করিয়া যোগাভ্যাসের ধারণা দ্বারা পুরুষোত্তমের জ্ঞানলাভ করেন। “যোমাবর্নো পুরুষঃ সোহহমস্মি”। এই আদিত্যাস্তর্গত পুরুষই “আমি”। যখন আমিই সেই এক পুরুষ ব্রহ্মাণ্ডব্যাপক ব্রহ্মস্বরূপ—তখনই ‘সর্বত্র ব্রহ্মময়’ হয়। সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ হইলে আর আপনিও থাকে না।

“ক্রিয়া করিতে করিতে ক্রিয়ার অবস্থায় থাকা—এই প্রথম ক্রিয়া। এইরূপ থাকিতে থাকিতে সর্বদা ধ্যান করিলেই ব্রহ্মপদকে পায়—মূলধার হইতে ব্রহ্মরূপ পর্য্যন্ত সুব্রাহ্মার এক টান থাকে—ইহাই দ্বিতীয়মাত্রা, ইহাকে বিমূঢ়বত বলে, অর্থাৎ যোনিমুদ্রায় অধিকক্ষণ স্থিতি থাকিলে ব্রহ্মবর্ণ কূটস্থের মধ্যে সঙ্গ দেবতার সহিত সাক্ষাৎ হয়, পুরুষোত্তম—যিনি নিত্য পুরাণ পুঙ্খ—তাঁহাকে দেখা যায়। ইহাই বৈষ্ণবপদ অর্থাৎ লিঙ্গমূল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত বায়ু থাকে। আর যে দিশান দেবতা অর্থাৎ ওঁকার ক্রিয়াদ্বারা যখন সমস্ত জানা যায়

তাহাই তৃতীয়মাত্রা অর্থাৎ ব্রহ্ম অধিপতি ও দৈশ্বর—সকল ভূতের মধ্যে আছেন বলিয়া সকল জানা যায়, তখন হাইয়ের মত বর্ণ দেখা যায়। এইরূপ ধ্যান করিতে করিতে নাভি হইতে মস্তক পর্য্যন্ত বায়ুর টান থাকিবে—এইরূপ ধ্যানে দিশানপদকে পাইবে। অর্থাৎ কূটস্থের মধ্যে বিন্দু অথবা বাহবিন্দুতে [যাহা জীব সামনে দেখা যায়] থাকিবে—সে বিনা ইচ্ছা—অনিচ্ছার ইচ্ছা—যাহা বোধগম্য নহে, কেবল তাঁহারই মহিমা—তাঁহার দ্বারা সমস্ত জানিতে পারিবে। আর যাহা অর্ধমাত্রা বা চতুর্থমাত্রা—তখন হৃদয়ে ব্রহ্মের স্থিতি-অনুভব হয়, যেখানে সকল দেবতার তেজোময় রূপ দেখা যায়, আকাশে বিচরণ করিতেছে; শুদ্ধ ক্ষটিকের দ্বায় বর্ণ দেখা যায়, তাহাই সর্বদা ধ্যান করিবে। গগন-মণ্ডলে সে ধ্যান নিত্য করিতে করিতে সহস্রকল পন্ন নামক নিধি প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ সর্বব্যাপী ব্রহ্ম আত্মাস্বরূপ, তাঁহার পর আর কিছু নাই।”

(লাহিড়ী নহাশয়ের ব্যাখ্যাত বেদান্তদর্শন ২য় অধ্যায়, তৃতীয় পাদ)

উপরোক্ত বিবরণটির সারার্থ এই—

(১) প্রথম কাজ ক্রিয়া করা, (২) ক্রিয়া দ্বারা ক্রিয়ার পর-অবস্থা প্রাপ্তি, উহাই জ্ঞেয়—ব্রহ্মবস্তু। ক্রিয়ার পর-অবস্থাতেই ব্রহ্মবিজ্ঞান হয়। (৩) ক্রিয়ার পর-অবস্থায় থাকিতে থাকিতে যে ধ্যানাবস্থা হয়, তদ্বারা ব্রহ্মপদ লাভ হয়—তখন সুব্রাহ্মার মধ্যে মূলধার হইতে ব্রহ্মরূপ পর্য্যন্ত একটা টান অনুভব হয়। ইহাই প্রণবের প্রথম মাত্রা। (৪) যোনিমুদ্রায় ব্রহ্মবর্ণ কূটস্থের মধ্যে সমস্ত দেবতার সাক্ষাৎ হয়, পরে পুরুষোত্তম দর্শন হয়। ইহাই বিষ্ণুপদ—তখন লিঙ্গমূল হইতে (মূলধার ছাড়িয়া গেল) মস্তক পর্য্যন্ত বায়ু স্থির। ইহাই প্রণবের দ্বিতীয় মাত্রা। (৫) ওঁকার ক্রিয়ার দ্বারা যখন নাভি হইতে মস্তক পর্য্যন্ত টান হয় (স্বাধিষ্ঠান ছাড়িয়া গেল) তখন যে একটি অপর্য্যবস্থা লাভ হয়—উহাই প্রণবের তৃতীয় মাত্রা। তখন সর্বভূতস্থিত দৈশ্বকে জানা যায় (এইবার দৈশ্ব দর্শন হইল)। দৈশ্ব সর্বভূতস্থ বসিয়া সাধকও তখন সকলের অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন, তিনি তখন সকলের সব কথা

[সাংখ্যমত -সকল বস্তুই ত্রিগুণাত্মক। আত্মা নিগুণ।]

জ্ঞান, কর্ম ও কর্তা ত্রিবিধ

জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।

প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছূ তাত্ত্বপি ॥ ১৯

জানিতে পারেন। এই সময় মন কূটস্থের মধ্যে বিন্দুতে সর্ষদা লাগিয়া থাকে, এবং তাঁহার সর্ষদা বিন্দুদর্শন হয়। (৬) হৃদয়ে ব্রহ্মের স্থিতি যখন অমুভব হয়, তখনই চতুর্থ মাত্রা, তখন আকাশে সমস্ত দেবতার তেজোময় রূপ দর্শন হয়। ঈশ্বরের মত বর্ণ দেখা যায়—উহাই শিবরূপ। আবার উহাই ধ্যান করিতে করিতে সহস্রবল পদ্মে স্থিতি অমুভব হয়, তখন এক আত্মাই পরব্রহ্মরূপ ও সর্ষদ্যাপী এই অমুভব পদ প্রাপ্তি হয় ॥ ১৮

অর্থঃ। গুণসংখ্যানে (সাংখ্যশাস্ত্রে) জ্ঞানং, কর্ম চ, কর্তা চ (জ্ঞান কর্ম ও কর্তা) গুণভেদতঃ (সত্ত্বগুণভেদে) ত্রিধা ইব (তিন প্রকারই) প্রোচ্যতে (কথিত হইয়াছে, তানি অপি (সে সকলও) যথাবৎ শুণু যথাযথভাবে শ্রবণ কর। ॥ ১৯

ত্রিধর ততঃ কিম্? অত আহ—জ্ঞানং কর্ম চেতি। গুণাঃ সম্যক্ কার্যভেদেন ব্যাযন্তে প্রতিপত্তন্তে অস্মিন্ ইতি গুণসংখ্যানে—সাংখ্য শাস্ত্রে। তস্মিন্ জ্ঞানঞ্চ কর্ম চ কর্তা চ প্রত্যেকং সত্ত্বাদিগুণভেদেন ত্রিধৈব উচ্যতে। তাত্ত্বপি জ্ঞানাত্মনি বক্ষ্যমাণানি যথাবৎ শুণু। ত্রিধৈবেতি এব কারো গুণত্রয়োপাধিব্যতিরেকেণ আত্মনঃ স্বতঃ কর্মাদি-প্রতিষেধাৎ। চতুর্দশাধ্যায়ে “তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ” ইত্যাদিনা গুণানাং বন্ধকত্ব প্রকারো নিরূপিতঃ। সপ্তদশাধ্যায়ে “যজ্ঞন্তে সাত্বিকা দেবান্” ইত্যাদিনা গুণকৃত-ত্রিবিধস্বভাবনিরূপণেন রজস্তমঃ স্বভাবং পরিত্যজ্য সাত্বিকাহাবাদি-সেবয়া সাত্ত্বিকস্বভাবঃ সম্পাদনীয় ইত্যুক্তম্। ইহ তু ক্রিয়া-করক-ফলাদীনাম্ আত্মসম্বন্ধো নাতীতি দর্শয়িতুং সর্ষদ্যাং ত্রিগুণাত্মকত্বম্ উচ্যতে ইতি বিশেষো জ্ঞাতব্যঃ ॥ ১৯

বঙ্গাশুবাদ। “গুণসংখ্যানে” অর্থাৎ সাংখ্যশাস্ত্রে জ্ঞান কর্ম ও কর্তা—এই তিনটি সত্ত্বাদি গুণভেদে যে ত্রিবিধ হয়, তাহা উক্ত আছে সেই জ্ঞানাদির বিষয় বলিতেছি যথাযথভাবে শ্রবণ কর। “ত্রিধৈব”—এই “এব” শব্দটি গুণত্রয়রূপ উপাধি ব্যতিরেকে আত্মার স্বতঃ কর্ম প্রতিষেধার্থ অর্থাৎ আত্মার নিজের যে কর্মাদি নাই—ইহাই বলিবার জন্য। চতুর্দশ অধ্যায়ে “তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ” ইত্যাদির দ্বারা সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের বন্ধকত্ব নিরূপিত হইয়াছে, এবং সপ্তদশ অধ্যায়ে “যজ্ঞন্তে সাত্বিকা দেবান্” শ্লোকদ্বারা গুণকৃত ত্রিবিধ স্বভাব নিরূপণদ্বারা রজঃ ও তমঃস্বভাব সম্পাদনই কর্তব্য বলা হইয়াছে। ইদানীং ক্রিয়াকারক ও ফলাদির সহিতও যে আত্মার সম্বন্ধ নাই—ইহাই দেখাইবার জন্য সকল বস্তুর ত্রিগুণাত্মকতা বলিতে-ছেন; ইহাই বিশেষ বলিয়া জানিবে ॥ ১৯

[আচার্য্য শব্দ বলিয়াছেন—“পরমার্থত্বকৈক্যবিষয়ে যতপি বিরুদ্ধাভেদে, ততপি গুণভোক্ত-বিষয়ে প্রমাণম্”—পরমার্থ ত্বকৈক্যত্ব বিষয়ে সাংখ্যশাস্ত্রে বিরুদ্ধ মত থাকিলেও গুণ ও গুণভোক্তার স্বরূপ-নির্ণয়বিষয়ে এই শাস্ত্রই প্রমাণ।]

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—জ্ঞান কর্ম কর্তা—তিনরকমের তিন গুণভেদে তাহাদিগের গুণ সব যেমন যেমন তাহা বলিতেছি।—আত্মা অকর্তা, তবে জ্ঞান, কর্ম ও কর্তার গুণভেদে ত্রিবিধ অবস্থা হয়; ইহা কিরূপে সম্ভব হয় বলিয়া বুঝিবে? এই কর্তা ও জ্ঞেয় বস্তু কি একই বস্তু নহে? ক্রিয়া ব্যতীত কারকত্বের সম্ভাবনা নাই। গুণাতীত যে আত্মা তাহার আবার ক্রিয়া কোথায়? সুতরাং ক্রিয়ার সম্ভাবনা নাই। এ কর্তা গুণাতীত নহে বরং ত্রিগুণযুক্ত।

আত্মা অকর্তা হইলেও গুণভেদে জ্ঞান, কর্ম ও কর্তারও ত্রিবিধ অবস্থা হয়। এই কর্তা ও জ্ঞেয় বস্তু (আত্মা) কিন্তু এক বস্তু নহে। ক্রিয়াব্যতীত কারকত্বের সম্ভাবনা থাকে না, কিন্তু গুণাতীত যিনি, তাঁহার আবার ক্রিয়ার সম্ভাবনা কোথায়? সুতরাং এ কর্তা গুণাতীত নহেন, বরং ত্রিগুণযুক্ত। বুদ্ধি-প্রতিবিম্বিত চৈতন্য বা আভাস চৈতন্যই সমস্ত বস্তুর জ্ঞাতা, সাধন দ্বারা এই আভাস চৈতন্য যখন শুদ্ধ হইয়া যান, তখন তিনিও অকর্তাই হইয়া যান। দৃশ্য বস্তু থাকিলে তাহার দৃষ্টাও আছে বুঝিতে হইবে, কিন্তু যখন দৃশ্য বস্তুর অভাব হয়, তখন দৃষ্ট-তাবও থাকে না। চিত্তস্পন্দন হেতুই বহুবিধ বস্তু কল্পিত হয়, প্রাণস্পন্দন ব্যতীত চিত্তস্পন্দন হয় না, সুতরাং বহুবিধ দৃশ্য বস্তু উহা প্রাণের বিবিধ স্পন্দন ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রাণ নিষ্পন্দিত হইলে তাহার বহু বস্তুরূপ পরিণামও ক্ষীণ হইয়া যায়, এইরূপে চিত্তস্পন্দনও ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইলে তাহার ভোক্তাবও বিলুপ্ত হইয়া যায়, ইহাই দৃষ্টার স্বরূপে অবস্থান। বৃত্তির সম্যক্ নিরুদ্ধাবস্থা দ্বারা ইহা দিষ্ট হয়। এই অবস্থাকেই কৈবল্যাবস্থা বলে। তখন বুদ্ধির অভাবপ্রযুক্ত বুদ্ধি-বোধাত্মক তাবও থাকে না। কিন্তু ব্যাখ্যিত অবস্থায় “বৃত্তিসারূপ্যমিত্যত্র”—পুরুষ যেন বুদ্ধি-বৃত্তির সহিত অভিন্ন ভাবে প্রতীত হন। দর্পণ থাকিলেই যেমন দর্পণের সমুদ্রস্থ বস্তুর প্রতিবিম্ব দর্শন হয়, তদ্রূপ বুদ্ধি রূপ দর্পণ থাকিলে প্রতিবিম্ব দর্শন দ্রব হয় না। দৃষ্টা পুরুষই চৈতন্য-স্বরূপ; এই দৃষ্টা বাহ্য জ্ঞাত হন, তাহাই দৃশ্য বা জ্ঞেয় বস্তু। দৃষ্টা-চৈতন্যের দ্বারা চৈতন্যযুক্ত হইয়া বুদ্ধি বিষয়সমূহকে প্রকাশ করে। তাহা হইলে দৃষ্টা-পুরুষ বা বুদ্ধি-প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই জ্ঞাতা-পুরুষ, এবং বিষয়সমূহ জ্ঞেয়। ইন্দ্রিয়যুক্ত চিত্ত হইল বিষয় জ্ঞানের করণ বা দর্শন শক্তি। চিত্তের সহিত মিলিত হইয়াই আত্মার ভোক্তৃত্ব তাব হইয়া থাকে। এই ভোক্তৃত্ব-তাবই অন্তিতাধ্য অভিমান হইতে সপ্রাপ্ত। চিত্ত মধ্যে যে বিষয়ের জ্ঞান হয় তাহা অভিমানেরই প্রকার-বিশেষ। দৃষ্টা-পুরুষের সন্নিকর্ষ হইতে বুদ্ধিতে বিষয় সকল প্রকাশিত হয়, সেই জন্য বুদ্ধি-বৃত্তির সহিত পুরুষ অভিন্নভাবে যেন অবস্থিত বলিয়া মনে হয়, এই জন্য বিষয়ের সহিত পুরুষেরও সারূপ্য প্রতীত হয়। নিরুদ্ধ অবস্থায় যেমন তাঁহার স্বরূপে অবস্থান হয়, তেমনই ব্যাখ্যিত অবস্থায় বিষয়রূপে তিনিই প্রতীত হন। সেই জন্য জ্ঞেয় বিষয় জ্ঞাতা পুরুষ-হইতে অভিন্ন। দৃশ্য না থাকিলে যেমন দৃষ্টা নাই, দৃষ্টা না থাকিলেও তেমনই দৃশ্য নাই। সম্ভাবন বস্তু মাত্রেরই কর্তৃ-নিরপেক্ষ হইয়া অস্তিত্বযুক্ত হইতে পারে না। বস্তুর সত্তা দৃষ্টার সত্তার উপর নির্ভর করে, তাহা হইলে বস্তুর সত্তাও দৃষ্টা-পুরুষ হইতে বিভিন্ন হইতে পারে না। আত্মার এইরূপ বহুভাবে প্রকাশই হইল—তাঁহার মায়া বা লীলা। বাস্তবিক দৃষ্টা ও “আমি”

(একান্ত জ্ঞানই সাত্ত্বিক জ্ঞান)

সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে ।

অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ॥ ২০

একই বস্তু, মানুষখানে 'মম' আসিয়া সমস্ত বস্তুকেই দুর্জের করিয়া তুলিয়াছে। তাই বৃষ্ণ বস্তু দর্শনে মূঢ় ভীত-কম্পিত-চিত্ত কাঁদিয়া বলে—“হে আৰিঃ, হে প্রকাশ স্বরূপ, তুমি আমার বুদ্ধিতে প্রকাশিত হও। মা, তুমিই তো প্রত্যেক জীব-জগৎকে বুদ্ধিরূপে অবস্থিতা, এই বুদ্ধির দ্বারা তুমি বস্তু-মাত্রকে স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশ করিয়া আমাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতেছ। তোমার এই বহু রূপ দেখিয়া ভয় লাগিয়া গিয়াছে। একবার তুমি স্ব-স্বরূপে অবস্থান করিয়া নিঃসন্দেহে প্রতিষ্ঠিত হও। তুমিই যে আমি এবং আমিই যে এই সমস্ত দৃশ্যরূপে ছুটিয়া উঠিতেছে। তোমার রূপা-কটাকে আমাদের সেই দর্শন শক্তি প্রস্ফুটিত হউক, তাহা হইলেই বহুব্ধের খেলায় আর যুদ্ধ হইতে হইবে না।”

সাধক। এইরূপ শরণাগত ভাবে প্রাণময়ী অভয়া চিত্ত-শক্তির নিকট আশ্রয়নিবেদন কর, তাহা হইলেই তুমি তাঁহার সহিত যোগযুক্ত হইতে পারিবে। এ বাহু-জগৎ যে তোমারই রূপ, তোমার আশ্রয়ই প্রকাশ—তাহা বুঝিতে পারিবে। তখন আর এই বাহু দৃশ্য দেখিয়া ভয় হইবে না।

যে লীলাময়ীর লীলাই ‘তুমি’ ‘আমি’—বাহু জগৎরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই তাঁহার গুণের খেলা। সত্যাদি-ভেদে এই গুণের কত যে খেলা হয় তাহাই ভগবান এই বার দেখাইবেন ॥ ১৯

অম্ময়। যেন (যে জ্ঞান দ্বারা) বিভক্তেষু (ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতীয়মান) সর্বভূতেষু (সর্বভূতে) অবিভক্তং (অবিভক্ত ভাবে স্থিত) একং অব্যয়ং ভাবং (এক অব্যয় নিত্য বস্তুরূপে) ইক্ষতে (দৃষ্ট হয়) তৎ জ্ঞানং (সেই জ্ঞান) সাত্ত্বিকং বিদ্ধি (সাত্ত্বিক বলিয়া জানিও) ॥ ২০

শ্রীধর। তজ্জ্ঞানশ্চ সাত্ত্বিকাদিভৈবিধ্যমাং—সর্বভূতেষু ইতি ত্রিভিঃ। সর্বেষু ভূতেষু—ব্রহ্মাদি স্থাবরাত্তেষু, বিভক্তেষু—পরম্পরং ব্যাবৃত্তেষু অবিভক্তং অম্ময়ভূতম্, একম্ অখ্যয়ম্ নির্দিষ্টাং, ভাবং—পরমাখ্যতৎ, যেন—জ্ঞানেন, ইক্ষতে আলোচয়তি, তৎ জ্ঞানং সাত্ত্বিকং বিদ্ধি ॥ ২০

বঙ্গানুবাদ। [তিনটি শ্লোকে সাত্ত্বিকাদি ত্রিবিধ জ্ঞান বলিতেছেন]—ব্রহ্মাদি স্থাবরাত্ত পরম্পর ব্যাবৃত্ত (খণ্ডিত) ভূতসকলের মধ্যে এক অবিভক্ত নির্দিষ্ট পরমাখ্যতত্ত্ব যে জ্ঞান দ্বারা আলোচনা করা (দেখা) যায়, সেই জ্ঞানকে সাত্ত্বিক বলিয়া জানিবে ॥ ২০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ক্রিয়া ক’রে সর্বভূতের মধ্যে এক কুটস্থ ব্রহ্ম অব্যয় অবি-
নশী যে দেখে—ভিন্ন ভিন্নভেদেও এক করিয়া দেখে ও ভিন্ন ভিন্ন সব জীব ব্রহ্মস্বরূপ সর্বভূতে দেখে—ইহারই নাম সাত্ত্বিক জ্ঞান অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় এই জ্ঞান হয়।—দেশ, কাল, বস্তু দ্বারা বিভিন্ন ভূত সকলের মধ্যে পরিচ্ছিন্নরূপে যে সত্তা দৃষ্ট হয় তিনি এক অখণ্ড নির্দিষ্ট, এইরূপ যে জ্ঞান দ্বারা এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা সত্তা আলোচিত হয়,

তাহাই সাত্ত্বিক জ্ঞান; ইহার নামই-সম্যক দর্শন। আপাততঃ আমাদের যে জ্ঞান রহিয়াছে সেই জ্ঞানে বস্তুসমূহ ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীত হইয়া থাকে, কিন্তু সেই সকল অসংখ্য বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে একটা অবিভক্ত চিত্তবস্তু রহিয়াছে, তাহা সর্বদাই দৈত-বিবাক্ত। এই অদ্বিতীয় তত্ত্ব বস্তুটিকে যে জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধি করা যায় তাহাই সাত্ত্বিক জ্ঞান। এই পরম জ্ঞানকে লাভ করিতে হইলে আমার বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গণের যে বিভিন্ন শক্তি-সকল বহির্গামী হইয়া বস্তু-সকলের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপলব্ধি করিয়া থাকে, তাহাদের সেই বিভিন্ন শক্তিকে সংপিণ্ডিত করিয়া একমুখী করিতে হইবে। এইরূপ ইন্দ্রিয়গণের একীকরণ দ্বারা ইহা সত্তা-সামান্য ভাব তাহাই ছুটিয়া উঠিবে। আমার মন ও প্রাণ চঞ্চল বলিয়া ইন্দ্রিয়ের বহির্গামী বৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না, সুতরাং বহু জ্ঞানও নিরন্তর হয় না। বহু জ্ঞান নিরন্তর করিতে হইলে মনের লয়-বিক্ষেপ ভাব যদ্বারা দৃশ্য দর্শন হইয়া থাকে, সর্বাংশে মনের এই চঞ্চল ভাবে বিদূষিত করা আবশ্যক। প্রাণের চাকল্যেই মনের চাকল্য, সেই প্রাণকে প্রাণায়াম সাধনা দ্বারা স্থির করিতে হইবে। তরঙ্গায়িত সমুদ্রের মধ্যে তাহার চিরস্থির ভাবটিকে ধরিতে হইলে তাহার তরঙ্গভঞ্জে চাকল্যকে যেমন প্রশমিত করা আবশ্যক হয়, তজ্জপ যে এক অখণ্ড জ্ঞেয় বস্তুটা আপাততঃ বহু বলিয়া মনে হইতেছে, তাহা যে প্রকৃতই বহু নহে, তাহা যে স্থির সমুদ্রের তরঙ্গায়িত ভাব মাত্র তাহা বুঝা যাইবে যখন প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণ স্থির হইয়া যাইবে। প্রাণায়াম সাধন দ্বারা খাস স্থির হইলেই প্রাণ স্থির হইয়া থাকে, প্রাণের স্থিরতার সহিত মনও স্থির হইয়া যাইবে। মন অচঞ্চল বা প্রাণস্থির হইলেই তাহা আত্মমুখী হয়। তখন বহুভাব বা নানাধর্মের তরঙ্গোচ্ছাস প্রশমিত হইয়া যায়, ইহাকে নিরোধ ভাবও বলে। এই নিরোধ ভাব হইতেই একান্ত-জ্ঞান বা ব্রহ্ম জ্ঞানের উদয় হয়, তখনই দৈতপ্রপঞ্চ মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয়। এই অবস্থায় হিত যোগী

“জিতাহারো জিতক্ৰোধো জিতসন্দো জিতেন্দ্রিয়ঃ।

নির্বন্দো নিরহঙ্কারো নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥”

“জিতাহার” অর্থে ইহা নহে যে, ক্ষুধাকে মারিয়া কেলিতে হইবে। এই অবস্থায় অবস্থিত যোগীর বসনায় তৃপ্তিকর বস্তুতে আসক্তি থাকে না, তিনি যাহা পান তাহাই খান, ইহা খাইতে ভাল লাগে, উহা ভাল লাগে না, যোগীর এরূপ ইচ্ছার সম্যক অভাব হয়। সাধারণতঃ আমাদের ক্রোধ হয়—নিজের অভিলষিত বস্তু না পাইলে, কিন্তু যোগাভ্যাসীর ক্রিয়ার পর-অবস্থায় মন বা ইচ্ছা না থাকায় ক্রোধ হইবারও সম্ভাবনা থাকে না। তিনি সন্তোষাবলম্বিত। আসক্তিপূরক কাহারও সঙ্গ করেন না বা বৃথালাপের লজ্জা কাহারও সহিত কথা বলেন না, এই লজ্জা তাঁহার নিকট অজ্ঞ বস্তু থাকিয়াও নাই। ইন্দ্রিয়সকল তাঁহার আয়ত্তাধীন, তাঁহাকে সময়ে অসময়ে তাহার বিপক্ষে লইয়া যাইতে পারে না—তাঁহার কারণ তিনি ভিত্তেভিত্তি, কোন ইন্দ্রিয়ের তাঁহার উপর কর্তৃত্ব নাই। ক্রিয়া দ্বারা প্রাণ বশীভূত হইলে, ইন্দ্রিয় সকল তাঁহার থাকিয়াও নাই। এমন কি বাক্য, পাদ, পাণি, পাদু ও উপহৃত এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়েরও আপন আপন কৰ্মের প্রতি স্পৃহা থাকে না। তিনি নিবন্দ—কারণ ক্রিয়ার পর অবস্থায় মনই থাকে না, সুতরাং অজ্ঞ কোন লক্ষ্য বা ভাব না থাকায় দ্বন্দ্ব হইবে কিরূপে? তিনি সর্বদাই নিবহকার—কারণ “আমি আমি” করিয়া সর্বদা দ্বিগুণের মত যে বিচরণ করিত,

(পৃথক বা অর্নেকের জ্ঞানই রাজস জ্ঞান)

পৃথক্ভবেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্ ।

বেত্তি সর্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ২১

সেই অহংকারও থাকে না। সুতরাং ক্রিয়ার পর অবস্থায় সৃষ্টি সমুদায় থাকিয়াও থাকে না। বজ্জুতে সর্প ভ্রমের ছায় ব্রহ্মোত্তে সংসার ভ্রম হয়, চকুল মনের। ক্রিয়ার পর অবস্থায় মনও নাই সুতরাং সৃষ্টিও নাই আর বজ্জুতে সর্পবোধও নাই। তখন এক অব্যক্ত ব্রহ্মবস্তুর ব্যতীত আর কোন কিছুই সত্তা থাকে না সুতরাং নির্দ্বন্দ্ব নিরহঙ্কার যোগীরা কোন ভোগেচ্ছা বা কোন বস্তুর প্রতি লোভও থাকে না সুতরাং তাঁহার পরিগ্রহের সম্ভাবনা নাই বা কিরূপে হইবে? তাই বলিতেছি সাধক তোমার সকল দরজা খোলা থাকুক, তুমি প্রাণক্রিয়া দ্বারা মনকে বশ করিতে পারিলেই এই জগৎ, জীব, মারা, ঈশ্বর বা আত্মার সমস্ত বহুতই অবগত হইতে পারিবে। ইহাই প্রকৃত সাত্বিক জ্ঞান ॥ ২০

অর্থঃ। তু (কিন্তু) পৃথক্ভবেন (পৃথক পৃথকরূপে) যৎ জ্ঞানং (যে জ্ঞান) সর্বেষু ভূতেষু সর্বভূতে) পৃথক্বিধান্ নানাভাবান্ (পৃথক্বিধ নানা ভাবসমূহকে) বেত্তি (জ্ঞানে) তৎ জ্ঞানং (সেই জ্ঞানকে) রাজসং বিদ্ধি (রাজস বলিয়া জানিবে) ॥ ২১

তীর্থঃ। রাজসং জ্ঞানমাহ—পৃথক্ভবেনিতি। পৃথক্ভবেন তু যৎ জ্ঞানং ইত্যশ্রয় বিবরণং। সর্বেষু ভূতেষু—দেহেবু, নানাভাবান্ বস্তুতঃ এষ অনেকান্, ক্ষেত্রজ্ঞানং, পৃথ-
বিধান্—সুবিভক্তঃ পৃথগ্বিধরূপেণ বিলক্ষণান্ যেন জ্ঞানেন বেত্তি তৎ জ্ঞানং রাজসং বিদ্ধি ॥ ২১

বঙ্গানুবাদঃ। [রাজস জ্ঞানের বিষয় বলিতেছেন]—পৃথকরূপে যে জ্ঞান হয় ইহা তাহারই বিবরণ। যে জ্ঞানে পৃথকরূপে সর্বভূতে পৃথক্বিধ (সুখী দুঃখী আদি রূপে-বিলক্ষণ বা বিভিন্ন) নানাভাব বস্তুতঃই অনেকানেক ক্ষেত্রজ্ঞানরূপে অনুভূত হয়, সেই জ্ঞানকে রাজস বলিয়া জানিবে ॥ ২১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—পৃথক করে নানা বস্তুতে আসক্তিপূর্বক দৃষ্টি করিয়াও এক ব্রহ্মস্বরূপ দেখে—সে রাজসিক জ্ঞান।—অপরিবর্তনীয় এক আত্মস্বরূপেরই জ্ঞান হইতে থাকে এবং ভিন্ন ভিন্ন দেহে প্রবিভক্তরূপে দৃষ্ট হইলেও যে জ্ঞান দ্বারা আত্মাকে এক ও নিরন্তর আকাশের ছায় বোধ হয়, তাহাই সাত্বিক জ্ঞান—যাহা ক্রিয়ার পর-অবস্থায় বোধ হয়, ইহা পূর্বে শ্লোকে বলা হইয়াছে। এ শ্লোকে বলা হইতেছে যে পূর্বে শ্লোকোক্ত একাত্মবোধ নাই বটে, নানা বস্তুকে নানা ভাবে দেখা ও তত্তৎবস্তুতে আসক্তি বা কখন বিরাজিত প্রকাশ করে বটে, কিন্তু তাতা যে একেই বহুরূপ—এইরূপ জ্ঞান যখন হয়, তাহা রাজস জ্ঞান। একাত্মত্বের চিন্তা থাকিলেও যতদিন দেহের পার্থক্য ভাবের লোপ না হয়, তাহাকে শুদ্ধ জ্ঞান বলে না, উহা এক প্রকার মল-মিশ্রিত জ্ঞান—সুতরাং রাজস জ্ঞান। কাবণ জ্ঞানের শুদ্ধতা হইলে আর তাহাতে পৃথকত্বের ভাব থাকিতে পারে না। এখানে ব্রহ্মেরই পৃথক পৃথক ভাব মনে হইলেও পৃথক দৃষ্টি

(স্থূল দেহাধিতে যে আত্মজ্ঞান, তাহাই তামস জ্ঞান)

যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্যে সক্তমহৈতুকম্ ।

অতত্ত্বার্থবদল্লং চ ততামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২

নষ্ট হয় না, সুতরাং এ জ্ঞানও রাজসিক জ্ঞান। ব্রহ্মোত্তের ধর্ম চকলতা, একত্বের বিচার মনে থাকিলেও অহংভাবে তখনও বৈতন্ধ্য মিতে নাই। ভিন্ন দেহের বোধ থাকিলে দেহাধিতে দেহীকেও পৃথক বলিয়া ধারণা থাকে। সত্তার একত্ব পরোক্ষ ভাবে দর্শন হইলেও সত্তার স্বরূপে অবস্থানরূপ পৃথক্বিধ বস্তির নিরোধ ভাব স্মৃতিত হয় না, সুতরাং সে জ্ঞান সমুদায় হইলেও সাত্বিক জ্ঞান নহে। নানাত্বের জ্ঞান থাকায় উহাকে রাজস জ্ঞানই বলিতে হইবে ॥ ২১

অর্থঃ। যৎ তু (যে জ্ঞান) একস্মিন্ কার্যে (কোন একটি বিষয়ে) কৃৎস্নবৎ (সম্পূর্ণ বলিয়া) সক্তম্ (অভিনিবিষ্ট বা আসক্ত হয়) [এই দেহই আত্মা অথবা এই প্রতিমাই ঈশ্বর এইরূপ নিশ্চয়যুক্ত] অহৈতুকম্ (যুক্তি-বিরহ) অতত্ত্বার্থবৎ (যাহা তত্ত্বার্থকে প্রকাশ করে না বা যাহা তত্ত্বজ্ঞানের বিরোধী পরমার্থ-অবলম্বনশূন্য) চ অল্লং (এবং তুচ্ছ) তৎ (সেই জ্ঞান) তামসং উদাহৃতম্ (তামস বলিয়া কথিত হয়) ॥ ২২

তীর্থঃ। তামসং জ্ঞানমাহ—বহুত্বিতি। একস্মিন্, কার্যে—দেহে প্রতিমারো বা কৃৎস্নবৎ—পরিপূর্ণবৎ, সক্তম্—এতাবানিব আত্মা ঈশ্বরো বা ইতি অভিনিবেশযুক্তম্, অহৈতুকম্—নিরূপপত্তিকম্; অতত্ত্বার্থবৎ—পরমার্থাবলম্বনশূন্যম্, অতএব অল্লং—তুচ্ছম্, অল্লং বিষয়তঃ অল্লং ফলতঃ চ। যৎ এবভূতং জ্ঞানং তৎ তামসম্ উদাহৃতম্ ॥ ২২

বঙ্গানুবাদঃ। [তামস জ্ঞানের বিষয় বলিতেছেন]—কিন্তু যাহা একমাত্র কার্যে দেহে বা প্রতিমাধিতে—পরিপূর্ণবৎ আসক্ত (অর্থাৎ এই দেহই আত্মা বা এই প্রতিমাই ঈশ্বর এইরূপ অভিনিবেশ যুক্ত), নিরূপপত্তিক অর্থাৎ অযৌক্তিক, পরমার্থ-অবলম্বনশূন্য

*ভগবানকে সকলে আত্মা দেখিতে পাই না, সুতরাং আত্মার ভগবৎ উপাসনার জন্য কোনও অবলম্বন আবশ্যক, বিনা অবলম্বনে ভগবদ্যান সকলের পক্ষে হ্রস্ব নহে। তাই যোগীরা কুটুম্বের মধ্যে যৌগিক রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, যৎ-কাষ্ঠাধিতে তাহারই প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া অল্লং বানবদের কণা-এবং জন্তু তাহারই ধ্যান পূজাদির ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য সাধারণ লোকেরা তাহার অভিজ্ঞতার ফল লাভ করিয়া প্রতিমাদিতে ভক্তিশ্রদ্ধাৎ হইয়া জীবনকে কৃতার্থ করিতে পারিবে। এইরূপ ভক্তি-প্রদায়ক প্রতিমাদির অর্জনা শাস্ত্রমতে, সুতরাং তাহা তামসিক নহে। কিন্তু দেবার্জনার প্রবৃত্ত উদ্দেশ্য অবগত না হইয়া যৎ-শিলায় প্রতিমা মাত্রকে ঈশ্বর ভাবিলে তাহা তামসিকতার পরিণত হয়। প্রতিমা মাত্র অবলম্বন করিয়া যদি চৈতন্যসত্তা বা ঈশ্বর ভাব অনুভব হয়, তাহা কখনও সামান্য জিনিষ হইতে পারে না। আত্মার দেশে বহু সাধক এই যৎ-শিলায় প্রতিমার মধ্যে পূর্ণচৈতন্যের পরম পুরুষের সাক্ষাৎ পাইয়াছেন। উক্ত প্রকার সাধকগণ্যদের নিকট সেই যৎ-শিলা আর তখন কেবল যৎ-শিলা মাত্র নহে—সে পাদ্যশয়ী মূর্ত্তিতে তখন ভিত্তী মূর্ত্তির স্পন্দন অনুভব হইতে থাকে, সে প্রতিমার ভজনাধিতে সত্য জ্ঞান প্রসূত হয় না হওয়ায় সে পূজা তামসিক হইতে পারে না। যদি যৎ-শিলায় মধ্যে কোন প্রকার চৈতন্যের সাক্ষাৎ পায় না বাহ্য, যে পূজা কেবল লোকচোর-সত্ত্ব অনুষ্ঠান মাত্র, তাহা আত্মার অন্তর্গত চৈতন্য ভাবকে প্রত্যক্ষ করিয়া তুলে না—তাহা অসত্যই তামসিক।

(সাত্ত্বিক কৰ্ম)

নিয়তঃ সঙ্গরহিতমরাগদেবতঃ কৃতম্ ।

অফলপ্ৰেপ্সুনা কৰ্ম যতঃ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩

অতএব অল্পবিষয়ক বা অল্প-ফলজনক বলিয়া অতি তুচ্ছ—এবম্বলত যে জ্ঞান—তাহা তামস বলিয়া কথিত ॥ ২২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—কোন কর্মের নিমিত্তে আসক্তি পূর্বক দৃষ্টি করে বিলা কারণে—সে তামসিক ।—দেহ-সরুত্ব অবিবেকী জীবের যে জ্ঞান—তাহাই তামসিক জ্ঞান । ইহাদের সব ধারণাই মন-মানা, তাহাতে যুক্তিও নাই বিচারেবও স্থান নাই, অথচ নিজের ধারণার প্রতি অটুট বিশ্বাস । তমসাজ্ঞের বুদ্ধি হইতেই এইরূপ জ্ঞানের উদয় হয় । শঙ্করা-চার্য্য দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন—যেমন জৈন ও বৌদ্ধ দার্শনিকদের মতে জীব দেহ-পরিমাণ মাত্র কিবা ঈশ্বর কাঠাধি পরিমাণ মাত্র ; এরূপ জ্ঞান অর্থোক্তিক এবং তাহা কখনও সত্য পদার্থকে প্রকাশ করিতে পারে না । হুতরাং উহার ফলও অতি তুচ্ছ, অর্থাৎ বাহ্যরা ঐ মতের অহবর্জন করে, তাহাদের পরমার্থ-সংস্কায় জ্ঞান অত্যন্ত স্বল্প । তামসিকেরা সত্য বস্তুকে দেখিতে পায় না, কারণ তমোক্তনের ধর্ম জ্ঞানকে আবরণই করিয়া থাকে ॥ ২২

— — —

অর্থঃ । অফলপ্ৰেপ্সুনা (ফলাভিলাষশূন্য ব্যক্তিকর্তৃক) সঙ্গরহিতঃ (অনাসক্তভাবে) অরাগদেবতঃ (অশুভাগ বা ধেষদ্বারা প্রেরিত না হইয়া) কৃতং (অহুষ্টিত) যৎ নিয়তঃ কৰ্ম (যে নিত্যকর্ম) তৎ সাত্ত্বিকম্ উচ্যতে (তাহা সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত হয়) ॥ ২৩

শ্রীধর । ইদানীং ত্রিবিধং কৰ্ম আহ—নিয়তমিতি জিহিঃ । নিয়তঃ—নিয়তভাৱে বিহিতম্ সঙ্গরহিতম্—অভিনিবেশ-শূন্য, অরাগদেবতঃ কৃতং—পুত্রাদি প্রীত্যা বা শক্রদেষণে বা যৎ কৃতং ন ভবতি । ফলং প্রাপ্তুমিচ্ছতীতিঃ ফলপ্ৰেপ্সুঃ তদ্বিলক্ষণেন নিদ্ধামেন কর্তা যৎ কৃতং কৰ্ম তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩

বঙ্গানুবাদ । [ইদানীং তিনটি শ্লোকে ত্রিবিধ কর্মের বিষয় বলিতেছেন]—যে কর্ম (১) নিয়ত অর্থাৎ নিত্য অহুষ্ঠেয় বলিয়া বিহিত, এবং (২) সঙ্গরহিত অর্থাৎ অভিনিবেশশূন্য, (৩) অরাগদেবতঃ কৃতং—অর্থাৎ পুত্রাদির প্রীতির নিমিত্ত বা শক্রর প্রতি বিবেক বশতঃ বাহ্য কৃত নয়, (৪) অফলপ্ৰেপ্সু—অর্থাৎ যে কর্তা ফল ইচ্ছা করেন না অর্থাৎ নিদ্ধাম কর্তা দ্বারা যে কর্ম কৃত, সেই কর্মকে সাত্ত্বিক বলিয়া জানিবে ॥ ২৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ইচ্ছারহিত হইলে—ফলাকাঙ্ক্ষারহিত ধ্যান ধারণা সমাধিপূর্বক ইচ্ছারহিত, হিংসারহিত—এমত যে কর্ম তাহার নাম সাত্ত্বিক কর্ম অর্থাৎ ক্রিয়া ক'রে যাওয়া ।—ভগবান এইবার ত্রিবিধ কর্মের কথা বলিতেছেন । কর্ম (১) প্রাণের চকল অবস্থায় যে ভাবে কৃত হয়, (২) প্রাণের কথঞ্চিৎ স্থিরতা হইলে এবং (৩) প্রাণের পূর্ণ স্থিতিতায় কর্ম যে ভাবে কৃত হয়—তাহারই কথা এখানে বলিতেছেন । (১) প্রথমাবস্থায় যখন শ্বাস ইড়া পিঙ্গলায় চলে, (২) ইড়া পিঙ্গলায় চলিয়াও সামান্যভাবে যখন সুস্থায় চলে, এবং (৩)

(রাজস কর্ম)

যত্নু কামেপ্সুনা কর্ম সাহস্মারেন বা পুনঃ ।

ক্রিয়তে বহলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্ ॥ ২৪

যখন পরিপূর্ণভাবে প্রাণ সুস্থায়মার্গে দ্বিগা চলে, তখন যে সকল কর্ম কৃত হয়—তাহাই সাত্ত্বিক কর্ম । শ্বাস কখন ইড়ায়, কখন পিঙ্গলায় এবং কহাচিৎ সুস্থায় বহিতে থাকে, এই শ্বাসের প্রতি যে সাধক লক্ষ্য রাখিতে শিখিয়াছেন, তিনি শ্বাসের প্রবাহের সহিত কর্মেবও সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক ভাবে লক্ষ্য করিতে পারিবেন । এমত তিনি সতর্কতা অবলম্বন করিয়া শ্বাসের গতিকে সুস্থায় যুখে চালাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন । সেইরূপ ভাবে চালাই-বার কৌশল এই—সাধনার অগ্রসর সাধক গুরুপদেশ মত সাধনা পথে চলিতে চলিতে যখন তাঁহার প্রাণ কঠ ও তদুর্কে থাকে, তখন তাঁহার মনে, প্রাণে, ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সাত্ত্বিকতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং মন উর্কে অবস্থিত হওয়ায়, সে মনে কোনপ্রকার কাম-সঙ্কল্প থাকে না, সূতরাং তৎকৃত কর্মেও কোন কামনার দাগ নাই । এই সকল সাধক পুরুষদের ক্রিয়া ব্যতীত অন্য কোন কর্মই থাকে না, এবং এতদ্বারায় ধারণা ধ্যানের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া একেবারে পূর্ণ কলাকাজ্জ্বলিত অবস্থায় তাহারা প্রবেশ করেন ; এই অবস্থাতেই যোগীর যোগসমাধি হইয়া থাকে । এ অবস্থা ব্যতীত অন্য কোন অবস্থাতেই সঙ্গরহিত হওয়া সম্ভব নহে । সঙ্গরহিত অবস্থায় যে কর্ম কৃত হয়, তাহাতে অভিনিবেশ হয় না, সূতরাং ধেষভাবও থাকিতে পারে না । আর “অমুক লোক ক্রিয়া করিয়া কত সামান্যিক উন্নতিলাভ করিয়াছে, অতএব আমিও খুব বেশী করিয়া ক্রিয়া করিব, বাহাতে তদ্বপেক্ষাও অধিক লাভবান হইতে পারিব”—এইরূপ ভাব লইয়া বাহ্য সাধনার চেষ্টাশীল হয়, তাহাদের সেই চেষ্টা ব্যর্থ, তাহারা ক্রিয়ার ফল যে শাস্তি—তাহা হইতে বঞ্চিত হয় । অথবা “আমার বেশ দর্শন হয় বা অন্তের মত আমার তেমন দর্শন হয় না, আমার ক্রিয়া ঠিক হইতেছে না”—ইত্যাদি ভাব লইয়া বাহ্য সাধনে প্রবৃত্ত হয়, তাহাবাই কর্মফলপ্ৰেপ্সু । বাহ্যের এ ভাব আর্দ্রো উদয় হয় না তাহাবাই “অফলপ্ৰেপ্সু” । এই “অফলপ্ৰেপ্সু” ভাব উত্তরোত্তর বর্ধিত হইয়া যোগীকে পূর্ণ নিদ্ধাম করিয়া তুলে, তখন তাঁহার প্রাণের গতিও পূর্ণভাবে সুস্থায় মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে থাকে । কিন্তু প্রাণকর্ম বহু পরিমাণে করিতে না পারিলে এরূপ অবস্থালাভও সহজ হয় না, তাই দৃঢ়ভাসী সাধকের ইহা নিয়ত-কর্ম বা নিত্য অহুষ্ঠেয় হইয়া থাকে । তাহারই ফলে সাধকের এই ক্রিয়া আপনাপনি চলিতে থাকে এবং অবিদ্যায় ভাবে চলিতে থাকে । শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রতি বাহার স্থির লক্ষ্য থাকে, তাহার মন অতি সহজে স্থিরভাবে ধারণ করে এবং অতি অনায়াসে উহা সুস্থায়মার্গে পরিচালিত হইয়া থাকে । এই অবস্থায় কৃত কর্মই সাত্ত্বিক কর্ম ॥ ২৩

— — —

অর্থঃ । তু (কিন্তু) কামেপ্সুনা (ফলকামী ব্যক্তিকর্তৃক) সাহস্মারেন বা (অথবা “আমি কর্তা” এইরূপ অহঙ্কারযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক) পুনঃ বহলায়াসং (এবং বহু ক্রেশ ও

(সাত্ত্বিক কৰ্ত্তা)

মুক্তসঙ্গোহনহংবাদী শ্রুত্যাংসাহসমবিতঃ ।

সিদ্ধ্যসিদ্ধোনিবিকারঃ কৰ্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥ ২৬

অর্থঃ। মুক্তসঙ্গঃ (ফলে আসক্তিশূন্য) অনহংবাদী (“আমি কৰ্ত্তা” এইরূপ ভাব বাহার নাই) শ্রুত্যাংসাহসমবিতঃ (ধৈর্য ও উৎসাহযুক্ত) সিদ্ধ্যসিদ্ধোঃ নির্বিকারঃ (সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে হর্ষবিষাদাদি-বিকারশূন্য) কৰ্ত্তা সাত্ত্বিকঃ উচ্যতে (কৰ্ত্তা সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত হন) ॥ ২৬

শ্রীধরঃ। কৰ্ত্তারঃ ত্রিবিধমাহ—মুক্তসঙ্গ ইতি ত্রিভিঃ। মুক্তসঙ্গঃ—ত্যাগতিনিবেশঃ অনহংবাদী—গর্ভোক্তিরহিতঃ, শ্রুতিঃ—ধৈর্য্যম্, উৎসাহঃ—উদ্যমঃ, তাত্পর্য্যঃ সমবিতঃ—সংযুক্তঃ। আরক্কত কর্ণণঃ সিদ্ধৌ অসিদ্ধৌ চ নির্বিকারঃ—হর্ষ-বিষাদশূন্যঃ। এবমুতঃ কৰ্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥ ২৬

বঙ্গানুবাদ। [সাত্ত্বিকাদি ত্রিবিধ কৰ্ত্তার বিষয় তিনটি স্লোকে বলিতেছেন]—(১) মুক্তসঙ্গ অর্থাৎ ত্যাগতিনিবেশ, আসক্তি বা ফলসন্ধানশূন্য, (২) অনহংবাদী অর্থাৎ গর্ভোক্তি-রহিত, (৩) ধৈর্য্য এবং (৪) উদ্যমযুক্ত বা অধ্যবসায়শীল (৫) এবং আরক্ক কর্ণণের সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে হর্ষবিষাদশূন্য—এবমুত কৰ্ত্তাকে সাত্ত্বিক বলা যায় ॥ ২৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ইচ্ছারহিত ব্রহ্ম করিতেছেন ক্রিয়ার পর স্থিতি সর্বদা ভিতরে ভিতরে স্থির থাকে। উৎসাহ—উর্দ্ধের সহিত অর্থাৎ কূটস্থিতে সর্বদা লেগে থাকে, কোন একটা বিষয় আপনা আপনি দেখিতে পাইলে অথবা হইয়া উঠিল কিম্বা হইলই না—এ দুয়েতেই ক্রিয়ার পর অবস্থায় থেকে স্থির—কোন মনের বিকার নাই—এমত কৰ্ত্তার নাম সাত্ত্বিক কৰ্ত্তা।—সাত্ত্বিক কৰ্ত্তার বিষয় বলিতেছেন। তিনি স্বয়ং ইচ্ছারহিত, বাহ্য কিছু হয়, তাহা ব্রহ্মের ইচ্ছাতেই হয়, ভিতরে ভিতরে সর্বদা তাঁহার এইরূপ অক্ষল ভাব থাকে, ক্রিয়া করিবার সময় মনে কোন সঙ্কল্পের উদয় হয় না। প্রত্যাহ নিয়মিত ভাবে অধিকক্ষণ ক্রিয়াও করিয়া থাকেন এবং ক্রিয়ার পরে স্থিতিও বেশ হয়, অল্প কোন সঙ্কল্প মনে উঠে না, মন কেবল চক্রে চক্রে উঠা নামা করে। এতদিন ধরিয়া ক্রিয়া করিতেছি বা এতক্ষণ ক্রিয়া করি, তবুও তেমন অশুভব হইতেছে কে?—ইত্যাদি চিন্তা তাঁহার মনে আসে না, গুরুর আজ্ঞা পালন করিয়া চলিতেছি—এই মনে করিয়া প্রত্যাহ স্থিরভাবে ধৈর্য্যযুক্ত ও উৎসাহযুক্ত হইয়া ক্রিয়া করিয়া যান, ক্রিয়া করিয়া কিছু অশুভব হইল বা হইল না, মন স্থির হইল বা তেমন হইল না—একজা যিনি ব্যস্ত হইয়া পড়েন না বা উৎসাহ উত্তম কমিয়া যায় না—এরূপ কৰ্ত্তাই সাত্ত্বিক কৰ্ত্তা। উক্তরূপে যাহারা ক্রিয়া করেন, তাঁহাদের ক্রিয়ার পর-অবস্থা বা সমাধি গভীরতর ভাবে উদ্ভিত না হইলেও ক্রিয়ার পরে স্থিতি কিছু কিছু করিয়া হয়-ই, এবং ক্রিয়ার নেশাও বেশ কমিয়া আসে, মনটা যেন কোন অনশুভবনীয় বিষয়ে আটকাইয়া যায়, বাহিরের বিষয় তেমন মনে পড়ে না, মনটা অনেক ক্ষণ বৃত্তিরহিত অবস্থায় স্থির হইয়া থাকে। এই অবস্থা পর্য্যন্ত হইলে ক্রমে মনটা কূটস্থেতে-সর্বদা লাগিয়া থাকে। সেই সময় তিনি কূটস্থের মধ্যে কত কি দেখিতে পান, অথচ দেখিব

(রাজস কৰ্ত্তা)

রাগী কর্ণফলপ্রেম্পলুর্কৌ হিংসাত্মকোহশুচিঃ ।

হর্ষশোকান্বিতঃ কৰ্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ২৭

বলিয়া কোন কামনা করেন না। দেখিতে না পাইলেও মনটা বিবাদের বা নিগ্রান্ধে ভরিয়া যায় না বা তজ্জন্ম মনও নিকটম হইয়া সাধনায় শিথিলতা প্রকাশ করে না। মন দ্বিগ্না ক্রিয়া করায় ক্রিয়ার পর-অবস্থা বা স্থিরতার বেশ উদয় হয়, বুদ্ধিও তাঁহার সেইজন্য খুব স্থির, কোন কিছুতেই উৎকল বা বিষম হন না। হয়তো একটা কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য অত্যন্ত পরিশ্রম ও অর্ধব্যয় করিলেন, কিন্তু কর্ণটি সফল হইল না—একজা তাঁহার চিন্তে অপ্রসন্ন ভাব ফুটিয়া উঠে না, বরং সর্বদা তাঁহার মুখে হাসিটি লাগিয়া থাকে। চেঁচা ব্যর্থ হইল তাহা দ্বিগ্না দ্বিগ্নের জন্য চিন্তে বিবাদের দাগ পড়ে না—ইহারই নাম মুক্তসঙ্গ। তাঁহাদের অহংভাব থাকে না, শ্রুত্যাং কর্ণ করিয়া সফলতা লাভ করিলেও চিন্তে কোন অহঙ্কার বা বিকার আসে না, এইরূপ অনহংবাদী পুরুষেরা সাধন করিয়া কখনও কিছু অশুভব করিলেন কিন্তু সে অশুভব বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না—একজাও বিষম হইয়া পড়েন না। কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া কেবল গুরুর উপদেশ মত সাধন করিয়া চলেন এবং বহুকর্ণের মধ্যে আপনাকে নিযুক্ত রাখিয়াও কূটস্থে লক্ষ্য রাখিতে কখনও তাঁহার ভুল হয় না। কিছু ফল লাভ হউক বা না হউক সাধনায় কোন দিন তাঁহার অপ্রযুক্তি আসে না, এইরূপ প্রমাদশূন্য ব্যক্তিই সাত্ত্বিক ক্রিয়াবান ॥ ২৬

অর্থঃ। রাগী (বাহ্য রাগ অর্থাৎ আসক্তি আছে), কর্ণফল-প্রেম্পঃ (কর্ণ ফল প্রার্থনা যে করে) লুর্কঃ (পঞ্চদশে বাহার ঢুকা আছে), হিংসাত্মকঃ (পরকে গীড়ন করাই বাহার স্বভাব), অশুচিঃ (বাহু এবং অন্তর শৌচাচার বর্জিত), হর্ষ-শোকান্বিতঃ কৰ্ত্তা (হর্ষ ও শোকযুক্ত কৰ্ত্তা) রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ (রাজস বলিয়া উক্ত হয়) ॥ ২৭

শ্রীধরঃ। রাজসঃ কৰ্ত্তারমাহ—রাগীতি। রাগী—পুত্রাদিষু প্রীতিমান্, কর্ণফলপ্রেম্পঃ—কর্ণফলকামী, লুর্কঃ—পরত্যাগীলাবী, হিংসাত্মকঃ—মারক্ণভাবঃ, অশুচিঃ—বিহিত-শৌচশূন্য, লাভালাভয়োঃ হর্ষ-শোকাত্যাং সমবিতঃ কৰ্ত্তা রাজসঃ ॥ ২৭

বঙ্গানুবাদ। [রাজস কৰ্ত্তার বিষয় বলিতেছেন]—রাগী অর্থাৎ পুত্রাদিতে প্রীতিমান, কর্ণফলকামী, পরত্যাগীলাবী, মারক্ণভাব, বিহিত শৌচশূন্য, লাভালাভে হর্ষশোকযুক্ত—এইরূপ কৰ্ত্তা রাজস ॥ ২৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ইচ্ছার সহিত ফলাকাঙ্ক্ষা, লোভ, হিংসা, অশুচি, অস্বা, এবং দুঃখী, এমন যে কৰ্ত্তা তিনি রাজস কৰ্ত্তা।—বাহ্যের অত্যধিক বিষয়াধিতে প্রীতি, তাহা বা সর্বদা পুত্রকন্যাদির লালন পালনে ব্যতিব্যস্ত এবং বিষয়লাভে সজ্জ থাকে, শ্রুত্যাং নিয়মিত ভাবে ক্রিয়ায় সাধনে তৎপর নহে। যেটুকু ক্রিয়া করে, তাহাতে ফললাভের আকাঙ্ক্ষাই থাকে অর্থাৎ এ কাজ করিলে শরীর ভাল থাকিবে, কিংবা সিদ্ধ গুরু হয়তো তাঁহার আশীর্বাদে অনেক বিপত্তির হাত হইতে জ্ঞান পাওয়া যাইবে, তাঁহার সুপারিশে কিছু

(বুদ্ধির ভেদ ত্রিবিধ)

বুদ্ধিভেদঃ ত্রিবিধঃ গুণতন্ত্রিবিধঃ শৃণু ।

প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ভেদেন ধনঞ্জয় ॥ ২৯

উচিত কি অসুচিত এই চিন্তা করিতে করিতে দশ বৎসর কাটিয়া গেল তবু মন নিঃসংশয়ে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিল না—এইরূপে একদিন অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়িল, আর সব শেষ হইয়া গেল—এই সব কষ্টারাই তামস কৰ্ত্তা ॥ ২৮ শেষ বুদ্ধি আসিয়া পড়িল, আর সব শেষ হইয়া গেল—এই সব কষ্টারাই তামস কৰ্ত্তা ॥ ২৮

অমর । ধনঞ্জয় (হে ধনঞ্জয়) ! বুদ্ধিঃ ধ্রুতঃ চ (বুদ্ধির এবং ধ্রুতির) গুণতঃ এব (গুণাত্ম্যাবেই) ত্রিবিধঃ ভেদঃ (তিন প্রকার ভেদ)। পৃথক্ভেদে (পৃথক্ পৃথক্ভেদে) অশেষেণ । সমগ্ররূপে প্রোচ্যমানঃ (যাহা বলা হইবে) শৃণু (তাহা শ্রবণ কর) ॥ ২৯

শ্রীধর । ইদানীং বুদ্ধিঃ ধ্রুতঃ ত্রিবিধ্যং প্রতিজ্ঞানীতে—বুদ্ধিভেদমিতি ॥ স্পষ্টোক্তং ॥ ২৯

বঙ্গানুবাদ । অতঃপূর্বে বুদ্ধি ও ধ্রুতির ত্রিবিধতা বিষয়ে বলিবার প্রতিজ্ঞা করিতেছেন । শ্রোতব্যং অর্থঃ স্পষ্টঃ [হে ধনঞ্জয়, সর্বত্রিবিধ-ভেদ বশতঃ বুদ্ধি ও ধ্রুতির যে তিন প্রকার ভেদ—তাহা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে স্পষ্টরূপে বলিতেছি— শ্রবণ কর] ॥ ২৯

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—বুদ্ধি, ধ্রুতি তিন প্রকার—তাহার গুণ বলি পৃথক্ পৃথক্ করে—সর্বাঙ্গি গুণ-ভেদে বুদ্ধিরও ত্রিবিধ ভেদ হয়, সেই কথাই ভগবান অশেষরূপে অর্থাৎ কিছু বাধ না দিয়া এবং প্রত্যেকটিকে পৃথক্ ভাবে বলিবে বলিয়া আশ্বাস দিতেছেন । জীব বা আত্মাকে আমরা বুদ্ধি—বুদ্ধির ভিত্তির দিয়া । যদিও আত্মাকে ইহাদের বিধাব স্পর্শ করিতে পারে না, তবুও অসিদ্ধাবস্থায় অন্তঃকরণের ধর্মই জীবের আরোপিত হয় এবং তদ্ব্যবহার করিতে পারে না, তবুও অসিদ্ধাবস্থায় অন্তঃকরণের ধর্মই জীবের আরোপিত হয় এবং তদ্ব্যবহার করিতে পারে না, তাই যেন ভগবান বলিতেছেন—আত্মার কণ্ঠবিহীন নিষ্ক্রিয় ভাব জীবকে বিচার করা হয় । তাই যেন ভগবান বলিতেছেন—আত্মার কণ্ঠবিহীন নিষ্ক্রিয় ভাব জীবকে বিচার করা হয় । তাই যেন ভগবান বলিতেছেন—আত্মার কণ্ঠবিহীন নিষ্ক্রিয় ভাব জীবকে বিচার করা হয় । তাই যেন ভগবান বলিতেছেন—আত্মার কণ্ঠবিহীন নিষ্ক্রিয় ভাব জীবকে বিচার করা হয় ।

(সাধিক বুদ্ধি)

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে ।

বন্ধঃ মোক্ষঃ চ বা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাধ্বিকী ॥ ৩০

বলিয়া কল্পনা করা হইয়া থাকে । সুতরাং বুদ্ধি যদি রাগ দ্বেষশূন্য হইয়া বিশুদ্ধ হয়, তবে আত্মাও তখন গুণ-মলশূন্য হইয়া প্রকাশিত হইবেন । বুদ্ধিতে গুণ-মল না থাকিলে, তখন সেই বুদ্ধিও আত্মকারী হইয়া যায় । গুণ-মলশূন্য হইলেই মনোবুদ্ধির তদ্বৎ শান্ত হইয়া আত্মা নিজ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন । চৈতন্যময় জ্ঞানই আত্মা এই আত্মাই যাবতীয় বস্তুকে প্রকাশ করেন । জ্ঞানই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়রূপে প্রকাশিত হ'ন ! অজ্ঞানের দ্বারা এই তিনের পৃথক্ভ উপলব্ধি হইয়া পাকে । যখন জ্ঞাতাকে জ্ঞেয় হইতে পৃথক্ভে জ্ঞানী বাইবে, তখন জ্ঞেয় বস্তুও দাঁতের দাঁতের অন্তর হইয়া বাইবে । জ্ঞেয় বস্তু না থাকিলে জ্ঞাতার দৃশ্যবস্তুও থাকিবে না, তখন জ্ঞাতা আর কাহারও সাক্ষীরূপে না থাকিয়া কেবল সম্যাক্রূপে স্থিতিলাভ করিবেন । ইহাই জ্ঞাতার স্বরূপে অবস্থান, যাহা ক্রিয়া পর অবস্থায় হইয়া পাকে ॥ ২৯

অমর । পার্থ ! (হে পার্থ) বা বুদ্ধিঃ (যে বুদ্ধি) প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ (কর্ম্ম প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি) কার্য্যাকার্য্যে (কর্তব্য ও অকর্তব্য) ভয়াভয়ে (ভয় ও অভয়) বন্ধঃ মোক্ষঃ চ বেত্তি (বন্ধ ও মোক্ষকে বিধিত হয়—অর্থাৎ যে বুদ্ধির দ্বারা কিসে বন্ধন হইবে বা কিসে মুক্তি হইবে, জানা যায়) সা সাধ্বিকী (সেই বুদ্ধি—সাধ্বিকী বুদ্ধি) ॥ ৩০

শ্রীধর । তত্র বুদ্ধিঃ ত্রৈবিধ্যমাহ—প্রবৃত্তিং ইতি ত্রিভিঃ । প্রবৃত্তিং ধর্ম্মে, নিবৃত্তিং অধর্ম্মে । সন্ন্যাস ধর্মে কালে চ যৎ কার্য্যম্ অকার্য্যকং । ভয়াভয়ে—কার্য্যাকার্য্য-নির্মিতৌ অর্থ্যমর্থৌ । কথং বন্ধঃ মোক্ষঃ ইতি বা বুদ্ধিঃ—অন্তঃকরণং বেত্তি, সা সাধ্বিকী । যদ্য পুমান্ দেহীতি বক্তব্যে করণে কর্তব্যোপচায়ঃ, কাষ্ঠানি পচন্তি ইতি বৎ ॥ ৩০

বঙ্গানুবাদ । [এ বিষয়ে বুদ্ধির ত্রৈবিধ্য তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন]—১ম প্রবৃত্তি এবং অধর্ম্মে নিবৃত্তি এবং যে দেশে যে কালে যাহা কর্তব্য বা অকর্তব্য আর ভয়াভয়ে অর্থাৎ কার্য্য ও অকার্য্য হেতু অর্থ এবং অনর্থ এবং কিরূপে বন্ধন হয় বা কিরূপে মোক্ষ হয়—এই সকলকে যে বুদ্ধি অর্থাৎ অন্তঃকরণ জ্ঞানে, সেই বুদ্ধি সাধ্বিকী । এই শ্লোকে যে বুদ্ধি দ্বারা পুরুষ জ্ঞানে বলা উচিত ছিল, কিন্তু করণে কর্তব্যোপোপ লেদপ হয়, (যেমন কাষ্ঠসকল পাক করিতেছে,) তজপ এখানে করণরূপ বুদ্ধিতে কর্তব্যোপোপ হইয়াছে ॥ ৩০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এই কর্ম্মেতে প্রকৃষ্টরূপে থাকা উচিত অর্থাৎ ক্রিয়া; ক্রিয়া না করে থাকা অসুচিত ক্রিয়াই কার্য্য—না করা অকার্য্য; ক্রিয়া না করিলে ভয় ; ক্রিয়া করিলে ভয় নাই—ক্রিয়া না করিলে বন্ধন, ক্রিয়া করিলে মোক্ষ—এমত যে বুদ্ধি তাহা ক্রিয়া করিয়াই হয় অর্থাৎ সুশাসিত থাকিলে সাধ্বিক বুদ্ধি হয়।—সাধ্বিকী বুদ্ধি কিরূপ ? তাহাও ভগবান বলিতেছেন । মন-তত্ত্ব লাভ করিয়া আমরা পুরুষ মত যাহা ইচ্ছা তাহাই করিব—এরূপ কখনই সম্ভব

(তামসী বুদ্ধি)

অধর্ম্যে ধর্ম্যমিতি বা মন্যতে তমসাবৃত।

সর্বার্থান বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধি সা পার্থ তামসী ॥৩২

অনুব্র। পার্থ! (হে পার্থ) যা (যে বুদ্ধি) অধর্ম্যে (অধর্মকে) ধর্ম্য ইতি মন্ততে (ধর্ম বলিয়া মনে করে) চ (এবং) সর্বার্থান্ (সকল বিষয়ই) বিপরীতান্ (বিপরীত) [বলিয়া মনে করে] তমসা আবৃত। (অজ্ঞান আচ্ছন্ন) সা বুদ্ধিঃ (সেই বুদ্ধি) তামসী (তামসী বুদ্ধি) ॥ ৩২

শ্রীধর। তামসীঃ বুদ্ধিমাং—অধর্ম্যমিতি। বিপরীত-গ্রাহিণী বুদ্ধি তামসীত্যাং। বুদ্ধিঃ—অন্তঃকরণং পূর্বোক্তং। জ্ঞানং তু তদ্ব্যভিঃ। প্রতিবিশি তদ্ব্যভিঃ। যদা—অন্তঃকরণম্ অধর্ম্যে বুদ্ধিরপি অধাবসায়লক্ষণা বৃত্তিরেব। ইচ্ছাধেবাদীনাং তদ্ব্যভিঃ বহুভেদেপি ধর্ম্যধর্ম-ভয়াভয়সাধনদ্বয়েন প্রাণান্তাং এতাসাং ত্রৈবিধ্যম্ উক্তম্। উপলক্ষণং চ তৎ অতাসাম্ ॥ ৩২

বঙ্গানুবাদ [তামসী বুদ্ধি কি তাহাই বলিতেছেন]—বিপরীতগ্রাহিণী বুদ্ধিই তামসী বুদ্ধি। পূর্বোক্ত অন্তঃকরণই বুদ্ধি, জ্ঞান কিন্তু তাহার বৃত্তি, বৃত্তিও তাহার বৃত্তিই। অথবা অন্তঃকরণকণ ধর্ম্য বুদ্ধি ও অধ্যবসায়লক্ষণই বৃত্তি। ইচ্ছাধেবাদি অন্তঃকরণ-বৃত্তি-সমূহের বহুত থাকিলেও ধর্ম্যধর্ম-ভয়াভয়-সাধনরূপ ব্যাধির প্রাধাত্যহেতু ইহাদের ত্রৈবিধ্য কথিত হইল। ইহা অত্যন্ত বৃত্তি সকলেরও উপলক্ষণ ॥ ৩২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ক্রিয়ানা করাটাই ধর্ম—সকল বস্তুতে দৃষ্টি আর ত্রুষ্ণা যিনি সকল বস্তুতে রয়েছে তাকে দৃষ্টি করে না—এরূপ যে বুদ্ধি তাহাকে তামসিক বুদ্ধি কহে—যে বুদ্ধি সমস্ত বিষয়কে বিপরীত ভাবে গ্রহণ করায় সেই বুদ্ধি তামসী-বুদ্ধি। তামসী বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তির ধর্মকে অধর্ম ও অধর্মকে ধর্ম বলিয়া মনে হয়। এই বুদ্ধির নিকট দুঃখপ্রদ বস্তুকে সুখপ্রদ বলিয়া এবং যাহা অসত্য এবং অনিত্য, তাহাকে সত্য ও নিত্য বলিয়া মনে হয়, এবং যাহা ধর্মার্থই সত্য ও নিত্য তাহাকেই অসত্য অনিত্য বলিয়া মনে হয়। আমাদের এই দেহটি কিরূপ অনিত্য—কবে আছে, কবে নাই; অথচ এই দেহকে নিত্য মনে করিয়া রক্ষা করিতে আশ্রয়-বস্ত্র কবিত্তে আমরা কত ব্যস্ত—যেন উহা চিরকাল থাকিবে। তামসী বুদ্ধি হেতুই ধর্ম প্রণীত শাস্ত্রকে অবজ্ঞা করিয়া থাকি এবং শাস্ত্রকথিত কর্ম ও আচার সমূহকে অন্ধসংস্কার বলিয়া উপহাস করিয়া থাকি। কদম্ব ও কদম্ব গ্রহণই অকাল মৃত্যুর কারণ—এই সকল শাস্ত্রবাক্যের প্রতি বিজ্ঞপ করিয়া থাকি, এবং শাস্ত্রকথিত সদাচার বর্জন করিয়া আশ্রয়লাভ করিয়া থাকি। প্রেয়ঃসাধনকে ত্যাগ করিয়া প্রেয়ঃসাধন লইয়া জীবন অতিবাহিত করি। ক্রিয়া করা যাহা পবন ধর্ম এবং প্রকৃত সুখশান্তি লাভের উপায়, তাহাকে তামসিক বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি অহঙ্কার ও তজ্জতা-বশতঃ উপেক্ষা করিয়া যোগাভ্যাসাদির শিক্ষা করে এবং আপনার ও অপরের কল্যাণের পথে কষ্টকরোপ করিয়া আপনাকে বুদ্ধিমান মনে করে; এবং যিনি সর্বত্র রহিয়াছেন, আমার অন্তরে বাহিরে যিনি বিরাজমান, যিনি নিত্য পরমপদার্থ; বিবেকাক্ষতা হেতু সেই আত্মাকে বুঝিবার বা জানিবার চেষ্টা না করিয়া বাহ্য অনিত্য ও কষ্টদায়ক—

(সাত্বিকী ধৃতি)

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃ-প্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।

যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্বিকী ॥ ৩৩

সেই সকল ভোগান্ত্রব্যাদির প্রতি লোলুপ দৃষ্টি করিয়া থাকে এবং তাহা পাইলে আপনাকে ভাগ্যবান এবং না পাইলে আপনাকে দুর্ভাগ্য বলিয়া মনে করে। এ সমস্ত বিপরীত ভাবই তামসী বুদ্ধির লক্ষণ, কলিযুগে এইরূপ তামসী বুদ্ধির প্রভাবই অধিক হইয়া থাকে ॥ ৩২—

অনুব্র। পার্থ! (হে পার্থ) যোগেন (যোগবল প্রভাবে, একাগ্রতা বশতঃ) অব্যভি-চারিণ্যা (বিষয়াস্তর ধারণা ব্যতিরেকে) যয়া ধৃত্যা (যে ধৃতির দ্বারা) মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়-ক্রিয়াঃ (মনঃপ্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সমূহ, ধারয়তে (নিয়মিত হয়) সা ধৃতিঃ সাত্বিকী (সেই ধৃতি সাত্বিকী ধৃতি) ॥ ৩৩

শ্রীধর। ইদানীং ধৃতঃ ত্রৈবিধ্যমাং—ধৃত্যভিচারিণিঃ। যোগেন—চিত্তৈক্যাগ্ৰেণ হেতুনা, অব্যভিচারিণ্যা—বিষয়াস্তরম্ অধারয়ন্ত্যা, যয়া ধৃত্যা মনসঃ প্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াং চ ক্রিয়া ধারয়তে—নিযুক্তিতি, সা ধৃতিঃ সাত্বিকী ॥ ৩৩

* ভক্ত তু সদা স তাত্‌হা রানচরিতমানসে কলিযুগে এত মোক্ষ লোকের ধর্ম্য চিত্ত অন্ধন করিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

কলিমল এসে বর্ম সব গুপ্ত ভয়ে সদগ্রহ।	দগ্ধনহ নিজমতি কলিকরি প্রদট করে বহুপহ।
ওয়ে লোক সব মোহনস লোভগ্রসে গুজকর্ম।	হুহু ইন্দ্রিয়ান হুহুনিদি কহউ কছুক কলিধর্ম।
বদনধর্ম মতি আগ্রম চারী।	শ্রুতি-বিরোধ রত সব নর নারী।
বিল শ্রুতিবেচক ভূপ প্রজানন।	কোউ নহি মান্ নিগর্ম-অনুগমন।
মাগস নোই জা কহি জোই ভাব।	পতিত নোই জো গাল-বজাব।
মিথ্যারস্ত দস্তবস্ত জোই।	তা, কহি সন্ত কহি সব জোই।
জোই সন্ন্যাস জো পর-ধনহাণী।	জো কর দস্ত সো বড আচারী।
জো কহি বৃষ্ট মসধনী জানা।	কলিযুগ নোই গুণবস্ত বখানা।
নিরাচার জো শ্রুতিপথ ত্যাগী।	কলিযুগ নোই জানা বৈবাগী।
জো নব অক জো বিদ্যা।	সোই তাগস লনিক বলিকানা।
অহস্ত বেগ ভূষণ ধরে ভজ্ঞভজ্ঞ জো বহি।	তেই তাগস তেই নিদ্র নর পুজা তে কলিগ নাহি।
নাহিবিদস নর সকল গোসাই।	নাহি নতমরকত কী নারী।
হুহু দ্বিনহ উপদেশহি জানা।	মেলি জনেউ লেহি কু নামা।
সব নব কামলোভ-রত—জোই।	বেদ শ্রি গুরু সন্ত বিরোধী।
গুণমন্দির হুহু পতি ত্যাগী।	ভজহি নারী পর-কষ অভাগী।

৩৩ দিব দিব অগ কর লেখ। এক নহুনি এক নহি দেখ।
ই ই শ্রিয়ান নোব ন ধর্ম। সো গুণ যোগ মনক মং পরধর্ম।
মাতু পত্না বাগদনহ বোলাবহি। উবন ভরই সোই ধর্ম সিধাবহি।
অন্ধমান বিমু নাহনর কহি ন দুসরি বাত। কোড়ি কারণ লোভন করহি বিপ্রওক-যাত।

(রাজসিক ধৃত)

যয়া তু ধর্মকামার্থান্ ধৃত্য ধারয়তেহর্জুন।

প্রসঙ্গেন ফলাকাজ্ঞী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩৪

বঙ্গানুবাদ। [অধুনা তিনটি শ্লোকে ধৃতির ত্রিবিধতা বলিতেছেন] চিত্তের একাগ্রতা হেতু বিষয়ান্তরের ধারণা না করিয়া যে ধৃতির দ্বারা মন প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া-সমূহকে নিয়মিত বা নিবোধ করা যায়, সেই ধৃতি রাজসী ॥ ৩৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ক্রিয়ার পর-অবস্থায় আপনা আপনি যখন ধারণা হ'লে মনের এবং প্রাণবায়ুর এবং দশ ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান সমুদয় রহিত হ'য়ে যাবে—ধারণা ধ্যান সমাধি পূর্বক স্থির—তখন আপনা আপনি থাকিবে, অজ্ঞানকে আসক্তিপূর্বক দৃষ্টি তখন হইবে না—এ রকম ধারণা, এরই নাম সাত্ত্বিক ধারণা।—“দ্রিয়তে অনয়া ইতি ধৃতিঃ ইতি যত্র বিশেষঃ”—(আনন্দগিরি), যে যত্র-বিশেষদ্বারা মন, প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়-সমূহের ক্রিয়া নিয়মিত হয়। এই ধারণা যোগ ধারণা হওয়া চাই, সমাধিসাধন ব্যতীত ইহা হয় না। সমাধিসাধন ব্যতীত ধারণা হইলে তাহা অসিদ্ধ। সুতরাং যে ধারণা প্রাণায়াম করিতে করিতে প্রাণ বায়ুর নিবোধ হেতু মন ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া রুদ্ধ হইয়া যায়, তখন অল্প দিকে দৃষ্টি থাকে না, আপনাতে আপনি থাকে, তাহাই সাত্ত্বিক ধৃতি।

সাধারণতঃ আড়াই দণ্ড ইড়ায়, আড়াই দণ্ড পিঙ্গলায় ও সামান্য দণ্ড সূর্যায় শাস বহে। ইড়াপিঙ্গলায় ক্রিয়া দ্বারা সূর্যায় শাসের গতি হয়, তখন ক্রিয়ার পর-অবস্থা বা স্থিরত্ব পদ লাভ হয়। এইরূপ স্থির হইলেই সমস্ত ইন্দ্রিয়-মনের বিষয়-গমন নিবৃত্তি হয়। ইহাই পাপশূন্য অবস্থা। ক্রিয়া করিতে করিতে মনের চাক্ষুশ্য ক্ষয়ের সহিত পাপেরও ক্ষয় হইয়া থাকে, তখন মন মনেতেই লীন হইয়া যায়। তদ্রূপ সম, সাধকও সম-ভাবাপন্ন হইয়া যান। তখন আপনার দৃষ্টিকে ও দৃষ্টকে দেবতাকে অহুতব করা যায়, পরমানন্দের অবস্থা। সাধকের তখন অল্প কোন আশ্রয় বা অবলম্বন থাকে না। এইরূপ নিরাবলম্ব স্থিতিই ক্রিয়ার পর-অবস্থার হয়। এই স্থিতি দ্বারা ই যোগী বা মণিবন্ধের পর যে পদ তাহা লাভ করেন, ইহাই বিমূঢ় পরমপদ। শরীরেতে সর্বদাই বায়ু চলিতেছে, সেই বায়ু দ্বারা ক্রিয়া করিলে সাধক পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পবিত্র হন। এই স্থির পদই ঈশ্বর; তিনি প্রাণস্বরূপে দ্বয়ে রহিয়াছেন। এই স্থির ভাব যখন বিস্তৃত হয়, তখনই মহৎ পদ লাভ হয়, তখনই ঈশ্বরের মহিমা সাধক অবগত হইতে থাকেন। এই স্থিতিপদ যত বাড়িবে, তত সাত্ত্বিক ধৃতি হইতে থাকিবে। তখন মন বিনাবলম্বনে স্থির হইবে, বিনা চেষ্টায় বা বিনাবরোধে বায়ু স্থির হইয়া যাইবে এবং কোন বিষয়ে লক্ষ না থাকিলেও দৃষ্টি স্থির হইয়া যাইবে। ইহারই অপর নাম—খেচরী সিদ্ধি ॥ ৩৩

অর্থঃ। অর্জুন! (হে অর্জুন,) যয়া ধৃত্য (যে ধৃতির দ্বারা) ধর্মকামার্থান্ (ধর্ম, অর্থ ও কাম সকল) ধারয়তে (ধারণা করিয়া থাকে অর্থাৎ ত্যাগ করে না) তু (কিন্তু) প্রসঙ্গেন (কর্তৃত্বাদি-অভিনিবেশ বশতঃ) ফলাকাজ্ঞী (ফলাকাজ্ঞী হয়) পার্থ। (হে পার্থ) সা ধৃতিঃ রাজসী (সেই ধৃতি রাজসী) ॥ ৩৪

(তামসিক ধৃতি)

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।

ন বিমুক্তিঃ দুর্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩৫

শ্রীধর। রাজসী ধৃতিমাহ—যয়া তু ইতি। যয়া তু ধৃত্য ধর্মকামার্থান্ প্রাধিক্রমেণ ধারয়তে—ন বিমুক্তিঃ, তৎপ্রসঙ্গেন ফলাকাজ্ঞী চ ভবতি সা রাজসী ধৃতিঃ ॥ ৩৪

বঙ্গানুবাদ। [রাজসী ধৃতির কথা বলিতেছেন] যে ধৃতি দ্বারা ধর্ম, অর্থ ও কাম প্রাধান্য বলিয়া অবধারিত হয় অর্থাৎ তাহা ত্যাগ করে না কিন্তু তৎপ্রসঙ্গ-ক্রমে ফলাকাজ্ঞীও হয়—সেই ধৃতি রাজসী ॥ ৩৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ধর্ম—ফলাকাজ্ঞার সহিত কন্দ এবং অন্তঃসব কর্ম ফলাকাজ্ঞার সহিত যে ধারণা সে রাজসিক ধারণা।—ধর্ম, অর্থ কাম লইয়াই বাহ্যিক মন, মোক্ষ চিন্তা বাহ্যিকের মনে স্থান পায় না, ফলাকাজ্ঞাই বাহ্যিককে কর্মসাধনে প্রবৃত্ত করে; তাহারা মন-ইন্দ্রিয় দ্বারা কেবল ভোগস্বপ্নের কথাই আলোচনা করে, তাহাদের ধৃতিই রাজসিক ধৃতি। সাধনাদি অভিযাস করিলেও ইহাদের চিত্ত বাসনারহিত হইতে চাহে না, সাধনার দ্বারা ফল কখন কি ফল লাভ হইবে—এই চিন্তাতেই মগ্ন থাকে। ক্রিয়া করিয়া একটু স্থির হইলে, সে সময়েও ফলাকাজ্ঞা করে এবং প্রসঙ্গক্রমে যদি ঐরূপ চিন্তায় কামনা সিদ্ধ হয়, তবে তাহা খুব মনে করিয়া রাখে—যদি ঐ অবস্থা পুনরায় আসে, আবার সে সময় কিছু চাহিতে হইবে। ইহা মোক্ষমার্গে বিশেষ বিঘ্ন উৎপাদন করে ॥ ৩৫

অর্থঃ। পার্থ! (হে পার্থ) দুর্মেধা (অবিবেকী, দুর্বুদ্ধি ব্যক্তি) যয়া (যে ধৃতির দ্বারা) স্বপ্নং (নিদ্রা) ভয়ং (ভয়) শোকং (শোক) বিষাদং (বিষাদ), মদং চ এবং (এবং গর্ভং) ন বিমুক্তিঃ (পরিভ্রাণ করে না) সা ধৃতিঃ তামসী (সেই ধৃতি তামসী) ॥ ৩৫

শ্রীধর। তামসী ধৃতিমাহ—যয়েতি। দুর্মেধা—অবিবেকবহুলা মেধা ২তঃ দুর্মেধাঃ পুরুষঃ, যয়া ধৃত্য বঙ্গাদীন ন বিমুক্তিঃ—পুনঃ পুনঃ আবর্তয়তি। স্বপ্নোহত্র নিদ্রা। সা ধৃতিঃ তামসী ॥ ৩৫

বঙ্গানুবাদ। [তামসী ধৃতির কথা বলিতেছেন]—অবিবেক-বহুলা মেধা বাহার—সেই দুর্মেধা পুরুষ যে ধৃতি দ্বারা স্বপ্নাদিকে অর্থাৎ নিদ্রা, ভয়, শোক, বিষাদ এবং মদকে ত্যাগ করে না অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ আগমন করে (প্রাপ্ত হয়) সেই ধৃতি তামসী ॥ ৩৫

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—স্বপ্ন, ভয়, বিষাদ, মেদাক, এরূপ কল্পেতে ধারণা সে তামসিক।—ধৃতির অর্থ ধারণা। বিগত সুখ-দুঃখাদি বা বিষাদ-শোকের যে স্থিতি বা ধারণা আমাদের চিত্ত মধ্যে লাগিয়া থাকে, তাহাই সময়ে সময়ে মনোমধ্যে উদ্ভিত হয় এবং হইয়া আবার শোক-দুঃখ-মোহ উৎপন্ন করে—যে ধৃতি দ্বারা এইরূপ শোক-মোহকর-বিষয় মনে পুনঃ পুনঃ আবর্তিত হয়, কিছুতে ভুলিতে দেয় না—তাহাই তামসী ধৃতি। বিষয় ব্যাপারকে দুঃখকর জানিয়াও এই তামসী ধৃতির সংস্কার বশতঃই আমরা বিষয় চিন্তা হইতে বিনিবৃত্ত হইতে পারি না। নিদ্রাও আমাদের একটি তামসিক বৃত্তি এবং

তাঁহাকে আমরা তামসী ধৃতি দ্বারা ধরিয়া রাখি ও প্রত্যহ যথানিয়মে ঘুমাইয়া পড়ি। নিজা মনের একপ্রকার আচ্ছন্ন বা তমোভাব সে সময় মনের ক্রিয়ালীলতা লোপ পায়; কিন্তু আমরা যে নিজাকে ত্যাগ করিতে পারি না, তাহা নহে। ঋষি পতঞ্জলি নিজাকেও আমরা নিজাকালীন অবস্থাকে জাগ্রত অবস্থায় স্বরণ করিতে পারি। যেমন স্থখে শায়িত ছিলাম, ঘুমাইয়া মনটি আচ্ছন্ন বেশ প্রসন্ন বোধ হইতেছে বা “প্রজ্ঞা মে বিশারদী কয়োতি” আমার প্রজ্ঞাকে বেশ উদ্ধ করিতেছে—এইরূপ নিজার ভাবই সাত্বিক নিজা। এইরূপ নিজাতেই দেব-দর্শন হয়, ইচ্ছা কল লাভ হয়। আর এক প্রকারের নিজা আছে তাহা রাজসিক। তাহাতে মনে হয়—আমি কষ্টে নিমজ্জিত ছিলাম, আমার মন অবশ্যই হইয়া গিয়াছে অর্থাৎ সে মনে কিছুই ভাল লাগে না, স্থখে বা সহজে কিছু স্বরণ হয় না, মন যেন অনবস্থিত হইয়া ভ্রমণ করে, ঘুমাইতে ঘুমাইতে বা তা স্বপ্ন দেখে, জাগিয়া উঠিয়া মন অত্যন্ত অপ্রসন্ন হইতে থাকে, ইহাই রাজসিক। আর তমোভাবাপন্ন নিজায় ঘুম খুব গাঢ়ই হয় কিন্তু জাগিয়া উঠিয়া মন প্রসন্ন থাকে না, শরীরের ক্লান্তি দূর হয় না, বরং শরীরে যেন একটা ভার বোধ হয়, চিন্তের জড়তা ও আলস্য যেন কাটিতে চাহে না, ইহাই তামসিক ভাবের নিজা। সুতরাং নিজার নিরোধ না হইলেও যোগ-লাভ হয় না। আমাদের দেশে সে কালের মহাত্মারা অনেকেরই জিতনিজ ছিলেন।

আত্ম-বিচারশীল এবং যোগীশ্বর পুরুষের নিজা, ভয়, শোক ও বিবাদ অল্পই হইয়া থাকে, কারণ এগুলি প্রকৃতির ধর্ম, আত্মার নহে। তামসিক প্রকৃতির লোকদিগের এই সকল বিষয় স্বাভাবিক ও অধিক মাত্রায় থাকে বলিয়া তাহারা ভাল হইবার চেষ্টাও ভালরূপে করিতে পারে না। এই সকল ব্যক্তির বড় একটা সাধনের ক্লেশ সহিতে চাহে না। একদিন দৈবাৎ যদি যাত্রি জাগিয়া সাধন অভ্যাস করে, পরে তিন দিন ছিবা ভাগে নিমজ্জিত হয় এবং উহাতে শরীর ও মন এত জড়-ভাবাপন্ন হইয়া যায় যে, পবে কয়েক দিন আব নিয়মিত সময়ে উঠিতেই পারে না। অনেকের বারণা নিজা ভাল রূপে না হইলে যোগ হয় কিন্তু বাহ্যিক যাত্রি জাগিয়া সাধন অভ্যাস করিয়া থাকেন, সেই সকল সাত্বিক ব্যক্তির অতিরিক্ত পরিশ্রমেও ক্লান্তি আসে না, এমন কি উপর্যুপরি দুই চারি দিন না ঘুমাইলেও দিনের বেলা ঘুম আসে না। আলস্য, নিজা, ভয়—তামসের ধর্ম, তমোগুণ থাকিতে যোগী বা আত্মজ্ঞ হওয়া সম্ভব নহে। ভগবান এই ধৃতির কথা উল্লেখ করিয়া দেখাইতেছেন যে, বাহ্যিক তত্ত্বজ্ঞানেছু হইবেন, সেই সকল পুরুষের রাজসিক তামসিক ধৃতি থাকিলে চলিবে না। রাজসিক ও তামসিকের আত্মায় বা ভগবানে প্রকৃত বিশ্বাস থাকে না, তাহাদের সঙ্কল্পেরও কোন নিশ্চয়তা নাই, এই জ্ঞাত্যাহারা সাধনার ফল লাভে চির-বঞ্চিত থাকেন। সাত্বিক ধৃতিসম্পন্ন পুরুষ ঠিক ইহার বিপরীত। তাহাদের সাধনাত্ম্যসেও আলস্য নাই, আত্মাতেও কোন সন্দেহ নাই তাহারা একজ্ঞ তাহাদের সঙ্কল্পে অটল।

(ত্রিবিধ সুখ)

সুখং ত্রিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।

অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তঃ নিগচ্ছতি ॥ ৩৬

হানী পুরুষ দেহ সম্বন্ধী নহেন, সেইজন্য দেহধর্ম তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। চেষ্টা করিলে লোকে জিতনিজ বা মৃত্যু-ভয়শূন্য হইতে পারে, ‘কারণ’ যিনি ষষ্ঠটা আয়ত্ন, তিনি ততটা প্রকৃতির কারাগার হইতে মুক্ত। মৃত্যু ভয়, শক্তির স্বল্পতা বা দেহের অস্বাস্থ্য এ সমস্তই দেহ প্রকৃতির নিদ্বন্দ্ব, যিনি দেহ-প্রকৃতি হইতে বিমুক্ত, তাহাকে প্রকৃতি-জাত গুণে বিকল হইতে হইবে কেন? আমাদের মধ্যে যে জীব বহিরাছেন, তিনি প্রকৃতির সহিত মিলিয়াই এতটা জড়ভাবাপন্ন ও শোক-ভয় প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। এখন তিনি তাঁহার আত্ম-শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপনই করিতে পারেন না, এবং রোগে, শোকে, বিপদে পড়িয়া তিনি আপনাকে এত অসহায় মনে করিয়া থাকেন। আত্মা যে জন্ম-ম্রুরা রোগ শোক-মৃত্যুরহিত আত্মা যে অভয় ও অনৃত্যবস্ত—এই আত্ম-কথা আলোচনা করিয়া তাহারা সেই নিজ ভাবাইয়া দিতে হইবে। নিজ প্রকৃত স্বরূপের বিশ্বাস জন্মাইয়া দিতে পারিলে এই রোগ-শোক-পরিপূর্ণ বন্ধ জীবই আবার শোকাতিগ অবস্থা লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইতে পারে ॥ ৩৫

অম্মন। ভরতর্ষভ! (হে ভরতশ্রেষ্ঠ) ইদানীং তু (এক্ষণে) ত্রিবিধং সুখং (তিন প্রকার সুখের বিষয়) মে শৃণু (আমার নিকট শুন), যত্র (যে স্থখে) অভ্যাসাদ্রমতে (অভ্যাস দ্বারা আনন্দ লাভ করে) দুঃখান্তঃ চ (ও দুঃখের অবসান নিগচ্ছতি) প্রাপ্তং হয় ॥ ৩৬

শ্রীধর। ইদানীং সুখং ত্রৈবিধ্যং প্রতিজ্ঞানীতে অর্জুন—সুখমিতি। স্পষ্টোক্তং। তত্র ত্রৈবিধ্যং সুখং আহ—অভ্যাসাদ্রমতি। যত্র—যস্মিন সুখে, অভ্যাসাৎ—অতিপরিচর্য্যায় রমতে, ন তু বিষয়হৃৎ ইব সহসা রতিং প্রাপ্নোতি, যস্মিন্ রমমাণস্ত দুঃখস্ত অন্তঃ—অবসানং, নিত্যবাং গচ্ছতি—প্রাপ্নোতি ॥ ৩৬

বঙ্গানুবাদ। [ইদানীং অর্জুনোক্তদ্বারা সুখের ত্রিবিধতা বিষয় প্রতিজ্ঞা করিতেছেন] এই অর্জুনোক্তার্থ স্পষ্টই। [তাহাতে সাত্বিক সুখের বিষয় বলিতেছেন] যত্র—অর্থাৎ যে স্থখে নিয়ত অভ্যাস বশতঃ লোকে পরিচিত হয় এবং রতি প্রাপ্ত হয়, অথচ বিষয় সুখের মত সহসা রতি পাওয়া যায় না, এবং যাহাতে রত হইলে দুঃখের অন্তঃপ্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ৩৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সুখ তিন প্রকার—অভ্যাসের দ্বারায়, ক্রিয়া করিয়া যেখানে পৌঁছায় সেখানে সুখ কিনা সুন্দর পরবোম দেখে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থেকে—দূরের অর্থাৎ দুঃখ অল্প বস্তুতে আসক্তি পূর্বক দেখা—দুঃখ কিনা দূরের ঋ=শূণ্য; পঞ্চভয়ের শূন্যাকার ৩ং চং দেখে আসক্তি পূর্বক তাহাতেই লগে থেকে বিব্রত লোকে হয়, ইহারই নাম দুঃখ—ইহা সর্বদাই সকলের হইতেছে কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় এই দুঃখের অন্তঃ হয়।—ভগবান এখানে

(সাত্ত্বিক সুখ)

যন্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেহমুতোপমম্ ।

তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্ৰসাদজম্ ॥ ৩৭

কৰ্মতত্ত্বের কথা বলিতে গিয়া কৰ্মের প্রবর্তক—জ্ঞান, কৰ্মের আশ্রয়—কর্তা, এবং কৰ্মের সাধন—বুদ্ধি ধৃতি প্রভৃতির ত্রিবিধ ভেদ বর্ণনা করিলেন, এক্ষণে কৰ্মের ফল সুখাদিও ত্রিবিধ ভেদ দেখাইতেছেন। সুখের ত্রিবিধ ভেদ বলিতে গিয়া ক্রিয় পুং মাত্মবুদ্ধি বাহ্যনীয় এবং কোন সুখ আগ্রাহ তাহাই বলিতেছেন। ভগবান বলিতেছেন—বিষয় সুখ গ্রাহ্য নহে, তাহা পরিচিৎ, এবং সহজে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সে সুখ শেষ পর্যন্ত সুখকর নয়, সুতরাং তাহার প্রতি আসক্ত না হইয়া এমন সুখের সন্ধান কর—যাহা সহসা পাওয়া যায় না, পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিতে করিতে প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং প্রকৃতই দুঃখের অবসান হয়। ইহাই সমাদি-জনিত সুখ। অভ্যাস কাহাকে বলে? যোগদর্শনে আছে,—“তত্র স্থিতৌ যদ্বোহভ্যাসঃ।” চিত্ত বৃত্তিশূন্য হইলে সেই নিরোধ-প্রবাহের নাম স্থিতি। সেই স্থিতির দ্বারা যে পুনঃ পুনঃ উৎসাহ সহকায়ে প্রযত্ন—তাহারই নাম অভ্যাস। এই অভ্যাসের দ্বারা আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ক্লেশের অবসান হয়। আধ্যাত্মিক ক্লেশ—মানসিক; দৈব-প্রতিফলতার কিম্বা পূর্ব জন্ম-ফলে যে প্রতিবন্ধকাদি বিষয় আসে—তাহাই আধিদৈবিক; এবং বাস্ত-পিত্ত-কফজনিত যে শারীরিক ক্লেশ—তাহাই আধিভৌতিক। এই সব দুঃখের অন্ত হইলে যে সুখ লাভ হয়, সেই সুখ শুণ-ভেদে তিন প্রকার। সেই সুখ পাইতে হইলেও তাহার অভ্যাস করা আবশ্যক হয়। ক্রিয়ার অভ্যাসের দ্বারা ধীরে ধীরে সাধককে সেই সুখময় স্থানে পৌঁছাইয়া দেয়, যেখানে পৌঁছিলে (ক্রিয়ার পর-অবস্থায়) অতঃ পরে আসক্তি পূর্বক দেখা, যাহা দুঃখেরই নামান্তর, তাহা আর থাকে না। কারণ সুখ হইল—স্ব+খ=সুখের আকাংক্ষা অর্থাৎ পবন্যোম। এই পরব্যোমে স্থিতির তুল্য আর উৎকৃষ্টতর সুখ কিছু হইতে পারে না। আর দুঃখ তাহাই যাহা সেই পরব্যোম হইতে দূরে সরাইয়া দেয়। বিষয়াসক্তি যাহার যত অধিক সে পরব্যোম হইতে তত দূরে থাকে। পরতত্ত্বের রং চং ঘোষাই তো লোকে মুগ্ধ হইয়া তাহারে পানে ছুটিয়া যায় কিন্তু সেখানে শুষ্ক ভাণ্ড চং চং করিতেছে, সুখের আভাস আছে বটে, কিন্তু প্রকৃত সুখের নাম গন্ধ পর্যন্ত নাই। কিন্তু জীব আপাতমনোহর বস্তু পাইয়া তাহাতেই মুগ্ধ হইয়া পবন্য সুখের প্রতি উদাসীন হইয়া সমস্ত জীবনকে দুঃখময় করিয়া তুলে। বিষয় পাইলে দুঃখ নষ্ট হয় না, ক্রিয়ার পর-অবস্থাই এক নাজ দুঃখের নিবর্তক ॥ ৩৬

অমর। যৎ তৎ (যাহা কিছু) অগ্রে বিষয় ইব (প্রথমে বিষয়ের তায়। পরিণামে (পরিণেবে) অমৃতোপমম্ (অমৃত তুল্য) আত্মবুদ্ধিপ্ৰসাদজম্ (যাহা আত্মবুদ্ধির প্রসঙ্গতর ফলস্বরূপ) তৎ সুখং (সেই সুখ) সাত্ত্বিকং প্রোক্তম্ (সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত হয়) ॥ ৩৭

শ্রীধর। কীদৃশং তৎ?—যতদ্বিত্তি। যতঃ কিমপি অগ্রে—প্রথমঃ, বিষমিব—মনঃ-সংযমাদীনত্যাং দুঃখাবহমিব ভবতি। পরিণামে তু অমৃতসদৃশম্। আত্মবিষয়া বুদ্ধিঃ আত্মবুদ্ধিঃ, তত্ভাঃ প্রসাদঃ—রক্তস্রো-মলত্যাগেন বহুতয়া অবস্থানং, ততো জাতং যৎ সুখং তৎ সাত্ত্বিকং প্রোক্তং যোগিভিঃ ॥ ৩৭

বঙ্গানুবাদ। [সেই সুখ কিরূপ? তাহাই বলিতেছেন]—যে সুখ মনঃসংযমাদীনত্যাং বলিয়া প্রথমে বিষয়ের মত দুঃখাবহ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু সে সুখ পরিণামে অমৃত-সদৃশ। এবং যে সুখ আত্মবুদ্ধি প্রসাদজ—আত্মবিষয়ক যে বুদ্ধি, তাহা আত্মবুদ্ধি, তাহার যে প্রসাদ অর্থাৎ রক্তস্রোমলত্যাগ মলত্যাগ হইলে বুদ্ধির স্বচ্ছরূপে যে অবস্থান, তাহা হইতে জাত যে সুখ, যোগিগণ তাহাকে সাত্ত্বিক সুখ বলেন ॥ ৩৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—প্রথমেতে বিষয়ের যেমন জালা তদ্রূপ সৎদিগের মতি বা ক্রিয়ার কথা শুনিলেই অহংকারে আবৃত হইয়া মন গ্রাহ্য করিতে কখনই সম্মত হয়না প্রায়—কিন্তু একবার ঘাড় ঝুঁজে গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিয়া ক্রিয়া অভ্যাসে প্রবৃত্ত হইলে অমৃত অমৃত সকলেই শুনিয়াছেন কিন্তু কেহ কখন দেখেনওনি অমৃতবও করেননি—তাহা ক্রিয়ার পর গুরুবাক্যের দ্বারায় উপদেশ পাইয়া তাহার অনুভব করিতে পারেন—সেই অনন্ত সুখ পাইলেই অমর পদ পায়—যাহা সুস্বাদু থাকিয়া সেই ক্রিয়া হয়—তন্নিমিত্তে তাহাকে সাত্ত্বিক সুখ কহে। সে কেবল আত্মাতে বুদ্ধি স্থির করিয়া ক্রিয়ার দ্বারায়—আত্মায়ই রূপান্তরে পরমানন্দ লাভ হয়।—সাত্ত্বিক সুখ ইন্দ্রিয়ভোগজনিত সুখ নহে। তাহা তপঃ-ক্লেশ, বৈরাগ্য, ধ্যান দ্বারা সাধিত হয়। ইহার সাধন সেই দ্বন্দ্ব সহজ বা অনায়াসলভ্য নহে। ইহার পথ খুঁজিয়া পাওয়াও সহজ নহে এবং পথটিও হৃগগ নহে। ভৃগুচৌগীরা জানেন, ক্রিয়া প্রথম প্রথম এমন কি—দুই পাচ বৎসরও ভাল লাগে না; যদি বা কেহ এ পথ প্রথমে আগ্রহের সহিত গ্রহণ কবেও, কিছুদিন করিয়াই কিন্তু পথের দুর্গমতা ও নিবসতা বুদ্ধিতে পারে এবং তখন আর তাহার চিত্ত অগ্রসর হইতে চাহে না। প্রথমে একটু একটু প্রযত্নের শৈথিল্য হয়, শেষে আর সেদিকে মাড়াইতে ইচ্ছা করে না, এমন কি অনেকের সাধনায় বসিতেও ভয় বোধ হয়। কিন্তু যিনি গুরুবাক্যে নির্ভর করিয়া ‘যা হবার হবে’ বলিয়া আর ফলাফলের দিকে না তাকাইয়া ঘাড় ঝুঁজিয়া ক্রিয়ার অভ্যাসে চিত্তকে লাগাইয়া রাখে তিনি একদিন না একদিন সাধনার উত্তম মরুভূমি উত্তীর্ণ হইয়া সাধনার পরাবস্থারূপ শুভিল শান্তিময় ভূমি অবগাহন করিয়া কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন। তিনি অমৃত পান করিয়া তখন অমর হইয়া যান। তাহারই সঙ্ক্ষে ভক্তিশ্রবের এই কথা সার্থক হয়—‘স তরতি স তরতি স লোকান্ ভাবয়তি’—তিনি পার হইয়া যান, তিনি তো পার হনই, অন্তকেও পার লইয়া যান। যে অমৃতের কথা আমরা যুগে বলি বা কাণে শুনি মাত্র, সেই অমৃতকে তিনি সাক্ষাৎ-ভাবে লাভ করেন। কিন্তু এ অভ্যাস সহজ নহে; এক তো বড় ভিত্তি লাগে প্রথম প্রথম তাহার পর দীর্ঘ কাল অভ্যাস করিতে হয়, তাহাতে স্বল্প প্রেমযুক্ত ব্যক্তির ধৈর্যের বাঁধ ভাঙিয়া

(রাধাসুখ)

বিষয়েন্দ্రిয়সংযোগাদবৃত্তদগ্ৰেহমৃতোপমম্ ।

পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ৩৮

যায়। আবার দীর্ঘকাল ও বহুদিন ধরিয়া সাধন না করিলে প্রাণ সুস্থায় প্রবেশ করে না। প্রাণ সুস্থায়ী না হইলে সে পরম স্বেধের আশা কেহই পায় না। মন দিয়া বহুদিন ধরিয়া ক্রিয়া করিলে আত্ম-গুরু রূপায় আত্মাতে বুদ্ধি স্থির হইয়া যায় এবং যাহাকে শাস্ত্রে পরমানন্দ বলেন, সেই পরমানন্দ তখন সাধকের প্রাপ্তি হয়। ইন্দ্রিয়-সুখ শরীরকে লইয়া হয় কিন্তু এ সুখে শরীরকে ভুলিয়া যাইতে হয়। এ সুখসঙ্কোচ কালে মনের সঙ্কল থাকে না, তখন মন বুদ্ধির সহিত মিলিয়া এক হইয়া যায়, প্রাণও স্পন্দনশূন্য হয়, স্মরণও বুদ্ধিতে অস্ত কোন বিচারের চেষ্টা থাকে না। তখনই বুদ্ধির সহিত আত্মার মিলন হয়, ইহাই সূ-
ক্ষ্মবৎ, ধঃ—শূন্য। বিষয়-সংস্রবশূন্য হেতু বুদ্ধিতে বিন্দুমাত্র বিষয়ের দাগ পড়ে না, তাহাতে কেবল আত্মাই লক্ষিত হন। নিদ্রা আলস্ত হইতে যে তামসিক সুখ, বিষয়েন্দ্రిয়যোগে যে রাজসিক সুখ হয়, ইহা সে সব সুখ নহে। বুদ্ধির সহিত আত্মার মিলনে যে সুখ—ইহা সেই সাত্বিক সুখ। এখানে শরীরে চাকল্য নাই, মনে চাকল্য নাই, বুদ্ধিতেও চাকল্য নাই। বুদ্ধি তখন একাগ্র হইয়া নিরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তখন অত্র অমৃতত্ব কিছুই থাকেনা,—প্রকৃত সুখ ইহাকেই বলে। আত্মা আনন্দরূপ স্মরণ এক আনন্দ ব্যতীত তখন আর কিছুই অনুভব থাকে না। বুদ্ধি তখন সেই আনন্দে মাথা হইয়া আনন্দরূপ হইয়া যায় ॥ ৩৭

অর্থঃ । বিষয়েন্দ্రిয়সংযোগাৎ (বিষয় ও ইন্দ্রিয়ার সংযোগ বশতঃ) যৎ তৎ (যে সুখ) অগ্ৰে (প্রথমে) অমৃতোপমম্ (অমৃত তুল্য) [কিন্তু] পরিণামে বিষম্ ইব (শেষে বিষতুল্য) তৎ সুখং (সেই সুখ) রাজসং স্মৃতম্ (রাজস বলিয়া কথিত হয়) ॥ ৩৮

শ্রীধর । রাজসং সুখমাহ—বিষয়েতি । বিষয়াণাম্ ইন্দ্রিয়াণাং চ সংযোগাৎ যৎ তৎ প্রসিদ্ধং স্রীসংসর্গাদিসুখম্, অমৃতম্ উপমা যন্ত তাদৃশং ভবতি, অগ্ৰে—প্রথমম্ । পরিণামে বিষতুল্যম্ । ইহানুত্তরে চ দুঃখহেতুত্বাৎ । তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ৩৮

বঙ্গানুবাদ । [রাজস সুখ কি, তাহা বলিতেছেন]—বিষয় আর ইন্দ্রিয়, তাহার সংযোগ দ্বারা যে সুখ—যেমন প্রসিদ্ধ স্রীসংসর্গাদি সুখ—যাহা প্রথমে অর্থাৎ অমৃতোপম যাহার উপমা অমৃত, আর পরিণামে বিষতুল্য, কারণ ইহকালে ও পরকালে দুঃখের হেতু বলিয়া। সেই যে সুখ—তাহা রাজস বলিয়া কথিত ॥ ৩৮

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—বিষয় ইন্দ্রিয় অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত আসক্তি পূর্বক দেখাতে প্রথম বোধ হয় বাঁচলাম এমন উত্তম বস্তু পাইয়াছি বলিয়া মৈথুন করিতে থাকে কিন্তু মন স্থির করিয়া যে আমি অমর মরব না, আমি কি মরব? যে আমাকে মর বলে, সে মরুক—যিনি মৃত্যু কখন বিবেচনা

করেন না তিনিও মরবেন ও যিনি মর বলিতেছেন, তিনিই কোন্ বেঁচে থাকবেন—অর্থাৎ দুই জনেই মৃত্যুগ্রাসে পতিত, তথাপি ছেলে মানুষের মতন মিথ্যা কথাবার্তাকে সত্য বিবেচনা করেন, অতএব কথাই মন্দ বাহা না বলিয়া থাকিতে পারে না—কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় আপনা আপনি মৌন হইয়া যায়। পরিণামেতে ঐ মৈথুনের পর কোন পচা যোনিতে লিপ্ত দিয়া বিষের মত জালা উপস্থিত হয়—ইহারই নাম রাজসিক সুখ। শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাদির সহিত শোত্র, শ্রব, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলেই, যে এক প্রকার স্বেধের উৎপত্তি হয়, তাহা প্রথমতঃ অমৃতোপম বলিয়া মনে হয় এবং উহা পাইবার জন্য আমাদের চিত্ত কি ব্যগ্রই না হয়। মনে হয় এমন সুখের বস্তু আর নাই—কিন্তু স্রী সত্য প্রভৃতি এই সব স্বেধের সমাপ্তি কালে এক পরিণাম-বিরস-ভাব আনিয়া দেয়, যাহাতে ঐ সকলকেই আবার ক্ষণকাল পরে বিষতুল্য বলিয়া মনে হয়,—মনে কতঃস্থগা ও সেই সকল সুখকে কত তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়। শুধু তাহাই নহে—এইরূপ ইন্দ্রিয়পরায়ণতার পরিণাম আরও ভয়াবহ, কারণ উহাতে বল, বীর্ঘ্য, রূপ, মেধা, ধন ও উৎসাহ সবই বিনষ্ট হইয়া যায়। এই সকল ইন্দ্রিয়-ভৃষ্টির দ্বারা কত অধঃপতন আসিয়া লইতে হয় এবং তাহার পরিণামে জীবকে নরকাগ্নি মহাদুঃখ ভোগ করিতে হয়। কিন্তু মানুষ এই সামান্য স্বেধের মোহে পাগলের মত নিজের কত অনিষ্ট করে, নিজের ভবিষ্যৎ সমসার তুষ্টি করিয়া তুলে, তাহা স্থিরভাবে বিচার করিয়া দেখিলে হৃৎকম্প হইতে থাকে। এখন সাত্বিক সুখের সহিত রাজসিক স্বেধের তুলনা করিলে দেখা যায় রাজসিক সুখ সাত্বিক সুখের ঠিক বিপরীত। রাজসিক সুখ অগ্রে অমৃততুল্য পরে বিষের মত জালাপ্রদ, সাত্বিক সুখ প্রথমটা বিষের মত অমৃতত্ব হয় বটে, কিন্তু পরে অমৃতের মত বোধ হয়। রাজসিক সুখের সাধনার কোন কষ্ট নাই, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ার সংযোগ হইলেই হইল, কিন্তু সাত্বিক সুখ সহসা লাভ করা যায় না, একান্ত সাধন করিতে হয়; অভ্যাস করিতে করিতে প্রাণ তিত্ত হইয়া উঠে কিন্তু যখন একবার আয়ত্ত হইয়া যায়, তখন সাধনার সিদ্ধিলাভ হয়, বুদ্ধি-নির্মল হয় এবং সেই শুদ্ধ বুদ্ধিতে আত্মার স্বরূপ দর্শন হয়। তখন মনে যে প্রসন্নতা আসে, তাহার সহিত আর কোন আনন্দেবই তুলনা হয় না, এবং সে সুখ একমাত্র আত্মজ্ঞান হইতেই লাভ হইতে পারে। আত্মজ্ঞানে যাহাদের নিষ্ঠা নাই, তাহারা বাহ্যবস্ত হইতে স্বেধের আশা করিয়া থাকে, কিন্তু সেই সকল স্বেধের দ্বারা বহু দুর্গতি তাহাদিগকে সহ করিতে হয় এবং তাহার পরিণামেও নানাবিধ দুঃসাধ্য রোগ ভোগ করিতে হয়, এবং পরকালেও নিরয়োগমুখ হইয়া থাকে। রাজসিক সুখ মাত্র বাসনার পরিতৃপ্তি সাধন, সেইজন্য তাহা চঞ্চল, এবং সেই স্বেধের দ্বারা অত্র বস্তুর অপেক্ষা করিতে হয় কিন্তু সাত্বিক সুখ ইন্দ্রিয়ার সহিত বিষয়ের সংযোগ বশতঃ উৎপন্ন হয় না, তাহা মন, প্রাণ ও বুদ্ধির স্থিরতা হইতে উৎপন্ন, স্মরণও তাহা অচঞ্চল, এবং তাহা বিষয়মিশ্রিত নহে, একান্ত উহা নির্মল এবং আকাশবৎ স্বচ্ছ ও সর্বতোমুখী। তাহা কেবল পরমানন্দ স্বরূপ, তাহাতে দুঃখের চেষ্টা উঠে না। রাজসিক সুখ হেহেজ্ঞিয়ার সংযোগজাত এবং সাত্বিক সুখ হেহেজ্ঞিয়ার অতীত অবস্থা হইতেই লাভ হয় ॥ ৩৮

(তামস সূত্র)

যদগ্রে চানুবন্ধে চ সূত্রং মোহনমাত্মনঃ

নিদ্রালস্তপ্রমাদোৎস ততামসমুদাহৃতম্ ॥ ৩৯

অর্থঃ। যৎ চ সূত্রং (আৰ বে সূত্র) অগ্রে অনুবন্ধে চ (প্রথম ৩ পশ্চাতে) আত্মনঃ মোহনং (বুद्धির মোহকর হয়) নিদ্রালস্তপ্রমাদোৎস (নিদ্রা আলস্ত ও প্রমাদ হইতে জাত) তৎ (সেই সূত্র) তামসম্ উদাহৃতম্ (তামস বলিয়া কথিত হয়) ॥ ৩৯

শ্রীধর। তামসঃ সূত্রমাহ—যদ্বিতি। অগ্রেচ—প্রথমক্ষেপে, অনুবন্ধে চ—পশ্চাদপি, যৎ সূত্রং আত্মনো মোহকরং। তদেবাহ—নিদ্রা চ আলস্তক প্রমাদশ্চ—কর্তব্যার্থাবধানরাহিত্যেন মনোগ্রাহম্ এতেভ্য উত্তিষ্ঠতি যৎ সূত্রং তৎ তামসম্ উদাহৃতম্ ॥ ৩৯

বঙ্গানুবাদ। [তামস সূত্রের কথা বলিতেছেন]—যাহা প্রথমে ও পশ্চাতে আত্মার মোহকর এবং নিদ্রা, আলস্ত ও প্রমাদ—কর্তব্য কর্ণে অবধানতা বশতঃ মনোগ্রাহ—এই সকল বিষয় হইতে উৎপন্ন যে সূত্র তাহা তামস বলিয়া কথিত ॥ ৩৯

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—প্রথমেই মনটাকে বোঁধ ফেলে কিঞ্চিৎ অল্প সূত্রের জন্ত মোহিত করিয়া দেয়—সে নিদ্রাতে প্রথমেই অনুভব হয়—যত্নপি কেহ যখনবাধা করে তখন অনুভব হয়। আলস্তেতেও ভ্রম। এবং রাগেভেও কিংবা কোন বিষয়ে প্রমত্ততা পূর্বক আসক্তির সহিত দৃষ্টি করা—ইহাকে তামসিক সূত্র কহে অর্থাৎ কিছুই দেখিতে পায় না।—যে সূত্র আত্মজ্ঞান হইতেও উৎপন্ন নহে কিংবা বিষয়ে দ্বিষের সংযোগ বশতঃও নহে, যাহা নিদ্রা আলস্ত ও প্রমাদ হইতে উৎপন্ন হয় তাহাই তামসিক সূত্র। সমস্ত রাত্রি ঘুমাইয়া ও আবার দিনের বেলায় কোঁস ভোল করিয়া ঘুমায়, সামান্য গুণ ধ্যানও মনোনিবেশ করিতে পারে না, যদি করে কেবল চলে। অথবা না ঘুমাইলেও বিছানায় পড়িয়া আছে, অল্পক্ষণও বসিতে পারে না, একটু বসিলেই ভইতে ইচ্ছা করে। জাগিয়া আছে অথচ একটা কর্তব্য কর্ণ উপস্থিত তাহা কিছুতেই করিবে না, করিতে বলিলে রাগিয়া উঠে। বড় জিজ্ঞাসা করা যায় শুইয়া বসিয়া তেই করিবে না, করিতে বলিলে রাগিয়া উঠে। বড় জিজ্ঞাসা করা যায় শুইয়া বসিয়া আলস্তে কালক্ষেপ করিয়া লোকে কি সূত্র পায়? অথচ ইহাতে কোন বস্তু লাভ নাই, ভোগাধির মত ইন্দ্রিয় তৃপ্তি বা চিত্ত বিশ্রান্তি হেতু এ সূত্র নহে, মনে হয়ত শত কলনা করিতেছে, কিন্তু উঠিতে বলিলে বা কিছু করিতে বলিলেই রাগিয়া বাইবে—তাহাতেই মনে হয় এই আলস্ত-জড়তার মধ্যেও একপ্রকার সূত্র আছে, নচেৎ ছাড়িতে চায় না কেন? কিন্তু তাহা বস্তুতন্ত্রতা শূন্য। ইহা এক প্রকার বুদ্ধির আচ্ছন্ন ভাব মাত্র। মাদক দ্রব্য গ্রহণেও এই দ্রাবীর স্বভাবশূন্য হয়। ইহাতে কিন্তু বড় ক্ষতি করে, এই তমোভাব হেতু বেহ ও মনের শক্তি দিন দিন হ্রাস হইয়া আসে, জ্ঞানের ঐজ্জল্য কমিয়া যায়, কোন কর্তব্য অবধারণ করিতে পারে না। আলস্ত ও অতিনিদ্রার ফলে অনেক শক্তিমান পুরুষ জীবনে সফলতা লাভে বঞ্চিত হইয়াছেন। তীক্ষ্ণ প্রতিভা থাকিলেও আলস্তে তাহার শক্তি স্তম্ভ হইয়া যায়। তমোগুণে এক প্রকার মত্ততা আনে, কোন প্রকার বিচার থাকে না,—যদ যাইয়া সারাস্রাত নালায়

(ত্রিগুণ হইতে কেহই মুক্ত নহে)

ন তদন্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।

সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্রাজিভিঃ গুণৈঃ ॥ ৪০

পড়িয়া গড়াগড়ি যায়, আবার সকালে উঠিয়া শুঁড়ি বাড়ী ছুট। এই দশা দেখিয়া লোকে কত ঘৃণা করে, আত্মীয়েরা কত গালাগালি করে, স্বী পুত্রের কষ্টের সীমা থাকে না, তবুও এই সামান্য সূত্রের লোভ ছাড়িতে পারে না—এই জেবীর সূত্রকেই তামসিক সূত্র বলে ॥ ৩৯

অর্থঃ—পৃথিব্যাং (পৃথিবীতে) দিবি বা (অথবা স্বর্গে) দেবেষু বা পুনঃ (অথবা দেবগণের মধ্যে) তৎ সত্ত্বং নাস্তি (সেরূপ প্রাণী বা বস্তু নাই) যৎ (যাহা) প্রকৃতিজৈঃ (প্রকৃতিজাত) এভিঃ স্রাজিঃ গুণৈঃ (এই তিনটি গুণ কর্তৃক) মুক্তং স্রাজং (বিমুক্ত) ॥ ৪০

শ্রীধর। অমুক্তমপি সংগৃহ্য প্রকরণার্থম্ উপসংহরতি—ন তদন্তি। এভিঃ প্রকৃতি-সত্ত্বৈঃ—সর্বাদিভিঃ গুণৈঃ, মুক্তং—হীনং, সত্ত্বং—প্রাণিজাতম্। অতঃ বা যৎ স্রাজং তৎ পৃথিব্যাং—মহুত্তলোকাধিষু দিবি দেবেষু চ কাপি নাস্তিত্যর্থঃ ॥ ৪০

বঙ্গানুবাদ। [যাহা পূর্বে উক্ত হয় নাই তাহা সংগ্রহ পূর্বক তিনটি শ্লোক দ্বারা প্রকরণার্থ উপসংহার করিতেছেন]—এই প্রকৃতিসত্ত্বব সত্ত্বাদি ত্রিগুণ হইতে মুক্তপ্রাণ যে সব (প্রাণি সমূহ) বা “অন্ত” অর্থাৎ প্রাণহীন বস্তু কেহই নাই। পৃথিবীতে মহুত্তর মধ্যে বা স্বর্গে দেবভাগনের মধ্যেও কেহ নাই যিনি গুণমুক্ত হইতে পারেন ॥ ৪০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—পৃথিবীর মধ্যে স্বর্গে দেবভায়া অর্থাৎ ত্রিগুণবিশিষ্ট ব্যক্তির—এই প্রকৃতিতে তিনগুণ ইড়া, পিঙ্গলা, সূর্য্য—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিনগুণ হইতে মুক্ত তাহার তুল্য কেহই নাই।—প্রকৃতির পরিণাম এই দ্বগৎ, সত্ত্বাৎ ভগবতের কোন বস্তু বা কোন প্রাণীই সর্বাদি গুণ হইতে মুক্ত নহে। সর্বাদি গুণ যখন বহিয়াছে তদবস্থায়ী তখন কর্মও হইতে থাকিবে। এই সকল ভেদ দেখাইবার জন্ত ভগবান্ জ্ঞান, কর্ম, কৰ্ত্তা, বুদ্ধি, ধৃতি ও সূত্রেরও ত্রৈবিধ্য দেখাইলেন। যদ্বারা লোকে বুদ্ধিতে পারিবে কোন্ প্রকার কর্ম করণীয় এবং কোন প্রকার কর্ম ত্যাগ্য। সর্বভূতে একাধা শর জ্ঞানই সাত্ত্বিক জ্ঞান। এবং যিনি সাত্ত্বিক কৰ্ত্তা হন, সাত্ত্বিক জ্ঞান হেতু আসক্তি-বহিত হইয়া কর্ম করা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। তাঁহার বুদ্ধিও সাত্ত্বিক এইজন্য প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, কার্য অকার্য সন্ধে তাঁহার জ্ঞান নিশ্চয় সূচুত, সত্ত্বাৎ যে কর্মে বন্ধন হইবে তাঁহার বুদ্ধি সে কর্মে বন্ধনই প্রবৃত্ত হইবে না। কেন তাঁহার একরূপ কার্যে প্রবৃত্তি হইবে না? তাহার কার্যবুদ্ধি তাঁহার ধৃতি সাত্ত্বিক অর্থাৎ সমাধিসাধন দ্বারা বুদ্ধি মানিভরহিত সত্ত্বাৎ ইন্দ্রিয়গণ যে তাঁহাকে বাত্যাভিহত ভরণীর জ্ঞায় যেবার সেবার নিষ্কোপ করিবে তাহার সম্ভাবনা নাই। এবং এইরূপ সংঘর্ষের ফল যে পরমানন্দ তাহা সাত্ত্বিক কৰ্ত্তা নিশ্চয় পাইবেন, অতএব এ নির্মল আমন্দ ছাড়িয়া তিমি যে আবার বিষয়ের মলিন বারি পান করিবার জন্ত ব্যাকুল হইবেন তাহার সম্ভাবনা নাই। তাই ভগবান এই সকল গুণজাত কর্ম, বুদ্ধির ভেদ দেখাইয়া সাধককে সাবধান করিয়া দিতেছেন যে আত্মানিত্ত্ব

(কর্ম বিভাগ ও তদন্তকারী দ্বিধা)

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাং চ পরন্তপ ।

কৰ্মাণি প্ৰবিভক্তানি স্বভাবপ্ৰভবৈৰ্গুণৈঃ ॥ ৪১

কর্তৃপক্ষ প্রাবর্ত্তনান বর্ত্তমান প্রাবর্ত্তনান
স্বতরাং কোনও কর্ণের ফলে তাঁহাকে বন্ধ করিতে পারে না। অতএব সেই আত্মবন্ধপে
প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারিলে কিছুতেই ত্রিগুণকে অতিক্রম করা যাইবে না। কিন্তু এই
গুণত্রয়ই আত্মবন্ধপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রধান অন্তরায়। তাই বলিতেছেন গুণত্রয়ের মধ্যে
সবুই নির্মল ও প্রকাশধর্মী, স্বতরাং যদি সবগুণকে আশ্রয় করিতে পার তবে ব্রহ্ম সংস্পর্শ
লাভ করিবে, ব্রহ্মের প্রকাশ অসম্ভব করিবে। তাঁহার প্রকাশ অসম্ভূত হইলেই আর
গুণত্রয় জীবকে মুক্ত করিয়া রাখিতে পারিবে না। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিই ইড়া, পিদলা,
সুস্মা। ইড়া পিদলায় বতর্দিন প্রাপের প্রবাহ চলিতে থাকে ততর্দিন সংসার ঘূর্ণি নষ্ট হয়
নাম। এইঘট্ত ক্রিয়ার অভ্যাস করিতে হইবে, ক্রিয়ার অভ্যাসে প্রাণ সুস্মাবাহী হইলেই
বিচিত্র রূপ ও বিচিত্র শব্দের দর্শন ও শ্রবণ হইতে থাকে। অতেনা অজ্ঞান দেশের সেই
সব বিচিত্র দৃশ্য দর্শন করিতে পারিলে চিত্ত আর বাহ জগতের চিত্ত দর্শনে তখন ব্যাকুল
হইবে না, পরে সুস্মায় প্রাণ থাকিতে থাকিতে আপনা আপনিই গুণাতীত অবস্থায়
উপনীত হইবে। যেমন তিলের মধ্যে তৈল থাকে, ধর্মির মধ্যে ঘৃত থাকে, শ্রোতের মধ্যে
জল ও কাঠে অগ্নি থাকে, তজ্রপ প্রকৃতির মধ্যে তাঁহাকে পুরাবস্থারূপে লক্ষ্য করা যাইতে
পৃথক নহে, ক্রিয়া বাবা দেহ-প্রকৃতির মধ্যে তাঁহাকে পুরাবস্থারূপে লক্ষ্য করা যাইতে
পারে। কূটস্থ থাকিতে থাকিতে অসম্ভব হয় বেন আত্মাকে দেখিতেছি, পরে আর দ্রষ্টা
আমিও থাকে না। যেমন দ্রব্দের প্রতি অগ্নির মধ্যে ঘৃত থাকে, তজ্রপ সর্বব্যাপী আত্মা
সূক্ষ্মের মধ্যেই প্রকাশিত রহিয়াছেন। কূটস্থ থাকিতে থাকিতে এই বোধ নিক্তর হইয়া
যায় স্বতরাং ক্রিয়ার অভ্যাস করিয়া কূটস্থ দর্শনের যোগ্যতা আবশ্যক। তাহা হইলে সাধক
ইড়া পিদলা সুস্মার অতীত অবস্থা লাভ করিয়া সব, বজ্র, তমঃ এই তিনগুণকে অতিক্রম
করিতে পরিবেন। এই তিনগুণে দেবতা, নহুত, ইতর প্রাণী সকলেই আবদ্ধ রহিয়াছে।
এই ত্রিগুণের বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে না পারিলে জীবের দুঃখভোগের অবসান
হইবে না॥ ৪০

অবস্থ। পরন্তুপা (হে পরন্তুপা) ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়বংশেই মুদ্রিত।
ও শৃঙ্গণের) কদম্বি (কদম্বসমূহ) স্বতাবপ্রভবৈঃ গুণৈঃ (স্বতাব্যাত গুণানুসারে)
প্রবিত্তানাম্ (বিত্তজ হইয়াছে) ॥ ৪১

প্রতিভা-বিভক্ত হইয়াছে) ॥ ৪১

শ্রীধর । নহু চ যদ্যেব সর্বমপি ক্রিয়াকারকফলাদিকং প্রাপ্তিহীনত্বং ত্রিগুণাদ্ভবেৎ
তর্হি কথং অস্ত যোক্ষঃ ? ইতি অপেক্ষায়ঃ স্বস্বাধিকারবিহিতৈঃ কর্মভিঃ পরমেধরাধনাৎ
তৎপ্রসাদসঙ্গজ্ঞানেন ইত্যেবং সর্বাধিকারার্থসাং সংগৃহ্য প্রদর্শয়িতুং একরূপান্তরং আবর্ততে—
ব্রাহ্মণস্যৈত্যাदि बावद्वायसमाप्तिः । हे पदवृत्त—हे शक्ततापन, ब्राह्मणमात्रं कर्त्रिणां
विना च शुभागां च कर्माणि प्रविभज्यानि—प्रकर्षेण विभागतो विहितानि । शुभागां
समाप्त्यं पृथक्करणं विज्ञात्वात्वेन वैलक्षण्यात् । विहागोपगलक्षणमाह । अन्तः—साक्षिकादि,

প্রভবতি—প্রাকৃতবতি যেহ্যঃ তৈঃ গুণৈঃ উপলক্ষনভূতৈঃ । বহা, বহাবঃ—সূক্ষ্মজ-
 সম্ভারঃ, তথাৎ প্রাকৃতভূতৈঃ ইত্যর্থঃ । তত্র সম্ভবপ্রাণা ব্রাহ্মণাঃ । সম্ভোপসর্জনরজঃ—প্রাণাঃ
 ক্ষিত্রিয়াঃ । তম উপসর্জনরজঃপ্রাণাঃ বৈশ্বাঃ । রজ উপসর্জনতমঃ প্রাণাঃ শূদ্রাঃ ॥ ৪১

বঙ্গাভুবাৎ । [বহি ক্রিয়া, কারক, ফলাদি এবং প্রাণিসমূহ—এ সমস্তই ঐতিহ্যগতক
হয়, তবে প্রাণীর মুক্তি কিরূপে সম্ভবপর হয় ? এই প্রশ্নকার উত্তরে বলিতেছেন যে “স্বাধ
অধিকার বিহিত কৰ্ম দ্বারা দৈববের আরাধনা করিলে তৎপ্রদাহলক্ষ জ্ঞান দ্বারা মুক্তি হয়—
এইরূপ সর্গসীতার্থসার সংগ্রহ করিয়া দেবদেবতার জ্ঞান “ব্রাহ্মণ” ইত্যাদি শ্লোক হইতে
অধ্যয়নসাধি পৰ্যন্ত প্রকরণসমস্ত বলিতেছেন] হে শক্তপ্রাপন, ব্রাহ্মণ, কত্রিয়, বৈশ্য
এবং শূদ্রদিগের কৰ্ম সকল প্রবিভক্ত অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে বিভাগত বিহিত হইয়াছে ।
[দ্বিধ্বংসরূপে ত্রিবর্ণের একত্র থাকায় উহাদের সমান হইয়াছে, দ্বিধ্বংসের অভাব হেতু “শূদ্রাণাং”
পট্টার সহিত সমান করা হয় নাই] বিভাগের উপলক্ষণ (অর্থাৎ কিসের দ্বারা বিভক্ত হইল
বলিতেছেন—“স্বভাব প্রভবৈশুংগৈঃ”—স্বভাব যে সাধিক রাজসিকাদি তাহা হইতে প্রভূত
অর্থাৎ প্রাচুর্ভূত হয় যে সকল গুণ, সেই সকল গুণের লক্ষণ দ্বারা ; অথবা স্বভাব—পূর্ণ
জন্মের সংস্কার তাহা হইতে প্রাচুর্ভূত হয় যে সকল তাহাদের দ্বারা । তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ
স্বপ্রধান । কত্রিয় সমমিশ্রিত রমঃপ্রধান । বৈশ্য তমো উপসজ্জিত (মিশ্রিত) রমঃ-
প্রধান । শূদ্র রজোমিশ্রিত তমঃপ্রধান ॥ ৪১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ব্রাহ্মণ, ক্রিয়, বৈষ্ণ, শূদ্র—যিনি যেমন যেমন বর্ণ
করেন তাঁহাদিগের সেই সেই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে—স্বভাব অর্থাৎ আত্মাতে
থেকে আটকিয়ে থাকা জিয়ার পর অবস্থা ইহার দ্বারায় বাহ্যিকের কণ
গুণ হয়, সে সেই রকম জাতিতে বিভক্ত।—জিহ্বাশ্রিত। মায়াই এই সংসারের
কারণ, মায়াই যদি সেই ভগবানেরই হয় তবে সেই মায়াই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই আছে।
ধাকিবে ও সূত্রবৎ তাহার নিবৃত্তি কখনও সম্ভব হইতে পারে না—এই আশঙ্কা নিবারণের
জন্য কি উপায়ে এই সংসার-কারণের নিবৃত্তি হইতে পারে ভগবান সেই উপায় এই—
যার বলিবে। চতুর্দশ অধ্যায়ে ভগবান বলিয়াছেন শ্রুতি হইতে উপায় স-বজ্ঞানমোক্ষ
এই অব্যয় দেহীকে আবদ্ধ করে। সূত্রবৎ এই গুণত্রয়কে যে অতিক্রম করিতে না পারে
তাঁহার স্ব স্বরূপে অবস্থান বা মুক্তিসাধনের আশা নাই। কঠিন হইলেও গুণত্রয়কে অতিক্রম
করা যায়, ভগবদ্ভক্তি ও অঙ্গ শস্ত্রের দ্বারা। তবে অঙ্গ-শস্ত্র লাভের জন্য ও ভগবদ্ভক্তির
জন্য জীবকে উপযুক্ত হইতে হয়। জীবকে ইহার অধিকারী করিবার জন্যই বোদ্ধান্ত
বর্ণাশ্রম ধর্মের আবশ্যিকতা। সমস্ত জীবই একেবারে ব্রহ্ম হইতে পারে না, এই ব্রহ্ম-
জ্ঞান লাভের জন্য প্রতিজ্ঞা মাহুবকে প্রযত্ন করিয়া থাকিতে হয়। এই প্রযত্নের ফলে
বৈষ্ণবর্গে অধিকার জন্মে। তখন নিজ নিজ সাধন ও চেষ্টা দ্বারা কেহ বৈষ্ণ, কেহ ক্রিয়,
কেহ বা ব্রাহ্মণ হয়। এই অধিকার লাভের পূর্বে সকলেই শূদ্র থাকে। এখন এখানে
সংশয় হইতে পারে ভগবান সর্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন, তবে তিনি আবার পৃথক পৃথক ২৭
শ্রেণী ধর্মের সৃষ্টি করিলেন কেন? সেই সংশয় দূর করিবার জন্য ভগবান বলিতেছেন যে

(ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক কৰ্ম)

শৌৰ্য্যং তেজোবৃদ্ধিৰ্দ্দাক্ষ্যঃ যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্ ।

দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কৰ্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪৩

বিক কৰ্ম, এই ধৰ্মের দ্বাৰাই তাঁহার ব্রাহ্মণত্বের পরিচয় হইয়া থাকে। তিনি ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকেন একজাতি নিম্ন সৰ্বলোকে সমানভাবে দেখিতে পাবেন। ইন্দ্রিয়সকল তাঁহার স্বভাবতঃই অস্তম্ভ এইজন্য তাঁহার বাহ্য ক্রিয়া অধিক হয় না। কূটস্থে তাঁহার স্বাভাবিক লক্ষ্য, এইজন্য মন তাঁহার শূন্য হইয়া যায়। তাঁহার ব্রাহ্মী স্থিতি সৰ্বদা, কোন কৰ্মেই সেইজন্য তাঁহার কপাকাক্ষা থাকে না, কাহারও দোষ তিনি গ্রহণ করেন না সুতরাং সৰ্বদা ক্ষমা তাঁহাকে তজনা করে। তিনি যোনিমুদ্রায় কত কি দেখেন, দেখিয়া কত নুতন নুতন অভিজ্ঞতা লাভ করেন; যে জ্ঞান বাহ্য চেষ্টায় হইতে পারিতনা, কূটস্থের ভিতর তিনি সেই সব দেখেন। তিনি বিজ্ঞান—আরু হন অৰ্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় নেশায় ভোর হইয়া সকলের মধ্যে যে ঐক্য রহিয়াছে তাহা তিনি বুঝে করেন। সেই অবস্থায় যোগীর অনুভব হয় যে ভাষায় দ্বিবা বাকি কিছুই—ই অথচ একপ্রকার অনির্দিষ্ট, একপ্রকার সৰ্বদাই বর্তমান রহিয়াছে। এই সব দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার দৈব বা ব্রহ্মের অন্তরে কোন সন্দেহই আসে না। ক্রিয়ার পর অবস্থায় আপনাকে আপনি থাকিয়া তিনি ব্যবহারিক কৰ্ম্মাদি বাহ্য কিছু করেন তাহা সবই তখন ব্রাহ্মকৰ্ম্ম। ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাসই সাধকের চরম উপলক্ষ। “অভীভ্যোবোপলক্ষ্যতত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি”—“আত্মা আছে” ইহার নিশ্চিত সাক্ষ্য বাহার হয় সেই উপলক্ষিকারীর বুদ্ধিতে আত্মার প্রকৃত স্বরূপ সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। সমাধি—সাধন দ্বাৰাই এই অন্তরের উপলক্ষ হইতে পারে। (১৩শ ও ১৭শ অধ্যায়ে এগুলির ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) ॥ ৪২

অর্থঃ । শৌৰ্য্যং (পরাক্রম), তেজঃ (বীৰ্য্য), বৃদ্ধি (বৈৰ্য্য), দাক্ষ্যং (কার্য্যে কুশলতা) যুদ্ধে চ অপি অপলায়নম্ (এবং যুদ্ধে অপলায়ন), দানম্ (মুক্তহস্ততা, ঐদার্য্য) দৈবরত্নাবঃ চ (প্রভুশক্তি বা নিয়ন্তৃত্ব), ক্ষাত্রং (ক্ষত্রিয়ের) স্বভাবজং কৰ্ম্ম (স্বভাবজাত কৰ্ম্ম) ॥ ৪৩

শ্রীধর । ক্ষত্রিয়স্ত স্বাভাবিকানি কৰ্ম্মাণ্যাহ—শৌৰ্য্যমিতি । শৌৰ্য্যং—পরাক্রমঃ । তেজঃ—প্রাগজ্যোতিঃ । বৃদ্ধিঃ—বৈৰ্য্যম্ । দাক্ষ্যং—কৌশলং । যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্—অপরাধুত্বাৎ । দানম্—ঐদার্য্যম্ । দৈবরত্নাবঃ—নিয়মনশক্তিঃ । এতৎ ক্ষত্রিয়স্ত স্বাভাবিকং কৰ্ম্ম ॥ ৪৩

সঙ্গীতবাদ । [ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক কৰ্ম্ম বলিতেছেন]—পরাক্রম, তেজঃ প্রাগজ্যোতিঃ অর্থাৎ প্রত্যক্ষপন্নমতিত্ব, দক্ষতা যুদ্ধে অপরাধুত্বাৎ, উদারতা, শাসন ক্ষমতা এই সকল ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজাত কৰ্ম্ম ॥ ৪৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—শৌৰ্য্যং=ক্রিয়া করা—তদ্বারায় ক্ষমতা দেখান; বৃদ্ধি=আপনা আপনি ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকা, দাক্ষ্যং অর্থাৎ সৰ্বদা ক্রিয়া করা গুরুবাক্যের দ্বারা বাহ্য লভ্য ক্রিয়া করিতে হটে না অর্থাৎ দিগন্তাশ্রিত ক্রিয়া করে, ক্রিয়া দান করে, সৰ্বদা ক্রিয়ার পর হৃদয়েতে স্থিতি—

(বৈশ্য ও শূদ্রের স্বভাবজাত কৰ্ম)

কৃষিগোরক্ষবাণিজ্যং বৈশ্যকৰ্ম্ম স্বভাবজম্ ।

পরিচর্যাশ্রয়কং কৰ্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥ ৪৪

এই ক্ষত্রিয়ের কৰ্ম্ম, এই ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া।—ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক কৰ্ম্ম (১) শৌৰ্য্য—অষ্টপ্রহর ক্রিয়া করা এবং (২) তেজঃ—ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়াকাল বিবৃতি ইত্যাদি দেখাইতে পারা। ক্রিয়া প্রদা পূর্বক করিতে করিতেই সাধকের অন্তঃশক্তির বিকাশ হয়। যদিও শক্তিলভি যোগাভ্যাসের লক্ষ্য নহে, কিন্তু শক্তির বিকাশ হইতে বুঝা যায় সাধকের সাধনা ঠিক পথেই চলিতেছে। কিন্তু যোগীর পরিশেষে গুণবৈতন্যরূপ পরবৈরাগ্য হইতে বিষয়ের প্রতি পরম উপেক্ষা আনিয়া যায়। তখন যোগী মনে করেন—“প্রাপ্তং প্রাপণীয়ং, ক্ষীণাঃ ক্ষেতব্যঃ ক্লেশাঃ, ছিন্নাঃ শ্লিষ্টপৰ্কা ভবনঃ ক্রমঃ”—(যোগভাষ্য)—“বাহ্য প্রাপণীয় তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি, যে সকল ক্লেশ ক্ষয় করা উচিত সে সকল ক্ষীণ হইয়াছে, ভবনঃ ক্রম অর্থাৎ জন্ম মরণরূপ প্রবাহ ছিন্ন এবং শ্লিষ্টপৰ্ক হইয়াছে। (৩) ধৃতি—বাহ্য লাভ করিলে সাধক আর কিছুতেই অবসন্ন হন না। বাহ্য লক্ষ্য স্থির হইয়া গিয়াছে এবং ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থিতিলাভ হইয়াছে, তাঁহারই প্রকৃত ধৃতি লাভ হইয়াছে। আশ্রয়ক্ষেত্র অবিচ্ছেদ্যে স্থিতি হইতেই ইহা সম্ভব, অভ্যন্ত উৎসাদক না হইলে ইহা হইবার নহে। (৪) দক্ষতা—অর্থাৎ চতুরতা, যিনি সৰ্বদা ক্রিয়া করেন একেবারে সময় নষ্ট করেন না, লাগিয়াই আছেন ক্রিয়াতে—তিনিই চতুর! (৫) অপলায়ন—সাধন পথে সময়ে সময়ে প্রভূত বিষ আনিয়া উপস্থিত হয়, এমন কি যত্ন আসন্ন তবুও তিনি সাধনা ছাড়িয়া দেন না। (৬) দান—একদিকে যেমন বিষয়াদির প্রতি নিস্পৃহতাব হেতু মুক্তহস্ত, অপরদিকে লোককে সম্পদে আনিবার চেষ্টা, ক্রিয়াদান বাহাতে জীবের ভবক্ষুধা নিবারণ হয়। (৭) দৈবরত্নাবঃ—ক্রিয়ার পর হৃদয়ে স্থিতি লাভ, হৃদয় প্রস্থিতি। কূটস্থে সোনার মত যে বর্ণ দেখা যায় তাহার মধ্যে বর্ণের মত বর্ণের বাহাকে সূক্ষ্ম চক্ষু বলে, তাহারই মধ্যে যে দেব বা পুরুষোত্তম বসিয়াছেন তিনিই দৈব। পুরুষোত্তম রূপ যখন দেখা যায় তখন এক ব্রহ্ম বলিয়া বুঝা যায়, কিন্তু তখনও এক বস্তুই যায় না। যখন ক্রিয়ার পর অবস্থায় দ্রষ্টা ও ব্রহ্ম হইয়া যান, তখন পুরুষোত্তম ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যান ॥ ৪৩

অর্থঃ । কৃষিগোরক্ষবাণিজ্যং (কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য) স্বভাবজং বৈশ্যকৰ্ম্ম (বৈশ্যের স্বভাবজ কৰ্ম) । শূদ্রস্ত অপি (আর শূদ্রের) পরিচর্যাশ্রয়কং কৰ্ম্ম (সেবা কৰ্ম) স্বভাবজম্ (স্বভাবজ) ॥ ৪৪

শ্রীধর । বৈশ্যশূদ্রয়োঃ কৰ্ম্ম আহ—কৃষীতি । কৃষিঃ—কৰ্ষণম্ । গাং বক্ষতীতি গোরক্ষঃ তন্তৃত্বাবো গোরক্ষ্যং—পাণ্ডাল্যমিত্যর্থঃ । বাণিজ্যং—ক্রয় বিক্রয়াদি, এতৎ বৈশ্যস্ত স্বাভাবিকং কৰ্ম্ম । ত্রৈবর্গিক পরিচর্যাশ্রয়কং শূদ্রস্যাপি স্বভাবজং কৰ্ম্ম ॥ ৪৪

(অধিকারানুরূপ কৰ্মই সিদ্ধিলাভের হেতু)

যতঃ প্রবৃত্তিভূতানাং যেন সৰ্বমিদং ততম্ ।

স্বকৰ্মণা তমভ্যৰ্থ্য সিদ্ধিং বিন্দ্ভতি মানবঃ ॥ ৪৬

নেশাতেই জগৎ ভুল হইয়া যায়। দৃষ্ট বিদ্যুতি ঘটিলেই ধ্যাভাব ঘোষাকারে অবস্থিত হয়। তবে বাহ্য কৰ্ম বা সাংসারিক কৰ্ম মনের খেয়াল বশতঃ হইয়া থাকে, কিন্তু প্রাণ কৰ্ম সেরূপ নহে—উহার মনের খেয়াল বশতঃ হয় না, তাহা আপনা আপনিই হয়। সেই প্রাণে লক্ষ্য রাখিতে পারিলেই আপনা আপনি জিয়া বদ্ধ হইয়া যায়। যেরূপ ভাবে উহা হয় তাহা বলিতেছি ॥ ৪৫

অম্বয়। যতঃ (যাহা হইতে) ভূতানাং (প্রাণিগণের) প্রবৃত্তিঃ (প্রবৃত্তি বা কৰ্ম চেষ্টা), যেন (যৎকর্তৃক) ইদং সৰ্বং (এই সমস্ত বিশ্ব) ততঃ (ব্যাপ্ত রহিয়াছে), তং (তাহাকে অর্থাৎ ঈশ্বরকে) স্বকৰ্মণা অভ্যৰ্থ্য (নিজ কৰ্ম দ্বারা অর্চনা করিয়া) মানবঃ সিদ্ধিং বিন্দ্ভতি (মানব সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে) ॥ ৪৬

শ্রীধর। তমেবাহ—যত ইতি। যতঃ—অন্তর্যামিণঃ পরমেশ্বরঃ, ভূতানাং—প্রাণিগণাঃ, প্রবৃত্তিঃ—চেষ্টা ভবতি। যেন আত্মনা, সৰ্বমিদং—বিশ্বং, ততঃ—ব্যাপ্তম্। তং—ঈশ্বরং স্বকৰ্মণা অভ্যৰ্থ্য—পূজয়িত্বা, সিদ্ধি লাভতে মহতঃ ॥ ৪৬

বঙ্গানুবাদ। যে অন্তর্যামী পরমেশ্বর হইতে প্রাণিসকলের কার্য চেষ্টা হয় এবং যে ঈশ্বর কর্তৃক এই বিশ্ব ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, সেই ঈশ্বরকে স্বকৰ্ম দ্বারা অর্চনা করিয়া মহতঃ সিদ্ধিলাভ করে ॥ ৪৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—যেখান হইতে সমুদয় প্রবৃত্তি হইতেছে অর্থাৎ যে আত্মা দৃষ্টি অঙ্গদিকে আসক্তি পূর্বক থাকিতেছে—বাহ্য না থাকিলে যিনি মহাদেব হইতেছেন—কখনই কোন বস্তুতে দৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ মর্যাদা স্বর্গে জীব স্তম্ভরূপ নেই, উন্নিমিত্তে তাহার পক্ষে কিছুই নাই—অতএব জীবাত্মাই মূলীভূত কারণ সমুদয় প্রবোদ, অতএব স্বকৰ্ম অর্থাৎ আপনার কৰ্ম ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত জিয়া—ইহা আদর পূর্বক ভক্তির সহিত সৰ্ব্বতোভাবে করার নাম অর্চনা—এইরূপ জিয়া গুরুবাক্যের দ্বারা লভ্য হইয়া সমুদয় বস্তুর সিদ্ধি সমুদয় লোকে পায়—অর্থাৎ যে বস্তুর ইচ্ছা হইলে সে বস্তু পাইল আর ইচ্ছা থাকে না—তদ্রূপ আত্মাতেই আত্মা যখন থাকেন জিয়ার পর অবস্থায়, তখন সব বস্তু পাইলেই যেরূপ ইচ্ছা রহিত হয় তদ্রূপ হয়। যেমন আম খাইলে যে তৃপ্তি হইবে, সেই তৃপ্তিরূপ ফল যদ্যপি সে প্রাপ্ত হইল কিনা খাইয়া; তখন আমাদের াকে দৃষ্টি অর্থাৎ আম পাইবার চেষ্টা কেন করিবে। তাহা সকলেরই জিয়ার ১৮ অবস্থায় অন্তত্ব হইয়া থাকে, বাহ্য গুরুভূতগম্য।—বর্ণ-বিভাগ ভগ্নায়া মনুষ্যের সেধর্ম, তাহা বহিরের কথা। তাহাও মানিয়া চলিতে হইবে, নচেৎ সমানে বিশ্রাম উপস্থিত হয়। কৰ্ম-ফল ও দয়ান্তর-বাহ্যকে ভারতীয় আৰ্য জাতিগণ মাত্র

করিয়া চলেন। এই দৃষ্টিকে কেন্দ্র করিয়াই শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা-সমূহ ব্যবহৃত হইয়াছে। কৰ্ম-ফলাভ্যাস যিনি যে বর্ণের মধ্যে আসিয়া জন্মগ্রহণ করেন তাহাকে সেই বর্ণের ভক্ত শাস্ত্রা-যায়ী যে বিধিব্যবস্থা আছে, তাহাই মানিয়া চলিতে হইবে। একত্র অসন্তোষ প্রকাশ কবাও বা, ঈশ্বরের বিধিকে অস্বীকার করাও ভাই। যাহারা ভগ নকে শ্রদ্ধা করেন তাহারা যেমন আপনার দুঃখ-দারিদ্র্য নিজ-কর্মেই ফল বলিয়াই মনে করেন, সেইরূপ ব্রাহ্মণাদি বর্ণের মধ্যে জন্মগ্রহণ করাও নিজ-নিজ কর্মেই ফল মাত্র, তাহাও ভগবানেরই ব্যবস্থা, সুতরাং তাহাতে অনন্ত হইলে ভগবানের ব্যবস্থাকেই অমাত্র করা হয়। যিনি যে দেহেই জন্ম-গ্রহণ করুন না কেন, উহা তাঁহার প্রাক্তন কর্মেই ফল, সুতরাং উহাই তাঁহার ঈশ্বর-নির্দিষ্ট স্থান। এবং সেই সেই ফলের ফলধর্ম্যমুসারে যেরূপ ধর্ম-কর্ম অবলম্বনীয়—তাহাই তাঁহার স্বধর্ম। মনে হইতে পারে যদি কেহ শূদ্র বা বৈশ্য ফলে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে তো ব্রাহ্মণোচিত কর্মে তাঁহার কোন অধিকার রহিল না, সুতরাং ভগবৎপ্রাপ্তির আশা তাঁহার পক্ষে সুদূর পর্ষদে রহিল!—এই মনে করিয়া কাহারও কাহারও ক্ষোভ হইতে পারে। তাহাদিগকে করুণামিথন ভগবান রূপা করিয়া বলিতেছেন—“এতদ্ভক্তোমাদের ভয় নাই। তোমরা যে ফলেই জন্মগ্রহণ করিয়া থাক না কেন, শাস্ত্র ব্যবস্থাহুয়াই নিজ-নিজ ফল-ধর্ম্যমুদ্রপ ধর্ম প্রতিপালন করিতে পারিলেই এবং তাহা ভগবৎ-প্রীত্যর্থ তনুষ্ঠিত হইলেই তোমাদের চিত্তশুদ্ধি হইবে। হওনা ভূমি ব্যাধ, হওনা ভূমি চণ্ডাল, হওনা ভূমি নীচ শূদ্র; ভূমি আপন আপন ফলধর্মের অনুশাসনে থাকিয়া কৰ্ম করিয়া যাও, কেবল একটি মনে রাখও তোমার স্বকুল বা স্ববর্ণ বিহিত সমস্ত কৰ্ম দ্বারা কেবল তাঁহারই পূজা করিতেছ।” ভগবান অর্চিত হইতেছেন ইহা ভাবিতে পারিলেই কর্মের শুদ্ধি হয়। ভূমি যে নীচ কৰ্ম করিতেছ—ইহাতে ক্ষোভ করিবার কিছু থাকিবে না। তাঁহার ভক্ত পাইখানা পরিষ্কারই করি বা ঘেবপূজাই করি, তাহা সমস্তই একের উদ্দেশ্যে কৃত হয় বলিয়া তাহাতে আর শুদ্ধা-শুদ্ধ বিচার থাকে না। বর্ণাশ্রমের অধিকারানুরূপ কৰ্ম করিয়া যদি ভূমি মনে করিতে পার যে, আমার কৰ্ম আমার স্বধর্ম-শাস্ত্রের ভক্ত নহে—উহা ভগবানের অভিপ্রেত, তাঁহার প্রীতির দৃষ্ট ইহা করিতেছি, তাহা হইলে উক্ত নীচ কোন কর্মের ফলেই তোমার উদ্ধগতিকে বোধ করিতে পারিবে না। যে যেখানে আছে, সে যদি মনে করিতে পারে আমার কৃত কৰ্ম আমার প্রীতির ভক্ত নহে, ইহা ভগবৎপ্রীত্যর্থ সম্পাদিত হইতেছে, তবে সে কৰ্ম আর কৰ্ম মাত্র নহে, তাহা ভগবৎকর্তার অঙ্গরূপে গণ্য। এবং এইভাবে যে কৰ্ম করিতে পারে, সে উচ্চজাতির উচ্চ কর্মের যে ফল সেই ফলেই সে লাভ করিবে। সে সিদ্ধি লাভ করিবে—অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞান লাভের যোগ্যতা লাভ করিবে এবং সে কিছুদিন পরেই মুক্তি পদবীতে আরুঢ় হইতে পারিবে। অন্তর্লক্ষ্য এই শ্লোকের অর্থ এই—আত্মা না থাকিলে আত্মার প্রবৃত্তি নিবৃত্তি কিছুই থাকিতে পারে না। আত্মাই সকলের মূল, তিনি আছেন বলিয়া মন সঙ্কল্প করিয়া এই বিরাট বাহ্য-জগৎকে ব্যক্ত করিতেছে, এবং নানাবিধ বাসনার বশে সুখদুঃখে পুনঃ পুনঃ দগ্ধ হইতেছে; আবার মন সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া আপনার মধ্যে আপনি যখন প্রতিষ্ঠিত হইয়া বর্ণাশ্রমের অধিকারানুরূপ কৰ্ম করিয়া থাকে তখন সেই ধীর পুরুষ আর কোন বস্তুতেই

(স্বধর্মই শ্রেয়ঃ, স্বভাবজ কর্মে পাপ হয় না)

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাত্ সংসৃষ্টিতঃ ।

স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিধম্ ॥ ৪৭

আসক্ত হন না। তখন তিনি মহাদেব, আপনাব আনন্দে আপনি মগ্ন। এই যে ইন্দ্রজাল-সদৃশ মায়। প্রপঞ্চের প্রকাশ—ইহাও সেই আত্মাকে অবলম্বন করিয়াই ব্যক্ত হইতেছে। এই চঞ্চল প্রাণই ভগবানের সেই মায়। রূপ। জল স্থির থাকিলে স্তরঙ্গ থাকে না, কিন্তু বায়ুর সংযোগে যেমন স্থির জলে তরঙ্গ উথিত হয়, সেইরূপ আত্মার স্বকীয় মায়ারাজ্য প্রভাবে আত্মাকে তরঙ্গায়িত বলিয়া মনে হয়। আত্মার সেই চঞ্চল ভাবই চঞ্চল প্রাণ। বায়ু থামিলেই যেমন সমুদ্রের তরঙ্গ কমিয়া যায়, প্রাণের হিলোল রুদ্ধ হইলেও প্রাণ সেইরূপ স্থির হয়। স্থির প্রাণই আত্মা, স্থির প্রাণে যে জ্ঞান প্রকাশিত হয়, তাহাই আত্মজ্ঞান। সাধক কিরূপে সেই আত্মজ্ঞান লাভে সিদ্ধ হইবেন—তাহারই উপায় বলিতেছেন যে স্বকর্মের দ্বারা তাঁহার অর্জনা করিতে হইবে। বাস্তবিক আত্মার তো কোন কর্ম নাই, তাঁহার কর্ম আমরা করনা করি চঞ্চল প্রাণের দ্বারা—সুতরাং এই চঞ্চল প্রাণই আত্মার কর্ম, এবং এই চঞ্চল প্রাণই জগৎ-প্রকাশের মূল কারণ। এই প্রাণের দ্বারা তাহাকে পূজা করিতে হইবে। আদর করিয়া ভক্তির সহিত যিনি এই ফলাকাঙ্ক্ষারহিত আত্ম-কর্ম (খাসপ্রখাসের কর্ম) করেন তিনি সিদ্ধিলাভ করেন, অর্থাৎ তাহারও আর ফলাসক্তি থাকে না, তিনি ক্রিয়ার পর-অবস্থায় পরমা তৃপ্তি লাভ করিয়া ইচ্ছারহিত হইয়া যান ॥ ৪৬

— — —

অর্থঃ। বহুষ্টিতঃ পরধর্মাত্ (উত্তমরূপে অমুষ্টিত পরধর্ম হইতে) বিগুণঃ (অসম্যক অমুষ্টিত) স্বধর্মঃ শ্রেয়ান্ (নিজধর্ম শ্রেষ্ঠ), স্বভাবনিয়তং কর্ম (স্বভাববিহিত কর্ম) কুর্বন্ (করিতে করিতে) কিল্বিধং ন আপ্নোতি (পাপ প্রাপ্ত হয় না) ॥ ৪৭

ত্রীধর। স্বকর্মণোতি বিশেষণত্ব ফলমাহ—শ্রেয়ানিতি। বিগুণোহপি স্বধর্মঃ সম্যক অমুষ্টিতঃপি পরধর্মাত্ শ্রেয়ান্—শ্রেষ্ঠঃ। নীচ বদ্ধবদ্ধাধিযুক্তাদ্বিধাধেঃ স্বধর্মাত্ ভিক্ষাটনাদি-পরধর্মঃ শ্রেষ্ঠ ইতি মন্তব্যম। বতঃ স্বভাবেন পূর্বোক্তেন নিয়তং নিয়মেন উক্তং, কর্ম কুর্বন্ কিল্বিধং নাপ্নোতি ॥ ৪৭

বঙ্গভূবাদ। [স্বকর্মণা—এই বিশেষণের ফল অর্থাৎ সার্থকতা বলিতেছেন]—স্বধর্ম বিগুণ (অজহীন) হইলেও সম্যকরূপে অমুষ্টিত পরধর্ম হইতে শ্রেষ্ঠ। যুদ্ধাদি স্বধর্ম বদ্ধবদ্ধাধি যুক্ত বলিয়া তাহা হইতে ভিক্ষাটনাদিরূপ পর-ধর্ম শ্রেষ্ঠ—ইহা মনে করা উচিত নয়। যেহেতু পূর্বোক্ত স্বভাবনিয়ত (স্বীয় অপ্রমাদ্ব্যবহারী) কর্ম করিলে কেহ পাপ-প্রাপ্ত হয় না ॥ ৪৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ক্রিয়া করিতে যতপিস্তাৎ মধ্যে মধ্যে অন্তর্য্যামিত্যে মন যায় সেও ভাল, কিন্তু একবারে অন্তর্য্যামিত্যে (আত্মা ব্যতীত অন্তর্য্যামিত্যে) বস্তুতে দৃষ্টি রাখা আগ্রহ পূর্বক ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত, তাহাতে মৃত্যুর ভয় আছে, কারণ মৃত্যু না হইলে সে ফলের ভোগ কে করিবে। ক্রিয়া করিতে করিতে হে অনন্ত

পদ অর্থাৎ অন্তঃপ্রহর ক্রিয়ার পর স্থিতি তাহা না হইয়া যদি মৃত্যুও হয় সেও ভাল—কিন্তু আত্মা ব্যতীত অন্তর্য্যামিত্যে দৃষ্টি ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত করিলে মৃত্যু হইবে বটে, কিন্তু কল্যাণের কারণ নিমিত্ত জন্ম-মৃত্যুরই ভয় থাকিল, অর্থাৎ ক্রিয়া কিছুদিন করিলেই ইচ্ছারহিত হইয়া যান—ক্রমশঃ তাহা সকলেরই অর্থাৎ ক্রিয়াক্ষিত ব্যক্তিদের অনুভব হইতেছে—লেখা বাছল্য—ক্রিয়ার পর অবস্থায় থেকে ধ্যান-ধারণা-সমাধিপূর্বক—অন্তর্য্যামিত্যে আসক্তিপূর্বক দৃষ্টি যায় না, সুতরাং কোন পাপও হয় না।—[স্বভাব-নিয়ত কর্মটি আগে বৃত্তিতে হইবে। বাহিরের দিক দিয়া ইহা বৃত্তিতে গেলেও আধুনিক সমাজে ছই দলে ইহার ছই প্রকার ধারণা করেন। ষাঁহার শাস্ত্রমতাবলম্বী—তাঁহার বলেন, স্বভাবনিয়ত কর্ম হইতেছে—যে যে বর্ণের জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই বর্ণের পক্ষে শাস্ত্রে যে কর্ম নির্দিষ্ট আছে, তাহাই তাহার স্বভাবনিয়ত কর্ম। ষাঁহার স্বাধীন চিন্তাশীল তাঁহার বলেন, জাতিগত অধিকার পরিবর্তন করিয়া যে ব্যক্তি যে বর্ণের উপযুক্ত তাহাকে সেই বর্ণধর্মীস্থায়ী চলিতে দেখাই তাহার প্রকৃত স্বভাবনিয়ত কর্ম। ইহা কতক পরিমাণে সত্য হইলেও কে বলিয়া বলিয়া সকলের দ্বারা নির্দেশ করিয়া দিবে এবং কেই বা তাহার সে কথা মানিবে? নিজে নিজে ব্যবস্থা করিতে গেলেই পদে পদে ভুল হইতে পারে। তখন সে ভুলের সংশোধন করিবে কে? সুতরাং এই ভাবের চেষ্টার ফল আরও বিপরীত হইবে। বর্তমান যুগে বর্ণাশ্রম-ধর্ম বিপর্য্যস্ত হইয়াছে সত্য, তাই বলিয়া আমরা নিজ-নিজ মনোমত ধর্ম পালন করিলেই যে তাহা স্বভাব-নিয়ত হইবে—তাহা নহে। এক মহুয়ের মধ্যেই কালে কালে কত পরিবর্তন ঘটে; তাহার দ্বেষ, মন ও স্বভাবের কত পরিবর্তন হইয়া যায়, তাই বলিয়া প্রতি-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বর্ণ ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া দিতে হইবে—এরূপ চিন্তা করা অমুচিত। তাহা হইলে সমাজ ও ধর্মের কোন শৃঙ্খলা থাকে না; বিশেষতঃ যে সমাজ কত যুগ-যুগান্তর হইতে বর্ণাশ্রম-ধর্মীযুগত পন্থাকে অমুসরণ করিয়া আসিতেছে, তাহার পক্ষে এরূপ উচ্ছৃঙ্খল ভাবে পরিবর্তন-প্রদার অমুসরণ করা আত্মহত্যার তুল্যই অনিষ্টজনক বলিয়া মনে হয়। এরূপ যথেষ্ট অমুসরণই উদ্যাবহ পরধর্ম; উহাতে সমাজ-দ্বেষ সমস্ত ভাঙিয়া চুরমার হইয়া যাইবে। যুগধর্ম-প্রভাবে জীবের চিন্তার মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটে, সে স্থলেও নিজ খেয়ালমত ধর্মীযুগের অপেক্ষা যথাসাধ্য শাস্ত্রনিয়ত স্ব স্ব বর্ণাশ্রম-বিহিত ধর্মীযুগের পালন করিবার চেষ্টাই স্বধর্ম-পালন। কলিযুগে বিশেষতঃ কোন বর্ণই পূর্ণরূপে বর্ণাশ্রমোচিত ধর্মপালনে সক্ষম থাকিবে না, তাহা জানিয়াই ধর্মবিগণ যুগ-ধর্মীযুগী ধর্মীযুগীনের সদ্ব্যবস্থা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আবার ব্রাহ্মণকেই অনেক দোষী সাব্যস্ত করিয়া থাকেন। কতক পরিমাণে ব্রাহ্মণের দোষী হইলেও সমস্ত বর্ণ ও আশ্রমের মধ্যেই যে দোষ আনিয়া পড়িয়াছে এবং তজ্জন্ম প্রত্যেক আশ্রমেই ধর্মের অক্ষয়ানি পরিলক্ষিত হইতেছে—ইহা কালকৃত; কালের প্রভাবে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই যুগে সেই সকল জীবেরই অধিক পরিমাণে আবির্ভাব হইয়াছে, যাহাদের পূর্ব কর্ম এই দুই যুগেরই উপযোগী। তথাপি বিচারশক্তি-সহযোগে পুরুষকার-প্রভাবে, মহুয় আপনাব দৈব হইতে আপনাকে উত্তোলন করিতে পারে। এই জ্ঞানই শাস্ত্র-

সমস্ত আচার, অনুষ্ঠান ও সাধনাদির প্রয়োজন হইয়া থাকে। কিন্তু এতদ্ব্যতীত নূতন করিয়া বর্ণাশ্রম-বিধির পরিবর্তনের কোন আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। সকল বর্ণই স্ব-স্ব স্থান হইতে নীচে নামিয়া গিয়াছে, আবার সকল বর্ণই চেষ্টা দ্বারা স্ব-স্ব বর্ণোচিত ধৰ্মে উন্নত হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত সমস্ত সনাতনশাস্ত্র শূদ্র বা নীচ জাতিতে উপনয়ন দ্বারা ব্রাহ্মণ না করিলেও কোন ক্ষতি হইবে না। পতিত ব্রাহ্মণ ও সনাতনশাস্ত্র হইলে আবার ব্রাহ্মণই হইবে, পতিত ক্ষত্রিয় তরুণ সনাতনশাস্ত্র হইয়া আবার ক্ষত্রিয়ই হইবে, এবং শূদ্রও শুদ্ধাশ্রমঃকরণে ভগবদ্ভজন করিতে করিতেই বিশুদ্ধ হইয়া যাইবে; কিন্তু তাই বলিয়া ভাড়াভাড়া তাহার গলায় উপবীত পরাইয়া তাহাকে ব্রাহ্মণ করা চলিবে না। ইহাতে সমাজ শৃঙ্খলার বিশেষ হানি হইয়া থাকে। কাল প্রভাবে আত্মব্রহ্মের শাধা পত্রও পরিবর্তিত হইয়া যাইতে পারে, তাহাতে ফল-সমাগমও না হইতে পারে, এমন কি তাহাকে আত্মব্রহ্ম বলিয়া চিনিতে পারাও কঠিন হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে পরিশ্রম ও যত্ন করিলে এবং বিবিধ উপায়ে উত্তম পাট করিলে আবার তাহাতে নব পত্র ও ফলোদগম হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে যে ফল ধরিবে তাহা তাহার স্ব জাতির অনুরূপই হইবে, উহা কখনও অন্য জাতীয় ফল দান করিবে না। তরুণ নিজ নিজ বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম পালন করিলে এই কলিযুগও স্ব-স্ব বর্ণাশ্রমগত উৎকর্ষ লাভ হইতে পারে। অতএব সেই রূপ পরিবর্তনে সচেষ্ট না হইয়া নূতন করিয়া সমাজ গঠন করিবার চেষ্টা করিলে বা নিজ ইচ্ছামত সমাজে পরিবর্তন আনিবার চেষ্টা করিলে, আমাদের আশা সফল হইবে না; উহাতে ধর্ম রক্ষাও হইবে না, সমাজ রক্ষাও হইবে না। বরং ইহাই সমীচীন হইবে—যিনি যে বর্ণেই উৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহার শাস্ত্রসম্মত বর্ণাশ্রমগত ধর্মপালনই কর্তব্য, এইরূপ কর্তব্য পালনে যিনি যতটা সচেষ্ট হইবেন, তাঁহার তত্ত্বরূপ গুণের উৎকর্ষ এবং উন্নতি লাভ হইবে। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র যদি পূর্ণভাবে স্বধর্ম পালনে যত্নশীল হ'ন, তবে তাঁহার নিজ জীবনেই উচ্চভাবের অমূল্য নিজ নিজ স্বভাবের পরিবর্তন দেখিতে পাইবেন। এই পরিবর্তন দেখিয়া তখন স্পষ্ট বুদ্ধিতে পারা যাইবে যে, অতঃপর পরজন্মে ইহারা উচ্চতম বর্ণের মধ্যেই জন্মলাভ করিবেন। আবার ব্রাহ্মণের মধ্যে যদি বর্ণ-বিগর্হিত নীচ ভাবের প্রভাব লক্ষিত হয় বা তাঁহাদের চরিত্র দূষিত হইয়া নিজ উচ্চবর্ণের অমূল্য হইয়া উঠে, তবে তাঁহাদিগকেও পব-জন্মে নীচত্ব ও নীচবর্ণের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। জ্যোতিষ শাস্ত্র (ভৃগুসংহিতা) মতেও একথা সুসিদ্ধ। কিন্তু প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বভাবানুযায়ী জাতি নির্ণয় করিতে হইলে সমস্ত সমাজ ও শাস্ত্র ব্যবহার অচল হইয়া উঠিবে। মহাত্মারক্তের অমুশাসন পরীক্ষায় আছে বটে—“শূদ্রও যদি পবিত্র কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা বিশুদ্ধা ও দ্বিতীয় হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকেও ব্রাহ্মণের দায় সমাদর করা কর্তব্য”; তাহা এখনও লোকে করিয়া থাকে, নীচত্ব লোক উৎপন্ন হইলেও লোকে তাহাকে ব্রাহ্মণের মতই সমাদর করে। জন্মসংস্কার ও বংশ দেখিয়াই সব সময়ে মধ্যমা নিরূপিত হয় না, সনাতন দ্বারা ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য; সেই সনাতন ব্রাহ্মণের মধ্যে না থাকিলে সে ব্রাহ্মণকে কেহই তো সমাদর করে না, পবিত্র ব্রাহ্মণোচিত সনাতন শূদ্রের মধ্যে থাকিলে সে শূদ্রকেও লোকে ব্রাহ্মণের মত সম্মান দিয়া থাকে। শম-দমাদি সাধনে সকলেইই অধিকার আছে, সকলেই তাহা করিতে পারেন এবং শম-দমাদিসম্পন্ন শূদ্রকে সকলেই সম্মান করিয়া থাকে,

কিন্তু সনাতনশাস্ত্র শূদ্রকে ব্রাহ্মণের আসনে বসাইয়া ব্রাহ্মণোচিত কার্য্য করাইতে হইলে এক ঘিরাট উচ্ছৃঙ্খলতায় সমস্ত ভবিয়া যাইবে, এবং তাহাতে এত অনর্থ উৎপন্ন হইবে যে, পরিশেষে তাহা আর সামসানো অনন্তব হইয়া পড়িবে।]

এইবার অন্তর্লক্ষ্যের কথা বলি:—

স্বধর্ম—আত্মধর্ম পরমানন্দরূপে স্থিতি লাভই জীবের স্বধর্ম। এই পরিস্থিতি লাভের যে চেষ্টা তাহার নামই স্বধর্ম রক্ষা বা পালন। কিন্তু অধিকাংশ জীবই স্বধর্মভ্রষ্ট, আত্মস্থিতি তাহার নাই, তাই বহির্মুখ জীব আত্মজ্ঞান লাভে সচেষ্ট না হইয়া প্রতিনিয়ত সংসারচক্রে পরিলব্ধ করিতেছে। এই স্থিতিলাভের উপায় আছে, সেই উপায় অবলম্বন করিয়া আত্মস্থিতি রত হওয়াই স্বধর্ম পালন। এই আত্মস্থিতির চেষ্টা হইতেই জীব আত্মজ্ঞান লাভে সমর্থ এবং তাহার এই পশুপাশ মোচন হয়। যতদিন জীব আত্মার দিকে লক্ষ্য না করে, ততদিন সে ইন্দ্রিয়সক্ত হইয়া পশুর মতই জীবন ব্যাপন করে। এই ইন্দ্রিয়সক্তির পর-ধর্ম (পরের ধর্ম)—ইহা বাস্তবিকই ভয়াবহ। ইন্দ্রিয়সক্তি থাকিতে জীবের আত্মজ্ঞান লাভ সম্ভব নহে, সূত্রগত তাহার “মহতী বিনষ্টি” বা মহাবিনাশ হইয়া থাকে। এখানে একটি সন্দেহ আসে যাহাকে স্বধর্ম বা আত্মধর্ম বলা হইতেছে, তাহা আবার কিগণ কি করিয়া হয়? যেমন জলের শৈত্যগুণ, মননের উষ্ণতা—তাহার স্বধর্ম, তেমনি আত্মারও একটা স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম আছে, তাহা আত্মাতেই নিহিত। মনে হইতে পারে আত্মা বা ব্রহ্ম তো নিগুণ, নিগুণের ধর্ম কেমন করিয়া থাকে? অবশ্য শূদ্র ব্রহ্মের গুণের কল্পনা নাই, কিন্তু মায়াকবলিত যে ব্রহ্ম তন্মধ্যে তাহা আছে সূত্রগত তাহাতে গুণ বা ধর্মের অভাব কেন হইবে? শূদ্র ব্রহ্মও সর্বদা পরিপূর্ণ, বিশুদ্ধ-স্বভাব ও নিগুণ। তাহার কর্তব্যাকর্তব্য কিছু না থাকিলেও—“নানবাগ্ধবাপ্তব্যং বস্ত্রং এব চ কর্ণণি”—এবং প্রাপ্তব্য বা-অপ্রাপ্তব্য কিছু না থাকিলেও আমি কর্ণে ব্যাপ্তই রহিয়াছি। তাঁহার কোন সঙ্কল্প বা কামনা নাই, তবুও যে তাহাকে কর্ণে ব্যাপ্ত থাকিতে হয়—ইহা কি প্রকারে সম্ভব হয়? ইহাকেই যোগীরা অনিচ্ছার ইচ্ছা বলেন। উপনিষদে আছে—

“যথা সূর্য্যগাং পাবকাদিশ্চুদিতাঃ

সহস্রাঃ প্রভবন্তে স্রুপাঃ।

তথাক্ষরাদিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ

প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যতিঃ” যুগুৎ

যেমন প্রজলিত অগ্নি হইতে সহস্র সহস্র অগ্নিসদৃশ উজ্জলকণা নির্গত হয়, সেইরূপ অক্ষর পুরুষ হইতে নানা প্রকার ভাবযুক্ত জীবগণ উৎপন্ন হয় এবং তাহাতেই প্রলয় কালে বিলীন হয়।

“এতৎস্বাক্ষর্য্যতে প্রাণো মনঃ সর্কেন্দ্রিয়ানি চ।

থং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্ত ধারিণী” যুগুৎ

এই পুরুষ হইতে, প্রাণশক্তি, মনঃ অর্থাৎ চিন্তাশক্তি, সর্কেন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও সর্ববস্তুর আধার পৃথিবী উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ব্রহ্মের সঙ্কল্পে এত সব কাণ্ড হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার নিজ প্রয়োজন কিছু নাই, যাহা কিছু হয়—সমস্তই তাঁহার অনিচ্ছার ইচ্ছার। এই অনিচ্ছার ইচ্ছাটিই আত্মার স্বধর্ম। এই

হইতে সরিয়া যায়। প্রাণের অন্তঃপ্রবাহটাই সহজ কর্ণ, উহা বহির্গত হইলেই দোষযুক্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু দোষযুক্ত হইলেও উহা পরিত্যাগ করিয়া লাভ নাই। পরিত্যাগ করিলে আবার সেই সহজ জ্ঞান লাভ হইবে না। বহিঃপ্রবাহটিকে অন্তর্গত করিবার প্রচেষ্টাই প্রাণায়ামাধি কৌশল। কিন্তু উহা অনায়াসসাধ্যও নহে এবং তাহা সুখকর সাধনাও নহে। তবুও বাহ্য প্রাণ-প্রবাহের গতি ফিরাইবার জন্য ঐক্লপ সাধনা অভ্যাস করিতে থাকেন, প্রথম প্রথম তাহা সৰ্ব্বতোভাবে ঠিক হয় না, এই জন্য অনেকের মন বিগড়াইয়া যায়, কিন্তু তবু ক্রিয়া ত্যাগ করা উচিত নহে। কারণ এই ক্রিয়া ব্যতীত প্রাণকে অন্তর্গত করিয়া দিবার আর কোন শ্রেষ্ঠ উপায় নাই, সুতরাং প্রথম প্রথম তাহা যত নীরসই বোধ হউক, কলাপকামী সাধকের তবুও তাহা করিয়া যাওয়া উচিত। সমস্ত কৰ্মের প্রথম চেষ্টা দোষযুক্তই হইয়া থাকে। কিন্তু যিনি কিছু ক্রেশ স্বীকার করিয়া এই কার্যে লাগিয়া থাকেন, তিনি অনতিবিলম্বেই ইহার আনন্দ নিজে নিজেই বুকিতে পারেন। কোথায় বিশ্ববোরা মন! আর কোথায় স্থির প্রশান্ত আত্মহ মন! মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হইবামাত্রই প্রাণের বহির্গত গতি আরম্ভ হয়, তখন বেহে আত্মবোধ হয় এবং দেহজনিত ও দেহের অক্ষমতাজনিত কত ক্রেশ হয়,—শিশু কেবলই বোদন করে—কিতরের খাইটী হারাইয়া যায়, বাহিরের সঙ্গেও তেমন মিশ যায় না—জীবের এই শোকাবহ অবস্থাটাই শূদ্রভাব। তারপর বালকের উপনয়ন হয় অর্থাৎ গুরুর নিকট উপনীত হয়, গুরু তখন তাহার প্রাণক্রিয়া বাহ্যতে অন্তর্গত হইতে পারে, সেইরূপ শিক্ষা-দীক্ষা প্রদান করেন। গুরু বলপূর্বক শিষ্যের চিত্তকে অন্তর্গত করিয়া দিয়া ক্ষণিকের জন্য “তৎপদং” দর্শন করাইয়া দেন। প্রাণের বহির্গত গতি হইতেই মনে যেমন বিষয়াকারা বৃত্তির উদয় হয়, আবার অন্তর্গত চালনার অভ্যাসে তেমনই ভিন্নাকারা বৃত্তির উদয় হইতে থাকে। প্রথম প্রথম সাধনা করিতে গিয়া সাধকের অনেক কিছু পাইবার আশা করে, নিজের শক্তি দেখাইতে ইচ্ছা হয়—তখনই বৈশ্রভাব, ফলা-কার্যকার সহিত কর্ণ হইতে থাকে। পরে ক্ষত্রিয়ভাব—আজ্ঞাজ্ঞান লাভের জন্য রীতিমত যুদ্ধের আয়োজন করিতে হয়। এই যুদ্ধ ব্যাপারটাই ক্রমশঃ ক্ষিত্তি-ভেদের সাধনা। ঐ অবস্থায় সাধকের যে ক্রিয়ার আবশ্যক হয়, তাহাই তখন তাহার স্বভাবজন কর্ণ। বৈশ্রভাব সাধনার স্রাব যুগ হইবে। ধীরে ধীরে প্রাণকে উঠাইতে নামাইতে হইবে, তাহার মধ্যে কোন ভীততা বা বল-প্রয়োগ থাকিবে না। এইভাবে সাধনে কিছুকাল অত্যন্ত হওয়ার পর শাসের আকর্ষণ বিকর্ষণে যখন কোন কষ্ট থাকিবে না, চান্দা-ফেলা দীর্ঘ হইয়া গাইবে, তখন সাধক এ অবস্থা হইতে উন্নততর দীক্ষায় দীক্ষিত হইবেন। ক্রমে ক্রমে সাধনার কঠোরতা বাড়িবে, উহাই ক্ষত্রিয় ভাব। এইখানে শাসের উপর বল প্রয়োগ করিতে হইবে, কৃষ্ণকের দ্বারা বলপূর্বক বায়ুকে সূক্ষ্মার মুখে বিচালিত করিতে হইবে, ‘বলাৎকায়ে গৃহীয়াৎ’ ইহাই ক্ষত্রিয়ের দিগ্বিজয় বা অশ্বমেধ যজ্ঞ। এই প্রকার করিতে করিতে একরিকে যেমন শৌর্ধ্য, তেজঃ, যোগধারণা ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা আসিবে, তেমনই অষ্টদিকের রিপুদের সহিত প্রবল ভাবে যুদ্ধ করিতে হইবে, মনে হইলে আর যেন পারিলাম না, তখনও যুদ্ধ তর দিলে চলিবে না, যুদ্ধে অপলায়ন ভাবটাই ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম। তাহার পর যোগীর অনেক প্রকার

(নাস্তিকত্যাগ ও সংযমের দ্বারা যোগীর নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি)

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।

নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৯

শক্তিলভ হয়, মেরুধোর মধ্যে এক চক্রের পর আর এক চক্রে উপান হইতে থাকে—তবুও হইতে থাকে, ইহার নামই পরব্রাহ্ম জয়। যোগী তখন আসক্ত হইয়া সমস্ত শক্তির সব্যবহার করিবেন। ইহাই ঈশ্বর-ভাব এবং অন্যকে সংপদ দেখাইয়া দেওয়া—উহাই শ্রেষ্ঠ দান। হরংস্থি ভেদ হইলেই ক্ষত্রিয়ভাব শেষ হইয়া গেল—তখন যোগী সর্ব বিষয়ে স্থির মন শান্ত, দ্বন্দ্ব, জিতাত্মা ও জিতেদ্রিয় হইয়া সর্বদা স্থির হইয়া ব্রহ্মা য থাকেন। তখন মনের কোন সঙ্কল্প না থাকায়—“যদুচ্ছালাত-সন্তোষদ্বার্তা-তা বিমৎসরঃ। সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ ক্রতাপি ন নিবধ্যতে”।—এই ত্যাগ কেহ ইচ্ছাপূর্বক ছোর করিয়া করিতে পারে না, উপযুক্ত সময়ে সাধকের আপনা-আপনিই সমস্তই ত্যাগ হইয়া যায়—ইহাই ব্রাহ্মণ ভাব, সর্বশেষ ও সর্বোচ্চ অধিকার! ॥ ৪৮

অর্থঃ। সর্বত্র (সর্ববিষয়ে) অসক্তবুদ্ধিঃ (আসক্তিশূন্য), জিতাত্মা (জিতেদ্রিয় বা বশীকৃতাত্মঃকরণ), বিগতস্পৃহঃ (স্পৃহাশূন্য ব্যক্তি), সন্ন্যাসেন (কৰ্ম ও তাহার ফলে আসক্ত-ত্যাগ রূপ সন্ন্যাস লক্ষণ দ্বারা), পরমাং নৈষ্কর্ম্য-সিদ্ধিং (আত্মজ্ঞান রূপ পরমাসিদ্ধি) অধি-গচ্ছতি (প্রাপ্ত হন) ॥ ৪৯

শ্রীঃ। নহু কৰ্ম্মণি ক্রিয়মাণে কথং দে-শপ্রহাণেন গুণাংশ এব সম্প্রত্যন্তে, ইত্য-পেক্ষায়ামাহ—অসক্তবুদ্ধিরিতি। অসক্তা : শূন্য বুদ্ধিঃ। জিতাত্মা—নিরহঙ্কারঃ। বিগতস্পৃহঃ—বিগতাস্পৃহা ফলবিষয়েচ্ছা যন্তাৎ ২:। এবভূতেন সজ্ঞত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ—ইত্যেবং পূর্বোক্তেন কৰ্ম্মাসক্তিত্বং ফলয়োক্ত্যাগলক্ষণেন সন্ন্যাসেন নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং—সর্বকৰ্ম্ম নিবৃত্তিলক্ষণং সত্ত্বত্বম্ অধিগচ্ছতি। যতাপি সজ্ঞফলয়োঃ ত্যাগেন কৰ্ম্মাহুষ্ঠানমপি নৈষ্কর্ম্য-মেব। কৰ্ম্মস্বাভিনিবেশাভাবাৎ। তদুক্তং—“নৈব কিঞ্চিৎ কৰোমীতি যুক্তো মন্তেজ কবচিং” ইত্যাদি শ্লোক-চতুষ্টয়েন। তথাপি অনেন উক্তলক্ষণেন সন্ন্যাসেন পরমাং নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং “সর্বকৰ্ম্মণি মনসা সংতুজ্ঞাত্তে স্তবং বশী” ইত্যেবং লক্ষণং পারমহংসচর্য্যাম্ আপ্রোতি ॥ ৪৯

বজ্রাভ্যুবাধ। [যদি বল ক্রিয়মাণ কৰ্ম্ম সকলের দোষাংশ পরিত্যাগে কিরূপে গুণাংশ প্রাপ্ত হওয়া যায়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন]—অসক্ত অর্থাৎ সঙ্গশূন্য বাহার বুদ্ধি। জিতাত্মা অর্থাৎ নিরহঙ্কার। যে ব্যক্তি হইতে ফলবিষয়ক স্পৃহা বিগত হইয়াছে তিনি বিগতস্পৃহ। আশক্তি ও ফলত্যাগই সাত্ত্বিক ত্যাগ—এইরূপ পূর্বোক্ত শ্লোকোক্ত কৰ্ম্মাসক্তি ও ফলত্যাগ রূপ যে সন্ন্যাস, তদ্বারা নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি অর্থাৎ সর্বকৰ্ম্মের নিবৃত্তিরূপ যে সত্ত্বত্ব তাহা প্রাপ্ত হয়। যতাপি সজ্ঞ ও ফলত্যাগপূর্বক যে কৰ্ম্মাহুষ্ঠান তাহা নৈষ্কর্ম্যই, যেহেতু ঐরূপ কৰ্ম্ম-

হুঁচান কৰ্ত্তব্যভিনিবেশের অভাব হয়। আর তাহাই “নৈব কিঞ্চিৎ কদোষীতি” ৪টা শ্লোক দ্বারা পঞ্চমাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। তথাপি এই শ্লোকোক্ত সন্ন্যাসের দ্বারা পবনা নৈকৰ্ম্ম্য সিদ্ধি বাহ্য পক্ষম অধ্যায়ে “সৰ্বকৰ্ম্মাণি মনসা সংন্তস্তান্তে সুখং বশী” সেই পরমহংসচর্য্যাকপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়—ইহাই বিশেষত্ব। ৪২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—কোন বিষয়ে আসক্তিপূর্ব্বক দৃষ্টি করিবে না, বর্ত্তমান অবস্থায় ও ক্রিয়ার পর অবস্থায় সৰ্ব্বদা থেকে আত্মাকে আত্মার দ্বারায় ক্রিয়ার স্বরূপ লড়াই করে জিতে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থেকে যখন সব বিষয়ে ইচ্ছা হইতে রহিত হইয়া যায় তখন আর কোন কৰ্ম্ম ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত থাকে না—যখন কোন বিষয়ের ইচ্ছা না থাকিল, বাহ্য ইচ্ছা করিয়া পাইয়া হইত, সুতরাং সব বিষয়ের প্রাপ্তি হইল, যাহার নাম সিদ্ধি তো সেই পরম অর্থাৎ সকলের পরব্রহ্মস্বরূপ হইলে তিনি যেমত অকৰ্ত্তা অথচ কৰ্ত্তা তেমনি ইচ্ছারহিত হইয়া সমুদয় ইচ্ছা সম্পন্ন (ইচ্ছা না করিয়া) হয়—ইহারই নাম সিদ্ধি ও সন্ন্যাসী অর্থাৎ বাহ্য কিছুই ইচ্ছা হয় বর্ত্তমান অবস্থায় অনাবশ্যক কৰ্ম্মের তাহা করে না—এইরূপ স্থিরবুদ্ধি ক্রিয়ার পর অবস্থায় হয়।—আত্মাতে মন রাখিতে রাখিতে আর কোন বাহ্য বিষয়ে আসক্তি আসিবে না। এতদ্ব্যতীত মন খুব বুদ্ধ করিতে হয়, কিন্তু ক্রিয়া করিয়া ক্রমশঃ ক্রিয়ার দ্বারা যখন পরাবস্থা লাভ হয়, সব ইন্দ্রিয় ক্ষয় হওয়ায় তখন আর বিষয়ে স্পৃহা থাকে না। স্বকৰ্ম্মদ্বারা ঈশ্বরার্চনা করিলেই উক্তরূপ সিদ্ধিলাভ হয়। তখন তিনি অনিচ্ছার ইচ্ছায় সকল কৰ্ম্ম করেন, কিন্তু কৰ্ম্মে আর আসক্তি থাকে না এবং ফলের আকাঙ্ক্ষাও থাকে না। তখন তিনি কৰ্ত্তা হইয়াও অকৰ্ত্তা অথচ সব কাজ ঠিকমত হইয়া যাইতেছে, এবং ইচ্ছারহিত হইলেও কোন কাজ তাঁর আটকায় না, সব কে যেন করিয়া দেয়। এই অবস্থার নামই “নৈকৰ্ম্ম্যসিদ্ধি”—সৰ্বকৰ্ম্মনিবৃত্তি, কারণ ইচ্ছারহিত, অথচ সৰ্বকৰ্ম্ম ফলা কাঙ্ক্ষা করিয়া করিলে যে ফল, ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়াও তাঁহার তাহাই হয়। সাধারণতঃ সকামী ব্যক্তিদের কামনার পূর্ত্তিতে যে কৃতকৃত্যতা বোধ হয়, তাঁহার স্পৃহা না থাকায় বস্তুর প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তিতে তাঁহার আনন্দের কোন বিষ উৎপন্ন করে না। প্রথমে ক্রিয়াক্রান্ত করিতে হইবে, এই ক্রিয়া করিতে করিতে মন ও ইন্দ্রিয়ের যে এক প্রকার উপরাম হয় অর্থাৎ মন ও ইন্দ্রিয় বাহ্য বস্তুতে প্রসক্তি দেখায় না তাহাই কৰ্ম্মজা-সিদ্ধি, এতদ্বারা জ্ঞান-নিষ্ঠার বোগ্যতা লাভ হয়। জ্ঞাননিষ্ঠাই ক্রিয়ার পর অবস্থাতে থাকা। এইরূপ থাকা অধিকক্ষণ ও ইচ্ছামত হইলেই নৈকৰ্ম্ম্যসিদ্ধি লাভ হয়। নৈকৰ্ম্ম্যসিদ্ধি বাহার হয় তাহার মধ্যে নিম্নোক্ত লক্ষণ সকল ফুটিয়া উঠে। তাহার তখন ধন, জন, গৃহ বা পুত্র-দাবাদিতে আসক্তি থাকে না। অন্তঃকরণ তখন তাহার বশীভূত হইয়া গিয়াছে। দেহ, ভোগ বা জীবনধারণেও তাঁহার কোন স্পৃহা নাই। তখন তাঁহার মন কল্পনার অভাবে আত্মাকারে স্থিত হয়। ইহাই নৈকৰ্ম্ম্যসিদ্ধি। এই নৈকৰ্ম্ম্যসিদ্ধির চরম বা পরমাবস্থা হইতেছে—তাঁহার বুদ্ধি সৰ্ব্বদা স্থির। ক্রিয়ার পর অবস্থা অষ্টপ্রহর এইরূপ থাকিলে ‘সৰ্বা ব্রহ্মময়ঃ ভাব হইয়া যায়’ ৪২

(নৈকৰ্ম্ম্যসিদ্ধির সাধনক্রম বলিবার প্রতিজ্ঞা)

সিদ্ধি প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্রোতি নিবোধ মে।

সমাসেনৈব কৌন্তেয় নির্ণা জ্ঞানস্ত যা পরা ॥ ৫০

অর্থঃ। কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয়!) সিদ্ধি প্রাপ্তঃ (সিদ্ধি প্রাপ্ত ব্যক্তি) যথা (যেদ্বারা) ব্রহ্ম আশ্রোতি (ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়) তথা (তাহা) সমাসেন এব (সংক্ষেপেই) মে নিবোধ (আমার নিকট শ্রবণ কর), যা (যাহা অর্থাৎ যে ব্রহ্মপ্রাপ্তি) জ্ঞানস্ত পরা নির্ণা (জ্ঞানের চরম নির্ণা বা পরিসমাপ্তি) ॥ ৫০

শ্রীধর। এবভূতস্ত পরমহংসস্ত জ্ঞাননিষ্ঠস্য ব্রহ্মভাবপ্রকারমহ—সিদ্ধিঃ প্রাপ্ত ইতি ষড়্ভূতিঃ। নৈকৰ্ম্ম্যসিদ্ধিঃ প্রাপ্তঃ সন্, যথা—যেন প্রকারেন, ব্রহ্ম প্রাপ্তোতি। তথা—তং প্রকারং সংক্ষেপেনৈব মে বচনাৎ নিবোধ—শৃণু ॥ ৫০

বঙ্গানুবাদ। [এবভূত পরমহংসের জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বারা যে ব্রহ্মভাব হয় তাহারই প্রকার ছয়টি শ্লোক দ্বারা বলিতেছেন]—নৈকৰ্ম্ম্যসিদ্ধিপ্রাপ্ত পুরুষ যে প্রকারে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন সেই প্রকারটি [যাহা জ্ঞানের চরম নির্ণা বা পরিসমাপ্তি] সংক্ষেপেই বলিতেছি তুমি ॥ ৫০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এইরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইয়া সমুদয় সিদ্ধিকে পায় যেদ্বারা করিয়া তাহা বোঝ—নিঃশেষরূপ স্থিতি, আর ব্রহ্মদর্শন ব্রহ্মভেদে থেকে ক্রিয়ার পর অবস্থা সেই পরা অর্থাৎ যাহার পর আর কিছুই নাই ব্রহ্ম ব্যতীত।—বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়গুলি মিলিত হইয়া কৰ্ম্ম উৎপন্ন করে, যখন এগুলি আর কৰ্ম্ম উৎপত্তি করিতে পারে না তখনই নৈকৰ্ম্ম্যসিদ্ধি হয়। কিন্তু সাধনার এই নৈকৰ্ম্ম্যসিদ্ধি হইতে পারে তাহাই ভগবান্ এইবার বলিবেন। জ্ঞান এবং জ্ঞানের পরি-সমাপ্তি—জ্ঞান হইলে, স্বকৰ্ম্মের আত্মাকারে স্থিত বাহ্য ক্রিয়ার পর অবস্থায় হইয়া থাকে, আর ক্রিয়ার পর অবস্থার বিশেষরূপে স্থিতিই পরম সিদ্ধি। জ্ঞানই জ্ঞেয়াকারে প্রকাশিত হয়, এইজন্ত জ্ঞান ও জ্ঞেয় অভেদ। সূর্য্য কিবল যেমন দ্বার, ছিদ্র ও গবাক্ষ পথ দ্বারা গৃহমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ আত্মচৈতন্য মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ঐ সকলকে চৈতন্যময় করে। চৈতন্য উদাহের ধর্ম্ম নহে। দেহ হইতে বুদ্ধি পর্য্যন্ত সনাত্ত জড় পদার্থে চৈতন্যের আভাস বর্ত্তমান বলিয়া ঐ সকল বস্তুতে আত্মভ্রম হয়। সেইজন্ত আত্মজ্ঞান বৃত্তঃসিদ্ধ হইলেও তাহাতে যে নামরূপময় ভূতের আবেশ করা হয় তাহার নিবৃত্তি করিতে পারিলেই আর দেহাধিতে আত্মভ্রম হইতে পারিলে না। আত্মজ্ঞান বৃত্তঃসিদ্ধ বস্ত্ত স্তব্ধতা তাহার জন্ত প্রয়োজ্য প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজ্য প্রয়োজন হয় আত্মজ্ঞান নিবৃত্তির জন্ত। ক্রিয়ার পর অবস্থাতে কোন কিছু চিন্তা করিবার বস্তু নাই, অচিন্ত্যও নাই। ব্রহ্মপদ চিন্তা করিয়া আনিবার উপায় নাই, কারণ নিশ্চিন্ত অবস্থাই ব্রহ্মপদ। যখন ই-না দুইই থাকে না তখনই ব্রহ্ম সম্পাদন হয়। এই নিশ্চিন্ত অবস্থা প্রাপ্তির যে সাধনা তাহাই বলা হইতেছে ॥ ৫০

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ ।
শব্দাদীন্ বিষয়াস্ত্যক্ত্য রাগদ্বৈষৌ ব্যুদস্ত চ ॥ ৫১

অর্থঃ । বিশুদ্ধয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ (বিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত হইয়া) ধৃত্য (ধৃতির দ্বারা) আত্মানং নিয়ম্য (মনকে নিয়মিত অর্থাৎ আত্মসংযম করিয়া) শব্দাদীন্ বিষয়ান্ ত্যক্ত্য (শব্দাদি বিষয়সমূহকে ত্যাগ করিয়া) রাগদ্বৈষৌ চ (ও রাগ দ্বৈষকে) ব্যুদস্ত (পরিত্যাগ পূর্বক)—॥ ৫১

শ্রীধর । তদেবাহ—বুদ্ধোতি । উক্তেন প্রকারেণ বিশুদ্ধয়া—পূর্বোক্তয়া সাধিক্যবুদ্ধ্যা যুক্তঃ, ধৃত্য সাধিক্য আত্মানং—তামেব বুদ্ধিং নিয়ম্য—নিশ্চলাং কৃত্য, শব্দাদীন্ বিষয়ান্ ত্যক্ত্য । তদ্বৈষৌ রাগদ্বৈষৌ চ ব্যুদস্ত । ‘বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্ত’ ইত্যাদীনাম্ ‘ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে’ ইতি তৃতীয়েন অর্থঃ ॥ ৫১

বদ্বানুবাদ । [তাহাই বলিতেছেন]—উক্ত প্রকারে পূর্বোক্ত সাধিকী বুদ্ধি দ্বারা যুক্ত হইয়া, সাধিকী ধৃতি দ্বারা সাধিক বুদ্ধিকে নিশ্চল করিয়া, শব্দাদি বিষয়সমূহকে পরিত্যাগ করতঃ (তদ্বৈষয়ক যে রাগ আর দ্বৈষ সেই ভাবগুলিকে পরিত্যাগ পূর্বক) [ব্রহ্মভূয়ায় অবস্থান করেন] । ৫০ শ্লোকস্থ “ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে” এই বাক্যের সহিত “বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্ত” ইত্যাদি শ্লোকের অর্থঃ ॥ ৫১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—বুদ্ধি ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থির করিয়া ব্রহ্মেতে থেকৈ আটকিয়া, আত্মাতে আপনা আপনি স্থির থাকার নাম ধারণা ধ্যান সমাধি পূর্বক কলাকাজকার সহিত শব্দাদি অগ্রাহ করিয়া—ইচ্ছা ও হিংসা বাহ্য ক্রিয়ার পর অবস্থায় কাজে কাজেই থাকে না ।—পরমহংসনিষ্ঠ পুরুষের যে সাধনাগুলি করিয়া নৈকর্য্যসিদ্ধি লাভ হয় তাহাই বলিতেছেন—(১) বিশুদ্ধবুদ্ধি—বাহ্যর বুদ্ধি বিশুদ্ধ হয় তাহার বুদ্ধিতে আত্মাবিবর্তিত কোন বস্তু আসে না এবং আত্মা সম্বন্ধে কোন সংশয়ও আসে না । (২) ধৃতি—প্রাণায়ামাদি দ্বারা যে স্থির অবস্থা আসে তাহাতেই বৃত্তি রুদ্ধ হয় । প্রাণকে নিয়মিত না করিলে শরীর ও ইন্দ্রিয় চঞ্চল থাকিবে, নিশ্চল হইবে না । প্রাণ স্থির হইলেই বুদ্ধি আত্মাতে আপনা-আপনি স্থির হইয়া যাইবে—সেই অবস্থায় থাকার নামই ধৃতি । (৩) শব্দাদি বিষয় ত্যাগ—যোগাভ্যাস দ্বারা ইন্দ্রিয়সকল অন্তর্গত হয়, হৃতরাগ তখন বাহ্য বিষয় আর গ্রাহ্যের মধ্যেই আসে না । (৪) রাগ-দ্বৈষ ত্যাগ—বাহ্যর কোন বস্তুর প্রতি অনুরাগও নাই বিরাগও নাই । মন থাকিতে এ ভাব আসা কঠিন । ক্রিয়ার পর অবস্থায় মন নিশ্চল হয়, কোন সংকল্প বা বাসনাই থাকে না—তিনিই তখন ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের উপযুক্ত হন ॥ ৫১

বিবিক্তসেবীলঘাশী যতবাক্যমানসঃ ।

ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫২

অর্থঃ । বিবিক্তসেবী (নির্জনস্থানবাসী), লঘাশী (মিতভোজী), যতবাক্য-কায়-মানসঃ (বাক্য, শরীর ও মনকে সংযত করিয়া), নিত্যং ধ্যানযোগপরঃ (নিত্য ধ্যানযোগ-পরায়ণ হইয়া) বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ (বৈরাগ্যকে সম্পূর্ণ আশ্রয় করিয়া)—॥ ৫২

শ্রীধর । বিবিক্ত—বিবিক্তেতি । বিবিক্তসেবী—উচ্চিশেষাবস্থায়ী, লঘাশী—মিতভোজী । ঐতঃ উপাশ্রিতঃ যতবাক্যমানসঃ—সংযত-বাপেহচিত্তো ভূত্বা, নিত্যং—সর্বদা, ধ্যানেন বা যোগো ব্রহ্মসংস্পর্শঃ তৎপরঃ সন্ ধ্যানাবিচ্ছেদার্থং পুনঃ পুনঃ দৃঢ়ং বৈরাগ্যং সম্যগ্ উপাশ্রিতো ভূত্বা ॥ ৫২

বদ্বানুবাদ । [আরও বলিতেছেন]—উচ্চিশেষ অর্থাৎ পবিত্র দেশবাসী, মিতভোজী, এই সকল উপায় দ্বারা বাক্য বেহ ও চিত্তকে সংযত করিয়া, সর্বদা ধ্যান দ্বারা ব্রহ্ম সংস্পর্শ-রূপ যোগে তৎপর হইয়া ধ্যানের অবচ্ছেদের ভয় পুনঃ পুনঃ দৃঢ় বৈরাগ্যকে সম্যকরূপে আশ্রয় করিয়া—॥ ৫২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সর্বদা আপনাতে আপনি থাকে, অল্প আহার করে, পারগ পক্ষে কণা বলে না শরীরেতে আপনা-আপনি ছোট বিবেচনা করিয়া দৈম্যক করে চলে না, মনকে অন্তর্দিকে না নিয়ে গিয়ে আপনা-আপনি ছোট বিবেচনা করিয়া আপনাতে থাকে অর্থাৎ ক্রিয়া করে—যাহা গুরুবক্তৃগম্য—১৭২৮ বার প্রাণায়াম প্রত্যহ করে ও মধ্যে মধ্যে ২১৭৩৬ বার প্রাণায়াম করে অর্থাৎ দিন রাত্র সর্বদাই প্রাণায়াম করে অর্থাৎ ইচ্ছাতেই থাকে নিত্য—যাহা ক্রিয়া করিতে করিতে আপনা হতেই হয়—যখন সর্বদাই আপনাতে থাকিল এইরূপ অভ্যাস পাইয়া তখন অন্তর্দিকে আর ইচ্ছা ব্রহ্ম ব্যতীত কিছুতেই হয় না—ইহারই নাম বৈরাগ্য, ইচ্ছা বাহার আছে সেই বৈরাগী ।—ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের সম্যক লাভ করিতে হইলে সাধককে—(১) বিবিক্তসেবী হইতে হইবে । নির্জন দেশে বসিয়া সাধনাভ্যাস না করিলে ধ্যান জন্মে না । এইজন্য সাধকের অপেক্ষাকৃত কোলাহলশূন্য স্থানে থাকি আবশ্যক, কিন্তু বাহিরের গোলমাল হইতেও বেশী গোলমাল করে আশ্রয়ের মন ও ইন্দ্রিয়গুলি । তাহাদিগকে বশে রাখিতে হইলে প্রাণকে স্থির করিতে হইবে, প্রাণ স্থির হইয়া এমন স্থানে অবস্থান করেন যদ্বারা “আমি আমার” সব মিটিয়া যায়—ইহার নামই আপনাতে আপনি থাকা । এইরূপ নিঃসঙ্গাবস্থা না হইলে কেবল জনশূন্য স্থানে থাকিলেও কাম ক্রোধাদি হৃদয়গণের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করা অসম্ভব । (২) লঘু আহারও সাধকের পক্ষে উপকারী । অতিভোজনে আলস্ত ও নিদ্রা সাধককে ঘেরিয়া ফেলে । মন তনের দ্বারা

অভিভূত হয়, এইজন্য আহায়ে ও নিদ্রায় সংযম রক্ষা করিতে হয়। সাধকপ্রবর কবীর বলিয়াছেন—

‘নীদ নিসানী নীচ কী উঠো কবীরা জাগি।
ওর রসায়ন ছোড় কর রাম রসায়ন লাগি ॥’

নিদ্রা নীচলোকের চিহ্ন, কারণ তমোভূগ সর্কোপেক্ষা নিকৃষ্ট গুণ, বাহ্যারা প্রাণকে উপরে উঠাইয়া রাখিতে পারেন তাঁহাদের আর নিদ্রা হয় না, হে কবীর, তুমি জাগিয়া উঠ, অর্থাৎ জাগ্রত অবস্থায় উপরে উঠিয়া থাকিতে পারাই বাহ্যদুরী। তুমি সামান্য ধাতুর রসায়ন ছাড়িয়া দিয়া আত্মারামের রসায়ন কর। হুই বা বহু পদার্থ পরস্পর যুক্ত হইলে এক বস্তুতে পরিণত হয় বা গুণান্তর প্রাপ্ত হয় বাহা দ্বারা—তাহাই রসায়ন। আমরা সংসারে বাসনা ও চেষ্টা দ্বারা অবিরত আমাদের অবস্থাকে পরিবর্তন করাইতেছি। দরিদ্র ব্যক্তি বহু পরিশ্রম, চেষ্টা, ব্যাপার-বাশিষ্ঠ্য প্রভৃতি দ্বারা খুব ধনী হইয়া নিজের অবস্থান্তর সম্পূর্ণ সাধন করিতে পারে, কিন্তু কবীর বলিতেছেন এ সব চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া তুমি রাম-রসায়ন কর। যে রসায়ন দ্বারা এই মোহবদ্ধ জীব জীবমুক্ত অবস্থা লাভ করিয়া আত্মারাম হইয়া যায়—ক্রিয়া দ্বারা ক্রিয়ার এই মোহবদ্ধ জীব জীবমুক্ত অবস্থা লাভ করিয়া আত্মারাম হইয়া যায়—ক্রিয়া দ্বারা ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্তি হইলেই সেই রাম-রসায়ন হইয়া থাকে, অতএব সেই রসায়ন ক্রিয়ায় তুমি লাগিয়া থাক। (৭) কায়-মন বাক্যের সংযম—স্বরূপ, বলবান ও ধনীরা নিজ শরীরটাকেই খুব বড় করিয়া দেখে। নিজের মনে খুব দেমাক থাকে যে সে বড়লোক অথবা দেবীতে সন্দেহ, কিম্বা সে খুব বলিষ্ঠ,—কিন্তু বাস্তবিক এই দেহটার মত সৃণিত ন্যাঙ্কারময় জিনিষ আর কিছুই নাই, জ্ঞানহীন পণ্ডিত্য ব্যক্তিরাই ইহার গর্ব করে। এক দণ্ডের মধ্যে ইহার কি পরিণাম হইতে পারে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে আর ইহার জ্ঞান গর্ব করিতে ইচ্ছা করে না। মনেতে এইরূপ বিচার রাখিয়া আসনাদি সাধনে চেষ্টা করিলে শরীরকে সংযত করা যাইতে পারে। মনঃসংযম হয়—মনকে অল্প দিকে যাইতে না দিয়া আপনাতে আপনি থাকিতে পারিলেই প্রকৃত মনের সংযম হয়। বাক্যসংযম—বাক্যসংযমের জন্ত দ্বিলাকে তালু-মূলে রাখিয়া চক্রে চক্রে স্তব্ধ করিতে থাকিবে ও অনাবশ্যক কথা বলিবে না, এইরূপে বাক্যসংযম হয়। বাক্যসংযমে ইচ্ছার নাশ হয়। শক্তি ক্ষয় না হওয়ার কোন এক বিষয়ে মনকে অধিকক্ষণ সংযম করা যায় ও কার্য সিদ্ধি করা যায়। (৮) প্রত্যহ ধ্যানাভ্যাস ও যোগাভ্যাস করিবে। আমাদের মনে সর্কদা বহু প্রত্যয়ের উদয় হইতেছে, সেই প্রত্যয়ের বোধ দ্বারাই যোগযুক্ত হওয়া যায়। প্রত্যয়-বোধ হইবে একাগ্রতা দ্বারা, একাগ্রতা আসিবে প্রাণসংযম হইতে, সূতরাং প্রত্যহ বেকী মন দ্বিয়া প্রাণায়াম করিবে। যে প্রায়ই মধ্যে মধ্যে ১৭২৮ বার করিয়া প্রাণায়াম করে এবং মধ্যে মধ্যে অবিরাম কয়েক দিন ধরিয়া ১৭২৮ বার করিয়া ২১৭০৬ বার পুষ্টি করে সে ক্রিয়ার পরাবস্থার আবাদন পায় এবং যে এইরূপ ক্রিয়াতে লাগিয়া থাকে তাহার নিত্যই এই অবস্থা হয়। (৯) বৈরাগ্য—উক্তরূপ অভ্যাসের ফলে এক ব্রহ্ম ব্যতীত আর কোন ইচ্ছাই থাকে না, ইহারই নাম বৈরাগ্য ॥ ৫২

(ব্রহ্মলাভের যোগ্যতা)

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।

বিমূঢ়া নির্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫৩

অর্থঃ। অহঙ্কারং, বলং, দর্পং, কামং, ক্রোধং, পরিগ্রহঃ (অহঙ্কার, পাশবিক বল, দর্প, কাম, ক্রোধ, এবং শরীরধারণ বা ধর্মার্থ লোকের নিকট অর্থাৎ গ্রহণ) বিমূঢ়া (ভ্রান্ত করিয়া) নির্মমঃ (মমতাহীন) শান্তঃ (ও বিক্ষিপশূন্য হইলে) [সাধক] ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে (ব্রহ্ম সাধ্যকারে সমর্থ হন) ॥ ৫৩

শ্রীধর। কিঞ্চ—অহঙ্কারমিতি। ততশ্চ বিরজোহহং ইত্যাদি অহঙ্কারং, বলং—দুর্বাগ্রহং, দর্পং—যোগবলং উন্মার্গ-প্রবৃত্তিসংঘং। প্রারম্ভবশাৎ অপ্রাপ্যমাণেষু বিধয়েষু কামং, ক্রোধং, পরিগ্রহং চ বিমূঢ়া—বিশেষণে ত্যক্তা। বলং আগ্নেয় নির্মমঃ সন্, শান্তঃ—পরমাং উপশান্তিঃ প্রাপ্তঃ। ব্রহ্মভূয়ায়—ব্রহ্মাহমিতি নৈশ্চল্যেন অবস্থানায়, কল্পতে—যোগো ভবতি ॥ ৫৩

বঙ্গভূবাদি। [আরও বলিতেছেন]—তাহার পর অহঙ্কার অর্থাৎ আমি বিরক্ত বা বৈরাগ্য-যুক্ত এই অহঙ্কার, বল—দুর্বাগ্রহ বা সৃণিত বিষয়ে স্পৃহা, দর্প—যোগবল হেতু উন্মার্গপ্রবৃত্তি, কাম—প্রারম্ভবশে অপ্রাপ্ত বিষয়াদিতে অভিলাষ, ক্রোধ এবং পরিগ্রহ—এই সকলকে বিশেষরূপে পরিত্যাগ করিয়া, এবং এই সমস্ত বিষয় বলপূর্বক আসিয়া পড়িলেও তিনি নির্মম অর্থাৎ মমতাবিহীন, এবং পরম উপশান্ত হইলে তখন তিনি “অহং ব্রহ্মাস্মি” এইরূপ নিশ্চল ব্রহ্ম-ভাবে অবস্থানের যোগ্য হইতে পারেন ॥ ৫৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—অহঙ্কার, বল, দর্প অর্থাৎ বুক চাড়া দিয়ে চলা, ইচ্ছা, ক্রোধ, অজ্ঞের বাড়ী অর্থাৎ অল্প বস্তুতে মন না দেওয়া ব্রহ্ম ব্যতীত, ইচ্ছা সকল হইতে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া বিশেষরূপে এই উপযুক্ত সমুদয় বিষয় হইতে মুক্ত হয়, সেই ক্রিয়ার পর অবস্থায় আমিও থাকে না, আমারও থাকে না—যাহা ক্রিয়াবিত্ত ব্যক্তিমিগের সকলেরই অসম্ভব হইতেছে, ইহারই নাম শান্তি অর্থাৎ ক্রিয়ারই অন্ত—ইচ্ছা করিতে করিতে ব্রহ্মরূপ হইয়া যায় অধিক কালে।—(১০) অহঙ্কার—দেহ ও ইন্দ্রিয়সমূহের উপর যে আত্মজ্ঞান, তাহাই অহঙ্কার, সেই অহঙ্কারকে ত্যাগ করিতে হইবে (শব্দ)। (১১) বল—যে সামর্থ্য কাম-বাগান্বিত, শান্তবিরুদ্ধ অসং আগ্রহরূপ বল তাহাই পরিত্যজ্য। (১২) দর্প—ধর্মকে অতিক্রম। যোগাভ্যাস হেতু বিতৃষ্ণা লাভ হইয়া উন্মার্গগামী হওয়া—এই দর্প লক্ষণমূলক হইলেও যোগীকে দ্রষ্ট করিতে পারে। (১৩, ১৪) কাম, ক্রোধ—চিত্ত অজ্ঞ থাকিলে পার্থিব বিষয় লাভে অভিলাষ হয় এবং বাসনা কোনরূপে প্রতিহত হইলে ক্রোধ জন্মে। (১৫) পরিগ্রহ—অজ্ঞপ্রকার পরিগ্রহ তো নয়ই, কেবল শরীর ধারণ জ্ঞান। ধর্মার্থটানের জ্ঞান অর্থ সংগ্রহ করাও উচিত নহে। (অবশ্য ইহা কেবল মন্যাসীদের পক্ষেই সম্ভব)। (১৬) নির্মম—মমত-বুদ্ধির পরিহার করিতে হইবে। কারণ মমত-

(ব্রহ্মভূতের পরাক্রম লাভ)

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।

সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মনুজিনঃ লভতে পরাম্ ॥ ৫৪

বুদ্ধি যতক্ষণ থাকিবে ততক্ষণ হর্ব-বিবাদাদিতে চিত্তের বিক্ষেপ হইবেই। (১৭) শাস্ত্র— উপরত, এই মনের স্থিরতা না আসিলে ব্রহ্ম দর্শনে সামর্থ্য হয় না। ক্রিয়া করিতে করিতে যখন সাধকের আত্মা ব্যতীত আর কোন দিকেই লক্ষ্য থাকে না, এবং ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কোন বিষয়েই চিত্ত ধাবিত হয় না, তখন সাধক নির্মম হইয়া যান, অর্থাৎ তাঁহার ‘আমি ও আমার’ থাকে না। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই সাধক প্রশান্ত হইয়া যান, চিত্তে কোন উত্তেগের তরঙ্গ উঠে না, ইহাই পরম নিরুত্তর উপশান্তি। এই অবস্থা-প্রাপ্ত যোগী ব্রহ্ম ভাবোন্মত্ত হইয়া ব্রহ্মই হইয়া যান ॥ ৫৩

অর্থঃ। ব্রহ্মভূতঃ (ব্রহ্মপ্রাপ্ত, অথবা শ্রবণ-মননাদি দ্বারা “আমি ব্রহ্ম” এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয়বৃত্ত), প্রসন্নাত্মা (লজ্জা-অধ্যাত্মপ্রসাদ ব্যক্তির) [কোন দ্রব্য নষ্ট হইলে বা না থাকিলেও] ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি (শোকও করেন না, আকাঙ্ক্ষাও করেন না), সর্বেষু ভূতেষু সমঃ (তখন সর্বভূতে সমদর্শী হইয়া) পরাং মনুজিনঃ (আমাতে পরমা ভক্তি) লভতে (লাভ করেন) ॥ ৫৪

শ্রীধর। ব্রহ্মাহমিতি নৈশ্চল্যেন অবস্থানস্ত ফলমাহ—ব্রহ্মভূতঃ। ব্রহ্মভূতঃ—ব্রহ্মপি অবস্থিতঃ। প্রসন্নাত্মা—প্রসন্নচিত্তঃ, নষ্টং ন শোচতি ন চ অপ্রাপ্তং কাঙ্ক্ষতি, দেহাদি অভিমাত্রাভাবাৎ। অতএব সর্বেষু অপি ভূতেষু সমঃ সন্ রাগ-দেবাদিকৃত বিক্ষেপাতাবাৎ সর্বভূতেষু মন্তাবলক্ষণাৎ পরাং মনুজিনঃ লভতে ॥ ৫৪

ব্রহ্মানুবাদ। [“আমি ব্রহ্ম” এইরূপ নিশ্চল অবস্থিতির ফল বলিতেছেন]—ব্রহ্মভূতে অবস্থিত, প্রসন্নচিত্ত (যে ব্যক্তি নষ্ট বিষয়ে অশ্রুশোচনা করে না এবং অপ্রাপ্ত বিষয়েও আকাঙ্ক্ষা করে না,) যেহেতু তাঁহার দেহাভিমান নাই। অতএব সকল ভূতেই সমভাবে হওয়ায় রাগ-দেবাদিকৃত বিক্ষেপের অভাব বশতঃ সর্বভূতে: “মন্তাবন্য” রূপ পরা ভক্তি লাভ করেন ॥ ৫৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ব্রহ্ম হয়ে প্রসন্ন আত্মা কাজে কাজেই হল, কারণ সে ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য বস্তুতে আসক্তি পূর্বক দৃষ্টিই করে না, যখন আসক্তি-পূর্বক দৃষ্টি কোন বস্তুতে না করিল তখন সেই অন্য বস্তুর শোচনা থাকে না, আসক্তি পূর্বক দৃষ্টি করিলেই তাহার প্রাপ্তির ইচ্ছা হয়—যখন ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোন বস্তুতে দৃষ্টিই নাই, তখন তাহার আকাঙ্ক্ষাও কাজে কাজেই নাই—সব ভূতেতেই সেই কুটস্থ ব্রহ্ম দেখে চর এবং অচরে, তখন অন্ততঃ সব আপন্য আপনি হয়—গুরু বাক্যেতে বিশ্বাস করিয়া আপনাতে আপনি থাকিয়া ক্রিয়া সর্বদা করে এবং তাহাকেই লাভ বিবেচনা করে, যে লাভ সকলের উপর ইচ্ছা জ্ঞান করে।—যিনি ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বরূপই হইয়া যান তাঁহার কি কি লক্ষণ

কুটিয়া উঠে? ভগবান এখানে সেই কথা বলিতেছেন। ক্রিয়ার পর অবস্থায় সাধক ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যাইলে তাঁহার চিত্ত সর্বদা প্রসন্ন থাকে, কেননা কোন বস্তুর প্রতিই তাঁহার তখন আসক্তি থাকে না, এবং এইজন্য অপ্রাপ্ত বস্তুর ক্ষণিক আকাঙ্ক্ষা নাই, এবং প্রাপ্ত বস্তুর যদি নষ্ট হইয়া যায় সেজন্যও তাঁহার কোন শোক হয় না। চর অচর সর্বভূতে কুটস্থ দর্শন করিয়া চর অচর সমস্তই তাঁহার নিকট সমান বলিয়া বোধ হয়। ব্রহ্ম ব্যতীত যাহার অন্য বস্তুতে লক্ষ্যই নাই তাহার আবার বস্তুর প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা থাকিবে কেমন করিয়া? সুতরাং তিনি অন্য কোন লাভকে লাভই মনে করেন না। ক্রিয়ার পর অবস্থায় মেশায় যখন তঁা হইয়া থাকেন তখন তিনি পরমানন্দে অবস্থিত, তখন অন্য বস্তু আছে কি নাই তাহাও তাঁহার মনে থাকে না। ক্রিয়ার পর অবস্থার পর অবস্থাতেও (যখন দিব্য ব্যুৎপত্তি ভাব) তাঁহার চিত্ত নির্ব্যাকুল, তখনও তিনি সর্ববস্তুতেই ব্রহ্ম দর্শন করেন, এক পরমানন্দে সবই যেন ভরিয়া আছে বলিয়া তাঁহার বোধ হয়। তখন বহু অর্থ বা প্রেমাম্পদ আত্মীয়ের সমাগমে, বা খোরতর কার্যিক, মানসিক হুঃখ সমুৎপত্তি হইলেও তাঁহার চিত্ত মথিত বা বেগযুক্ত হয় না। তিনি কোন বস্তুর প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল ক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখেন; যাহাতে এই স্বরূপ-স্থিতির বিচ্যুতি না ঘটে, এইজন্য সর্বদা ক্রিয়া করাকেই লাভের বিষয় মনে করেন। সর্বদা যে ক্রিয়া করে তাহার সর্বত্র কুটস্থ দর্শন হইয়া থাকে। সর্বত্র ব্রহ্মদৃষ্টি না হইলে কাহারও সমতাব বা সমদৃষ্টি হইতে পারে না। ক্রিয়া করিয়া যাহার অন্তঃকরণ যত বিশুদ্ধ হয় তাঁহার তত সমদৃষ্টি লাভ হয়। বহু বাসনা থাকিতে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় না। প্রাপ্ত বেগযুক্ত থাকিলে মনেরও বহু বাসনা বা স্পন্দন থাকিবেই। এইজন্য ক্রিয়া দ্বারা প্রাথমে স্থির করিয়া মনকে নিষ্পন্দিত করাই সর্ব প্রথমে আবশ্যক। মন নিষ্পন্দিত হইলেই আত্মস্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ হয়। এই স্বরূপের সাক্ষাৎকারই আত্মার অপরোক্ষাহুতি। সেখানে আমি আমার কিছুই থাকে না। অতঃপর তাবই প্রকৃত জ্ঞান বা মুক্তি। পরা ভক্তিও ইহাকেই বলে। ইহা সহজলভ্য বস্তু নহে। ভক্ত ভুলসীদাস বলিয়াছেন:—

জ্ঞানকেপম্হ রূপানকে ধারা।

পরত ধগেল হোই নহিঁ বারা।

জো নিরবিধন পম্হ নিরবহই।

সো কৈবল্য পরমপম্হ লহই।

জ্ঞান মার্গ তরবারির শাপিত ধারের মত তীক্ষ্ণ। এই ক্ষুরধারের পথ পার হওয়া বড় কঠিন। যদি নির্ভয়ে কেহ এই পথ পার হইয়া যায় তবে তাহার পরমপম্হ কৈবল্য লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু—

অতি দুর্লভ কৈবল্য পরমপম্হ।

সন্ত পূরণ নিগম আগম বম্হ।

রাম ভক্তত সোই মুক্তি গোসাঈ।

অনইচ্ছিত আবই বরিয়াঈ।

পরমপম্হ কৈবল্য যে কত দুর্লভ, সাধুগণ পূরণ ও বেদ সকলেই উহা ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। কি রামভক্তনের দ্বারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও উহা সাধকের নিকট উপস্থিত হয়।

ক্রিয়া করিয়াও ঐরূপ দুর্লভ পরমপম্হ ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়, প্রত্যেক ক্রিয়াকারীই তাহা অর্জিতে পারিবেন। কিন্তু তীব্র বৈরাগ্য ব্যতীত কেহই

(পর্যাবৃত্তি দ্বারা আত্মার স্বরূপ জ্ঞান বা যুক্তি)

ভক্ত্যা মামভিজান্নাতি যাবান্শ্চাপি তত্ত্বতঃ ।

ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ ৫৫ *

অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। মানবের বিষয়াক্ত চিত্ত পদে পদে বিস্তৃত হইয়া থাকে, কিন্তু যাহারা আত্মকিয়া দ্বারা আত্মার মত ভজন করেন, সেই তৎপর্যায়ক্রিয়াবানের নিকট ক্রিয়ার পর অবস্থা রূপ কৈবল্য জ্ঞান আপনা-আপনিই সমুদিত হইয়া থাকে। সাধক বৃত্তিতেও পারেন না উৎকৃষ্টে আসিল। সাধারণতঃ বস্তুর প্রতি হইলে আমাদের চিত্ত প্রসন্ন হয়, কিন্তু যাহারা ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থিতি লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের চিত্তের ক্রিয়াশক্তি সঞ্চিত হইয়া যায় হুতরাং কোন সংস্কারের স্মরণ থাকে না এবং এই সত্ত্ব ব্রহ্ম ব্যতীত কোন বস্তুর প্রতি আসক্তি থাকে না, পাইলেও তাহার প্রতি রাগ বা বিদ্বেষ আসে না। ক্রিয়ার পর অবস্থায় চিত্ত তরঙ্গ শূন্য হওয়ার আর নানাবিধ উপলব্ধি হয় না। এই সমস্তার নাম পরাভক্তি। শ্রীমদ্ভগবতে আছে—

“সর্বভূতেষু যেনৈকং ভগবদ্ভাবমীকতে ।

ভূতানি ভগবত্যাভ্যন্তে ভাগবতোত্তমঃ ॥”

যিনি সর্বভূতে এক ভগবদ্ভাব ও ভগবদাত্মাতে সর্বভূত দর্শন করেন তিনিই ভাগবতোত্তম। অবশ্য ক্রিয়ার পর অবস্থায় এ সকল কথাই কোন আলোচনা করাই সম্ভব নহে, কারণ তখন ভূতও থাকে না—আর সর্ব কোথা হইতে আসিবে? কিন্তু পরাবস্থায় পরাবস্থাতে সর্বভূতে যে এক আত্মাই রহিয়াছেন এবং এই সব অনন্ত ভাব যে সেই আত্মতাবের মধ্যে পরিস্ফুট হইতেছে তাহা বুঝা যায় ॥ ৫৪.

অর্থঃ । [ব্রহ্মভূত ব্যক্তি] ভক্ত্যা (ভক্তির দ্বারা) [অহং—আমি] যাবান্ (যে প্রকার) যঃ চ অপি (এবং যাহা হই) তত্ত্বতঃ (স্বরূপতঃ) অভিজান্নাতি (জানিতে পারেন); তত্ত্বতঃ (অনন্তর) মাং (আমাকে) তত্ত্বতঃ জ্ঞাত্বা (তত্ত্বতঃ জানিয়া) তদনন্তরম্ (তৎপরে) বিশতে (আমাকে প্রবেশ করেন) ॥ ৫৫

* শাস্ত্রাধিকারী এই শ্লোকটিকে ভক্তির প্রাথমিক স্থাপিত হইয়াছে বলিতে চান। ভক্তির প্রাথমিক ভাৱেই, নচেৎ কিসেই হোক লোক ভগবানকে পাইতে চেষ্টা করিবে? কিন্তু যাহাদের মতে জ্ঞান বা যুক্তি কিছুই নহে তাঁহাদের জানিয়া রাখা উচিত শ্রীমদ্ভগবতেও আছে—“তৎ যৎ জ্ঞানমধ্বং”—সেই অধ্ব জ্ঞান বস্তুরই তত্ত্ববিদের তত্ত্ব অর্থাৎ ভগবৎ স্বরূপ বলিয়াছেন। অধ্ব অর্থাৎ যাহার দ্বিতীয় নাই অর্থাৎ একমাত্র সেই বস্তুই আছে, আর বিশেষ অস্ত কোন বস্তু নাই, হুতরাং জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা জ্ঞানেরই প্রকার ভেদ মাত্র। এই জ্ঞান বা তত্ত্বই তৎ বস্তুর স্বরূপ। শ্রীমদ্ভগবদগীতার ভগবদ্গীতার প্রকার ভক্তের মধ্যে জ্ঞানকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। ভগবানের মতে “জানী যাত্নেব মে মতম্”—কিন্তু আমার মতে জানী আমারই স্বরূপ। জানী কিরূপে তাঁহার স্বরূপ হন তাহারও কারণ নির্দেশ করিয়াছেন—“আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা” যেহেতু তিনি যুক্তাত্মা অর্থাৎ আমার সহিত যোগযুক্ত হুতরাং সর্বোৎকৃষ্ট। তৎ যে আমি সেই আমাকেই তিনি আশ্রয় করিয়াছেন। হুতরাং ব্রহ্মভূত পুরুষ সনঃ সর্বোৎকৃষ্ট হুতরাং হুতরাং হুতরাং সর্বভূতে সমদৃষ্টি হইয়া থাকে।

শ্রীধর। ততশ্চ—ভক্ত্যেতি। তয়া চ পরয়া ভক্ত্যা তত্ত্বতো মাং অভিজান্নাতি। কথং তৎ? যাবান্—সর্বব্যাপী, যচ্চ অপি—সচ্চিদানন্দধনঃ তথাভূতং। ততশ্চ মামেবং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা, তদনন্তরং—তত্ত্ব জ্ঞানস্ত উপরম্যে সতি, মাং-বিশতে—পরমানন্দরূপো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৫৫

বদান্তবাদ। [তাহার পর কিরূপ হয় তাহা বলিতেছেন]—সেই পরা ভক্তি দ্বারা আমাকে তত্ত্বতঃ জানিয়া থাকে আমি কিরূপ? যাবান্ অর্থাৎ সর্বব্যাপী এবং যেরূপ সচ্চিদানন্দধন আমি তথাভূত আমাকে জানে, এবং এইরূপে যথার্থ ভাবে জানিয়া তদনন্তর—সেই জ্ঞানের উপরম্য হইলে—আমাকে প্রবেশ করে অর্থাৎ পরমানন্দ রূপ হইয়া যায় ॥ ৫৫

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এইরূপ ভক্তিপূর্বক আমি যে কি তাহা সাদর পূর্বক জানিতে পারি, যত কিছু সব আমি যাহা আর যাহা কেহ আমি—তত্ত্বতঃ অর্থাৎ ক্রিয়া করিয়া ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া তারপর আমি যে কে তাহা জানিয়া আমাতেই লয় হয় পরে।—আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন, পরমাশ্রয়বিষয়ে জ্ঞানদ্বারা যাহাতে নিরন্তর প্রবাহিত হয় তাহারই জ্ঞত যে চেষ্টা তাহারই নাম জ্ঞাননিষ্ঠা। এই জ্ঞাননিষ্ঠা ও কর্মনিষ্ঠা পরস্পর বিরুদ্ধ। তাহা হইলে ক্রিয়া সাধন দ্বারা এইরূপ জ্ঞানের প্রবাহ উৎপন্ন হওয়া কিরূপে সম্ভব? অতএব ক্রিয়া সাধন দ্বারা জ্ঞানের উৎপত্তি কল্পনা করা অসম্ভব। জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। আত্মাই সেই অধ্ব জ্ঞানতত্ত্ব। আত্মা উৎপত্তি-নাশ-বর্জিত, তাহা স্বতঃই বিস্তারমান। এবং তাহা স্বপ্রকাশ-স্বরূপ। যাহা স্বয়ং প্রকাশিত তাহাকে প্রকাশিত করিবার চেষ্টাও বিফল প্রয়াস মাত্র। প্রাণ পরমাশ্রয় মায়াশক্তি, সেই মায়াশক্তি হইতে মন উৎপন্ন হইয়া নানাবিধ কল্পনা করে, সেই কল্পনাগুলি প্রাণের কম্পন ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাহারই প্রভাবে অন্ত্যাকে সত্য বলিয়া মনে হয়। ক্রিয়াদ্বারা এই প্রাণস্পন্দন নিরোধ হইলেই মনের মননশক্তি বা কল্পনারাশি উন্মূলিত হইয়া যায়, তখন আত্মার যাহা স্বাভাবিক ভাব তাহাই স্ফুটি উঠে। এই প্রকাশ পূর্বে ছিল না এখন হইল—তাহাও নহে, তাহা পূর্বেও ছিল, এখনও আছে এবং পরেও থাকিবে। মেঘমালা যেমন স্বপ্রকাশ ভাস্করকে আবৃত করিয়াছে বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বাস্তবিক মেঘমালা সূর্যকে আচ্ছাদিত করিতে পারে না—ঘনচ্ছন্ন দৃষ্টি দ্বারা সূর্যকে ঘনচ্ছন্ন বলিয়া প্রতীতি হয় মাত্র, স্বরূপতঃ তাহা কখনই ঘনচ্ছন্ন হয় না। তরুণ মনের সমস্ত-বিকল্লাদি থাকে। হেতু আত্মাকে অপ্রকাশিত বলিয়া মনের বারণা হয় মাত্র, কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই আমরা বুঝিতে পারি মনের কল্পনারাশি এবং ইন্দ্রিয়াদির বিষয় গ্রহণরূপ কার্য্যও হইতে পারিত না, আত্মসত্তার অস্তিত্ব না থাকিলে। উহাদের কার্য্যগুলি তাই আত্মার অস্তিত্বই প্রমাণ করে। হুতরাং যাহা আছে, যাহা পূর্বে হইতেই প্রাপ্ত—তাহাকে পাইবার জ্ঞত আবার প্রয়ানের কি প্রয়োজন? হুতরাং আত্মলাভ বা আত্মজ্ঞানের জ্ঞত সাধন প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। তবে সাধনের জ্ঞত শাস্ত্রাদি এত মাথা ঘোঁড়াধুঁড়ি কেন করিতে বলেন? তাহার কারণ মনের বৈকারিক ভাব। হেতুই অন্য রহিয়াছে, ভ্রমবশতঃ মনে হইতেছে তাহা আমার নাই। এই-জ্ঞত অধ্বগণের ধূম পড়িয়া গিয়াছে। যখন মনের চাকল্য ঘুলি, স্থির হইলাম, তখন দেখি যাহাকে খুঁজিতেছিলাম তাহা হস্তেই মথ্যেই রহিয়াছে। এইরূপ আত্মার চিরস্থির নিত্য

(শীর্ণিত হও এবং তজ্জন্ত বুদ্ধিযোগ অবলম্বন কর)

চেতসা। সর্বকর্মাণি ময়ি সন্ন্যস্ত মৎপরঃ ।

বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মাস্তভঃ সততং ভব ॥ ৫৭

সংসারের সকল কর্খই করিতে হয় কিন্তু মনটা তাঁহার দিকেই পড়িয়া থাকে, অবসর পাইবা
মাত্রই যিনি একটুও সময় নষ্ট না করিয়া ক্রিয়াতে বসিয়া যান, অথবা সকল কর্খ করিতে
করিতেও যিনি প্রাণের গতিকে লক্ষ্য করিতে ভুলেন না, অথবা চক্রে চক্রে মনকে
সর্বদা লাগাইয়া রাখেন—তাঁহার মন ক্রমে ক্রমে স্থির, বিশুদ্ধ ও প্রসন্ন হয়। ইহার নামই
মধ্যপাশ্রয় বা শরণাগতি। পূর্ক সুকৃতির অভাববশতঃ বাহার চিন্তমল একেবারে অপগত
হয় নাই, এমন কি যিনি প্রতিষিদ্ধ কর্খও করিয়া ফেলেন, তিনিও যদি দৃঢ়ভাবে গুরুপদে
উপায় দ্বারা স্বরণে তৎপর হন তিনিও পরমগতি লাভ করিতে পারেন। কারণ সর্বদা স্বরণে
ভাব হইতেই মন স্থির ও প্রসন্ন হইতে থাকে। ইহাই ভক্তির নামান্তর। এইরূপ ভগবদ্ভক্তি
লাভের পর বৈরাগ্য অর্থাৎ অস্ত কোন বস্তুতে মন না যাওয়া এবং জ্ঞান অর্থাৎ ক্রিয়ার পর
অবস্থা লাভ করিয়া সর্বদা অবিনাশী ব্রহ্ম পদে সাদর ভাবে লাভ করতঃ কৃতার্থ হইয়া
থাকেন ॥ ৫৬

অস্বয়। চেতনা (মনের দ্বারা অথবা বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা) সর্ককথাপি (সমস্ত কথা) ময়ি স্নানস্ত (আমাতে সমর্পণ করিয়া) মংপদঃ (মংপরায়ণ হইয়া) বুদ্ধিবোগম্ উপাশ্রিত্য (বুদ্ধিবোগ আশ্রয়পূর্বক, সমস্তবুদ্ধিরূপ যে যোগ তাহা আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ সমাহিত হইয়া) মচ্চিত্তঃ সততং ভব (সতত মচ্চিত্ত হও অর্থাৎ আমাতে নিবিষ্টচিত্ত হও) । ৫৭

শ্রীধর । যদ্বাদেবং তথাং চেতসেতি । সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি চেতসা যস্মি সন্ন্যস্ত—সম্য-
 মংপরঃ—অহমেব পরঃ প্রোপ্য: পূৰ্ব্বস্বার্থো যন্ত স: । ব্যবসায়ান্তিক্রিয়া বুদ্ধ্যা যোগম্ উপাশ্রিত্য,
 সততং—কৰ্ম্মানুষ্ঠানকালেহপি । “ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহविः” ইতি জ्ञानेन मय्येव चित्तं यञ्ज
 तधातुतो डव ॥ ५१

তথাভূতো ভব ॥ ৫৭

বজ্রাম্ববাদ । [যেহেতু নিত্য কৰ্ম্মাৰ্থস্থানে ব্রহ্মলাভ হয়, অতএব বলিতেছেন]—কৰ্ম্ম-
সকলকে চিত্ত দ্বারা আমাতে সমৰ্পণ করিয়া মনপৰ অৰ্থাৎ আমিই পরম প্রাপণীয় পুরুষাৰ্থ
বাহ্যর তাদৃশ হইয়া ব্যবসায়াত্মিক বুদ্ধির দ্বারা যোগকে আশ্রয়পূৰ্ব্বক সত্তত মন্থিত হও,
অৰ্থাৎ কৰ্ম্মাৰ্থস্থান কালেও “ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ” ইত্যাদি বর্ণ অধ্যায় শ্লোকোক্ত চিত্ত যেক্রমে
হয়, তমিও তদ্রূপ হও ॥ ৫৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—চিন্তের দ্বারায় সৰ্ব্ব কৰ্ম ব্রহ্মই করিতেছেন বলিয়া জেনে থাকিলে গৰ কৰ্মেরই নাশ, কারণ অল্প এক ব্যক্তি করিতেছে কোন কৰ্ম, সে কৰ্ম ভুগি না করিলে তোমার সে কৰ্মের নাশ—অংগুর=সৰ্বদাই আত্মাতেই থাকিবে ও ক্রিয়া করিবে; বুদ্ধি দ্বারায় অৰ্থাৎ হৃদয় চিন্তে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া আপনাতেই আপনি সকল কৰ্ম করিয়াও থাকিবে বাহ্য সাধুদিগের বিচিত্র দশা, বাহ্য আপন। আপনি ক্রিয়া করিতে করিতে হয়।—

(আত্মনিয়ন্ত্রণ চিন্তার সর্বপ্রকার ছুঃখ ভ্রগতির নাশ
এবং অহঙ্কারের বিনাশ)

मच्छिन्तः सर्वदुर्गाणि म० प्रसादात्तु रिष्यति ।

অথ চৈতন্যহকারান্ন শ্রোয়সি বিনঙ্ক্যসি ॥ ৫৮

কর্ম যদি কর্মফল প্রসব না করে তবে তাহা কর্ম না করারই তুল্য। কর্মেতে মনঃবুদ্ধি না থাকিলে সে কর্মের ফলভোগ কর্তাকে করিতে হয় না, শাস্ত্র, গুরু ও বিচার দ্বারা ইহা জানিয়া রাখিলে কর্মের শুভাশুভ ফল দ্বারা আবদ্ধ হইতে হয় না। ব্রহ্মই করিতেছেন, আমি করিতেছি না—এই ভাব থাকা চাই, তাহা হইলে সে কর্ম তোমার কৃত হইল না, সুতরাং তোমার কর্ম নাশ হইয়া গেল। এই ভাব আসিলে কিরূপে? এছত্ত “মৎপর” হইতে হইবে, অর্থাৎ সর্বদা আমাকে লইয়া থাকিতে হইবে বা আত্মাতেই থাকিতে হইবে। সর্বদা যে ক্রিয়া করে তাহার মন অস্ত্র কোথাও যাইতে পারে না। এইরূপ সর্বদা যে ক্রিয়া করে তাহার বুদ্ধি স্থির হয়, অর্থাৎ যিনি অযুক্ত তাঁহার বুদ্ধি স্থির নহে, সেই বহুমুখী বুদ্ধি দ্বারা ব্রহ্মচিন্তা হয় না। বাহার ব্রহ্মমুখী বুদ্ধি বা স্থিরবুদ্ধি তিনি আপনাতে আপনি থাকেন। এইরূপ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়াও অনিচ্ছার ইচ্ছার যোগমগ্ন সাধকের সকল কর্মই হইয়া যায়। সে এক বিচিত্র অবস্থা—তাহা না হইলে কেহই বুদ্ধিতে পারে না। বুদ্ধিকে সমাহিত করাই বুদ্ধিযোগ। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে বুদ্ধির স্থিরতা তাহাই বুদ্ধিযোগ। তখন ভেদবুদ্ধি থাকে না, বুদ্ধিতে সমতা আসে। এইরূপ সমতার চিন্তা সংলগ্ন হইলেই “মচ্চিত্ত” হওয়া যায়। মচ্চিত্ত হইতে হইলেই “মৎপর” হইতে হয়। আত্মাতে সর্বদা থাকিবার উপায় সর্বদা ক্রিয়া করা। ইহাই আসল শরণাগতির অবস্থা (শাহা পূর্বদ্বোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে)। ক্রিয়া দ্বারা প্রাণ স্থির হইলেই স্থিরবুদ্ধির আবির্ভাব হয়। বাহার বুদ্ধি স্থির তাহার সর্বদাই অসংযুক্ত ভাব হইয়া থাকে, তখন লাভালাভ, ভয়-পরাজয় ইত্যাদিতে বুদ্ধির বিক্ষেপ বা চাক্ষু্য লক্ষিত হইবে না। বুদ্ধির সমতা হইতেই সাধকের সর্ব কর্ম ব্রহ্মে সমর্পিত হয়। এই অবস্থায় অবস্থিত সাধকের দেহান্বেষণ বা আপন-পর বোধ কিছুই থাকে না। এইরূপ সত্য-বুদ্ধির সর্বকর্মসমর্পণ আপন-আপনিই হইয়া যায়। কারণ যিনি “মচ্চিত্ত” হইতে পারিয়াছেন তাঁহার চিন্তে অস্ত্র প্রত্যয় সমুদিত হয় না, কেবল আত্মাকাব্য। বুদ্ধিরই প্রত্যয় হইতে থাকে। এই মচ্চিত্ততাই তত্ত্ববুদ্ধি বা জ্ঞান লাভের উপায়। মনোমল বা চিন্ত-বিক্ষেপ থাকিতে এই প্রকার বিশুদ্ধ স্থির ভাবের উদয়ই হয় না। আত্মার সহিত বুদ্ধির যোগ হইলে সাধক অনন্তশরণ হইতে পারেন। আত্মার সহিত বুদ্ধির যোগ রাখিবার প্রধান উপায় হইল ক্রিয়াযোগ। অস্ত্র কর্মের দ্বারা এ কর্মে কোন বন্ধন নাই এবং এই কর্ম দ্বারা বুদ্ধি স্থির ও বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। ৫৭

অজ্ঞান । মলিনতঃ (মদগত চিত্ত হইলে) ত্বং (তুমি) মৎপ্রসাধাৎ (আমার অজ্ঞানকে)
সর্বদুর্গাণি (সকল প্রকার দুঃখ দুর্গতি) ভবিজ্যসি (উত্তীর্ণ হইবে) । অথ চেৎ (আর যদি)
অজ্ঞানঃ (অজ্ঞানবশতঃ) ন শ্রোতুমি (না শুনি , বিনক্ষ্যাসি (তবে বিনষ্ট হইবে) ॥ ৫৮

শ্রীধর । ততো বহুবিভক্তি তচ্ছূণু—মচ্ছিত্ত ইতি । মচ্ছিত্তঃ সন্ মৎপ্রসাধাৎ সর্বাণ্যপি
হুর্গমি—হুস্তরাণি সাংসারিকিণি দুঃখানি তিরিচ্ছাসি । বিপক্ষে দোষমাহ—অথ চেৎ—যদি পুনঃ
ত্বম্ অহঙ্কারাৎ—জ্ঞাতৃত্বাভিমানাৎ, মহত্ত্বং এতৎ ন শ্রোয়সি, তর্হি বিনষ্ক্যসি—পুরুষার্থাৎ
লষ্টো তবিশ্রুসি । ৫৮

বঙ্গানুবাদ । [তাহার পর যাহা হইবে তাহা শুন]—মদগতচিত্ত হইলে আমার
প্রসাদে সমস্ত হুস্তর সাংসারিক দুঃখ অতিক্রম করিবে । বিপরীতাক্ষরণে যে দোষ হয় তাহাও
বলিতেছেন—যদি পুনরায় তুমি জ্ঞাতৃত্বাভিমান বশতঃ (অর্থাৎ নিজেকে যদি তুমি পণ্ডিত
মনে করিয়া) মহত্ত্ব বাক্য না শুন, তবে তুমি পুরুষার্থ হইতে লষ্ট হইবে । ৫৮

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—আমাত্তে সর্বদা চিত্ত রাখিয়া অর্থাৎ ক্রিয়া করে-
যাহা গুরুবস্তুর গম্য, সকল শত্রুর মধ্যে কেলাতে যে পড়িয়া যায় মন তাহা
হইতে মুক্ত হইবে । যত্নপিত্তাৎ আমি বড়লোক বালয়া অহঙ্কার হইয়া আমার
কথা না শুন তাহা হইলে মন্থবে অর্থাৎ অবশ্যান্তর হবে—জন্মগ্রহণ করিতে
হবে—আমার কথাটা শুনো, পাগলার মাতালের কথাটা শুনো ।—বাহ “আমির”
বেষ্টনের মধ্যে আসিলেই চিত্ত অহঙ্কৃত হয় অর্থাৎ তখন আপনাকেই কর্তা বলিয়া মনে হয় ।
প্রকৃত “আমি”তে চিত্ত নিমজ্জিত হইলেই আত্মপ্রসাদ লাভ হয় । এই অবস্থায় সব কেলাই
পার হওয়া যায় । মনকে বাধিবার ক্ষমতা বড়রিপূর্ণ কত স্থানে থানা পাতিয়া বসিয়া
আছে । তাই নিজে একেবারে সম্পূর্ণ নিরালস্য করিয়া ফেলিতে হইবে, মনের যেন
কোন আশ্রয় বা অবলম্বন না থাকে । নিজের চিত্তকে তাহার চিত্তের মধ্যে ডুবাইয়া দিতে
হইবে । প্রাণ বহিমুখী থাকিলে প্রাণস্পন্দনের সহিত চিত্তেও স্পন্দন উঠিবে, তাহাতে
কেবল রাশি রাশি বাসনার ফেনই উথিত হইবে । সে অবস্থায় চিত্ত বিষয়াকার্যকারিত
হইয়া কেবল বিষয়েরই অনুসন্ধান করিবে, সে চিত্ত কখন শান্ত বা শুদ্ধ হইতে পারিবে না, বা
আত্মভাবে মগ্ন হইতে পারিবে না । স্বর্গলষ্ট হইলে জীব কখনও তাহার কৃপা অনুভব
করিতে পারে না । স্বর্গলষ্ট আত্মভাব—উহাই জন্মজন্মাব্যুতীর্ণ হির প্রাপ্ত ভাব ।
এই স্বর্গে যে আপনার মতিকে বাধিতে না পারে, সেই স্বর্গহীন ব্যক্তি কখনও তাহার
কৃপা অনুভব করিতে পারে না । কঠোপনিষদে বলিয়াছেন—“তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো,
যাজুপ্রলাদাঙ্গহিমানমান্ননঃ”—যাঁহারা অক্রতু অর্থাৎ কামনাশূন্য, যাঁহারা বীতশোক অর্থাৎ
শোকদুঃখাদিরহিত, তাঁহারা ইন্দ্রিয়ধারক ইন্দ্রিয়-মনোবুদ্ধি প্রভৃতির প্রসন্নতা বা হিরতা
বশতঃ আমার বিত্ত্ব চৈতন্য স্বভাব বা নিকরিকার ভাব সাক্ষাৎ করিতে পারেন ।

সুতরাং ভগবানের শরণাগত হইতে হইলেও পুরুষার্ধের আবশ্যক । পুরুষের প্রথমই
পৌরুষ, সেই পৌরুষও ভগবদশক্তি । এই আত্মশক্তির প্রভাবেই মন সর্বপ্রকার আসক্তি-
শূন্য হইয়া যাইতে পারে । আত্মসাক্ষাৎকার পৌরুষ-প্রযত্নেরই ফল । যে চেষ্টা করিবে,
যে লাগিয়া থাকিবে, তাহারই হইবে, এবং তাহাও ইন্দ্রিয়শক্তি বা আত্মশক্তি, সুতরাং তাহা
করিয়া কাহারও অহঙ্কার করিবার কিছু থাকে না । যাঁহারা দিনরাত ক্রিয়ালগ্নিগা থাকেন,
তাঁহাদের ক্রিয়ার পরাবস্থা আসিবেই, ক্রিয়ার পর অবস্থায় জীবের জীবন থাকে না, তখন

(জীবের প্রকৃতি-পরতন্ত্রতা)

যদহঙ্কারমাস্রিত্য ন যোৎসু ইতি মন্যসে ।

মিথ্যৈব ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নির্যোক্যতি ॥ ৫৯

জীব শিবের সহিত মিলিয়া শিব হইয়া যান । তাই আত্মাতে চিত্ত রাখিয়া সর্বদা ক্রিয়া করি-
বার উপদেশ লাহিড়ী মহাশয় দিয়াছেন । স্থানে স্থানে বড় রিপূর্ণের অভিজ্ঞ হুর্গ এবং নিম্নরূপ
পূর্বকর্ণের সংস্কার, এসব ভেদ করিয়া বাহির হওয়াই যেন অসম্ভব বলিয়া মনে হয় । কিন্তু
তখনই মন তাহা হইতে মুক্ত হইতে পারে, যদি মচ্ছিত্ত হয় অর্থাৎ কৃষ্ণের সর্বদা লক্ষ্য
রাখে । অভিমান বশতঃ নিজেকে বড় মনে করিয়া যদি সারাংসার এই কথা না শুন ও তদমু-
রূপ কাজ না কর তাহা হইলে বিনাশ অশুভাচারী, অর্থাৎ বারবার জন্মমরণের বশীভূত হইতে
হইবে । ভগবৎকৃপা সেখানে তর্য, যেখানে সেই আপনাতে আপনি—সেখানটীতে
মনোবুদ্ধিকে পৌছাইয়া দাও । মন হইতে সব আশা—সব কল্পনা নিঃশেষে দূর করিয়া দাও,
তবে তুমি অকিঞ্চন হইতে পারিবে । এই অকিঞ্চনের প্রতি ভগবানের অসীম কৃপা ॥ ৫৮

অর্থ । অহঙ্কার আস্রিত্য (অহঙ্কার আশ্রয় করিয়া) ন যোৎসু (যুদ্ধ করিব না)
ইতি যৎ মন্যসে (এইরূপ যে মনে করিতেছ) তে (তোমার) ব্যবসায়ঃ (নিশ্চয়) মিথ্যা
এব (মিথ্যাই) [কারণ] প্রকৃতিঃ ত্বাং (প্রকৃতি তোমাকে) নির্যোক্যতি (যুদ্ধে
নিযুক্ত করিবে) ॥ ৫৯

শ্রীধর । কাম বিনষ্ক্যামি ন তু বহুভির্ভুংগ্য করিষ্যামীতি চেৎ ? তত্রাহ—যদহঙ্কারমিতি ।
মহত্ত্বম্ অনাদৃত্য কেবলম্ অহঙ্কারম্ অবলম্ব্য যুদ্ধং ন করিষ্যামি ইতি যৎ মন্যসে—ত্বম্
অধ্যবশ্রুসি । এবং ত ব্যবসায়ো মিথ্যৈব, অন্ততঃস্বাৎ তব । তদেবাহ—প্রকৃতিঃ ত্বাং
বহোত্তররূপে পরিণতং সত্যী নির্যোক্যতি—যুদ্ধে প্রবর্তয়িত্যভ্যেব ॥ ৫৯

বঙ্গানুবাদ । [আমার স্বাভিলাষ নষ্ট হউক, তথাপি বহুগুণের সহিত যুদ্ধ করিব না—
যদি এইরূপ বল, তাহার উত্তরে বলিতেছেন]—আমার বাক্য অনাদৃত করিয়া, কেবল
অহঙ্কার অবলম্বন পূর্বক “আমি যুদ্ধ করিব না” এইরূপ যে মনে করিতেছ, তোমার ঐ
অধ্যবসায় মিথ্যা, কারণ তোমার স্বাধীনতা নাই । তাহাই বলিতেছেন—যে তোমার প্রকৃতি
বহোত্তররূপে পরিণত হইয়া (কারণ তোমার ক্ষত্রিয় স্বভাব) তোমাকে যুদ্ধে প্রবর্তিত
করিবেই ॥ ৫৯

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—যত্নপিত্তাৎ দেখা ক্রিয়া করে না ক্রিয়া করে যে আমি
বড়মানুষ আমি আবার ক্রিয়া কি করব—তবে ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত আমি অর্গে
যাই আমি কৈলাসপুরে যাই—আমার হেন হ'ক, আমার তেন হ'ক, এ সমুদয়ই
মিছে, কিন্তু ঐ প্রকৃতি দ্বারায় মিথ্যা ব্যবসা করিলে পুনর্ববার জন্মগ্রহণ করিতে
হইবে, এবং কাজে কাজেই পরে এই ক্রিয়াই আপনা আপনি করিতে
হইবে, যখন দুঃখ ব্যতীত সুখ স্থায়ী কিছুতেই দেখিবে না —“যুদ্ধ করিব
না”—এ নিশ্চয় তোমার টকিবে না । কারণ জীব মাত্রেই প্রকৃতির দাস । তুমি ইচ্ছা

স্বভাবজেন কোন্তেয় নিবন্ধঃ স্নেন কর্মণা ।

কর্তুং নেচ্ছসি যমোহাৎ করিষ্যস্ববশোহপি তৎ ॥ ৬০

না করিলেও তোমার ক্ষত্রিয় প্রকৃতি তোমাকে যুদ্ধে নিযুক্ত করিবেই । আমার আশ্চর্য্যনে কাজ নাই, আমি যাগ-যজ্ঞ ব্রত-নিয়মাদির দ্বারা স্বর্গ্যাদি লাভ করিব, আশ্চর্য্যনে যে হাঙ্গামা সে হাঙ্গামা পোহাইতে রাজি নহি—একথা বলিলেও চলিবে না । বারবার জন্ম-মৃত্যুর দুঃখ ভরন করিয়া এবং সংসারে বিবিধ ক্লেশ, তাপ ও বিরহের জ্বালায় দগ্ধ হইয়া আত্মাহুতহীন হইয়া একদিন আমাকে বাধ্য করিবেই । কারণ যাহারা জন্মজন্মান্তরীয় সংসার বশতঃ রজঃ-সত্ত্ব-মিশ্রিত স্বভাব লাভ করিয়াছে, তাহারা একান্ত আসক্তচিত্তে সংসার লইয়া থাকিতে পারে না, তাহাদের নিদ্র প্রকৃতিই আত্মজিজ্ঞাসার দ্বারা নিঃশেষে ব্যাকুল করিয়া তুলিবে । সেইজন্য আত্মজ্ঞান লাভার্থে চেষ্টা বা যুদ্ধ করা যাহা তোমার পক্ষে স্বাভাবিক তাহা করিবে না কেন বলিতেছ ? তুমি ক্রিয়া কর, তবে এইটুকু বিচার রাখিও যে ক্রিয়াতে তোমার যেন ফলা-কাজ্জা না থাকে, তাহা হইলেই কোশলে প্রকৃতিকে বশ করিতে পারিবে । এখন যাহা অগাধ মনে করিতেছ ক্রিয়াভ্যাসে সত্তত সচেষ্ট থাকিলে (যাহা তোমার পক্ষে স্বাভাবিক) তুমি একদিন এরূপ অবস্থা লাভ করিবে যখন আর তোমাকে এতদূর হানাহানি লড়াই করিতে হইবে না । তোমার স্বভাব আপনা-আপনি পরিবর্তিত হইয়া যাইবে । তোমার ক্ষত্রিয় স্বভাব বলিয়া চিরদিনই যে তোমাকে ক্রিয়া করিয়াই বাইতে হইবে, স্থির নিশ্চল আর হইতেই পারিবে না, তাহা নহে । কিন্তু এখনই যদি শান্ত স্থির হইয়া বসিয়া থাক এবং তজ্জন্য ক্রিয়ার চেষ্টা পর্য্যন্ত ত্যাগ কর তাহা হইলে চলিবে না । তোমার স্বভাবই তোমাকে ক্রিয়া করাইয়া তবে ছাড়িবে । ক্ষত্রিয় স্বভাব তোমার, তুমি এক্ষণে ব্রাহ্মণের মত ঠিক শাস্তভাবে ধ্যান-মগ্ন হইয়া থাকিতে পারিবে না, এখন যদি ক্রিয়ারূপ যুদ্ধ ছাড়িয়া চুপ করিয়াই বসিয়া থাক, তথাপি তুমি চুপ করিয়া থাকিতে পারিবে না । যদি শূন্য হইতে তাহা হইলে চুল আসিত, বৈশ্র হইলে কতপ্রকার লাভালাভের কতিয়ান করিতে । কিন্তু তুমি যে ক্ষত্রিয়, তুমি চুপ করিয়া থাকিলেও তোমার মন ক্রিয়া করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিবে, এইজন্য নিজ প্রকৃতি-মত কাজ কর । ক্ষত্রিয়স্বভাবে শান্ত শুদ্ধ স্থির ভাব মধ্যে মধ্যে আসে, এইজন্য সেই অবস্থার প্রতি লোভ আছে, কিন্তু এখনও তো পরাবস্থায় বেশীক্ষণ থাকিতে পার না । এজন্য তোমার মনে ক্লেশ হওয়াও স্বাভাবিক, কিন্তু ক্রিয়া (যুদ্ধ) ব্যতীত যখন ঐ ক্লেশ উপশমের আর কোন ঔষধ নাই, তখন ক্রিয়া না করিয়া আর উপায় কি ? যদি একান্তই গৌর্য্যতুমি করিয়া ক্রিয়া না কর, তবে জন্ম-মরণের হাত এড়াইবে কিরূপে ? এই জন্ম-মরণের অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়া আবার একদিন নিজে নিজেই ক্রিয়া করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণর নিকট আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে । গুরুই লক্ষ্যভেদের সাধন দেখাইয়া শিষ্টকে কৃতার্থ করিয়া থাকেন । তবে প্রকৃত শিষ্ট হওয়া চাই ॥ ৫৯

অন্থর । কোন্তেয় (হে কোন্তেয় !) মোহাৎ (মোহবশতঃ) যৎ কর্তুং ন ইচ্ছসি (যাহা করিতে ইচ্ছা করিতেছ না) স্বভাবজেন (স্বভাবজাত) স্নেন কর্মণা (স্বীয় কর্মণা)

নিবন্ধঃ (আবদ্ধ ভূমি) [স্তবরাং] অবশঃ অপি (অবশ হইয়াও) তৎ করিষ্যসি (তাহা করিবে) ॥ ৬০

শ্রীধর । কিঞ্চ—স্বভাবজেনেতি । স্বভাবঃ—ক্ষত্রিয়ত্ব হেতুঃ পূর্বকর্মসংস্কারঃ তস্মাৎ জাতেন স্বীয়েন কর্মণা—শৌর্য্যাদিনা পূর্বোক্তেন নিবন্ধঃ—যদ্বিতঃ, যৎ মোহাৎ যৎ কর্ম—যুদ্ধলক্ষণং, কর্তুং ন ইচ্ছসি, অবশঃ সন্ তৎ কর্ম করিষ্যসি এব ॥ ৬০

বল্লাভবাদ । [আরও বলিতেছে] স্বভাব অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ত্ব হেতু পূর্বকর্মসংস্কারজাত শৌর্য্যাদি স্বীয় কর্ম দ্বারা ভূমি নিয়ন্ত্রিত । মোহবশতঃ এখন যে যুদ্ধরূপ কর্ম করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, অবশ হইয়াও ঐ সকল কর্ম পরে তোমাকে করিতে হইবে ॥ ৬০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—আপনার আপনার আত্মা আপনার কর্ম্মতেই নিঃশেষরূপে বদ্ধ যেমন ভূমি ব্রহ্মতে থাক ত ব্রহ্মতে যাবে, অত্যা দিকে আসক্তি পূর্বক দৃষ্টি কর ত সেইখানে যাবে—ভূমি ভালরূপ ক্রিয়া কর ভালরূপ ফল পাইবে, যদিহুতাং মোহেতে করে অন্য বস্তুতে আসক্তিপূর্বক দৃষ্টি করিয়া থাক আত্মাতে না থাক—পরে জন্ম মৃত্যু দুঃখভোগ করিয়া শান্তিযুক্ত হইয়া এই ক্রিয়া করিতে বাধিত হইবে—কারণ ইহা ব্যতীত অন্য গতি নাই ।—জীব পূর্বজন্ম-সংস্কারজাত স্বভাবের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ, প্রকৃতির সে বেষ্টন উল্জ্বল করিবার সাধ্য কাহারও নাই । জীবত্ব যেখানে, সেখানে সে স্বাধীন নহে, প্রকৃতির অধীন । তাহার নিজ স্বরূপে তিনি সরা যুক্ত, সেখানে প্রকৃতিও নাই । আত্মার স্বরূপে কখন দাগ লাগে না, তাহা সর্বদাই স্বতন্ত্র, প্রকৃতি-পরতন্ত্র নহে । তবে যজ্ঞবর্ণ কাচের পাত্রের মধ্যে জলকে যেমন যজ্ঞবর্ণ বলিয়া বোধ হয়, তজ্জন্য প্রকৃতির মধ্য দিয়া আত্মাকে দেখিলে (জীবভাবে আত্মা প্রকৃতি যুক্ত) প্রকৃতির গুণে আত্মাকে লিপ্ত বলিয়া মনে হইবেই । তাহা অন্তর্ধা করিবার উপায় নাই । যখন সাধক ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর-অবস্থা প্রাপ্ত হন অর্থাৎ মন যখন শরীর, প্রাণ-বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের অতীত হইয়া আত্মস্বরূপে অবস্থিত হয়, তখন সেখানে ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই অসম্ভব থাকিবে না, প্রকৃতিও থাকিবে না, প্রকৃতির অসম্ভবও থাকিবে না । তখন প্রকৃতি থাকিলেও আত্মার সহিত প্রকৃতি যুক্ত না থাকায় প্রকৃতির কার্য আর আত্মাতে অধ্যাসিত হইবে না । প্রকৃতিযুক্ত আত্মার উপর আর প্রকৃতির কোন কর্তৃত্ব থাকিবে না । আমি মুক্তি-লাভ করিব বলিলেও আমার মুক্তি হইবে না, আমি বদ্ধ থাকিব বলিলেও আমি বদ্ধ থাকিতে পারিব না । পূর্ব পূর্ব কর্ম্মবশতঃ যাহার স্বরূপ জ্ঞানের উদয় হয়, তাহার নিষ্ঠা বা কর্ম্ম-চেষ্টাও তজ্জন্য হয় । যাহার জ্ঞান-বৈরাগ্যের সংস্কার আছে, সে সাধনার দিকে মূর্ত্তির পথে চলিবেই, তাহার সাময়িক ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর উত্থানির্ভর করে না । সকলেরই স্বভাব নিজ নিম্ন-কন্মদ্বারা গঠিত, সে স্বভাব কেহ অতিক্রম করিতে পারে না । যদি বল জীবের স্বাধীন-মতা তবে কোথায় ? তাহার উত্তর এই বলি যে—জীবভাবে জীবের স্বাধীনতা নাই, জীব সকল স্ব-স্ব কর্ম্ম প্রকৃতির দ্বারা আবদ্ধ, স্তবরাং জীবভাব থাকিতে জীবের স্বাধীনতা নাই । তবে জীবের জীবত্ব মোচনের উপায় আছে । জীব স্ব-স্বরূপে শুদ্ধ চৈতন্য, নিজিয় ও নিরূপাধিক ।

তিনি প্রকৃতির কর্মকে অস্বীকার করিয়া আত্মক হন। প্রকৃতি আপনাব কর্ম করিবেনই, কিন্তু সে অবস্থাতেও আত্মা তাহাতে লিপ্ত নহেন, ইহা বুঝিতে পারিলেই জীবের স্বরূপে অবস্থান হয়।

“মুখাভাসকো দর্পণে দৃশ্যমানো, মুখত্যাং পৃথক্তেজস নৈবান্তি বস্তু।

চিহ্নাভাসকো ধীমু জীবোহপি তৎসং, স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোহহমাত্মা ॥

যথা দর্পণাভাব আভাসহানো, মুখং বিজ্ঞতে কল্পনাহীনমেকং।

তথা ধীবিয়োগে নিরাভাসকো যঃ, স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোহহমাত্মা ॥”

দর্পণে দৃশ্যমান মুখ-প্রতিবিম্ব যেমন প্রকৃত মুখ হইতে পৃথক্ বস্তু নহে সেইরূপ বুদ্ধিদর্পণে আত্মপ্রতিবিম্বস্বরূপ আভাস বাহ্য জীব নামে কথিত, তিনিও পরমাত্মা হইতে পৃথক্ নহেন। সেই নিত্যবোধ-স্বরূপ আত্মাই আমি।

যেদ্রুপ দর্পণের অভাব হইলে প্রতিবিম্বের অভাব হয়, তখন একমাত্র কল্পনাহীন মুখই বিদ্যমান থাকে, তদ্রূপ বুদ্ধিদ্রুপ দর্পণের অভাবে যিনি প্রতিবিম্বশূন্য বা আভাসহীন হইয়া বিদ্যমান থাকেন, সেই নিত্যবোধ স্বরূপ আত্মাই আমি।

এরূপ হয় না যে প্রকৃতির গুণ এবং সেই হেতু তাহার কর্ম সমুদায়কে আত্মা সর্বদা শাসন করিয়া বেড়াইবেন। প্রকৃতির গুণাত্মক কর্ম হইবেই, কিন্তু আত্মা তাহাতে কখনও লিপ্ত নহেন ইহা জানিতে পারিলেই আত্মা প্রকৃতির নিগড় হইতে মুক্তিলাভ করেন।

পূর্বাভাস বশতঃ জীব বিষয়ে আসক্তদৃষ্টি হইলে তাহার কষ্ট-ভোগও অনিবার্য, কিন্তু কষ্টভোগ করিয়া জীব সেই কষ্ট-ভোগ হইতে পরিত্রাণ চায়, তখনই তাহার সাধনার দিকে লক্ষ্য পড়ে। অম্ম-জবা-মৃত্যুর কষ্ট দেখিয়া জীবের নিজ প্রকৃতিই তাহা হইতে মুক্তির সোপান অন্বেষণে তৎপর হয়। তাই সদগুরুগণ বলেন, যদি এখন হইতে মুক্তির সোপান অন্বেষণে তৎপর হয়, তাই সদগুরুগণ বলেন, যদি এখন হইতে ভাল করিয়া ক্রিয়ার অভ্যাসে মন দাও, তবে তোমার মুক্তির পথ পরিষ্কার হইয়া উঠিবে, যদি আসক্ত বা প্রমাদবশতঃ ক্রিয়া করা কষ্টকর বোধ কর, তবে তোমাকে এখনও অনেক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু সেই সব দুঃখ-কষ্ট ভোগের পর তোমার চিত্ত তাহা হইতে মুক্তি লাভের জন্য স্বতঃই উদ্যোগী হইবে। বাহ্য পথে করিতেই হইবে, তাহা এখনই অমুষ্ঠান কর, তাহাতেই কল্যাণ লাভ করিবে ॥ ৬০

* আত্মার উপর প্রকৃতির কর্ম কোন বলেই নাই। কোন দিনই আত্মা প্রকৃতির কার্যে লিপ্ত নহেন। তবে যেমন কোন সাধু প্রথম কোন উদ্দেশ্য বশতঃ নহে, কেবল খেলার ছলে যদি ছবি করেন, এবং তখন যদি তাহাকে শাস্তিরক্ষকেরা ধরিত্তা ফেলে, তবে তিনি খুশি হন সত্য; কিন্তু সে অবস্থাতেও ঐ কর্ম তাহাকে লিপ্ত করিতে পারে না, কারণ সে কর্মের প্রতি তাহার আসক্তি নাই এবং তিনি চৌধ্য কর্ত্তার ভান করিয়াছেন বলিয়াই যে তিনি প্রকৃতি-পরতন্ত্র হইয়া যাইবেন তাহাও নহে। শুদ্ধ আত্মার সম্বন্ধে বস্তু মুক্তি কিছুই চিন্তনীয় নহে, কারণ প্রকৃতি হইতে তিনি সর্বা মুক্ত, তবে যেখানে প্রকৃতির বস্তুতা আছে সেখানে প্রকৃতির বশে অবশ ভাবেই জীবকে কর্ম করিতে হয়। সাংখ্য মতামুযায়ী প্রকৃতিই সেই কর্ম করান, আর বেদান্ত মতে ঈশ্বরই মারা দ্বারা এই সব কর্ম করিবার প্রেরণা দেন। হস্তরং অবশ হইয়াই জীবকে স্বভাবের বশে বা ঈশ্বরের দ্বারা অমুসরণ করিতে হয়। কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থার প্রকৃতি পৃথক্ হইয়া যান অথবা ঈশ্বর নিজ মারা সংহরণ করেন। মোটের উপর উহা একই কথা। প্রকৃতি পৃথক্ হইয়া যাইলেও তাহার কর্ম করিবার সামর্থ্য থাকে না, তখন প্রকৃতির থাকা না থাকা সমান হইয়া পড়ায়।

(জীব দৈবদ্যায়ী, অন্তর্ধ্যায়ী পরমেশ্বরই পরিচালক

দৈবরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্যেশেহর্জুন তিষ্ঠতি।

ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্তারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ৬১

অম্বর। অর্জুন (হে অর্জুন !) দৈবরঃ (পরমেশ্বর) মায়য়া (মায়াক্রিয়া) যন্তারূঢ়ানি [ইব] (যন্তারূঢ় পুস্তলিকার ছায়া) সর্বভূতানি (ভূত সকলকে) ভ্রাময়ন্ (ভ্রমণ করাইয়া) সর্বভূতানাং হৃদ্যেশে (সর্ব জীবের হৃদয় বেশে) তিষ্ঠতি (অধিষ্ঠিত আছেন) ॥ ৬১

শ্রীধর। তদেবং শ্লোকদ্বয়েন সাংখ্যাদ্বিমতেন প্রকৃতিপারতন্ত্র্যং স্বভাবপারতন্ত্র্যং কর্মপার-
তন্ত্র্যং চোক্তম্। ইদানীং সমতম্যং—দৈবর ইতি দ্ব্যত্ম্যম্। সর্বভূতানাং হৃদয়মধ্যে দৈবরঃ—
অন্তর্ধ্যায়ী তিষ্ঠতি কিং কুর্সম? সর্বাণি ভূতানি মায়য়া—নিজ শক্ত্যা, ভ্রাময়ন্—তত্ত্বং
কর্মস্ব প্রবর্তয়ন্। যথা দাক্ষস্ময় আকৃঢ়ানি কৃত্রিমাণি ভূতানি স্বত্বধারী লোকে ভ্রাময়তি
তৎসং ইত্যর্থঃ। যথা বজ্রাণি—শরীরানি আকৃঢ়ানি ভূতানি—দেহাতিমানিনঃ জীবান্,
ভ্রাময়ন্ ইত্যর্থঃ। তথা চ শ্বেতাশ্বতরাণাং মন্ত্রঃ—

“একো দেবঃ সর্বভূতেষু গুঢ়ঃ

সর্বব্যাপী সর্বভূতাস্তরায়া।

কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাবিবাসঃ

সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নিগুণশ্চ ॥” ইতি।

অন্তর্ধ্যায়ীভ্রাময়ক—“য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মানং অন্তরো ব্রময়তি” ইম্ আত্মা ন বেদ, বস্তু
আত্মা শরীরম্, এবং তে অন্তর্ধ্যায়ীভ্রাময়কঃ” ইত্যাদি। (বৃহদারণ্যকঃ ॥ ৬১

বস্তুভ্রাময়ক। [এইরূপে দুইটি শ্লোকে সাংখ্যাদ্বিমতে জীবের প্রকৃতি-পারতন্ত্র্য (প্রকৃতির
অধীনতা) ও স্বভাবপারতন্ত্র্য এবং কর্মপারতন্ত্র্যের কথা বলা হইল। এখন দুইটি শ্লোকে
ঈশ্বর মত বলিতেছেন]—সকল ভূতের হৃদয় মধ্যে অন্তর্ধ্যায়ী দৈবর রহিয়াছেন। কিরূপে
আছেন? (ইহার উত্তরে বলিতেছেন) যে সমস্ত ভূতগণকে মায়াদ্বারা অর্থাৎ ঈশ্বরশক্তি
প্রভাবে নিজ নিজ কর্মেতে প্রবর্তমান করতঃ (বহিয়াছেন)। যেমন পুত্রদ্বারা দাক্ষস্ময় আকৃঢ়
কৃত্রিম ভূতগণকে ভ্রমণ করায় তদ্রূপ। অর্থাৎ বস্তু শব্দে শরীর, তাহাতে আকৃঢ় দেহাতিমানী
জীবগণকে ভ্রমণ করাইয়া—ইহাই অর্থ। এ বিষয়ের প্রমাণ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের মন্ত্র বাহ্য—
“এক দেব অর্থাৎ পরমাত্মা যিনি সর্বভূতে গূঢ়ভাবে স্থিত এবং তিনি সর্বব্যাপী ও সর্বভূতের
অন্তরায়া, তিনি কর্মাধ্যক্ষ বা সকল কর্মের নিয়ন্তা এবং ভূতগণের অধিবাস অর্থাৎ অধিষ্ঠান-
স্বরূপ। তিনি সাক্ষী অর্থাৎ দ্রষ্টা ও চেতয়িতা এবং কেবল অর্থাৎ নিরুপাধিক ও নিগুণ অর্থাৎ
গুণাতীত। অন্তর্ধ্যায়ী-ভ্রাময়ক আছে—“যিনি আত্মাতে অর্থাৎ বুদ্ধিতে অবস্থিত হইয়াও বুদ্ধির
অন্তর এবং বুদ্ধিকে যিনি পরিচালিত করিতেছেন (তবুও) বুদ্ধি বাহ্যকে জানিতে পাবে না,
এবং বুদ্ধিই বাহ্য শরীর অর্থাৎ উপাধি, তিনিই তোমার আত্মা, অন্তর্ধ্যায়ী এবং অমৃত” ॥ ৬১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ঈশ্বর ক্রিয়ার পর অবস্থার হৃদয়েতে স্থিতি সকল
ভূতেই আছেন, চর এবং অচরে ব্রহ্ম স্বরূপে, ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না স্বরূপ যন্ত্রের

দ্বারায় সব ভুতকে অর্থাৎ হইয়াছে যাহারা আর হ'বে যারা তাহাতে আবৃত হইয়া—আরুণ অর্থাৎ অন্য বস্তুতঃ যাহা মিথ্যা তাহাকে সত্য জ্ঞান করিয়া—ভ্রমণ—মায়ী অর্থাৎ আসক্তি পূর্বক দৃষ্টি করিতেছে।—প্রকৃতির প্রেরণায় জীবকে অহরহঃ কৰ্ম-চক্রে ঘুরিতে হয়, এবং তাহারই ফলে নানা যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। ইচ্ছা না থাকিলেও জীবকে প্রকৃতির বশে পড়িয়া জন্ম-মৃত্যুর চক্রে বার বার ঘুরিতে হয়। বদ্ধ জীবের আত্মস্বাতন্ত্র্য নাই; তবে উপায় কি? জীবের কি তবে মুক্তি নাই? না, ইহা নহে, জীব মুক্তি লাভ করে, এবং মুক্তি লাভ করিয়াই জীবের প্রকৃতি-পারতন্ত্র্য ঘুচিয়া যায়। অনাহি কৰ্ম-বশে বা যে কারণেই হউক জীব প্রকৃতির অধীনতা স্বীকার করিয়াছে। বেদ ও অধ্যাত্ম শাস্ত্র বলেন—জীব এই অধীনতা জাল হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে, যদি সে সচেষ্ট হয়। জীব বদ্ধ বলিয়াই তাহার মুক্ত হইবার ইচ্ছাও স্বাভাবিক। ভগবান বা পরমাত্মা সকল অবস্থাতেই প্রকৃতির অধীশ্বর, তিনি কখনও প্রকৃতির অধীন নহেন, জীবও সেই পরমাত্মারই অংশ। যতদিন জীব পরমাত্মা হইতে আপনাকে স্বতন্ত্ররূপে দেখে, ততদিন সে বদ্ধ, ততদিন প্রকৃতির বশতা তাহাকে স্বীকার করিতেই হইবে। যখন সে জ্ঞান লাভ করে, আপনার স্বরূপ অবগত হয়, তখন তাহার প্রকৃতপারতন্ত্র্যের অবস্থা শেষ হইয়া যায়। কেন যে চৈতন জীব মায়ার বশীভূত হয়—সে অতি রহস্য ব্যাপার! অধ্যাত্ম শাস্ত্র চিত্তকেই মায়ার নাতি-দেহ কল্পনা করিয়াছেন, সেই চিত্ত-চক্রে অবরুদ্ধ হইলে মায়ার খেলাও বামিয়া যায়। অনাস্থ-বিষয়ে আত্ম-বুদ্ধি এবং আত্মবিষয়ে অনাস্থ-বুদ্ধি উৎপন্ন করাই মায়ার কার্য। এই মায়াই বিষ্ণু শক্তি বা ভগবানের কার্য উৎপাদকসমর্থ শক্তি। সেই শক্তির শরণ গ্রহণ করিলেই জীব মৃত্যুরূপ সংসারনিম্ন উত্তীর্ণ হইতে পারে। শক্তি ও শক্তিমাত্র অস্তিত্ব। বিষ্ণু-মায়ী ও বিষ্ণু-শক্তি—একই কথা। বিষ্ণু ও মায়ী অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত, এই মায়ামিশ্রিত চৈতন্ত্যই নারায়ণ বা নারায়ণী। তত্ত্বে ইহাকেই মহামায়ী বলিয়াছেন, বেদ ইহাকেই মুখ্য প্রাণ বলেন, যোগীরা ইহাকেই স্থির প্রাণ বলিয়াছেন। মায়ার কার্য—এই দেহ; এই দেহকে অবলম্বন করিয়াই জীবের জন্ম-মৃত্যু-চক্র—ইহাই মায়ার খেলা। মহাত্মদেহটী(প্রকৃতি)যেভাবে নিশ্চিত হইয়াছে এবং জীব দেহের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যেরূপে বদ্ধ হইয়াছে, আবার সেই দেহটীকে যথার্থ ভাবে জানিতে পারিলেই জীব তাহাতেই মুক্তির অবকাশ দেখিতে পাইবে, সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়াই দেহের গঠনপ্রণালীর নির্মাণ ব্যবস্থা হইয়াছে। বিবিধ নাড়ী-মুখে প্রাণের গতি হইলেই মন উন্নতির মত সংসার চক্রে পবিত্রমণ করে,—উহা রাধা করিবার একমাত্র উপায়—প্রাণকে স্থির করা। মহাত্মাবতার শাস্ত্রপুর্বে আছে—“মহাত্মদিগের দেহে বাতাদি-বাহিনী ৮শটি নাড়ী আছে। উহারা পাঁচ ইন্দ্ৰিয়ের গুণ দ্বারা পরিচালিত হয়। অজ্ঞাত সহস্র সহস্র সূক্ষ্ম নাড়ী—এ ৮শটি নাড়ীকে আশ্রয় করিয়া শরীর মধ্যে বিস্তৃত রহিয়াছে। নদী সমূহ যখন যথাকালে সাগরকে পরিবদ্ধিত করে, তদ্রূপ ঐ সমস্ত শিরা দেহের বুদ্ধি সাধন করিয়া থাকে। মানবগণের হৃদয় মধ্যে মনোবহা নামে যে শিরা আছে, ঐ শিরা তাহারই সর্ব গাত্র হইতে সঙ্কলিত গুণ গ্রহণপূর্বক উপস্থিত উন্নত কবিয়া দেয়। সঙ্কলিতব্যাপিনী অজ্ঞাত শিরা-সমূহ ঐ শিরা হইতে বহির্গত হইয়া চৈতন্যগুণ বহনপূর্বক চক্ষুর দর্শনক্রিয়া সম্পাদন

জ্ঞেয়। মন-বৃত্ত দ্বারা যেমন চক্ষুগত বৃত্ত মথিত হয়, তদ্রূপ সঙ্কলিত জী-দর্শনাদি দ্বারা চক্রে উদ্ভেদিত হইয়া থাকে। স্বপ্নাবস্থায় জী-দেহের অসংকেত মন যেমন সঙ্কলিত অমুরাগ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ঐ অবস্থায় মনোবহা নাড়ীও দেহ হইতে সঙ্কলিত গুণকে নির্গত করিয়া দেয়। তাহা হইলে দেহা যাইতেছে—নাড়ী-মুখেই বাহ্যপ্রবৃত্তি স্থিরিত হইয়া এই গুণময়ী সংসার-লীলা চলাইতে থাকে। তাহার নিবোধের কি উপায়—তাহাও শাস্ত্র-পুর্বে ঐ স্থানে উল্লিখিত রহিয়াছে—“বাহ্য-প্রবৃত্তিশূন্য মহাপ্রাণ যোগবলে ক্রমে ক্রমে গুণের সাম্য লাভ করিয়া অন্ত কাণে সত্য-লোকপ্রাপ্ত সুস্থি-মার্গের প্রতি প্রাণ প্রেরণপূর্বক মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন। মহাত্মের মন বিশ্বাত্মক হইলেই জ্ঞানের উদয় হয়। তখন সমুদয় বিষয় স্বপ্নের ভায় প্রতিভাত হইয়া থাকে এবং মনও প্রকাশশালী, বাসনাবিহীন মন-সিদ্ধ ও সর্বশক্তিসম্পন্ন হয়”। যোগ-ক্রিয়া অভ্যাসের ফলে বাহ্য সঙ্কলিত রুদ্ধ হইলে ক্রিয়ার পর-অবস্থায় হৃদয়ে যে একপ্রকার স্থিতি বোধ হয়, তাহাই দৈশনশীল বা দৈশর ভাব। যোগীরা এই অবস্থাটী প্রাপ্ত হইলেই বুঝিতে পারেন—জগতের নিয়ন্তা কে? কাহার শাস্তিতে এই জগৎ চলিতেছে? তখনই বুঝিতে পারা যায়—

“জগত্ত্বং জগদাধারত্বমেব পরিপালকঃ।

স্বমেব সর্বভূতানাং ভোক্তা জোহ্যং জগৎপতে।” অধ্যাত্মসাময়ণ

দেহমধ্যেই রহিয়াছেন—সেই দৈশরকে বুঝা যায় কিরূপে? জগৎ কাহার কটাক্ষপাতে চলিতেছে, সেই জগতের শাসক বা দৈশর সকলের হৃদয়-শক্তি-স্থিতিরূপে সর্বদাই বিরাজ করিতেছেন। তাহাকে জানিবার উপায় এই যে মূলধারাদি পঞ্চচক্রে ভেদ করিয়া মেরুদণ্ডের মধ্যভাগে সুস্থি নাড়ী প্রবাহিত হইয়াছে এবং সেই সুস্থি-নাড়ীমধ্যস্থ যে ব্রহ্মনাড়ী বর্তমান রহিয়াছে, তাহার অন্তর্গত যে শক্তি বা ব্রহ্মাকাশ রহিয়াছেন—উহাই সর্বশক্তিসম্পন্ন দৈশর, তাহারই শাসনে পঞ্চতত্ত্ব-মন-ইন্দ্রিয়াদি ভূতনিস্তর স্ব-স্ব-কর্মে প্রবৃত্ত রহিয়াছে, উহা না থাকিলে পঞ্চতত্ত্ব কর্তৃকর্ম হইতে পারিত না।

“ভয়াহস্তায়াস্তপতি ভয়াং তপতি সূৰ্য্যঃ।

ভয়াহিস্রস্ত বায়ুশ্চ মৃত্যুধাবতি পঞ্চমঃ ॥” কঠ উপঃ

প্রাণশক্তিরূপে প্রকাশিত জগৎ কারণ ব্রহ্মের ভয়ে বা নিয়মে বাধ্য হইয়া অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতেছে, ইহার ভয়ে তপন উদ্ভাপ দিতেছে, ইহার ভয়ে ইন্দ্র, বায়ু ও মৃত্যু স্ব-স্ব-কার্যে ধাবমান হইতেছে, আধ্যাত্মিক ভাবে দেখিলে দেখা যায় যে প্রাণশক্তির শাসনে এই ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মকৎ, ব্যোম বা মেরুদণ্ড মধ্যগত পঞ্চ-চক্রস্থ শক্তি স্ব-স্ব-কার্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। মহাপ্রাণ বা ব্রহ্মাকাশ সর্বত্র অর্থাৎ মূলধারাদি পঞ্চভূতময় স্থানেই লাস্কত হইতে পারেন, কিন্তু প্রধানতঃ ইনি আজ্ঞাচক্রেই বিশিষ্টরূপে প্রকাশিত আছেন। এই চক্রগুলির হৃদয়ে অর্থাৎ মধ্যস্থলেই কূটস্থ জ্যোতিঃ নির্কাত স্থানে প্রদীপশিখার মত প্রজ্জ্বলিত রহিয়াছেন। আবার প্রত্যেক চক্রের কূটস্থই আজ্ঞাচক্রস্থ কূটস্থের সহিত সমস্ত্র ভাবে মিলিত, যেন সকল চক্রে আজ্ঞাচক্রের জ্যোতিঃই দীপ্যমান রহিয়াছে। এইজন্ত এক আজ্ঞাচক্রে লক্ষ্য রাখিলেই সমস্ত চক্রস্থ কূটস্থের প্রতিই লক্ষ্য করা হয়। এই আজ্ঞাচক্রস্থ কূটস্থে লক্ষ্য করিতে পারিলেই

সর্বভূতস্থিত (সর্বক্ষেত্র অন্তর্গত) ব্রহ্মনাড়ী দ্বারা গমনাগমন হয় এবং তাহা হইলেই সর্বতোভাবে তাঁহার শরণ লওয়া হয়। (এই কথা পর স্কন্ধে বলিবেন)।

ক্রিয়ার পর-অবস্থায় স্থিতিই বিজ্ঞপদ। উহাতে স্থিত হইলেই ঐব বিশ্বাস হয়। সর্বদা চক্ষের মত জ্যোৎস্না দেখা যায়। স্বস্থ বায়ু (অনিল) স্বস্বায় সর্বদা থাকে, এবং প্রত্যুষের মত প্রকাশ অম্লভব হয়, সেই প্রকাশের মধ্যে বাহ্য ইচ্ছা করা যায়, সমস্তই দেখা যায়। জ্যোতিঃরূপ অগ্নি দেখা যায়, সূর্য্যরূপ কূটস্থ দেখিতে পাওয়া যায় এবং কূটস্থের মধ্যে নক্ষত্র, নক্ষত্রের মধ্যে শুভা এবং শুভা মধ্যস্থ আকাশে জিহ্বন রহিয়াছে দেখা যায়। প্রত্যেকের শরীরের মধ্যে মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি সুষুপ্তা রহিয়াছেন। উনিই স্বস্বায় শক্তি। ক্রিয়া দ্বারা ঐ শক্তি জাগ্রত হইলে সাধকের তখন অতি স্বল্পরূপে শরীরের মেরুদণ্ডে স্থিতরূপে পঞ্চতত্ত্ব প্রবেশ করিবার ক্ষমতা হয়। এই স্থিতি হইতেই “সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ” বলিয়া বোধ হয়, তখন আর কিছু আবরণ থাকে না, স্তব্ধাভিতর বাহির—সব এক হইয়া যায়। সুষুপ্তায় থাকিতে থাকিতে ক্রিয়ার পর-অবস্থায় মূলাধার হইতে ব্রহ্মরূপ পঞ্চাঙ্গ সর্বদা আটকাইয়া থাকে, তখন প্রাণের বায়ু, দক্ষিণ ও মধ্য শ্রোত একশ্রোত হওয়ায় কুলকুণ্ডলিনী তখন আত্মরূপে সর্বব্যাপক হইয়া যান, তখন এক ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই, সেখানে সেই ব্রহ্ম করাও কিছুই থাকে না। এই অবস্থা প্রাপ্তির লক্ষ্যই ক্রিয়া করা উচিত। ক্রিয়া না করিলে প্রাণের অচল বা স্থির অবস্থা বুঝা যায় না। এই পঞ্চপ্রাণের প্রাণবস্তুর যে মুখ্য প্রাণ—তিনিই কূটস্থ।

“এতদ্ব্যজ্ঞায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেজিয়াশি চ।

ধ্বং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্ত ধারিণী ॥” যুগল উপঃ

এই মুখ্য প্রাণ হইতেই প্রাণ, অপান প্রভৃতি পঞ্চ প্রাণের উৎপত্তি হয়। সঙ্গ দ্বারা চকল হইলেই মুখ্য প্রাণ বিভিন্ন প্রাণরূপে মন, ইন্দ্রিয় ও দেহাদির মধ্যে শক্তি বিস্তার করে। এই পঞ্চ প্রাণ স্থির হইলেই উহা মুখ্য প্রাণের সহিত এক হইয়া যায়, তখন মনও স্থির হইয়া অমন হইয়া যায়—উহাই ব্রহ্মলোক। স্বয়ং বায়ুই জীবের বল বা জীবন, সেই বায়ুই স্থানে স্থানে থাকিয়া ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ করে। ক্রিয়া দ্বারা প্রাণকে স্থির করিতে পারিলেই প্রাণ ও জ্ঞানসহ মন স্থির হয় এবং বহু জন্মের সংসার বশতঃ যে বাসনা বীজ সঙ্গ রূপে হৃদয়ে বিজ্ঞমান থাকে সেই বাসনা বীজ নষ্ট হইয়া যায়, তাহাতেই জীব মুক্তি লাভ করে—

“বধা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেন্ত্র হৃদি শ্রিতাঃ।

অধ মর্ত্যোহমৃতো ভবতি অত্র ব্রহ্ম সমাশ্রুতে।” কঠ উপঃ

তাঁহারা মন দ্বারা ক্রিয়া করেন ও ক্রিয়া দ্বারা ক্রিয়ার পর-অবস্থায় গমন করেন তাঁহাদের প্রথমই তৃতীয় নেত্ররূপ কূটস্থকে লাভ হয় এবং সেই তৃতীয় নেত্র পাইয়া তাঁহারা শিবরূপ হইয়া যান, পরে সেই কূটস্থে স্থির হইয়া থাকিতে থাকিতে তাঁহারা বিজ্ঞরূপ হইয়া যান, তাঁহাদের মূলাধারে কুণ্ডলিনী জাগিয়া উঠে।

তাঁহারা যতদূর পর্যন্ত ও কষ্ট সহন করিয়া ক্রিয়া করিয়া গেলেন তাঁহাদের সকলেই এই অপূর্ণ অবস্থা লাভ হইতে পারে। তখন যে সকল কামনা অন্তঃকরণকে আশ্রয় করিয়া ছিল তাহা আপনিই বিনষ্ট হইয়া যায়। অনন্তর তাঁহারা জলবৎ স্থিত অথচ ছড়ের হাথ স্রবাহু অমৃত

ক্রিয়ার পর অবস্থায় পান করিয়া থাকেন। এই অমৃতরূপ স্রাব পান করিয়া তাঁহারা অমরগণ প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ হইয়া যান। তখন প্রকৃতি-পুরুষ সেই পরমব্রহ্মপথে বীন হয় এবং সেই স্থিতি দ্বারা “সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ” হইয়া যায়। ব্রহ্মরূপ ভেদ করিয়া তখন প্রাণের গতি হয়, তখন প্রাণে চাকল্য থাকে না, মনের পরিকল্পনা থাকে না—স্তব্ধাভিতর ভাব তিরোহিত হইয়া যায়।

অব্যক্ত রূপে ভগবান্ যে চরাচর সর্বভূতে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন ক্রিয়ার পর অবস্থায় তাহা অম্লভব হয়। এই স্থিতি সর্বদাই বিজ্ঞমান রহিয়াছেন, কিন্তু ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্নারূপে জিহ্বণ যন্ত্রে প্রাণের গতি হওয়ায় সেই অব্যক্ত স্থির ভাবকে অম্লভব করা যায় না। জিহ্বণে আকৃষ্ট হইয়া লক্ষ্য বহিস্থ হওয়ায় সেই স্থির অব্যক্তাবস্থা বাহ্য জীবরূপে পরিণত হইয়াছে এবং এই জীবতাব বশতঃ অসত্য প্রপঞ্চ জগৎকে সত্য বলিয়া জ্ঞান হইতেছে এবং তাহাতে আসক্তি হওয়ায় বার বার জন্মমৃত্যুরূপ ভবভ্রমণ নিবারিত হইতেছে না। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যখন ব্রহ্মরূপে অবস্থান হয়, তখন সমস্ত ব্যক্ত ভাব অব্যক্ত-সত্তায় লীন হইয়া যায়।

জীবের দেহটাই হইতেছে যন্ত্র, যখন জীব স্বস্থানচ্যুত হয় তখনই মায়া তাহাকে আক্রমণ করে, জীবের ভ্রম উৎপন্ন হইয়া দেহে অভিমান হয়। এই দেহকে আমি বা আমার বলিয়া স্বীকার করাই যন্ত্রাঙ্কুর হওয়া। কিন্তু প্রকৃতিকে অতিক্রম করা জীবের পক্ষে দুঃসাধ্য হইলেও অসাধ্য নহে। ভগবান্ যেমন প্রকৃতির সাক্ষী মাত্র, সাধককেও সেইরূপ প্রকৃতির ঐষ্টা মাত্র হইতে হইবে। এই ঐষ্টা রূপে থাকিতে পারিলেই মায়া অতিক্রম করা যায়। ক্রিয়ার পর অবস্থার সময় সব হইতে ব্রহ্মন গিয়া পড়ে, তখন মায়াই কার্য স্থির ভাবে দেখা যায়, এবং মায়াই মোহিত হইতে হয় না। এই মায়া তবে কি?—জগৎ-জীব বাহ্য দ্বারা সংসার চক্রে আবর্তিত হইতেছে। এই মায়া তাঁহার স্বরূপের নীচে থাকে, মায়া স্বরূপ স্পর্শ করিতে পারে না, সেখানে “সদা নিরন্ত্র কৃৎসনঃ।” সেখানে কেবল আত্মা, আর কিছুই নাই। কিন্তু ব্রহ্মের “একোহং বহু শ্রাম্” এই সঙ্কল্পই মায়া বা ভগবদ্ভিচ্ছা। ছইদিকে দর্পণ রাখিয়া নিজেই দেখিলে যেমন একেই অসংখ্য অসংখ্য প্রতিবিম্ব দেখা যায়, তজপ ব্রহ্মের সঙ্কল্পই সেই মায়া দর্পণ, উহাই তাঁহার অবটনবটন-পটীয়া শক্তি—তাহাতে ব্রহ্ম আপনাকে বহুরূপে অবলোকন করেন—“তৎ স্ত্রী তদেবামুশ্রাবিশং”—ইহাই যেন তাঁহার সৃষ্টি এবং সেই সৃষ্ট পদার্থে তাঁহার অচ্যবেশ। যতরূপ মায়াদর্পণ থাকিবে ততরূপ এক আত্মাই অনন্ত দৃশ্য-পদার্থরূপে পরিদৃষ্ট হইবেন। এই মায়াই কেহ জগৎলীলার কারণ বলেন, কেহ ঈশ্বরের শক্তি বলেন। কিন্তু এই মায়া বড় অচিন্ত্য, ইনি আছেন কি নাই কিছুই বলা যায় না। মায়াই স্বরূপ এই :—

“অনাস্মানি শরীরানি আত্মবুদ্ধিস্তা বা ভবেৎ।

সৈব মায়া তস্মৈবাসৌ সংসারঃ পরিকল্প্যতে ॥”

অনাত্মা বা শরীরাদিতে যে আত্মবুদ্ধি তাহাই মায়া। তাহার দ্বারা সংসার পরিকল্পিত হয়। জানীরা বলেন সমুদ্রে যেমন তরঙ্গোচ্ছাস হয় তজপ পরমাশ্রিতে এই বিশ্ব কল্পিত হয়। এই পরিকল্পনা কেন হয়? তাহাকেই জানীরা জ্ঞানি বলেন। কারণ পরমার্থতঃ তাহার

(শরণাগত ভাবই মায়া হইতে পরিজ্ঞাপ লাভের উপায়)

তমেব শরণং গচ্ছ সৰ্বভাবেন ভারত ।

তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিঃ স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥ ৬২

কোন সত্তা নাই। “রজ্জৌ ভৃক্ষদবদ্ ভ্রান্ত্যা বিচারে নাস্তি কিঞ্চন”। ভ্রান্তিবশতঃ যেমন রজ্জুতে সৰ্পভ্রম হয়, কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে ভ্রান্তি সরিয়া যাইলে তখন রজ্জু রজ্জুই থাকে, তাহাতে সৰ্পজ্ঞান অসীক বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ ব্রহ্ম-বিচারণা করিলে ব্রহ্মাতিরিক্ত সংসার-সত্তার কোন বোধই থাকে না। হস্তামলকে আছে—

য একো বিভাতি স্বতঃ শুদ্ধচেতাঃ প্রকাশরূপোহপি নানেন বীষু।

শর্যাবোধকস্য যথা ভাসুরেকঃ স নিত্যোপলব্ধিরূপোহমাত্মা ॥—শঙ্কর

নানা পাক্ষিত্ত্ব জলে প্রতিবিম্বিত সূর্যের ছায় যে প্রকাশ স্বরূপ পদার্থ নানা বুদ্ধিতে নানারূপে প্রতীয়মান হইলেও শুদ্ধচিত্তে যিনি এক অদ্বিতীয় ভাবেই প্রকাশিত হন, সেই নিত্যবোধস্বরূপ আত্মাই আমি।

যনাচ্ছন্দদৃষ্টির্দ্বন্দ্বমর্কঃ যথা নিম্প্রভঃ মনুতে চাতিমুদঃ।

তথা বদ্ধবস্ত্রাতি যো মুচদৃষ্টেঃ স নিত্যোপলব্ধিরূপোহমাত্মা ॥—শঙ্কর।

মেঘের দ্বারা আচ্ছন্দদৃষ্টি অতিমুদ ব্যক্তি স্বর্য়াকেই মেঘাচ্ছন্দ ও প্রভাহীন মনে করে, সেইরূপ মুচদৃষ্টি অবিবেকী ব্যক্তিগণের নিকট বাহাকে বন্ধের ছায় বোধ হয়, সেই নিত্যবোধ-স্বরূপ আত্মাই আমি ॥ ৬১

অঙ্ঘর। ভারত (হে ভারত !) সৰ্বভাবেন (সৰ্বতোভাবে) তম্ এব (তাঁহারই) শরণং গচ্ছ (শরণাগত হও)। তৎ প্রসাদাৎ (তাঁহার প্রসাদেই) পরাং শান্তিঃ (পরমা শান্তি) শাশ্বতং স্থানং (ও নিত্য ধাম) প্রাপ্স্যসি (প্রাপ্ত হইবে) ॥ ৬২

শ্রীধর। তমিতি। যথাহেতুঃ সৰ্কে ভীষাঃ পরমেশ্বরপরতন্ত্রাঃ তন্মাৎ অহংকারং পরিত্যজ্য সৰ্বভাবেন—সৰ্বাঙ্গনা, তম্ ইতরমেব শরণং গচ্ছ। ততঃ তন্ত্ৰৈব প্রসাদাৎ পরাম্ উৎকৃষ্টে, শান্তিঃ স্থানঞ্চ—পারমেশ্বরং, শাশ্বতং—নিত্যং, প্রাপ্স্যসি ॥ ৬২

বঙ্গানুবাদ। [যেহেতু সৰ্বভাবই পরমেশ্বর-পরতন্ত্র]—অতএব অহংকার পরিত্যাগ করিয়া সৰ্বাস্তঃকরণে সেই ইতরেরই শরণাপন্ন হও। পরে তাঁহারই প্রসাদে পরা-শান্তি এবং শাশ্বত নিত্য স্থান প্রাপ্ত হইবে ॥ ৬২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—সেই যিনি ত্রিগুণাঘত হইয়া রহিয়াছেন তিনিই আত্মা তাঁহাকেই স্মরণ কর গুরুবাক্যের দ্বারা ক্রিয়া প্রাপ্ত হইয়া সকল বস্তুতে ক্রিয়ার পর অবস্থা ব্রহ্মকে দেখিয়া এইরূপ ক্রিয়া করিতে করিতে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিয়া আনন্দ লাভ করতঃ বাহ্যার পর আর নাই এমন শান্তিপদ পাইবে এবং বুদ্ধি দ্বারা স্থির করিতে পারিবে যে ইহা বাস্তব অম

কোন পথ শাস্তির আর নাই—নিত্যই এই বোধ থাকিবে।—যিনি সৰ্বভূতের স্বয়ংস্বার্থে স্থিতিরূপে অবস্থিতি করিতেছেন সংসারের চপল সুখ-দুঃখ হইতে পরিজ্ঞাপ লাভের জন্য দেহ, মন, প্রাণ, বাক্য ও বুদ্ধি দিয়া সৰ্বতোভাবে তাঁহার শরণ গ্রহণ করিতে হইবে, তবে তাঁহার অহংরূপে পরমা শান্তি লাভ করিতে পারিবে। প্রাণিগণ শুভ বা অশুভ যে সমস্ত কার্যে প্রবৃত্ত হয় তাহার মূলে দৈবের শক্তিই বিद्यমান রহিয়াছে। সূতরাং প্রথমতঃ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির দিকে না তাকাইয়া, যিনি এই সকলের কারণ, সেই ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ কর, তাঁহারই রূপায় অবিচ্ছিন্ন বা সংসারের পরপারে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। সেই আত্মারূপী ভগবান্ তোমার অন্তি সন্নিকটে, কারণ তিনি তোমার আত্মা, তিনি না থাকিলে তুমি থাক না। সেই ভগবান্ পরমাত্মা নিজ স্বভাবে নিত্য জ্ঞান স্বরূপ ও আনন্দ স্বরূপ, যদি তাঁহার শরণাপন্ন হও তবে তুমিও জ্ঞানানন্দ-সিদ্ধিতে ডুবিয়া থাকিবে। এই নাম-রূপময় অগৎ ও তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে। নিজ প্রকৃতিকে স্বীকার করিয়া নির্গুণ পুরুষ যখন ত্রিগুণাঘত হন, তখনই অব্যক্ত চিত্তরূপ হইতে জগৎ প্রপঞ্চ ব্যক্ত হইয়া উঠে। চিরস্থিৰ আনন্দসিদ্ধির মধ্যে একটু হিলোল বা স্পন্দন আরম্ভ হয়। এই স্পন্দনাদ্বিকা ভাবই প্রাণশক্তি, উহাই মায়ার রূপ। প্রাণশক্তির প্রথম বিকাশ সময়ে স্পন্দন থাকিলেও সে স্পন্দন ততটা বেগযুক্ত নহে, সে সময়ে তাই আত্মার মধ্যে স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান একেবারে আবৃত্তি হইয়া যায় না। তখনও মায়ার শুদ্ধশক্তিরূপে, বিভারূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন, তাই তখনও তাহাতে অজ্ঞানান্ধকারের কুহেলিকা ঘনীভূত হইয়া জ্ঞানদৃষ্টিকে অবরোধ করিতে পারে না। তখনও সুস্থির মধ্যে প্রাণের সঞ্চরণ হইতে থাকে। পরে যখন মায়ার স্পন্দন অতিমাত্রায় বেগযুক্ত হইয়া নিম্নে অবতরণ করে, যখন সুস্থির ছাড়িয়া প্রাণশক্তি নৃত্য করিতে করিতে ইড়া-পিঙ্গলায় আসিয়া প্রবিষ্ট হয়, তখনই মায়ার নিজ বিভারূপকেও আচ্ছন্ন করিয়া অবিচ্ছিন্নরূপে আপনাকে প্রকাশিত করেন। তখনই প্রাণমধ্যে অস্বাভাবিকরূপে কম্পন বৃদ্ধি হয় এবং সঞ্চরণ মন জাগিয়া উঠে, দেহাশ্রয়বুদ্ধি প্রবল হইয়া উঠে, এবং সচঞ্চল মন কর্তৃক বুদ্ধিমর্পণে নানাত্বের প্রতিবিম্ব পড়ে। দেহের সহিত আত্মার যোগ হইয়া জ্বলিও কম্পিত হয় এবং তখনই প্রাণ অতিমাত্রায় চঞ্চল হইয়া প্রাসরূপে বহির্গমনাগমন করিতে থাকে। যদিও সমস্তই চিন্ময় তবুও বস্তুরূপে সেই সূক্ষ্মদ্রব্যকে জড় বলিয়া অনুভব হয় এবং আত্মা বহির্ভূত হইয়া ঐ সকল বস্তুকে ভোগ করিবার জন্য মনোবেগরূপে ধারমান হয়; এবং জীব মনের ন্যূনতম সঞ্চরণ হইয়া বিবিধ ভোগলালসায় মগ্ন হয় এবং আপনাকে আপনি ভুলিয়া যায়। এখন এই অবস্থা হইতে জীবের ক্রিয়াকে উদ্ধার হইবে, তাই রূপাময় ভগবান্ গুরুরূপে অর্জুনকে বলিতেছেন—হে অর্জুন, যে ব্রহ্মাকাশ বা দৈব সমস্ত শক্তিপুঞ্জের মধ্যবিন্দু, যিনি অমূর্ত হইয়াও—“স বাহ্যাক্যন্তরহৃদঃ” সমস্ত বস্তুর বাহিরে ও ভিতরে বর্তমান অর্থাৎ জ্ঞানরূপে বুদ্ধির অভ্যন্তরে এবং নামরূপে বহির্দেহে বিद्यমান—তিনি পূর্ণ জ্ঞানরূপ জন্ম-মরণাধি বড় বিকার বর্জিত, কিন্তু তাঁহা হইতেই প্রাণশক্তি, চিত্তশক্তি, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং আকাশ (বিজ্ঞান) বায়ু (অনাহত) তেজঃ (মণিপুর) জল (বাধিষ্ঠান) ও সৰ্ব-ভূতের আধার পৃথিবী (মূলধার) উৎপন্ন হইয়া থাকে।—

“অগ্নিস্ফূর্তা চক্ষুরী চন্দ্রস্বৰ্ণা দিশঃ শ্রোত্রে বায়ুভূতাস্ত বেষাঃ ।
বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্ত পন্ত্য্যং পৃথিবী হ্বেষ সৰ্বভূতান্তরাঙ্গা ॥
তন্মাদগ্নিঃ সমিধো যন্ত স্বৰ্ঘাঃ সোম্যং পৰ্জন্তা ওষধয়ঃ পৃথিব্যাম্ ।
পুমান্ বেতঃ সিকৃতি যোবিতার্যং বক্ষীঃ প্রজাঃ পুরুষাং সম্প্রসূতাঃ ॥
তন্মাস্ত দেবো বহুধা সম্প্রসূতাঃ সাধ্যা মনুষ্যাঃ পশবো বয়ংসি ।
প্রাণাপানো ব্রীহিযবো তপশ্চ শ্রদ্ধা সত্যং ব্রহ্মচর্যং বিধিস্ত ॥
অতঃ সমুদ্রা গিরয়শ্চ সর্কহস্ত্যাং স্তম্ভতে সিদ্ধবঃ সৰ্করূপাঃ ।
অতশ্চ সৰ্কা ওষধয়ো রসশ্চ যেনৈব ভূতৈস্তিষ্ঠতে হস্তরাঙ্গা ॥” যুক্তক

এই পুরুষের মস্তক হইতে ছালোক বা আকাশ, দুইটা চক্ষু হইতে চন্দ্রস্বৰ্ণা, কর্ণ হইতে চিক্‌সমূহ, তাঁহার বাগিদ্রিয় হইতে ঋগাদি বেদ সমূহ, তাঁহার গ্রাণ হইতে বায়ু এবং তাঁহার হৃদয় হইতে এই বিশ্ব এবং পদবয় হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে । সেই নির্জীকার পুরুষ হইতে আকাশ উৎপন্ন হয়, এবং হোমকার্ত্ত সদৃশ স্বৰ্ঘ এই আকাশরূপ প্রথম অগ্নি হইতে উৎপন্ন । জলময় অমৃত হইতে মেঘরূপ দ্বিতীয় অগ্নি, এবং মেঘ বৃষ্টিরূপে পরিণত হইলে পৃথিবী হইতে তৃতীয় অগ্নিরূপে শস্তাদি উৎপন্ন হয়, অনন্তর অন্নাদি আহার দ্বারা পুষ্ট হইয়া চতুর্থ অগ্নিরূপে পুরুষ পঞ্চম অগ্নিরূপ জ্ঞীতে বীৰ্য্যরূপ আহুতি প্রদান করে । এইরূপ পবমান্ হইতে মনুষ্যাদি বহু প্রজা উৎপন্ন হইয়াছে ॥ সেই অক্ষর পুরুষ হইতে বহু আদি দেবগণ, সাধ্য নামক দেবগণ, মনুষ্য, প্রান্য ও অরন্য পশু এবং পক্ষী সকল উৎপন্ন হইয়াছেন । জীবদ্বিগের প্রাণন ক্রিয়া প্রাণ ও অপান, শাস্ত্র ও যব এবং ব্রতাদি রূপ তপঃ, সংকার্য সাধনে প্রবৃত্তিরূপ শ্রদ্ধা, সত্য, ব্রহ্মচর্য ও কৰ্ম্মাহুষ্ঠান পদ্ধতি বিধি সমূহর সেই সত্য পুরুষ হইতে উদ্ভূত ॥ এই অক্ষর পুরুষ হইতেই সমুদ্র সকল, পৰ্ব্বত সকল, নানারূপ নদী প্রবাহিত হইয়াছে, এবং এই পুরুষ হইতেই সকল প্রকার ধাতু যবাদি শস্ত, মধুর অন্ন রসাদি সমুদ্র হইয়াছে ॥

সঙ্কল্পনস্পর্শন-দৃষ্টি-মোহৈর্জ্ঞানাসামুদ্রায়াবিসৃজ্য ॥

কৰ্ম্মাহুগাক্তজ্ঞমেণ দেহী স্বানৈবু রূপাণ্যন্তিসম্প্রপজতে ॥

স্থলানি স্পর্শাণি বহুনি চৈব রূপাণি দেহী বশুগৈর্কৃণোতি ॥

ক্রিয়াগুণৈরাঙ্কগুণৈশ্চ তেষাং সংযোগহেতুরপরোহপি দৃষ্টঃ ॥ খেতাস্ততর উপঃ

প্রথমে সঙ্কল্প—মনে মনে ভালমন্দ কৰ্ম্মের চিন্তা হয়, তাহার পর স্পর্শন অর্থাৎ স্পর্শদ্রিয়ের ব্যাপার হয়, অনন্তর দৃষ্টিপাত, তাহার পর মোহ জন্মে । উক্ত সঙ্কল্পন, স্পর্শন, দৃষ্টি ও মোহ দ্বারা শুভাশুভ সমস্ত কৰ্ম্ম সম্পন্ন হয় । অনন্তর দেহী কৰ্ম্মাহুগাক্তী ত্রীপুরুষাধিকাবে কৰ্ম্মফলের পরিণাক অহুসারে দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি নানা দেহ প্রাপ্ত হয় । এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত দেবাইতেছেন—অন্নপান ভোজনে যেমন শরীরের বৃদ্ধি হয়, ইহাও ঠিক তেমনই হইয়া থাকে ।

সেই দেহী স্বকৃত পাপ পুণ্যের ফলে স্থূল সূক্ষ্ম বহুবিধ রূপ গ্রহণ করিয়া থাকে, এবং স্বকৃত কৰ্ম্ম ও জ্ঞানজনিত শুভাশুভ বাসনা বশে ভোগের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দেহ প্রাপ্ত হইয়া অপার জীব বলিয়া প্রতীত হয় ।

এই আত্মা যদিও সর্বোপাধিবিনিমুক্ত তথাপি তাঁহার অনাদি অবিজ্ঞা মায়াক্রান্তি বশতঃ তাঁহাকে গুণময় ও তাঁহার গুণক্রিয়ার ফল স্বরূপ এই জগদাদি কার্য্যকে উৎপন্ন বলিয়া বোধ হয় । কিন্তু স্বপ্নকাল পুত্রের যেরূপ অন্তঃকরণের অতিরিক্ত কোন পৃথক্ সত্তা নাই, তজ্জপ অবিজ্ঞাস্থষ্ট বিষয়াদিরও পুরুষাতিরিক্ত কোন পৃথক্ সত্তা নাই ।

সেই অবিজ্ঞা-বিরহিত আত্মস্বরূপে ফিরিয়া যাওয়া যায় কি প্রকারে ? পুরুষের সেই নির্জীকার সত্তায় ফিরিয়া যাউতে হইলেও যেমন ভাবে কুটস্থ পুরুষ হইতে এই বাহ্য ব্যাপার সমূহ সম্প্রসারিত হইয়াছে, ঠিক সেই সেই ভাবের মধ্য দিয়া আবার জীবকে স্বস্থানে ফিরিয়া যাইতে হইবে । উহাই ক্রিতিতত্ত্ব জলতত্ত্বে, জলতত্ত্ব তেজস্তত্ত্বে, তেজস্তত্ত্বে বায়ুতত্ত্বে, বায়ুতত্ত্বে আকাশের মধ্যে এবং আকাশকে স্থির প্রাণের মধ্যে এবং স্থির প্রাণকে অব্যক্তে লয় করিবার যে প্রণালী সেই পথ অবলম্বন করিতে হইবে । কিন্তু এভাবে সমস্ত বাহ্য বস্তুর মধ্যে প্রাণ-শক্তিরই জীড়া দেখা যাইতেছে, প্রাণই চঞ্চল হইয়া জগৎরূপে ব্যক্ত হইয়াছেন, আবার সেই অব্যক্তের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে সেই স্থির প্রাণকে ধরিতে হইবে, যিনি ত্রিগুণাশ্রিত হইয়া এই জীব ভাব ব্যক্ত করিতেছেন কিন্তু সমস্ত ব্যক্ত ভাবের মধ্যেও সেই অব্যক্ত ক্রিয়ার পরাবস্থারূপ ব্রহ্ম বিরাজ করিতেছেন নচেৎ কিছুই হইতে পারিত না । তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, না পারিলে আর মায়ার হস্ত হইতে পরিজ্ঞাণ পাইবার অন্য কোন উপায় নাই । তাই সৰ্বভাব তাঁহাতে অর্পণ করিয়া তাঁহার হইয়া যাইতে হইবে । সমস্ত ভাবময় সঙ্কল্প প্রাণ হইতে জাগিয়া উঠিতেছে, সেই প্রাণকে চালিয়া দিতে হইবে তাঁহাতে । তাহা হইলে আর এ ব্যক্ত জগতের কোন ক্ষুদ্র লক্ষিত হইবে না, তখন সমস্তই অব্যক্তের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া সবই অব্যক্ত হইয়া যাইবে । এই অব্যক্তই পরমপদ, এই অব্যক্তে প্রবেশ করাই সমস্ত সাধনার উদ্দেশ্য । ভগবান্‌ও তাই উপদেশ দিতেছেন—সৰ্বভাবে তাঁহার শরণ গ্রহণ কর, যেন তিনি ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা না থাকে, প্রাণাপানের সমতা সাধন দ্বারাই সুস্থায়ীস্থিত ব্রহ্মাকাশ প্রকাশিত হইবে, তখন তোমার মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি আপন আপন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাতেই বিলীন হইবে । তখন অব্যক্ত পরমপদ প্রকাশিত হইয়া পরা শাস্তিরূপ শান্ত স্থান—বাহার উপর আর কিছু নাষ্ট এমন স্থান লাভ করিতে সমর্থ হইবে । সেই মুখ্য প্রাণে যাইতে হইলে এই ব্যক্ত প্রাণেরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে, এই প্রাণের সাধনাত্তেই বাহ্য প্রকৃতির উপশম লাভ হইবে, তাহা হইলেই আপনায় মধ্যে আপনি থাকিয়া পরমানন্দ লাভ করিবে । উহাই পরমাত্মার প্রদান । যে ক্রিয়া করিবে না, সে তাঁহার প্রদান কি, তাহা কখন অহুতব করিতে পারিবে না ॥ ৬২

(গীতা-কথিত জ্ঞানই গুহ্যতর জ্ঞান)

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদগুহ্যতরং ময়া ।

বিসৃষ্টৈতদশেষেণ যথেষ্টসি তথা কুরু ॥ ৬৩

অঙ্গর । ইতি (এই) গুহ্যং গুহ্যতরং জ্ঞানং (গুহ্য হইতেও গুহ্যতর তত্ত্বজ্ঞান) তে (তোমার নিকট) ময়া আখ্যাতং (মৎ কর্তৃক উক্ত হইল) এতৎ (ইহা) অশেষেণ বিসৃষ্ট (অশেষ প্রকারে আলোচনা করিয়া) যথা ইচ্ছসি (যেরূপ ইচ্ছা হয়) তথা কুরু (তাহাই কর) ॥ ৬৩

শ্রীধর । সৰ্বগীতার্থমুপসংহরন্ম আহ—ইতিতি । ইতি অনেক প্রকারেণ তে—ভূতঃ, সৰ্বজ্ঞেন পরমকারুণিকেন ময়া, জ্ঞানং আখ্যাতং—উপদিষ্টম্ । কথন্তং ? গুহ্যং—গোপ্যাৎ রহস্তমন্ত্রযোগাধিজ্ঞানাদপি গুহ্যতরং । এতৎ ময়া উপদিষ্টং গীতাশাস্ত্রম্ অশেষতঃ বিসৃষ্ট—পর্যালোচ্য, পশ্চাদ্ যথেষ্টসি তথা কুরু । এতদ্বিন্ পর্যালোচিতে সতি তব মোহঃ নিবর্তিত্বতে ইতি ভাবঃ ॥ ৬৩

বঙ্গানুবাদ । [সমস্ত গীতার্থের উপসংহার করিতেছেন]—এইরূপে তোমাকে সৰ্বজ্ঞ ও পরম কারুণিক যে আমি, সেই আমাকর্তৃক জ্ঞান উপদিষ্ট হইল । সেই জ্ঞান কিরূপ ? তাহা গুহ্য অর্থাৎ গোপনীয় রহস্তমন্ত্রযোগাধি অপেক্ষাও গুহ্যতর । এই মণ্ডপরিষ্ট গীতা শাস্ত্রকে পর্যালোচনা করিয়া পশ্চাদ্ যাহা ইচ্ছা হয় কর । ইহা (গীতাশাস্ত্র) পর্যালোচিত হইলে তোমার মোহ নিবর্তিত হইবে—ইহাই ভাবার্থ ॥ ৬৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এই তোমাকে জ্ঞান সমুদয় বলিলাম—এখন তোমার যা ইচ্ছা হয় তা কর—যাহা গুহ্য হইতে গুহ্যতম অত্যন্ত গুহ্য—যাহা বলিলাম ইহা অত্যন্ত গুহ্য—বাহাতে মোহ অন্ধকার নষ্ট হয় এবং জ্ঞানদীপ জলিয়া উঠে, সেইরূপ গুহ্য হইলেও গুহ্যতর ও গুহ্যতম জ্ঞান ও তাহার সাধনার কথা তোমাকে বলিয়াছি । আত্মজ্ঞান লাভের ক্ষণে যে সকল ক্রিয়া-যোগ এবং তাহার ফলস্বরূপ যে সকল জ্ঞান ও অমৃতত্ব পর লাভ হয় তাহা সমস্তই তোমাকে শুনাইয়াছি । এখন তুমি তোমার কর্তব্য অবধারণ কর । জীবের মধ্যে তিনটি ভাব ররিয়াছে—(১) অজ্ঞতা বা দেহাত্মভাব, তখন দেহ এবং দেহের ভোগকেই সৰ্ব্বাপেক্ষা বড় বলিয়া মনে হয় । (২) সুখদুঃখের ষাত-প্রতিষাত এবং জন্মমরণের দারুণ ক্লেশ এবং তাহার প্রতিকারের কোন উপায় না দেখিয়া জীবের নিজ কর্তৃত্বের প্রতি অনাস্থা জন্মে । তখন সৰ্বশক্তিমান ঈশ্বর সহজে অলোচনা করিয়া ঈশ্বর সহজে একটি ধারণা হয়, তখন জীব তাঁহাতে আত্মসমর্পণের ক্ষমতা মোক্ষামুকুল সাধন ও বিচার অবলম্বন করে । ইহার ফলে (৩) ঐকান্তিক চেষ্টা ও তপস্যা দ্বারা তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করে এবং তখন বৃত্তিতে পারে যে শুদ্ধ বুদ্ধ মূল স্বভাব আত্মা হইতে সে স্বতন্ত্র নহে (ক্রিয়ার পর অবস্থায় অমৃতত্ব) । এই বোধে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলেই প্রকৃতির অধীনতা ত্যাগ করিবার সামর্থ্য জন্মে । তখন আমার “আমি”কে বৃত্তিতে পারে, তখন আত্মার প্রতি ঐকান্তিক অমুখ্যায় হয়, এবং আত্মা ব্যতীত আর কিছুই ক্ষণ প্রাণে আকাঙ্ক্ষারই উদয় হয় না—ইহাই ভক্তি যোগ । পরে

(গুহ্যতম রহস্ত কথা)

সৰ্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ ।

ইচ্ছৌহসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥ ৬৪

নিরাকাজ্জ যোগীর মনে আর কোন বস্তিরই উদয় হয় না তখন মনও থাকে না । তখন জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে যে এক সূদৃঢ় ও সুদীর্ঘ ব্যবধান ছিল তাহা বিলীন হইয়া যায়—ইহাই চরম জ্ঞান । এই অবস্থায় যিনি সুপ্রতিষ্ঠিত, মুক্তি তাঁহার নিজ আয়ত্তের মধ্যেই থাকে । ৬৩

অঙ্গর । মে (আমার) সৰ্বগুহ্যতমং (সৰ্বপেক্ষা গুহ্যতম) পরমং বচঃ (উৎকৃষ্ট বাক্য) ভূয়ঃ শৃণু (পুনরায় শ্রবণ কর) [অং—তুমি] মে দৃঢ়ম্ ইষ্টঃ অসি (আমার অত্যন্ত প্রিয় হও) ততঃ ইতি (সেই হেতু) তে (তোমাকে) হিতং (সেই হিতকর কথা) বক্ষ্যামি (বলিব) । ৬৪

শ্রীধর । অতি গম্ভীর গীতাশাস্ত্র অশেষরূপে পর্যালোচিতম্ অশরুতঃ কৃপয়া স্বয়মেব তত্ত্ব সাব্যং সংগৃহ্য কথয়তি—সৰ্বগুহ্যতমমিতি ত্রিভিঃ । সৰ্বকোষ্যোহপি গুহ্যভ্যো গুহ্যতমং মে বচঃ তত্র তত্র উক্তমপি ভূয়ঃ—পুনরপি, বক্ষমাণং শৃণু । পুনঃ পুনঃ কথনে হেতুমাহ । অং দৃঢ়ম্-অত্যন্তম্ ইষ্টঃ—প্রিয়োহদীতি মদ্য । তত এব হেতোঃ তে হিতং বক্ষ্যামি । যথা অং মম ইচ্ছৌহসি । ময়া বক্ষ্যমাণং চ দৃঢ়ং—সৰ্বপ্রমাণোপেতমিতি নিশ্চিত্য ততঃ তে বক্ষ্যামীত্যর্থঃ । দৃঢ়মতিরিক্তি কচিৎ পাঠঃ ॥ ৬৪

বঙ্গানুবাদ । [অতি গম্ভীর গীতাশাস্ত্র অশেষরূপে পর্যালোচনা করিতে অসমর্থ (অর্জুনের প্রতি) কৃপা করিয়া স্বয়ংই তাহার (গীতার) সাব্যং সংগ্রহ করিয়া তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন]—সৰ্ব প্রকার গোপনীয় হইতেও গুহ্যতম আমার বাক্য পূর্বে উক্ত হইলেও পুনরায় বলিতেছি শ্রবণ কর । পুনঃ পুনঃ বলিবার হেতু কি বলিতেছেন । তুমি আমার অত্যন্ত ইষ্ট অর্থাৎ প্রিয় ইহা মনে করিয়া সেই ক্ষণেই তোমার হিত বাহা তাহা বলিতেছি । অথবা তুমি আমার নিতান্ত প্রিয় বলিয়া এই বক্ষ্যমাণ বিষয়টি দৃঢ় অর্থাৎ সৰ্বপ্রমাণ-যুক্ত বলিয়া নিশ্চয় করিয়া তোমাকে আমি বলিতেছি । “দৃঢ়মিতি” স্থলে কেহ কেহ “দৃঢ়মতি” পাঠ বলিয়া থাকেন । ৬৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—কেবল অত্যন্ত গুহ্য বাহা, তাহা বলিতেছি—কারণ তুমি ইষ্ট সখা এটা ভালরূপে জান, তোমার ভালর নিমিত্ত বলছি।—তোমাকে রহস্ত কথা অনেকবার বলিয়াছি, এবং সেই গোপনীয় আত্মত্ব জানিবার যে রহস্তময় সাধনা তাহাও বলিয়া দিয়াছি, আবার যে তত্ত্ব-বস্তুর সাধনাই গুহ্যতর কথা, সেই গুহ্যতম তত্ত্ব-বস্তুর জ্ঞানিতে হইলে যাহা করা আবশ্যক ও যেরূপ হওয়া আবশ্যক সেই সৰ্ব গুহ্যতম তত্ত্ব আবার অর্জনকে বলিতেছেন । অর্জনকে কেন তিনি এত আগ্রহ করিয়া বলিতেছেন ? কারণ তিনি ভগবানে দৃঢ়প্রজ্ঞ । শ্রদ্ধালু না হইলে গুরু শিষ্যকে রহস্ত কথা বলিতে পারেন না, কারণ শ্রদ্ধাহীনকে উপদেশ দেওয়া নিফল । ভাগবতে তাই ঋষিরা সূতকে বলিলেন—“ক্রমুঃ শিষ্যস্ত শিষ্যস্ত গুরবো গুহ্যমপ্যুত” । শাস্ত্রের গুঢ় রহস্ত সৰ্বত্র প্রকাশ করা নিষিদ্ধ

(সর্বসার উপদেশ — ভগবানের প্রতিজ্ঞা)

মম্বনা ভব মন্ত্ৰো মদ্যাজী মাং নমস্করু ।

মামবৈশ্বসি সত্যং তে প্রতিজ্ঞানি প্রিয়োহসি মে ॥ ৬৫

হইলেও যে সকল শিশু শিষ্ট অর্থাৎ গুরুভক্তিপরায়ণ, তাহাদিগকে গুরু গভীর তত্ত্ব সকল গুরু বলিয়া থাকেন ।

হে অর্জুন—তুমি যে আমার ইষ্ট সখা, তোমাতে আমাতে যে কোন ভেদ নাই। তুমি সৎসার-বৃক্ষের ফল খাইয়া মুহমান হইয়া আপনার স্বরূপকে ভুলিয়া গিয়াছ, তোমার বন্ধ ভাব দেখিয়া আমার কষ্ট হইতেছে, নিজেই নিজেকে না বুঝাইলে আর কে তাহাকে বুঝাইবে? তাই আমি তোমার মঙ্গলের জন্য আবার গুরুতম কথা বলিতেছি। যে ইষ্ট সাধনায় দৃঢ়, ভগবানের রূপা সেই বুদ্ধিতে পারে। যে ভজনশীল, সাধনায় খুব দৃঢ়, তাহারই নিকট তো পূরম বহু প্রকাশিত হয়। প্রথমে পরোক্ষ জ্ঞানের কথা বলিয়া গন্তব্য পথ নির্দেশ করিয়াছি, সেই পথানুবর্তনের যে সম্বল গোপনীয় সাধনা—তাহাও তোমাকে বলিয়া দিয়াছি। এখন তুমি আমি যে এক তাহাই যেভাবে বুদ্ধিতে পারিবে অর্থাৎ জ্ঞান যেরূপে অপরোক্ষ হইয়া থাকে সেই পূরম জ্ঞান প্রাপ্তির উপায়—যাহা অপেক্ষা আর কল্যাণতম কিছু নাই—তাহাই তোমাকে বলিতেছি ॥ ৬৪

অর্থঃ । [অং—তুমি] মম্বনা: (মদগত-চিত্ত) মন্ত্ৰঃ: (আমার ভক্ত) মদ্যাজী মদ্বজনশীল বা আমার পূজক) ভব (হও), মাং নমস্করু (আমাকে নমস্কার কর); [ততঃ—তাহা হইলে] মাম্ এব এশ্বসি (আমাকেই পাইবে), তে (তোমার নিকট) সত্যং প্রতিজ্ঞানি (সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি) । [যতঃ অং—যেহেতু তুমি] মে প্রিয়ঃ অসি (আমার প্রিয় হইতেছে) ॥ ৬৫

প্রীধর । তদেবাহ—মম্বনা ইতি । মম্বনাভব—মচ্ছিত্তো ভব । মন্ত্ৰঃ—মন্ত্ৰজনশীলো ভব । মদ্যাজী—মদ্বজনশীলো ভব । মামেব নমস্করু । এবং বর্তমানঃ অং মৎপ্রসাদাৎ লব্ধজ্ঞানেন মাম্ এব এশ্বসি—প্রাপ্যসি । অত্র চ সংশয়ং মা কাৰ্যী: । অং হি মে প্রিয়োহসি । অং সত্যং যথা ভবতি এবং তুভ্যম্ অহং প্রতিজ্ঞাং করোমি ॥ ৬৫

বজ্রানুবাদ । [তাহা কি তাহাই বলিতেছেন]—তুমি মচ্ছিত্ত হও, আমার ভজনশীল হও, মদ্বজন (বা পূজনশীল) হও, আমাকেই নমস্কার কর । এইরূপ হইলে তুমি মৎপ্রসাদ-লব্ধ জ্ঞানের দ্বারা আমাকেই পাইবে । এ বিষয়ে আর সন্দেহ করিও না । তুমি নিশ্চয়ই আমার প্রিয়, এ বিষয়ে তোমাকে সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি ॥ ৬৫

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—আমাতোই মন রাখ অর্থাৎ ক্রিয়া কর, আমারই যজ্ঞ কর অর্থাৎ ক্রিয়া কর, নমস্করু অর্থাৎ ওঁকারের ক্রিয়া কর—যাহা গুরুবক্ত-গমঃ—সত্য ক'রে আমি তোমায় বলছি যে তুমি আমারই হবে—প্রতিজ্ঞা ক'রে বলছি—কারণ তুমি আমার প্রিয় ।—গীতায় ভগবান্ কত সাধনায় উপদেশই দিয়াছেন, এইবার তিনি নিজেই তাহার সার সঙ্কলন করিয়া দিতেছেন । (১) তুমি মম্বনা অর্থাৎ মচ্ছিত্ত

হও, (২) তুমি মন্ত্ৰ অর্থাৎ আত্মসমর্পণ কর, ভক্তির সহিত আমাকে ভজন কর । (৩) মদ্যাজী হও অর্থাৎ আমার পূজার্তনায় মন দাও । (৪) আমাকে নমস্কার কর ।

প্রথমেই ভগবানের 'মম্বনা' কথাটি লইয়াই আলোচনা করা যাক । "মম্বনা" হইয়াই জ্ঞান প্রাপ্তির উপায় । অন্ধে চিত্ত বিলম্ব না হওয়া পর্যন্ত কেহই "মম্বনা" হইতে পারে না । ভগবানে মনটা সমর্পণ করিতে হইবে, তবেই মন আর তোমার থাকিবে না, ভগবানের হইয়া যাইবে । চিত্ত সর্বদা স্পন্দিত হইতেছে বলিয়া আমরা বুঝিয়াও তবু তাঁহাকে চিত্ত অর্পণ করিতে পারি না । সুতরাং প্রথমেই চিত্তের যে নিরন্তর স্পন্দন হইতেছে তাহা ধামাইতে হইবে । মনের সঙ্কল্প-বিকল্পই সেই স্পন্দন—ইহা মনের স্বর্গ, সুতরাং মনকে সহজে সঙ্কল্পবিকল্পশূন্য করা যায় না । এইজন্য চিত্তকে একমুখী করিতে হইবে । অর্থাৎ কোন ধ্যেয় বিষয়ে মনকে রাখিয়া মনে অত্র কোন বৃত্তির উদয় হইতে না দেওয়া । কিন্তু ইহাতেও চিত্তের বহির্মুখ ভাব একেবারে যায় না । সেইজন্য মনকে কোন আধ্যাত্মিক স্থানে রাখিয়া একাগ্রতা অভ্যাস করিতে হয় । মহাত্মা বেদে সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক স্থান হইতেছে সহস্রার ও অজ্ঞাচক্রে, কিন্তু সহস্রাবে প্রথম অভ্যাসীর মন রাখা তত সহজও নহে, নিরাপত্তও নহে । সেইজন্য অজ্ঞাচক্রে মন রাখাই সর্বোত্তম । আধ্যাত্মিক স্থানগুলি বা চক্রে মনকে নিবিষ্ট করিতে হইলেও প্রথম প্রথম মনে স্পন্দন হইবেই, কিন্তু অজ্ঞাচক্রে বা কোন একটা স্থানে চিত্তকে রাখিতে রাখিতে মনের বেগ বা স্পন্দন একেবারে কমিয়া যাইবে । এইরূপ নিয়মিত অভ্যাসে চিত্তের স্থিরতা বৃদ্ধি পায়, তখন যে কোন ধ্যেয় বিষয়ে চিত্ত স্থির রাখা হইতে পারে । কোন একটা বাহ্য বিষয় লইয়াও চিত্ত স্থির করা যায় এবং সাধকের সে বাহ্য বিষয়টী আয়ত্তও হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে ক্লেশ ক্ষীণ হয় না, সুতরাং তাহাতে পারমার্থিক লাভ নাই । সেইজন্য শুদ্ধ ও সহ্যচারসম্পন্ন হইয়া এবং বিষয়ের হেয়ত্ব আলোচনা করিয়া ভগবদ্ভক্তি সহকারে প্রত্যগাত্মার ধ্যানে মনকে নিবেশ করিতে পারিলে মন সহজেই স্থির হয় । সাধনা বা ধ্যানাধির সময় সাবধান হওয়া আবশ্যিক যেন মন সে সময় অত্র দিকে চিন্তা না করে । বিষয়-ধ্যানে চিত্ত গাঢ় নিবিষ্ট হইতেও পারে, কিন্তু তাহাতেও আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ হয় না । আধ্যাত্মিক শক্তির তখনই বিকাশ হওয়া সম্ভব যখন চিত্তে স্পন্দন থাকিবে না এবং তাহা কোন আধ্যাত্মিক চিন্তা বা আধ্যাত্মিক স্থানে স্থির হইয়া থাকিবে । মনের এই প্রকার নিবোধ ভাবই তাহাকে কৈবল্য অভিযুগে উপনীত করে । তখন মনের মনন না থাকায় মনও লয় হইয়া যায়, মন লয় হওয়ায় বিষয়েরও অভাব হইয়া থাকে । বিষয়ের অভাব বশতঃ পুরুষের বুদ্ধি বোধাত্মক ভাবও থাকে না । মনের এইরূপ নিরুদ্ধাবস্থাই প্রকৃত "মম্বনা" অর্থাৎ আপনাতে আপনি । যাহারা "মম্বনা" হইতে পারেন নাই, তাহারা "মন্ত্ৰ" অর্থাৎ ভজনশীল হইবেন । যাহারা এইরূপ জটিল স্বরূপে অবস্থান বাহাতে হয় তৎকৃত্ত দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে প্রবৃত্ত করেন, তাহারা ইহা ভক্ত । তাহাদের সব চেষ্টা তখন প্রযুক্ত হয় "মম্বনা" হইবার জন্য, যেন মন অত্র কিছুতে বাধা না পড়ে । এইজন্য মনকে সর্বদা কৃষ্ণ চিন্তায় রাখা আবশ্যিক । যদি মন স্বভাববশে অন্তর ছুটিয়া যায় তবুও তাহাকে ধীরে ধীরে ধরিয়া আনিয়া কৃষ্ণ চিন্তায় নিযুক্ত করিতে হইবে । এইভাবে সাধনা চালাইলে দিব্য জ্যোতিঃ ও নাম প্রকটিত হইবে,

(পরম গুহ্য ভগবদ্বাণী)
“আত্মনিবেদন”

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকঃ শরণং ব্রজ ।

অহং ভ্রাতৃ-সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৬৬

তখন মনকে শাস্ত করা আর তেমন কঠিন হইবে না। এমন কি ঐক্লপ জ্যোতিঃ দেখিতে দেখিতে বা দিব্য স্নমধুর নাদ শুনিতে শুনিতে মন একেবারে তন্ময় হইয়া যাইবে। “দ্য পরাহুবক্ত্রীখরে” এই ভক্তি লক্ষণ তখন ফুটিয়া উঠিবে। ইহারই ভক্ত “মদ্যাজী” অর্থাৎ ক্রিয়া করিতে হইবে। এই “মদ্যাজী”র সহিত “মাং নমস্কর” উক্তারের ক্রিয়া কর (উহা এক প্রকার সাধনার অঙ্গ)। ক্রিয়ার সহিত যাহারা “উক্তার ক্রিয়া” নিয়মিত ভাবে করেন তাঁহাদের প্রাণ-শক্তি (খাস) মাধায় চড়িয়া বসে। তাহা হইলেই আত্মা কি এবং তাঁহাকে পাওয়াই বা কিরূপ এ সমস্ত কথা তখন বুঝিতে পারা যায়। সমস্ত দেবতার ও ঋষিরা এই পূজাই করিতেছেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবও আপনাকে আপনি পূজা করেন। এই আত্মপূজার অধিকার লাভ হইলে তুমি কৃতার্থ হইবে। সেই পূজার অধিকার লাভের জন্য তোমার মনঃপ্রাণকে ক্রিয়াতে নিযুক্ত কর। ক্রিয়া দ্বারা ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্তি হইলেই তুমি আপনাকে আপনি ছুলিয়া যাইবে, তুমি তখন তুমি থাকিবে না, তোমার “আমি” আমাতে মিশিয়া এক হইয়া যাইবে, তুমি স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহাই ক্রিয়ার ফল। সে কথা শ্রীকৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছেন, সুতরাং তাহার আর অস্তথা হইবে না।

“সর্বান্ধানা সর্বধিমা সর্বসংস্করণং হস।

ন এব শরণং দেবে গতিরন্তীহ নাত্থা ॥” যোগবশিষ্ঠ

সমস্ত মনটি দিয়া, সমস্ত বুদ্ধি দিয়া, সমস্ত কার্য চেষ্টা দ্বারা তাঁহার শরণ গ্রহণ করিতে হইবে, সেই পুরন্দেব ব্যতীত জীবের আর কোন উপায় নাই ॥ ৬৫

অর্থঃ। সর্বধর্মান্ (সকল প্রকার অস্থানমূলক ধর্ম) পরিত্যজ্য (পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ নিয়মের খুঁটি নাটীর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য ছাড়িয়া দিয়া) একং মাং (একমাত্র আমাকে, অর্থাৎ সকলের অস্বাক্ষরে যে আমি সেই আমাকে) শরণং ব্রজ (আশ্রয় কর), অহং (আমি) ভ্রাতৃ (তোমাকে) সর্বপাপেভ্যঃ (সমুদ্র পাপ হইতে) মোক্ষয়িষ্যামি (বিমুক্ত করিব), মা শুচঃ (শোক করিও না) ॥ ৬৬

শ্রীধর। ততোহপি গুহ্যতমমাহ—সর্কেতি। মন্তৃত্যু এবং সর্কং ভবিষ্যতি ইতি দৃঢ়-বিশ্বাসেন বিধিকৈরুৎসাহ্য ত্যক্তা মদেকশরণো ভব। এবং বর্তমানঃ কর্তৃত্যাগনিমিত্তং পাপং ভ্রাতৃ ইতি মা শুচঃ—শোকঃ মা কার্যঃ। যতঃ ভ্রাতৃ মদেকশরণং সর্বপাপেভ্যঃ অহং মোক্ষয়িষ্যামি ॥ ৬৬

বঙ্গানুবাদ। [আরও গুহ্যতম তত্ত্ব বলিতেছেন]—আমাকে ভক্তি করিলেই সমস্ত হয়—এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাসের দ্বারা বিধিনিয়মের দাসত্ব পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও। এরূপ হইলে (অর্থাৎ আমাকে ধরিয়া থাকিলে) কর্তৃত্যাগনিমিত্ত পাপ

হইবে তাবিয়া শোক করিও না যেহেতু মদেকশরণ তোমাকে সর্ব পাপ হইতে আমি মুক্ত করিব ॥ ৬৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—কোন দিকে তাকিও না আসক্তি পূর্বক, কেবল আত্মাতে মন রেখে গুরুবাক্যের দ্বারায় ক্রিয়া পেয়ে ক’রে চল—স্মরণ ক’রে চল—ও—এই ক্রিয়া করিতে করিতে আমি অচ্য দিকে আসক্তি পূর্বক দৃষ্টি করিয়া হইতে মুক্ত করিয়া দিব অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় অচ্য দিকে দৃষ্টিই যায় না, ইহার নিমিত্ত তুমি কিছু ভেবো না।—যোগীর কোন দিকে তাকাইলে চলিবে না এমন কি বেদ বা বিদিশান্ত্রও যোগাত্ম্যাসের অঙ্গুল নহে। কেবল গুরুবাক্যের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার প্রদত্ত উপদেশ মত ক্রিয়া করিয়া চলিবে। কেন করিতেছি, কত দিন করিতে হইবে, করিয়া কি হইবে—এ প্রশ্ন মনে আসিতে দিও না। গুরু বলিতেছেন তাই করিতেছি, ইহাতে কি হইবে তাহা তিনিই জানেন। এইরূপ দৃঢ়চিত্ত হইয়া গুরুতে আত্মসমর্পণ করিয়া ক্রিয়া করিয়া যাঁতে হইবে।

“সর্বধর্ম ত্যাগ করিয়া আমার শরণ গ্রহণ কর”—ইহাই গীতার্থের সার কথা। ভগবান্ এই কথা বলিয়া গীতোক্ত উপদেশের উপসংহার করিতেছেন। সুতরাং এ শ্লোকটি একটু বিশেষ ভাবে আলোচ্য। ধর্ম ত্যাগ না করিয়া ধর্মের অগ্রাঙ্ক উপদেশ পালনে কি তাঁহার শরণ গ্রহণ হয় না? জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ প্রভৃতি অনেক কথাই গীতায় বলিয়াছেন, এখন শরণাগতির সহিত পূর্বোক্ত জ্ঞান, ভক্তি, কর্মাদির কোন যোগ আছে কি না। শ্রদ্ধা, স্মৃতি প্রভৃতি ধর্ম-শাস্ত্র আমাদের অনেক কর্মই করিতে বলেন এবং অনেক কর্ম করিতে নিষেধও করেন। এতদিন কি করিব এবং কি করিতে হইবে না—লইয়া অনেক পুঁথি পত্র ঘাঁটা হইল, শাস্ত্রাণ্যের মধ্যে ঘুরিয়া পথভ্রম হইয়া গিয়াছে, কত লোকের কাছে গিয়া কত কথাই শুনিলাম, কত জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহাদের উপদেশ মত কিছু কিছু কার্যও করিলাম; কিন্তু মনের বাঁধা, মনের সন্দেহ মিটিল না। তাই ভগবান্ পুঁথিপত্রের ধর্ম ত্যাগ করিয়া তাঁহার শরণ গ্রহণের কথা বলিলেন—“সর্ব ধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ”—ওগো, তোমরা ধর্মাদি সব ছাড়িয়া একবার আমাকে জড়াইয়া ধর, উদ্দেশ্য ইহা নহে যে ধর্মোপদেশ পালন করিতে হইবে না। কিন্তু ভগবান্কে ভাল না বাসিলে ধর্ম-কর্ম সবই বুঝা, তাই আমা দের অহুষ্টিত কর্ম যাহাতে ব্যর্থ না হয় এইজন্য ভগবৎ শরণাগতির কথা বলিলেন। কারণ ভগবান্কে বাদ দিয়া যে কর্ম করা যাক তাহাতে আত্মবিনাশ হয়, কিন্তু সংসার পাশ মোচন হয় না। অতএব কর্ম কি ভাবে করিতে হইবে, শ্রীমদ্ভাগবতে ব্যাসকে নারদ বলিতেছেন—“যদ্রু ক্রিয়তে কর্ম ভগবৎ পরিতোষণম্। জ্ঞানং যন্তদধীনং বি ভক্তিযোগসমবিশিতম্ ॥” অর্থাৎ লোকে যদি অমুশ্রব করে যে তাহার সর্ব কর্ম ব্রহ্মের শক্তি দ্বারাই হইতেছে, এবং তাহার প্রার্থিত ভোগ্য বস্তুও ব্রহ্মময় এবং তিনিই কর্মফল দাতা তবেই কর্ম সমর্পণ করা সম্ভব হয়, নচেৎ হইতে পারে না। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে জ্ঞানোদয় হয় এইরূপ অচ্যুতি সেই জ্ঞানেরই প্রকাশ মাত্র ভগবৎসাধনার দ্বারা ঐ জ্ঞান অমুভূতির বিষয় না হইলে উহা মৌলিক জ্ঞানে পর্য্যবসিত হয়। অতএব ধর্ম-কর্মের অস্থান আমার সুখাদি ভোগের জন্য নহে, এতদ্বারা যেন ভগবান্ প্রসন্ন

হন, ইহাই আসল শরণাগতি। ভগবান্ সৰ্ব্ব ধৰ্ম্ম ত্যাগ করিতে বলিলেন বটে, কিন্তু এই ধৰ্ম্মত্যাগকে কেহ যেন কৰ্ম্মসম্মান মনে না করেন। ভগবানের এই উদ্দেশ্য হইলে তিনি তাঁহার শরণ গ্রহণরূপ কৰ্ম্মের ব্যবস্থা করিলেন কেন? সৰ্ব্ব শাস্ত্রের সৰ্ব্ব সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ—ইহাই সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ কৰ্ম্ম। প্রত্যেক ধৰ্ম্মের অমুষ্ঠানেই এক একটা ফল আছে, যদি সেই সব ফলের প্রতি চিন্তা আকৃষ্ট হয় তাহা হইলে জ্ঞান বা মোক্ষ লাভ হইবে না, সুতরাং পরমতত্ত্ব অবিস্মৃতিই থাকিবে। তাই আচার্য্য শঙ্কর বলিলেন—“ধৰ্ম্ম শব্দেনাহি অধর্ম্মোহপি গৃহ্যতে, সৰ্ব্বধৰ্ম্মান্ সৰ্ব্বকৰ্ম্মানি ইত্যেতৎ”—অর্থাৎ ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম যতদিন থাকিবে ততদিন দেহ স্বধ্বংস নষ্ট হইবে না, পুনঃপুনঃ জন্ম যাওয়ায় ঘুচিবে না—এই জন্ম সাধককে ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মের অতীত অবস্থা লাভ করিতে হইবে। কঠোপনিষদ্ বলিতেছেন,

“ইহ চেদশকোদোহঃ প্রাক্শরীর্যস্ত বিম্ভসঃ।

ততঃ সর্গেণ লোকেষু শরীরস্য কল্পতে ॥”

এই দেহে যদি সে ব্রহ্মকে বুঝিতে সমর্থ হয় তবে সে দেহপাতের পূর্বেই সংসার বন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়। যদি অবগত হইতে সমর্থ না হয় তবে তাহাকে আবার এই পৃথিবীতে শরীর গ্রহণ করিতে হয়।

অবশ্য “ধৰ্ম্ম” বলিতে—গার্হস্থ্য ধৰ্ম্ম, যতিধৰ্ম্ম, রাজধৰ্ম্ম, দেহধৰ্ম্ম, ইন্দ্রিয়ধৰ্ম্ম—ইত্যাদি অনেক প্রকার ধৰ্ম্মকেই ধৰ্ম্ম বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। স্মৃতিও বলিতেছেন—“ধৰ্ম্মকর” ধৰ্ম্মাচরণ করিও; এখন ধৰ্ম্ম বলিতে কোন্ ধৰ্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে তাহা বুঝিয়া উঠা শক্ত। কিন্তু মহন্ত জীবনের সৰ্ব্ব প্রধান লক্ষ্য “আত্মদর্শন”, অথচ পূর্বোক্ত ধৰ্ম্মের কোনটাই আত্ম-ধৰ্ম্মনের মুখ্য উপায় নহে। তাই এগুলিকে যথাকালে গ্রহণ ও যথাসময়ে ত্যাগ করিয়া প্রকৃত আত্মবোধে সচেত হইতে হইবে। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি—ইহাদের সকলেরই নিজ নিজ ধৰ্ম্ম আছে, এবং তাহাদিগকে জোর করিয়া ছাড়াইবার উপায় নাই, অথচ সৰ্ব্ব ধৰ্ম্ম পরিত্যক্ত না হইলেও আত্মদর্শন হইবার উপায় নাই। তাই ভগবান্ বলিতেছেন এক্ষণে তুমি, আর ইহাতে পাপ হইবে, উহাতে পুণ্য হইবে—এই ভাবিয়া বিবিধ কৰ্ম্মের মধ্যে ঋণপাইয়া পড়িও না। এই সৰ্ব্বধৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হইলে তোমাকে কামসঙ্কল্প-বর্জিত হইতে হইবে। যেথা যাইতেছে আমাদের মধ্যে যাহারা বেশ ভাল লোক বা ধার্মিক লোকও হ’ল তাহারাও অনেক সময়ে ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মের বহুবিধ শাখার ও ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রীয় মতের বিচার করিতে গিয়া বিভ্রান্ত হইয়া পড়েন। তখন মনে হয় কিছুই বুঝি করা হইল না। সবই আধ্বাণচা রহিয়া গেল। তখন তাঁহাদের প্রতি সাধুদের এই উপদেশ যে প্রারব্ধ বশে যে কৰ্ম্মই কৃত হউক না কেন, তাহার ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল তাঁহার অরণে মন লাগাইয়া রাখ। আর ভাল-মন্দ কৰ্ম্মের ভাল-মন্দ সব ফলই জগৎগুরু পরমাত্মার চরণে অর্পণ করিয়া তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া সৰ্ব্বতোভাবে আমার শরণ গ্রহণ কর, অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কেবল ক্রিয়া করিয়া চল। আর যাহা হইবার হউক সেদিকে তোমার লক্ষ্য করিবার কোন প্রয়োজন নাই। যদি বল ক্রিয়া করিতে বলিলেও মন যে বারবার বিষয়ের দিকে ছুটিয়া যায় তাহাতে যে স্বপ্নের বিঘ্ন হয়, তাহাতে যে মন আসক্তিপূর্ব্বক কত কি ভাবনা করে, না জানি তাহাতে কত

পাপই হয়, এই পাপের বোঝা হইতে কিসে রক্ষা হইবে? তাই গুরুর উপদেশ এই যে—তুমি একটু মন দিয়া শ্রবণ করিতে চেষ্টা কর, এই শ্রবণ বা ক্রিয়ার ফলে তোমার মন আর অন্য দিকে যাইবে না। ক্রিয়া করিলে ক্রিয়ার পর অবস্থা যে আসিবেই; তিনিই যে ভগবান্, তাঁহার শরণ মাত্র প্রকাশেও যে তুমি পাপমুক্ত হইবে।

আমাদের মধ্যে পাপ-পুণ্য কৰ্ম্ম করে কে জান? দেহেন্দ্রিয়াদি-মন-বুদ্ধি সন্মিত প্রকৃতিই সমস্ত কৰ্ম্ম করিয়া থাকে, আত্মা ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মের অতীত। তুমি ক্রিয়া দ্বারা ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মের গ্রহিণীয়া ফেল, তাহা হইলেই তুমি প্রকৃতির অতীত হইয়া আত্মাতেই প্রতিষ্ঠিত হইবে। প্রাণ দিয়া এবং প্রাণপণে ক্রিয়া করিতে পারিলেই তাঁহার শরণ লওয়া হইবে। এইরূপ শরণ গ্রহণ যে করে সেই তো তাঁহার ভক্ত। ভক্ত বিপন্ন হইলে বা সাধক নিরাশ হইলে ভগবান্ই তাহাকে অভয় দান করেন। যে এককাল ধরিয়া তাঁহার ভজন করিয়া আসিল, যে তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া আছে তাহার আবার ভাবনা কি? যাহা কিছু ক্রটি, যাহা কিছু পাপ হইয়া থাকুক, তবুও তিনি শরণাগত সাধককে মুক্তিদান করেন। তিনি যে বলিয়াছেন—

“সকৃদপি প্রসন্নায় তবাস্মীতি চ বাচতে।

অভয়ং সৰ্ব্বকৃত্যো ব্রহ্মান্যেতৎ ব্রতং মম ॥”

“তোমার আমি” বলিয়া একবারও যে আমার শরণাগত হইয়া আমার কৃপাপ্রার্থী হয়, আমি তাহা : অভয় প্রদান করি—এই আমার ব্রত।

তাই নিজ ভক্তকে ভগবান্ বলিতেছেন—তুমি দেহ, ইন্দ্রিয়, মন প্রকৃতির বশে না চলিয়া আমার শরণ গ্রহণ কর। আত্মার শরণাপন্ন হওয়াই সৰ্ব্বকৰ্ম্মের শ্রেষ্ঠ কৰ্ম্ম এবং সৰ্ব্বকৰ্ম্মের সেরা ধৰ্ম্ম। যে তাঁহাকে চায়, সে বিষয়কে চাহে না। প্রাণের সহিত বিষয়কে না চাহিলেই মন বিষয়ের পানে অযথা ছুটিয়া যাইবে না। অনেক মনে করেন ভগবান্ই জীবকে যন্ত্রাঙ্কত পুতলিকার মত মায়ার দ্বারা নাচাইতেছেন—কীবেব স্বতন্ত্রতা কোথায়? ভগবান্ কৃপা করিলে তবে তো মুক্তি হইবে? মুক্তি ভগবদ্ কৃপার উপর নির্ভর করে বটে, কিন্তু একজন্ম জীবকেও প্রমত্ত করিতে হয়। বিনা প্রয়াসে, বিনা তপস্কায় কেহই তাঁহাকে লাভ করিতে পারে না। যে তাঁহাকে পাইতে চাহে তাহাকেই কিছু মূল্য দিতে হইবে, যদিও সে মূল্য ভগবদ্ প্রাপ্তির তুলনায় কিছুই নহে—তথাপি ঐ মূল্য দিতেই হয়; ঐ সাধনার ক্রেশই সেই সামান্য মূল্য। সাধনপথের হর্গমতা ও ক্রেশ ধৈর্য্যিা অনেকে বিচলিত হইয়া যান। তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ভক্ত কবি বলিয়াছেন—

“ক্ষণ আধ হঃখ জনম ভরি সুখ

কাহে তু বিনোদিনী মোচয়সি মুখ”।

কেন তুমি তপস্কার ভয়ে সাধনে বিমূঢ় হইয়া রহিয়াছ? তাঁহাকে নিশ্চয় পাইবে। তাঁহার প্রাপ্তির তুলনার সাধনার ক্রেশ অতি সামান্য, অতএব বিমূঢ়ের ভায় মুখ ফিরাইয়া, আলস্তে সম্যক্বেপ করিও না। একবার কোমর বাধিয়া লাগিয়া যাও—ভাবপব অনন্ত সুখ, আত্মসমুদ্রে নিবস্তুর সন্তরণ! অতএব “নান্দ্র্যানং অবসাদয়েৎ”—মনকে অবসন্ন হইতে দিও না। বেগে সাধন করিয়া চল, সাধনের বেগ যত বৃদ্ধি হইবে, যত বৈরাগ্যে প্রাণ করিয়া যাউতে

থাকিবে, ততই তোমার আত্মসাক্ষাৎকার আসন্ন হইবে। কিন্তু তোমার শ্রম না দেখিলে আত্মদেব সন্তুষ্ট হইবেন না। আত্মদেবের সন্তোষের জন্যই গুরুপ্রদত্ত সাধনা প্রচণ্ডবেগে করিয়া চল, কিছুতেই অবহেলা করিও না। অবহেলা করিলেই ঠকিবে। বেদে একটি মন্ত্র রহিয়াছে—“ন ঋতে শ্রান্তস্ত সখ্যায় দেবাঃ”—সাধনার পরিশ্রমে যতদিন আপনাকে পরিশ্রান্ত করা না যায়, ততদিন দেবতারা অহুকূল হন না। হে সাধক! পরিশ্রমে ক্লেশ বোধ করিও না। তোমার পরিশ্রম দেখিয়া আত্মদেব অহুকূল হইবেন, তিনি তোমাকে সৰ্ব্বপাপ হইতে মুক্ত করিয়া দিবেন।

জগদ্বাদি বস্তুকে আশ্রয় করিয়া যে ধৰ্ম্ম রহিয়াছে তাহাই সৰ্ব্বধৰ্ম্ম বা পঞ্চভূতাত্মক প্রকৃতির ধৰ্ম্ম। এই প্রাকৃত ধৰ্ম্মের অনুসরণ করিলে স্থখ, দুঃখ, জন্ম, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি বিবিধ তাপে জীবকে তাপিত থাকিতে হয়। সেইজন্য প্রকৃতি ও প্রকৃতির সৰ্ব্বধৰ্ম্মের উপরে উঠিতে হইবে। পঞ্চভূতাত্মক প্রকৃতিই স্থিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ঘোম বা মূল্যধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধাক্ষা—এই পঞ্চচক্রস্থিত পঞ্চ ভূতময় ভাবকে পরিত্যাগ করিয়া আজ্ঞাচক্রে প্রবেশ করিতে হইবে। ইহাধের কোন একটী স্থানে বাধা পড়িয়া গেলে সাধকের বিভূতি বা ঐশ্বর্য লাভ হইবে বটে, কিন্তু বন্ধনমুক্তি হইবে না। তাই সাধককে আজ্ঞাচক্রে ও তাহার উপরে উঠিতে হইবে। ইহাই সব ছাড়িয়া তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করা—ইহাই “মামেকং শরণং ব্রজ”। অর্থাৎ এক অধিতীয় যে শক্তি সহস্রারে অবস্থিত, তাহার আশ্রয় লইতে হইবে। উহাই তাঁহার পরম স্বাম ও পরম পদ। ওখানে যে সাধক পৌঁছিতে পারেন তাঁহাকে আর সংসারে প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয় না।

ভাগবতে শ্রীশুকদেব তাই বলিতেছেন—

“সমাপ্রিতা যে পদপল্লববৎ মহৎপদং পূণ্যযশো মুরারেঃ।

ভবানুধিবৎসপদং পরংপদং পদংপদং যদ্বিশদাং ন তেবাম্ ॥”

পূণ্যযশঃ মুরারির পদপল্লব-নৌকা যে আশ্রয় করিয়াছে, ভবসমুদ্রে তাহার নিকট গোম্প-দেব ত্রায় বোধ হয়, সেই পরমপদে যাহারা স্থানলাভ করিয়াছে তাহাদের আর পদস্থলন হয় না, অর্থাৎ তাহাদিগকে আর সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না।

মুখ শব্দের অর্থ বেটন, সংসার বা জন্মজরা-মৃত্যু প্রভৃতি দুঃখ যাহা জীবকে সন্তত বেটন করিয়া আছে তাহা যিনি নাশ করেন তিনিই মুরারি।

“মুঃ ক্লেশে চ সন্তাপে কৰ্ম্মভোগে চ কৰ্ম্মিণাম্।

দৈত্যভেদেহপ্যরিশেষাং মুরারিস্তেন কীৰ্ত্তিতঃ ॥”

যে পদ প্রাপ্ত হইলে আর জীবকে সংসারে বাতায়াত রূপ ক্লেশ সন্তাপ সহ করিতে হয় না, উহাই জীবদেহে ব্রহ্মরূপস্থিত সহশ্রদল কমল। ঐ স্থানে স্থিত সাধকেরই পরমগতি লাভ হয়।

“ব্রহ্মরূপে মনো দত্তা কণাঙ্কঃ যদি তিষ্ঠতি।

সৰ্ব্বপাপবিনির্মুক্তঃ স যাতি পরমাং গতিম্ ॥”

ব্রহ্মরূপে মন-স্থাপিত করিয়া যদি কেহ কণাঙ্ককালও অবস্থিত করিতে পারে, তাহা হইলে সে সৰ্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরমগতি লাভ করে।

(গীতাশাস্ত্র স্তনিবার যোগ্য নয় কাহারা ?)

ইদন্তে নাতপক্ষায় নাভক্তায় কদাচন।

না চাপ্তশ্রবণে বাচ্যং ন চ মাং যোহভ্যসূয়তি ॥ ৬৭

“অগ্নিন্ লীনং মনো বস্ত স যোগী মগ্নি লীয়তে।

অগ্নিমাহি গুণান্ ভুক্ত্বা শ্বেচ্ছয়া পুরুষোক্তঃ ॥”

যাঁহার চিত্ত ব্রহ্মরূপে লীন হয়, তিনিই পুরুষোত্তম। তিনি শ্বেচ্ছাহুসারে অগ্নিমাহি ঐশ্বর্য সকল ভোগ করিয়া শেষে আমাতেই বিলীন হইয়া যান।

অতএব যিনি আত্মচিন্তায় নিযুক্ত হইয়া সৰ্ব্বপ্রকারে আমারই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন তিনি জীবমুক্ত, তাঁহার আর অত্মদিকে দৃষ্টিই যায় না, স্তব্ধতা তাঁহার পক্ষে আর কিছু শোক করিবার থাকিল না ॥ ৬৬

অনুন্ন। ইহং (ইহা) তে (তোমার) অতপন্থায় (তপস্তাহীন ব্যক্তির নিকট) ন বাচ্যং (বলা উচিত নহে), ন অভক্তায় (ভক্তিহীনকে নহে), ন চ অন্তশ্রবণে (শ্রবণে অনিচ্ছুক ব্যক্তি বা গুরুবিষয়ে ব্যক্তিকেও নহে), ন চ মাং যঃ অভ্যসূয়তি (যে আমাকে অস্বীকার করে তাহাকেও বলা উচিত নহে) ॥ ৬৭

শ্রীধর। এবং গীতার্থতত্ত্ব উপদিষ্ট তৎসম্প্রদায় প্রবর্তনে নিয়ম—ইহমিতি। ইহং—গীতার্থতত্ত্ব, তে—তুমি, অতপন্থায়—স্বার্থানুষ্ঠানহীনায় ন বাচ্যম্। ন চ অভক্তায়—গুরোঁ দ্বিধবে চ ভক্তিশূন্যায় কদাচিৎপি বাচ্যম্। ন চ অন্তশ্রবণে—পরিচর্য্যাম্ অকুর্তে, শ্রোতৃম্ অনিচ্ছতে বা বাচ্যম্। মাং—পরমেশ্বরং, যঃ অভ্যসূয়তি—মহত্ত্বদৃষ্ট্যা ঘোষারোপেণ নিন্দতি, তর্থে চ ন বাচ্যম্ ॥ ৬৭

বঙ্গানুবাদ। [এইরূপে গীতার্থতত্ত্ব উপদেশ করিয়া তৎসম্প্রদায় প্রবর্তনে (অর্থাৎ কীদৃশ ব্যক্তিকে গীতার্থতত্ত্ব বলিবে) নিয়ম বলিতেছেন]—এই গীতার্থতত্ত্ব (যেন) স্বার্থানুষ্ঠানহীন ব্যক্তিকে বলা না হয়, এবং গুরুতে ও দ্বিধবে ভক্তিশূন্য ব্যক্তিকেও কদাচিৎ বলা না হয়। যে পরিচর্যা না করে বা শুনিতে ইচ্ছা না করে তাহাকেও বলিবে না। আমি পরমেশ্বর, আমাকে যে মহত্ত্ব দৃষ্টিতে ঘোষারোপ পূর্বক নিন্দা করে তাহাকেও বলিবে না ॥ ৬৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—যে কেহ আমাকে হিংসা নিন্দা করে তাহাকে ক্রিয়ার কথা বলিবে না।—অজ্ঞানের মোহ নাশের জন্য গীতায় আধ্যাত্মিক রহস্তপূর্ণ যে যোগার্থ তত্ত্ব শ্রবণব্যাপ্য করিলেন এইবার সেই সব সাধনা কাহারা পাইবে এবং কাহারা পাইবে না তাহার উপদেশ করিতেছেন। গীতা যোগশাস্ত্র ইহাতে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত যোগবিষয়ক সকল নিগূঢ় কথা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ভগবান্ উপদেশ করিলেন বলিয়াই যে এই নিগূঢ় আধ্যাত্মিক কথা সকলেই জানিবার সমান অধিকারী তাহা নহে। যাহাদের জানিবার অধিকার আছে তাহাদিগকেই বলিতে হইবে। অধিকারী যে কাহারা তাহাই এই লোকে ভগবান্ বলিতেছেন। স্বার্থে যাহাদের আস্থা নাই, যাহারা অসংঘর্ষী স্তব্ধাঃ তপঃ-সাধনে অযোগ্য, গীতার সাধনা তাহাদের জন্য নহে। অস্বার্থাচারী ভক্তিহীন, গুরু ও দ্বিধবে

(ভগবন্তের নিকট গীতাব্যাত্যার কল)

য ইদং পরম গুহ্যং মন্ত্ৰেণ্ডভিধাস্যতি ।

ভক্তিং ময়ি পরাং কৃপা মামেবৈষ্যতাসংশয়ঃ ॥ ৬৮

অতীত, শাস্ত্রে বাহ্যের অবিশ্বাস—তাহাদিগকে সাধনার কথা বলিবে না । বাহ্যের আত্মার অন্তরে বিশ্বাস দৃঢ় নহে, বাহ্যের সর্বদেবময় বাহ্যেবকে না জানিয়া বিশেষ বিশেষ দেবতাকে হিংসা ও নিন্দা করে, তাহার গীতোক্ত সাধনা পাইবার অযোগ্য । সুতরাং তাহাদিগকেও গীতার উপদেশ বলিতে নাই । আর একটি বড় কথা গুরুত্বপূর্ণ । গুরুত্বপূর্ণ ব্যতীত গীতার মর্মার্থ উপলব্ধি করিবার উপায় নাই এবং তপঃসাধনে প্রমাদবৃত্ত এবং দৈবের প্রতি বাহ্যের ভক্তিশূন্য তাহার গীতোক্ত উপদেশ গ্রহণে অনধিকারী । অধিকারীকে ব্রহ্মবিদ্যা বলা শাস্ত্রনিবদ্ধ, কারণ তাহার নিকট বিদ্যা আত্মগোপন করেন, কখনও প্রকাশিত হন না । যথা :—

“বস্ত্র মেবে পরা ভক্তির্থা মেবে তথা গুরো ।

ভক্তিতে কথিতা হর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥” শ্বেতাশ্বতর উঃ ।

বাহ্যের নিজ ইষ্টদেবতার প্রতি পরম ভক্ত আছে এবং গুরুভেদে গুরুপ ভক্তি থাকে সে মহাত্মার নিকটেই পূর্বকথিত উপনিষৎ শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ পায় ।

“বিদ্যা হ বৈ ব্রাহ্মণমাঙ্গগাম গোপার মা শেববিষ্টেহমস্মি ।

অনুরক্তান্নান্দবেহমভ্যাস মা মা ক্রুরাধীর্ধ্যবতী তথা শ্রাম্য ॥” মুক্তিকোনিষদ ।

ব্রহ্মবিদ্যা ব্রাহ্মণগণের নিকট গিয়া বলিয়াছিলেন, “তোমরা আমাকে গোপনে রাখিও তাহা হইলে তোমরা ইষ্ট অর্থাৎ ভোগ ও মুক্তি উভয়ই লাভ করিবে । কিন্তু [যদি সকলের নিকট গোপন নাও রাখিতে পার] অনুরক্ত, সবলতাত্প্র ও অসংযমী বা অতপস্বীদিগকে কদাপি বলিবে না, বলিলে বিদ্যার শক্তি থাকিবে না ॥” ৬৭

অতঃ পরঃ (যিনি) ইদং পরম গুহ্যং (এই পরম গুহ্য বিষয়) মন্ত্ৰেণ্ড (আমার ভক্তগণের নিকট) অভিধাস্যতি (ব্যাখ্যা করিবেন) [সঃ—তিনি] ময়ি পরম ভক্তিং কৃপা (আমাতে পরা ভক্তি করিয়া) মাম্ এষ এত্ৰ (আমাকেই প্রাপ্ত হইবেন), অসংশয়ঃ (ইহাতে সন্দেহ নাই) ॥ ৬৮

শ্রীমদ্ভগবতঃ প্রোক্তঃ বহিঃপ্রোক্তঃ গীতান্দ্রোপদেষ্টঃ কলমাহ—য ইমমিতি । মন্ত্ৰেণ্ড অভিধাস্যতি—মন্ত্ৰেণ্ডো বা বাক্যতি, স ময়ি পরাং ভক্তিং করোতি, ততো নিঃসংশয়ঃ সধ মামেব প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৬৮

বঙ্গানুবাদ । [এই সকল ঘোষবহিত ভক্তগণের নিকট গীতাশাস্ত্রের উপদেষ্টার যে কি কল তাহা বলিতেছেন]—যে ব্যক্তি আমার ভক্তগণকে এই গীতার উপদেশ দিবে সে ব্যক্তি আমাতে পরাভক্তি করে, পরে নিঃসংশয় হইয়া (তাহার সকল সংশয় ছিন্ন হওয়ার) আমাকেই প্রাপ্ত হয় ॥ ৬৮

ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃতমঃ ।

ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্তঃ প্রিয়তরো ভূবি ॥ ৬৯

(গীতা পাঠের কল জ্ঞানযজ্ঞের তুল্য)

অধ্যাত্মতে চ ইমং ধর্ম্যং সম্বাদমাবয়োঃ ।

জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥ ৭০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—যে এই ক্রিয়া পাবে—সে আমারই হবে ।—অধ্যাত্মশাস্ত্র গীতার উদ্দেশ্য লোককে আত্মবিন করা । আত্মবিন সে-ই হইবে যে ক্রিয়া করিবে । এই ক্রিয়া জন্ম-মরণ হইতে উদ্ধার করিয়া লোককে মুক্তি পদবী দান করেন । সমস্ত ক্রিয়ারহস্ত গীতায় আছে, তাই যে কেহ এই গীতা পড়িয়া লোককে জ্ঞানায় ও ইহার রহস্ত বুঝিয়া দেয় সে-ও নিশ্চয় একদিন আত্মবিন হইয়া যাইবে—ইহাতে সন্দেহ করিও না । আত্মক্রিয়াশীল পুরুষ আত্মাকেই লাভ করিবেন ॥ ৬৮

অতঃ পরঃ (যিনি) তস্মাৎ (তাহা) কশ্চিন্ (কেহ) মে (আমার) প্রিয়কৃতমঃ চ ন (অধিক প্রিয়কারী আর নাই) । তস্মাৎ অন্তঃ (তাহা হইতে অন্ত কেহ) মে প্রিয়তরঃ চ (আর আমার অধিক প্রিয়) ভূবি ন ভবিতা (পৃথিবীতে হইবে না) ॥ ৬৯

শ্রীমদ্ভগবতঃ প্রোক্তঃ বহিঃপ্রোক্তঃ গীতান্দ্রোপদেষ্টঃ কলমাহ—য ইমমিতি । মন্ত্ৰেণ্ড অভিধাস্যতি—মন্ত্ৰেণ্ডো বা বাক্যতি, স ময়ি পরাং ভক্তিং করোতি, ততো নিঃসংশয়ঃ সধ মামেব প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৬৮

বঙ্গানুবাদ । [আরও বলিতেছেন]—সেইজন্য গীতাশাস্ত্র ব্যাখ্যাকর্তার জ্ঞান অস্ত্র কেহই মন্ত্র মণ্ডো আমার অত্যন্ত পরিতোষকর্তা নাই, কালাস্ত্রেও হইবে না । পৃথিবীতে তাহা হইতে অস্ত্র প্রিয়তর অধুনা নাই, কালাস্ত্রেও হইবে না ॥ ৬৯

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এ ক্রিয়া করে তাকে আমি বড় ভালবাসব । “তান্ন মত পৃথিবীতে আর ভাল লোক নাই ।—মন্ত্র শরীর ধারণ করিয়া যে ক্রিয়া পায় এবং ভক্তি সহকারে ক্রিয়া করিয়া যায় তাহাপেক্ষা আর আত্মার প্রিয়তর কেহ নাই । কারণ ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পরাবস্থা প্রাপ্ত যোগী আত্মার যত নিকটে-এত নিকটে আর কেহ হইতে পারে না । বাহ্যবিষয়ে চিত্ত যত উৎক্লিষ্ট হয় ততই সে আত্মা হইতে দূরে সরিয়া যায়, যে ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থার দিকে যত আগ্রহ হইতে পারে, ততই সে আত্মার সান্নিধ্য লাভ করে । যে ক্রিয়ার পর অবস্থার সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়, সে আত্মার সহিত এক হইয়া যায়, সুতরাং তরপেক্ষা প্রিয়তর আত্মার আর কাহারও হইবার সম্ভাবনা নাই ॥ ৬৯

অতঃ পরঃ (যিনি) তস্মাৎ (তাহা) কশ্চিন্ (কেহ) মে (আমার) প্রিয়কৃতমঃ চ ন (অধিক প্রিয়কারী আর নাই) । তস্মাৎ অন্তঃ (তাহা হইতে অন্ত কেহ) মে প্রিয়তরঃ চ (আর আমার অধিক প্রিয়) ভূবি ন ভবিতা (পৃথিবীতে হইবে না) ॥ ৬৯

(গীতা শ্রবণের ফল)

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ ।

সোহপি মুক্তঃ শুভান্নলোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্মণাম্ ॥ ৭১

শ্রীধর । পঠন্তঃ ফলমাহ—অধ্যোক্ত ইতি । আবেদ্যোঃ—শ্রীকৃষ্ণার্জুনয়োঃ, ইমং ধর্ম্যঃ—
ধর্ম্যং অনপেত্যং সংবাদং যঃ অধ্যোক্তে—অপক্লপেণ পঠিত্যতি, তেন পুংসা সর্কষজ্ঞেভ্যঃ শ্রেষ্ঠেন
জ্ঞানযজ্ঞেন অহম্ ইষ্টঃ শ্রাম্—ভবেয়মিতি মে মতিঃ । যত্ন্যসৌ গীতার্থম্ অবধানাম্ এব
কেবলং অপতি, তথাপি মম তচ্ছবতো মামেব অসৌ প্রকাশয়তীতি বুদ্ধিঃ ভবতি । যথা
লোকে যদৃচ্ছ্যপি যদা কশ্চিৎ কশ্চিৎ নাম গুহ্যতি, তদ্যসৌ মাম্ আক্লম্যতীতি মদ্যতৎপাশ্বম্
আগচ্ছতি, তথা অহমপি তন্ত সন্নিহিতো ভবেয়ম্ । অতএব অজামিল-কজবন্ধু-প্রমুখানাং
কথঞ্চিং নামোচ্চারণ মাভ্রোণ যথা প্রসন্নোহস্মি তর্থেষ তস্তাপি প্রসন্নো ভবেয়মিতি ভাবঃ ॥ ৭০

বঙ্গানুবাদ । [গীতাপাঠকারীর ফল বলিতেছেন]—আমাদের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ও
অর্জুনের এই ধর্মসংযুক্ত সংবাদ, যিনি অপক্লপে পাঠ করেন সেই পুরুষ কর্তৃক আমি
সর্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা অর্জিত হইয়া থাকি, ইহাই মনে করি । সে ব্যক্তি গীতার্থ না
বুঝিয়াও যদি কেবল গীতা পাঠ করে, তথাপি তাহা শুনিয়া আমার বোধ হয় যেম সে আমাকেই
প্রকাশ করিতেছে (ডাকিতেছে), যেমন যদৃচ্ছাক্রমে কেহ যদি কোন সময়ে কাহারও নাম
গ্রহণ করে, সে যেমন ‘আমাকেই ডাকিতেছে’ মনে করিয়া সেইলোক তাহার পার্শ্বে উপস্থিত
হয়, সেইরূপ আমিও তাহার সন্নিহিত হই । অতএব অজামিল ও কজবন্ধু (এবং) প্রভৃতির
কোনরূপ নামোচ্চারণমাত্রই তাহাদের উপর যেরূপ প্রসন্ন হইয়াছিলাম সেইরূপ অর্থজ্ঞানহীন
গীতাপাঠকারীর প্রতিও আমি প্রসন্ন হইয়া থাকি—ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ৭০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা যে একদা শুনবে (পড়বে) তার ভাল হবে ।—আমাদের
উভয়ের এই ধর্মজনক সংবাদ যে অধ্যয়ন করিবে তাহার ভাল হইবে । কেন ? যে বিচার
সাধনে এই জ্ঞান প্রত্যক্ষ হয় সেই সাধনে উৎসাহ বর্দ্ধিত হইবে এই সংবাদ পাঠ করিলে ।
ভগবানকে পূজা কবিরার সর্বোত্তম উপায় জ্ঞানযোগ, গীতাধ্যয়নে জীবের অন্তঃকরণে সেই
জ্ঞানলালসার বৃদ্ধি হয় । সুতরাং পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ যিনি স্বয়ং জ্ঞানরূপ তিনি যে গীতাধ্যয়নের
দ্বারা সম্পূর্ণ হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি ? জ্ঞানযজ্ঞের মহাকল পরমপদ লাভ, যিনি
গীতা পাঠ করিবেন তাহার বুদ্ধি শুদ্ধ হইবে এবং শুদ্ধ বুদ্ধির ফল যে মোক্ষ তাহাও তিনি
লাভ করিবেন ॥ ৭০

অর্থ । শ্রদ্ধাবান্ অনসূয়ঃ চ (শ্রদ্ধাবান্ ও অনসূয়শ্চ) যঃ নরঃ (যে ব্যক্তি) শৃণুয়াৎ
অপি (কেবল শ্রবণও করে) সঃ অপি মুক্তঃ (তিনিও মুক্ত হইয়া) পুণ্যকর্মণাম্ (পুণ্যকর্ম-
কারিগণের) শুভান্ লোকান্ (শুভলোক সকল) প্রাপ্নুয়াৎ (প্রাপ্ত হন) ॥ ৭১

শ্রীধর । অতস্ত অপর্যো যোহত কশ্চিৎ শৃণোতি তস্তাপি ফলমাহ—শ্রদ্ধাবানিতি ।
যো নরঃ শ্রদ্ধাযুক্তঃ কেবলং শৃণুয়াদপি, শ্রদ্ধাবানপি যঃ কশ্চিৎ কিমর্থং অয়ং উচৈঃ অপতি,
অবদ্বং অপর্যোতি বা দোষদৃষ্টিঃ করোতি, তদ্যাবত্বার্থমাহ—অনসূয়শ্চ অনসূয়রহিতঃ যঃ
শৃণুয়াৎ সোহপি সর্বৈঃ পার্শ্বে মুক্তঃ সন্ অশ্বমেধাদিপুণ্যকৃত্যং লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ ॥ ৭১

(ভগবানের অর্জুনকে জিজ্ঞাসা)

কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা ।

কচ্চিদজ্ঞানসংমোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয় ॥ ৭২

বঙ্গানুবাদ । [অত্র ব্যক্তি পার্থ করিতেছে তাহা যদি কেহ শ্রবণও করে, তাহাতেও যে
ফল হয় তাহা বলিতেছেন]—যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া কেবল শ্রবণও করে, এবং শ্রদ্ধাবান
হইয়াও (যদি কেহ কি অল্প উচ্চস্বরে অবিশ্রান্ত ভাবে ও-ব্যক্তি কেন পড়িতেছে আর কি ভক্ত
অবাধে পাঠ করিতেছে এইরূপ দোষদৃষ্টি করে তাহার ব্যাবহার্য্য অর্থাৎ তাহার। যে ফল পায়
না—তাহা জানাইবার অত্র বলিতেছেন)—অনসূয়রহিত ভাবে (অর্থাৎ দোষদৃষ্টি না করিয়া)
যে ব্যক্তি ইহা শুনে সে-ও সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া অশ্বমেধাদি যজ্ঞকারী পুণ্যাদ্বিগের
শুভ লোক প্রাপ্ত হয় ॥ ৭১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—শ্রদ্ধা পূর্বক শুনিলে সেও মুক্ত হ'বে :—রসজ্ঞ ভক্তেরা
ভগবৎ কথা যত শুনে ততই তাহাদের আরও ভাল লাগিতে থাকে—“বুদ্ধতাং রসজ্ঞানাং
স্বাদ্ স্বাদ্ পদে পদে” । কিন্তু রসজ্ঞান তো সব সময় সকলের হয় না । ভাগবতী কথায় শ্রদ্ধা
ও কৃতি জন্মিলে রসজ্ঞান হইতে পারে । কিন্তু আমাদের ভগবৎ-কথায় শ্রদ্ধা ও কৃতি
কোথায় ? ভবব্যতির তাড়নে উৎকৃষ্ট ও হুমধুর যে হরিকথা তাহাও অনেক সময়ই
ভাল লাগে না । এ বোগের ঠিক কি ? শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—

“তশ্চবোঃ শ্রদ্ধাধানস্ত বাসুদেবকথাকৃতিঃ ।

শ্রাম্ভংসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থ-নিষেবণাৎ ॥”

হে বিশ্রগণ ! পুণ্যতীর্থ গদাদি স্থান অথবা গুরুপদকমলরূপ মহাতীর্থে স্থান করিলে শ্রদ্ধার
সঞ্চার হয় এবং ভগবৎ কথা শ্রবণে আগ্রহের উদয় হয় । এই আগ্রহের উদয় হইলেই
ভগবৎ কথায় কৃতি উৎপন্ন হয় । ভগবৎ কথা শ্রবণ এবং তাহার অধ্যয়নের ফলে ভগবৎ
শক্তি প্রভাবে কাম-ক্রোধাদির প্রবল উত্তেজনা হ্রাস হইতে থাকে, এবং কাম-ক্রোধ দ্বারা
আর তাহার চিত্ত বিদ্ধ হয় না ; তখন জ্ঞানের স্মরণ হয় এবং ভগবৎতত্ত্বের অত্মভূতি হইয়া
বাহু বিধয়ের প্রতি বৈরাগ্যের উদয় হইতে থাকে, সুতরাং হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হয় অর্থাৎ ব্রহ্ম
বাচীত বাবতীর বস্তুর প্রতি আসক্তি নষ্ট হইয়া যায়, সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইয়া যায় এবং জন্ম-
জন্মান্তর-সঞ্চিত কর্ম নষ্ট হইয়া যায় ॥ ৭১

অর্থ । পার্থ (হে পার্থ !) ত্বয়া (তোমা কর্তৃক) একাগ্রেণ চেতসা (একাগ্রচিত্তে)
এতৎ শ্রুতং কচ্চিৎ (ইহা কি শুনা হইয়াছে ?) । ধনঞ্জয় (হে ধনঞ্জয় !) তে অজ্ঞানসংমোহঃ
(তোমার অজ্ঞানজনিত সংমোহ) প্রনষ্টঃ কচ্চিৎ (বিনষ্ট হইল কি ?) ॥ ৭২

শ্রীধর । সম্যক্ বোধাত্মপত্তৌ পুনরুপদেক্যামি ইত্যশয়েন আহ—কচ্চিৎ ইতি ।
কচ্চিদিতি প্রশ্নার্থে । অজ্ঞানসংমোহঃ—তবাজ্ঞানরূপতঃ বিপর্য্যয়ঃ । স্পষ্টমুক্তং ॥ ৭২

বঙ্গানুবাদ । [সম্যক্ বোধের অল্পপত্তি হইলে অর্থাৎ সম্যক্ বোধ না জন্মিয়া থাকিলে
পুনরায় উপদেশ দিব, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন]—কচ্চিৎ শব্দ প্রশ্নার্থে ব্যবহৃত হয় ।

(অৰ্জুনের উত্তর—তঁাহার মোহনাশ হইয়াছে)

অৰ্জুন উবাচ ।

যাক্ষো মোহঃ স্মৃতিলঙ্ঘ্য ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত ।

স্থিতোহস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ ৭৩

অজ্ঞানসংমোহ—ভক্তজ্ঞান বিষয়ে অজ্ঞানবশত বিপরীত বুদ্ধি। অত্র সব স্পষ্ট। [হে পার্থ, তুমি একাগ্রচিত্তে ইহা শুনিলে ত ? হে ধনঞ্জয়, তোমার অজ্ঞানজনিত মোহ বিনষ্ট হইল ত ?] ॥ ৭২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এ শব্দে সর্ব অজ্ঞান নাশ হয়। (তোমার হইয়াছে তো ?)।—অৰ্জুনের মোহ নষ্ট হইয়াছে কি না হইয়াছে ভগবান্ তাহা কি জ্ঞানেন না ? তবে আবার এ প্রশ্ন কেন ? সৰ্বমোহ-নাশন, সাক্ষাৎ জ্ঞানরূপ ভগবান্ বাহার উপদেশটা তাহারও কি আবার মোহ থাকিতে পারে ? গীতাশ্রবণের ফলেই অজ্ঞান মোহের নাশ, অৰ্জুনেরও নিশ্চয়ই তাহা হইয়াছে—সেই কথা অৰ্জুন নিজ মুখে ব্যক্ত করিয়া জগৎ-জীবকে সুনাইয়া দিল, তাহাতে জগতের কল্যাণ হইবে—এই প্রশ্নের ইহাই উদ্দেশ্য। অজ্ঞান বশতঃই জীবের ভ্রান্তি হয়, শ্রীগুরুকৃপায় শিষ্টের সেই ভ্রান্তি নাশ হয়। শিষ্ট সাধনায় কৃতকৃত্য হইলে গুরুর যে আনন্দ সে আনন্দ বৃষ্টি শিষ্ট সাধকের হয় না। শিষ্ট প্রাণের সহিত উপদেশ ধারণ করিতে পারিলেন কিনা, যদি গ্রহণ করিতে না পারিয়া থাকেন, তবে উপায়ান্তর দ্বারা তঁাহাকে বুঝানো হইবে ইহা সৎগুরুর চিরদিনের অঙ্গীকার। শিষ্টের উপদেশ গ্রহণ ও গুরুর উপদেশ দান এইজন্মই। যদি শিষ্টের মোহ নষ্ট হইয়া থাকে, তবে গুরু-শিষ্ট উভয়ের প্রয়াসই সার্থক। গুরুর উপদেশ মত সাধন করিয়া সাধকের স্বরূপ জ্ঞান হয় ও নিজ স্বরূপে স্থিতিলাভ হয়, অৰ্জুনেরও তাহা হইল কিনা সে পরিচয় আমরা পর স্লোকে পাইব ॥ ৭২

অর্থঃ। অৰ্জুন উবাচ (অৰ্জুন বলিলেন)। অচ্যুত (হে অচ্যুত !) ত্বৎপ্রসাদাৎ (তোমার কৃপায়) মোহঃ নষ্টঃ (মোহ নষ্ট হইয়াছে), ময়া (মৎকর্তৃক) স্মৃতিঃ লঙ্ঘ্য (স্মৃতিলাভ হইল—অর্থাৎ কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞান লাভ হইল) গতসন্দেহঃ (নিঃসংশয় হইয়া) স্থিতঃ অস্মি (আমি স্থির হইয়াছি), তব বচনং করিষ্যে (তোমার উপদেশ মত কার্য্য করিব) ॥ ৭৩

শ্রীধর । কৃতার্থঃ সন্ অৰ্জুন উবাচ—নষ্টো মোহ ইতি । আত্মবিষয়ো মোহো নষ্টঃ । যতঃ অয়ম্ অহমস্মি ইতি স্বরূপাহসন্ধানরূপা স্মৃতিঃ ত্বৎপ্রসাদাৎ ময়া লঙ্ঘ্য । অতঃ স্থিতোহস্মি বুদ্ধ্যঃ উষিতোহস্মি, গতঃ ধর্ম্মবিষয়ঃ সন্দেহো যন্ত সৌহৃৎ তব আজ্ঞাং করিষ্য ইতি ॥ ৭৩

বঙ্গানুবাদ । [কৃতার্থ হইয়া অৰ্জুন বলিলেন]—আত্মবিষয়ক যে মোহ তাহা নষ্ট হইল, যেহেতু “এই আমি” এই স্বরূপসন্ধান-রূপ স্মৃতি তোমার প্রসাদে লাভ করিলাম। অতএব স্থিত হইলাম অর্থাৎ সুদীর্ঘ উষিত হইতেছি। গত হইয়াছে ধর্ম্মবিষয়ে সন্দেহ বাহার সেই আমি তোমার আদেশ মত কার্য্য করিব ॥ ৭৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—শরীরের ভেজ দ্বারা ব্যক্ত হইতেছেঃ—আমার মোহ আর সন্দেহ সব গেল—যা বলবেন তাই করিব।—হৃদয়কৃত দোষের চিন্তা ও

আত্মীয়দিগের বধ জনিত কাতরতা অৰ্জুনের স্বাভাবিক বৈধ ৩ জ্ঞানকে অভিব্যক্ত করিয়া ফেলিয়াছিল, তাই তিনি আর যুদ্ধ করিবেন না বলিয়া শোকাবলু চিত্তে সশর-গাভীর পরিত্যাগ করিয়া মোহবিভ্রান্ত চিত্তে রথের উপর বসিয়া পড়িয়াছিলেন। এই মোহ নষ্ট করিবার জন্মই ভগবানের প্রয়াস। দেহাত্মজ্ঞানরূপ মোহ অৰ্জুনকে কাতর করিয়াছিল, তাই তিনি স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্ম গ্রহণে অভিলাষ করিয়াছিলেন। ভগবানের উপদেশে আবার তঁাহার সেই আত্মবুদ্ধি ফিরিয়া আসিল। তঁাহার স্মৃতি দৃঢ় হইল যে তিনি দেহ নহেন, তিনি আত্মা। স্মৃতির অমর অমর আত্মার আবার জীবন-মরণের জন্ম ভয় কি ? মন্দাকিনীর গুল কুলকুল ধারার মত যখন এই আত্মস্মৃতিধারা অৰ্জুনের মনঃপ্রাণ-বুদ্ধির মধ্যে প্রবাহিত হইতে লাগিল তখন তিনি সর্ব প্রকার সন্দেহশূন্য হইয়া অভয় লাভ করিয়া উঠিয়া বসিলেন। তিনি এইবার জোর করিয়া বলিলেন—“আমার মোহ নষ্ট হইয়াছে, আমার আত্ম-স্মৃতি ফিরিয়া পাইয়াছি।” যে আত্মবিশ্বাস হইয়া জীব কতবার এই ভবে আসে আর যায়, আজ সেই বিশ্বাস, সেই ভুল ছুটিয়া গেল। আমার কত-জন্মের সেই নামরূপ-দেহ যাহা স্বপ্নদর্শনের দ্বায় কেবল অজ্ঞান হইতেই উৎপন্ন হয়, আজ সেই মোহ, সেই অজ্ঞান আমার নষ্ট হইয়া গেল। আর এই সংসারে কর্তৃত্বাভিমান, আমার কত শত সাজা বেশ, লাগত অবস্থায় যেমন স্বপ্ন-জ্ঞান সরিয়া যায়, তেমনই করিয়া অজ্ঞান-সম্ভ্রাম আমার জ্ঞানদৃষ্টি হইতে সরিয়া গেল। যে স্মৃতি লাভ হইলে “সর্বগ্রহীনাং বিমোক্ষঃ”—সমস্ত গ্রহিণীর মোচন হয়, আমার সেই হৃদয়গ্রন্থির ভেদ হইল। চিৎ-জড়ের যে অভেদ জ্ঞান আমাকে—কত কাল হইতে জীবভাবে বদ্ধ করিয়াছিল, আজ সে অনর্থক জ্ঞান বিনুগ্ন হইল। মায়ার কৌশল আজ আমার নিকট ধরা পড়িয়া গিয়াছে, আর অনায়াসে দেহাদিতে আমার আত্ম বুদ্ধি নাই। এখন বুঝিয়াছি, হে আত্মদেব ! তুমিই সব, আমিও তুমি। তোমাতে আমাতে আর এই জীব ও জগতের সঙ্গে অজ্ঞানজনিত যে ভেদ কল্পনা করিয়াছিলাম, আজ তোমার প্রসাদে সব তিরোহিত হইয়া গেল। সবই আত্ম-স্বরূপ, “সর্বং ধর্ম্মদং ব্রহ্ম”। ক্রিয়ার পর অবস্থায় এই স্থিতি লাভ করিয়া আমার স্বরূপ যে কি তাহা বুঝিয়া লইয়াছি। আমি যে অৰ্জুন এ বোধ চলিয়া গিয়াছে, আমার পৃথক কর্তব্যের ধারণা যাহা দেহবোধ হইতে হয়, সে ধারণা লোপ পাইয়াছে। দেহবোধের ধারণা ততদিন থাকে যতদিন আত্মবোধ না হয়। ততদিন কত কর্তব্যাকর্তব্যের বোধ জীবকে আবলু করিয়া রাখে। তখন দেহের চাকল্য মনের চাকল্য, প্রাণের চাকল্য জীবকে অস্থির করিয়া রাখে, আজ মায়ার সে তাত্ত্বিক নৃত্য তোমার কৃপায় থামিয়া গিয়াছে। এইবার তোমার উপদেশ মত স্বাসে লক্ষ্য রাখিয়া প্রাণের সাধনা করিতে করিতে এক দিব্য অবস্থা লাভ করিয়াছি। উহাই ক্রিয়ান্ন পর অবস্থা। প্রাণ স্থির হইয়া যেমনই অস্থির সঞ্চারণ করিতে লাগিল, অমনি জগৎ-দর্শন স্পষ্ট হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্ন-দুঃখের ধারণাও থামিয়া গেল। এখন মরণ-বীচনই বা কি, সুখ-দুঃখই বা কার ? সব স্বপ্ন যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে ভাঙিয়া গেল। স্ব-স্বরূপে স্থিতি লাভ করিয়া প্রকৃত সুখের আজ পরিচয় পাইলাম। আর বিষয়স্বত্বকে বড় মনে করিয়া একদিন যে সাধনাকে পরিত্যাগ করিতে চাহিয়াছিলাম, সাধন-সময়ের সাজ মেরুদণ্ড-গাভীরকে অবনত করিয়া

সঞ্জয় উবাচ ।

(অদ্ভুত রোমহর্ষণ সংবাদ)

ইত্যহং বাহুদৈবস্ত পার্থস্য চ মহাত্মনঃ ।

সম্বাদনিমমশ্রৌষমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্ ॥ ৭৪

পাগলের মত শুধু হা-হতাশ করিতেছিলাম এবং নিরাজের মত আর বুদ্ধ করিব না বলিয়া তোমার নিকট নিজ মত ব্যক্ত করিয়াছিলাম, এখন সে সব দুর্বুদ্ধি তোমার প্রসাদে ও ক্রিয়ার পর অবস্থার প্রসাদে, সমূলে নির্মূল হইয়া গিয়াছে—এখন তোমার বাক্য, যে গুরুদেব, আমি নিশ্চয় গালন করিব। এই দেখ “স্থিতোহস্মি”—আমি আবার যুদ্ধার্থ উত্তীর্ণ হইলাম। আমার মেরুদণ্ড সোজা হইয়াছে এবং তাহাতে একটি টান অহুতব করিতেছি।

নাভিচক্রেব তেজস্তত্ত্বং বদ্য আমরের জীব আবার মেরুদণ্ড সরল করিয়া সাধনার্থ উঠিয়া বসিলেন। এইবার তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন—“করিয়ে বচনং তব—শুধু বাক্য যেমন করিয়াই হউক গালন করিবই”। জীবশক্তি এখন এই ভাবে কোমর বাঁধিয়া সাধন-সময়ে আত্মোৎসর্গ করিবার জন্য সাধনার্থ সোজা হইয়া আসনে দৃঢ়ভাবে উপবেশন করে, তখন ক্রিয়ার পর অবস্থা বা আত্মজ্ঞান লাভের আর বিলম্ব থাকে না। তখন জগৎজ্ঞান আত্মদেব কৃষ্ণ চৈতন্য ও নিজ মাধুরী সাধককে আত্মাধন করাইয়া দেন, জীব তখন “রসো বৈ সঃ”—কে আপন হইতে অভিন্ন আনিয়া কৃতকৃতার্থ হয়। আর সন্দেহের লেশ থাকে না। এইরূপে দেখা দিতে আত্মবুদ্ধি তিবোহিত হওয়ায় চিরদিনের জন্য তাঁহার সংসার লীলায় অবসান হয় ॥ ৭৩

অন্থয় । সঞ্জয়ঃ উবাচ (সঞ্জয় বলিলেন)। অহং (আমি) ইতি (এইরূপে) মহাত্মনঃ (মহাত্মা) বাহুদৈবস্ত (বাহুদেবের) চ পার্থস্ত (এবং অর্জুনের) ইমং রোমহর্ষণং (এই রোমাঞ্চকর) অদ্ভুতং সংবাদম্ (অদ্ভুত কথোপকথন) অশ্রৌষম্ (শ্রবণ করিয়াছিলাম) ॥ ৭৪

শ্রীধর । ভদ্রেণ ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদঃ কথয়িত্বা প্রস্তুতাং কথাম্ অহুসম্বাদনঃ সঞ্জয় উবাচ—ইতীতি । রোমহর্ষণং—রোমাঞ্চকরং সংবাদম্ অশ্রৌষম্ শ্রবণ করিয়াছিলাম ॥ ৭৪

বজ্রাস্ত্রবাদ । [এইরূপে ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদ বলিয়া প্রস্তাবিত কথার অহুসম্বাদনার্থ (উপসংহারার্থ) সঞ্জয় বলিতেছেন]—রোমহর্ষণ শব্দে রোমাঞ্চকর সংবাদ । (মহাত্মা বাহুদেবের ও পার্থের এই রোমাঞ্চকর কথোপকথন) আমি গ্রহণ করিয়াছি ॥ ৭৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—এই যে সম্বাদ এ অদ্ভুত—কৃষ্ণার্জুন-সংবাদে সাধনার অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা হইয়াছে এইজন্য এ সম্বাদ বাস্তবিকই অদ্ভুত। আর ইহাতে যে সব অহুতবের কথা বলা হইল তাহার কিছু কিছুও যাহার প্রত্যক্ষ হয় তাহার বিশ্বাসের আর অহুতবের কথা বলা হইল তাহার কিছু কিছুও যাহার প্রত্যক্ষ হয় তাহার বিশ্বাসের আর সীমা থাকে না। এই অন্ধ-মজ্জা-মেঘপরিপূর্ণ দেহ, ইহার মধ্যে প্রাণের সঞ্চার, মন-বুদ্ধির খেলা, তাহার মধ্যে আবার এই সব দৃঢ় ধর্শন, এই সব কত অজানা জিনিসের অহুতব—ইহা মনে হইলেও শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে।

ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ তবানেনতদ্ গুহ্যমহং পরম্ ।

যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্ ॥ ৭৫

এই অদ্ভুত সংবাদ দিব্য-দৃষ্টি হইতেই কৃষ্ণিয়া উঠে। এ সমস্ত অহুতব অন্তঃকরণেই হইয়া থাকে, তাই ধৃতরাষ্ট্র অর্থাৎ মনকে লইয়াই এই সব কথোপকথন। দিব্য-দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি মনে মনেই এই সব সাধন-সংবাদ প্রত্যক্ষ করেন। সাধকের চৈতন্য সমাধিতে এই সব দিব্য জ্ঞান স্ফূর্তিত হয় এবং সেই অবস্থায় পৌঁছিয়া সাধকেস্রগণ সব তত্ত্বই জানিতে পারেন। ইহা বাস্তবিকই অদ্ভুত! যতক্ষণ দেহদৃষ্টি ও জীবভাব থাকে ততক্ষণ এই শরীর, মন, বুদ্ধি ও প্রাণের মধ্যে কত খেলাই চলিতে থাকে। কিরূপে ব্রহ্ম হইতে এই জগৎ লীলাকারিণী মহাশক্তি প্রাণ উদ্ভূত হইয়া থাকে, এবং সেই প্রাণধারার সহিত ব্রহ্ম ভাসিতে ভাসিতে আপনাকে আপনি কত হুস্ত ও কত জ্বলের মধ্যে প্রকটিত করেন, যেন ব্রহ্ম স্থলই হইয়া গিয়াছেন। আবার সৎগুরু রূপায় সাধন সাহায্যে দিব্য দৃষ্টি লাভ করিয়া জীব আবার কেমন প্রবুদ্ধ হইয়া আত্মবিশুদ্ধ ভাবকে পরিত্যাগ করে, তাহা আলোচনা করিলে অত্যন্ত অদ্ভুতই মনে হয়। যাহা ব্যক্ত ছিল না, কোন ইন্দ্রিয়েরই গোচর ছিল না, সেই সব অপ্রত্যক্ষ অজ্ঞাত বস্তু সাধকের জ্ঞানগোচর হইয়া আবার কিরূপে তাহাকে অতীন্দ্রিয় জগতের সন্ধান আনিয়া দেয়—এই সব সংবাদ প্রত্যেকে বিশ্বাসাভিভূত করেই তো। জানকী-বিশ্বয়ে তাহার যে রোমাঞ্চ হইবে তাহা আর বেশী কথা কি? সর্বব্যাপী বাহুদেব তো বাহুদেবই আছেন, কিন্তু জীব অর্জুনের আত্মাও যে দেহ সঞ্চী নহে, সেও যে বাহুদেবেরই অংশ, সেও যে মহান—এই পরম গুহ্য সংবাদে জীবের মন প্রকৃতই পুলকিত হয় এবং দেহ প্রকৃত রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে ॥ ৭৪

অন্থয় । অহং ব্যাসপ্রসাদাৎ (আমি ব্যাসদেবের অনুগ্রহে) এতৎ পরং গুহ্যং যোগং (এই পরমগুহ্য যোগতত্ত্ব) স্বয়ং কথয়তঃ (স্বয়ং বর্ণনায় প্রবৃত্ত) যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ (যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে) সাক্ষাৎ শ্রুতবান্ (প্রত্যক্ষ ভাবেই শুনিয়াছি) ॥ ৭৫

শ্রীধর । আত্মনঃ তত্ত্ব শ্রবণে সম্ভাবনামাহ—ব্যাসপ্রসাদাহিতি । ভগবতা ব্যাসেন দিব্যং চক্ষুঃ প্রোক্তাঃ মহং দত্তম্ । ততো ব্যাসস্ত প্রসাদাৎ এতৎ অহং শ্রুতবানস্মি । কিং তৎ ইতি অপেক্ষামাহ—পরং যোগম্ । পরম্ আবিষ্করোতি । যোগেশ্বরাৎ শ্রীকৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ শ্রুতবানিতি ॥ ৭৫

বজ্রাস্ত্রবাদ । [সঞ্জয় বুদ্ধকে হইতে বহুদূরে থাকিলেও তাহা শ্রবণে যে সম্ভাবনা আছে, তাহাই বলিতেছেন]—ভগবান্ ব্যাসদেব আমাকে দিব্যচক্ষু ও প্রোক্তাঃ প্রদান করেন অতএব ব্যাসের অনুগ্রহেই আমি (বহুদূরে থাকিলেও) শুনিয়াছি। যাহা শুনিয়াছি তাহা কি? এই আশায় বলিতেছেন যে তাহা পরম যোগ। পরম (শ্রেষ্ঠ) কি সে? তাহা বলিতেছেন—যে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ বক্তা, তাঁহারই মুখ হইতে আমি শুনিয়াছি ॥ ৭৫

তচ্চ সংসৃত্য সংসৃত্য রূপমত্যন্ততং হরেঃ ।

বিশ্বায়ো মে মহান্ রাজন্ হৃদ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭৭

করিয়া করিয়া) যুহঃ যুহঃ চ (ক্ষেপে ক্ষেপেই) হৃদ্যামি (রোমাঞ্চিত হইতেছি বা হৃষ্ট হইতেছি) ॥ ৭৬

শ্রীধর। কিঞ্চ—রাধ্মনিত্তি। হৃদ্যামি—রোমাঞ্চিতো ভবামি, হর্ষং প্রাপ্তোমীতি বা। স্পষ্টমন্ত্যং ॥ ৭৬

বজ্রানুবাদ। [আরও বলিতেছেন]—“হৃদ্যামি”র অর্থ রোমাঞ্চিত হইতেছি, অথবা হর্ষ প্রাপ্ত হইতেছি। অস্ত্র সব স্পষ্ট। [রাজন্, কেশবাজ্জনের এই বিষয়কর পুণ্য সংবাদ (পুণ্য—শ্রুতিমাত্র পাপহর) শ্রবণ করিয়া প্রতিক্ষেপেই আমি হর্ষপ্রাপ্ত হইতেছি] ॥ ৭৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—একথা শুনে মন বড় সন্তুষ্ট হ'ল।—কেশবাজ্জনের এই যে সংবাদ ইহা পুণ্য কথা। ইহা চিন্তকে নিষ্পাপ ও শুদ্ধ করে। সাংসারিক কথায়, ভোগের কথায় আমাদের চিন্তকে আবদ্ধ করে এইজন্য উহা পাপ। আর এই কেশবাজ্জনের কথায় পাপ মূক্ত করে। অর্জুন বিগত তেজস্তত্ত্ব, তাহার দ্বারাই জগদ্ব্যাপার চলিতেছে, সেই তেজঃ বধন ঈশ্বরমুখ বা আশ্রমুখ হয় তখনই তাহা ভগবৎ প্রাপ্তির সহায়ক হয়।

কেশব=ক—মন্তক, ইশ—প্রভুত্ব করা, ব—প্রাপ্তি। সহস্রারে যিনি বিরাজ করিতেছেন, সেই ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হইয়াছে বাহ্যর—তিনিই কেশব। এই কেশব আর অর্জুন পরস্পর সখ্য ভাবে মিলিত। সাধক সাধনশক্তি বলে বধন নির্মল হইয়া যান তখনই সহস্রদল কমলস্থিত গুরুশক্তির সহিত তিনি মিলিত হইতে পারেন। এই মিলন না ঘটিলে হেহেমিয়্যাহি প্রকৃতি-ক্ষেত্র জয় করা অসম্ভব। সুতরাং বধনই এই পুণ্যময় ভাব আবিস্কৃত হয়, তখনই ক্লেশপূর্ণ শরীরকে সাধক বিস্মৃত হইয়া যান, তখন অন্তর্জগতের কত রূপ, কত শব্দ, কত ঐশ্বর্য, কত জ্ঞান প্রকটিত হই। সাধককে এক অনাস্বাদনিতপূর্ণ চিন্ময় রাজ্যের বিমলানন্দে মগ্ন করিয়া দেয়। আমাদের এই বিষয়-মগ্ন মনটা বিষয়ক্লেশ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া মুক্তির আরাম অমৃতত্ব করে। শুদ্ধচিত্তের এ কথায় বত আনন্দ হয় আর অস্ত্র কিছুতে হয় না ॥ ৭৬

অন্বয়। রাজন্ (হে রাজন্!) হরেঃ (হরির) তৎ (সেই) অত্যন্ততং রূপং (অতি অদ্বুত রূপ) সংসৃত্য সংসৃত্য (শ্রবণ করিয়া করিয়া) মে (আমার) মহান্ বিশ্বয়ঃ (অতিশয় বিশ্বয় হইতেছে) চ (আর) পুনঃ পুনঃ হৃদ্যামি (পুনঃ পুনঃ হৃষ্ট হইতেছি) ॥ ৭৭

শ্রীধর। কিঞ্চ—তচ্চৈতী। বিশ্বরূপং নির্দিশতি। স্পষ্টমন্ত্যং ॥ ৭৭

বজ্রানুবাদ। [আরও বলিতেছেন]—তৎশব্দে পূর্বপ্রদর্শিত বিশ্বরূপ। অস্ত্র সব স্পষ্ট। [হে রাজন্, হরির সেই সেই অদ্বুত বিশ্বরূপ শ্রবণ করিয়া করিয়া আমার মহা বিশ্বয় জন্মিতেছে ও আমি পুনঃ পুনঃ হৃষ্ট হইতেছি] ॥ ৭৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ফের খুব খুসি হচ্ছি।—ভগবানের সগুণ রূপই বিশ্বরূপ, বাহ্য অর্জুনের দ্বান সৌকর্য্য হেতু যেখানে হইয়াছিল। সেই অত্যন্ত রূপ শ্রবণ করিয়া

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ ।

তত্র শ্রীবিজয়ো ভূতিক্ষ্রবা নীতিমতিমম ॥ ৭৮

ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতাস্থপনিষৎ ব্রহ্মবিজ্ঞানঃ যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
মৌল্যযোগো নাম অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ।

দ্বিব্যাপ্তিসম্পন্ন সঞ্জয়ের আনন্দের আর সীমা নাই। এত আনন্দের কারণ কি? কারণ এই জগদ্ব্যাপারের মধ্যে জীবের ইন্দ্রিয়গুলি সাময়িক তৃপ্তিলাভ করিলেও জীব প্রকৃত তৃপ্ত হয় না, বহুভাবের মধ্যে এক ঐক্য ভাবকে দেখিতে না পাইলে জীব শান্ত হয় না। নানাষ ও অনৈক্য ভাহাকে অভয় দান করিতে পারে না। যতক্ষণ জীব নানাধর্শন করে ততক্ষণ জীব কিছুতেই সন্তাপমুক্ত হয় না। তাই ক্ষতি বলিলেন—

“যেহেবেহ তদমৃতং, যদমৃতং তদবিহ। যতোয়াঃ স যতুম্যাপ্রোতি য ইহ নানেক পশ্চতি ॥” (কঠ)

যে প্রাণচৈতন্য ইহ অর্থাৎ এই বিশেষ বা দেহস্থ অন্তঃকরণে প্রকাশিত সেই আত্মচৈতন্যই অমৃত তথায় অর্থাৎ প্রকৃতির অতীত অবস্থায়; যে চৈতন্য মাত্রাতীত ভাবে, সেই চৈতন্য এই এখানে অর্থাৎ দেহ বা দেহস্থ অন্তঃকরণে অমৃত্যুত বহিয়াছেন। যে ব্যক্তি এই ব্রহ্মচৈতন্যে নানা ভাব (অর্থাৎ অন্তঃকরণের ভিন্নতা বশতঃ আত্মা বা ব্রহ্মের ভিন্নতা) দর্শন করে, সে ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর পব মৃত্যু লাভ করিতে থাকে। অর্থাৎ পুনর্জন্ম ও পুনর্মৃত্যুর হস্ত হইতে সে মুক্তিলাভ করে না। এখন এই এক বিশ্বাস্ত্রের মধ্যে বধন সমস্ত নরনারী, দেবতা, পুত্র, পক্ষী, সরীসৃপ, বৃক্ষ, নদী, সমুদ্র, সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ একাধারে সমস্ত অবস্থিত দোষতে লাগিলেন, শুধু তাহাই নহে, সেই নানাভাব বধন এক মহাজ্যোতির মধ্যে আত্ম-হার্য হইয়া গেল—তখন পৃথক পৃথক দৃষ্ট পদার্থের আর পার্থক্য রহিল কোথায়—এই ভাবিয়া সঞ্জয়ের বিশ্বাস উৎপন্ন হইল। যে ভেদভাব নানা উপদেশ ও বিচার বিতর্কেও মাইবার নহে তাহা বধন বিশ্বরূপের মধ্যে প্রত্যক্ষ ভাবে এক হইতে দেখা গেল, তখন বিশ্বের মহান্ ঐক্য দেখিয়া ভেদবুদ্ধিবিমূঢ় চিত্ত নির্বাক হইয়া গেল। এ কথা যতবার শ্রবণ হয় ততই বিশ্বয়ে চিত্ত অভিভূত হইয়া যায় ॥ ৭৭

অন্বয়। যত্র (যেখানে বা যে পক্ষে) যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ (যোগেশ্বর কৃষ্ণ) যত্র (যেখানে) ধনুর্ধরঃ পার্থঃ (ধনুর্ধর পার্থ), তত্র (সেখানে) শ্রীঃ (রাজলক্ষ্মী) বিজয়ঃ (বিজয়) ভূতিঃ (ভূতদ্বয় বা উত্তরোত্তর বুদ্ধি) ক্রবা নীতিঃ (অখণ্ডিত বা অব্যতিচারী স্বায়) [বর্ধমান] ইতি মে মতিঃ (ইহা আমার নিশ্চয় ॥ ৭৮

শ্রীধর। অতঃ পূঃ পূত্রাণাং রাজ্যাদ্বিশ্বকং পরিত্যজ্য ইত্যশয়েনাহ—বজ্রেতি। যত্র—যেখানে পক্ষে, যোগানাম্ ঈশ্বরঃ শ্রীকৃষ্ণো বর্ততে, যত্র চ পার্থো গাতীব ধনুর্ধরঃ, তত্রৈব শ্রীঃ—রাজলক্ষ্মীঃ তত্রৈব বিজয়ঃ; তত্রৈব চ ভূতিঃ—উত্তরোত্তর্য্যভিভূতিঃ, নীতিঃ—গ্ৰাম্যোহপি, তত্রৈব ক্রবা—নিশ্চিন্তা, ইতি সর্বত্র সখ্যতে। ইতি মম মতিঃ—নিশ্চয়ঃ। অত ইদানীমপি ভাবং সম্পূত্রঃ যঃ শ্রীকৃষ্ণঃ শরণম্ উপেত্য পাণ্ডবান্ প্রমাদ্য নরকং তেভ্যো নিবেত্ন পুত্র-প্রাণরক্ষাং কুরু ইতি ভাবঃ।

ভগবন্তজিস্কৃত্য তৎপ্রসাদাঙ্গবোধতঃ।

সুখং বন্ধবিমুক্তিঃ স্মাদিত্তি গীতার্থসংগ্রহঃ।

তথা হি “পুরুষঃ স পরঃ পার্শ্ব ভক্ত্যা লভ্যত্বেনন্তরা,” “ভক্ত্যা অনন্তরা শক্য অহমেবং-বিশোধজ্ঞান”—ইত্যাদৌ ভগবন্তভক্তেঃ মোক্ষং প্রতি সাধকতমত্বপ্রবণাং তদেকান্তভক্তিরেব তৎপ্রসাদোক্তজ্ঞানবাস্তবব্যাপারমাত্রজ্ঞান মোক্ষহেতুরিতি স্মৃষ্টং প্রতীয়তে। জ্ঞানস্ত চ ভক্ত্যবাস্তবব্যাপারত্বমেব যুক্তম্।

“তেষাং সত্যতত্ত্বজ্ঞানং ভক্ততাং প্রীতিপূর্বকম্।

দ্ব্যমি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযাস্তি তে।

মন্তস্ত এতদ্বিজ্ঞায় মন্তাবারোপপত্ততে।”

ইত্যাদি বচনাং। ন চ জ্ঞানমেব ভক্তিরিতি যুক্তং,

“সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মন্তস্তিং লভতে পরাম্।

ভক্ত্যা মামভিজ্ঞানান্তি যাবান্ বশ্যাস্মি তত্ত্বতঃ।”

ইত্যাদৌ ভেদদর্শনাং। ন চৈবং সতি “তমেব বিদিত্বা অতিযুক্ত্যমেতি নাত্যঃ পথা বিদ্যতেহয়নার” ইতি প্রতিবিরোধঃ শঙ্কনীয়ঃ, ভক্ত্যবাস্তব ব্যাপারত্বাং জ্ঞানস্ত। ন হি কাঠৈঃ পচতি ইত্যুক্তে জ্ঞানানাম্ অসাধনত্বম্ উক্তং ভবতি। কিঞ্চ—

“বস্ত্র দেবে পরা ভক্তির্বা দেবে তথা গুরো।

তস্ত্রৈতে কথিতা হৃথ্যাঃ প্রকাশস্তে মহাত্মনঃ।”

“দেহান্তে দেবঃ পরঃ ব্রহ্ম তারকং ব্যাচষ্টে” “যমেবৈব বৃণতে তেন লভ্যঃ” ইত্যাদি প্রতি-পূরণবচনানি, এবং সতি সমঞ্জসানি ভবন্তি, তস্মাৎ ভক্তিরেব মোক্ষহেতুরিতি সিদ্ধম্।

তেনৈব দত্তয়া মত্যা তদগীতাবিরূতিঃ কৃত্য।

স এব পরমানন্দন্তরা প্রীণাতু মাধবঃ।

পরমানন্দ প্রীপাদ-রজঃ প্রীধাবিগাধুনা।

প্রীধরস্বামিযতিনা কৃত্য গীতা-স্ববোধিনী।

স্ব প্রাগল্ভ্যবলাঘিলোভ্য ভগবদ্গীতাং তদন্তর্গতং

তত্ত্বং প্রোক্ষ্য কুর্নৈপতি কিং গুরুকৃপাপীযুঃ দৃষ্টিং বিনা।

অণু স্বাভলিনা নিবস্ত্র জলধেরাদিসুসুস্তম্বী

নাবর্ন্তেবু ন কিং নিমজ্জতি জনঃ সংকর্ণধারং বিনা। ১৮

ইতি শ্রীপ্রীধরস্বামিকৃত্যায়ং ভগবদ্গীতাটীকায়াং স্ববোধিতাং

পরমার্থনির্ণয়ো নামাষ্টাদশোহধ্যায়ঃ।

বঙ্গানুবাদ। [অতএব তুমি (ধৃতরাষ্ট্র) পুত্রগণের পক্ষে রাজ্যাদি লাভের আশঙ্কা পরিচয় কর, এই আশয়ে বলিতেছেন]—যাহাদের পক্ষে যোগেশ্বর কৃষ্ণ আছেন, এবং যেখানে গাভী-ধরকৃষ্ণ পার্শ্ব, সেখানেই রাজলক্ষী, সেখানেই বিজয় আর সেখানেই

উত্তরোত্তর অভিবৃদ্ধি, নীতি বা জ্ঞান বিচারও সেইখানে। অর্থাৎ শব্দের অর্থ নিশ্চিন্তা। (ইহার সহিত শ্রী, বিজয় প্রভৃতি সকলের অর্থ)। ইহাই আমার নিশ্চয়। অতএব এখনও পুত্রগণসহ তুমি শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়া পাণ্ডবদিগকে প্রসন্ন করতঃ এবং সর্বত্র তাহাদিগকে অর্পণ করিয়া পুত্রগণের প্রাণরক্ষা কর—ইহাই তাৎপর্য।

ভগবদ্ভক্তিসমূহের ঈশ্বর প্রসাদলব্ধ আত্মজ্ঞানবশতঃ সুখে বন্ধ-বিমুক্তি হয়—ইহাই গীতার সারসংগ্রহ। ভক্তির মুক্তিসাধকত্ব বিষয়ে প্রমাণ এই—“হে পার্শ্ব, একান্ত ভক্তিঘারা সেই পুরুষ লভ্য হন”। “হে অর্জুন, একান্ত ভক্তি ঘারা এইরূপ আমি জ্ঞাত ও দৃষ্ট হই”—ইত্যাদি প্রমাণ দ্বারা ভগবদ্ভক্তির মোক্ষসাধকত্ব প্রত্ন হইয়া বলিয়া সেই একান্ত ভক্তিই মৎপ্রসাদজনিত তত্ত্বজ্ঞানরূপ যে অবাস্তব ব্যাপার তাহার সহিত যুক্ত হইয়া মোক্ষের হেতু হয়—ইহাই স্পষ্টতঃ প্রতীত হইল। (তত্ত্বজ্ঞানের যে অবাস্তব ব্যাপারতা) সে বিষয়েও ১০।১০ শ্লোকে—“সত্যতত্ত্ব জ্ঞানং প্রীতিপূর্বক ভজনকারীদিগকে সেই বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যাহার দ্বারা তাহারা আমাকে পায়” এবং ১৩।১০ শ্লোকে “আমার ভক্ত ইহা জানিয়া মন্তাব প্রাপ্তির যোগ্য হয়”—ইত্যাদি বচন হইতে প্রমাণিত হইতেছে—জ্ঞান ভক্তির অবাস্তব ব্যাপার। আর জ্ঞানই ভক্তি ইহাও যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ—“সর্বভূতে সমদর্শী ব্যক্তি আমার উপর ভক্তি লাভ করেন” এবং তৎপরবর্তী শ্লোকে—“ভক্তির দ্বারা আমাকে বিশেষরূপে জানেন”—এই শ্লোক দুইটি দ্বারা ভক্তি ও জ্ঞানের ভেদ নির্দেশ করিতেছেন। আর এরূপ হইলে তাহাকে জানিবার পর মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, মুক্তির অন্ত উপায় নাই”—এই প্রতিবাক্যের সহিত বিরোধ হইল এইরূপ আশঙ্কা করা যায় কি? না। যেহেতু জ্ঞান ভক্তির অবাস্তব ব্যাপার। যেমন “কাঠৈঃ পচতি”—কাঠ দ্বারা পাক করে এই কথা বলিলে অসাধনত্ব উক্ত হইল না, অগ্নিও কাঠের দ্বারা বেকরূপ সাধন হইয়া থাকে, জ্ঞানও সেইরূপ সাধন। এইজন্যই “যাহার দেবতাতে পরা ভক্তি এবং যেমন দেবতাতে সেইরূপ গুরুত্ব, সেই মহাত্মার নিকটেই এই সকল কথিত তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশিত হয়।” আর “দেহান্ত হইলে দেবতা (ইষ্টদেব) তারক ব্রহ্মের উপদেশ করেন” এবং “যাহাকে এই ভগবান্ কৃপা করেন তৎকর্তৃকই তিনি লভ্য হন”—ইত্যাদি প্রতি-স্মৃতি ও পূরণের বাক্যগুলির সামঞ্জস্য হয়, অতএব ভক্তিই যে মোক্ষের হেতু ইহা সিদ্ধ হইল।

তাঁহারই প্রদত্ত বুদ্ধি দ্বারা তাঁহার গীতার বিবৃতি (স্ববোধিনী টীকা) করা হইল, এতদ্বারা পরমানন্দ মাধব প্রীত হউন।

সেই পরমানন্দের প্রীপাদরূপের শোভাধারী প্রীধরস্বামী যতি কর্তৃক এই স্ববোধিনী টীকা অধুনা সম্পন্ন হইল।

নিজের প্রাগল্ভ্য বলে ভগবদ্গীতা আলোড়ন করিয়া ওড়লাভেজু ব্যক্তি কি গুরুকৃপারূপ অমৃতবৃষ্টি ব্যতিরেকে তদন্তর্গত তত্ত্ব লাভ করিতে পারে? যেমন নিজ অঙ্গলি দ্বারা সমুদ্রজল

আলোড়ন করিয়া জলমধ্যস্থ মণিগ্রহণেচ্ছ ব্যক্তি কি সংকর্ণতার ব্যতীত আবর্ত মধ্যে ডুবিয়া যায় না ? সেইরূপ গুরুরূপা না পাইলে গীতাতত্ত্ব জানা যায় না ॥ ৭৮

ইতি ভগবদগীতার সুবোধিনী টীকার বঙ্গানুবাদ পরিসমাপ্ত ।

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—কৃষ্ণ যে দিকে সে দিকে জন্ম অর্থাৎ কুটস্থেরই জন্ম।—অর্থাৎ মানুষ যতই দেহভাবে মত্ত থাকিয়া তাঁহাকে ভুলিয়া থাকুক, একদিন দেহাতীত কুটস্থ চৈতন্তের প্রতি নজর পড়িবেই। সেদিন আসিবেই যেদিন সব ভুলিয়া, প্রকৃতির সুদৃঢ়-বেষ্টনী উল্লঙ্ঘন করিয়া জীব পরমাত্মার সন্নিধানে তাঁহার চরণ প্রান্তে আসিয়া মিলিত হইবেই। সেই সাধু ক্রিয়াবানেরা বাহ্যের বজ্রস্তম প্রাক্কীর্ণ হইয়া সত্ত্বগুণ যথেষ্ট বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে—তাঁহারা একদিন গুণাতীত অবস্থায় পৌঁছিতে পারিবেন—অতএব হে ক্রিয়াবানগণ, গুণবিক্ষণী এই ক্রিয়াযোগের অস্থিষ্ঠানের দ্বারা পরমপথে প্রতিষ্ঠিত হও ও নিজ জীবন সফল কর।

এই পরমানন্দের সংবাদ যে সকল মহাপুরুষেরা চারিদিকে বিকীর্ণ করিতেছেন—সেই সকল হতভাগ-আত্মজ পুরুষেরা, ও যে মহাপুরুষ এই পথের দীপবর্ত্তিকা হস্তে অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া জগৎজীবের কল্যাণ করিয়াছেন সেই যোগীস্বর পুরুষ জয়ন্ত হউন ॥ ৭৮

ইতি শ্রীমাচরণ-আধ্যাত্মিকদীপিকা নামক গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সমাপ্ত ।

শ্রীগুরুপদ তবলা ॥

অষ্টাদশ অধ্যায় ও সমস্ত গীতার সারাংশ

ভক্তি বা শ্রদ্ধা না হইলে যোগাত্ম্যসাধিতে প্রযত্নই হয় না। যোগাত্ম্যসাধনে প্রবৃত্ত পুরুষেরই প্রাণ, মন, বুদ্ধি স্থির হয়, এবং এই স্থির মনেই আত্মাকে সর্কাপেক্ষা আপনার বা প্রিয়তম বলিয়া মনে হয়। ভগবান বা আত্মা ব্যতীত আমার অস্তিত্বই নাই—ভক্তি দ্বারা এই ধারণাই দৃঢ় হয়। আমার প্রভুই সর্বভূতে অধিষ্ঠিত এইরূপ ধারণার কালেই বিশ্বের সর্ব পদার্থে তাঁহাকে ধারণা করা সম্ভব হয়, এইরূপে ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন হইলে পৃথক্ ভাবে জগৎ বস্তুর জ্ঞান বা দেহাধিতে আর তেমন আসক্তি থাকিতে পারে না। এই অবস্থাতেই সাধকের সর্ববিষয়ে নিলিপ্ততার উদয় হয়। এই নিলিপ্ত-ভাব হইতেই জ্ঞানের উজ্জ্বল বৃদ্ধি হয় এবং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে হইতে জ্ঞানের চরম উৎকর্ষতা লাভ হয়, পরে স্বরূপে অবস্থান হয়। যোগাত্ম্যসাধ দ্বারা সাধক যোগ-বলে বিভূষিত হন এবং যোগ-বলে সাধকের অসামান্য দিব্যদৃষ্টি লাভ হয়, সেই দিব্যদৃষ্টি হইতেই বিস্তৃত জ্ঞানের উদয় হয় এবং তাহাতেই পরম পুরুষের সাক্ষাৎকার হয়। এই পুরুষ-দর্শন ব্যতীত আত্মতাবনা (নিজের সম্বন্ধে বহুবিধ জ্ঞানা) নিবৃত্ত হয় না। পুরুষ জ্ঞান হইলে ভগবান বাহুদেবের মায়াজড়িত প্রকৃত স্বরূপ অবগত হওয়া যায় এবং জীবও যে ভগবানের সহিত অতেন্দ্র ভাবে সম্বন্ধে জ্ঞানও সাধকের হইয়া থাকে, এবং এই জ্ঞান দ্বারাই বিশ্বের পরম পদ লাভ হয়। ভাগবতে শ্রীনারদ বলিতেছেন—

“যেনৈবাহং ভগবতো বাহুদেবত্বং বেদমঃ।

মাদ্ভাস্তাবমবিধং যেন গচ্ছন্তি তৎপরম্ ॥”

যে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বিশ্বব্যাপী বাহুদেবের মাদ্ভাস্তাব বৃত্তিতে পারিলাম, এবং সেই জ্ঞানদ্বারাই বিশ্বের পরম পদ সাক্ষাৎ করা যায়। কিন্তু যতদিন মাদ্ভাস্তাব উপরতা না হন ততদিন জীব নিজেকে সম্পন্ন মনে করিতে পারেনা। মাদ্ভাস্তাব হইলে সাধক বৃত্তিতে পারেন কিরূপে ভগবানের অচিন্ত্য মায়াজড়িত প্রভাবে পুরুষ হইতে কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহের প্রকৃতির আবির্ভাব ও তাহার ক্রমবিকাশ হয়। গুণত্রয়েরই বিবিধ সাযোগ্য হইতে এই অনন্ত রূপময় জগৎ প্রস্তুত হয়, তাহা বাস্তবিক একে এই দিব্যপরিগ্রাম মাত্র, এবং গুণত্রয়ের কার্য-পরম্পরা হইতে এই সব বিবিধ বৃত্তবস্ত্র ও পৃথক্ ভাবাদির অস্তিত্ব হয়। সকলের মূল সেই একটি বস্তুই এবং সেই এক হইতে সমস্ত বস্তু অস্তিত্ব। যতদিন সকলের মূল-স্বরূপ এই একে পৌছিতে পারা না যায়, ততদিন নামান্ব দর্শন নষ্ট হয় না। নামান্ব দর্শনই অজ্ঞানের নামান্তর। ভ্রমি বলিয়াছেন—

“যদেবেহ তদমৃতং যদমৃতং তদবিদ্যং।

যতোঃ স যত্নামোতি ব ইহ নানের পততি ॥” কঠোপনিষৎ

যে আত্ম-চৈতন্ত এই দেহ-পুর মধ্যে প্রকাশিত, সেই আত্মাই আবার অমৃত অর্থাৎ প্রকৃত জড় অতীত অবস্থায় রহিয়াছেন, আবার বেত্র-চৈতন্ত মাদ্ভাস্তাব ভাবে বিবাক করিতেছেন—সেই

চৈতন্যই এই দেহের মধ্যে রহিয়াছেন। যে ব্যক্তি এই ব্রহ্ম-চৈতন্যে পৃথক পৃথক ভাব, অর্থাৎ অন্তঃকরণের বা দেহের ভিন্নতা বশতঃ দেখিতে আসে ও ব্রহ্মের ভিন্নতা দর্শন করে, সে ব্যক্তি মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ তাহাকে পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর অধীন হইতে হয়।

গুণত্রয় হইতে জীবের নানান দর্শন হয়। ইন্দ্রিয় সকল প্রকৃতিরই গুণ, ইহার সর্বদা বাহ্য পদার্থ দর্শী, অন্তরায়াকে ইহার বুদ্ধিতেই পারে না, সুতরাং বহির্দৃষ্টি হইতে ইহারে এতদূর জড়তা আসিয়া যায় যে, ইহার স্থূল জড়ভাব ব্যতীত অন্য কিছু যে রহিয়াছে, তাহা বুদ্ধিতেই পারে না। প্রকৃতিজাত ইন্দ্রিয়গুলির সেবা করিয়া জীবেরও এই জড়তা বহুমূল হইয়া যায় এবং তাহার আন্তর জ্ঞানকে আচ্ছাদন করিয়া ফেলে। ইহারে কবল হইতে পরিভ্রাণ লাভের জন্য জ্ঞানী ব্যক্তির আপনাদের প্রকৃতি মধ্যে বাহ্যতে সমগুণ অধিক পরিমাণে স্মৃতি হয়, তজ্জন্ম বিশেষ চেষ্টা করিয়া থাকেন, শাস্ত্রেও তজ্জন্ম বহুবিধ নিয়ম নির্দিষ্ট হইয়াছে। ব্রহ্মসমোপগ-জনিত আবরণ ও বিক্ষেপ এত অধিক হয় যে, স্বরূপ দর্শন করা অসম্ভব হয়। সমুগুণও আবরণ বটে, কিন্তু তাহা এত অল্প যে, তাহাতে স্বরূপ দর্শনের বিষয় উৎপন্ন করে না। স্বরূপ দর্শন হইলেই অজ্ঞান, জড়তা, প্রমাদ প্রভৃতি তমোভাব এবং লোভ-কর্ষণ-বিষম্পৃহা প্রভৃতি রজোভাব সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়া থাকে। যে আত্ম-চৈতন্য সর্বব্যাপী, তাহাকেও এই ব্রহ্মসমোভাব বিদূরিত না হইলে কিছুতেই বুদ্ধিতে পায় না। এই ব্রহ্মসমোভাবকে সম্পূর্ণ বিদূরিত করিবার জন্য জ্ঞানীর নিজাম ভাবে বা ভগবদর্পিতচিহ্নে কর্তব্য আবশ্যক বলিয়া মনে করেন। ক্রিয়াভ্যাসই সর্বাংগে উৎকৃষ্ট নিজাম কর্তব্য। এই ক্রিয়ারূপ নিজাম সাধনা হইতেই পরাবস্থারূপ জ্ঞানে স্থিতিলাভ হয়। এই পরিস্থিতি সূর্যকালব্যাপী হইলেই সাধককে জীবমুক্ত করিয়া দেয়। যোগাভ্যাসরূপ উপায় দ্বারা ইহা সাধ্য। ব্রহ্মসমের বহুলতাই বিশুদ্ধ সত্ত্বের আবরণ। যখন বুদ্ধি সত্ত্বরজগুণ দ্বারা আর অভিভূত হয় না, তখনই বৈশাখী-সমাপ্তির উদয় হয়। এতদ্বারায় যোগীর আত্মসাক্ষ্যকারজনিত অধ্যাত্ম-প্রসাদ লাভ হয়। ইহাকেই ঋতুভরা প্রজ্ঞা বলে, এ প্রজ্ঞার মিথ্যার লেশ মাত্র থাকে না। যেমন নদী উত্তীর্ণ হইলে আর তরঙ্গের আবশ্যকতা থাকে না, তজ্জন্ম ক্রিয়ার পর-অবস্থায় জ্ঞেয়-পরমাশ্রয় সহিত নিজ-আশ্রয় অভিন্নতা প্রত্যক্ষীকৃত হইলে তখন আর ক্রিয়া-সাধনের আবশ্যকতা থাকে না। তাহার পূর্বে ক্রিয়া ত্যাগ অত্যন্ত অনিষ্টকর। এই কথাই গীতার ভগবান্ ক্রীষ্ণ অর্জুনকে বহু প্রকারে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। “ন ধত্তে প্রাপ্তস্ত সখ্যায় দেবাঃ” (ঋক্ বেদঃ)—সাধনার পরিশ্রমে যতদিন আপনাকে পরিশ্রান্ত করা না যায়, ততদিন দেবতারও কোন সাহায্য করেন না।

এই অষ্টাদশ অধ্যায়ই গীতার সার-সংক্ষেপ। ইহার আলোচনার বুঝা যায় মানুষ সাধনার সিদ্ধিলাভ করিলে আত্ম-সাক্ষ্যকার লাভ করে। ইহা কিরূপে লাভ করিতে হইবে তাহাই ভগবান্ ১৮শ অধ্যায়ে ৫০ হইতে ৫৪ শ্লোকে অর্জুনকে বুঝাইয়াছেন। প্রথমতঃ স্বকর্ণের দ্বারা দৈব-আবাধনায় বৃত্ত হইলে ভগবদ্রূপায় সাধকের সর্বকর্তৃত্ব ত্যাগ হয়। কারণ ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর-অবস্থায় সাধকের যখন স্থিতি হইতে থাকে, তখন তাহারই প্রসাদে অন্তঃকরণ

শুদ্ধ হইয়া থাকে, আর বিষয়-বাসনার চিত্ত উৎক্লিষ্ট হয় না। চিত্তশুদ্ধিই জ্ঞানোৎপত্তির যোগ্যতা প্রমাণ করে। ক্রিয়ার পর-অবস্থায় বাহার বস্তুত্ব স্থিতি হয়, তাহার সে পরিমাণে জ্ঞানোদয় হয়। ব্রহ্ম প্রাপ্তি বা নিঃশেষরূপে ক্রিয়ার পর অবস্থায় স্থিতিই এই সাধনামুষ্ঠানের বা ক্রিয়ার সার্বোৎকৃষ্ট পরিসমাপ্তি। তজ্জন্ম সাধককে করিতে হইবে—(১) কায়মনোবাক্যে ন্যম (২) লঘু আহার (৩) নির্জন স্থানে বাস বা জনসঙ্ঘ ত্যাগ (৪) দর্প, ক্রোধ ও পরপীড়া-বর্জন এবং নিবহকার হইয়া সর্বদা যোগাভ্যাসে লাগিয়া থাকা অর্থাৎ ধ্যান-ধারণার অভ্যাস করা—তাহা হইলে চিত্ত মমতারহিত হইবে ও শান্ত হইবে—এইরূপে যোগী ব্রহ্মসাক্ষ্যকারের সামর্থ্য লাভ করিবেন।

ব্রহ্মভূত যোগীর কি কি লক্ষণ হুটয়া উঠে তাহাই ৫৫ শ্লোকে বলিয়াছেন—

“ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যচ্চাংখ্য তত্ততঃ।

ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥”

পরাক্রান্ত দ্বারা আমি যে অবগতানন্দ বৈতরহিত ব্রহ্ম তাহার সাক্ষ্যকার হয়। পরে প্রারম্ভ কর্ত্ত্বের অবসানে (অজ্ঞান কার্য্য দেহাদির নিবৃত্তির নদে নদে) ঘট-নাশের সহিত-যেমন ঘটাকাশ মহাকাশের সহিত এক হইয়া যায় তজ্জন্ম উপাধি বিনির্মূল্য সাধক আত্মাকারেই স্থিতিলাভ করেন। দর্পণ ভঙ্গ হইলে প্রতিবিম্ব যেমন থাকে না, সেইরূপ আত্মাকারে স্থিত সাধকের সর্বোপাধির ক্ষয় হইয়া যায়।

প্রত্যাধিক ক্রিয়া করিতে করিতে মন যখন বিক্ষেপশূন্য হইয়া স্থির হয়, তখন চিত্তাকাশের সমস্ত মল বিদৌত হইয়া যায়, আর দ্বিতীয় কিছু সত্তার চিহ্ন পর্যন্ত থাকে না, সমস্ত তত্ত্বই তখন তত্ত্বাতীত অবস্থায় বিলীন হইয়া যায়, তখনই নিজের স্বরূপ সত্তার প্রকৃত জ্ঞান হয়। এই জ্ঞান হওয়ার পর জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞানের আর পৃথক বোধ থাকে না, সমস্তই তখন ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যায়। “আমি” যে কি তাহা জানিয়া জ্ঞাতা-আমি জ্ঞেয়-আমিতে লয় হইয়া যায়। উহাই বৈতরহিত শূন্য চিদ্ব্যনানন্দরূপ আত্মপ্রত্যয়, বাহ্য ক্রিয়ার পর অবস্থায় বুদ্ধিতে পায়। গীতার বলা হইয়াছে—

চিত্তরূপ যন্ত্রে ভাবনাময় যে সমস্ত কর্ত্তব্য বহিয়াছে, তাহার ক্ষয় হইতেছে দৈবরূপ, —ইহা জানিতে পারিলেই জীবের কর্ত্তব্য নষ্ট হয়। যতদিন আমি কর্ত্তব্য করিতেছি এই ধারণা থাকে, ততদিন সে কর্ত্তব্যের শুভাশুভ ফল আমাকেই ভোগ করিতে হয়, যখন বুদ্ধিতে পারিলাম আমার কর্ত্তব্য নাই, তখন কর্ত্তব্যের নাশ হইয়া গেল, তখন আর কর্ত্তব্য আমাকে ছড়াইতে পারিবে না। কর্ত্তব্য কেন যে হয় এবং কেনই বা দৈবকে সকল কর্ত্তব্যের কর্ত্তা বা মালিক বলে তাহা ক্রিয়ার পর-অবস্থায় জ্ঞেয়ে স্থিতি হইলেই বুদ্ধিতে পায়। এইজন্য—

“চেতসা সর্বকর্ষণাণি ময়ি সংশ্রুত মৎপরঃ।

বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্ছিত্তঃ সততং ভব ॥”

যে “মৎপরঃ” অর্থাৎ সর্বদা আত্মাতে থাকে, তাহার মনে হয় সব কর্ত্তব্য ব্রহ্মই করিতেছেন, ইহা জানিতে পায়। বুদ্ধিযোগ আশ্রয় করিলে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর-অবস্থায় স্থিতি হইলে বুদ্ধিযোগ

মুক্ত)। যোগী আপনাতাই আপনি থাকেন অথচ সকল কর্তাই হইয়া যায়। “শক্তি” হইতে পারিলে সে চিন্তে আর সংসারবীজ থাকে না, সুতরাং জন্ম-মাতায়াত বা পুনঃ পুনঃ বেহাঙ্গরূপে অশেষ জর্গতির শেষ হয়।

এই অবস্থা প্রাপ্তির জন্য সর্বভূতস্থিত ঈশ্বরের শরণাগত হইতে হইবে। ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম—এইগুলিই তো সর্বভূত; ইহাদের স্থান যেহেতু মেরুদণ্ড মধ্যে যথাক্রমে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপূর, অনাহত ও বিশুদ্ধাধ্য চক্র। সাধনকালে সাধককে এই পথ দিয়াই আনা-গোনা করিতে হয়। কিন্তু ঈশ্বর বা পরমাশ্রয়ী সর্বভূতের স্বদেশে বা চক্রগুলির ঠিক কেন্দ্র মধ্যে অবস্থিত। প্রতি চক্রের ক্রিয়া সেই কেন্দ্রমধ্যস্থ শক্তির প্রেরণা। তাহাতেই আমাধেব ভূম্যাদি পদার্থ নিচয়ের জ্ঞান হইতেছে। এই জ্ঞানের দ্বারাই চিত্ত বহির্গত হয়। কিন্তু মূলাধারাদি পঞ্চচক্রের মধ্যে ব্রহ্মাকাশ (হৃদয়ার মধ্যে বজ্রা, বজ্রার মধ্যে চিত্রা এবং চিত্রার মধ্যে ব্রহ্মাকাশ) রহিয়াছে, উহাই ঈশ্বর। উহারই শাসনে চক্রমধ্যস্থ তত্ত্বগুলি স্ব স্ব কার্য নিরন্তর ভাবে করিয়া যাইতেছে, বতস্পর্শ ক্রিয়া দ্বারা সেই চক্রের কেন্দ্রভূত ব্রহ্মনাড়ীর মধ্যে চিত্ত প্রবেশনা করে, ততক্ষণ ঈশ্বরের শরণ গ্রহণ হয় না, এইরূপ শরণ গ্রহণ যে করে সেই জাগ্রতবান ক্রিয়াবান, তাহারই ঈশ্বর প্রসাদে পরম শান্তি লাভ হইয়া থাকে।

প্রশ্ন আনিতে পারে—পূর্য্যধার যেমন যন্ত্রদ্বারা পুস্তলিকাদিগকে যথেষ্ট জীড়া করায়, ঈশ্বরও তজ্জপ সর্বজীবের হৃদয়ে অগ্নিষ্ঠিত থাকিয়া মায়া দ্বারা সংসারস্থ জীবসমূহকে স্ব স্ব কার্যে প্রেরণা দিয়া থাকেন, জীবের স্বাতন্ত্র্য নাই—এ কথা শুনিতে ভয় হইবার কথা, কারণ তাহা হইলে মুক্তিসাধনের চেষ্টা জীবের পক্ষে এক বিপুল ব্যর্থতা এবং সমস্ত শাস্ত্রব্যাক্যেরও কোন মূল্য থাকে না। ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, আত্মা স্বয়ং প্রকৃতি-পরবশ নহেন, তিনি মুক্ত ও সধা স্বাধীন। তিনি মুক্ত বলিয়াই চিত্তের প্রতিবিম্ব যে জীব, তাহারও মুক্তি-ইচ্ছা স্বাভাবিক, সেইজন্য প্রকৃতি যতই প্রবল হউক, জীবকে আত্মমুদ্রাকান হইতে বিমুক্ত করিতে পারে না। কারণ আত্মাই জীবাত্মার প্রাণ, এবং এই নিজ প্রাণ হইতে জীব কখনও বিমুক্ত হইবারও নহে; তবে মায়াবশ হইয়া বেহেস্তিরের প্রতি বদ্ধদৃষ্টি হওয়ার জীব আপন স্বরূপকে বিমূর্ত হইয়া গিয়াছে। সে অবস্থাতেও জীব ও পরমাশ্রয়ী পরস্পর এক ও অস্তিত্ব। জীব প্রকৃতি-পরবশ সত্য, কিন্তু জীবকে মুক্ত করিবার প্রেরণা প্রকৃতিও যেমন ঈশ্বর হইতে পাইয়া থাকে, আবার প্রকৃতির বশত বিচূর্ণ করিয়া তাহা হইতে মুক্ত হইবার প্রেরণাও জীব ঈশ্বর হইতেই পাইয়া থাকে। ঈশ্বরের এক দিকটো যেমন জন্মমৃত্যু তদ্বৎসীল, সধা অচ্যুত ও মুক্ত, বহির্দিকটো আবার তেমনই জন্ম-মৃত্যু হৃৎ-হৃৎ-ধ্বনি উভাল ও বহোচ্ছ্বাসে সধা স্পন্দিত ও বিতীষিকাময়ী। জীব অজ্ঞানবশতঃ স্বতঃনি বহির্দৃষ্টিসম্পন্ন থাকে ততদিন সে প্রকৃতিপরবশ থাকে, ততদিন কলের পুতুলের মত প্রকৃতির আদেশ মান করিতে বাধ্য হয়, ততদিন কিছুতেই সে প্রকৃতিকে উপেক্ষা করিতে পারে না। প্রকৃতিব এ প্রেরণাও ভগবদ্বক্তা-সুতরাং যে সর্বকোভাবে ভগবানের শরণ গ্রহণ করে, সেই ভক্ত যোগীর ঈশ্বর-প্রসাদেই সংসারবন্ধন মোচন হইতে পারে। একজন ঈশ্বরকেও বেগ পাইতে

হয় না এবং তাঁহার কোন সঙ্কল্প করাও আবশ্যক হয় না। সমুদ্রের নিকটে উপনীত হইতে পারিলে যৌতুভক্ত ব্যক্তি যেমন সমুদ্রের স্বাভাবিক স্রব্দ বায়ু দ্বারা স্রব্দিত হয়, তজ্জপ ভগবানের নিকট যে পৌঁছিতে পারে, ঈশ্বরে স্থিত স্বতঃসিদ্ধ শান্তিও তজ্জপ ভক্ত সাধককে সংসার তাপ হইতে বিমুক্ত করিয়া দেয়, এবং ভগবানেরও একজন কোন সঙ্কল্প করিতে হয় না। তাহার প্রমাণ—যোগী যখন ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর-অবস্থায় উপনীত হন, তখন তিনিও সেইরূপ শান্তিলাভ করিয়া পরিভূত হন, বাসনা-সঙ্কল্প তাঁহারও তখন থাকে না। ক্রিয়ার পরাবস্থার ঘনীভূত স্বরূপই মননমোহন শ্রীমদ্ভক্তের রূপ। এই পরাবস্থায় যে তৃপ্তি, যে আনন্দ, সে আনন্দ আর কিছুতে পাইবার সম্ভব নহে—উহা সত্যই সাক্ষাৎ মননময়। উহাই পুরুষোত্তম নারায়ণের নিত্য শাস্ত মুক্তি, সুতরাং উহা মোক্ষ ও নিত্য অধিষ্ঠিত আনন্দের একমাত্র আশ্রয়।

যিনি অধিষ্ঠানরূপে এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছেন, তাঁহাকে অবিনাশী বলিয়া জানিবে। দেহী কূটস্থ ও নিত্য, শরীর নষ্ট হইলেও কূটস্থ নষ্ট হন না। তিনি অচ্ছেদ্য, অমায়,

অক্লান্ত ও অশোক, ইনি নিত্য সর্বব্যাপী, রূপান্তর শূন্য এবং অনাদি। ইনি চক্ষুরাধি ইন্দ্রিয়ের অগোচর, কণ্ঠস্থিরেরও

অগোচর এবং মনেরও অগোচর, এই কূটস্থ দেহীই ব্রহ্মস্বরূপ,

তিনি যেমন তেমনই আছেন ও থাকেন, এই দেহটীরই যৌবন-করাদি বিবিধ অবস্থান্তর প্রাপ্তি হয়। যাহার এই কূটস্থ ব্রহ্মে বুদ্ধি স্থির হইয়াছে, তিনি এই সকল বিকার দেখিয়া মুগ্ধ হন না। পঞ্চ ভূতাত্মেরই ব্যক্তভাব এই শরীর। ইহাই ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম পঞ্চ দৃশ্য-ভূতের সমষ্টি। মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপূর, অনাহত ও বিশুদ্ধাধ্য চক্র ইহাই ভূতপঞ্চকের জীলাহুল। প্রণবাত্মা দেহই অকার, উকার, মকার ও নাহ বিন্দুর অধিষ্ঠান। এই সকলের অতীতই কূটস্থ ব্রহ্ম, যাহার স্থান আজ্ঞাচক্র, ঐখানে যখন বায়ু স্থির হয়, তখন উহা যেমাত্রা-বহিত শব্দাতীত ও নাহ বিন্দু কলাতীত—তাহা সাধকেরা বুঝিতে পারেন। মাত্রাস্পর্শ-বোধ হয় বায়ুর চাক্ষুশ্য হেতু, ক্রিয়া দ্বারা যখন সেই বায়ু স্থির হয়, তখন ইন্দ্রিয়ের সহিত ইন্দ্রিয়-বিষয়ের সংযোগ ছিন্ন হয়। মাত্রাস্পর্শ বর্তমান থাকিতে স্বর্ষ-দুঃখাদি ধ্বংসহিত হওয়া যায় না। যখন মাত্রাস্পর্শ বর্জিত হইতে পারা যায়, তখন স্বর্ষ-দুঃখের স্পর্শও থাকে না। তখন এক পরমানন্দ অবস্থার সাক্ষাৎ হয়, তখন মন মত্ত মধুকরের নেশায় ভৌ হইয়া বলিয়া থাকে। বেদাদি শাস্ত্রে উহারই বর্ণনা আছে। উত্তমপুরুষ তিনি সকলের অতীত, বায়ু সর্বদা স্থির হইলেই উহা অসুভব হয়। যতদূরে যেমন কোন ব্যথা অসুভব হয় না, যাহার বায়ু স্থির হইয়া যায় তাহারও তেমনই কোন ব্যথা অসুভব হয় না। কূটস্থের কোন ব্যথা নাই, কারণ উহা স্থির অথচ অমর। এই উকাররূপ শরীরে প্রচ্ছদন-বিধারণ যে না করে সে স্বভাবস্বরূপ স্থিরপদ বা ব্রহ্মপদকে জানিতে পারে না। স্থিরপদ জানিতে না পারাই অজ্ঞান, এই অজ্ঞান যাহার যত, তাহার ক্রেশভোগও ততই অনিবার্য।

গীতার কর্তব্য, পুরুষোত্তম যোগ, নৈবাস্তব-সম্পদ, সম্যক ও ত্যাগেরও বিষয় আলোচিত হইয়াছে, ঐগুলিই গীতার বিশেষত্ব।

এই কর্তৃত্ব এখন আলোচনা করিয়া দেখা যাক। জীবের কর্তৃই দেহাদিরূপে পরিণাম লাভ করে, এজন্য ১৮শ অধ্যায়ে ভগবান্ কর্তৃত্ব বিশেষ-গীতার বিশেষ (১) কর্তৃত্ব ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। প্রথমতঃ অষ্টম অধ্যায়ে অর্জুনের প্রশ্নে কর্তৃ কি, তাহার উত্তরে ভগবান্ বলিয়াছেন :-

“ভূতভাবোত্তবকরো বিসর্গঃ কর্তৃসংজ্ঞিতঃ”—

জীবের মধ্যে যে বহুশক্তি বর্তমান রহিয়াছে, তাহার বিকাশসাধন এবং তাহা দেবোদ্দেশে ত্যাগ করার নামই কর্তৃ। দেবোদ্দেশে ত্যাগ করিতে না পারিলেও কর্তৃ হয়, কিন্তু তাহা বাহ্যকর্তৃ, তদ্বারা জীবের কেবল বন্ধন হয়; কিন্তু যে কর্তৃ দ্বারা কুটস্থ অকরে মন স্থির থাকে এবং সেই স্থিরতা হইতে যে উত্তম পুরুষের দর্শন হয়, তাহাই আসল আধ্যাত্মিক কর্তৃর উদ্দেশ্য। ‘উহা বিনা ত্যাগে হইবার নহে। মন যদি ভোগাসক্তি লইয়া কর্তৃ করে, তাহা হইলে সে কর্তৃর ফলে আধ্যাত্মিক ভাব জাগিয়া উঠে না। এইজন্য ক্রিয়াসাধনই একমাত্র কর্তৃ, বদ্বারা দৈবী শক্তি প্রবৃত্ত হয়। ইহা তো হইল কর্তৃসাধনের উদ্দেশ্য; এখন কর্তৃ সম্পাদিত হয় কিরূপে—তাহা জানিলে আপনাকে আর কর্তৃর কর্তৃ ভাবিয়া বিভ্রান্ত হইতে হয় না। তাই ভগবান্ বুঝাইলেন—কর্তৃসাধনের জ্ঞান কর্তৃর (১) অধিষ্ঠান—এই দেহ, (২) সদস্য অহঙ্কারই কর্তৃর কর্তৃ, (৩) চক্ষুবাণী ইন্দ্রিয়গুলিই কর্তৃ করিবার করণ বা যন্ত্র (৪) কর্তৃ করিবার জ্ঞান কর্তৃর যে বিবিধ চেষ্টা বাহা দেহমধ্যস্থ প্রাণাপানাদি বায়ুজন্মের দ্বারা হইয়া থাকে, (৫) ইহা ছাড়াও কর্তৃ করিবার জ্ঞান প্রেরণা দিবার কোন অজ্ঞাত শক্তি কাজ করিয়া থাকে, যাহাকে দৈব বলে। কেহ কেহ কর্তৃসাধনের সংস্কারকেই উহার কারণ বলেন, এবং কেহ কেহ উহা জীবের হৃদয়স্থ অন্তর্যামীরই প্রেরণা বলেন, এক কথায় যাহাকে ভগবদ্বিচ্ছা বলে। এই ভগবদ্বিচ্ছাই কর্তৃর মূলীভূত বীজরূপ। কত যন্ত্র-কলাস্তর হইতে কত জগৎধরিয়া জীবমাত্রই এই মূল কারণকে আশ্রয় করিয়া বিচিত্র কর্তৃ-সংস্কার দ্বারা সজ্জ হইয়া থাকে, কাহারও তাহা “না” করিবার উপায় নাই। শ্রীমদ্ভগবতে ব্রহ্মা বলিতেছেন—

“বয়ং ভবন্তে তাত্ত্ব মহর্ষির্বহাম সর্কে বিবশা যন্ত দ্বিষ্টম্।

ন তন্ত কশ্চিৎপসা বিভ্রয়া বা ন বোগবীৰ্য্যেণ মনৌষয়া বা।

নৈবার্ধবর্ধৈঃ পরতঃ স্তোভা বা কুতঃ বিহস্তঃ তদুদ্ভক্তি কৃত্বাৎ ॥

ভবায় নাশায় চ কর্তৃ কর্তৃং শোকায় মোহায় নহা ভয়ায়।

সুখায় দুঃখায় চ দেহবোগমব্যক্তমিষ্টং জনতাৎসহ যন্তে ॥

বধাচি তন্ত্যায় গুণকর্ম্মদামডিঃ সুদুস্তবৈর্বৎস বয়ং সুযোজিতাঃ।

সর্কে বহাম বলিমৌখরায় প্রোতানসীব দ্বিপছে চতুষ্পাৎ ॥”

শিব, নারদ প্রভৃতি আমরা সকলেই তাহার আজ্ঞা বিবশ হইয়া বহন করিতেছি। কোন জীবই বিভ্রা, যোগ বা বুদ্ধি বলে তাহার আদেশ অস্তথা করিতে সমর্থ নহে। হে প্রিয়ব্রত! জীবসমূহ জন্ম-মরণাদি সুখ-দুঃখ ভোগের জ্ঞান ইন্দ্রিয়বৃত্তি দেহাদি ধারণ করে। চতুষ্পাদি

জন্ত যেমন নাসিকায় বদ্ধ হইয়া মস্তকের ইচ্ছায় তাহার কর্তৃ করে আমবাও তেমনই গুণকর্মে বদ্ধ হইয়া ইন্দ্রিয়ের ইচ্ছায় তাহার নিমিত্ত কর্তৃ করিয়া থাকি।

বর্তমানে দেহ ধারণ করিতে হয়, ততদিন এই মহানিষ্কর্তৃ ইন্দ্রিয়-সঙ্কর বা দৈবকে কেহই জ্ঞান করিতে পারে না। এ মূলীভূত বীজের কখনও ধ্বংস নাই। এমন কি জীব মুক্ত হইলেও তাহার প্রকৃতির মধ্যে তখনও এই বীজ বা সংস্কার কর্তৃ করে। তবে মুক্ত হইয়া কি হইল যদি মনে কর, তাহার উত্তর এই যে মুক্ত পুরুষ প্রকৃতি হইতে আপনাকে ভিন্ন মনে করেন, এই জন্য প্রকৃতির কার্যকে কখনও তাহার স্বকর্তৃ বলিয়া ভ্রম করেন না। ভগবান্ তাই বলিয়াছেন—

“যন্ত নাহঙ্করো ভাবো বুদ্ধির্ভক্ত ন লিপ্যতে।

হৃদ্যপি স ইমান্ লোকান্ হন্তি ন নিবধ্যতে ॥”

শরীরাদি কর্তৃর কর্তৃ এইরূপ আলোচনা হেতু বাহার “নাহঙ্করতঃ” অর্থাৎ আমি কর্তৃ এইরূপ ভাব নাই, এবং বাহার বুদ্ধি ইষ্টানিষ্ট কর্তৃ অভিনিবিষ্ট হয় না, সেই আত্মদর্শী পুরুষ লোকদৃষ্টিতে সকল প্রাণীকে হনন করিয়াও হনন কর্তৃর ফলে বদ্ধ হন না।

এইজন্য যেখানে পাওয়া যায়—বশিষ্ঠ-নারদাদিকেও যেমন মুক্তপুরুষ বলা হইয়াছে, তদ্রূপ মহর্ষি জ্ঞান-দুর্গাসাকেও মুক্ত পুরুষ বলা হইয়া থাকে। তাহার সকলেই যে মুক্ত পুরুষ এ বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাদের প্রকৃতির মধ্যে যে বীজ নিহিত ছিল, তাহার কার্য শেষ পর্যন্ত হইয়াছে ও হইবে। বদ্ধ ও মুক্তের পার্থক্য এই—বদ্ধ জীব প্রকৃতির কার্যকে স্বকর্তৃ মনে করিয়া সন্তুষ্ট ও ব্যথিত হয়। মুক্ত পুরুষ সে সকলকে স্বকর্তৃ মনে না করায় তিনি প্রকৃতির কার্যে ব্যথা বা আনন্দ প্রাপ্ত হন না। যিনি প্রকৃতিকে কর্তৃর কর্তৃ বলিয়া জানেন, তিনি কর্তৃর শুভাশুভ ফলে কখনই বদ্ধ হইতে পারেন না।

জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এই তিনটি কর্তৃ-প্রকৃতির হেতু। এই তিনটির অভাবেও কর্তৃ সম্পন্ন জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা হইতে পারে না। জীবমুক্ত অবস্থায় এই ত্রিগুণী এক হইয়া যাওয়ায় মুক্ত পুরুষের কর্তৃ প্রকৃতির আর উদয়ই হয় না।

কর্তৃ, কর্তৃ ও করণ এই তিনটি ক্রিয়ার আশ্রয়। সাত্ত্বিকাদি গুণ-ভেদে ইহার ত্রিবিধ এবং ত্রিবিধ বলিয়াই কর্তৃ-কর্তৃর মধ্যে বহু ভেদ লক্ষিত হয়; এবং তৎকৃত কর্তৃরও তিন প্রকার ভেদ হয়। এইজন্য বাহার। সাত্ত্বিক কর্তৃ তাহার উৎসাহের সহিত ক্রিয়া করেন এবং তাহাদের বাহিরে কিছু চাক্ষু্য থাকিলেও ভিতরটা খুব স্থির। তাহার। কোনরূপ ফলে আসক্ত হন না, কুটস্থের মধ্যে তাহার। কত কি দেখিলেও আহ্লাদে আটপানা হইয়া নিজেদের গৌরব বৃদ্ধির জন্য জয়ডঙ্কা বাজাইয়া বেড়ান না। রাজসিক কর্তৃদের ইহার বিপরীত মনোভাবই হইয়া থাকে, কিন্তু সাত্ত্বিক কর্তৃরা কুটস্থের মধ্যে কিছু যেখানে পান বা না পান, তাহার। সকল অবস্থাতেই স্থির, তাহাদের মনে কোন বিকার আসে না, কিন্তু তামসিক কর্তৃদের উক্ত অবস্থাতে মন দুঃখে ভায় হইয়া যায়, তাহাদের ক্রিয়াতে আর তেমন উৎসাহ থাকে না।

সমুদায় কর্তৃক মন হইতেই হয়, সেই মন ক্রিয়ায় দ্বারা স্থির হইলে কর্তৃক হইলেও কর্তৃক-লেপ হয় না। যিনি ক্রিয়ার দ্বারা এক অবিনাশী কুটস্থ ব্রহ্মকেও সর্বভূতের মধ্যে দেখিতে পান, তাঁহারই জ্ঞান প্রকৃত জ্ঞান। ফলাকাঙ্ক্ষারহিত কর্তৃক বা ক্রিয়ার দ্বারা যে ধারণা-ধ্যান-সমাধিরূপ কর্তৃক নিম্পন্ন হয়, তাহাই সাত্ত্বিক কর্তৃক। বাহ্যদের সাত্ত্বিকী বুদ্ধি, তাহারা বুদ্ধিতে পারে যে ক্রিয়া করিলেই ভয় দূর হয়, সুতরাং ক্রিয়া কবাকে কর্তব্য বলিয়া মনে করে। উহার ফলে তাঁহারা মোক্ষলাভ করেন। বাহ্যারা ক্রিয়া করে না, তাহারা বন্ধন-মশাতেই থাকে। তাহাদের সাত্ত্বিকী বুদ্ধি থাকে না বলিয়া তাহাদের প্রাণ সুস্থায় বিচরণ করে না। বাহ্যারা তামসিক বুদ্ধিসম্পন্ন, তাহারা আলস্য ও প্রমাদবশতঃ ক্রিয়ার অভ্যাস করে না। সুতরাং, ব্রহ্ম সর্বত্র থাকে সত্ত্বেও তাহাদের ব্রহ্মদৃষ্টি হয় না। বাহ্যারা শ্রদ্ধার সহিত ক্রিয়া করে সাত্ত্বিক ধারণা তাহাদেরই হয়। তাহাদের মন-প্রাণের বেগ থাকে না এবং তাহাদের অন্তর্দৃষ্টি হওয়ায় ইন্দ্রিয়গণ বাহ্যজ্ঞান বহিত হয়, সুতরাং আসক্তি পূর্বক কোন বস্তুতেই তাঁহাদের লক্ষ্য পড়ে না। তখন তাঁহারা আপনাতে আপনি ভূবিয়া থাকেন, স্থিরত্বের আনন্দে তাঁহারা ভৌ হইয়া যান। কিন্তু পঞ্চতত্ত্বের রং চং দেখিয়া বাহ্যারা তাহাতেই আসক্তি প্রকাশ করে, তাহাদের কোন কালে দুঃখের অন্ত হয় না। অনাসক্ত যোগীর চিন্তা ক্রিয়ার পরাবস্থায় সুন্দর পরব্যোমে স্থিতি লাভ করে, তাহাতেই তাহার সর্বদুঃখের পরিসমাপ্তি হয়। তাঁহারা ইচ্ছা অমৃতপথ লাভ করেন।

বিষয়ানুসৃত দৃষ্টিই প্রবৃত্তির পথ, তাহাই সংসার। ইহার বিপরীতভাবে বাহ্যার মনের স্থিতি হয়—তিনিই মহাদেব।

প্রাণ কর্তৃক “স্বকর্মে”, এই স্বকর্মের দ্বারা বিশ্বপ্রাণ বাসুদেব অর্চিত হইয়া থাকেন।

যে এইভাবে তাঁহার অর্চনা করিতে পারে, সেই সমুদায়ের স্বকর্ম ও স্বধর্ম

বাক্সিদ্ধি হয়, সমস্ত বাসনা সিদ্ধি হয়।

উচ্চস্তরে উঠিলে তখন সাধকের আর কোন ইচ্ছাই থাকে না। তখনই তিনি মুক্তিসাধ করেন। ইচ্ছাই জীবের বন্ধন-বজ্জ, ক্রিয়া দ্বারা ইচ্ছারহিত অবস্থা প্রাপ্তি হইলে আত্মা ব্যতীত অন্য বস্তুতে দৃষ্টি থাকে না, তখন তিনি সিদ্ধ হইয়াছেন বলা যায়। তাঁহার আর তখন মরণের ভয় থাকে না। ইচ্ছাই আত্মার ধর্ম বা স্বধর্ম। এই স্বধর্মের প্রতিঃ বাহ্যদের আত্মা নাই তাহাদের দাঁড়াইবার স্থান নাই। জন্মদুঃখাদুঃখ তাহাদের কর্তনও পিছন ছাড়ে না ; ব্রহ্মই ঈশ্বর এবং ব্রহ্মই জীব, তবে জীবকে এত দুঃগত ভোগ করিতে হয় কেন? ব্রহ্ম, ঈশ্বর ও জীব স্বরূপাধার এক, পরম্পরের কোন ভেদ নাই।

“ইহং বিন্ধ্য ভগবান্বেতরো”—এই দৃষ্টমান বিশ্ব ও জীব সমস্তই ব্রহ্মময়, তবে যখন ব্রহ্ম স্নায়াকে আশ্রয় করেন তখন তিনি জগৎকর্তা ঈশ্বর বলিয়া পরিচিত হন, আবার যখন

অবিচার্য্য অশীন হন, তখনই ব্রহ্মের জীবতাব হয়। তখন তিনি ব্রহ্ম, জন্ম-মৃত্যুর বশীভূত এবং তখন তিনি কণ্ডাধ্বারা পূর্ণ নরকানিও ভোগ করেন। কিন্তু এ সমস্ত ভাবের কোনটাই নিত্য সত্য নহে। জিতাপের আলা তবো কাহার হয় এবং

কেই বা তাহা হইতে মুক্ত হয়? এবং কেই বা তাহাকে মুক্ত করেন? এইটাই বিশেষ ভাবে আলোচ্য। প্রকৃতি বা মায়ার তিনটি গুণ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। রজঃস্তমঃ যখন সত্ত্বের দ্বারা অভিজুত হয় তখন সেই সত্ত্বপ্রধান গুণটাই শুদ্ধসত্ত্ব। সত্ত্বগুণ নির্মল ও প্রকাশক, উহাতে জ্ঞান কখনও আচ্ছাদিত হয় না। এই শুদ্ধ সত্ত্বতাবের উপর যে ব্রহ্মচৈতন্তের লীলা দেখা যায়, তাহাতে ব্রহ্মের নির্গুণ ভাব যেন ঢাকা পড়ে, এবং তাহাতেই সত্ত্ব গুণের খেলা আরম্ভ হয়। এই শুদ্ধ সত্ত্বের মধ্য দিয়া ব্রহ্মকে দেখিলে তাঁহাকে সত্ত্ব মনে হয়, তখন তিনি ঈশ্বর—এই বিরাটবিশ্বের অধিপতি, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কর্তা। এই শুদ্ধ সত্ত্বের মধ্য দিয়া যে খেলা হয়, তাহাতে যে শক্তির প্রকাশ হয় তাহাই ঈশ্বর-ভাব। শুদ্ধ ব্রহ্মচৈতন্ত এখানে মায়ামিশ্রিত। মায়ামধ্যস্থ সত্ত্বগুণের শক্তি এখানে লীলায়িত বলিয়া ব্রহ্মকে লীলাময় ঈশ্বর বলিয়া মনে হয়। লাল কাচের মধ্য দিয়া যে আলোক আসে তাহাকে যেমন লাল আলোক বলি, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আলোক লাল বা সূক্ষ্ম নহে, তরুণ শুদ্ধ সত্ত্বের মধ্য দিয়া যে চৈতন্তের স্পৃহণ তাহা নির্গুণ হইয়াও শুদ্ধ-সত্ত্ব সত্ত্ব রূপে প্রতিভাত হয় মাত্র। আবার রজঃস্তমঃ মধ্য দিয়া যে চৈতন্ত প্রতিবিম্বিত হয় তাহাই চিহ্নভেদের মিশ্রণ ভাব। উহাই জীব ও জগৎ রূপ। যদিও তিনটি গুণই প্রকৃতির, তথাপি তাহাদের মধ্যে অনেক ভেদ আছে। সত্ত্ব গুণটী স্বচ্ছ, ভাস্বর ও শাস্ত বলিয়া আমি সুখী, আমি জ্ঞানী ইত্যাদি মনোবস্তুগুলিকে ক্ষেত্রজের সহিত যোজন্য করিয়া দেয়। আর রজঃগুণ বিক্ষেপশক্তিসম্পন্ন, সুতরাং বাগ্যাত্মক বলিয়া কণ্ঠাসক্ত দ্বারা জীবকে আবদ্ধ করে, এবং তমোগুণ আবরণশক্তিপ্রধান বলিয়া দেহীকে অকাণ্ডে প্রযুক্ত করে এবং অশুভম, নিজা, ভয়প্রভৃতির দ্বারা বদ্ধ করে। গুণগুলি জড় হইলেও চৈতন্তদীপ্ত বলিয়া তাহাদিগকেও চৈতন্ত বলিয়া ধারণা করে। সত্ত্বগুণের গতি নিরন্তর উর্দ্ধমুখ বা আত্মাভিমুখী বলিয়া উহা জীবকে নিরন্তর নিবৃত্তিমার্গের দিকে পরিচালিত করে এবং রজঃস্তমোগুণ ইহার বিপরীত মুখে বা প্রবৃত্তিমার্গের দিকে পরিচালিত হয়। পুঙ্খ বলিয়াছি ত্রিগুণ সম্মিলিত ভাবেই সমস্ত কার্য্য করে, তবে এক এক সময়ে এক একটী প্রাধান্য থাকে, তখন সে অপর দুইটি গুণকে অভিজুত করে। তাই যখন রজঃস্তমোগুণ প্রবল হইয়া বিষয় সূত্রে তীব্র বেগে প্রধাবিত হয়, তখন সত্ত্বের ক্ষীণ কণ্ঠ অহুত্বের তাহাদিগকে প্রবৃত্তিমার্গে ধাইতে নিবেদন করে, আবার যখন সত্ত্ব প্রবল হয় তখন রজঃস্তমঃকে অভিজুত করিয়া সত্ত্বগুণ জীবকে নিবৃত্তি পথে পরিচালিত করে, তখন রজঃস্তমঃ গুণ কাম, ক্রোধ, রাগ, ঘেব, আলস্য ভদ্রতাকে সত্ত্বগুণ বাধা দেয়। এই শুদ্ধ সত্ত্ব প্রতিবিম্বিত চৈতন্তই ঈশ্বর—তিনিই জীবকে পাপপঙ্ক হইতে টানিয়া লন। শুদ্ধ সত্ত্ব থাকিতে থাকিতে জীবের জ্ঞান এত স্বচ্ছ ও নির্মল হয়, যদ্বারা সে আপনাকে আপনি মুক্ত মনে করে এবং যতদিন রজঃস্তমোগুণে জীব অভিজুত থাকে, ততদিন এই প্রবৃত্তি ও মোহমূলক গুণবয়ে প্রাতঃবিম্বিত চৈতন্তই শোকমোহপ্রসূত হইয়া দুঃখভোগ করে। রক্তপুষ্প বা নীলপুষ্প যেমন শুদ্ধ স্বচ্ছ ফটিকে রক্ত বা নীলবর্ণে অধ্বজিত করে, কিন্তু রক্ত বা নীলবর্ণ কখনই ফটিকে তাহার স্বাভাবিক ভাব হইতে চিত্রিত করিতে পারে না, তরুণ শুদ্ধ চৈতন্তটি মায়ামুক্ত ঈশ্বরভাব বা মায়ামিশ্রিত জীবভাবে প্রকাশিত হইলেও তাহা

সদা কালই শুদ্ধ ও সুনির্দল থাকে। আপনাকে আপনি এইরূপ দেখিতে পারিলেই জীবমুক্ত অবস্থায় পৌঁছান যায়।

প্রাণের মধ্যেই এই ত্রিগুণ যুক্ত হইয়াছে। এই প্রাণের স্পন্দনই গুণত্রয়ের স্পন্দন। প্রাণ যখন ইড়ার বহে তখনই রজোগুণ, যখন পিঙ্গলার বহে তখনই তমোগুণ এবং যখন সূক্ষ্মার বহে তখনই সত্ত্বগুণ। আবার প্রাণ যখন ইড়া পিঙ্গলা সূক্ষ্মার অতীত হইয়া স্থির হয় তখনই ব্রহ্মভাব, সেখানে আর গুণের খেলা নাই, সুতরাং জ্ঞান-মরণ স্বপ্ন-জাগ্রদ্বিও তখন আর অস্তিত্বের বিষয় হয় না। গুণ হইতে মুক্তিলাভের জন্য তাই ঈশ্বর বা শুদ্ধ সত্ত্বভাবের শরণ লইতে বলা হইয়াছে। যেমন সমুদ্রে তরঙ্গ, তেমনি ব্রহ্মাত্মার মধ্যে প্রাণলীলা। প্রাণের বিবিধ স্পন্দনই বিবিধ কর্ম; তাহাতেই জীব বদ্ধ হয়। আবার কটক দ্বারা কটক উদ্ধারের দ্বায় যে প্রাণকর্ম দ্বারা প্রাণকে স্থির করিতে পারে তাহারই কর্মবন্ধন ছিন্ন হয় এবং ভববন্ধন-কাটিয়া যায়। এইজন্য বাহাতে প্রাণ স্থির হয় তাহার চেষ্টা সকলকেই করিতে হইবে। ক্রিয়াভ্যাস দ্বারা প্রাণের স্থিরতা আসে। প্রাণ স্থির হইলেই মন ও মনের স্থিরতার সহিত বুদ্ধির স্থিরতা আসে। অতএব নিরবস্থার হইয়া (আমি সকলের চেয়ে ছোট) অল্প বস্তু হইতে মনের লক্ষ্যকে ফিরাইয়া কেবল ক্রিয়াতে মনকে নিবদ্ধ কর, অল্প আহার কর, বেশী কথা বলিও না বা মনে বিবধ জ্ঞানা-কল্পনা করিও না—এইরূপে বাক্য মন ও বসনাকে সংযত করিতে পারিলেই আপনাতে আপনি থাকিতে পারিবে এবং তাহা হইলেই বাহাতে ক্রিয়ার অন্ত হয় সেই ক্রিয়ার পর অবস্থারূপ শান্তি লাভ করিয়া স্বয়ংই ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যাইবে। তখন অল্প কোন ব্যাপারই তোমার মনের অঙ্গসঙ্গতা আনয়ন করিতে পারিবে না। বাহার চিত্ত ক্রিয়ার পর অবস্থায় লীন হইয়া যায় তাহার আর উদ্বিগ্ন নাই, শোক নাই, ভয় নাই, কোন লাভ-ক্ষতির হিসাব নাই—সে চরাচর সর্বভূতে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিয়া কৃতকৃত্য হইয়া যায়। যাহা কিছু হইতেছে সবই ব্রহ্ম করিতেছেন এই অমৃতত্ব তাহার স্থির হয় সুতরাং অকর্মা বলিয়া তাহার কর্মলেশ হয় না, সুতরাং ফলভোগও করিতে হয় না, তাই তাহাদের সর্ব কর্মেরও নাশ হয়। যদিও তাহার ইচ্ছায় দ্বারা সকল কর্মই হইতে পারে তথাপি তাহার বুদ্ধি ব্রহ্ম লক্ষ্যে স্থির থাকে বলিয়া কোন কর্মই তাঁহাকে লিপ্ত করিতে পারে না। সাধু ক্রিয়াবানদের এইরূপ বিচিত্র দশা হইয়া থাকে। ইহা তর্ক দ্বারা বা বুদ্ধি খাটাইয়া বুঝিতে পারা যায় না, এ অবস্থা বাহার হয় সেই বুঝিতে পারে।

ঈশ্বর সাধুদিগের হৃদয়ে যেমন আছেন, অসাধুদিগের হৃদয়েও তেমনি ভাবে আছেন, এবং তাহারই আদেশে বা ইচ্ছিতে ভূতমাত্রাই ইড়া, পিঙ্গলা, সূক্ষ্মারূপ যজ্ঞে আকৃষ্ট হইয়া স্ব স্ব নিয়তি অঙ্গসারে পরিচালিত হয়। সাধুরা ক্রিয়ার উপদেশ পাইয়া গুরু-উপদেশ অঙ্গসারী চলিতে চলিতে তাহাদের প্রাণ সূক্ষ্মায় ও পরে সূক্ষ্মার অতীত অবস্থায় স্থির হইয়া যায়, কিন্তু সংসারাসক্ত অসাধুগণের প্রাণ ইড়া পিঙ্গলা অতিক্রম করিতে পারে না, সুতরাং জ্ঞান ও বিষয়ে আসক্তি হেতু তাহার। ব্যাবহার নূতন দেহে সংযুক্ত হইয়া জগতে যাতায়াত করে। আত্মা ত্রিগুণবহিত, আবার সেই আত্মাই গুণকে আশ্রয় করিয়া শাসনরূপে চঞ্চল হইয়া কত

কষ্টই ভোগ করেন আবার গুরুপদেশ মত চলিয়া যখন তাহার শাস স্থির হয় তখন তিনি শান্তিপদ লাভ করিয়া স্বধর্মস্থ পাশ হইতে মুক্ত হন। ইহাই গুহ্যং গুহ্যতর জ্ঞান।

যিনি মহামায়া, তিনিই মায়াবীশ চৈতন্য, তাঁহাকে কেহ কেহ অর্ধনারীশ্বরও বলেন; এবং কেহ তাঁহাকে পুরুষ, কেহ তাঁহাকে ঈশ্বরের স্বকীয় প্রকৃতিও বলিয়া থাকেন। তিনি বাহাই হউন, সেই মহাশক্তিই সংসার স্থিতির কারণ। যিনি আত্মা, তিনিই পরমাত্মা, তিনিই মহামায়া ব্রহ্মাবিশ্বশিবপ্রসবিনী এই বিশ্বজগতের জননীরূপা, তিনিই আমার সর্ব্ব, তিনিই আমার “আমি”। জ্ঞানীরা নিজাত্মার সহিত পরমাত্মার এই অভিন্নতাব উপলব্ধি করেন বলিয়াই তাহারা “সোহং” বলিয়া থাকেন। স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর এবং তাহার অতীত পরব্রহ্মই তাঁহার পদবাচ্য। সেই তাঁহারই আনন্দরূপে, পরে মহাশূন্যরূপে এবং পরিশেষে নিত্যজ্ঞানস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন।

ক্রিয়াভ্যাস দ্বারা লব্ধবিক্ষেপরূপ অওদ্ধি ক্ষয় হইলে সেই লব্ধচিত্তে আর ফলাভিসন্ধান থাকে না, তখন আমার “আমি”র সহিত পরিচয় হয়, এবং মিথ্যা অহঙ্কৃত “আমি” চিরদিনের জন্য সেই “পরম আমি”র মধ্যে আত্মগোপন করে। তখন মায়া নাই, সুতরাং মায়াতে প্রতিবিম্ব পড়ে না। এইরূপে জীব-ভাব চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হয়।

পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্মফলদ্বারাই জীব আত্মরী সম্পদ অথবা দৈবী সম্পদের অধিকার লইয়া

জন্মগ্রহণ করে। গীতার বোড়শ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকের

দৈব ও আহর সম্পদ ব্যাখ্যা দেখিলেই ইহা উত্তমরূপে বুঝা যাইবে। বাহ্যার

আত্মরসম্পদযুক্ত তাহার। তত্ত্বজ্ঞানলাভের অনধিকারী,

তাহাদের পক্ষে ভগবদ্ ভজন করা বা জ্ঞানলাভ করা অসম্ভব। অর্জুনও সেইরূপ অধিকারী কিনা তাহার মনে এই সন্দেহ হইতেছিল, তাই ভগবান্ জঙ্ঘনকে আশ্রয় দিয়া বলিলেন, তুমি ভয় পাইও না। তুমি যে দৈবী সম্পদের অধিকার লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছ, ভগবৎ-প্রবণতা তোমার পক্ষে তাই স্বাভাবিক। এই দৈবী সম্পদের অধিকার বাহাদের না থাকে, তাহারা সাধন পথে আসিতেই চায় না, যদি বা আসে সাধন পথে অধিক দিন টিকিয়া থাকিতে পারে না। অবশ্য এই কথা শুনিয়া অনেকেরই ভীত হইবেন, কিন্তু ভয় পাইয়া হতাশ হইবার কারণ নাই। জন্মজন্মান্তর সাধনাত্ম্যাসের সংস্কার বাহার থাকে, তাহার পক্ষে যোগপথ তত কঠিন বলিয়া মনে হয় না, কিন্তু এ অধিকার লইয়া না আসিলেও এই জন্মের পুরুষকার দ্বারা যথেষ্ট দৈবী সম্পদ অর্জন করিয়া লইতেও পারা যায়। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যখন দৈবী সম্পদ লইয়া জন্মগ্রহণ করে নাই এবং আহর সম্পদ লইয়াই আদ্য আছে, তখন তাহার চিত্ত ভগবদ্ যুগে কেনই বা যাইবে? যাওয়া কঠিন নিশ্চয়ই, কিন্তু একেবারেই যাইবে না তাহা নহে, অবশ্য কিছু চেষ্টা করিতে হইবে। যদি বল চেষ্টা আসিবে কেন? তাহার উত্তর এই যে আমাদের প্রকৃতিতী ত্রিগুণময়ী; আমার মধ্যে রজোভাব তমোভাব হয়তো অধিক প্রবল, কিন্তু সত্ত্বভাব সামান্য হইলেও কিছু থাকিবে নিশ্চয়ই। ইহাতেই অনেক কার্য হইতে পারে। যদি

কোন স্তম্ভ যুদ্ধের পশ্চাদ্ধাবন: অতিভূত হইয়া সত্ত্বগুণের দ্বিধা বায়ু বিস্তারিত হয়, তবে সেই স্তম্ভ যুদ্ধের, সেই মাহেন্দ্রক্ষণে আমার হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তির বীজ নিক্ষিপ্ত হইতে পারে। আমি ভগবদ্বারাধনার সুফল হৃদয়ঙ্গম করিয়া উক্ত কার্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি। যদি মনের বেগ একবারও ভগবদ্ব্যবস্থায় দাবিত হয়, তাহা হইলে অবশ্যই আমাকে অত্যন্তভাবেও দৈবীসম্পদের অধিকারী করিবেই। এক জন্মেই সামান্যমাত্র চেষ্টাও প্রবলদ্বারা দৈবরূপে উপনীত হওয়া অসম্ভব নহে, এবং এই দৈবায়ুগ্রহই আমাকে ভগবৎজিজ্ঞাসু করিয়া আমার জীবনকে সফলতার দিকে অগ্রসর করিয়া দিতে পারে। এ জন্মের দৈব পূর্বজন্মের পুরুষকারেরই ফল মাত্র, তখন সেই দৈবই আবার পুরুষকারকে বেগবৃত্ত করিবে। দৈব ও পুরুষকারের মধ্যে কোনটির প্রাধান্য অধিক তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে; দৈবই বীজস্বরূপ এবং পুরুষকারই ক্ষেত্রস্থানীয়। ক্ষেত্র ভাল হইলে অপকৃষ্ট বীজও উৎকৃষ্ট শস্য উৎপন্ন করে, ক্ষেত্র ভাল না হইলে উৎকৃষ্ট বীজও উত্তম ফল উৎপন্ন করিতে অসমর্থ হয়, কিন্তু উভয়ের সংযোগ ব্যতীত কিছুই হয় না। পুরুষকার প্রবল হইলে যদি দৈব ক্ষীণবলও হয় তথাপি হতাশ হইবার কারণ নাই, কারণ ভগবান্ স্বয়ং পৌরুষরূপেই প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। সুতরাং আমার কক্ষোত্তম বা আত্মচেষ্টাকে আমার অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে বলিয়া যেন শিথিল করিয়া না ফেলি। বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন—

“পরং পৌরুষমাত্মিত্য মন্তেদন্তান্ বিচূর্ণয়ন্।

ভূভেন্নবভমুদ্রাক্ষং প্রাক্তনং পৌরুষং জয়েৎ ॥”

প্রবল পুরুষকার অবলম্বন করিয়া দন্তে দন্ত চাপিয়া এ জন্মের স্তম্ভকর্ম দ্বারা প্রাক্তন অন্তত কর্মফল জয় করিতে হইবে।

সুতরাং আমার অদৃষ্ট ভাল-নহে বলিয়া চূপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। যে উদ্যোগী পুরুষ তাহার উদ্যোগের ফলই দৈবরূপে আসিয়া আবির্ভূত হইবে এবং প্রাক্তন অন্তত ফলও ধীরে ধীরে বিনষ্ট হইতে থাকিবে।

দন্ত, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ও অজ্ঞান—এইগুলি আত্মবী সম্পদ। যাহারা রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতির লোক, তাহাদের ঐগুলি স্বভাবজাত গুণ। আর যাহারা নির্ভীক, শুদ্ধচিত্ত, যাহাদের কর্মে ভৎপরতা ও জ্ঞানে নিষ্ঠা আছে, যাহাদের বাহ্যেস্ত্রিয় সংযত, যাহারা দান করে, বজ্র করে, শাস্ত্রাধ্যয়ন করে, তপস্বী করে এবং যাহারা সয়ল, লোভহীন, দয়ালু, অক্লুর, অচঞ্চল, তেজস্বী, ক্রমান্বিত, গুচি, অনভিমানী ও অহিংসক,—যাহাদের কুর্কর্ম করিতে লজ্জা হয়, পরনিন্দা, পরত্রোহ করিতে ভাল না লাগে, যাহাদের চিত্ত ভগবদ্ভজনা করিতে আনন্দ পায় এবং ভজনার ফলে যাহাদের চিত্ত স্থির ও শান্ত হইয়াছে তাহারা দৈববলে বলীয়ান্ হইয়াছে বুঝিতে হইবে, তাহাদের তপস্বী ও আত্মাধেবণ সাক্ষ্যমণ্ডিত হইবেই। এতদুত্তম উদ্যোগ চাই, নিরুত্তম হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না;—ভগবান্ গীতার মধ্যে কোন স্থানেই নিশ্চেষ্টতার প্রশংসা দেন নাই।

গীতার “পুরুষোত্তম ভব” গীতার একটি বিশেষণ। এই জীব ও জগতের মধ্যে

হুইটী শক্তি খেলা করিতেছে দেখা যায়। একটি স্থির ও নিত্য এবং অস্ত্রটি চঞ্চল, নিত্য-পরিবর্তনশীল। কিন্তু এই “স্থির বস্তুটি না থাকিলে যেটি নিত্য-পরিবর্তনশীল তাহার অস্তিত্বই কল্পনা করা যায় না। এই নিত্য ও অনিত্য বস্তু দুইটির

পুরুষ ভ্রম যোগ

একটিকে ক্ষর ও অপরটিকে অক্ষর বলা হইয়া থাকে। আত্মার কূটস্থ অপরিণাম তাবটীই পুরুষ এবং আত্মার বহুকাপ প্রকাশ বা পরিণামশীল তাবটীই অক্ষর পুরুষ। এই অক্ষর অপরিণামী কূটস্থ তাবটীকে আশ্রয় করিয়াই ক্ষর পুরুষের আশ্রয় বর্তমান থাকে। অক্ষর পুরুষই আত্মার সত্য বিষয় এবং তাহা হইতে যে সহস্র সহস্র (যথঃ পাবকাদ্ বিম্বুলিজাঃ) প্রতিবিম্ব উৎপন্ন হয় তাহাই ক্ষরভাব। পুরুষোত্তমের সহিত অক্ষরের বহু সাদৃশ্য আছে বলিয়া পুরুষোত্তমকেও অক্ষর বলা হইয়া থাকে। ক্ষরকেও পুরুষ বলা হয়, কারণ চিত্তের প্রতিবিম্ব পড়িয়া তাহাকেও চৈতন্যময় করিয়া রাখিয়াছে। এই ক্ষর পুরুষ সর্বদা বাহ্যর্কৃষ্টিসম্পন্ন, সেই জন্য তিনি নিঃস্বরূপ বিষয়ে অনভিজ্ঞ। এক আত্মাই বহুরূপে দৃষ্ট হইতেছেন, তাহা না বুঝিয়া যিনি নানাতরুণ ভেদ দর্শন করেন তাহার বিনাশ অবশ্যজ্ঞাবী অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ যাতায়াত তাহার কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না, ইহাই প্রকৃত পক্ষে বিনাশ।

“তদ্বিদং ভগবান্ রাজেন্দ্রক আত্মাত্মনাং স্বদৃক্।

অন্তরোহন্তরো ভাতি পশুতঃ মায়য়োরুণা ॥” ভাঃ, ১ম স্ক:

এই সমস্ত বিষয়ই জগৎ প্রকাশক পরমেশ্বরের স্বরূপ, পরমেশ্বর ভিন্ন ইহা আর কিছুই নহে। তিনি এক তাহাতে নানাতাই, তিনিই ভোক্তা এবং তিনিই অন্তরে বাহিরে বিরাজ করিতেছেন, কেবল মায়াবশে নানাক্রমে পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকেন।

পরিণামী সকল বস্তু ও জীবের মধ্যে যে একটি অপরিণামী নিত্য বস্তু বাহ্যে আছে যাহাকে এই চক্ষু দেখিতে পায় না, যাহাকে দেখিতে হইলে দিব্যচক্ষু প্রয়োজন, ত্রিকূটীতে যাহার স্থিতি, যাহা যোগীদের যোগপথানুগম্য, লোকে তাঁহাকে বুঝিতে না পারিলেও যিনি নিত্য, সত্য, অবিদ্যমান, তিনিই কূটস্থ অক্ষর। এই কূটস্থ অক্ষর হইতেও আর একটি উত্তম পুরুষ আছেন; এই কূটস্থকে, দেখিতে দেখিতে পরে উত্তমপুরুষকে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকেই শাস্ত্রে পরমাত্মা বলিয়াছেন—ইনি স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল—ত্রিভুবন ব্যাপিয়া এবং তাহার অতীত হইয়াও বর্তমান বহিয়াছেন। তিনিই কর্তা, তিনিই দীপক এবং তিনিই পুরুষোত্তম পরব্রহ্ম। এই পুরুষেরই যে দ্বিকৃতি অন্তহীন অপরিণামী তাহাকেই অক্ষর পুরুষ বলে। তাহার অপর দ্বিকৃতি পরিণামী ও বহুরূপ-বিশিষ্ট, চেতন অচেতন সমস্ত জীব ও জগৎ তাহা হইতে প্রতিনিয়ত সত্ত্ব হইয়া তাহাতেই বিলীন হইতেছে।

ক্ষর ও অক্ষর এই দুইটি বাতাবই যখন তাহার, তখন তিনি ক্ষরের অতীত হইবেন কিরূপে? তাহাকে বাহ্য দিগে কব তাহাও হইতে পারে না—‘ঈশাবাস্তমিদং সর্বং’ যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ—চেতন অচেতন যাহা কিছু রহিয়াছে, সেই সমস্তই পরমেশ্বর সত্য পরিপূর্ণ, তথ্যাতীত

অন্ত কিছুই নাই। তবে তাঁহাকে ক্ষয়ের অতীত এই জ্ঞান বলা হইয়াছে যে ভাবটী তাঁহার দ্বৈতরূপে পরিণাম লাভ করিয়াছে তাহার উপাসনা করিয়া (অর্থাৎ সংসারভোগে আসক্ত হইয়া) কেহই তাঁহার প্রপঞ্চাতীত ভাবটীকে ধরিতে পারে না, এবং তাহা ধরিতে না পারিলে (বাহ্যদেব সংসারে আসক্ত দৃষ্টি থাকে) তাহাঙ্গের মহাবিনাশ হয় অর্থাৎ জ্ঞান-মুহুর্ত কবল হইতে তাহাঙ্গের পরিভ্রাণ হয় নাই। কেনোপনিষদ্ বলিতেছেন—“ইহং চেন্দ্রবেদীদ্ব্যন্ত্যমন্তি, ন চেন্দ্রিযাবেদীদ্ব্যন্তী বিনষ্টাঃ”—ইহলোকে থাকিয়া বা এই দেহেতে থাকিয়া যদি ব্রহ্মস্বরূপকে বিধিত হওয়া যায় তাহা হইলেই জীবনের সফলতা হইল। এই সফলতা প্রাপ্তিই প্রকৃত জীবন এবং যদি তাঁহার অবিনাশী অটল ব্রহ্মভাবে জানিতে পারা না যায় তাহাই মুহুর্ত।

এই পুরুষোত্তম এক অদ্বিতীয় ও অবিনাশী এবং তিনিই সমস্ত ভূতজাত বস্তুর মধ্যে প্রকাশিত হইতেছেন অথচ তাঁহার কোন পরিণাম বা পরিবর্তন নাই, তিনিই ঈশ্বর, তিনিই আবার জীবরূপে সর্বত্র সব হইয়া সব কবিতেছেন—এই জীবভাবটী কিন্তু চিরন্তন নহে, উহার নাশ হয়। যিনি সর্বরূপে, তিনিই আবার স্বজ্ঞাতিস্বজ্ঞ সর্বাভীত অরূপ ব্রহ্ম ভাবে বিরাজ করিতেছেন, ইহাই শাশ্বত অবিনশ্বর ভাব সেখানে কোন ইচ্ছা নাই, স্তব্ধতা করাকরিও কিছু নাই। এই অক্ষর ভাবটী অমাত্র অর্থাৎ জ্ঞান, স্বপ্ন ও সুশুপ্তির অতীত, বাহ্যকে তুরীয় অবস্থা বলে। তিনি বাক-মনের অগোচর বলিয়া তথায় কোন লৌকিক ব্যবহার নাই। উহা প্রপঞ্চোপশম অর্থাৎ জগৎসংস্কর-রহিত, ইহা শিব-স্বরূপ ও অবৈত-স্বরূপ। চিত্ত নিকট হইলে তবে এই চৈতন্যরূপ ব্রহ্ম প্রবেশ করা যায়।

বধন আবার এই অশঙ্ক অস্পর্শ অরূপ ব্রহ্ম মায়ামলিত ভাবে আপনাকে আপনি প্রকাশ করেন, তখন তিনি অন্তর্ধ্যামী কর্তা ও ঈশ্বর বলিয়া চিহ্নিত হন। তখন তাঁহার রূপ আছে আবার নাইও। তখন তিনি ভূতজাত বস্তু মাঝেই মিলাই থাকেন, অথচ তাহার তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

প্রলয় নিশায় সমস্তই ভগবৎ প্রকৃতিতে স্থগুপ্ত থাকে, তখন সৃষ্ট পদার্থ কিছুই থাকে না, গুণ-ক্লেবের পূর্ণ পর্য্যন্ত তখন একমাত্র নির্গুণ, নিরাকার, নিঃস্পন্দ ব্রহ্মই বিরাজ করেন, নামরূপের কোন চিহ্নমাত্রও থাকে না। সেই ভগবান্ই সৃষ্টি কালে আবার—

“ন এব ভূয়ো মিহ বার্ষ্যচোদিতাং, স্বজীবমায়াং প্রকৃতিং সিন্ধুকর্তীম্।

অনামরূপাঙ্ঘনি রূপনামনী, বিধিসমনোহতসসার শাস্তবৎ ॥”

সেই ভগবান্ই জীবের ভোগের জন্ত নামরূপবর্জিত জীবাত্মার নামরূপাদি উপাধি সৃষ্টি করিবার বাসনায় স্বীয় কালশক্তিপ্রেরিতা নিজে অংশভূত জীবগণের বিমোহিনী সৃষ্টি-কার্য্যভিলাষিণী প্রকৃতির অহুসরণ করেন, এবং সকলের কর্মবিধান করিবার জন্ত বেদাদি শাস্ত্রও নির্মাণ করিয়া থাকেন।

“এ এক ঈশো জগদ্ব্যবলীলবা

স্বজ্যত্বব্যত্যক্তি ন তত্র দজ্জতে।”

যে এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর, আত্মলীলা প্রকাশ করিয়া এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন, রক্ষা করেন ও

সংহার করেন, অথচ অনাসক্ত হেতু সেই সকল কাব্যে তাঁহাকে লিপ্ত করিতে পারে না। তখন তিনি জ্ঞাতকর্তা, অন্তর্ধ্যামী ও ঈশ্বর।

তিনি প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র হইয়াও প্রকৃতিকে পরিচালনা করেন, প্রকৃতি তাঁহার বশীভূত, তাই তখন তাঁহাকে প্রভবিকু বা স্রষ্টা, নিখিলভূতগণের পালক ও তাহাঙ্গের গ্রাসকারী বলা হয়। কিন্তু এই সকল কার্য্য করিয়াও তিনি সদা নিলিপ্ত।

বেদান্ত সূত্রে—“জগদ্ব্যবসৃতঃ”—সৃষ্টি স্থিতি লয়, ইহা হইতে হয়। যিনি না থাকিলে কিছুই হইতে পারিত না, কিন্তু ঐ সকল কর্মের মূলে তাঁহার কোন নিগূঢ় সঙ্কল্প নাই, কারণ তাঁহার অপ্রাপ্ত্য কিছুই নাই, তথাপি তাঁহার অনিচ্ছার ইচ্ছার এই জগৎ উৎপন্ন হইতেছে, অস্তিত্ববান্ হইতেছে ও তাঁহার মধ্যেই লীন হইতেছে—ইহাই তাঁহার অঘটনঘটনপটীয়াসী বিচিত্র মায়াশক্তির প্রকাশ। “বধা পাবকাদ্ বিস্মুলিঙ্গাঃ”—তদ্রূপ তাঁহা হইতে এই অনন্ত বিচিত্র জগৎ উৎপন্ন হইতেছে।

কি আশ্চর্য্য! তাঁহার মধ্যে আবার বিচিত্র রসগ্রাহিতা-ভাবও এক অপূর্বরূপে ফুটিয়াছে দেখা যাইতেছে, তাই যেন জগৎ খেলার উদ্দেশ্যবিশীন হইয়াও তিনি প্রবৃত্ত ব্রহ্মিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। যদি তাঁহার মধ্যে, বসন্তাব না থাকিত তবে তাঁহারই প্রীতিচ্ছবি এই যে জীব আমরা, আমরা কেহ কখন কাহাকেও ভালবাসিতে পারিতাম না। এই রসের প্রতি আকর্ষণ মাত্র বলিয়াই আজ আমরা পরস্পরের সহিত প্রণয়ে আবদ্ধ হইতেছি, পরস্পরের সহিত পরস্পরের মিলন আবেগ আজ আকাশে, স্বর্গে ও অবনীতে এক মহামন্দের প্রবলবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। এই যে পরস্পরের সহিত পরস্পরের মিলন আবেগ সেই আত্মার সহিত পরমাশ্রয় মহামিলনের আশাই সৃচিত করিতেছে।

আগতিক যত সখ্যক তাঁহাতেই আরোপ করা হইয়া থাকে; তিনিই আমাদের পিতা, মাতা, পতি, পুত্র—সব, কারণ চৈতন্য হইতে ব্যবৃত্ত হইয়া কেহই আমাদের পিতা, মাতা, পতি, পুত্র বা শ্রিয়জন হইতে পারে না। এই শ্রিয়ভাবগুলি তাঁহাতে আরোপিত হইলে, তখন তাঁহাকে আরও অন্তরতর মনোজ্ঞ বলিয়াই মনে হইবার কথা।

এই স্বন্দর পরিভ্রাণ ভাবরসে বিমুগ্ধ হইয়াই দ্বারকার প্রদ্যামণী ভগবানের নিকট আপনাদের স্বদয়ভাব ব্যক্ত করিয়া বলিলেন—

“মতাঃ স্ম তে নাথ সদ্যজিৎ পঞ্চজং

পিরিক্বেবৈরিধ্য-স্ববৈজ্ঞবন্দিতাং।

পরায়ণং ক্ষেমমিচ্ছতাং পরং

ন বত্র কালঃ প্রভবেৎ পরঃ প্রভূঃ ॥

ভবার নক্ষং ভব বিশ্বভাবন।

যমেব মাতাথ স্বহৃৎ পতিঃ পিতা।

তং সদ্গুরুনঃ পরমঞ্চ দৈবভং

যত্নাহবৃত্ত্যা কৃতিনো বভূবিম ॥”

হে নাথ! ব্রহ্মাদিরও প্রভু সে কাল, তিনিও যেখানে আপনার প্রভাব দেখাইতে অসমর্থ, ব্রহ্মা সনকাহি সেবিত ও সুরেন্দ্রবন্দিত সেই পদারবিন্দে আমরা প্রণাম করি। হে বিশ্বভাবন! আপনি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন। আপনিই আমাদের মাতা, পিতা, বন্ধু, সঙ্গুরু এবং পরম দেবতা, আপনার আজ্ঞাব্যবর্তী হইয়া আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। সেই নরদেবতার কৃপা কিরূপে লাভ করিতে হয়? তাই বলিতেছেন—

“স বা অয়ং যৎ পদমত্র সুরয়ো

জ্বিতেন্দ্রিয়া নিঞ্জিতমাতবিশ্বনঃ।

পশুস্তি ভক্ত্যুৎ কলিতামনাঅনা

নবেষ সত্ত্বং পরিমার্ষ্ট মর্হতি ॥”

এই কর্মভূমিতে জ্বিতেন্দ্রিয় যোগিগণ প্রাণায়ামাদির দ্বারা অন্তঃখাস বোধ করতঃ, ভক্তিবশে উৎকৃষ্ট চিত্ত হইয়া, বুদ্ধির নির্মল অবস্থায় যাঁহার স্বরূপ জানিতে সক্ষম হন, সেই শ্রীকৃষ্ণই আমাদের অগ্রে বর্তমান রহিয়াছেন।

এই ভগবান্ই সকলের হৃদয়ে হৃদয়ে অন্তর্ধামীরূপে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। কিন্তু বুদ্ধির নির্মলতা ব্যতীত তাঁহাকে বুঝিতে পারা যায় না। এই অন্তঃখাস রুদ্ধ না হইলে বুদ্ধির নির্মলতা সাধিত হয় না, এবং বুদ্ধি নির্মল না হইলে তাঁহাকে ঐকান্তিক ভাবে ভালবাসিতে পারা যায় না।

এই ষড়্বর্ষ্যসম্পন্ন ভগবদ্ভাবের উপরেও আর এক ভাবাতীত ভাব রহিয়াছে। যেখানে কেবল তিনিই আছেন, আর কিছুই নাই, সেখানে সৃষ্টিও নাই সংহারও নাই, কার্যও নাই কারণও নাই, এই সর্বোপাধিবিনির্মুক্ত ব্রহ্মভাবকেই শব্দাচার্য্য প্রভৃতি মনোবিবর্গ পরমতত্ত্ব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রযত্নশীল যোগীরা ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় আটকাইয়া থাকিয়া আপনার মধ্যে আপনার এই নিছক স্বরূপকে উপলব্ধি করেন, এবং উপলব্ধি করিয়া পরিনির্বাণ লাভ করেন। সমস্ত বেদশাস্ত্রের মধ্যে এই কথাই আলোচিত হইয়াছে, ‘সর্বো বেদা যৎ পঞ্চমামনন্তি, তপাংসি সর্বাণি চ বদ্বদন্তি, যজ্ঞিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্য চরন্তি’। সমস্ত বেদ যে ব্রহ্মরূপ প্রাপ্তব্য বলিয়া নির্দেশ করেন, এবং যে পরমপদ লাভের জন্যে তপস্যা ও কর্মসমূহ অধিষ্ঠিত হয় এবং যে পদপ্রাপ্তির জন্যে সাধুগণ ব্রহ্মচর্য্যাধি ব্রত অহুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

তিনি সাকার, নিরাকার, সগুণ ও নিগুণ—এইরূপ বহুভাবে চিন্ত্যমান হইয়া থাকেন। এজন্ত পরম্পরের মধ্যে বিবাদেরও অন্ত নাই, কিন্তু যিনি তাঁহার পুরুষোত্তমরূপ দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন তাঁহার মনে আর এ সব সন্দেহ থাকে না। তিনি জানেন সেই এক পরম পুরুষই সাকার, নিরাকার, সগুণ, নিগুণ ও সর্বময় হইয়া সর্বরূপে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি আছেন বলিয়াই অগ্নির উষ্ণতা, জলের শৈত্য, আদিত্য-চন্দ্রের অন্তর্গত সমস্ত ভেদঃ ও রস স্বীকৃত হইয়া উঠিতেছে। অন্নরূপেও তিনি, তাহার ভোক্তারূপেও তিনি—আবার তিনিই অন্তর্ধামীরূপে সর্বপ্রাণীর বুদ্ধিবৃত্তিতে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। প্রকৃত

সাধক পুরুষেরা জানেন যে সেই এক পরমপুরুষই সাকার ভাবে, নিরাকার ভাবে, সগুণ ও নিগুণ ভাবে সর্ব সময়েই প্রকাশিত রহিয়াছেন। যাঁহার যতটুকু অধিকার তিনি তাঁহাকে ততটুকুই বুঝিতে পারেন। যাঁহারা তাঁহাকে পুরুষোত্তমরূপে অল্পভব করিবার সামর্থ্য লাভ করিয়াছেন, সকল ভাবই তাঁহার তাহা জানিয়া তাঁহাকে সর্বভাবে ভজনা করিয়া থাকেন। মোটামুটি সাংখ্য, যোগ, ভক্তি—এই তিন মতের যে কোন একটিকে সইয়া ভগবান্কে অবেষণ করা যাইতে পারে। ভক্তিমূলক ধর্মেও জ্ঞানলাভ হয় এবং যোগ প্রভাবের দ্বারা দর্শন হইয়া থাকে। নিত্যানিত্য বিবেক হইতেই জ্ঞান জন্মে, বিচার দ্বারা প্রপঞ্চাধি মিথ্যা প্রপন্ন হইলেই পরমতত্ত্বের সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু কেবল মৌখিক বিচার দ্বারা জ্ঞানলাভ হয় না। ক্রিয়ার পর অবস্থায় সম্যক স্থিতি হইতেই নিত্যবিষয়ক জ্ঞানের উদয় হয় এবং তাহাতে যে শান্তি শান্তি রহিয়াছে তাহার প্রভাবেই মানুষের চিত্ত আর অনিত্য বিষয়ে গমন করে না, কারণ জগৎাদি সমস্ত পদার্থই মনঃক্লিষ্ট অবস্থামাত্র, মনের উত্থানের সহিত উত্থার উদ্ভিত হয় এবং মনের বিলয়ের সহিতই উত্থার বিলীন হয়। এই মন জীবিত থাকিতে যাঁহারও শান্তিলাভ হওয়া সম্ভবপর নহে। যে জগদ্ব্যাপার মনেরই তন্ত্রনা মাত্র, উহাই আবার আগ্রহ, যত্ন ও স্রুষ্টিতে পৃথক পৃথক রূপে প্রতিভাত হয়। আগ্রহে বাহ্য রূপরূপে প্রকাশিত, যত্নে তাহাই হৃদ্যভাবে বিরাজিত, স্রুষ্টিতে তাহা একেবারে রূপশূন্য। তুমার অবস্থা তাহারও অতীত। এই তুমার ব্রহ্মই অবস্থা ভেদে সগুণ ও নিগুণ হন। এই তুমার ব্রহ্মই সৃষ্টি, স্থিতি, লয় শূন্য অবস্থা; উহা সবার একরূপ। অথচ সকল প্রকারের প্রকাশের তিনিই আশ্রয়। স্রুষ্টিও প্রকৃতির একটা অবস্থা মাত্র, স্রুষ্টিতে সমস্ত প্রকাশ আচ্ছাদিত থাকিলেও তাহাতেই সকল প্রকাশের বীজ বর্তমান থাকে, স্তবরাং প্রকৃতিরূপতা-প্রাপ্তিই যুক্তি নহে, যুক্তির স্বরূপ অরূপ—তাহা প্রকৃতির অতীত অবস্থা। আগ্রহ, যত্ন, স্রুষ্টি—এই তিন অবস্থাতেই চৈতন্য সমভাবেই থাকেন। কোন অবস্থাতেই চৈতন্যের কোন বিকৃতি হয় না, অবস্থান্তরে কেবল বুদ্ধিরই অবস্থান্তর হয়। দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন বুদ্ধির অধীন বলিয়া বুদ্ধির অবস্থান্তরের সহিত তাহাঙ্কেরও অবস্থান্তর হইয়া থাকে। দেহাতিমানবশতঃ জীব সেই সকল অবস্থাকে আপনার অবস্থান্তর বলিয়াই মনে করে। কিন্তু বুদ্ধির বিকার ঘটিলেও জীব তাহাতে বিকৃত হয় না; জীব সকল অবস্থাতেই আত্মারাম, জীব তাহা জানিতে পারিলেই তাহার ভবজন মোচন হয়—“দুহৈ যদা পশুত্যন্নমীশমন্ত মহিমানমিত্তি বীতশোকঃ।” জীবতাব হইতে ভিন্ন আত্মস্বরূপ ভগবান্ ভক্তিতে মাত্র লব্ধিত হন, সমাধিবোধে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থায় মারাতীত পরমাশ্রয় স্বরূপ লব্ধিত হইলেই জীবের দৈব হইতে ভিন্নতারূপ ভ্রান্তি বিদূরিত হয়, তখন জীব আর আপনাকে হেঁদামিতে আবদ্ধ মনে করে না, উহাই মুক্তি। অবিদ্যা উপাধি হেঁতুই জীবের সংসারিত্বভাব হইয়া থাকে। কিন্তু এই হেঁদাভ্যন্তরে স্বর্ঘ্য-কিরণেব, মত যে কুটস্থ জ্যোতিঃ সকল সময়েই বর্তমান রহিয়াছেন, তাহাতেই দেহকে প্রকাশ ও চৈতন্যরূপে বলিয়া মন হয়। সেই তেজঃই ব্রহ্মের রূপ, তাহা দেহাত্ম্যেরে আসিয়া দেহকেও তেজোময় এবং প্রকাশময় করিয়া তুলে। সমস্ত আকাশও সেই তেজঃ

পরিপূর্ণ। আকাশের মধ্যে সূর্য্যরশ্মিকে যেমন দেখা যায় না, কিন্তু আকাশ হইতে অবতরণ করিয়া যখন কোন বস্তুর মধ্যে নিপতিত হয় তখনই সেই তেজঃকে বুঝিতে পারা যায়, তজ্জপ ব্রহ্মতেজঃ ষট্ হইলেই তাহাকে বুঝিতে পারা যায়, তখন তাহার ষট্াকরূপ নামরূপের প্রকাশ হয়। নামরূপনয় এই ষট্টিই ক্ষরভাব, ষট্টিমধ্যস্থ আকাশ বা তেজঃই অক্ষরভাব। আকাশের অভ্যন্তরে সূক্ষ্মরূপে পরব্যোম রহিয়াছে, তন্মধ্যে কত ব্রহ্মাণু রহিয়াছে, সেই এক একটা ব্রহ্মাণুর মধ্যে আবার ব্রহ্মাণ্ড বিরাজ করিতেছে, যখন সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি ও সমস্ত বস্তুর মধ্যে সেই ব্রহ্মাণুর বোধ হইবে তখনই ব্রহ্মজ্ঞান হইবে। ক্রিয়ার পরাবস্থাতেই উহার উপলব্ধি হইয়া থাকে, স্বদয়েতেই এই পরাবস্থার স্থিতি অল্পভূত হইয়া থাকে। যদি সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতে চাও তো ক্রিয়াব পর অবস্থায় থাকিবার জ্ঞ প্রযত্ন কর। স্বদয়ে এই স্থিতি ঘনীভূত হইলেই আর কোন বিষয় জ্ঞানিবার ইচ্ছা থাকে না, উহাই সকল জ্ঞানের অন্ত বা বেদান্ত-উহাই পুরুষোত্তম ভাব। পূর্বে বলা হইয়াছে, আত্মা ব্যতীত যোটের উপর অত্র সমস্ত বস্তুই ক্ষর, এই ক্ষরভাবই জন্ম-মরণের অধীন। কুট্স্থ অক্ষরই অবিনাশী পুরুষ। যিনি কুট্স্থে দৃষ্টি না রাখিয়া জগদ্বস্তুতে আসক্ত হন তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ দেহান্তের পরিগ্রহ করিতে হয়। আর যিনি অষ্ট প্রহর কুট্স্থেতে লাগিয়া থাকেন তিনি অবিনাশী কুট্স্থই হইয়া যান। এই ক্ষর ও অক্ষরের উপর পরমাত্মা বা পরমেশ্বর তিনিই পুরুষোত্তম, ক্ষর ও অক্ষর এ দুই-ই তাঁহার বিভিন্ন ভাব, উহার উভয়ই তাঁহার শক্তি—একটি পরিণামী ও ওক্তটি পরিণামহীন এইমাত্র প্রভেদ। গীতাতে ইহাদিগকেই পরা ও অপরা প্রকৃতি বলা হইয়াছে। চকল খাসপ্রাশ্নে এই পরিণামী ভাবটাই বিশেষরূপে ব্যক্ত, খাসের স্থিরতাই অচঞ্চল কুট্স্থের রূপ, এই স্থিরতাকে অবলম্বন করিয়াই চকল ভাবটী প্রবহমান হইতেছে। তাই পুরুষোত্তম একটিকে যেমন নিঃশব্দ নিষ্ক্রিয় সদামুক্ত, অতটিকে তিনি আবার ভর্তা, ভোক্তা, মেধেশ্বর। এই ভগৎ ও জীবতাব উভয়ই তাঁহার নাম-রূপ, কিন্তু তিনি স্বয়ং নামরূপ-বিবর্জিত।

লয় বিক্ষেপই চিত্তের অশুদ্ধি, যোগাভ্যাস দ্বারা লয় বিক্ষেপ নষ্ট হইলে তবে চিত্ত শুদ্ধ হয়। শুদ্ধ চিত্তে ফলাভিসন্ধি থাকে না, তাহা সর্বদাই দৈশ্বমুখী, সুতরাং সেই শুদ্ধ চিত্তে বাহ্য কিছু কৃত হয় তাহা সমস্তই ভগবদপিত হইয়া থাকে।
ভগবদর্পণ
এই ভগবদর্পণ সম্পূর্ণ হইলেই চিত্ত নিরন্তর শুদ্ধ থাকে, তাহাই সর্বকর্ম সন্ন্যাসের হেতু। জীবের বিবিধ বাসনাই সংসার, ঘনীভূত বাসনাই গৃহ, দায়, পুত্র, মিত্র, বন্ধু, বৈশ্য, শত্রু প্রভৃতি রচনা করে। বাসনা ক্ষয় না হইলে জীব যত্নের পর সেই সব লোকে গমন করে যেখানে তাহার বাসনামূলক ভোগলালসা পরিচূড়িত হয়। কিন্তু তীব্রতর সাধন প্রভাবে যাহার চিত্ত যত স্থির হইতে থাকে, তাহার তত ভগবদনিষ্ঠা বৃদ্ধি পায়, এইরূপ নিষ্ঠা বৃদ্ধি পাইতে পাইতে আপনাকে আপনি স্থিতরূপ পরমা নিবৃত্তি লাভ হইয়া থাকে। সেখানে আর সংসার নাই। কিন্তু এতদ্র ব্রহ্ম-বাসনাও তীব্র হওয়া আবশ্যক, নচেৎ সংসার-বাসনা সম্যক্রূপে নষ্ট হয় না। যাহারা বলে প্রযত্ন

করিলেও কাম, ক্রোধ ও মোহাদি কিছুতেই নিবৃত্ত হইতে চাহে না, তাহাদের প্রযত্নের মধ্যে হয় বৈরাগ্য নয় সম্যক সাধনার নিশ্চয়ই কোন ক্রটি থাকে, নচেৎ বিষয়-বাসনা নীকীপিত হয় না কেন? বিষয়বাসনা হইতেই সংসার, সেই বাসনা যাহার যত দৃঢ় তাহার সংসারে ও ভোগলোকাধিতে পুনরাগমন ও ভট্টা নিশ্চিত। যাহারা প্রযত্ন সহকারে ক্রিয়াভ্যাসে রত হন এবং যাহাদের মন কুট্স্থে সর্বদা লক্ষ্য রাখিতে পারে তাহাদের বিষয়বাসনা বা রজস্তমোভাব সমূলে উৎপাটিত হইয়া থাকে। সূর্য্যবাহিনী প্রাণ না হইলে বাসনাবীজ নষ্ট হয় না, এইজন্য আলস্য ও প্রমাদরহিত হইয়া ক্রিয়া করা কর্তব্য। বাসনা-পিঞ্জর হইতে যিনি মুক্ত না হইয়াছেন তিনি কখনও আত্মবিশ্ব বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। বাসনার ক্ষয় হইলেই মনোনাশ হয় এবং মনোনাশ হইলেই স্বরূপে স্থিতি বা মুক্তি লাভ হয়। জীবমুক্ত পুরুষেরাও কণ্ট করেন, কিন্তু তাহারা অভিসন্ধি পূর্ব্বক কর্মে প্রযত্ন হন না। তাহাদের আত্মচিন্তার দ্বারা কোন কর্মদ্বারাই বিচ্ছিন্ন হয় না, এইজন্য তাহাদের আত্মবোধ সদা জাগ্রত। জাগ্রত-স্বপ্নে চৈতন্য থাকিয়াও যেমন চৈতন্য সেই সকল অবস্থা হইতে নিশ্চিন্ত থাকে, জীবমুক্তের সাংসারিক স্থিতিও তজ্জপ। কৃষ্ণের অঙ্গ যেমন প্রয়োজন মত অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়, জীবমুক্তের ইঞ্জিয়সমূহ থাকিয়াও ইঞ্জিয়বিষয় হইতে সর্বদা অন্তর্মুখী হইয়া স্থিরত্ব ভাব প্রাপ্ত হয়।

সমাধি সাধনার অভ্যাস করিতে হইবে, কিন্তু সমাধিও হওয়া সহজ নহে, এই জ্ঞাত প্রযত্ন সহকারে সাধনা করিতে হইবেই এবং সেই সঙ্গ মনে মনে আত্মবিচার করিতে হইবে, যাহা কিছু স্থূল তাহা মনোময় কল্পনারই ঘনীভূত অবস্থা। প্রাণের স্পন্দনই মন বা কল্পনার আশ্রয়। প্রাণের স্পন্দন নিরুদ্ধ হইলেই মন আকাশবৎ হইয়া যায়। সেই আকাশ বা নাদ (নাদ আকাশের গুণ) নিঃশব্দ বিন্দুতে প্রবিষ্ট হয়। বিন্দুই মায়াতীত অবস্থা, উহাই ব্রহ্মদ্বার। সুতরাং তোমার নিজ স্বরূপ সর্বদাই নিঃশব্দ; এই ভাবটী অমুত্তর করিতে চেষ্টা কর, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে তুমি হেহ নহ। “ন কিঞ্চিৎ হেহ দেহাদি ন চ ভোগাদি বিদ্যতে।” দেহাদি ব্যস্তিবকই নাই, সুতরাং হেহজনিত দুঃখাদিও অস্তিত্ব নাই।

যাহারা বন্ধন মুক্ত হইবার জ্ঞাত সুদৃঢ়চেত, তাহাদের বশিষ্ঠগীতার এই উপদেশ সর্বদা স্মরণ রাখা কর্তব্য—

“আসক্তিমাছঃ কর্তৃত্বমকর্তু রপি উক্তবেৎ।

মৌর্য্যে স্থিতে হি মনসি তন্মাসৌর্য্যং পরিভাষেৎ॥”

মন যদি মুক্ত হয় তবে সেই সঙ্গে আসক্তি থাকিবেই, অতএব মূর্খতাই প্রথমে পরিত্যজ্য। আসক্তিই আসল কর্তব্য, যদি কর্ম নাও কর তথাপি আসক্তি বতর্হীন আছে, ততর্হীন তুমি কর্ম না করিলেও কর্তা। কর্তব্য হেতু সুতরাং বন্ধনও অনিবার্য্য, এইজন্য ভগবানের ও বশিষ্ঠ-দেবের এই উপদেশ—“যোগস্থঃ কুরু কণ্ঠাশি সঙ্গং ত্যক্তা ধনঞ্জয়।” নিঃশব্দ হইয়া সিদ্ধি-অসিদ্ধি সমভাবে গ্রহণ করিয়া কর্ম কর।

“শান্ত-ব্রহ্মবপুর্ভূতা কৰ্ম ব্রহ্মময়ং কুরু।

ব্রহ্মার্পণমগ্ধাচারো ব্রহ্মৈব ভবসি ক্ষণাৎ ॥”

ব্রহ্ম যেমন শান্ত, ব্রহ্মচিন্তা দ্বারা তুমিও সেইরূপ শান্ত হইয়া কৰ্ম কর। জল ও ঘূলের তরঙ্গ
যে রূপ অভিন্ন, কৰ্মও সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। এইরূপে কৰ্ম ব্রহ্মার্পিত হইলে তুমি
ক্ষণেকের মধ্যেই ব্রহ্মরূপ হইয়া যাইবে।

যদি ইহা করিতে না পার তবে সৰ্বত্র সন্তুষ্ট ঈশ্বরভাব দর্শন করিবার চেষ্টা কর--

“ঈশ্বরার্পিত সৰ্বার্থ ঈশ্বরাত্মা নিরাময়ঃ।

ঈশ্বরার্পণ

ঈশ্বরঃ সৰ্বভূতাত্মা ভব ভূষিতভূতলঃ ॥”

ঈশ্বরাত্মায় সৰ্ব কৰ্ম সমর্পণ করিয়া ঈশ্বরেই মন নিমগ্ন কর, তাহা হইলেও তুমি নিরাময়
হইতে পারিবে। সৰ্বভূতের আত্মাই যে ঈশ্বর, ঈশ্বরার্পিত চিত্তে কৰ্ম করিতে পারিলেও
তুমি জগতের ভূষণস্বরূপ হইবে।

“সংশান্ত-সৰ্বসঙ্কল্পঃ সমঃ শান্তমনা মুনিঃ।

সংশাস্তযোগ-যুক্তাত্মা কুর্কন্ যুক্তমতির্ভব ॥”

হুমি সৰ্ব সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া শান্তমনা হইয়া দেখ তুমিই সৰ্বত্র সমভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছ।
এইরূপ সৰ্ব-সঙ্কল্প ত্যাগ হইলেই তুমি যুক্তাত্মা হইয়া সৰ্বসঙ্গ ত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে।

“সৰ্বসঙ্কল্পসংশোভো প্রশান্তমনবাসনম্।

ন কিঞ্চিদ্ভাবনাকারং যৎ তদ্ ব্রহ্মপদং বিদুঃ ॥”

যখন সঙ্কল্প সম্যক্রূপে শাস্ত হয়, বাসনাসমূহ প্রশান্ত হয়, চিত্তে কোনপ্রকার ভাবনার উদয়
হয় না, তাহাকেই ব্রহ্মভাবে অবস্থিত বলিয়া জানিবে। অন্যদিকাল হইতে চিত্তে যে কণ্ঠ-
সংস্কার সঞ্চিত থাকে তাহাই বাসনা। জলের মধ্যে মৃত্তিকা
সঙ্কল, বাসনা ও ভাবনা

থাকিলেও জলকে স্বচ্ছ দেখায়, কিন্তু জলটি যদি আলোড়িত

হয় তাহা হইলেই অস্বচ্ছ হয়। চিত্তে বাসনা থাকেই, তাহাকে আলোচনা করিলেই
তদ্বিষয়ক সঙ্কল্প হয়, সঙ্কল্পকে আলোড়ন করিলেই তাহা ভাবনারূপে পরিণত হয়—এই সঙ্কল্প,
বাসনা ও ভাবনা চিত্ত হইতে মুছিয়া গেলেই চিত্তের চিত্ত্ব থাকে না, চিত্তের এইরূপ প্রশান্ত
তাবই জীবন্তত্বের লক্ষণ। চিত্তই অজ্ঞানের বাসস্থান, চিত্ত ক্ষয় হইলেই অজ্ঞান নাশ হয়।
চিত্তই কৰ্মময় বাসনা দ্বারা কার্যরূপে পরিণত হয় এবং উহাই সমস্ত কৰ্মভাব বা শক্তির
মূল, এবং ব্রহ্মই চিত্তের আশ্রয়। যখন চিত্ত হইতে কৰ্মবাসনা বিলুপ্ত হয়, তখন চিত্তও ক্ষয়
হইয়া যায়, সুতরাং তখন এক ব্রহ্মভাব ব্যতীত অত্র কিছু থাকিতে পারে না। তখন অন্তর
বহিঃ সমস্তই ব্রহ্মময়।

“সমস্ত-কলনাঞ্চালস্তেশ্বরৈষৈক-ভাবনা।

কিঃ রিয়া বর্ধ প্রকার্ণ করিতেঃঃঃঃ

গলিত্ত্বৈতনির্ভাসমেতদেবেশ্বরার্পণম্ ॥”

যদিও জড় ও চৈতন্যকে বিচারার্থ পৃথক্ করিয়াই বুঝিতে হয়, কিন্তু বাস্তবিক জড় বলিয়া
কোন বস্তু নাই। চৈতন্য যখন তমঃ দ্বারা অভিভূত হন তখনই তাহা জড় দৃশ্যরূপে প্রতীত
হয়। জড় পৃথক্ কিছু বস্তু নহে। বোধরূপে সমস্ত বস্তুই এক চিৎস্বরূপ। সমস্ত বস্তুই

ঈশ্বর, এই ভাবনায় যখন বৈতন্যতা বিগলিত হয়, তাহাই প্রকৃত ঈশ্বরার্পণ। বৈতন্য
বিদূষিত হইলেই আর শোক তাপে সন্তপ্ত হইতে হয় না। অর্জুনের এই অবস্থা হইয়াছিল,
ভাগবতে বর্ণিত আছে :—

“বাসুদেবাজ্ঞামুধ্যান পরিত্যক্তং হন্য।

ভক্ত্যা নিশ্চলিতাশেষ-কষায়ধিষণৌজ্জ্বলঃ ॥

গীতাং ভগবতা জ্ঞানং যন্তং সংগ্রামমুর্দনি।

কালকর্মতমোরুদ্বং পুনরধ্যগমম্ভিতুঃ ॥

বিশোকো ব্রহ্মনস্পত্ত্যা সংহির্ষিতৈতৎসংশয়ঃ।

লীনপ্রকৃতির্নৈশ্চল্যলিপ্তদ্বাদসম্ভবঃ ॥”

শ্রীকৃষ্ণের স্বধাম গমনের পর অর্জুনের হৃদয় অত্যন্ত শূন্য হইয়া গেল, তখন তিনি বাসুদেবের
চরণযুগল নিয়ত ধ্যান দ্বারা বদ্ধিত ভক্তিবৈগ দ্বারা, কামাধি বিষয়বাসনা-বিরহিত নির্মল
অন্তঃকরণ দ্বারা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সময়ে শ্রীকৃষ্ণ যে জ্ঞান উপদেশ দিয়াছিলেন বাহ্য কাল ও কৰ্ম
রূপ অন্ধকার দ্বারা আবৃত হইয়া গিয়াছিল, সেই তত্ত্বজ্ঞান আবার লাভ করিলেন। এইরূপ
ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা প্রকৃতি লীন হইলে সত্ত্বাধি গুণত্রয় ও গুণত্রয়ের কার্যভূত লিপ্তসারীবিষয়ক
জ্ঞান থাকে না ও তদ্বিবন্ধন স্থলশরীরেও অস্তিমান তিরোহিত হয়। এইরূপ বৈতন্যমের
মূলভূত অবিভাবিলয়ে অর্জুনের সম্যক্রূপে শোক বিরহিত হইলেন।

ভগবানের রূপময় ভাবটীও বড় সুন্দর। আমাদের রূপ দেখাই অভ্যাস, এইজন্ত অরূপের

ভগবানের অরূপ চিন্তন

ও

রূপময় বিগ্রহ

কথা শুনিলেই ভয় হয়। তাই রূপ-বিবর্জিত ব্রহ্মভাবকে

আমাদের শূন্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ইহা প্রকৃত কথা

নহে; অরূপের মধ্যেও বাঁহাদের চিত্ত মগ্ন হইয়া যায়

তাঁহারাও এমন কি একটি বস্তুর সন্ধান পান বাহ্য রূপের মধ্যেও হ্রস্বত। এই রূপময়

ভাবেই দুইটি স্বরূপ আছে। একটি সমস্ত এক করা জ্যোতির্ময় রূপ, তাহা শুদ্ধ জ্যোতিঃ

মাত্রই। ত্রিভুবনের সমস্ত রূপ ঐ জ্যোতির মধ্যে প্রবেশ করিয়া জ্যোতিঃরূপতা প্রাপ্ত হয়।

তাহাও রূপ বটে কিন্তু ঘোর প্রচণ্ড রূপ—এ রূপের মধ্যে অত্র বিবিধ বিচিত্র রূপ সব এক

হইয়া যায়। তাই বিশ্বরূপ দর্শনে ভীত অর্জুনকে ভগবান্ তাঁহার মানব মূর্তি দেখাইয়া

আশ্বস্ত করিয়াছিলেন। এ রূপ মানুষের মতই অখণ্ড ঠিক মানুষও নহে, নবনীত-শ্রামল-তমঃ;

এ রূপ বড় চিত্তাকর্ষক। ভক্ত ভাবুকরা এই রূপ বড় পছন্দ করেন। “রূপের লাগি জাঁখি বুঝে,

গুণে মন ভোর। প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁধে প্রতি অঙ্গ মোর।” রূপের প্রতি যে জীবের

স্বাভাবিক মোহ আছে, এই শ্রামযন্ত্রের রূপ দেখিয়া জীবের সেই রূপের মোহ কাটিয়া যায়।

এ রূপ দেখিয়া আর অত্র রূপের দিকে জাঁখি ফিরাইতে ইচ্ছা করে না। এই রূপ কখনও

চিন্তাধী মাহুমুর্জিত, কখনও বাম, কখনও প্রভৃতি ভক্ত-ভাবাত্মক চিন্তন বিগ্রহে তাঁহার অরূপ-

সুন্দর রূপধামি কুটিয়া উঠে। তাহাতে মানুষের মতই প্রাণভরা ভালবাসা, সেই হাসিমাখা

প্রেমবীক্ষণ কি অপূর্ণ শোভাই না বিকীর্ণ করে! ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ, এ মূর্তি সেই

আনন্দের ধনীভূত মূর্তি, তাহা পাকভৌতিক বেহ নহে, তাহা অপ্রাকৃত চিদানন্দরূপ ভাবময় বিগ্রহ। সাংসারিক বিবিধ সৃষ্টির আদর্শই সেই ভগবদ্ভাব শিক্ষা করিতে হয়। আমরা পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু, স্ত্রী, পুত্রের নিকট যে ব্যবহার পাইয়া থাকি, এবং তাহাদের ক্ষুদ্র যে অহুরাগ পোষণ করি, সেই অহুরাগ, সেই ব্যাকুলতা ভগবানের নিমিত্ত হইলেই তাঁহাকে অনায়াসে লাভ করা যায়। যিনি সর্বব্যাপী, সর্বময়, এবং ইন্দ্রিয় মনের অগোচর, তিনিই আবার মায়ামহুগুরূপে ভক্তের স্থূল দর্শন-স্পর্শ-লালসাকেও চরিতার্থ করিয়া থাকেন। তাহাকে যে যে ভাবে ভজনা করে তিনিও তাহাকে সেই ভাবেই ভজনা করেন। যে তাঁহার নিকট সামান্য বিষয়ের প্রার্থী হয় তিনি তাহার সেই বিষয়াভিলাষ মিটাইয়া দিয়া তাহাকে তাঁহার চরণ সেবার অধিকারী করিয়া দেন। এতই তাঁহার করুণা! আমাদের চিত্ত যতদিন গুণময় পাদার্ঘ্যে অভিনিবিষ্ট থাকিবে ততদিন তাঁহার সব-ভুলানো আনন্দময়-স্বরূপে আসক্ত হইতে পারিবে না। যেমন আশ্রয়স্থান তেমনই মায়াতত্ত্ব বিগ্রহে তাঁহার সেই পরমানন্দ স্বরূপ সর্বত্রই আশ্রয়নীয়। গোপীরাও তাই গোপীজন-বল্লভের দর্শনলাভে আনন্দে বিহ্বল হইয়া সর্ব প্রকার তাপশূন্য হইয়াছিলেন।

“তত্রোপবিষ্টো ভগবান্ ন দীপ্যতে।

ভগবানের ধ্যান

যোগেশ্বরাস্তু হৃদি কল্পিতাসনঃ।

চক্ৰাণ গোপীপরিবদগতোহর্জিতঃ

ত্রৈলোক্যলক্ষ্যকপরং বপুর্দধং ॥”

যোগীদ্বয়গণ আপনাদের হৃদয়গড়ে বাঁহার আসন কল্পনা করিয়া থাকেন সেই সর্বোচ্চ ভগবান্ গোপীসভা মধ্যে তাঁহাদের কর্তৃক অর্জিত হইয়া তাঁহাদের উত্তরীয়াসনে উপবিষ্ট হইয়া ত্রৈলোক্যলক্ষীর শোভামূল্য রূপ ধারণ করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন।

“তাপামাবিবভূচ্ছারিঃ স্রয়মান-মুখাশুভঃ।

পীতাম্বরধরঃ স্রযী সাকাম্যমুখ-মস্রযঃ ॥”

যখন ক্রকদর্শনে ব্যাকুল হইয়া গোপীরা কাতরচিত্তে বোদন করিতেছিলেন তখন তাহাদের সম্মুখে সম্মিতমুখে ভগবান্ মদনমোহনরূপে আবির্ভূত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণই আনন্দের সেই ধনীভূত মূর্তি, পরমানন্দের নির্যাবরণ রূপ।

ইহাই লোকবিমোহনীয় মায়াতত্ত্ব, গুণসম্বন্ধশূন্য, ইহাতে সমস্ত ইন্দ্রিয় পরিত্যক্ত হয়—অথচ তাহাতে কামগন্ধ নাই। ইড়া জড় নহে, সাক্ষাৎ চিহ্নময় বস্তু। এখানে স্থূল নাই অথচ স্থূলের গন্ধ ও শোভা আছে, দ্রব্য নাই অথচ মিষ্টতা আছে, বেহ নাই অথচ রূপ আছে। বেহ ও দ্রব্য লইয়াই কামের বেলা, তাহা প্রাকৃতভাব মাত্র। কিন্তু ঐ রূপ, ঐ হাসি, ঐ ঞ্জালবাসা অপ্রাকৃত, তাই ভগবান্ মদনমোহন। ইহাই অরূপের রূপ। ভগবানের আর একটা রূপ আছে, তাহা বর্ণ বা রূপ নহে, তাহা কেবল অরূপ, তাহা ভাবনয়ও নহে, তাহা বিত্ত্ব সত্তা মাত্র। তাহা সহজে কেহ বুঝিতে পারে না। তাহাই আপনাতে আপনি, উহাকেই শ্রীকৃষ্ণের ক্রিয়ার পর-অবস্থা বলিয়াছেন। প্রথমটিকে

সামান্য বা মায়াতত্ত্ব বলে, শেষেরটাই তাঁহার পরম রূপ এবং উহা নিত্য, আত্মস্তব্ধিত ও মায়া পরপার। প্রথম রূপটি ভক্তের প্রাণকে আকর্ষণ করে, ভক্ত যখন সেইরূপ ঘেঁষিতে দেখিতে বা স্মরণ করিতে করিতে তন্ময় হইয়া যান, তখন তাঁহার চিত্ত শুদ্ধ হইয়া যায়, সেই শুদ্ধচিত্তেই পরমরূপ প্রকাশিত হয়; চিত্ত অন্তঃস্থ থাকিতে কিছুতেই বুঝা যায় না। এইরূপ প্রথম ভাবের পূজা ও যোগাদি অভ্যাস করিতে করিতে চিত্ত যখন লয়-বিক্ষেপরূপ মল-শূন্য হয় সেই নির্মল সত্ত্ব হইতেই আত্মস্তব্ধিত জ্ঞানময় পরমরূপটিকে বুঝা যায়।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই পরমরূপের পরিচয় দিতেছেন—

“সামান্যং পরমং চৈব ঘে রূপে বিজি মেহনব।

পাণ্যাহির্যুজঃ সামান্যং শব্দচক্রেগদাধরম্ ॥

পরং রূপমনাস্তত্ত্বং সন্মমৈকমনাময়ম্।

ত্রক্ষাশ্রপরমাশ্রাধি শব্দেনৈতদ্ব্যবহাতে ॥”

যে অনব, আমার সামান্য ও পরম দুইটা রূপ আছে জানিও। যেটা হস্তপদাদিবিশিষ্ট শব্দচক্রেগদাধারী রূপ তাহাই আমার সামান্য রূপ, আর যেটা আমার পরমরূপ সেইটা আদি-অন্তহীন ও অনাময়, উহা ব্রহ্ম, পরমাত্মা শব্দে অভিহিত।

“যাবৎপ্রতিবুদ্ধন্তং অনাস্তজ্ঞতয়া স্থিতঃ।

তাবচ্চতুর্ভুজাকারং দেবপূজ্যপরো ভব ॥

তৎক্রমাৎ সম্প্রবুদ্ধন্তং ততো জ্ঞাতসি তৎপরম্।

মম রূপমনাস্তত্ত্বং যেন ভূয়ো ন জায়তে ॥”

আত্মজ্ঞানের অর্থাৎ হেতু যতদিন তুমি প্রবুদ্ধ না হও, ততদিন তুমি চতুর্ভুজাকার আমার সামান্য রূপের পূজা করিও। এইরূপ বাহ পূজা করিতে করিতে যখন তুমি প্রবুদ্ধ হইবে তখন তুমি আমার আত্মস্তব্ধিত পরমরূপটি জানিতে পারিবে, যাহা জানিলে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

“প্রতিবিধেধিবার্দ্দশমং সাক্ষিবহাস্থিতম্।

নশ্রুৎসু ন বিনশ্রুতং যঃ পশ্চতি স পশ্চতি ॥”

আমি সাক্ষীস্বরূপে অবস্থিত, দর্পণে প্রতিবিম্ব দর্শনের তায় লোকে আমাতে জগৎ দর্শন করে। আমার মায়াদর্পণে প্রতিবিম্বিত জগৎরূপের আমি সাক্ষী মাত্র; মায়াদর্পণ সঙ্কুচিত হইলেই আর প্রতিবিম্ব দর্শন হয় না, হুতরাং প্রতিবিম্ব নষ্ট হইলেও সাক্ষীস্বরূপ আত্মা চিৎ-বর্জমান—ইহা যিনি জানেন তিনিই ঠিক জানেন। অতএব—

“ন কুর্ধ্যাজোগ সন্ত্যাগং ন কুর্ধ্যাজোগভাবনম্।

স্থাতব্যং হৃদয়েনৈব যথাপ্রাপ্তাহুর্ভবিতী ॥”

বেহ ধারণের ক্ষমতা যাহা প্রয়োজনীয় সেইটুকু ভোগ ত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই, এবং ভোগের বিচিহ্নতার ক্ষমতা চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই। মনে সর্বদা সমতা রক্ষা করিয়া যথাপ্রাপ্ত বিষয়ের অহুর্ভবন করিবে।

“নানাত-মলমুৎপজ্য পরমাত্মকভাঃ গতঃ ।

কুর্স্বন কার্যমকার্যাক নৈব কৰ্ত্তা ভুমজ্জ্বন ॥”

হে অজ্ঞান, নানাত-মল পরিত্যাগ করিয়া পরমাত্মময়তা লাভ কর । (চিত্তকে ব্রহ্মভাবে ভাবিত করিতে পারিলে পরমাত্মভাবে স্থিতি লাভ হয়), সেই অবস্থায় কার্যাই হউক বা অকার্যই হউক, তুমি কৰ্ত্তা নহ ।

—আত্মজ্ঞান লাভের উপায়—

মনঃশাসন, যোগাভ্যাস ও প্রাণায়াম ।

আত্মা স্বয়ং শুদ্ধ ও নির্মল, প্রকৃতির কোন রূপে তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না । “ধাত্মা যেন সধা নিবৃত্তকৃৎকং”—পরমাত্মা বা ভগবানের নিজধামে মায়া আপন কৃৎক বিচারে সর্বদা অসমর্থ । ভগবানের সেই স্বকীয় পরমধাম বাহা “শুদ্ধমত্যন্তনির্মলং” বুদ্ধির দ্বারা সেইটী বুদ্ধিতে পারাই জ্ঞানালোচনার ফল । আত্মা দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেহ-প্রকৃতির সুখ-দুঃখাধি আপনায় সুখ-দুঃখ বলিয়া অনুভব করেন । এই কল্পিত সুখ-দুঃখের অনুভূতির দ্বারা আত্মা দেহে বদ্ধ হইয়া থাকেন । পুনঃ পুনঃ এইরূপ সুখ-দুঃখ অনুভব করিতে করিতে আত্মা যেন দেহরূপতাই প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া অনুভব হয় । এই অবস্থা হইতে একই আত্মার দুইটা বিভাব প্রকাশ পায়, তখন একটীকে জীবাত্মা ও অপরটীকে পরমাত্মা সংজ্ঞা দেওয়া হয় । জীবাত্মা প্রকৃতই পরমাত্মা হইতে অভিন্ন, কিন্তু তিনি যখন প্রকৃতির সহিত মিলিয়া যান, প্রকৃতির কার্যকে আপনায় কার্য বলিয়া অভিমান করেন তখনই তাঁহার জীব সংজ্ঞা হয় । পরমাত্মা ঈশ্বর, সুখ-দুঃখাধি জন্ম-মরণের অতীত, কিন্তু জীব অমৌলিক, শোকে মোহে মুহমান এবং জন্ম-মৃত্যুর নিয়ত অধীন । জীব কিন্তু আবার নিজ অধিকার প্রাপ্ত হইতে পারেন ক্ষতিতে তাহার উপদেশ আছে—

“বা সুপর্ণা সমুজ্জা সধায়া সমানং বৃক্ষং পরিষরজ্ঞাতে ।

তয়োৱজ্ঞঃ শিল্পপং স্বাভ্যন্তানশ্লগ্নোহভিচাক্ষীতি ॥

সমানে বৃক্ষে পুৰুষো নিমগ্নোহশ্লগ্না শোচতি মুহমানঃ ।

জুহুং বদা পতত্যাত্মমীশমন্ত বহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥

(যুগল, তৃতীয়)

সর্বদা সংযুক্ত তুল্য-স্বভাব জীব ও ঈশ্বররূপ দুইটা পক্ষী একই শরীররূপ বৃক্ষে অবস্থিত রহিয়াছেন । সেই উভয়ের মধ্যে একটী (অর্থাৎ জীব) বিচিত্র স্বাচ্ছন্দ্যকর্মফল ভোগ করে এবং অপরটী (নিত্যমুক্ত সর্বজ্ঞ ঈশ্বর) ভোগ না করিয়া দর্শন করেন মাত্র । জীব একই দেহরূপ বৃক্ষে (ঈশ্বরের সহিত) অবস্থিত হইয়াও বীর ঐশ্বর্যে অজ্ঞাত বা বিব্রত বশতঃ মোহগ্রস্ত হইয়া জীপুত্রাদির বিরোধে ও অর্থাধির নাশে শোকাচ্ছন্ন হইয়া দুঃখভোগ করিয়া থাকে । সেই ব্রাত্ত জীবই বহু জন্ম পরে আবার যখন সঙ্কল্পরূপে লেখন লাভ করিয়া জ্ঞানের উচ্চতম শিখরে আরুঢ় হয়, তখন জীবতাব হইতে বিলম্ব ঈশ্বরকে দর্শন করে এবং তাঁহার মহিমা (ঐশ্বর্য) উপলব্ধি করে, অর্থাৎ ভিতর বাহির বা কিছু সমস্তই তাঁহার

প্রকাশ, তাঁহা হইতে পৃথক সত্তা আর কাহারও নাই এইটী সম্যক উপলব্ধি করিয়া তখন সে-ও সমাহিতচিত্ত হইয়া হৃৎখাতীত অবস্থা লাভ করে ।

মহাভারতেও এইরূপ আছে—“পরমাত্মা আমার পরমবন্ধু, তাঁহাকে আশ্রয় করিলে আমি তাঁহার স্বরূপ লাভ করিয়া তাঁহা হইতে অভিন্ন হইতে পারি । তাঁহা হইতে আমার কোন অংশে ন্যূনতা নাই । আমি তাঁহারই দ্বার নির্মল ও অব্যক্ত সন্দেহ নাই । মোহবশতঃ প্রকৃতির বশীভূত হওয়াতেই আমার এরূপ দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে । আমি নিশ্চয় হইয়াও সগুণ প্রকৃতির সহবাসে এতকাল অতিক্রম করিলাম, আমার মত নিকোঁশ আর কে আছে ?”

এই দুর্দশা হইতে মুক্তিলাভের অস্ত্র শাস্ত্র উপদেশ দিলেন—“প্রকৃতের্ভিন্নমাত্মানং বিচারয় সদাহনব ॥” হে অনব, “প্রকৃতি হইতে আত্মা ভিন্ন” সর্বদা এই বিচার কর । গীতাতে ভগবান এই কথাই সমর্থন করিয়াছেন—

“উপদ্রষ্টুং হুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা যতেশ্বরঃ ।

পরমাত্মোতি চাপ্যুক্তো দেহেহস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥ ১৩ অঃ

নান্নং গুণেভ্যঃ কৰ্ত্তারং যদা জ্ঞেয়রূপভূতি ।

গুণেভ্যাস্ত পরং বেত্তি মন্তাবং সোহধিগচ্ছতি ॥ ১৪ অঃ

ঈশ্বর স্বামী ইহার ব্যাখ্যা বলিয়াছেন—প্রকৃতির অবিবেকবশতঃ পুরুষের এই সংসার ; বশতঃ পুরুষের সংসার নাই । প্রকৃতির কার্য দেহে অবস্থিত থাকিয়াও পুরুষ প্রকৃতি হইতে ভিন্ন অর্থাৎ প্রকৃতির গুণে যুক্ত নহেন । কারণ তিনি প্রকৃতির কার্যের সাক্ষীমাত্র, তিনি অনুমন্তা অর্থাৎ সন্নিধিমাত্রই অগ্রাহক (নির্জিগৃহ্যাবে অনুমোদন করেন) । তিনি ভর্ত্তা অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়ের সত্তাস্বরূপ তাঁহা হইতেই হয়, তিনি না থাকিলে দেহেন্দ্রিয় মন বুদ্ধি কাহারও পুষ্টি হয় না । তিনি ভোক্তা অর্থাৎ সুখদুঃখাধিরূপ বুদ্ধিবৃত্তির তিনি উপলব্ধি কৰ্ত্তা, তিনি না থাকিলে কোন কিছুই অনুভব হইত না । তিনি মহেশ্বর অর্থাৎ জীবাত্মার তিনিই মূল বলিয়া তিনিই পরমাত্মা । এই দেহে অবস্থিত যে পুরুষ তিনিই পর-পুরুষ অর্থাৎ প্রেষ্ঠ । নানা পাত্রস্থিত জলে যেমন এক চন্দ্রেরই প্রতিবিম্ব পড়ে, তরুণ নানা দেহমধ্যে এক সত্য ব্রহ্মেরই সমস্ত জীবাত্মা প্রতিবিম্ব মাত্র । ক্ষতিও বলিয়াছেন—“এব সর্কেষ্বর এব ভূতাদিধপতি এব লোকপালঃ ॥” প্রকৃতির গুণসমূহেই সংসার-বাছল্য বর্জন করিয়া একগুণ তদ্ব্যতিরেকে এই মোক্ষপ্রাপ্তির বিষয় বলিতেছেন—প্রকৃতিগুণ সগুহই বুদ্ধ্যাধি আকারে পরিণত হইয়া স্বর্গ করে গুণ হইতে ভিন্ন আত্মা সদা সাক্ষীরূপ বলিয়া যিনি অবগত হন তিনি তখন আমার ভাব অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন ।

আনি না জীব নিজের সেই স্বরূপকে কিরূপে ভুলিয়া গিয়াছে ? বাহা হউক এখন আবার তাহার নিজস্বরূপের সহিত তাহার পরিচয় হওয়া আবশ্যক । নিজস্বরূপকে চিনিয়া লইবার যে প্রণালী তাহা ভগবান গীতার বহুস্থানে ব্যাখ্যা করিয়াছেন । ভগবান

বলিয়াছেন—

“ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মন সাধর্ষ্যমাগতাঃ।

সর্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যধন্তি চ ॥”

এই জ্ঞান লাভ করিয়া বাহ্যর। আমার সাধর্ষ্য লাভ করেন অর্থাৎ ত্রিগুণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হন, তাহার। সৃষ্টকালেও জন্মগ্রহণ করেন না, প্রলয়কালেও লয়প্রাপ্ত হন না।

এখন বুঝা গেল জন্ম-মরণের দুঃখভোগই জীবত্ব, এই জীবত্ব ঘুচিবে কিরূপে?

যোগমায়াধারা সমাচ্ছন্ন জীব নিজ স্বরূপকে ভুলিয়া দেহেতে আত্মবুদ্ধি স্থাপন করিয়াছে, তাই সে দীন হইয়া-আত্ম হইয়া কেবল আশ্রয় খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, এই পথহারা ভ্রান্ত পথিকের অন্তই ঋষিরা সাধন পথ নির্দেশ করিয়াছেন। জীব যতদিন মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে ততদিন তাহার উচ্চলক্ষ্য থাকে না, ততদিন সে পশুর মত জীবন যাপন করে। আহা, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন ইহাই জীবসাধারণের ধর্ম। মহুগ্ন ও মহুগ্নোত্তর জীব সকলেই সাধারণতঃ এই ধর্ম দ্বারা পরিচালিত হয়। সমস্ত জীবদেহ হইতে মহুগ্ন দেহই সর্বোত্তম দেহ। এই দেহ পাইয়াই জীব যুক্তির সোপান অধেষণে স্বত্বশীল হইতে পারে। মহুগ্নের মধ্যে এই ধর্ম অনন্তসাধারণ। উহাই জ্ঞান। মহুগ্নের মধ্যে যে পশুভাব রহিয়াছে-এই জ্ঞান দ্বারাই সে তাহার এই পশুভাব সংবৃত করিয়া দিব্যভাব কুটাইয়া তুলিতে পারে, ইহাই জীবের পরিত্রাণ। বাহ্যর। মোক্ষের সোপানভূত সুদূরলভ মহুগ্নদেহ পাইয়া এই দেহমধ্যস্থ জীবকে পরিত্রাণের চেষ্টা না করে, তদপেক্ষা মহাপাপী আর কে হইতে পারে?

“সোপানভূতং মোক্ষস্ত মহুগ্নঃ প্রাপ্য হুর্লভম্।

যন্তায়ত্তি নাত্মানং তস্যাং পাপতরোহিত্র কঃ ॥” (কুলার্গব)

পশুত্ব সংযমের অধিকারী ভেদে ঋষিরা তিনটি উপায় নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাই কর্ম (যোগ), ভক্তি ও জ্ঞান নামে আখ্যাত হইয়াছে। প্রাণ, মন, বুদ্ধিই যথাক্রমে কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান লাভের সাধন। এই পঞ্চায় দ্বারাই জীব পুনরায় নিজধামে প্রবেশ করিতে পারে। প্রাণ, মন বুদ্ধির বাহ্য স্বাভাবিক গতি বা ধর্ম তাহার চন্দ্রাহবর্জনই জীব-ধর্ম। কিন্তু মহুগ্ন বুদ্ধির সাহায্যে উচ্চ বিচার দ্বারা এই চন্দ্রাহবর্জনই জীব-ধর্ম। কিন্তু মহুগ্ন ভক্তি ও জ্ঞানাত্মক দ্বারা মহুগ্ন যখন আপনার সমস্ত শক্তিকে পরিচালনা করিতে উত্তত হয় ও পরে কৃতকার্য হয় তখনই সে দেবত্বলাভ করিতে পারে। এইরূপ অসুশীলন বা ভগবদ্ভজনের জন্য পাপক্ষয় হওয়া আবশ্যক, নচেৎ ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য জীবের মধ্যে সেরূপ আগ্রহ উৎপন্ন হয় না। তাহারাই ভগবানকে দৃঢ়ভাবে ভজনা করিতে পারে বাহ্যের পাপক্ষয় হইয়া গিয়াছে। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—

“যেযাং তন্তুগতং পাপং জনানাং পূণ্যকর্মণাম্।

তে বন্দমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ভ্রতাঃ ॥”

বন্দ-মোহ-নির্মুক্ত নহে বলিয়াই ভগবানকে দৃঢ়ভাবে ভজনা করিবার প্রযুক্তি সাধারণ মহুগ্নের মধ্যে তেমন প্রবল ভাবে আসে না। মহুগ্নের পাশবিক ধর্মগুলিই উহার প্রধান

অস্তরায়। এই পশুভাবের উপরে উঠিতে না পারিলে জীবের মধ্যে যে একটি অসাধারণ শক্তি বা ধর্ম রহিয়াছে তাহা পরিপূর্ণ হইতে পারে না। তাই ভগবান অজ্ঞানকে সতর্ক করিয়া দিব্যর অন্ত বলিতেছেন—

“কাম এষ ক্রোধ এষ বজ্রোত্তপসমুদ্ভবঃ।

মহাশনো মহাপাপ্য। বিজ্ঞানমিহ বৈরিণম্ ॥” গীতা, ৩য় অঃ

বজ্রোত্তপজাত হৃৎপুণীর ও অত্যাগ্র কাম এবং ক্রোধ ইহাদ্বিগকে মোক্ষমার্গের পশম শত্রু বলিয়া জানিবে।

“আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।

কামরূপেণ কৌন্তেয় হৃৎপুণেনানলেন চ ॥

ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরশ্চাধিষ্ঠানমুচ্যতে।

এতৈর্বিমোহয়তোষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥

তস্যাং তুমিচ্ছিয়াণ্যার্দো নিয়ম্য তবতর্জভ।

পাপানং শত্রুহি ছেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥”

হে কৌন্তেয়, জ্ঞানীর চিরশত্রু এই কামরূপ অপূর্ণবীর অগ্নিতে জ্ঞান আচ্ছন্ন হয়। ইন্দ্রিয় সমূহ, মন ও বুদ্ধি এই কামের আশ্রয়। কাম ইহাদিগের দ্বারা জ্ঞানকে আবৃত করিয়া দেহীকে বিমোহিত করে। অতএব, হে ভরতশ্রেষ্ঠ, তুমি প্রথমে ইন্দ্রিয়গণকে সংবৃত করিয়া জ্ঞান ও বিজ্ঞানের নাশক এই পাপরূপ কামকে বিনাশ কর।

যতদিন এই সকল পশুবৃত্তি দমিত না হয় ততদিন প্রাণ, মন ও বুদ্ধির মধ্যে যে অলৌকিক শক্তি রহিয়াছে তাহার কোন সন্ধানই মহুগ্ন পায় না। এই অলৌকিক শক্তি প্রকৃতি করিবার উপায় ঋষিরা শাস্ত্রে বহুস্থানে আলোচনা করিয়াছেন। প্রাণ, মন ও বুদ্ধিকে দৈবী-ধর্মের অন্তর্কুলছন্দে পরিচালিত করিলেই আমাদের ধর্ম লাভ হয়, ভক্তি ও জ্ঞান লাভ হয়। যোগ, ভক্তি ও জ্ঞানাত্মক দ্বারা প্রাণ, মন ও বুদ্ধি যত উৎকর্ষতা লাভ করিবে ততই উহার ঈশ্বরমুখী হইবে। ইহাদের চরম উৎকর্ষতার দ্বারাই জীবের জীবত্ব মোচন হয়। প্রথমে প্রাণশক্তির বিষয় আলোচনা করা যাক। প্রাণশক্তিকে দৈবী সম্পদের অন্তর্কুল ভাবে পরিচালনা করিতে না পারিলে এই প্রাণই ভগবানের সহিত যোগযুক্ত হইবার পক্ষে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান অস্তরায় হইয়া দাঁড়াইবে। প্রাণশক্তির কার্য্য স্পন্দন। প্রাণশক্তি দ্বারা স্পন্দিত হইয়াই ইন্দ্রিয়, দেহ, মন অনবরত বিষয়াভিযুগে ছুটিয়া যাইতেছে। প্রাণের গতিও যেমন অবিচলভাবে ছুটিয়া চলিয়াছে, ইন্দ্রিয়দেব বিষয়গ্রহণ-স্পৃহাও তদ্রূপ বলবতী হইতেছে। এইজন্য প্রাণশক্তিকে যথেষ্ট স্পন্দিত হইতে না দিয়া বাহ্যেতে উহার গতি দৈবীসম্পদের অভিমুখে প্রসারিত হয়, সেই চেষ্টা করাট সাধকের প্রথম প্রয়োজন। যে বিজ্ঞা বা কৌশল দ্বারা প্রাণকে দৈবীভাবে অহুপ্রাণিত করা যায় ঋষিরা সেই বিজ্ঞাকেই যোগবিজ্ঞা বলিয়াছেন, উহার প্রধান অঙ্গই প্রাণায়াম।

প্রাণ যদি স্বচ্ছ বা নির্মল হয় তবে তাহার গতির মধ্যে অতিরিক্ত বেগ থাকিতে পারে না এবং প্রাণশক্তিই মনরূপে কার্য্য করে বলিয়া প্রাণের স্পন্দন যত কমিতে থাকে মনও তদনুরূপ নিষ্পন্দিত হইয়া যায়। সুতরাং সেই পরমাণে মনের বিষয়-গ্রহণ-স্পৃহাও কম হইতে থাকে। এইরূপে মনের চুটাছুটি কমিয়া আসিলে মনও স্থির হইয়া আইসে। ইহাই মনের বিপুলতা। কারণ সঙ্কল্প-বিকল্পের দ্বারাই মন অগুচি হইয়া থাকে। মনের শুদ্ধি হইলে বুদ্ধিও নির্মল এবং একমুখী হইয়া থাকে। বুদ্ধির একাগ্রতা বুদ্ধিও এই দ্বারাই সম্পাদিত হয়। এই একাগ্রতা বাহার যত অধিক তাহার তত বেশী ধ্যেয় বস্তুর প্রতি ভক্তি বা ভাসবাসা ক্ষম্যে। একটী বস্তুর প্রতি এইরূপ একাগ্রতা যে পরিমাণে স্থাপিত হইবে তত অধিক সেই বস্তুর প্রতি তাহার প্রীতি উপন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। এইরূপে ধ্যেয় বস্তুকে ভাল লাগিতে লাগিতে মনের সেই ক্ষীণ স্পন্দনও আর বন্ধ থাকিবে না তখনই “নিরোধ” ভাব আসিবে। এই “নিরোধ বা অরুদ্ধ”রূপই ভগবৎ-স্বরূপ, অর্থাৎ সেখানে মায়ার খেলা সমস্তই। দেহ ইন্দ্রিয়, মন প্রাণ সমস্ত প্রকৃতি-বস্তুরই ক্রিয়া তথায় রুদ্ধ। এইখানে শ্রীমদ্ভগবতের কথা স্বরণ করুন—“দায়া ধেন নদা নিরন্তকুহকং”—ভগবানের স্বধামে মায়ী চিরদিনের অন্ত নিবস্ত। আত্মার বা ভগবানের স্বধামে পৌছিতে হইলে এই প্রাণ-ক্ৰীড়ার গতি রোধ করিতে হইবে। প্রাণায়াম দ্বারাই প্রাণশক্তির গতি রুদ্ধ হয়। এই প্রাণস্পন্দন নিবৃত্ত না হইলে ধ্যান-পূজা কিছুতেই আমাদের অধিকার হয় না। তাই সকল সাধকেরাই অবগত আছেন—আমাদের সঙ্কা, পূজার্কনার মধ্যে প্রথমই কেন প্রাণায়াম ও ভূতওদ্ধির ব্যবস্থা রহিয়াছে। প্রাণায়াম ব্যতীত ভূতওদ্ধি হয় না এবং ভূতওদ্ধি না হইলে পূজার্কনার কোন বিশেষ ফলই লাভ হয় না। উপনিষদও তাই বলিতেছেন—

“এষোহুগ্রাচ্ছা চেতসা বেদিতব্যো

যস্মিন প্রাণঃ পঞ্চথা সংবিবেশ।” যুগল

যে শরীরে পঞ্চথা প্রাণ সম্যক্রূপে প্রবিষ্ট রহিয়াছে সেই শরীরস্থিত আত্মা অতি শূন্য ও চিহ্নপূর্ণ; জ্ঞানের দ্বারাই এই আত্মাকে জানিতে হইবে।

“প্রাণো হেঘঃ যঃ সর্পভূতৈর্জিতাতি”

যিনি সর্পভূতস্থিত দৈবর তিনিই প্রাণরূপে প্রকাশ পাইতেছেন।

“উর্জঃ প্রাণমুন্নয়তাপানং প্রত্যগশ্রুতি।

মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বদেবা উপাসতে।” কঠ

যিনি প্রাণবায়ুকে উর্জ এবং অপান বায়ুকে অধোমিকে রক্ষা করেন অর্থাৎ যখন যোগীর ভিতরের বায়ু ভিতরে থাকে এবং বাহিরের বায়ু বাহিরে থাকে—অর্থাৎ প্রাণাপানের গতি যখন স্বাভাবিক ভাবে স্থির হয়—সেই স্থিরতার মধ্যে “বামনমাসীনং” বামনদেব রহিয়াছেন। বামন অর্থাৎ (বাম—বিপক্ষি ন—ছেদক) যিনি সমস্ত বিপক্ষির ছেদক—তিনি ব্যক্ত হন। জীব মায়েবই শ্বাসের গতি যখন বহির্দিকে গমনাগমন করিতে থাকে ততদিন সংসার লীলার অবসান হয় না; এবং এই জন্ম-মৃত্যুর চক্রের মত বিপত্তি আর কিছুই নাই, সেই বিপত্তির

ছেদন তখনই হয়, যখন এই প্রাণ অন্তর্মুখ হইয়া স্থির হয়। ইহাই শিব-সুন্দর ভাব। এই অবস্থার উপলব্ধি বাহার হয় তিনি বুঝিতে পারেন চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়-দেবতাগণও তাহারের স্ব স্ব বৃত্তি ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার সমীপে অবস্থান করেন। ইহাই পরম শান্তির অবস্থা।

“কন্দিদ্যোরঃ প্রত্যগাত্মানমৈকং আবৃত্তচক্ষুরবৃত্তমিচ্ছন।”

কোন কোন বিবেকী পুরুষ চক্ষুরাধি ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া জীবদেহে প্রকটিত আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন।

ইন্দ্রিয়গণের বিষয়ে উল্লঙ্ঘনের ফলেই তাহার মলাচ্ছাদিত হয়। এই মল বিদূষিত না হইলে ভগবদর্শন বা মোক্ষলাভ হয় না। ইন্দ্রিয়গণের বিষয়-স্পৃহারূপ মল তখনই নষ্ট হয় যখন প্রাণকে নিগ্রহ করিতে পারা যায়। যহ বলিতেছেন—

“দহন্তে গ্রায়মানানাং ধাতুনাং হি যথা মলাঃ।

তথেন্দ্রিয়াণাং হহন্তে যোযাঃ প্রাণস্ত নিগ্রহাৎ॥”

ধাতুর মলাদি যেমন অগ্নিদ্বারাই ভস্মীভূত হয়, তজপ প্রাণনিগ্রহের দ্বারাই ইন্দ্রিয়-দোষসমূহ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

যোগী যাজ্ঞবল্ক্যও প্রাণায়ামের প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন—

“প্রাণায়ামাদুত্তে ন্যস্তং তারকং নবকাশিব।

সংসারার্ণবমর্জনাং তারকং প্রাণসংযমঃ॥”

প্রাণায়াম ব্যতীত নবক হইতে উদ্ধার করিবার অল্প কোন উপায় নাই। বাহার সংসার-সিন্ধুতে মগ্ন হইয়াছে তাহারের পক্ষে প্রাণসংযমই (বা প্রাণায়ামই) একমাত্র তারক অর্থাৎ উদ্ধারকর্তা।

যোগদর্শনে মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন—

“যোগাঙ্গাচ্ছানানামুদ্বিক্রয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ।”

যোগাঙ্গের (যোগাঙ্গ=যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি) অহুষ্ঠান হইতে অগুচির ক্ষয় হইলে বিবেকখ্যাতি পর্যন্ত জ্ঞানদীপ্তি হইতে থাকে।

বাসনা ক্ষয় না হইলে জ্ঞানলাভ হয় না। বাসনা, সঙ্কল্প প্রভৃতিই মনের অন্ধকার। পূর্বেই বলিয়াছি প্রাণের স্পন্দন হইতেই মনের বিক্ষেপ হয়। সুতরাং প্রাণবায়ুর সীমতা সাধন করিতে পারিলে চিত্ত বৃত্তিশূন্য অবস্থায় আসিতে পারে। স্থিরদৃষ্টিতে ভ্রমের সন্ধিস্থানে লক্ষ্য স্থির করিবার অভ্যাস করিলে চিত্তের একাগ্রতা বৃদ্ধি পায়। চিত্তের একাগ্রতা ব্যতীত মোক্ষলাভ হইতে পারে না। প্রাণায়াম সাধন দ্বারা দ্বিত্বশাস হইতে না পারিলে মনকে স্থির করা কঠিন। মন স্থির না হইলে সঙ্কল্প-বিকল্প রহিত হওয়া যায় না। সঙ্কল্প-বিকল্পই বিচিত্র বাসনার জাল, এতদ্বারাই জীব বদ্ধ হইয়া থাকে। অধ্যাত্মবামায়ণ বলিতেছেন—

“নিঃসঙ্কলো যথাপ্রাপ্ত ব্যবহারপরো ভব।

ক্ষয়ে সঙ্কলজালস্ত জীবো ব্রহ্মত্বাপ্নোয়াৎ॥”

সঙ্কল্প জালের ক্ষয় হইলেই জীব ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়।

“অভ্যাশাং হৃদিক্রচেন সত্যসংঘোষবহিনী।

নির্দম্বং বাসনাবীজং ন ভুয়ঃ পরিরোহতি ॥”

অভ্যাসের দৃঢ়তা দ্বারা হৃদয়ে জ্ঞানবহি প্রজ্জলিত হয়, এবং বাসনাবীজ নিঃশেষে দম্ব কর, বীজ দম্ব হইলে আর অঙ্কুর জন্মিবে না।

“সমুদায় প্রাণীর শরীরে কাম, ক্রোধ, ভয়, মিত্রা ও খাস এই পঞ্চ দোষ রহিয়াছে। কামাদি প্রাকৃতিক গুণসমূহকে জয় করিতে পারিলেই জীবাশ্মা দেহাভিমান ত্যাগ করিয়া পরমাত্মার চর্চনলাভে সমর্থ হন। যোগবলে কাম, ক্রোধ, মোহ, অহরাগ ও মেহ এই পঞ্চ দোষ ত্যাগ করিতে পারিলেই মোক্ষ হয়।” মহাত্মারূত, শান্তিপর্ক।

অনেকে মনে করেন যোগাত্ম্যাসাধির মধ্যে যে প্রাণায়াম রহিয়াছে উহা অস্বাভাবিক। প্রাণায়াম বাস্তবিক অস্বাভাবিক হইলে ভগবান্ গীতার মধ্যে উহার উপদেশ দিতেন না। ভগবান্ বজ্রমুঠানের কথা বলিতে গিয়া প্রাণবজ্রের কথা বলিতেছেন—

“অপানে জুহতি প্রাণং প্রাণেশপানং তথাগরে।

প্রাণাপানগতীকৃত্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ॥

অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেহু জুহতি ॥”

কেহ কেহ অপান বায়ুকে প্রাণবায়ুতে এবং কেহ বা প্রাণবায়ুকে অপান বায়ুতে হোম করেন। এইরূপে কেহ কেহ সংযতাহারী যোগী প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়া প্রাণাপানের উর্দ্ধ ও অধোগতি বোধ পূর্বক কৃত্তকদ্বারা প্রাণসকলকে প্রাণেতেই হোম করেন।

“সর্বেহপ্যেতে বজ্রবিদ্যা বজ্রকথিতকথায়াঃ।

বজ্রশিষ্টাশ্রুতভূজো বাস্তি ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥”

এই সকল বজ্রকাহিনীগণ বজ্র সম্পাদন পূর্বক নিম্পাণ হইয়া বজ্রশেষ অমৃত ভোজন করিয়া সনাতন ব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন। শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন—“কৃত্তকে হি সর্বে প্রাণা একীভবন্তি। তজ্জৈব লীল্যমানেষু ইঞ্জিরেষু হোমং ভাবয়ন্তি।” কৃত্তকে সর্বপ্রাণ একীভূত হয়, এই শুভনরূপ কৃত্তক অত্যন্ত স্থির হইতে, যোগী ইঞ্জিরগণকে সেই নিগুহীত প্রাণবায়ুতে লয় করিয়া থাকেন। (শঙ্কর ভাষ্য)

গীতার ভগবান্ আবার পঞ্চম অধ্যায়ে বলিতেছেন—

“স্পর্শান্ কৃদ্বা বহির্জ্ঞানাত্মকং চৈবান্তরে ক্রবোঃ।

প্রাণাপানৌ সৌ কৃদ্বা নাসাত্যন্তরচাষিণৌ ॥

যতেজস্রমনোবুদ্ধি মূর্খনির্মোক্ষপরায়ণাঃ।

বিগতেজ্ঞাত্তরাক্রোধো যঃ সঃ সঃ সঃ ॥”

শ্রীধরস্বামী ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—“অধোদানীং ধ্যামযোগঃ সম্যগ চর্চনস্ত অস্তবদং বিস্তরেন বখ্যামি ইতি তস্য স্পষ্টস্থানীদান্ শ্লোকান্ উপস্থিতম্ ॥” যোগামুঠারী ব্যক্তি মোক্ষপ্রাপ্ত হন ইত্যাদি বলিয়াছেন, সেই যোগই পুনরায় এই দুইটি শ্লোকদ্বারা সংক্ষেপে বলিতেছেন। স্বপ-

সাদি বিষয় সকল চিত্তিত হইলেই তাহার অস্তঃকরণে প্রবিষ্ট হয়। অতএব এই চিত্ত্য ত্যাগ পূর্বক, চক্ষুর্দৃশ্যকে জ্ঞানের মধ্যে রাখিয়া, এবং নাসারন্ধ্রে বিচরণশীল প্রাণ ও অপান বায়ুর উর্দ্ধাধোগতি রোধপূর্বক কৃত্তক করিবে। ষাধারণ ইঞ্জিয়, মন ও বুদ্ধি উক্ত উপায় দ্বারা সংযত হইয়াছে সেই মোক্ষপরায়ণ, ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধশূন্য যে যুনি তিনি জীবিত থাকিলেও সদা মুক্ত।

যোগবাশিষ্ঠে নির্বাণপ্রকরণে শ্রীমান্ ভৃগু এই উপদেশ দিয়াছেন :—

“যদিও প্রাণ ও অপান চঞ্চলস্বভাব তথাপি অভ্যাসের সামর্থ্যে উহার নিশ্চল হইবে। যে পুরুষ নিজ অন্তরে এই সকল জ্ঞাত হইয়া অভ্যাসবান্ হন, সে পুরুষের কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব অভিমান থাকে না। যাহারা প্রাণচিত্তায় রত সেই সকল পুরুষের চিত্ত বিষয়ে প্রযুক্তি লাভ করে না। অনেক মহাপুরুষ এই প্রাণচিত্তা দ্বারা বাহ্য প্রাপ্তব্য তাহা প্রাপ্ত হইয়াছেন। স্থিতি, গতি, জাগ্রৎ, স্বপ্ন সকল সময়েই এই লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারিলে বন্ধন-দশা বিনষ্ট হয়। যাহারা বোধ-প্রাপ্ত তাহারাই প্রাণাপানের অঙ্গসরণ করিয়া থাকে।”

প্রাণের বর্তমান গতি বাহ্য ধ্যানপ্রায়সরূপে বহিতেছে, উহা তাহার স্বাভাবিক গতিপথ নহে, ইহাই উল্টা পথ। বিধিবৎ প্রাণসংযমের দ্বারা নাড়ী-চক্র বিশোধিত হইলেই প্রাণবায়ু ইড়া-পিত্ত-রাস পথ ত্যাগ করিয়া সমুদ্রাস্থ ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করে। তাহার ফলে—

“সমুদ্রাবাহিনি প্রাণে শৃঙে বিশতি মানসে।

তদা সর্কানি কন্দানি নিমূলয়তি যোগিবৎ ॥”

প্রাণ সমুদ্রাবাহী হইলে মন শৃঙেতে প্রবেশ করে, তখন যোগীর সমস্ত কৰ্ম উন্মূলিত হইয়া যায়।

বোধসার গ্রন্থে আছে—“প্রাণায়ামে মনঃসৈবং স তু কৃত্তম্ পতম্”—প্রাণায়াম দ্বারা যখন মন স্থির হয় তখন সেই প্রাণায়াম করিতে সকলেই সক্ষম হইতে পারে।

সমুদ্রাই জ্ঞানপ্রবাহিকা নাড়ী। হৃৎদেশে একশত একটা নাড়ী আছে, তাহারিগের মধ্যে সমুদ্রা নাড়ী ব্রহ্মরাজের অভিমুখে প্রসারিত হইয়াছে। মহত্ত্ব যুত্য়াকালে সেই ব্রহ্মনাড়ী সমুদ্রার সাহায্যে উর্দ্ধলোক (ব্রহ্মলোক বা সহস্রারের) গমন করিয়া অমৃত লাভ করে, অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর অতীত অবস্থা লাভ করে। নানাবিধ গতিহীনী অস্ত্র যে একশত নাড়ী আছে, জীব যুত্য়াকালে যখন সেই সকল নাড়ীযুগ্মে বহির্গত হয় তাহাতে জীবের বিভিন্ন লোকে গতি হয়। তথায় হৃৎ হৃৎখাদি ভোগ করিয়া আবার তাহাকে জন্ম-মৃত্যুর অধীন হইতে হয়।

“শতৈকৈক্য চ হৃৎস্বস্ত নাড্যন্তাসাং মুর্দ্ধানমভিমঃস্রতেকা।

তয়োর্দ্ধমায়াম্মত্বত্বমেতি বিস্ফুট্যা উৎক্রমণে তবন্তি ॥”

(কঠোপনিষৎ)

এই নাকী দিয়া উর্দ্ধগতি লাভের জন্য প্রাণায়ামাহি যোগাভ্যাসের বিশেষ আবশ্যকতা আছে। যেতাত্ত্বতর উপনিষদে সাধনার জন্য এই উপদেশ রহিয়াছে—

“প্রাণান্ প্রণীড়্যেহ সংযুক্তচেষ্ঠঃ
ক্ষীণে প্রাণে নাসিকয়োচ্ছসীত।
দ্রষ্টাশ্চক্ষুর্মিষ বাহমেনং
বিদ্বান্ মনো ধারয়েতাশ্রমন্তঃ॥”

যোগাভ্যাসে প্রযুক্ত বিদ্বান্ পুরুষ সংযুক্তচেষ্ঠে হইয়া সাবধানতার সহিত প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে। রথের দুইশ্বকে যেমন সারথী সংযত করে, প্রাণকে সংযত করিয়া মনকে ধোর-বন্ধতে স্থাপন করিবে। কারণ প্রাণায়াম দ্বারা বাহ্য মনের মূল ক্ষয়প্রাপ্ত হয় তাহারই মন ব্রহ্মে স্থিরতা লাভ করে।

এইজন্য হেথিতে পাই আমাদের সকল শাস্ত্রই—বিশেষ করিয়া তন্ত্র—সমস্ত সন্ধ্যা পূজার্মনার পূর্বেই প্রাণায়াম করিতে বলিয়াছেন। যে ভূতভক্তি না হইলে আত্ম-দর্শন অদূরপর্যন্ত থাকিয়া যায়, সেই ভূতভক্তির প্রধান উপকরণ যোগাঙ্গ প্রাণায়াম।

তাই যোগী গোরক্ষনাথ উক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন—

“যাবদৈশ্বর্য এবিশতি চরন্ মাক্রতো মধ্যমার্গে
বাবহিন্মূর্ন ভবতি বৃদ্ধঃ প্রাণবাত-প্রবক্ষ্যঃ।
যাবৎ ধ্যানং সহজসদৃশং জায়তে নৈব তৎ
তাবজ্জ্ঞানং বধতি তদ্বিদং দত্তমিথ্যা প্রলাপঃ॥”

যতদিন প্রাণবায়ু স্থায়ীমার্গে প্রবেশ না করে, এবং প্রাণ নিরুদ্ধ হইয়া যতদিন বিন্দু স্থির না হয় এবং যতদিন ধ্যান দ্বারা তত্ত্বসমূহ সাক্ষাৎকার না হয়, ততদিন জ্ঞানের কথা বলা দার্শনিকতা এবং মিথ্যা প্রলাপ মাত্র।

শ্রীমৎ শুকদেবজ্ঞ জ্ঞান ও ভগবন্ত-ক্লান্তির জন্যও যোগাভ্যাসের প্রয়োজন বলিয়া গিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—

“ইধং মুনিজুগপদমেধ্যবস্থিতো
বিজ্ঞানদৃষ্টার্থাহুরন্ধিতাশয়ঃ।
অপাশ্চিন্মাপীড়্য গুণং ততোহনিলং
স্থানেষু ঘটস্থলময়েজ্জিতরূপঃ॥”

ভাঃ, ২য় স্কঃ

শাস্ত্রজ্ঞানদ্বারা বাহ্য বিষয়বাসনা সকল বিদূষিত হইয়াছে এরূপ মুনি উপরত হইবেন, অতঃপর তিনি নিজের পাদদ্বাংগ মূলাধার পীড়ন করিয়া প্রাণবায়ুকে উর্দ্ধে ঘটস্থানে (ঘট চক্রে) উন্নীত করিবেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের ২য় স্কন্ধের ১২২-১২১২২ শ্লোক পড়িলে বুঝিতে পারা যাইবে যোগাত্ম্যাসের প্রয়োজনীয়তা কত অধিক। পরে ত্রয়োবিংশ শ্লোকে বলিতেছেন—

“যোগেবরাণাং গতিমাস্তরন্ত-
ক্ৰহিঙ্গিলোক্যাঃ পবনাশ্বনাশ্বনাশ্ব।
ন কর্মভিত্তাং গতিমাপ্নুবন্তি
বিজ্ঞাতপোষোগসমাধিতাম্॥”

বাহ্যের লিঙ্গশরীর বায়ুর মধ্যেই অবস্থান করে সেই শ্রেষ্ঠ যোগিগণের গতি ক্রহিঙ্গিলোকের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে, অর্থাৎ তাঁহারা ত্রিভুবনের অন্তরে বাহিরে বিচরণ করিতে পারেন। বিজ্ঞা, উপাসনা, তপস্যা ও অষ্টাঙ্গ যোগাভ্যাস জনিত সমাধিক জ্ঞান দ্বারা যে গতি লাভ হয় কর্মদ্বারা কামিগণ সে গতি লাভ করিতে পারে না।

“ন হতোহন্তঃ শিবঃ পদ্মাবিশতঃ সংস্খতাবিহ।
বাহুদেবে ভগবতি ভক্তিব্যোগো যতো ববেৎ॥”

যে যোগাত্ম্যাস দ্বারা ভগবান্ বাহুদেবে ভক্তিব্যোগ লাভ হইয়া থাকে সংসারপ্রবর্ত ব্যক্তিগণের তদ্ব্যপেক্ষা অন্য কোন মঙ্গলময় পথ নাই।

পারিশিষ্ট

গীতাসার

পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগুরুদেব গীতায় যে যোগাদি আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার স্বকপোলকল্পিত নহে;—এই যোগাদি ব্যাখ্যা শ'ঙ্গসম্মত। আমরা এখানে গুরুড-পুৰাণান্তর্গত “গীতাসার” হইতে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি—

শ্রীভগবানুবাচ

গীতাসারং প্রবক্ষ্যামি অৰ্জুনায়োষিতং পুরা।

অষ্টাঙ্গযোগঃ সূক্তার্থঃ সৰ্ববোধাস্তসারগম্।

শ্রীভগবানু কহিলেন—আমি গীতার সার বর্ণন করিব যাহা পূর্বে অৰ্জুনের নিকট বলিয়াছিলাম। সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্রের সারগর্ভ অষ্টাঙ্গযোগই গীতার্থসার।

আত্মসাত্ত্বঃ পরো নাত্ত আত্মা দেহাদিবর্জিতঃ।

রূপাধিমান্ হি দেহোহন্তঃ করণাদি লোচনম্॥

আত্মসাত্ত্বই পরমসাত্ত্ব, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট লাভ আর কিছুই নাই। আত্মা দেহবর্জিত। বেছেতু দেহ রূপাদি গুণযুক্ত এবং লোচনাদি ইন্দ্রিয়গণও আত্মার করণ মাত্র।

দেহ, মন, অহঙ্কার ও প্রাণ কেহই আত্মা নহে, কিন্তু আত্মা “বিধুম্ ইব দীপ্যাক্তিরাধিত্য ইব দীপ্তিমান্”। আত্মা ধূমশূন্য অগ্নির ভায় ও স্বর্ষ্যের ভায় দীপ্তিমান্।

সৰ্বজ্ঞঃ সৰ্বদর্শী চ ক্ষেত্রজ্ঞানি পশুতি।

ধামাত্ত্ব মনসা রশ্মীন্ যদা সম্যজ্ নিষচ্ছতি ॥

তদা প্রকাশতে হ্যাত্মা যটে দীপো জলগ্নিব।

জ্ঞানমুৎপত্ততে পুংসাং ক্রয়াং পাপস্ত কর্শ্বণঃ।

সৰ্বজ্ঞ ও সৰ্বদর্শী ক্ষেত্রজ্ঞই ইন্দ্রিয়গণকে দেখিতে পান। মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়-সংশ্লিষ্ট (শূন্য যেমন দৃশ্যের দ্বারা আমাদিগকে স্পর্শ করেন, ইন্দ্রিয়শক্তিও সেইরূপ বিষয়-মূহ স্পর্শ করে) সম্যক্ নিয়মিত হইলেই দীপে যেমন জ্বলা প্রকাশিত হয় আত্মাও সেইরূপ দেহবটে প্রকাশিত হন। পাপকর্মেয় কয় হইলেই জীবের জ্ঞান উৎপন্ন হইয় থাকে।

যথার্হতলপ্রাণ্যে পশুত্যাগ্নানমাত্মনি।

ইন্দ্রিয়াগীন্দ্রিয়ার্থাং মহাভূতানি পঞ্চ চ ॥

মনোবুদ্ধিমহাকারমব্যক্তং পুরুষং তথা।

প্রসংখ্যাম পরমার্থো বিমুক্তো বন্ধনৈর্ভবেৎ ॥

শ্রীমদ্ভগবদগীতা

৪৭১

যেমন দর্পণে নিষ্করণ দর্শন করা যায় তদ্রূপ নির্মল বুদ্ধিতে জীব ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়-বিষয়, পঞ্চ মহাভূত, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, প্রকৃতি এবং পুরুষকেও দর্শন করিয়া থাকে। তখন যে প্রসংখ্যাম বা বিবেকজ্ঞান দ্বারা দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে আত্মার পার্থক্য নিশ্চয় করিয়া বন্ধন-বিমুক্ত হইয়া পরমার্থ প্রাপ্ত হয়।

অহং ব্রহ্ম পরং ভ্যোতিঃ প্রসংখ্যায় বিমুচ্যতে।

ষিদ্ধানশেষতঃ খ্যাতে। যঃ পুরুষঃ পঞ্চবিংশকঃ।

বিবেকায় কেবলীভূতঃ যত্ পুংসঃ পঞ্চবিংশতিঃ ॥

তখন জীব “আমি পরম ভ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্ম” এইরূপ উপলব্ধি করিয়া মুক্ত হয়। চতুর্বিংশ তত্ব হইতে পৃথক্ পঞ্চবিংশ রূপে যে প্রসিদ্ধ পুরুষ তিনিই বিবেক বিচার দ্বারা প্রকৃতি হইতে পৃথক্ হইয়া কৈবল্য লাভ করেন এবং ষড়বিংশ ভক্ত স্বরূপ যে ব্রহ্ম তাঁহাকে সাক্ষাৎকার করেন।

নবদ্বারমিদং গেহং ত্রিধুগং পঞ্চসাক্ষিকম্।

ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতং বিদ্বান্ যো বেদ স বরঃ কবিঃ ॥

যে বিদ্বান্ পঞ্চসাক্ষিক অর্থাৎ পঞ্চমহাভূতযুক্ত; ত্রিধুগ অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ তমোগুণযুক্ত; এবং ক্ষেত্রজ্ঞ দ্বারা অধিষ্ঠিত চক্ষু-কর্ণ প্রভৃতি নবদ্বারবিশিষ্ট এই দেহকে জানেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ কবি বা জ্ঞানী।

শ্রীভগবানুবাচ।

যমাচ্চ নিয়মাস পার্থ আসনং প্রাণসংযমঃ।

প্রত্যাহারস্তথা ধ্যানং ধারণার্জুন সপ্তমী।

সমাধিরয়মষ্টাদো যোগ উক্ত বিমুক্তয়ে ॥

শ্রীভগবানু বলিলেন, হে পার্থ! যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি এই অষ্টাদ যোগ বিমুক্তির উপায় বলিয়া কবিত হইয়াছে।

কর্ষণা মনসা বাচা সর্বাংস্বাহু সর্বাণি।

সৰ্বত্র মৈথুনত্যাগং ব্রহ্মচর্য্যং প্রচক্ষতে ॥

মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চ ঐক্যপ্রাণং পরমং তপঃ।

শরীর-শোষণং বাপি কৃচ্ছ্রচাত্ত্বাঙ্গাদিভিঃ ॥

বেদান্ত শতক্লম্বীয় প্রণবাহি জপং বুধাঃ।

সব্ভক্তিকরং পুংসাং সাধার্যং পরিচক্ষতে ॥

ভক্তি শ্রবণ পূজাদি বাক্তৃ-মনঃ কারকশ্চিভিঃ।

সুনিশ্চলা হর্যো ভক্তিরেতদীশ্বর-চিন্তনম্ ॥

কর্ম, মন ও বাক্যের দ্বারা সর্বদা সকল অবস্থার সর্বপ্রকার মৈথুন ত্যাগকেই ব্রহ্মচর্য্য বলা হইয়া থাকে। মন ও ইন্দ্রিয়গণের একাগ্রতাই পরম তপস্তা। কৃষ্ণ চান্দ্রায়ণ ত্রতাদি দ্বারা যে দেহের শোষণ তাহাকেও তপস্তা বলে। বেদান্ত পাঠ, শত রুদ্রীয় পাঠ, বা প্রণবাদি অনেক পণ্ডিতগণ আখ্যায় বলিয়া থাকেন। এই আখ্যায় পুরুষের সৃষ্টিভিত্তিক। বাক্য, মন ও শরীরের কর্ম দ্বারা ভগবানের স্তব, শ্রবণ ও পূজাদি দ্বারা যে হরিতে অচলা ভক্তি তাহাই ঈশ্বর-চিন্তা।

মূর্ত্ত্যমূর্ত্ত ব্রহ্মরূপ চিন্তনং ধ্যানমুচ্যতে।

যোগারম্ভে মূর্ত্ত হরিমমূর্ত্তমধ চিন্তয়েৎ ॥

মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত ব্রহ্মরূপ চিন্তনকে ধ্যান বলা হয়। যোগারম্ভে কালে মূর্ত্তমান্ হরির এবং ভগবন্তর অমূর্ত্ত ব্রহ্মের চিন্তন করিতে হইবে।

জাগ্রৎস্বপ্নশুপ্তীনাং সাক্ষী জীবঃ স চ সূতঃ।

জাগ্রৎস্বপ্নশুপ্ত্যাধৈর্ষ্যতিরিক্তশ্চ নিশ্চলঃ ॥

নির্গতাবয়বোৎসর্গো নিত্যশুদ্ধসত্যবকঃ।

পরমাত্মৈব সঙ্জ্ঞাশ্রয়প্রাদৌ সন্নিধানতঃ।

অন্তঃকরণবাহুগৈশ্চ অন্তঃকরণসংস্থিতঃ।

জাগ্রৎস্বপ্নশুপ্তীশ্চ পশ্চত্যবিকৃতঃ সধা ॥

জাগ্রৎ, স্বপ্ন, শুপ্তি অবস্থার সাক্ষী জীব। সেই জীব যখন উক্ত অবস্থায় হইতে অতিরিক্ত হইয়া যায়, তখন তাহাকেই নিশ্চল বলে। স্বাভাবিক অবস্থার বিনাশ নাই, যিনি নিত্যশুদ্ধ-সত্যবিশিষ্ট, সেই পরমাত্মাই জাগ্রৎ-স্বপ্নাদি অবস্থার সন্নিহিত থাকেন বলিয়া তাহাকে সৎ বলা হইয়া থাকে। অন্তঃকরণেই, অথচ অন্তঃকরণের বিবর রাগের দ্বারা অবিকৃত সেই পরমাত্মাই জাগ্রৎ, স্বপ্ন শুপ্ত্যাদি অবস্থায় প্রত্যক্ষ করেন।

শ্রীশ্রীগীতামাহাত্ম্যম্ :

ও নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

ঋষিকৃবাচ—

গীতায়াম্ভব মাহাত্ম্যং যথাবৎ সূত মে বদ।

পুরা নারায়ণক্ষেত্রে ব্যাসেন মুনির্নোদিতম্ ॥

সূত উবাচ—

ভদ্রং ভগবতা পৃষ্টং যচ্ছি শুণ্ডতরং পরম্।

শক্যতে কেন তবক্তুং গীতামাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥ ২

কৃষ্ণো জানাতি বৈ সম্যক্ কিঞ্চিৎ কুন্তীমুতঃ কসম্।

ব্যাসো বা ব্যাসপুরো বা যাজ্ঞবল্ক্যোহথ মৈথিলঃ ॥ ৩

অন্তে শ্রবণতঃ শ্রদ্ধা লেশং সংকীর্তয়ন্তি চ।

কিঞ্চিদনাম্যত্র ব্যাসস্তাত্মান্ময়া স্মৃতম্ ॥ ৪

সর্কোপনিষদো গাবো দোদা গোপালনন্দনঃ।

পার্শ্বো বৎসঃ সুবীর্জোক্তা দুহ্যং গীতায়ুতং মহৎ ॥ ৫

সারথ্যমর্জুনস্তার্থো কুর্কন গীতায়ুতং দর্শো।

লোকত্রয়োপকারায় তস্মৈ কৃষ্ণায়নো নমঃ ॥ ৬

গীতামাহাত্ম্যের বঙ্গানুবাদ

শৌনক কহিলেন, হে সূত। পূর্বকালে নৈমিষারণ্যে (নারায়ণক্ষেত্রে) মুনি ব্যাসদেব যে গীতার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহা যথাবৎ আমার নিকট বল। ১।

সূত বলিলেন—ও ভগবন্। আপনি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছেন, ইহা পূর্য্য শুণ্ডতরং। এই গীতামাহাত্ম্য সুন্দরভাবে বলিতে কেই বা সমর্থ? ২। ঐকৃষ্ণই ইহা সম্যকরূপে অবগত আছেন; কুন্তীপুত্র অর্জুন, বেদব্যাচ ও তৎপুত্র শুকদেব, যাজ্ঞবল্ক্য এবং যিহিলা-বিপতি জনক ইহারও ইহার ফল কিঞ্চিৎমান জানেন। ৩। এতদ্বির অস্ত্রাঙ্ক ব্যক্তি সকল ইহার ফল শ্রবণ করিয়া ইহার মাহাত্ম্য লেশমাত্র কীর্জন করিয়া থাকেন, আমিও বেদব্যাচের মুখ হইতে কিছু শ্রবণ করিয়াছি, অতএব তাহাই আপনাকে বলিতেছি। ৪। সমস্ত উপনিষৎগুলি যেন গাভীরূপ, এবং সেই গাভীর দোদা গোপালনন্দন, ঐকৃষ্ণ এবং পার্শ্ব এই গাভীর বৎস রূপ (বৎস যেমন স্বীয় মাতার দুগ্ধ পান করিয়া পবিত্র হইয়া, অর্জুন এই উপদেশায়ুত পান করিয়া পবিত্র হইয়াছিলেন, চিরদিনের জন্য তাঁহার ভবকল্যাণ মিটিয়া গিয়াছিল।) গীতারূপ অমৃতই এই উপনিষদ্ গাভীর সুদৃঢ় দুগ্ধ, এবং এই গীতায়ুতরূপ দুগ্ধ সুবীর্ণগণই পান করিয়া থাকেন। ৫। যিনি প্রথমে অর্জুনের সারথ্যকার্য্যে ব্রতী হইয়া লোকত্রয়ের উপকারার্থ এই গীতায়ুত দান করিয়াছেন, সেই পরমাত্মারূপ ঐকৃষ্ণকে নমস্কার। ৬।

সংসার-সাগরং ঘোরং তন্তুমিচ্ছতি যো নরঃ ।
 গীতানাবং সমাসাচ্চ পায়ং যতি হুথেন সঃ ॥ ৭
 গীতাজ্ঞানং ক্রুতং নৈব সনৈবাত্যাসযোগতঃ ।
 মোক্ষমিচ্ছতি মৃঢ়ায়া যতি বালকহাস্যতায় ॥ ৮
 যে শ্রুতি পঠন্ত্যেব গীতাশাস্ত্রমহর্নিশম্ ।
 ন তে বৈ মাহুষ্য জ্ঞেয়া দেবরূপা ন সংশয়ঃ ॥ ৯
 গীতাজ্ঞানেন সংবোধং কুরুঃ প্রোহাজ্জানায় বৈ ।
 ভক্তিভবং পরং তত্র সত্ত্বং চাখ নিষ্ঠং যম্ ॥ ১০
 সোপানাষ্টাংশৈরেবং ভুক্তিমুক্তিসমুচ্ছিতৈঃ ।
 ক্রমশ্চিন্তিতুঃ শ্রীং প্রেমভক্ত্যা দি কৰ্ম্মণি ॥ ১১
 সাধোগীতাসি জ্ঞানং সংসারমলনাশম্ ।
 শ্রদ্ধাহীনস্ত তৎ কার্যং হস্তিমানং বুধৈব তৎ ॥ ১২
 গীতাশাস্ত্রং ন জানাতি পঠনং নৈব পাঠনম্ ।
 ন এব মাহুষ্যে লোকে মোক্ষকৰ্ম্মকরে ভবেৎ ॥ ১৩
 যস্মাদগীতাং ন জানাতি নাথমন্তঃপরোজনঃ ।
 যিক্ তন্তু মাহুষ্যং দেহং বিজ্ঞানং কুলশীলতাম্ ॥ ১৪
 গীতার্থং ন বিজ্ঞানান্তি নাথমন্তঃপরো জনঃ ।
 যিক্ শরীরং স্তবং শীলং বিভবন্তুগৃহাশ্রমম্ ॥ ১৫

যে ব্যক্তি এই ঘোর সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছুক হন, তিনি এই গীতারূপ তরলী
 আশ্রয় করিলে অনায়াসে সংসার-সাগরের পার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন ॥ ৭। যে ব্যক্তি
 গীতাজ্ঞানের শ্রবণাত্যাস করে নাই, অথচ সে যদি মোক্ষাভিলাষী হইয়া থাকে তবে সে
 বালকগণেরও উপহাস্যপদ হইয়া থাকে ॥ ৮। তাহার। গীতাশাস্ত্র অহর্নিশ শ্রবণ-অধ্যয়ন
 করিয়া থাকেন, তাহার। মনুষ্য নহেন, তাহার। দেবতাদ্বন্দ্ব, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই ॥ ৯

শ্রীকৃষ্ণ গীতাজ্ঞান উপদেশ দ্বারা অজ্ঞানকে তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহাতে
 সত্ত্ব ও নিষ্ঠা ভক্তিভব ব্যাখ্যাত হইয়াছে ॥ ১০। ভুক্তি-মুক্তি-সমুচ্ছিত-গীতার অষ্টাংশ
 অধ্যায়রূপ অষ্টাংশ সোপান দ্বারা ক্রমশঃ চিন্তিতু লাভ করিয়া প্রেমভক্ত্যা দি কৰ্ম্মে অধিকতর
 উন্নতিলাভ হইয়া থাকে ॥ ১১। গীতারূপ সলিলে জ্ঞান করিয়া সাধুদেব সংসার-মালিন্য বোত
 হইয়া যায় ; কিন্তু বাহারা শ্রদ্ধাহীন তাহার। গীতাসলিলে অবগাহন হস্তিনানের-ভায়
 বুধা হইয়া থাকে ॥ ১২। যে ব্যক্তি গীতাশাস্ত্র পঠনপাঠন করিতে না জানে, মনুষ্যলোকে
 তাহার সমস্ত কার্যই বুধা হইয়া থাকে ॥ ১৩। যেহেতু গীতাশাস্ত্রে যে অনভিজ্ঞ ভগপেক্ষা
 নরাধম আর ইহ জগতে কেহ নাই, তাহার মনুষ্যদেহ ধারণে, তাহার জ্ঞানে ও কুল-শীলে
 যিক্ ॥ ১৪। যে ব্যক্তি গীতার অর্থ অবগত নহে ভগপেক্ষা নরাধম আর কেহ নাই, তাহার
 দেহে, কল্যাণে, শীলতায় এবং তাহার গৃহাশ্রম ও বৈতবানিতে যিক্ ॥ ১৫।

গীতাশাস্ত্রং ন জানাতি নাথমন্তঃপরোজনঃ ।
 যিক্ প্রালব্ধং প্রতিষ্ঠাঞ্চ পূজাং মানং মহত্তমম্ ॥ ১৬
 গীতাশাস্ত্রে মতির্নাশ্তি সর্বং তদ্বিকলং জগৎ ।
 যিক্ তন্তু জ্ঞানদাতারং ব্রতং নির্ভাং তপো বশঃ ॥ ১৭
 গীতার্থপঠনং নাশ্তি নাথমন্তঃপরো জনঃ ।
 গীতাগীতং ন যজ্ জ্ঞানং তদ্বিক্রাস্তুরসম্যক্তম্ ॥ ১৮
 তন্মোহং ধর্ম্মবিরহিতং বেদবেদান্তগহিতম্ ।
 তন্মাদ্বর্ম্মময়ী গীতা সর্বজ্ঞানপ্রবোজিকা ।
 সর্বশাস্ত্রসারভূতা বিত্তত্বা সা বিশিষ্টতে ॥ ১৯
 যোহধীতে বিষ্ণুপর্কীহে গীতাং শ্রীহরিবাসরে ।
 যপন্ আশ্রন্ চলন্তিষ্ঠন্ত শক্তিন স হীয়তে ॥ ২০
 শালগ্রামে শিলায়াং বা দেবাগারে শিবালয়ে ।
 তীর্থে নদ্রাং পঠেদগীতাং শৌভাগ্যং লভতে ধ্রুবম্ ॥ ২১
 দেবকীনন্দনঃ কৃষ্ণো গীতাপাঠেন তুষ্টিত ।
 যথা ন বেদৈর্দানেন যজ্ঞতীর্থব্রতাদিভিঃ ॥ ২২
 গীতাধীতা চ যেনাপি ভক্তিভাবেন চেতসা ।
 বেদশাস্ত্রপুরাণানি তেনাদীতানি সর্বশঃ ॥ ২৩

গীতাশাস্ত্র যে অবগত নহে ভগপেক্ষা অধম আর কেহই নাই, তাহার আরও কৰ্ম্ম ও প্রতিষ্ঠা
 যিক্, তাহার পূজা, মান ও মহত্তম যিক্ ॥ ১৬। গীতাশাস্ত্রে বাহার মতি নাই অর্থাৎ তাহাতে
 বাহার বুদ্ধি প্রতিষ্ঠা নহে তাহার সমস্তই বিকল, তাহার জ্ঞানদাতাকে যিক্, তাহার ব্রত-নিষ্ঠা
 তপস্তা ও বশকেও যিক্ ॥ ১৭। যে ব্যক্তি গীতার্থ পঠন করে নাই, ভগপেক্ষা নরাধম আর
 কেহই নাই; এবং যে জ্ঞান গীতাশাস্ত্রে গীত হয় নাই, তাহাকে আশ্রয়-জ্ঞান বলিয়া জানিবে
 ॥ ১৮। এবং সে জ্ঞান একেবারেই বিকল ও তাহা ধর্ম্মবিরহিত এবং বেদবেদান্ত-বিনিষ্মিত ;
 অতএব ধর্ম্মময়ী গীতাকেই আশ্রয় করিবে, তাহা সর্বজ্ঞানপ্রবোজিনী ও সর্বশাস্ত্রের
 সারভূতা, এবং গীতার গ্রন্থ বিত্তত্বা আর অল্প কিছুই নাই বলিয়া সর্বশাস্ত্রাপেক্ষা
 ইহারই বিশিষ্টতা জানিবে ॥ ১৯। বিষ্ণুপর্কে একাদশীতে যিনি গীতা পাঠ করেন
 তিনি নিজ, জাগরণ, গমন, উপবেশন কোথাও কোন অবস্থাতেই তদ্বিক্রাস্তুর
 আশিত হন না ॥ ২০। যে ব্যক্তি শালগ্রামশিলা বা দেবাগারে, শিবালয়ে,
 কোন তীর্থে বা নদীতে গীতা পাঠ করেন, তিনি নিশ্চয় শৌভাগ্য লাভ
 করিয়া থাকেন ॥ ২১। দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ গীতাপাঠে বৈষ্ণব পরিভূত হইলেন, বেদাধ্যয়ন,
 দান, যজ্ঞ, তীর্থসেবা ও ব্রতাদি অহুষ্ঠান দ্বারাও তাদৃশ পরিভোক্ত প্রাপ্ত হন না ॥ ২২।
 যে ব্যক্তি ভক্তিবৃত্তিতে গীতাধ্যয়ন করেন তাহার বেদশাস্ত্র-পুরাণানি পাঠের বৈকল্য তাহাই
 লাভ হইয়া থাকে ॥ ২৩।

যোগস্থানে সিদ্ধপীঠে শিলাগ্রে সৎসভাহ্ চ ।
 যজ্ঞে চ বিষ্ণুভক্ত্যাগ্রে পঠন্ সিদ্ধিং পরাং ভবেৎ ॥ ২৪
 গীতাপাঠক শ্রবণং যঃ করোতি হিনে হিনে ।
 ক্রতরো বাজিমেষাধ্যাঃ কৃতান্তেন সহক্ষিণাঃ ॥ ২৫
 যঃ শৃণোতি চ গীতার্থং কীর্তয়ত্যেব যঃ পরম্ ।
 শ্রাবয়েচ্চ পরার্থং বৈ স শ্রোতাতি পরং পদম্ ॥ ২৬
 গীতায়্যঃ পুস্তকং শুদ্ধং যোহর্পয়ত্যেব সাদরাং ।
 বিধিনা ভক্তিভাবেন তস্মৈ তার্থ্য্য প্রিয়া ভবেৎ ॥ ২৭
 যশঃ সৌভাগ্যমারোগ্যং ভক্তে নাত্ম সংশয়ঃ ।
 দয়িত্বানাম প্রিয়ো ভূত্বা পরমং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮
 অভিচারোদ্ভবং দুঃখং বরশাপাগতঞ্চ যৎ ।
 নোপসর্পতি তজ্জৈব যত্র গীতার্কনং গৃহে ॥ ২৯
 তাপজয়োদ্ভবা পীড়া নৈব ব্যাধির্ভবেৎ কচিং ।
 ন শাপো নৈব পাপঞ্চ দুর্গতির্নরকং ন চ ॥ ৩০
 বিস্ফোটকাদয়ো মেঘে ন বাধস্তে কদাচন ।
 ভবেৎ কৃষ্ণপদে দাত্তং ভক্তিধাব্যভিচারিণীম্ ॥ ৩১
 জায়তে সততং সখ্যং সর্বজীবগণৈঃ সহ ।
 প্রায়স্কং ভূত্বো বাপি গীতাভ্যাসবতস্ত চ ॥ ৩২

যোগস্থানে, সিদ্ধপীঠে, শিলাগ্রাম শিলার সম্মুখে, সজ্জন সভায়, যজ্ঞক্ষেত্রে কিংবা ভগবদ্ভক্তের নিকট যিনি গীতা পাঠ করেন, তিনি পরমসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। ২৪। যিনি প্রত্যাহ গীতা পাঠ বা শ্রবণ করিয়া থাকেন তাঁহার সহক্ষিণ অথমেধাতি বজ্র করা হইল বুঝিতে হইবে। ২৫। যিনি গীতার্থ শ্রবণ বা কীর্তন করেন, কিংবা পরকে তনাইবার জন্য গীতা ব্যাখ্যা করেন তিনি পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ২৬। যিনি ভক্তি সহকারে বিধিপূরক সাধরে বিতৃত গীতা পুস্তক দান করেন তাঁহার তার্থ্য্য প্রিয়া হন, এবং তিনি যশঃ, সৌভাগ্য ও আরোগ্য লাভ করেন ও তিনি দেহভাজনদিগের প্রিয় (দয়িত্বপ্রিয়) হইয়া পরম সুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ২৭—২৮। যে গৃহে গীতার্ অর্কন হয়, তথায় অভিচার বা অভিশাপাদি জনিত কোনরূপ দুঃখই আসিতে পারে না। ২৯। পরন্তু তাপজর সমুদ্ভূত পীড়া, ব্যাধি, অভিশাপ, পাপ, দুর্গতি বা নরক-বন্ত্রণা তাঁহাকে ভোগ করিতে হয় না। তাঁহার ঘেহে বিস্ফোটকাহি বাধা উৎপন্ন হয় না, তিনি কৃষ্ণপদে দাত্ত ও অব্যভিচারিণী ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন। ৩০—৩১। গীতাভ্যাসবত ব্যক্তির সমস্ত জীবের সহিত সখ্যতা লাভ হয়, এবং তাদৃশ ব্যক্তি প্রায়স্কং কঠোর ভোগ করিলেও তাঁহাকে মুক্ত ও সুখী বলা যাইতে পারে, কারণ কোন কঠোর দ্বারা তিনি আবদ্ধ হন না। গীতাধ্যায়ী মহাপাপ ও অতিপাপ করিলেও পন্নপন্ন জন্মের দ্বারা সেই পাপ

স মুক্তঃ স সুখী লোকে কথং নোপলিপ্যতে ।
 মহাপাপাতিপাপানি গীতাধ্যায়ী কয়োতি চেৎ ।
 ন কিঞ্চিৎ স্পৃহতে তস্মৈ নলিনীহলমল্লসা ॥ ৩৩
 অনাচারোদ্ভবং পাপমবাচ্যাদি কৃতঞ্চ যৎ ।
 অভক্ষ্যতক্ষণং হোবমস্পৃশ্যস্পর্শঞ্চ তথা ॥ ৩৪
 জ্ঞানাজানকৃতং নিত্যমিচ্ছিতৈর্জনিতঞ্চ যৎ ।
 তৎ সর্বং নাশমায়াতি গীতাপাঠেন তৎক্ষণাৎ ॥ ৩৫
 সর্বত্র প্রতিভোক্তা চ প্রতিগৃহ চ সর্বশঃ ।
 গীতাপাঠং প্রকুর্য্যাদে ন নিপ্যতে কদাচন ॥ ৩৬
 বহুপূর্ণং মহীং সর্বাং প্রতিগৃহাবিধানতঃ ।
 গীতাপাঠেন চৈকেন শুদ্ধফলিকং সদা ॥ ৩৭
 যত্নাতঃকরণং নিত্যং গীতায়্য রমতে সদা ।
 স সার্বিকঃ সদা জাপী জিহ্বাবান্ স চ পণ্ডিতঃ ॥ ৩৮
 দর্শনীয়ঃ স ধনবান্ স যোগী জ্ঞানবানপি ।
 স এব যাজ্ঞিকো যাজী সর্ববেদার্থদর্শকঃ ॥ ৩৯
 গীতায়্যঃ পুস্তকং যত্র নিত্যপাঠশ্চ বর্ততে ।
 তত্র সর্বাণি তীর্থানি প্রয়াগাদিনি ভূতলে ॥ ৪০
 নিবসতি সদা ঘেহে ঘেহেঘেহপি সর্বদা ।
 সর্বত্র ঘেবাশ্চ যুযো যোগিনো ঘেহরক্ষকঃ ॥ ৪১

তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। ৩২-৩৩। অনাচার জনিত ও অব্যভিচার জনিত পাপ সকল, অভক্ষ্য তক্ষণ জনিত ও অস্পৃশ্য স্পর্শ জনিত দোষ সকল, জ্ঞানাজানকৃত বা ইচ্ছিত জনিত যে কোন দোষই হউক, গীতাপাঠের দ্বারা সমস্তই তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া যায়। ৩৪-৩৫। সর্বত্র ভোজন ও সর্বত্র প্রতিগ্রহ করিলেও গীতাপাঠকারীকে সেই সকল পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। ৩৬। অবহিত ভাবে (শত্রু বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া) বহুপূর্ণা পুণ্যী প্রতিহত করিয়াও একমাত্র গীতাপাঠ দ্বারা সে বিধোত-পাপ হইয়া শুদ্ধ ফলিকের দ্বারা শুদ্ধ হইয়া থাকে। ৩৭। বাহার যত্নকরণ সর্বদা গীতাতে রমমান থাকে, তিনিই সার্বিক, তিনিই জাপক, তিনিই উপাসক, তিনিই জিহ্বাবান্, তিনিই পণ্ডিত, তিনিই দর্শনীয়, তিনিই ধনবান্, তিনিই যোগী, তিনিই জ্ঞানবান্, তিনিই যাজ্ঞিক, তিনিই যাজক, তিনিই সর্ব-বেদার্থদর্শী বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন। ৩৮-৩৯।

গীতা যেখানে নিত্য পঠিত হয়, প্রয়াগাদি পৃথিবীর সমস্ত তীর্থই তথায় বর্তমান থাকেন। ৪০। তাঁহার জীবনকালে এবং দেহাবসানের পরও সমস্ত দেবতারা, ঋষিরা, যোগীরা তাঁহার দেহরক্ষক হইয়া বাস করেন। ৪১। বাহার গৃহে নিত্য গীতা পাঠ হয়, বালকক,

গোপালো বালকৃষ্ণোহপিনারদধ্বপাখদৈঃ ।
সহায়ো আয়তে শীঘ্রং যত্র গীতা প্রবর্ততে ॥ ৪২
যত্র গীতাবিচারস্ত পঠনং পাঠনং তথা ।
মোহতে তত্র শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ রাধিকাসহ ॥ ৪৩

শ্রীভগবান্ উবাচ—

গীতা মে হৃদয়ং পার্শ্ব গীতা মে সারমুত্তমম্ ।
গীতা মে জ্ঞানমভ্যুগ্রং গীতা মে জ্ঞানমব্যয়ম্ ॥ ৪৪
গীতা মে চোত্তমং স্থানং গীতা মে পরমং পদম্ ।
গীতা মে পরমং গুহ্যং গীতা মে পরমো গুরুঃ ॥ ৪৫
গীতাশ্রয়েহং তিষ্ঠামি গীতা মে পরমং গৃহম্ ।
গীতাজ্ঞানং সমাপ্রিত্য ত্রিলোকং পালয়াম্যহম্ ॥ ৪৬
গীতা মে পরমা বিদ্যা ব্রহ্মরূপা ন সংশয়ঃ ।
অৰ্দ্ধমাত্রা পরা নিত্যমনির্কীচ্যপছাদিকা ॥ ৪৭
গীতানামানি বধ্যামি গুহ্যানি শৃণু পাণ্ডব ।
কীর্তনাং সৰ্পপাপানি বিলয়ং যান্তি তৎক্ষণাৎ ॥ ৪৮
গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী সীতা সত্যো প্রতিলতা ।
ব্রহ্মাবলিভ্রাশ্ববিদ্যা ত্রিশঙ্খা মুক্তিগেহিনী ॥ ৪৯
অৰ্দ্ধমাত্রা চিদানন্দা ভবগ্রী ভাস্তিনাশিনী ।
বেদগ্রয়ী পরানন্দা তদ্বার্ষজ্ঞানমঞ্জরী ॥ ৫০

গোপাল, নারদ, ধ্রুব প্রভৃতি পার্শ্বাধি সহ তাঁহার সহায় হইয়া থাকেন । ৪২ । গীতাশাস্ত্রের বিচার, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা যে স্থানে হয়, তথায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাধিকা সহ পরমানন্দে বিরাজ করেন । ৪৩ ।

শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে পার্শ্ব; গীতা আমার হৃদয়, গীতা আমার সার সৰ্ব্বমুত্তম, গীতাই আমার অভ্যুগ্র জ্ঞান এবং গীতাই আমার অব্যয় জ্ঞান রূপ । ৪৪ । গীতাই আমার পরম উত্তম স্থান, গীতাই আমার পরমপদ, গীতাই আমার অতীব গুহ্য বস্তু এবং গীতাই আমার পরমগুরু । ৪৫ । গীতার আশ্রয়েই আমি অবস্থিত এবং গীতাই আমার পরম গৃহ এবং গীতাজ্ঞান আশ্রয় করিয়াই আমি ত্রিলোক পালন করিয়া থাকি । ৪৬ । গীতাই ব্রহ্মরূপা, অৰ্দ্ধমাত্রা ব্রহ্মপা, অনির্কীচ্য পছাদিকা, পরমাবিচারপূর্ণিণী । ৪৭ । হে পাণ্ডব! গীতার গুহ্য নামসকল বলিতেছি শ্রবণ কর, যে নামকীর্তন করিলে পাপসকল তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া যায় । ৪৮ । গঙ্গা, গীতা, সাবিত্রী, সীতা, সত্যো, পতিব্রতা, ব্রহ্মাবলি, ব্রহ্মবিদ্যা, ত্রিশঙ্খা, মুক্তিগেহিনী, অৰ্দ্ধমাত্রা, চিদানন্দা, ভবগ্রী, ভাস্তিনাশিনী, বেদগ্রয়ী, পরানন্দা, তদ্বার্ষজ্ঞানমঞ্জরী—এই কয়েকটি গীতার নাম । যে ব্যক্তি নিম্নলিখিতে এই নামগুলি নিত্য জপ করেন, তিনি জ্ঞান ও

ইত্যেতানি অপেন্নিত্যং নন্যো নিম্ণলমানসঃ ।
জ্ঞানসিদ্ধিং লভেন্নিত্যং তথাস্তে পরমং পদম্ ॥ ৫১
পাঠেহসমর্থঃ সম্পূর্ণে তদ্বৎ পাঠমাচর্যেৎ ।
তদ্বা গো-দ্বানজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫২
ত্রিভাগং পঠমানস্ত সোমযাগ-কলং লভেৎ ।
বড়ংশং জপমানস্ত গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ ॥ ৫৩
তথাধ্যায়দ্বয়ং নিত্যং পঠমানো নিরন্তরম্ ।
ইন্দ্রলোকমবাপ্নোতি কল্পমেকং বয়েৎ ধ্রুবম্ ॥ ৫৪
একমধ্যায়কং নিত্যং পঠতে ভক্তিসংযুতঃ ।
কল্পলোকমবাপ্নোতি গণোভূত্বা বসেচ্চিরম্ ॥ ৫৫
অধ্যায়ার্দ্ধকং পাঠং বা নিত্যং যঃ পঠতে জনঃ ।
প্রাপ্নোতি ববিলোকং স মন্বন্তরসমাঃ শতম্ ॥ ৫৬
গীতায়াঃ শ্লোকদশকং সপ্ত পঞ্চ চতুষ্টয়ম্ ।
ত্রিষোকমেকমর্দ্বং বা শ্লোকানিঃ যঃ পঠেদ্রবঃ ।
চন্দ্রলোকমবাপ্নোতি বর্ষাণামযুতং তথা ॥ ৫৭
গীতার্ধমেকপাঠকং শ্লোকমধ্যায়মেব চ ।
স্বয়ংস্বত্বা জনো হেহং প্রয়াতি পরমং পদম্ ॥ ৫৮
গীতার্ধমপি পাঠং বা শৃণুয়াৎসকালতঃ ।
মহাপাতকযুক্তোহপি মুক্তিভাগী ভবেজ্জনঃ ॥ ৫৯

সিদ্ধিলাভ করিয়া অস্ত্রে পরমপদ প্রাপ্ত হন । ৪২—৫১ । যিনি সম্পূর্ণ গীতাপাঠে অসমর্থ তিনি তাহার অৰ্দ্ধ পাঠ করিবেন, তাহাতেই তাঁহার নিঃসন্দেহে গোদ্বান জনিত পুণ্যলাভ হইবে । ৫২ । যিনি গীতার এক-তৃতীয়াংশ পাঠ করিবেন তিনি সোমযাগের ফললাভ করিয়া থাকেন এবং গীতার বর্ষাংশ পাঠ করিলে গঙ্গাস্নানের ফললাভ করিবেন । ৫৩ । যিনি প্রত্যহ দুই অধ্যায় পাঠ করেন তিনি এক কল্পকাল ইন্দ্রলোকে বাস করেন । ৫৪ । যে ব্যক্তি ভক্তি-সংযুক্ত হইয়া এক অধ্যায়ও পাঠ করেন, তিনি কল্পলোকে গণপদপ্রাপ্ত হইয়া বহুকাল বাস করেন । ৫৫ । যিনি অধ্যায়ের অৰ্দ্ধ বা একপাঠ নিত্য পাঠ করেন, তিনি শত মন্বন্তর কাল ববিলোকে বাস করেন । ৫৬ । যিনি গীতার দশটি, সাতটি, পাঁচটি, চারিটি, তিনটি, দুইটি, একটি বা অৰ্দ্ধ শ্লোকও পাঠ করেন, তিনি অযুত বর্ষ-ধরিত্র চন্দ্রলোকে বাস করেন । ৫৭ । যিনি গীতার এক অধ্যায়ের, এক শ্লোকের বা একপাঠ মাত্রের অৰ্দ্ধ শ্রবণ করিতে করিতে বেদভ্যাগ করেন, তিনি পরমপদ লাভ করিয়া থাকেন । ৫৮ । যিনি অন্তকালে গীতার্ধ বা গীতাপাঠ শ্রবণ করেন, তিনি মহাপাতকযুক্ত হইলেও মুক্তিভাগী হইয়া থাকেন । ৫৯ ।

গীতাপুস্তকসংযুক্তঃ প্রাণান্ত্যক্তাঃ প্রযাতি যঃ ।
 স বৈকুণ্ঠমবাপোতি বিষ্ণুনা সহ মোহতে ॥ ৬০
 গীতাপুস্তকসংযুক্তো যুক্তো মাহুযতাং ব্রহ্মেণ ।
 গীতাপুস্তকং পুনঃ কৃৎস্না লভতে যুক্তিযুক্তমাম্ ।
 গীতেত্যাচ্চারসংযুক্তো যিয়মাণো গতিং লভেৎ ॥ ৬১
 যদ্যৎ কৰ্ম চ সৰ্বত্র গীতাপাঠ-প্রকীৰ্ত্তনং ।
 তত্ত্বং কৰ্ম চ নির্দোষং ভূত্বা পূৰ্ণমাপ্নুয়াৎ ॥ ৬২
 পিতৃহৃদ্ভিঃ যঃ শ্রদ্ধে গীতাপাঠং কৰোতি হি ।
 সন্তোষঃ পিতরস্তত্ত্ব নিরয়াৎ যান্তি বর্গতিম্ ॥ ৬৩
 গীতাপাঠেন সন্তোষঃ পিতরঃ শ্রদ্ধতপিতাঃ ।
 পিতৃলোকং প্রযান্ত্যেব পুত্রানীর্ক্যাতং পরাঃ ॥ ৬৪
 গীতাপুস্তকদানঞ্চ যেষুপুঞ্জসমমিতম্ ।
 কৃৎস্না চ তদ্দিনে সম্যক্ কৃতার্থো জায়তে জনঃ ॥ ৬৫
 পুস্তকং হেমসংযুক্তং গীতায়ঃ প্রকরোতি যঃ ।
 হৃদ্যা বিপ্রায় বিহুবে জায়তে ন পুনর্ভবম্ ॥ ৬৬
 শতপুস্তকদানঞ্চ গীতায়ঃ প্রকরোতি যঃ ।
 স য়তি ব্রহ্মসম্বন পুনরাবুত্তিহর্গতম্ ॥ ৬৭
 গীতাদানপ্রভাবেন সপ্তকল্পমিতাঃ সমাঃ ।
 বিষ্ণুলোকমবাপ্যন্তে বিষ্ণুনা সহ মোহতে ॥ ৬৮

যিনি গীতা-পুস্তকসংযুক্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন, তিনি বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হইয়া বিষ্ণুর সহিত পরমাত্মা বাস করেন ॥ ৬০ ॥ গীতার এক অধ্যায় সমাযুক্ত হইয়াও যাহার মৃত্যু হয়, তাহার আর নীচ-যোনি প্রাপ্ত হইতে হয় না, তিনি পুনরায় মনুষ্যধোনি লাভ করিয়া সেই দেহে গীতাভ্যাস করিয়া মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন, মৃত্যুকালে “গীতা” এই শব্দমাত্র উচ্চারণ করিলেও তাহার সদ্গতি লাভ হয় ॥ ৬১ ॥ গীতাপাঠপুস্তক যে যে কৰ্ম আরম্ভ হয়, সেই সেই কৰ্ম নির্দোষ হইয়া পূর্ণ ফলদানে সমর্থ হয় ॥ ৬২ ॥ শ্রদ্ধাকালে পিতৃগণের উদ্দেশে গীতা পঠিত হইলে তাহার নিরয়ে থাকিলেও তথা হইতে আনন্দে স্বর্গে গমন করেন ॥ ৬৩ ॥ শ্রদ্ধতপিত পিতৃগণ গীতাপাঠে সন্তোষ হইয়া পুত্রগণকে আশীর্বাদ করিতে করিতে পিতৃলোকে গমন করেন ॥ ৬৪ ॥ যিনি যেষুপুঞ্জসংযুক্ত গীতাপুস্তক দান করেন, তিনি ভক্তিদেই সম্যকরূপে কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন ॥ ৬৫ ॥ যিনি হৃদয়সংযুক্ত গীতাপুস্তক বিধান বিপ্রকে দান করেন, তাঁহর আর পুনর্জন্ম হয় না ॥ ৬৬ ॥ যিনি একশত গীতাপুস্তক দান করেন, তিনি ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাহার পুনরাবুত্তির সম্ভাবনা থাকে না ॥ ৬৭ ॥

গীতাদান প্রভাবে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইয়া তিনি সপ্তকল্প কাল পর্যন্ত বিষ্ণুর সহিত আনন্দ ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ৬৮ ॥

সম্যক্ কৃত্বা চ গীতার্থং পুস্তকং যঃ প্রদাপয়েৎ ।
 তস্মৈ শ্রীতঃ শ্রীভগবান্ বদাতি মানসেন্দ্রিয়ম্ ॥ ৬৯
 দেহং মাহুযমশ্রিত্য চাতুর্কর্ণ্যৈর্গু ভারত ।
 ন শৃণোতি ন পঠতি গীতামহুতরূপিণীম্ ।
 হস্তান্ত্যক্তামৃতং প্রাপ্তং ন নরো বিষমমুতে ॥ ৭০
 জনঃ সংসারদুঃখার্থো গীতাজ্ঞানং সমালভেৎ ।
 পীত্বা গীতামৃতং লোকে লজ্জা ভক্তিং হৃদী ভবেৎ ॥ ৭১
 গীতামাশ্রিত্য বহুবো ভূত্বো জনকাদয়ঃ ।
 নিধুঁতকল্যাণা লোকে গতাশ্চৈব পরমং পদম্ ॥ ৭২
 গীতাসু ন বিশেষোহস্তি জনেহুচ্চারকেহু চ ।
 জ্ঞানেষেব সমগ্রেহু সমা ব্রহ্মস্বরূপিণী ॥ ৭৩
 যোহতিমানেন গর্বেণ গীতানিন্দ্যং কৰোতি চ ।
 স য়তি নরকং ঘোরং যাবদাহুতসংগ্রহম্ ॥ ৭৪
 অহকারেণ মুঢ়াশ্চা গীতার্থং নৈব মনুতে ।
 কুত্বীপাকেহু পচ্যেত যাবৎ কল্লকরো ভবেৎ ॥ ৭৫
 গীতার্থং বাচ্যমানং যো ন শৃণোতি সমীপতঃ ।
 স শূকর ভবাং যোনিমেনেকামধিগচ্ছতি ॥ ৭৬
 যে কৃৎস্না চ গীতায়ঃ পুস্তকং যঃ সমানয়েৎ ।
 ন স সফলং কিঞ্চিৎ পঠনঞ্চ বৃথা ভবেৎ ॥ ৭৭

গীতায় সম্যক্ অর্থ শ্রবণ করিয়া যিনি গীতা পুস্তক দান করেন তাহার প্রতিশ্রুতি শ্রীভগবান্ শ্রীত হইয়া তাহার মনের ইচ্ছিত বাহা তাহাই দান করেন ॥ ৬৯ ॥ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রকুলে মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি এই অমৃতরূপিণী গীতা শ্রবণ বা পাঠ না করে, সে হস্তান্তি অমৃত ত্যাগ করিয়া বিষ ভক্ষণ করে ॥ ৭০ ॥ সংসার-দুঃখপীড়িত ব্যক্তি গীতা জ্ঞান লাভ করিলে এবং গীতামৃত পান করিলে ভক্তিলাভ করিয়া হৃদী হইয়া থাকে ॥ ৭১ ॥ জনকাহি বহু ভূপতিগণ গীতাকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরমপদ লাভ করিয়াছেন ॥ ৭২ ॥ কেহ গীতোক্ত শ্লোকই উচ্চারণ করুন বা কেহ গীতোক্ত জ্ঞানই লাভ করুন, তাহার মধ্যে কলের ইতর-বিশেষ নাই, কারণ ব্রহ্মস্বরূপিণী গীতা সকলের নিকটেই সমতাবাপন্ন ॥ ৭৩ ॥ অহঙ্কৃত হইয়া যে মুঢ়াশ্চা গীতার নিন্দা করে, সে মহাশয় পর্যাণ্ত ঘোর নরকে বাস করিয়া থাকে ॥ ৭৪ ॥ যে মুঢ়াশ্চা অহকার ২২তঃ গীতার্থ জ্ঞানিতে না চায়, সে কল্লকর কাল পর্যন্ত কুত্বীপাক নরকে পড়িতে থাকে ॥ ৭৫ ॥ নিকটেই গীতা পাঠ হইতেছে তাহা দেখিয়াও যে ব্যক্তি শ্রবণ না করে, সে ব্যক্তি বহুজন্ম শূকরবোনি প্রাপ্ত হয় ॥ ৭৬ ॥ যে ব্যক্তি গীতা পুস্তক চুরি করিয়া আনে তাহাতে কোন ফল হয় না, ওরূপ ব্যক্তির গীতা পাঠ বৃথা হয় ॥ ৭৭ ॥

একস্থানে তাঁহার নিজ হস্তের লিখিত খাতার মধ্যে দেখিতে পাইলাম—“Birth date exactly not known”—সুতরাং এ সম্বন্ধে আমি কিছুই আমার মস্তব্য দিতে পারিব না। যোগিবরের পৌত্রত্ব (শ্রীমান্ অন্তরাচরণ লাতিড়ী ও শ্রীমান্ আনন্দমোহন লাতিড়ী) উভয়েই তাঁহার জন্ম সময় শকাব্দা ১৭৫০, সন ১২০৫, ১৯ই আশ্বিন মঙ্গলবার অপর পক্ষীয় সপ্তমী তিথি বলিয়া (ইং ১৮২৮, ৩০শে সেপ্টেম্বর) নির্ণয় করিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহাদের সহিত একমত না হইলেও বিশেষ কোন ক্ষতি হইবে না, কারণ আমি মহাপুরুষের জীবনী লিখিতে বলি নাট, সুতরাং এস্থলে যুক্তি-তর্ক দেখাইয়া জন্মসময় নির্ণয়ের সঙ্গতি অসঙ্গতি আমি দেখাইতে চাহি না, এবং তাঁহার কোন প্রয়োজনও নাই, শুধু গীতাপাঠকদের সহিত তাঁহার সামান্য পরিচয় করিয়া দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য। তাহাতে জন্ম সময়ের ২৪ বৎসর পার্থক্য কোন বিশেষ ক্ষতি হইবে বলিয়া মনে হয় না।

প্রাচীনকাল হইতেই বিজ্ঞা ও ধর্মের দিক দিয়া বঙ্গদেশের মধ্যে নবদ্বীপের বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা আছে। নদীয়া জেলা বঙ্গদেশের বহু প্রাচীন ও অধুনাতন অনেক শ্রেষ্ঠ পুরুষদিগের জন্মভূমি। বহু মনীষী পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া এই ভূমিকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। যোগিবর শ্রামাচরণও এই নদীয়া জেলার অন্তর্গত হুপ্রসিদ্ধ গোয়াড়ী কৃষ্ণনগরের সংলগ্ন ও সন্নিহিত জলদী বা খড়িয়া নদীর তীরবর্তী ঘুরণী নামক গ্রামে বরেন্দ্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ শিবচরণ সরকার এবং পিতা গৌরমোহন সরকার ধনে, প্রতিষ্ঠায় তৎকালীন ঘুরণীর প্রসিদ্ধ লোক বলিয়া গণ্য ছিলেন; গৌরমোহনের দ্বিতীয়া পত্নী যুক্তকেশী দেবীই শ্রামাচরণ লাতিড়ী (সরকার) মহাশয়ের গর্ভধারিণী ছিলেন। ধর্মকর্মে, পূজার্ননায় এবং দানাদিতে এই বংশীয় লোকদিগের দেশে বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল। খড়ে নদীর প্রবল বস্তাবেগে প্রাচীন সরকার বংশের বসতবাটা, শিবমন্দির প্রভৃতি ভূমিসাৎ হইয়া নদীগর্ভে অবসৃত হইয়া গিয়াছে, এখনও ধ্বংসাবশেষের চিহ্নরূপ ইষ্টকাঞ্চি ইত্যন্ততঃ নদীতটে বিক্ষিপ্ত-ভাবে পড়িয়া আছে দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রামাচরণের পঞ্চবর্ষকাল এই ঘুরণী গ্রামেই অতিবাহিত হয়। স্তন্য দায় তখনও নাকি তিনি শিশুস্বলভ চাপল্য পরিত্যাগ করিয়া একান্তে একাকী পন্ডাসন করিয়া বসিয়া থাকিতেন। জ্ঞানান্তরীয় সংস্কার তাঁহার জীবনকে যে দিকে প্রবাহিত করিয়া লইয়া যাইবে তাহার সূচনা তাঁহার শিশুজীবনেই পরিলক্ষিত হইতেছিল। শ্রামাচরণের পিতা ও পিতামহ মধ্যে মধ্যে নৌকাযোগে কাশীধামে গিয়া কিছু দিন ধরিয়া তথায় বসবাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে গৌরমোহন ভাগ্যবিপ্লব হেতু সাংসারিক প্রয়োজন বশতঃ ঘুরণীর বসবাস উঠাইয়া দিয়া একেবারে কাশীতেই স্থায়ীভাবে বাস করিবার জন্ত পরিবারবর্গ ও শিশু শ্রামাচরণকে লইয়া কাশী যাত্রা করিলেন। কাশীর মহানুপা মহম্মদ সিমন চৌহাটার নিকট একটি বাড়ী ক্রয় করিয়া তথায় সকলে বাস করিতে লাগিলেন। কাশী বহুদিন হইতেই প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের একটি আশ্রয় স্থান রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছিল। ইংরাজসাম্রাজ্যের

প্রথমাবধিই বহু বাঙ্গালী এই পুণ্যক্ষেত্রে গিয়া বাস করিতেন। এখন উহা বহু বাঙ্গালীর প্রবাস গৃহরূপে পরিণত হইয়াছে। যদিও মেড়শত বৎসর পূর্বে বহু বাঙ্গালীর তথায় স্থায়ীভাবে বাস ছিল না; কিন্তু তৎকালীন যে কয় ঘর বাঙ্গালী বাঙ্গালা দেশ হইতে উঠিয়া গিয়া কাশীতেই স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, শ্রামাচরণের পিতা তাঁহাদের অন্ততম। শৈশবেই শ্রামাচরণের মাতৃবিয়োগ হয়, কিন্তু তাহা কাশীতে হইয়াছিল কি না তাহা জানা যায় না।

শ্রামাচরণের শৈশবেই তাঁহাদের সমস্ত পৈত্রিক ভূসম্পত্তি নষ্ট হইয়া যায়। তাঁহার পিতা

গৌরমোহন কালের গতি চিন্তা করিয়া তাঁহাকে ইংরাজী শিক্ষা দিবারই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যদিও গৌরমোহন

সে কালের নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণদিগের ত্রায় সংস্কৃত আরবী ফার্সী ও মাতৃভাষায় সুপরিচিত ছিলেন তথাপি তিনি পুত্রকে ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা দিবার জন্ত প্রসিদ্ধ বাঙ্গা জয়নারায়ণ বোম্বালের স্থাপিত একটি ইংরাজি স্কুলে ভর্তি করিয়া দেন, পরে তিনি সম্ভবতঃ গভর্ণমেন্ট সংস্কৃত কলেজের অন্তর্গত ইংরাজি স্কুলে প্রবেশ করেন। তিনি কতদিন ধরিয়া ও কোন পর্য্যন্ত ইংরাজি বিজ্ঞা অধিকার করিয়াছিলেন তাহার সঠিক সংবাদ জানা যায় না। তবে তিনি ষে-উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহার জীবনে তিনি বহু ছাত্রের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহা তাঁহার অশিক্ষা লাভেই পরিচায়ক। ইংরাজি, হিন্দী, উর্দু ব্যতীত তিনি নাগভট্ট নামক তৎকালীন একজন প্রসিদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃতভাষা ও শাস্ত্রগ্রন্থ কিছু কিছু অধ্যয়ন করিয়া থাকিবেন।

কাশীতে সে কালে যে সমস্ত প্রবাসী বাঙ্গালী কাশীবাস করিবার জন্ত দেশত্যাগ করিয়া

আসিয়াছেন তন্মধ্যে পণ্ডিত দেবনারায়ণ বাচস্পতির নাম প্রসিদ্ধ। তিনি বড় নিষ্ঠাবান ও কর্মী ব্রাহ্মণ ছিলেন;

কাশীর পণ্ডিত মহলেও তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। এই বাচস্পতি মহাশয়ের ঋষ্টম কিংবা নবম বর্ষীয়া কন্যা শ্রীমতী কাশীমণি দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। শ্রীমান্ অন্তর লিখিয়াছেন, “কাশীমণি চিরজীবন শাস্ত ও সুশীলা ছিলেন এবং স্বামীর পারিবারিক অশান্তি ও অর্থকষ্টের দিনে পরম ধৈর্য্য সহকারে সকল দিক সামলাইয়া চলিয়াছেন। তিনি সুগৃহিণী ছিলেন, তাঁহার সুবিবেচনা ও ব্যবহার শুণে পতির সামান্য উপার্কন হইতে বাড়ীঘর সম্পত্তি করা সম্ভব হইয়াছিল। আমরা তাঁহার বৃদ্ধবয়সেও কখন অলসভাবে সময় কাটাইতে দেখি নাই। * * * প্রাতঃকালে সর্বপ্রথম আগত ভিক্ষুকে তিনি স্বহস্তে ভিক্ষা দিতেন, পরে বাড়ীর অন্ত্য লোকেরা অল্প ভিক্ষুদের ভিক্ষা দিতেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে লক্ষ্মীছাড়ার হবে ভিখারী প্রবেশ করে না, তাই কোনও দিন ভিখারী আসিতে বিলম্ব হইলে তাঁহার দৃষ্টিস্তার সীমা থাকিত না। এই পুত্রবতী নারী সুদীর্ঘ জীবন ধর্মপথে ও স্বামীর প্রার্থিত যোগ পথে সাধনা করিয়া প্রায় ৯৪১২ বৎসর বয়সে ১৩৩৭ সাল ১১ই চৈত্র মাসে কাশীলাভ করেন। আয়ের স্বল্পতা হেতু গৃহকাঞ্চি সমস্তই তিনি স্বহস্তে করিতেন। প্রতিদিন

তাহাদের গৃহে অনেক অতিথি ও আগন্তুক আসিয়া ভোজন করিতেন; তিনি যথেষ্ট রন্ধন করিয়া সকলকে তৃপ্তিপূর্বক ভোজন করাইতেন। এছাড়া তিনি দিবসে বড় বেশী সময় পাইতেন না, এই ক্ষত্র রাতিতে সকলকে ভোজন করাইয়া রাজি ১০টা পর হইতে ৩৪ ঘণ্টা কাল প্রত্যহ সাধনার মনোনিবেশ করিতেন।”

শ্রীমান্ আনন্দমোহন যোগিরাজের জীবনীতে লিখিয়াছেন—“অনুমানিক ত্রয়োবিংশ বয়স্ক কালে তিনি গাঞ্চিপুরে সরকারি চাকরী আরম্ভ করেন। মির্জাপুর, বক্সর, কটুয়া, গোরক্ষপুর, দানাপুর, বাণীক্ষেত, কাশী প্রভৃতি স্থানে তিনি যথাক্রমে বদলি হইয়া চাকরি করিয়াছিলেন। সরকারি পূর্তবিভাগে (Public Works Department, Military Engineering Works) এ তিনি কাজ করিতেন। সৈন্য সামন্তদের রসদ দেওয়া এবং রাজ্যবাট তৈয়ার করা তখন ইংরাজদের এই সামরিক বিভাগের একটি প্রধান কার্য ছিল। এইজন্য তখন রাজকীয় পূর্তকর্ম বিশারদ (Royal Engineer) নিযুক্ত হইয়াছিল। এই বিভাগের অফিসে দানাপুরে তিনি দ্বিতীয় ক্লাসের কাজ করিবার জন্য বদলি হইয়াছিলেন। ঐ অফিসের নাম আজকাল D. D. M. W. Office হইয়াছে (Deputy Director of Military Works Office) হইয়াছে। তিনি শেষ জীবনে তখনকার ব্যারাক মাস্টার (আজকাল উহাকে S. D. O. বলে) হইয়াছিলেন।”

যখন গাঞ্চিপুবে তিনি কর্ম করিতেন, তখন তাঁহার যেতন খুব সামান্যই ছিল। তখন তিনি সেনাবিভাগের অফিসার সাহেবদিগকে হিন্দী ও উর্দু ভাষা শিখাইতেন, তাহাতে তাঁহার কিছু আয় হইত, তাহাতেই তিনি আশনার ও কাশীর ব্যয় নির্বাহ করিতেন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে উক্ত অফিস কাশীতে স্থানান্তরিত হওয়ায় তিনি কাশী বদলী হইয়া আসিলেন। ঐ বৎসর ৩১শে মে তাঁহার পিতৃদেহ কাশীলাভ করেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের গৃহবিবাহ আবশ্যক হইল; অত্যন্ত অশান্তির ক্ষণে তিনি তথায় থাকিতে না পারিয়া সিমরন চৌহাটায় ঘর ভাড়া করিয়া সপরিবারে বাস করিতে লাগিলেন। ১৮৬৩ খৃঃ তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ৮তিনকড়ি লাহিড়ী মহাশয়ের জন্ম হয়। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে তিনি গুরুদেবের বসন্তবাটী বরিন করিয়া বাস করিতে লাগিলেন; কর্ম হইতে অবসর লইয়াও এই গৃহেই তিনি বাস করিতেন এবং এই গৃহেই তাঁহার মর্ত্যলীলার অবসান হয়। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ৮দুর্জি লাহিড়ী মহাশয় এই গৃহেই জন্মগ্রহণ করেন। এবং লাহিড়ী মহাশয়ের ভাগ্যবতী পত্নী ও জ্যেষ্ঠ পুত্রের এই গৃহেই দেহাবসান হইয়াছে।

বাহ্যিক লোকহিতকর কার্যেও তাঁহার যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। বাল্যসীটোলা হাই স্কুল প্রাতিষ্ঠান তিনি অত্যন্ত উদ্যোগী ছিলেন। অবশ্য অনেক গণ্যমান্ত ব্যক্তিও যথা সম্বল রামকালী চৌধুরী মহাশয়, মাননীয় গিরিশচন্দ্র দে, কাশীনাথ প্রভৃতিও এই কার্যে তাঁহার সহায়ক ছিলেন। লাহিড়ী মহাশয় সমস্ত দিন চাকরী করিয়া ও গৃহশিক্ষকতার কার্য সম্পন্ন করিয়া এবং গৃহের বিবিধ কর্মাদি করিয়া ক্রান্তমেহে আবার তিনি এই জনহিতকর

কার্যের জন্য বিপুল পরিশ্রম করিতেন। ইহাতেই বুঝা যায় তিনি কিরূপ উত্তমশীল ও উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন। এই পরিশ্রমের পবণ কর্মফল শরীরে আবার যে তিনি এই জনহিতকর কার্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারিতেন ইহাতে তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তাই প্রমাণ করে। এবং এইরূপ দৃঢ়চিত্ততার জন্যই ভবিষ্যৎ জীবনে যোগাভ্যাসের বিপুল পরিশ্রম তাঁহাকে ক্লান্ত করিতে পারে নাই; এবং তিনি যে সাধনার সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, মনের এই দৃঢ়তা এবং পরিশ্রমের অনলস অক্লান্তিই যে তাহার অক্লান্ত কারণ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। “নাম্নমাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ”—বীর্ঘবান্ পুরুষেরাই আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে—ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তাঁহার জীবনে বহিয়াছে।

গুরুদর্শন ও দীক্ষালাভ লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনের সর্বপ্রধান আশ্রয় ঘটনা। এইবার

গুরুদর্শন ও দীক্ষালাভ

সেই কথাই বলিব। কিন্তু তাহার পূর্বে আরও কয়েকটি

কথা আলোচনা করা আবশ্যক। তাঁহার দীক্ষা সম্বন্ধে

আমি আমাদের একজন বিশিষ্ট গুরুভ্রাতার নিকট যেরূপ শুনিয়াছিলাম এখানে তাহাই উল্লেখ করিব। এই তত্ত্বলোকের কথা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কারণ তিনি সর্বদা তাঁহার নিকট থাকিতেন, তাঁহার গৃহেই ভোজনাদি করিতেন এবং সময়ে সময়ে তাঁহার নিকট যে সব পত্রাদি আসিত তাঁহার আদেশ মত তিনি সেই সকল পত্রাদির উত্তর দিতেন। আমাদের এই গুরুভ্রাতার নাম অমর বাবু, ইনি অত্যন্ত গুরুভক্ত ও সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন, নিজের জীবনের অনেক ঘটনা অকপটে সকলের নিকট বলিবার তাঁহার যথেষ্ট সংসাহ ছিল। পরে তাঁহার অমরনাথ ব্রহ্মচারী নাম হইয়াছিল। তিনি “অমর” নামক একখানি সুন্দর উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। তাহাতে সাধকের ও সাধন সংক্রান্ত অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের কথা এবং হিমালয় প্রভৃতি স্থানের বর্ণনা ছিল।

লাহিড়ী মহাশয় হঠাৎ এই সময় হিমালয়স্থ নৈনীতালের নিকটবর্তী রাণীক্ষেত নামক স্থানে বাইবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া উক্ত প্রদেশে যাত্রা করিলেন। এই সময় সম্ভবতঃ তিনি দানাপুরের Royal Engineering Officeএ ক্লাসের কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। তখন বোধ হয় অক্টোবর কিংবা নভেম্বর মাস। নিজস্থান হইতে পাঁচশত মাইল দূরে সুদূর হিমালয়ের পর্বতমালায় ভিত্তির দিয়া তাঁহাকে গন্তব্যস্থানে বাইতে হইবে। তখনও রেলপথ হয় নাই, হুতয়াং সেই সুদূর পথ তাঁহাকে অন্তরূপ বানবাহনাদির সাহায্যে অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। তাঁহার জীবনে যে সুমহৎ ঘটনা ঘটিবে এবং জীবনযাত্রায় যে আমূল পরিবর্তন আসিবে তাহার আভাস মাত্রও তখন তিনি অবগত নহেন। তখন তিনি বেন চাকরীর দায়েরী পুত্র আশ্রায় বদ্ধ বান্ধবের মায়া কাটাইয়া বহুবান্ধবহীন নীতবল্লভ ভারতের উত্তর দিকস্থ হিমালয়ের প্রান্তপ্রান্তে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শ্রীমান্ আনন্দমোহন যোগিরাজের যে জীবনী প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রাণীক্ষেত বাইবার উল্লেখ আছে, তাহা হইলে তখন তাঁহার বয়সক্রম ৩৩ বৎসর হয়। শ্রীমান্ অভয়াচরণ যে সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসের শেষপঞ্চমি রাণীক্ষেতে বাইবার আদেশ প্রাপ্ত হন এইরূপ উল্লেখ

আছে, এই হিসাবে তখন তাঁহার বয়স প্রায় ৪০ হইয়াছিল। এই দুইটি বিষয়ের মধ্যে কোনটা ঠিক তাহা আমি বলিতে পারি না, কারণ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের নিকট তাহা শুনিয়াছিলাম তাহাতে সমস্তের কথা তিনি কিছু বলিয়াছিলেন কিনা তাহা আমার মনে নাই।

এই সময় নৈনিতাল বা রাণীক্ষেত কোনটাই বর্তমান কালের মত উন্নত নগররূপে পরিণত হয় নাই। রাণীক্ষেত তখনও বৃক্ষ-গুচ্ছাচ্ছাদিত অরণ্য মাত্রই ছিল; তখনও রাণীক্ষেত ও তাহার চতুর্পার্শ্বে ১৫২০ মাইল পর্য্যন্ত স্থানে বর্তমান যুগের কোন সমৃদ্ধি পরিলক্ষিত হইত না। লোকের তেমন ভীড় বসতি তো দূরের কথা, শৈল উপত্যকায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কতিপয় জীর্ণ ক্ষুদ্র বসত গৃহই তখন মহন্তবাসের চিহ্ন প্রকট করিত মাত্র, এবং আরও গোপনে দুই চারিটা ক্ষুদ্র কুটীরা ও পর্তুগীজ হাওলি সাধুর নির্জন বাসের উপযুক্ত আশ্রয় ছিল মাত্র। আজ আর সে দিন নাই; এখন সহরের সমস্ত সমৃদ্ধি আসবাব আয়োজন রাণীক্ষেতের সর্বত্র পরিদৃষ্ট হইবে। ইংরাজ সরকারের সেনানিবাস এবং অনেক দেশীয় ও ইউরোপীয় ব্যক্তিগণের স্বরম্য ঘর ও বিপণীশালায় সহরের বক্ষ পরিশোভিত রহিয়াছে। এখন আর সে স্থানে একটা সাধুর বাস নাই, তপস্কার বিদ্বৎ হইবার আশঙ্কায় বছরদিন পূর্বে সে স্থান ছাড়িয়া তাঁহার চলিয়া গিয়াছেন। সাধুর পদসংস্কৃত পবিত্র ধূলিবাশি আর সেই সকল উপত্যকাকে পবিত্র ক্ষেত্রে পরিণত করে না।

এখানে একটা সেনানিবাস স্থাপিত হইবে তাই সরকারি এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের কর্মচারিগণ স্থানটিকে সেনাদিগের বাসোপযোগী করিবার জন্য জল কাটাইয়া ভূমিটিকে সমতল করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। লাহিড়ী মহাশয় এই কাজের জন্যই এখানে আসিয়াছিলেন। কাজ খুব বেশী ছিল, এই সকল কার্যের পরিদর্শন ও ২৪ ঘণ্টা চিঠি লেখাই তাঁহার কার্যের অঙ্গ ছিল; সুতরাং স্বয়ং বাস্তবহীন একাকী এই নির্জন প্রদেশে তাঁহার সময় যেন আর কাটিতে চাহিত না। এই সময় তাঁহার মাথায় এক বেয়াল আসিল। তিনি নিকটস্থ এক পাহাড়ীয়া চাপরাশিকে ডিঙাসা করিলেন—“এখানে কোন সাধু মহাত্মা আছেন?” চাপরাশি আগ্রহের সহিত উত্তর করিল—“আছেন বৈকি”। লাহিড়ী মহাশয় আবার প্রশ্ন করিলেন—“আমাকে দেখাইতে পার?” চাপরাশী বলিল—“পারি বৈকি, আমাদের গ্রাম যে পাহাড়ের গায়ে, তাহারই উচ্চ শিখরে সাধুরা আছেন, তাঁহারা আমাদের বড় উপকার করেন, আমাদের রোগের ঔষধ এবং ক্ষুধার অন্ন প্রয়োজন হইলে তাঁহাদের নিকট হইতেই পাইয়া থাকি” ইত্যাদি। এইবার শ্রামাচরণতাহাকে ধরিয়া বলিলেন—“আমাকে সাধু দেখাইতে হইবে”। একটা দিন নিদ্রিষ্ট হইল, অফিসের কাজকর্ম সারিয়া যথেষ্ট বেলা থাকিতে থাকিতেই তাঁহার পার্শ্বত পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন, পরে তাহার একটি অনতিউচ্চ পাহাড়ের নিকট-বর্তী হইলেই চাপরাশি তাঁহাকে “এই পাহাড়ের শিখর দেশে সাধুরা থাকেন” বলিয়া পাহাড়ের গাত্রপলংক বন্ধুর পথ ধরিয়া তাঁহার সঙ্গী চাপরাশী অদৃশ হইয়া গেল। পাহাড়ের গাত্র দিয়া যে পথ শিখর দেশে পৌছিয়াছে, এখন একাকী সেই পথ দিয়া শ্রামাচরণ চলিতে লাগিলেন। পথে যাইতে যাইতে শ্রান্তি বোধ করিতে লাগিলেন এবং কেনই বা সাধুধর্মে

যাইতেছেন, দেখিয়া কি ফল হইবে, এ সব কথাও ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার মনে উদয় হইতেছিল, তথাপি নেশার ঝোঁকে পড়িয়া যেমন লোকে একটা অগম্য স্থানে পৌছিবার চেষ্টা করে, সেইরূপ একটা নেশা শ্রামাচরণকে আক্রমণ করিয়াছিল এবং তাঁহার প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে সেই গিরির শিখর দেশে উপনীত হইতে হইল। এখন সেই সব গিরির স্থান বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়াছে, সেখানে তেমন বৃক্ষ-লতাদি আজকাল আর নাই, কিন্তু তখন সেরূপ ছিল না। যদিও পাহাড়টা তেমন উচ্চ নহে কিন্তু তাহার পথ তখন সেরূপ অগম্য ছিল না। তিনি সেখানে পৌছিলেন বটে, কিন্তু শরীর মন উভয়ই বড় ক্লান্ত। মনে ইহাও চিন্তা করিতেছিলেন “এখনই রাজির নিবিড় অন্ধকারে গিরি পথ সমস্তই আচ্ছন্ন হইয়া যাইবে, পথ চিনিয়া তাঁরুতে ফিরিব কিরূপে?” বাহা চড়ক তথায় একজন সাধুপুরুষকে দেখিতে পাইলেন, যেন সাধুটি তাঁহার অন্তই অপেক্ষা করিতেছেন। আসিয়া কাজ বে তিনি ভাল করেন নাই এই চিন্তাতেই তখন তিনি মগ্ন, সুতরাং সাধুকে দেখিয়া তিনি বিশেষ কোন সম্ভাবণ করিলেন না। সাধু কিন্তু বড় প্রশংসিত, তাঁহাকে দেখিয়া মুহু মুহু হাসিতেছেন। একটু পরে সাধু তাঁহাকে জলপান করাইলেন, তখন তিনি একটু শ্রান্ত হইয়া সাধুর দিকে তাকাইয়া তাঁহাকে সামান্যরূপে অভিযান করিলেন এবং কিরূপে বাসায় ফিরা যাব তাহাই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। যুবক সাধু তাঁহার দিকে বিস্মিতভাবে তাকাইয়া বলিলেন—“আপনি এখানকার সাধু মহারাজকে দর্শন করিবেন না?” শ্রামাচরণ উত্তর করিলেন, “এই আপনাকে দেখিলাম, এই হইল, এখন নিজে স্থানে ফিরিয়া যাইতে হইবে”। সাধু বলিলেন, “তাও কি হয়, আপনি সাধু দেখিতে আসিয়াছেন, তাঁহাকে না দেখিয়া কিরূপে প্রত্যাবর্তন করিবেন? তাঁহার বাহিরে আসিবার সময় প্রায় হইয়াছে।” দেখিতে দেখিতে পর্তুগীজ চতুর্দিক ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতে চলিল। দুই চারিটা নক্ষত্র ক্রমে ক্রমে কুটীয়া উঠিতে লাগিল। শ্রামাচরণ কি করিবেন, কি যেন নেশার ঘোরে হতচেতন হইয়া সেখানে তিনি সাধুর আগমনের প্রতীক্ষা দেখিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে সত্য সত্যই সমুজ্জলচক্ষু, বাস্তবদন, সুদৃঢ় বলিষ্ঠ একটা শ্রোত্রবস্ত্র সাধুকে তিনি দেখিতে পাইলেন। সঙ্গ্রমে তিনি গাত্ৰোত্থান করিয়া সাধুকে অভিযান করিলেন। সাধু হাসিতে হাসিতে বলিলেন—“শ্রামাচরণ ভূমি এসেছ? ভাল আছ তো?” তিনি সাধুর কথার উত্তর দিবেন কি, সাধুর কথাগুলি তাঁহার মনে তখন বিষম চিন্তা ও উদ্বেগের সৃষ্টি করিল। ভাবিতে লাগিলেন সাধু তাঁহার নাম জানিলেন কিরূপে? এ দেশে কেহই তাঁহার নাম জানে না। ডাকে দুই একখানা তাঁহার নামযুক্ত পত্র আসে বটে, কিন্তু তাহা সাধুর আনিবার সম্ভাবনা কোথায়? তবে কি ইহার ঠগ না দস্য? তবে কি কোন ভণ্ড প্রতারণার হাতে আসিয়া পড়িলেন? এই সকল চিন্তায় যখন তাঁহার মন সচকল তখন তিনি সাধুর মুখে তাঁহার পিতারও নাম শুনিয়া বিশ্বাসে আরও অস্তিত্ব হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তখন তাঁহার চিত্ত এই অপরিচিত ব্যক্তিকে সাধু বলিয়া স্বীকার করিতে অসম্মত, এবং ক্রমাগত বিরুদ্ধ চিন্তা আসিয়া তাঁহাকে বিস্ত্রল করিয়া ফেলিতেছিল।

তখন সাধু বলিলেন—“শ্রামাচরণ, তুমি আমাকে চিনিতে পারিতেছ না, আমাকে একে-
বারে ভুলিয়া গিয়াছ ?” শ্রামাচরণ বলিলেন—“না, কিছুতেই মনে পড়িতেছে না, কখনও
আপনাকে দেখিয়াছি বলিয়া ভো মনে হয় না”। তখন সাধু ধীরে ধীরে তাঁহাকে স্পর্শ করি-
লেন। তাঁহার স্পর্শ পাইবামাত্র সমগ্র শরীরে একটা তড়িত প্রবাহ ছুটিয়া গেল। যেন অতীত
জন্মের সব কথা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। তিনি আনন্দে অধীর হইয়া সাধুর পা জড়াইয়া
ধরিলেন, আনন্দের উচ্ছ্বাসে যেন তাঁহার গাত্র-মন নৃত্য করিয়া উঠিল। বহুদিনের পরে আবার
তিনি তাঁহার প্রেমময় গুরুর দর্শন পাইলেন। ঠিক সেই দিনেই কি না মনে নাই, কিন্তু
তাঁহার দীক্ষা হইয়া গেল। এই দীক্ষা ভো অনেকেরই হয়, কিন্তু তাঁহার দীক্ষার একটা
বৈশিষ্ট্য ছিল। আজ শুধু তিনি দীক্ষিত হইলেন না, তাঁহার সহিত তাঁহার ভাবী শিষ্যদেরও
অদৃষ্ট সুপ্রসঙ্গ হইল। জগতের বহুলোক যে সাধনার পথ পাইবে, অতীত কালের কত সাধক
সাধন-পথ পাইবার জন্য আবার যে তাঁহাকেই বেঁটন করিয়া দাঁড়াইবে, আবার ভারতের গৃহে
গৃহে গীতা পঠিত হইবে, গীতাজ্ঞান প্রচারিত হইবে, যোগাভ্যাসের সুদুর্লভ অবিসেবিত
প্রাচীন পন্থা আবার জনসমাজে সহজলভ্য হইয়া প্রচারিত হইবে—এই সমস্ত ভাবী কর্মের
সূচনা তাঁহার দীক্ষার সহিত সংশ্লিষ্ট। তাই তাঁহার দীক্ষার দিন একটি গণনীয় দিন,
অনেকের ভাগ্য তাঁহার দীক্ষার সহিত জড়িত, আজ তাঁহার দীক্ষার সহিত জগতে সাধন-
সৌভাগ্যের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গেল।

এই সময় শ্রামাচরণ গুরুপদটি পথে তীক্ষ্ণ সাধনায় মনোনিবেশ করিলেন।

সাধন।

যন্ত্র দিনের মধ্যেই তিনি বহুদূর অগ্রসর হইলেন, অনেক
দুর্য্যোগ অজ্ঞাত বিষয় সহজেই তাঁহার বোধগম্য হইতে
লাগিল। তিনি এখন সাধনার ও গুরুপ্রেমে বিভোর—
আর সে স্থান ছাড়িয়া তাঁহার বাইতে মন সরে না কি যেন এক অজ্ঞাত অনাবিহিত বন্ধ
স্বাধ পাইলেন, তাঁহার মনঃ প্রাণ সেই বস্তুতবে ডুবিয়া রহিল, আর সে মন যেন উঠিতে
চাহে না। অত্যন্ত অনিচ্ছায় অকসিৎ বাইতে হয় তাই বাইলেন, কিন্তু প্রত্যহই
তাড়াতাড়ি হাতের কান্দ সাহিয়া আবার গুরুসন্নিধানে উপস্থিত হইতেন। অতি অল্প কয়েক
দিনেই তিনি সাধনার নেশায় আত্মবিস্মৃত হইতে লাগিলেন এবং এক অভিনব অজ্ঞাতপূর্ব
অবস্থায় তিনি বিভোর হইয়া পড়িলেন। একদিন তাঁহার গুরু (ইহাকে আমরা বাবাজী বলিয়া
জানি) জানাইলেন—শীঘ্রই তাঁহাকে এস্থান ত্যাগ করিয়া বাইতে হইবে, যে কোণে
তাঁহাকে এখানে আনা হইয়াছিল তাহা তিনি সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। এখানে
অপর একটি ক্লার্কের আসিবার কথা হইয়াছিল, বাবাজীর ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে সেই অপর
ব্যক্তির স্থানে তাঁহাকেই কর্তৃপক্ষীরেরা পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। এখন যে কার্য সাধনার
অন্ত তাঁহার এখানে আসা—তাহা হইয়া গেল, এইবার তাঁহার ফিরিয়া বাইবার সময় উপস্থিত,
কিন্তু শ্রীগুরুচরণ ছাড়িয়া তাঁহার যে বাইতে মন উঠে না। গুরু বুঝাইয়া বলিলেন, “তোমাকে
অনেক কষ্ট করিতে হইবে, মেশে না কিরিলে চলিবে না, অনেক লোক তোমার অপেক্ষার

বসিয়া আছে।” অগত্যা ব্যথিত অন্তঃকরণে তিনি বাইতে স্বীকৃত হইলেন। গুরু বলিলেন—
“তোমার ভয় নাই, চিন্তা করিও না, মধ্যে মধ্যে আমার দেখা তো পাইবেই, এবং তুমি
যখনই দেখিতে চাহিবে, তখনই আমাকে দেখিতে পাইবে।”

এই সময় অনেক অর্লৌকিক ব্যাপার ঘটয়াছিল, অনেক অদ্ভুত দৃশ্যের দর্শন, অনেক
অসাধারণ সিদ্ধ-সাধকদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ইত্যাদি বহু ঘটনা ঘটয়াছিল, তাহা লিখিয়া
গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাহি না। শ্রীমান্ অত্যন্ত লিখিয়াছেন—“১৮৬৯ খৃঃ ১৫ই
আশ্বিনাব্দী তথা হইতে বাক্সা করিয়া মিরজাপুর অফিসের কাছে যোগদান করেন এবং ১লা
জুন তারিখে পুনরায় কাশ্মীর অফিসে নিযুক্ত হন। ১৮৭২ খৃঃ আবার বহলী হইয়া হানাপুর
গেলেন।”

আমরা শুনিয়াছিলাম দীক্ষার পরেই কয়েকজন লোককে দেখাইয়া বাবাজী বলিলেন—

দীক্ষাদান

“ইহাদিগকে তোমাকে দীক্ষা দিতে হইবে তোমার জন্ত
ইহাদিগকে বহুদিন ধরিয়া আটকাইয়া রাখিয়াছি।” তাঁহুর
হাসিয়া বলিলেন, “আমার জন্ত কেন আটকাইয়া রাখিয়াছেন, আপনি যখন রহিয়াছেন
আমার নিকট দীক্ষা লইবে কেন?” বাবাজী হাসিয়া বলিলেন—“উহাদের সহিত আমার যেনা
পাণ্ডার সন্ধি নাই, তোমার সহিতই আছে, তোমাকেই দীক্ষা দিতে হইবে”। বোধ হয়
তাঁহাদের দীক্ষা হইয়া গেল। তাহার পর বাইবার প্রাক্কালে তিনি নিজ গুরুর নিকট প্রার্থনা
জানাইলেন এই সাধনা জাতিধর্ম্মানর্ধিশেষে সকলের নিকট যেন প্রচার করিতে পারেন।
বাবাজী তাহাতে প্রথমে কিছুতেই সন্মত হন নাই শুনিয়াছিলাম; পরে তাঁহার নির্মলজ্ঞানপ্রে
অগত্যা সন্ততি দান করিলেন কিন্তু কতকগুলি নিয়ম বাধিয়া দিলেন। সেই নিয়মামুসারে
শ্রামাচরণ সকলকে যোগদীক্ষার দীক্ষিত করিতেন, সমগ্র জীবনে কখনও তাহার অগ্রথা করে ন
নাই। এই সময় হইতেই তিনি লোক সকলকে দীক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথম
দীক্ষাদান কোথায় আরম্ভ হইল তাহা আমরা জানিতে পারি নাই, তবে কাশ্মীরে একজন
মালীকেই প্রথম দীক্ষা দেন (পাহাড়ের সন্ন্যাসীগুলির কথা এখানে আলোচ্য নহে)। মালী
কেন্দ্রবৈষ্ণব মন্দিরের দ্বারে সুলমালা বিক্রয় করিতেন। পরে বহুলোক তাঁহার নিকট দীক্ষা
লাভার্থ সমুপস্থিত হইতেন, এবং প্রায় সকলেই তাঁহার কুশালাত করিয়া কৃতার্থ হইয়া বাইতেন।
সমুদগ্ধে ব্যাকুল হইয়া ভ্রমরগণ যেমন পদ্মজলের চতুর্দিকে গুঞ্জন করিতে থাকে, তরুণ
তাঁহার নিকট শিকার লাভ করিবার জন্য নানাভাষায় লোক দলে দলে আসিয়া তাঁহার নিকট
উপস্থিত হইতেন। ব্রাহ্মণ-কৃত্রিয় হইতে অশুভ্র জাতীয় হিন্দু, মুসলমান, ইংরাজ এবং রাজা
মহারাজা হইতে পথের ভিখারী পর্যন্ত কেহই তাঁহার কাছে বঞ্চিত হয় নাই। ১৮৮০ খৃঃ
তিনি চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কাশ্মীরে নিজগৃহে বাস করিতে লাগিলেন; এই
সময় তিনি কাশ্মীর-নরেশ ঈশ্বরীনারায়ণ সিংহ ও ৩৭শ্রুজ প্রজ্ঞানারায়ণ সিংহকে দীক্ষা দেন।
পেন্সন লওয়ার পর কিছুদিন তিনি প্রজ্ঞানারায়ণ সিংহের অধ্যাপনায় কাণ্ড করিয়াছিলেন,
সেই সময় তাঁহারই তাঁহার মহাব জানিতে পারিয়া পিতাপুত্র তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ
করেন।

তিনি বড়দর্শনের, কতকগুলি উপনিষদের এবং গীতা, চরক, মনু প্রভৃতি ২২ খানি গ্রন্থের
শাস্ত্রগ্রন্থের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেগুলি সাধারণের
বোধগম্য না হইলেও সাধকদিগের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়।
তাঁহার পূর্বে এই সকল—বিশেষভাবে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এইরূপ সাধন বহুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা
আর কেহ করিয়াছেন বলিয়া জানা নাই।

এইরূপে প্রায় ১৫ বৎসর (১৮৮০—১৮৯৫ খৃঃ) ধরিয়া সাধারণের মধ্যে এই যোগধর্ম
প্রচার করিয়া এবং জিজ্ঞাসুস্বর্গের সন্দেহ বিদূরিত করিয়া
মহাপ্রয়াণ ১৮৯৫ খৃঃ ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৩২০ সনের ১০ই আশ্বিন
বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীশারদীয়া পূজার মহাচন্দ্রমীর সন্ধিক্ষণে তাঁহার দেহদেহের অবসান হয়।
তাঁহার পুত্রস্বয় ও ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে পদ্মাসনে বসাইয়া তাঁহার পবিত্র দেহে পুষ্পমালা চন্দনে
ভূষিত করিয়া মণিকর্ণিকা ঘাটে লইয়া গেলেন। চিতা শয্যা শয়ন করাইবার পূর্বে তাঁহাকে
বখন স্নান করানো হইতেছিল তখন সকলেই তাঁহাকে জীবিত বোধ করিয়া চমকিত
হইয়াছিলেন।

তিনি কর্ম হইতে অবসর লইয়া যে ১৫ বৎসর শরীর ধারণ করিয়াছিলেন, সে সময় তিনি
অধিকাংশ সময় ধ্যানমগ্ন অবস্থাতেই অতিবাহিত করিতেন।
জীবনের শেষভাগে তিনি কথা পর্য্যন্ত বেশী বলিতে
পারিতেন না। কথা কহিতে কহিতে সর্বদা তাঁহাকে অরণ্য করাইয়া দিতে হইত তিনি কি
বলিতেছেন, একটু অগ্রমনস্ক হইলেই তিনি পূর্বকথা ছাড়িয়া আবার মগ্ন হইয়া যাইতেন। সে
আশ্চর্য্য অবস্থার কথা বর্ণনা করা অসাধ্য।

তিনি নাম প্রতিষ্ঠার দিকে একবারেই লক্ষ্য রাখিতেন না, তাঁহার ফলে অতি অল্প লোকই
তাঁহার সহিত মিলিবার সুযোগ পাইয়াছেন। অনেকে তাঁহার নামও শোনেন নাই, কিন্তু
তাঁহার মত উচ্চাঙ্গের রাজযোগী বর্তমানকাল কেন, হুহু অতীত কালেও দুর্লভ ছিল।
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার যোগীর ও ভক্তের যে সকল লক্ষণ বর্ণিত আছে সে সকল
লক্ষণ তাঁহাতে যেমন পরিপূর্ণ আকারে দেখা যাইত এমন আর কাহাতেও দেখা
গিয়াছে কি না জানি না। তাঁহার কথাবার্ত্তা বেশভূষা বা আচার-ব্যবহারে
আড়ম্বরের লেশমাত্র ছিল না। তিনি সন্ন্যাসী পর্য্যন্ত ছিলেন না। জী পুত্র পরিবার
লইয়া সংসার করিতেন, জীবিকার জন্ত কর্ম করিতেন, অথচ তাঁহাকে পদ্মপত্রস্থিত
জলের জ্ঞান সম্পূর্ণ নিমিত্ত দেখাইত, কোন হুঃখ কষ্ট বা কোন বিপদ তাঁহার মনের সে
সুগভীর স্থিরতাকে স্পর্শ করিতে পারিত না—হৃদয়হেতুর সহিত নিগূঢ় মিলন-জনিত
অতুল আনন্দ তাঁহার মুখমণ্ডলকে সর্বদা মধুর প্রভা প্রদীপ্ত করিয়া রাখিত। কবি Gold-
smith এর “Eternal Sunshine over the Mind” তাঁহাতেই অর্থ হইয়াছিল। চাচিপাশে
শুভ কর্মের ঝটিকা ও বস্ত্র-বিদ্যুৎ, কিন্তু তাঁহার অন্তর অজ্ঞেয় গিরিশিখরের ত্রায় জ্ঞানের
প্রভা ও শান্তির স্নিগ্ধ কিরণে নিরন্তর সমুজ্জল হইয়া থাকিত।

অহঙ্কার বা আত্মগৌরবের লেশ মাত্র তাঁহাতে তো ছিলই না, পরন্তু এমন হৃদয় বিনয়
বচন দ্বারা তিনি আপনাকে সতত আবৃত করিয়া রাখিতেন যে লোকে তাঁহার মহত্বের বা
অপূর্ব বৈশিষ্ট্যের কোন সন্ধানই পাইত না। তিনি তাঁহার প্রত্যেক শিষ্যকে এই উপদেশ
দিতেন যে—“আপনাকে সর্বাঙ্গেক্ষা ছোট মনে করিবে”। তিনি বড় স্বল্পভাবী ছিলেন,
সাধনার কথা ছাড়া অন্য কোন কথাই প্রায় বলিতেন না, এবং এ সম্বন্ধে দুই চারিটি কথার যে
টুকু আলোচনা করিতেন সেই সকল উপদেশ ব্যক্তি তাঁহার অন্তর্নিহিত গভীর জ্ঞানের
পরিচয় দিত। তা ছাড়া তাঁহার হৃদয় বুদ্ধিমান ও সাধনার অপূর্ব প্রতিভা দেখিয়া বিদ্বান
ও সন্ধানগণ সহজেই মুগ্ধ হইয়া পড়িতেন। এত অল্প কথার অতিশয় সত্বের পাইয়া কৃষ্ণ-
তার্কিকেবাও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যাইত। তাঁহার অপূর্ব যোগপ্রতিভার মুগ্ধ হইয়া
তাঁহাকে গৃহস্থান্দ্রী জানিয়াও বহু বড়ী, পরমহংস, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী তাঁহার নিকট যোগদীক্ষা
লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার চাকরীর অবস্থাতেই বহুলোক তাঁহার সাধনসঙ্গ
প্রজ্ঞায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষালাভ করিয়া যোগাভ্যাসে রত হইয়াছেন। তিনি
দেখাইয়া গিয়াছেন এই কলিযুগের প্রচণ্ড প্রভাবের মধ্যেও সাধন করিতে পারা যায় এবং
তাহাতে সিদ্ধি লাভ করাও অসম্ভব নহে।

মহত্ত্বপ্রাপ্তির প্রতি তাঁহার প্রীতিও অনন্তসাধারণ ছিল। জীবনকাল জিতাপ জালায়
অবিরত জলিতেছে যেখান তাহাদের সেই হুঃখ নিবারণের জন্য তিনি সাধনার দ্বার জাতি-
নির্কিশেবে মহত্ত্বপ্রাপ্তির জন্ত উগ্ৰকৃত রাখিয়া ছিলেন; নীচ জাতি, উচ্চ জাতি, শুদ্ধ ও পতিত
কেহই তাঁহার কৃপা হইতে বঞ্চিত হয় নাই।

তিনি বুঝিয়াছিলেন যে স্বয়ংপ্রোক্ত ধর্মের বাবতীর অসুষ্ঠান যোগসাধনার উপর
প্রতিষ্ঠিত, যোগাভ্যাস ব্যাতীত আধ্যাত্মিক ও আধ্যাত্মিকের গূঢ় রহস্য অবগত হওয়া অসম্ভব।
তত্ত্ব-পুরাণাধিতে এ কথার স্পষ্ট ইঙ্গিত বর্তমান। সেই জন্ত তাঁহার ইচ্ছা ছিল যেন
ভারতবাসী আধ্যাত্মানুগণ অপ্রাচ্যিক যোগাভ্যাসে রত হয়। তিনি বৈরাগ্যের প্রয়োজনীয়তা
হৃদয়ঙ্গম করিতেন, কিন্তু কোন কালেই উৎকট বৈরাগ্যের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি
বলিতেন—প্রকৃত বৈরাগ্য বর্তমান যুগে সকলের পক্ষে হওয়া সম্ভব নহে, এবং অনধিকারে
বৈরাগ্য গ্রহণ করিলে কপটাত্মারের আশ্রয় লইতে হইবে। তিনি কপটাত্মাকে একেবারেই
পছন্দ করিতেন না। তিনি বলিতেন—যথাসম্ভব সংযম রক্ষা করিয়া নিত্য নিয়মিত ভাবে
যতটুকু পার অধ্যাস করিয়া চল, একদিন তুমি ঠিক জায়গার আসিয়া পৌঁছিতে পারিবে।

কর্ম হইতে অবসর গ্রহণের পরই অতিক্রান্ত প্রচার কার্যের আরম্ভ হয়। কিন্তু তিনি একান্ত
হাটে-বাটে কখন বক্তৃতা দান বা সংবাদপত্রে তাঁহার প্রচার কার্যের ঘোষণা করিতেন
তাহা নহে। জীবনের শেষ দিকটা যাহারা তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন তাঁহারা জানিতেন—সে
মম লইয়া আর প্রচার কার্য চল না। সে শুধু মৌন প্রকাশ্যতার ছবি যাহারা দেখিবার
সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে তাহারা সে দৃশ্য কিছুতেই বিস্মৃত হইতে পারে না। তাই পছন্দোভে
মুগ্ধ ভ্রমরের মত শত সহস্র গৃহী ও ত্যাগীরা আসিয়া তাঁহার কপালাত করিয়া আপনাদের

জীবনকে ধন মনে করিতেন। এইরূপে তাঁহার সাধন পদ্ধতি বজায় ৩ বজের বাহিরে বহনভাবে প্রচারিত হয়। এক্ষণে হুদ্র আমেরিকায় ও ইংলণ্ডে প্রচারিত হইতেছে। আধুনিক কালে গীতার মাহাত্ম্য প্রচারের তিনিই প্রধান পথ-প্রদর্শক।

যোগপথ দুই পথ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই সকলের সে পথে প্রবেশাধিকার নাই ইহাও সত্য, অথচ যোগপথ ব্যতীত শাস্ত্রের দুইবগাহ রহস্ত ভেদ করা একেবারেই অসম্ভব। বাহ্যতে সকল শ্রেণীর লোকেই অল্পবিস্তর এ পথে প্রবিষ্ট হইয়া জগতের গূঢ়রহস্ত অবগত হইতে পারে ও অনরাময় স্থানে পৌঁছিয়া শান্তিলাভ করিতে পারে, সেইজন্য নানা শ্রেণীতে বিভক্ত সমুদয় যোগবিদ্যাকে সর্বসাধারণের উপযোগী করিয়া সম্মিলিত আকারে ক্রমোন্নয়নী অভ্যাস করিবার ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন। সাধনোচ্চুগণের যোগ্যতা ও ভ্রমের অনুরোধী বাহ্যতে সকলে ধীরে ধীরে ক্রমোন্নতি লাভ করিতে পারে তাহার সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এবং যোগাঙ্গের বিবিধ সাধনার মধ্যে যেগুলি বর্তমান কালের উপযোগী হইবে তদনুসারে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা তাঁহার শিক্ষাগারের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইহার আরম্ভ বা সর্বনিম্ন শ্রেণীর সাধনাত্ম্যসীমিতাত্ম দুর্বল চিত্তের পক্ষেও উপযোগী। এই সকল সাধনার ক্রমগুলি সহজ হইলেও তাহার ফল অসাধারণ; সর্ব নিরশ্রয় সাধকেরাও পরিশ্রম ও যত্ন করিলেই উচ্চ ফল লাভ করিতে পারিবেন। তাঁহার সাধন-প্রণালীর মধ্যে এইরূপ সুব্যবস্থা থাকায় কাহাকেও নিরাশ হইতে হয় নাই, সামান্ত ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকিলেই সাধনা আরম্ভ করিয়া যেওরা যাইতে পারে। তাঁহার পূর্বে অল্প কোন আচার্য যোগাভ্যাসের নিম্ন পদ্ধতিগুলি সকলের পক্ষে সুগম করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কি না জানি না; অথচ কিছু সংখ্যক নিরাময়বর্তী হইয়া না চলিলে যোগাভ্যাস বিড়ম্বনা মাত্র।

এরূপ উচ্চশ্রেণীর লোকশিক্ষকের মহনীর চরিত্র, বিচক্ষণ জ্ঞান, আশ্চর্য যোগৈশ্বর্য এবং অপূর্ণ অনাসক্তি যে বিশেষভাবে ভারতবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই ইহাকে আমি ভারতবাসীর বিশেষতঃ বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য বলিয়া মনে করি; কারণ তিনি বাঙ্গালী ছিলেন।

তাঁহার শিষ্য সংখ্যা অবশ্য তৎকালোপযোগী কম ছিল না। তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যেও অনেকে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার শিষ্য সংখ্যাও অনেক, এবং বজ্র, বিহার, উড়িয়া, উত্তর প্রচিন্দাঞ্চল এবং হুদ্র পাঞ্জাবের তাঁহার শিষ্যগণ অনেকেরই নিকট সুপরিচিত। কিন্তু যে ভাঙ্কর সূর্যের কনককিরণে ইহার উদ্ভাসিত তাঁহার সঙ্গে অনেকেরই পরিচয় নাই।

আজকাল পৃথিবীতে এবং আমাদের দেশেও ধর্মের গূঢ় রহস্ত অবগত হইবার একটা সচেতন চেষ্টা দেখা যাইতেছে। এই সময়ে এই লোকশিক্ষকের চরিত্র ও উপদেশ বিশেষভাবে আলোচিত হইবার বাধ্য। কারণ তিনি যে পথ দেখাইয়া গিয়াছেন উহাই সেই অবশ্যবর্ত্ত পথ, ধর্মের রহস্তকে অবগত হইবার অন্য তরপেকা সুগমতর পথ। আজিও অবিকৃত হয় নাই।

আজ আর অর্ধ শতাব্দী হইতে চলিল তাঁহার দেহবহের অবসান হইয়াছে, কিন্তু এখনও তাঁহার শ্রুতি-পূজা অনেক স্থানে মিত্য হইতেছে। বহুস্থানে তাঁহার সমাধি ও শ্রুতি-মন্দির (পূবা, কানী, হাবদার, বাঁচি বিষ্ণুপুর, বেংকুরে) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহার ভক্তগণ সেই সেই স্থানে মিত্য পূজা করিয়া আজও তাঁহার পবিত্র শ্রুতি বক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

স্মারক-সূচী

অ	অনুবন্ধ কয়ং হিংসাম	অঃ ১৮ পৃষ্ঠাঃ ২৫
অকীর্তিকাপি ভূতানি	অঃ ২ পৃষ্ঠাঃ ৩৪	অনেকচিত্তবিভ্রান্তাঃ ১৬ ১৬
অকরং ব্রহ্ম পরমমু	৮ ৩	অনেকবক্তৃ নরনম ১১ ১০
অকরাণ্যাকারোহি	১০ ৩৩	অনেকবাহুবলবক্তৃ নরনম ১১ ১৬
অকির্যোতিঃস্বঃ সুরঃ	৮ ২৪	অতকালে চ মামেব ৮ ৫
অচ্ছিন্নোহয়মদ্যাহুইয়ম্	২ ২৪	অন্তবক্তৃ ফলং তেষাম্ ১ ২৩
অজ্ঞোচপি সন্ন্যাসাত্মা	৪ ৬	অন্তবক্তৃ ইমে যোহাঃ ২ ১৮
অজ্ঞাতাশ্রয়ানশ্চ	৪ ৪০	অন্তান্তবক্তৃ ভূতানি ৩ ১৪
অত্র শৃং মনোবানঃ	১ ৪	অন্তে চ বহবঃ শ্রুতঃ ১ ২
অথ কেন প্রযুক্তোহয়ম্	৩ ৩৬	অন্তে ভেদজ্ঞানন্তঃ ১৩ ২৫
অথ চিরং সমাধাত্মম্	১২ ২	অপরাং ভবতো জ্ঞান ৪ ৪
অথ চেৎ ত্বং মমং ধর্ম্যম্	২ ৩৩	অপরে নিয়তাচারঃ ৪ ৩০
অথ চৈনঃ নিত্যজাতম্	২ ২৬	অপরমিতভক্তাং ১ ৫
অথবা যোগানামেব	৬ ৪২	অপর্যাপ্তং তদ্ব্যাকম্ ১ ১০
অথবা বহুনৈতেন	১০ ৪২	অপানে জুহাত প্রাণম্ ৪ ২২
অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্টা	১ ২০	অপি চেৎ সুদূরাচারঃ ২ ৩০
অথৈবতদপাশংজোহসি	১২ ১১	অপি চেদসি পাপেভ্যঃ ৪ ৩৬
অদৃষ্টপূর্ণং ক্রুততোহসি	১১ ৪৫	অপি জ্যৈলোক্যাব্যাক্ত ১ ৩৫
অদ্যে কালে যদানং	১১ ২২	অপ্রকাশোহি শ্রুতিশ্চ ১৪ ১৩
অদ্যেই সর্বভূতানাম্	১২ ১৩	অফলাকাঙ্ক্ষাভর্ষণঃ ১১ ১১
অধর্মঃ ধর্ম্যমতি যা	১৮ ৩২	অঃ সৎসংস্কৃতিঃ ১৬ ১
অধর্ম্যাতিক্রম্যৎ কুরু	১ ৪১	অভিসম্ভার তু ফলম্ ১১ ১২
অধোদর্শনং প্রকৃত্যঃ	১৫ ২	অভ্যাসযোগবুদ্ধেন ৮ ৮
অ ধৃতং ক্ষরো ভাবঃ	৮ ৪	অভ্যাসেহ প্যাসমর্থোহসি ১২ ১০
আধ্বজ্ঞঃ কথং কোহত্র	৮ ২	অমানিষমদাত্তম্ ১৩ ১
অধিষ্ঠানং তথ কর্তা	১৮ ১৪	অমী চ ত্বং প্রভুতাত্তম্ ১১ ২৬
অধ্যাত্মজ্ঞান-নিত্যত্বং	১৩ ১১	অমী হি ত্বাং সুব্রহ্মজ্ঞাঃ ১১ ২১
অধোমুখে চ ৪ ইমং	১৮ ১০	অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতঃ ৬ ৩১
অনন্তবিজ্ঞং রাজা	১ ১৬	অয়ন্যে চ সৎকরু ১ ১১
অনন্তশাস্ত্রি নাগানাম্	১০ ২০	অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ সুরঃ ১৮ ২৮
অনন্তচেতাঃ সত্ততম্	৮ ১৪	অবজ্ঞানন্তি মাং যুতাঃ ২ ১১
অনন্তাশিত্তুরন্তো মান্	২ ২২	অবাচ্যবাক্যে বহু ২ ৩৬
অনপেক্ষঃ শুচিদক্ষঃ	১২ ১৬	অবিনাশি তু তদ্বিহি ২ ১১
অন্যদ্ব্যমিত্তি গুণাৎ	১৩ ৩১	অবিকৃতঞ্চ ভূতেশু ১৩ ১৬
অন্যাদিমধ্যান্তমনস্তবীধ্যম্	১১ ১২	অব্যক্তাদীনি ভূতানি ২ ২৮
অন্যশ্রিতঃ কক্ষকলম্	৬ ১	অব্যক্তাদ্যাকরঃ সর্বাঃ ৮ ১৮
অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রক	১৮ ১২	অব্যক্তোহক্ষর ইত্যুক্তঃ ৮ ২১
অনুবেগকরং বাক্যম্	১১ ১৫	অব্যক্তোহয়মচিত্তোহয়ম্ ২ ২৫

অব্যক্ত ব্যক্তিমাণয়	অ: ৭ শ্লো: ২৪	আত্মীয় যোনিমাণয়:	অ: ১৬ শ্লো: ২০
অজ্ঞানবিত্তং যোবং	১৭ ৫	আহারদ্বিগ্ন সর্কত	১৭ ৭
অশোচ্যানবশোচয়ং	২ ১১	আহ্বানবয়ঃ সর্ক	১০ ১০
অশ্রদ্ধানাং পুরুষা:	২ ৩		
অশ্রদ্ধা হতং হতং	১৭ ২৮	ইচ্ছাষেবনমুখেন	৭ ২৭
অবং সর্কদৃষ্টিগা:	১০ ২৬	ইচ্ছা দেবঃ স্বং দুঃখং	১৩ ৬
অসক্তবুদ্ধিঃ সর্কত	১৮ ৪২	ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং	১৩ ১৮
অসংস্কৃতনতিদ্বন্দ্ব:	১৩ ২	ইতি গুরুতমং শাস্ত্রং	১৫ ২০
অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে	১৬ ৮	ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং	১৮ ৬০
অসৌ ময়া হতঃ শত্রু:	১৬ ১৪	ইত্যক্ষুণ্ণং বাসুদেবঃ	১১ ৫০
অসংযতাত্মনা যোগ:	৬ ৩৬	ইত্যহং বাসুদেবশ্চ	১৮ ৭৪
অসংশয়ং মহাবাহো	৬ ৩৫	ইদৃশ্য তে গুরুতমং	২ ১
অস্মাকং তু বাশিষ্টী যে	১ ৭	ইদৃশ্যে নাতপস্কায়	১৮ ৬৭
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং		ইদৃশ্য ময়া লক্ষ্যং	১৬ ১৩
ক্লোথক সংশ্রিতা:	১৬ ১৮	ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য	১৪ ২
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং		ইদং শরীরং কোশ্চৈব	১৩ ১
ক্লোথং পবিগ্রহম্	১৮ ৫৩	ইন্দ্রিয়ন্তেজস্বিন্যার্থে	৩ ৩৪
অহং ক্রতুরহং যজ:	২ ১৬	ইন্দ্রিয়াণং হি চরতাং	২ ৬৭
অহমাত্মা শুদ্ধাকেশ	১০ ২০	ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাছ:	৩ ৪২
অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা	১৫ ১৪	ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধি:	৩ ৪০
অহং সর্কত প্রভব:	১০ ৮	ইন্দ্রিয়ার্থেব বৈবাগ্যং	১৩ ৮
অহং হি সর্কজ্ঞানং	২ ২৪	ইদং বিবদ্যতে যোগং	৪ ১
অহিংসা সত্যমক্লোথ:	১৬ ২	ইষ্টান্ ভোগান্ হি	৩ ১২
অহিংসা সমতা তুষ্টি:	১০ ৫	ইদৈকসং গগং কুংত্রং	১১ ৭
অহোবত মহং পাপং	১ ৪৫	ইদৈব তৈজিত: সর্গ:	৫ ১২
অ		ঈশ্বর: সর্কভূতানাং	১৮ ৬১
আখ্যাহি মে কো ভবান্	১১ ৩১		
আচাধ্যা: পতর: পুত্রা:	১ ৩৪	উচ্চৈঃশ্রবসমখানাং	১০ ২৭
আচোহভিজ্ঞানবানস্মি	১৬ ১৫	উৎক্রামন্তং হিতং বাপি	১৫ ১০
আত্মসম্ভাবিতা: শুদ্ধা:	১৬ ১৭	উত্তম: পুরুষশ্চ	১৫ ১৭
আর্কোপমেন সর্কত	৬ ৩২	উৎসঙ্গুলদ্বয়ং	১ ৪৪
আনিত্যানামহং বিক্ল:	১০ ২১	উৎসীদেবুবিমে লোকা:	৩ ২৪
আপূর্ণ্যামনচল প্রতিষ্ঠ:	২ ১০	উদ্বাস: সর্ক এইবতে	৭ ১৮
আত্মজ্ঞানলোকা:	৮ ১৬	উদ্বাসীনবরাণীন:	১৪ ২৩
আত্মজ্ঞানমহং বজ্রং	১০ ২৮	উদ্বাসোজ্ঞানাত্মনং	৬ ৫
আত্মসত্ত্ববল্যোগ্য	১৭ ৮	উপক্রান্তমমতা চ	১৩ ২২
আত্মকোমলমুদৈর্ঘ্যং	৬ ৩		
আবৃতং জ্ঞানমেভেন	৩ ৩২	উচ্চৈঃশ্রবসমখানাং	১৪ ১৮
আশাশাসনৈবদ্বা:	১৬ ১২	উচ্চৈঃশ্রবসমখানাং	১৫ ১
আশ্চর্যবৎ পততি	২ ২৩		

অ	অ: ১৩ শ্লো: ৪৪	কর্ম ব্রহ্মোক্তবং বিদ্ধি	অ: ৩ শ্লো: ১৫
অবিভবিত্বা গীতম্		কর্মেজিয়ানি সংযমা	৩ ৬
এ		কর্মসমুৎ: শরীরস্থং	১৭ ৬
এতচ্ছূদ্রা বচনং কেশবশ্চ	১১ ৩৫	কবিং পুরাণম্	৮ ২
এতদ্যোনীনী ভূতানি	৭ ৬	কথ্যচ্চ তে ন নমেবন্	১১ ৩৭
এতস্মৈ সংশয়ং কৃষ্ণ	৬ ৩২	কাজ্জল: কর্মণাং সিদ্ধি:	৪ ১২
এতান্নহৃদমিচ্ছামি	১ ৩৫	কাম এষ: ক্লোথ এষ:	৩ ৩৭
এতান্নপি তু কর্ম্মাণি	১৮ ৬	কামক্লোথবিযুক্তানাং	৬৫ ২৬
এতাং দৃষ্টিমবষ্টত্যা	১৬ ২	কামমাপ্রিত্য হৃদ্বয়ং	১৬ ১০
এতাং বিভূতিং যোগক	১০ ৭	কামাত্মনঃ স্বর্গপরা:	২ ৪৩
এতৈবমুক্ত: কোশ্চৈব	১৬ ২২	কানৈস্তৈস্তৈস্তজ্ঞানা:	৭ ২০
এবমুক্তো হ্রবীকেশ:	১ ২৪	কাম্যানাং কর্ম্মণাং জ্ঞানং	১৮ ২
এবমুক্তো ততো রাজান্	১১ ২	কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা	৫ ১১
এবমুক্তো জ্ঞান: সংযো	১ ৪৬	কার্পণ্যদোষোপহতস্তভাব:	২ ৭
এবমুক্তো হ্রবীকেশ:	২ ২	কার্যাকারণকর্তৃত্বে	১৩ ২০
এবমেতন্ যথাথ জ্ঞং	১১ ৩	কার্যামিত্যেব যং কর্ম্ম	১৮ ২
এবং জ্ঞাত্বা হতং কর্ম্ম	৪ ১৫	কলোহিষি লোকক্ষয়কৃৎ	১১ ৩২
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তম্	৪ ২	কামান্ত পরমেধাস:	১ ১৭
এবং প্রবর্তিৎ চক্রং	৩ ১৬	কিং কর্ম্ম কিমকর্মেতি	৪ ১৬
এবং বহুবিধা যজ্ঞা:	৪ ৩২	কিং তদ্ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং	৮ ১
এবং বৃদ্ধে: পরং বৃদ্ধা	৩ ৪৩	কিং নো ব্রাহ্মণ	১ ৩২
এবং সত্যতত্ত্বজ্ঞানং	১২ ১	কিং পুনত্রাজ্ঞাণা: পুণ্যা:	২ ৩৩
এবা তেহতিহিতা সাংখ্যো	২ ৩২	কির্বাটিনং গহিনং চক্রহন্তং	১১ ৪৬
এবা ত্রাষ্টী স্থিতি: পার্থ	২ ৭২	কির্বাটিনং গহিনং চক্রিণক	১১ ১৭
ও		কৃতত্বা কর্ম্মলমিহং	২ ২
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম	৮ ১৩	কুলক্ষয়ে প্রপশুন্তি	১ ৫০
ও তৎসদ্বিত্তি নির্দেশ:	১৭ ২৩	কৃষিগোবক্ষ্যবাণিধ্যং	১৮ ৪৪
ক		কৈলিদৈত্বীন গুণানতান্	১৪ ২১
কিচ্ছৈচ্ছ তং পার্থ	১৮ ৭২	কোধান্ ভবতি সম্বোধ:	২ ৬৩
কিচ্ছোভয়বিভ্রঃ	৬ ৩৮	কেশোহধিকতরস্তেবাম্	১২ ৫
কিচ্ছসবণাত্মক-	১৭ ২	কৈব্যাং মাম্ম গমঃ পার্থ	২ ৩
কিং ন জ্ঞেয়মশ্রুতি:	১ ৩২	কিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা	২ ৩১
কিং ভীষ্মমহং সংখ্যো	২ ৪	ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞোরেবম্	১৩ ৩৪
কিং বিদ্যামহং যোগিন্	১০ ১৭	ক্ষেত্রজ্ঞাপি মাং বিদ্ধি	১৩ ২
কিং বুদ্ধিযুক্তা হি	২ ৫১	গ	
কিং স্কৃততত্ত্বজ্ঞ:	১৪ ১৬	গতসুদৃশ্য যুক্তশ্চ	৪ ২৩
কিং হি সংসিদ্ধি	৩ ২০	গতিভর্তা প্রভু: সাক্ষী	২ ১৮
কিং হপি বোদ্ধব্যম্	৪ ১৭	গামাভিচ্চ ভূতানি	১৫ ১৩
কিং কর্ম্ম যং পশ্যেৎ	৪ ১৮	গুণানতানতীত্য ত্রীন	১৪ ২০
কিং যোগিকারন্তে	২ ১৭	গুণনহত্যা হি মহাত্মাবা	২ ৫ ন

চ	অঃ ৬ শ্লোঃ ৩৪	তপাম্যহমহং বর্ষং	অঃ ২ শ্লোঃ ১০
চকলং হি মনঃ কৃষ্ণ	১	১৬	১৪
চতুর্বিধা ভজন্তে মাং	১	১৬	১০
চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং	৪	১৩	৬২
চিত্তামপরিমেয়াক	১৬	১১	২৪
চেতসা সর্কর্যাপি	১৮	৫৭	৪৪
জ			
জগৎ কৰ্ম চ মে দিব্যম্	৪	২	১১
জরামরণমোকায়	৭	২২	৮
জাতস্ত হি এবো মৃত্যুঃ	২	২৭	৪২
জিতাস্থানঃ প্রশান্তস্ত	৬	৭	১০
জানযজেন চাপ্যন্তে	২	১৫	২৫
জানবিজানতৃপ্তায়া	৬	৮	২৪
জানং কৰ্ম চ কৰ্ত্তা চ	১৮	১২	৬৮
জানং জ্ঞেয়ং পরিজাতা	১৮	১৮	৩৭
জানং তেহং সবিজ্ঞানম্	৭	২	১২
জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং	৫	১৬	১
জ্ঞেয়ং বস্তুং প্রবক্ষ্যামি	১৩	১২	২৩
জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসম্যাসী	৫	৩	১২
জ্যায়সী চেৎ কৰ্মণস্তে	৩	১	২৭
জ্যোতিষামপি তচ্ছ্যোতিঃ	১৩	১৭	৬১
ক			
ত ইমেহবস্থিতা বুদ্ধে	১	৩৩	৩
তচ্চ সংসৃত্য সংসৃত্য	১৮	৭৭	২১
ততঃ পরং তৎ পরিমার্গিতব্যং	১৫	৪	১২
ততঃ শব্দাচ্চ চৈর্যচ্চ	১	১৩	১১
ততঃ খেতৈর্হৈয়বুদ্ধে	১	১৪	১০
ততঃ স বিশ্বয়াবিষ্টো	১১	১৪	২০
তৎ কৈত্রং যচ্চ বাদৃক চ	১৩	৩	৩
তব্বিত্ত মহাবাহো	৩	২৮	১৩
তত্র তৎ বুদ্ধিসংযোগং	৬	৪৩	২১
তত্র সৎ নির্মলত্বং	১৪	৬	২
তত্রাপত্যং স্থিতান্ পার্শ্বঃ	১	২৬	৪৫
তত্রৈকত্বং জগৎ ক্রুৎসম্	১১	১৩	২০
তত্রৈকাত্বং মনঃ কৃষ্ণা	৬	১২	১৮
তত্রৈবং সতি কৰ্ত্তারং	১৮	১৬	৩৮
তদ্বিত্যনভিসঙ্গায়	১৭	২৫	৩৮
তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন	৪	৩৪	৩৮
তদ্বুদ্ধয়ন্তদ্বাস্তানঃ	৫	১৭	৩৮
তদ্বিত্যনভিসঙ্গায়	৬	৪৬	৩৬

অঃ ১১ শ্লোঃ ২৫	ন চ শক্যোম্যবস্থাতুং	অঃ ১ শ্লোঃ ৩০
১৭	২০	১
১১	১২	২
১১	১১	২
১৮	৮	১৮
২	৫৬	১৫
৪২	১১	৮
১	২	১২
১১	৫১	১৮
১	২৮	৫
১৭	১৪	৩
৩	১১	১১
২	১৩	১১
২	৩০	৪
৪	২৫	৭
১৬	৫	৩
৭	১৪	১০
১	৪৩	৩
১১	২০	১১
১০	৩৬	১৮
৪	২৮	৩
১	১৮	৪
১১	৩৪	১৮
১৫	১৬	২
১৬	৬	৬
ঘ		
১	১	১০
৩	৩৮	১৪
৮	২৫	৪
১৮	৩৩	২
১	৫	১৭
১৩	২৪	১১
২	৬২	১৮
ঙ		
৫	১৪	১৮
৩	৪	৮
১৮	৬৯	১৫
২	৫	১৮
২	২	১

নেহাভিক্রমনারোহিত্তি	অঃ ২ শ্লোঃ ৪০	প্রশাস্ত্রা বিগতভীঃ	অঃ ৬ শ্লোঃ ১৪
নৈতে ত্বতি পার্ধ জ্ঞানন্	৮ ২৭	প্রসাধে সর্গহুঃখানাং	২ ৬৫
নৈনং ছিন্তিত্তি শত্রুণি	২ ২৩	প্রফ্লাহশ্চান্মি দৈত্যানাং	১০ ৩০
নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি	৫ ৮	প্রাপ্য পুণ্যকৃত্যং লোকান্	৬ ৪১
নৈব তত্ত্ব কৃতেনার্ধো	৩ ১৮	ব	
প		বলং বলবতাম্ চাহং	৭ ১১
পঠিত্তানি মহাবাহো	১৮ ১৩	বহিরন্তশ্চ ভূতানাং	১৩ ১৫
পত্রং পুষ্পং কলং তোয়ং	২ ২৬	বহুনাং জন্মনামস্তে	৭ ১২
পরন্তাত্ত্ব ভাবোহন্তো	৮ ২০	বহুনি মে ব্যতীতানি	৪ ৫
পরং ব্রহ্ম পরং ধাম	১০ ১২	বহুরাত্মা জ্ঞানন্তশ্চ	৬ ৬
পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি	১৪ ১	বাহুস্পর্শেহসক্তাস্মা	৫ ২১
পরিত্রাণায় নাধুনাং	৪ ৮	বীজং মাং সর্গভূতানাং	৭ ১০
পবনঃ পবতামস্মি	১০ ৩১	বুদ্ধিযুক্তো মহাতীহ	২ ৫০
পশু মে পার্ধ রূপাণি	১১ ৫	বুদ্ধিজ্ঞানমসংমোহঃ	১০ ৪
পশাদিত্যান্ বহুন্	১১ ৬	বুদ্ধেভেহং ধৃতে শ্চৈব	১৮ ২২
পশ্যামি হেবাংতব দেব	১১ ১৫	বুদ্ধ্যা বিভক্তয়া যুক্তঃ	১৮ ৫১
পশ্যেতাং পাণ্ডুপুত্রাণাং	১ ৩	বৃহৎসাম তথা সামান্	১০ ৩৫
পাঞ্চজন্মং হবীকেশো	১ ১৫	ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্	১৪ ২৭
পাপমেবাস্রয়েদ্যনান্	১ ৩৬	ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি	৫ ১০
পার্ধ নৈবেহ নামুজ	৬ ৪০	ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা	১৮ ৫৪
পিতাসি লোকশ্চ	১১ ৪৩	ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিঃ	৪ ২৪
পিতামহশ্চ জগতো	২ ১৭	ব্রাহ্মণক্সত্রিয়বিশাং	১৮ ৪১
পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ	৭ ২	জ	
পুরুষঃ প্রকৃতিশ্চো হি	১৩ ২১	ভক্ত্যা বনস্তয়া শক্যঃ	১১ ৫৪
পুরুষঃ স পরঃ পার্ধ	৮ ২২	ভক্ত্যা মামভিজ্ঞানাত্তি	১৮ ৫৫
পূর্বোবসাক্ষ মুখ্যং মাং	১০ ২৪	ভয়ত্রিগাহপতং	২ ৩৫
পূর্বাভ্যাগেন তেনৈব	৬ ৪৪	ভবান্ ভীষ্মচ কর্ণশ্চ	১ ৮
পৃথক্চে ন তু যজ্ঞ জ্ঞানং	১৮ ২১	ভবাণ্যো হি ভূতানাং	১১ ২
প্রকাশঞ্চ প্রযুক্তিঞ্চ	১৪ ২২	ভীষ্মজোপ প্রমুখতঃ	১ ২৫
প্রকৃতিং পুরুষকৈব	১৩ ১২	ভূতগ্রামঃ স এবায়ং	৮ ১২
প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য	২ ৮	ভূমিবাপোহনলো বায়ঃ	৭ ৪
প্রকৃতেত্ত্ব গণঃমৃতাঃ	৩ ২২	ভূয় এব মহাবাহো	১০ ১
প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি	৩ ২৭	ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং	৫ ২২
প্রকৃভ্যেব চ কর্ম্মাণি	১৩ ২২	ভোগৈগর্ভ্যা প্রসক্তানাং	২ ৪৪
প্রজহাতি যদা কামান্	২ ৫৫	জ	
প্রব্রাহ্মণ্য বতমানস্ত	৬ ৪৫	মচ্ছিত্তঃ সর্গদুর্গাণি	১৮ ১৮
প্রাণকালে মনসাচলেন	৮ ১০	মচ্ছিত্তা মনস্তপ্রাণাঃ	১০ ২
প্রলপন্ বিজ্ঞান্ গৃহন	৫ ২	মৎকর্ণকৃষ্ণং পরমো	১১ ৫৫
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা	১৬ ৭	মন্তঃ পরন্তরং মাষ্ট্রং	৭ ৭
প্রবৃত্তিঞ্চ...কার্য্যাকার্য্যো	১৮ ৩০	মহত্বেহায় পরমং	১১ ১
প্রশান্তমনসং ছেনং	৬ ২৭	মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যতং	১৭ ১৬

মহত্বেহায় পরমং	অঃ ৭ শ্লোঃ ৩	যৎ করোষি বদমানসি	অঃ ২ শ্লোঃ ২৭
মন্যনা ভব...মৎপরায়ণঃ	২ ৩৪	যজ্ঞবগ্নে বিশ্বমিব	১৮ ৩৭
মন্যনা ভব...প্রিয়োহসি মে	১৮ ৬৫	যজ্ঞকামেপ্সূনা কর্ণ	১৮ ২৪
মজ্জসে যদি তচ্ছক্যং	১১ ৪	যজ্ঞকৃতং ব্রহ্মবৈকস্মিন্	১৮ ২২
মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম	১৪ ৩	যজ্ঞপ্রতাপকারার্থং	১৭ ২১
মমৈবাত্মশো জীবলোকে	১৫ ৭	যজ্ঞকালে অনাবৃত্তিম্	৮ ২৩
ময়া ততমিহং সর্গং	২ ৪	যজ্ঞ যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ	১৮ ৭৮
ময়াধ্যদেশ প্রকৃতিঃ	২ ১০	যজ্ঞোপরমতে চিত্তং	৬ ২০
ময়া প্রসন্নেন তবাজ্জ্ঞেনহং	১১ ৪৭	যৎ সাংখ্যঃ প্রাপ্যতে	৫ ৭
ময়ি চানন্তযোগেন	১৩ ১০	যথাকালস্থিতো নিত্যং	২ ৬
ময়ি সর্গাণি কর্ম্মাণি	৩ ৩০	যথা কীপো নিবাতন্তো	৬ ১২
ময়াবেশ্য মনো যে মাং	১২ ২	যথা নদীনাং বহবো	১১ ২৮
ময়াসক্তমনাঃ পার্ধ	৭ ১	যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ	১৩ ৩৩
মযোব মন আধংস্ব	১২ ৮	যথা প্রদীপ্তং জলনং	১১ ২২
মহর্ষয়ঃ সপ্ত পুর্বে	১০ ৬	যথা সর্গগতং সৌম্য্যং	১৩ ৩২
মহর্ষীণাং ভূতরহং	১০ ২৫	যথৈধাংসি সমিচ্ছোহরিঃ	৪ ৩৭
মহাত্মানস্ত মাং পার্ধ	২ ১৩	যজ্ঞকরং বেদবিদো বদন্তি	৮ ১১
মহাত্মাত্ত্বহঙ্কারো	১৩ ৫	যজ্ঞে চাত্মবক্রে চ	১৮ ৩২
মাঞ্চ বোহিব্যভিচারেণ	১৪ ২৬	যজ্ঞকারমাস্রিত্য	১৮ ৫২
মাতুল্যঃ খন্তরাঃ পৌত্রাঃ	১ ৩৪	যদা তে মোহকসিঙ্গং	২ ৫২
মা তে ব্যথা মা চ বিনু	১১ ৪২	যদাদিত্যগতং তেজঃ	১৫ ১২
মাত্ৰাম্পর্শাত্ত্ব কোন্তেয়	২ ১৪	যদা ভূতপৃথগ্ ভাবম্	১৩ ৩০
মানাপমানয়োক্তল্যঃ	১৪ ২৫	যদা যদা হি ধর্ম্মশ্চ	১৩ ৩১
মানুপেত্য পুনর্জন্ম	৮ ১৫	যদা বিনিয়ন্তং চিত্তং	৬ ১৫
মাং হি পার্ধ বাপাশ্রিত্য	২ ৩২	যদা সত্ত্ব প্রবৃক্রে তু	১৪ ১৪
মুক্তসংকোহনহংবাদী	১৮ ২৬	যদা সংহরতে চায়ং	১৩ ২৭
মৃদ্রাগ্রাহণাত্মনো যৎ	১৭ ১২	যদা হি নেজ্জিয়ার্ধেয়	১৩ ২৪
মৃত্যুঃ সর্গহরচ্চাহম্	১০ ৩৪	যদি মামপ্রভীকারং	১৩ ৪৬
মোহাশা মোহকর্ম্মাণো	২ ১২	যদি হহং ন বর্জ্যং	১৩ ২৩
য		যদুচ্ছয়া চোপপন্নং	১৩ ৩২
য ইদং পরমং স্তবং	১৮ ৬৮	যদুচ্ছালাভসত্ত্বো	১৩ ২২
য এনং বেত্তি হস্তারং	২ ১২	যদযদাচরতি প্রেষ্ঠঃ	১৩ ২১
য এবং বেত্তি পুরুষং	১৩ ২৩	যদযদবিভূতিমং সত্ত্বম্	১০ ৪১
যদ্যপি সর্গভূতানাং	১০ ৩২	যদ্যপ্যেতে ন পশ্যতি	১৩ ৩৮
যদ্যবহাসার্মমসংকৃতোহসি	১১ ৪২	যদা যদ্যং ভয়ং শোকং	১৮ ৩৫
যজ্ঞস্তে সাত্বিকা দেবান্	১৭ ৪	যৎ যৎ বাপি অরন্য ভাবং	১৮ ৩৩
যজ্ঞজাতা ন পুনর্গোহম্	৪ ৩৫	যদা তু ধর্ম্মকামার্থান্	১৮ ৩৫
যজ্ঞতো হপি কোন্তেয়	২ ৬০	যদা ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ	১৮ ৩১
যজ্ঞন্তো যোগিনশ্চৈনং	১৫ ১১	যৎ লজ্জা চাপরং লাভং	১৩ ২২
যতঃ প্রবৃত্তিভূতানাং	১৮ ৪৬	যৎ সন্ন্যাসমিতি প্রাজঃ	৬ ২
যতেজ্জিয়মমোবুজিঃ	৫ ২৮	যৎ হি ন ব্যয়ন্ত্যোতে	২ ১৫
যতো যতো নিশ্চরতি	৬ ২৬		

যঃ শাস্ত্রবিধিযুৎপাদ্য	অঃ ১৬ শ্লোঃ ২৩	যোগিনামপি সর্বেষাং	অঃ ৬ শ্লোঃ ৪৭
যঃ সর্কজানভিনেহঃ	২ ৫৭	যোগী যুক্তীত সততং	৬ ১০
যজ্ঞোদ্যানংতপঃ কৰ্ম	১৮ ৫	যোগেন্দ্রমানবৈক্যং	১ ২৩
যজ্ঞশিষ্টাভূতভূতঃ	৪ ৩১	যো ন জ্ঞতি ন যেষ্ট	১২ ১৭
যজ্ঞশিষ্টাপিনঃ সন্তো	৩ ১৩	যো মামজমনারিক	১০ ৩
যজ্ঞার্থং কৰ্মণোহুজ্ঞ	৩ ২	যো মামেবমসঙ্গুতো	১৫ ১২
যজ্ঞে তপসি দানে চ	১৭ ২৭	যে মাং পশুতি সর্কজ	৬ ৩০
যজ্ঞান্তরতির্যক স্ত্রাং	৩ ১৭	যো যো যাং যাং তহুং	৭ ২১
যজ্ঞিষ্টিয়াপি মনসা	৩ ৭	যোহিৎ যোগেশ্বরা প্রোক্তঃ	৬ ৩৩
যমাং ক্রমভূতোহং	১৫ ১৮	র	
যমাদ্রোহিকতে লোকো	১২ ১৫	রজসি প্রসন্নঃ গতা	১৪ ১৫
যন্ত নাহংকৃতো ভাবো	১৮ ১৭	রজন্তমশ্চাভিত্য	১৪ ১০
যন্ত সর্কে সমাবজাঃ	৪ ১২	রজো রাগাশ্চকং বিজি	১৪ ৭
যাতয়ামং গভরসং	১৭ ১০	রসোহহমপ্য কোন্তয়	৭ ৮
যা নিশা সর্কভূতানাং	২ ৬০	রাগেষববিবৃক্তে	২ ৬৪
যামিমাং পুণ্ডিতাং বাচং	২ ৪২	রাগী কৰ্মকলপ্রোক্তঃ	১৮ ২৭
যাবং সজায়তে কিঞ্চিৎ	১৩ ২৬	রাজন্ সংসৃত্য সংসৃত্য	১৮ ৭৬
যাবহেত্যাদিরীক্যেহং	১ ২২	রাজবিদ্যা রাজগুহ্য	২ ২
যাবানর্থ উনপানে	২ ৪৬	রুদ্রাণাং শকবচ্যামি	১০ ২৩
যান্তি ধ্রুবভ্রতা ধ্রুবান্	২ ২৫	রুদ্রাভিত্য বসবো যে চ	১১ ২২
যুক্তঃ কৰ্মকলং ত্যক্তা	৫ ১২	রূপং মহন্তে বহুবক্তনৈঃ	১১ ২৩
যুক্তাহারবিহারস্ত	৬ ১৭	ল	
যুক্তেবং...নিয়তমানসঃ	৬ ১৫	লভন্তে ব্রহ্ম নিরীষণং	৫ ২৫
যুক্তেবং...বিগতকামবঃ	৬ ২৮	লেনিহসে প্রসমানঃ	১১ ৩০
যুধামশ্চ বিক্রান্তঃ	১ ৬	লোকোহ্মিন্ বিবিধা নিষ্ঠা	৩ ৩
যে চৈব সাত্বিকা ভাবাঃ	৭ ১২	লোকঃ প্রবৃষ্টিরাবন্তঃ	১৪ ১২
যে তু ধর্মাবৃতমিহং	১২ ২০	ব	
যে তু সর্কাপি কৰ্মাপি	১২ ৬	বক্তৃমহীতশেষেণ	১০ ১৬
যে ব্রহ্মব্রহ্মনির্দেস্তং	১২ ৩	বক্তৃপি তে স্বরমাণা	১১ ২৭
যে যেতদভ্যাস্তস্তো	৩ ৩২	বাস্তবমোহির্ঘরুপঃ	১১ ৩২
যেহপ্যজ্ঞেবতাত্ততা	২ ২৩	বাসাংসি জীর্ণানি যথা	২ ২২
যে মে মতমিহং নিত্যম্	৩ ৩১	বিদ্যাভিনয়সম্পদে	৫ ১৮
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে	৪ ১১	বিবিধীনমস্ট্রাং	১৭ ১৩
যে শাস্ত্রবিধিযুৎপাদ্য	১৭ ১	বিবিক্তসেবী লঘুপী	১৮ ৫২
যেবাং ব্রহ্মগতং পাপং	৭ ২৮	বিষয়া বিনিবর্তন্তে	২ ৫২
যে হি সংস্পর্শা ভোগা	৫ ২২	বিষয়েল্লিঙ্গসংযোগাং	১৮ ৩৮
যোহন্তঃস্থোহন্তরাবামঃ	৫ ২৪	বিস্তরেণান্নো বোগং	১০ ১৮
যোগযুক্তো বিজ্ঞাতা	৫ ৭	বিহার কামান্ যঃ সর্কান্	২ ৭১
যোগসংক্রান্তকৰ্মাণং	৪ ৪১	বীতরাগভয়কোষাঃ	৪ ১০
যোগঃ কুরু কৰ্মাপি	২ ৪৮	ব্রহ্মীনাং বাস্তুহোহ্মি	১০ ৩৭
		বেদানাং সামবেদোহ্মি	১০ ২২

বেদাবিনাশিনঃ নিত্যং	অঃ ২ শ্লোঃ ২১	সক্তাং সংজায়তে জ্ঞানং	অঃ ১৪ শ্লোঃ ২১৭
বেদাং সমতীতানি	৭ ২৬	সক্তাহরুপা সর্কজ	১৭ ৩
বেদেষু বজেষু তপঃসু	৭ ২৮	সদৃশং চেষ্টতে স্বতাঃ	৩ ৩৩
বেদযুক্ত শরীরে মে	১ ২০	সদ্যবে সাধুভাবে চ	১৭ ২৬
ব্যবসারান্নিকা বুদ্ধিঃ	২ ৪১	সদৃষ্টঃ সততং যোগী	১২ ১৪
ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন	৩ ২	সদ্যাসক্ত মহাবাহো	৫ ৬
ব্যাসপ্রসাদাং শ্রুতবান্	১৮ ৭৫	সদ্যাসক্ত মহাবাহো	১৮ ১
শ		সদ্যাসং কৰ্মণাং ক্রম	৫ ১
		সদ্যাসং কৰ্মযোগন্ত	৫ ২
শক্লোভীহৈব যঃ সোচুং	৫ ২৩	সমহুঃস্থঃস্থঃ	১৪ ২৪
শর্টনঃ শর্টনকপারমেৎ	৬ ২৫	সমং কাহশিরোগ্রীবাং	৬ ১৩
শর্টো হমন্তপঃ শৌচং	১৮ ৪২	সমং পশুন্ হি সর্কজ	১৩ ২৮
শরীরবাক্ত মনোভিৎ	১৮ ১৫	সমং সর্কেভু ভূতেষু	১৩ ২৭
শরীরং যদ্বাপ্রোতি	১৫ ৮	সমঃ শর্টো চ মিত্রে চ	১২ ১৫
শ্রুতকৃৎ গতা হেতে	৮ ২৬	সমোহং সর্কভূতেষু	২ ২০
শ্রুতো মেধে প্রতিষ্ঠাপ্য	৬ ১১	সর্গাপ্যাদিহব্রহ্ম	১০ ৩২
শ্রুতাত্তকলৈবং	২ ২৮	সর্ককৰ্মাপি মনসা	৫ ১৩
শৌর্বাং তেজো ব্রহ্মদীক্ষ্যং	১৮ ৪৩	সর্ককৰ্মাপি সদা	১৮ ৫৬
শ্রদ্ধা পরয়া তপঃ	১৭ ১৭	সর্কগুহ্যতমং ভূয়ঃ	১৮ ৬৪
শ্রদ্ধাবাননশ্রুত	১৮ ৭১	সর্কতঃ পাণিপায়ং তৎ	১৩ ১৩
শ্রদ্ধাবান্ সততে জ্ঞানং	৪ ৩০	সর্কদ্বাপি সংযম্য	৮ ১২
শ্রুতিবিশ্রুতিপরা তে	২ ৫৩	সর্কদ্বারেবু হেহেহ্মিন্	১৪ ১১
শ্রোয়ান্ অব্যবসায়জ্ঞাং	৪ ৩৩	সর্কদ্বান্ পরিভাষা	১৮ ৬৭
শ্রোয়ান্ স্বধর্মো...ভয়াবহঃ	৩ ৩৫	সর্কভূতস্বম্প্রাণং	৬ ২২
শ্রোয়ান্ স্বধর্মো...কিঞ্চিৎ	১৮ ৭৭	সর্কভূতস্বিতং যো মাং	৬ ৩১
শ্রোয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাং	১২ ১২	সর্কভূতানি কোন্তয়	২ ৭
শ্রোত্রাভীর্নোজিয়াগন্তে	৪ ২৬	সর্কভূতেষু বৈনকং	১৮ ২০
শ্রোত্রং চকুঃ স্পর্শনক	১৫ ২	সর্কমেতদূতং যন্তে	১০ ১৪
স		সর্কবোনিষু কোন্তয়	১৪ ৪
		সর্কস্ত চাহং জিহ্বা	১৫ ১৫
স এবাং ময়া তেহহা	৪ ৩	সর্কাগীল্লিয়কৰ্মাপি	৪ ২৭
সক্তাঃ কৰ্মণ্যবিধাংসো	৩ ২৭	সর্কেল্লিয়গুণাভাসং	১৩ ১৪
সখতি মহা প্রসত্তং	১১ ৪১	সর্কেহপোতে যজ্ঞবিদ্যো	৪ ৩০
স যোবো ধর্মরাষ্ট্রাণাং	১ ১০	সহজং কৰ্ম কোন্তয়	১৮ ৪৮
সদ্বো নরকারেব	১ ৪২	সহজাঃ প্রজাঃ স্ত্রী	৩ ১০
সদ্ব্যপ্রভবান্ কাবান্	৬ ২৪	সহজগুণপর্যন্ত	৮ ১৭
সততং কীর্তয়ন্তো মাং	২ ১৪	সংনিয়মোজিয়াগামং	১২ ৪
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ	৭ ২২	সাধিত্যাদিহেবং মাং	৭ ৩০
সংকারমানপূজার্থং	১৭ ১৮	সাধ্যযোগো পূবগ্ণালাঃ	৫ ৪
সৎসং ব্রহ্ম ইতি	১৪ ৫	সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম	১৮ ৫০
সৎসং যুৎসং সজয়তি	১৪ ২	স্বধর্মং সমং ক্রুত্বা	২ ৩৮

মুখ্যমাত্তিকং যন্ত্রং	৬	২১	স্বভাবজেন কোন্তের	১৮	৬০
অথং দ্বিধানীং ত্রিবিধং	১৮	৩৬	স্বয়মেবাশ্বনাশ্বানং	১০	১৫
অহর্দশমিহং রূপং	১১	৫২	স্বে স্বে কণ্ঠ্যভিত্তঃ	১৮	৪৫
অহর্দশমিহং রূপং	৬	২			
সেনয়োরুত্তরোর্মধ্যে	১	২১			
স্থানে স্থয়ীকেশ ভব	১১	৩৬			
স্থিতপ্রজ্ঞতা কা ভাবা	২	৫৪	হ		
স্পর্শনি রূপা বহির্বাহান	৫	২৭	হতো বা প্রাপ্যাসি অর্গং	২	৩৭
স্বধর্মপি চাবেক্ষ্য	২	৩১	হন্ত তে কথয়িষ্যামি	১০	১২

বিষয় সূচী

—প্রথম প্রভ—

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
অর্থ, সর্বাঙ্গপেজা বড়—হিংসাতাব	১৩১	আনন্দ কোথায়, অন্ধ না বিষয়ে ?	১১২, ১৫৭, ২৬২, ৩৬৮, ৩৬৯
অধ্যাত্ম চিত্ত কি ?	২১০	অনন্দময়কে কেন রূপ বলে ?	৭০
অধ্যাস ... ২০৬, ২০৭, ২০৮, ৩২১, ৪০০		অপ্ত কাহারো	৩৮১
অনাশ্রিত কর্মফলের অবস্থা	৩৫১	অপ্তবাক্য বা বেদবাণী কিরূপে প্রকাশিত হয় ?	১২৮-৯
“অমৃতব” পদ	৩০০, ৩৪২, ৩৭৮	অভাস চৈতন্য	২৪৩
অমৃতব—সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত		আরুক্ষ—কাহারো	৩৫৪
অথচ ব্যাখ্যাত যোগীর	৩২৮, ৪০০	আহার ও নিদ্রার নিয়ম—	
অমৃতভূতি, দ্বিবাগন্ধ, রস ও তেজের—		(যোগাত্ম্যাসকারীর)	৩৭১-২
বিভিন্ন স্থানে চিত্ত সংযম করিলে	৬১	ই	
অন্তঃকরণ শুদ্ধি	১২২	ইন্দ্রিয় জয়ের প্রধান উপায়	২১৬, ২২৮
অপর বৈরাগ্য—চারি প্রকার	৪০৭-৮	ইন্দ্রিয় সকল বহির্গুণী হয় কেন ?	২৬০
অভ্যাস ও অভ্যাসের ফল	৩৮২, ৪০৭, ৪০৮	ঈ	
অশরীরবী বাণী	১২২	ঈশ্বর ভাব	৩২২
অপ্ত চিত্তের লক্ষণ ও তাহার		ঈশ্বর পরব্রহ্ম কি ?	৩২৩
প্রতিকারের উপায়	১৮৪	ঈশ্বরপিপিত চিত্ত	৩১৬
অসংস্কৃতি—যোগের পঞ্চম ভূমিকা	১৫৬	উ	
অসম্প্রজ্ঞাত বা নিরোধ সমাধি—(নির্বিকল্প)		“উত্তমা মহজ্ঞাবস্থা”	৩৫৩
১৭৩, ৩৫৮-৭০, ৩৭৪, ৩৮১-৩, ৩২২, ৩২৩		উৎকলিও হামের ফল	৮২-৩০
অসম্প্রজ্ঞাত যোগলাভের—চারিটা উপায়		উদ্বীনি অবস্থা	২৩, ১২৫, ১৩৩, ২০১, ৩২৫
(পাতঞ্জল) ৪০২-১০		ঐ	
অহংজ্ঞান—হুই প্রকারের	৫৫	ঐশ্বরিক মায়ী—জগৎপ্রপঞ্চের কারণ	১১২
জা		ক	
আকাশ—পাঁচ প্রকার	৭১	কর্তা কে ?	২৭৪
আত্মদর্শন—যোগাত্ম্যাস ব্যতীত অসম্ভব	৩৫৬	কর্তৃত্বাভিনিবেশশূন্য হওয়ার উপায়	১২৫
আত্মা—অকর্তা কিরূপে ?	২৬৫, ২৬৬-৭	কর্ম—সঞ্চিত, ক্রিয়মান, প্রারম্ভ	৩০৪
আত্মা বা প্রপঞ্চের তিনটি স্বরূপ	২৫৭	কর্মবন্ধন	২১০, ২৭২
আত্মা-গুণ	৩৪৩, ৪১৩	কর্মচক্র	১২৪
আত্মার মন্বন্ত, দেহের সহিত কিরূপে ?	১২৮	কর্মের বিভাগ—কর্ম, অকর্ম ও বিকর্ম	২৭১-৩
আত্মাশক্তি ভগবতী—স্থিরপ্রাণ	১৪৭	কল্যাণরূপ	৪১৪
আনন্দ—আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম, তবে		কাম—জানীর নিত্য বৈরী কেন ?	২২৫
জীবের এত নিয়ানন্দ কেন ?	১৫৭-৮		

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
কামজয়ের উপায়	২২৫, ২৩২-৩৩, ৩৫৮	জান-চার প্রকারের	১৪৫-৬
কানীক্ষেত্র	৭৩	ত	
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আয়োজন কেন ?	৫৫, ৫৭	তহ—পাঁচটি	৩৫৩
কুল ও কুলবৃক্ষ	৮৭, ২৩	তহাভ্যাস ও মনোনাশ	৪০৩
কুলধর্ম—(নৌকিক ও যোগশাস্ত্রীয়)	২২	তহুমানসা	১৫৬
কুলীন	২২	তুখ্যাবস্থা	১৫৬
কুটস্থ	৬২, ৭০, ৩৬০	দ	
“কেবল কল্প”	২৭৮-৯	হয়—প্রকৃত কি ?	৫৪, ২১৮
“কেবল কৃষ্ণক”	২২৪	দ্বিভূত—এণব দ্বিভূত দ্বিভূত	২৬৬
ক্রিয়ার দ্বারা সর্বদেবতার উপাসনা	১২০	হোহুদ্বোদ	১৩০, ২৫৭-৭৮, ৩৪৮
ক্রিয়ার পরাবস্থা—বিজ্ঞানপদ	৩৬০, ৩৭৮	দ্রষ্টার পক্ষে অবস্থান বা স্থিতি	৩৬২, ৩৭০, ৪২১
“ ” —অপ্রাপ্তির কারণ	৩৬০	ধ	
ক্রেতৃ পক্ষ	২৮২, ৩৬২	ধর্ম—কি ?	৪, ২১৮, ২১৯, ২৪২, ২৫২, ২৫৪

গ

গুণকর্মবিভাগ অনুসারে বর্ণবিভাগ	২৬৭-৮	ধর্মক্ষেত্র	৫৪, ২১৮
গুণাভিত বা নিরৈশ্বর্য ভাব	১৪৫, ১৮২	ধর্মপালনে—শরীরের আবশ্যিকতা	৫৫, ২১৮
গোরক্ষনাথের উক্তি—জ্ঞানের আলোচনা		ধর্মসংস্থাপন কিরূপে হয় ?	২৫৩-৪
সম্বন্ধে	২২৩, ৩৫৩	ধাবণা—কাহাকে বলে	৩৭৬
গ্রহণ—চন্দ্র ও সূর্য (অন্তর্গত)	২২৪	ঐশ্বর্য স্থিতি	২৪৪

চ

চিত্তই বন্ধনবন্ধু ও তাহা হইতে মুক্তির		ন	
উপায়	১৮৭	নিয়মাত্মবর্তিতা	৩৭৩
চিত্তমল	৩২৫	নিষ্কামতা ও নৈকর্য বা জ্ঞানের অবস্থা	১৪১, ১৮১, ৩৩৩, ২৬৩
চিত্তশুদ্ধি	১৪৮, ১৪৯, ২৭৫, ৩২০	প	
চিত্ত স্থির করিবার উপায়	৩৬৫-৬	পঞ্চক্রেতৃ	২৮২, ৩৬২
চিত্তের বৃত্তি—পাঁচ প্রকার	৩৫২, ৩৭৪	পঞ্চকোষ	১১৪
চিহ্নাকাশ—ভগবানের চিত্তরূপ	২৪২	পঞ্চাকাশ	৭১

জ

অন্যত্ব পুনঃ পুনঃ হইবার কারণ		পদার্থভাবন	১৫৬
ও তাহা নিবারণের উপায়	১২৫-৬	পণ্ডিত	১০৫-৬, ২৭৬-৭
জাতিকল্পনা—কাহারও স্বকণোলকল্পিত		পরমপদ প্রাপ্তি	১৭৩-৪
নহে	২৬৬	পরমাত্মার পাদপীঠ	৭১
জিজ্ঞাসু শিত্তই ব্রহ্মবিচার অধিকারী	১০২, ৪১৮	পরম পুরুষার্শ্ব লাভের কঠব্য	১৪২
জীবচৈতন্য বা অহঙ্কার	২৪৩	পরাক্রান্তি—চিহ্নাকাশ	২৪২
জীবতাব	৩২২	পর্যবৃদ্ধি	২০৫
জীব ও জীবনের জন্মের প্রভেদ	২৫৬-৮	পর্যাক্রান্তি	৩৭৫-৬
জীবমুক্তি ২০, ১১১, ১৩৩, ১৩৮, ১৫৬, ১৭৫, ২৭০		পত্ন্য	২৭৫-৬
৩৩২, ৩৩৬ ৩৪৫, ৩৪৬, ৪১০		পাণ	২৭, ১৩৩, ১৩৬, ১৩৮, ১৮১, ১২২, ২১২, ২৫৪, ২৭৬, ৩০৩ ৩৪৩

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
পিতৃদেহ (আধ্যাত্মিক) ও তাহার ফল	৮২, ৯০	ব্রাহ্ম—চারিটি, ভগবানের	২৩৭, ২৩৮
পিতৃদেহ	৮২	বৈরাগ্য—কি ?	৩৭৪, ৪০৭, ৪০৮
পুত্র—অষ্ট	১১০-১১	ব্রহ্মজ্ঞান	৫৫, ২৬৬, ৩১০, ৩২২
পুরুষ কাহাকে বলে ?	১১১	ব্রহ্মজ্ঞ কে ?	৩৩৬, ৩৩৭
পুরুষার্থ কি ?	২১৬	ব্রহ্মযোনি—কুটস্থ বা চিহ্নাকাশ	২৪৩, ৩৫৫, ৩৬৬
প্রকৃতি কি ?	২১৪, ৩২২	ব্রাহ্মীস্থিতি	১৭৫, ২৩৩
প্রকৃতির তারতম্য—জীবতাব,		ভ	
ব্রহ্মতাব ও দৈবতাব	৩২২-৩০	ভক্তি—নিশ্চল	১৩৭, ৩৭৫
প্রকৃতিকে আশ্রয় করিবার উপায়	২১৪	ভাণ্ডে	৮২
প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির লক্ষণ	১৬০-১	ভাব সমাধি	৩৬২
প্রত্যগাত্মা	১৬১	ভূতভক্তি	১৮২, ১২০, ২২৪, ২৩৭, ২৪০
প্রত্যাবায়—জ্ঞান বৈরাগ্যবিহীন সন্ন্যাসীর		ভ্রামরী গুহা	২১৮, ২২২, ২২৮
৩১৪, ৩১৫		ম	
প্রণব—কেন বলা হয় ?	২৩২	মন	১১০, ২৩৭-৩৮, ২২৬, ৪০৮
প্রাণ—জগদ্ধাত্রী	২২৫	মহু—অন্তর্গত	২৩৮
“ —অগ্নিতা ও আদিপুরুষ	১৮২	মহৎতত্ত্ব (দ্বিতীয় পুরুষ)	২৩৬, ২৪৩, ৩৭০
“ —ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিবাত্মিক শক্তি	১৮৬	মহাকাল	২৪৪, ২৪৮
প্রাণকর্ম—৫শ প্রকারের	২৮৪-৫	মহাশাসন	১৬৭
প্রাণবায়ু	৩৮৪-২০	মহামহেশ্বর ভাব	২২৪, ৩৪৮, ৩৮০
প্রাণায়াম—অভ্যাসের ফল—জীবমুক্তি	৩৪৫ ৬, ৩৭৬	মহামহেশ্বর বা ঐশ্বর্য স্থিতি	২৪৪
“ —কেন ভগবদ্ সাংসারিকের		মায়ী নাশ করিবার উপায়	১১৮
প্রধান উপায় ?	২৮৮-২৬	মুনি—কে ?	৩৫৪
প্রাণের বিকৃতি—জীবের ভগবানুধীর		মোহ—কি ?	১৫২, ৩৩৭
অন্তরায়	৩৮৫	মোহ—দূর হয় কখন ?	১৫৩
প্রারম্ভ ভোগ ভিন্ন ক্ষয় হয় না	১৫২	মোহের উপায়	৩১২-১৩
ফ		ব	
ফলাকাশা রহিত কর্ম	১৫২	বজ্রেশ্বরের রূপ—অসীম স্থিরতা	১৮৮
ব		যুক্তাবস্থা কি ?	৩২৬, ৩৪১, ৩৬০-১, ৩৬৬, ৩৭৪
বর্ণ (আধ্যাত্মিক) জ্যোতি	২৬৫	যোগ কি ?	১৫১, ১৫৪, ২৪০, ৩৬২, ৩৭৮, ৩৮১, ৪১৪, ৪২২, ৪২২
বর্ণ বৈচিত্র্য—কুটস্থ মণ্ডলের	২৬৬-৭	যোগ—জ্ঞানপ্রাপ্তির প্রধান উপায়	১৪১, ১৫০
বর্ণসংকরতা	৮৮-৯, ২১	যোগমল (সন্ন্যাসীর অন্তরায়) নষ্ট	৩৩৭
বাসনা	১৪৩	যোগাত্ম্যাসের ফল—আনন্দধর্ম	
বিচারণা	১৫৬	ও চিত্তশুদ্ধি	৩২০, ৩৫৬, ৩৭৬
বিজ্ঞানপদ—ক্রিয়ার পরাবস্থা	৩৬০	যোগাত্ম্যের অবস্থা	২৭৫, ৩৪৫-৫, ৩৫৬, ৩৬০, ৩৬১
বিজ্ঞান উপাসনা	২২১	জ	
বিপরীত বস্তুত্ব	১৩০	শম সাধনা	৩৫৫
বিষ্ণু পরমপদ কি ?	১৪৫, ১৫২, ১৫৪, ২৩১	শরণাগতি	১০২
২৭৩, ৪১৮		শরীর—ভিন্নটি	১১৪

(৫০৮)

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
শরীর—প্রণবদ্বয় ...	২৩২	সমাধি—সবিকল্প (সম্প্রজ্ঞাত),	
শরীরের আবশ্রুততা—প্রকৃত ধর্মপালনে	৫৫, ২১৮	নির্বিকল্প (অসম্প্রজ্ঞাত) ১১, ১১৩, ২৮৫,	
শাস্তি ...	১৩৭	৩৬৮-১০, ৩৭৪, ৩৮১-৩, ৩২২, ৩২৩	
শাসপ্রশাসন—জীবের মন্ত্র ...	১৮৮	সমাধি অভ্যাসের ক্রম ...	৩২৩
শুদ্ধাচারকরণের লক্ষণ ...	১৪৩	সমাধি নিজার বিভিন্ন স্তর ...	৩২২
শুভ ও অশুভ কামনার ফল ...	১৮২	সমাধির অন্তরায় ও বিষ ...	৩২৪-৫, ৩২৭
শুভেচ্ছা ...	১৫৬	সাধক—চারি শ্রেণীর ...	২১২
শিব—কে ? ...	২৭২	,,—প্রকৃত গুরুভক্ত—কিরূপ হওয়া উচিত ? ৩২৪, ৩৮২-৩	
স		সাধন অভ্যাস করে না—তিন শ্রেণীর	
সংযম ...	৮২	লোক ও তাহারের পতি ৩০৭-৮	
সংযুক্তকিবিব অবস্থা ...	৪১২	সাধনার স্থান ...	৩৬৩
সদ্ব্যপত্তি ...	১৫৬	হৃদয়ার আগরণ ...	৩১৮
সন্ন্যাসী ...	৩২০, ৩৫০-১	স্থিতপ্রজ্ঞ ও স্থিতধীর পার্থক্য	১৫২
সপ্তমূমিকা—যোগের ...	১৫৬	অধর্ম—ক্রিয়ার পরাবস্থা ...	১৩৪
সমদর্শন ...	৩২৮-২, ৪০০	সৈন্ত—দেহযুদ্ধক্ষেত্রে ...	৫৬
সমদৃষ্টি ...	৩৩৪	হিংসাতাব—সর্কোপেক্ষা বড় অধর্ম	১৩১
সমভাব ...	১৩৮	হৃদয়গ্রহি ...	৩০৪, ৩৬৫

—দ্বিতীয় অংশ—

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
অজ্ঞান	২০	আত্মজ্ঞান ও আত্মজ্ঞান লাভের প্রধান উপায় ৪, ১১৮, ১২০	
অধিহৈব—চিদাকাশ ...	৫৬	আত্মদর্শন বা স্বরূপে অবস্থান ২২, ৬৩, ১৪৩	
অবিভূত অবস্থা ...	৫৫-৬	আত্ম সমর্পণ ...	৮২
অবিষক্ত পুরুষ—পুরুষোত্তম	৫৮	আত্মার দুইটি ভাব গুণময় ও গুণাতীত	৫৩, ৩৭১
অধ্যাত্ম—কূটস্থ ...	৪৪, ৫০	ই	
অধ্যাত্ম কর্ম ও সাধনা ...	৫৩, ৫৪, ৩২১	ইন্দ্রিয়—প্রাণশক্তিতে প্রতিফলিত চৈতন্য ৩৩০	
অভ্যাস ও ব্রহ্মবিচার ...	৬৫, ৬৬, ৩৩৩-৩৪	উ	
অনন্তজ্ঞির অবস্থা ...	৩২, ৩০৬-৭	উৎক্রান্তি ও তাহার সাধনা ১১-৩, ১০৫	
অনন্তশরণের অবস্থা ...	৩১০	উপাসনা ...	১৪২, ৩৫৪ ৫
অনিচ্ছার ইচ্ছা (ভগবদ্বিচ্ছা)	১৮৬	ক	
অসিদ্ধি ত্রিবিধ—আধ্যাত্মিক, আধিহৈবিক, ও আধিভৌতিক ২০৬, ২২২		কর্ম—আধ্যাত্মিক ...	৫১-৫৪
অহং শব্দ বাচ্য—উত্তম পুরুষ বা ত্রীকূট	১০	কর্মকল ত্যাগ ...	৩৪০-১
অহোরাত্রবেত্তা ...	২০		

(৫০৯)

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
কর্মের সংস্কার ...	৬২	ন	
কামকলা, কামগায়ত্রী, কামবীজ ১২২, ১২৩		নাদ—অক্ষর ব্রহ্ম বা পুরুষ শক্তি (মহৎ তত্ত্ব) ১৪, ১২৪	
কুণ্ডলিনী শক্তি—পর্যাক্রান্তি (গীতা) ৭৮, ৮২		নির্গুণের উপাসনা হয় না ৩১২	
—মহাপ্রকৃতি (তত্ত্ব) ১২২-৩		নিরোধ অবস্থা (ব্রহ্মের রূপ) ৩১, ১৬৪, ১২৬	
কূটস্থ, কূটস্থ বা অব্যক্তের—উপাসনা ১৫, ৫২		নিষ্কল অবস্থা ১৩২, ৩০৭	
৩১৮, ৩৭১-২		প	
কোষ পক্ষ ...	৭	পঞ্চাঙ্গি ১০৪	
কৈবল্য ৫, ১৩২, ৩০৭, ৩২৮		পঞ্চপ্রাণ—উৎপত্তিস্থান ও গতি ২১০	
কুরুপূজা ...	৩১১	পঞ্চীকরণ বা পঞ্চভূতের মিশ্রণ—প্রণালী ৭	
ক্রমযুক্তি বা বিদেহ যুক্তি ১০১		পরমধাম—স্বাহুতব পদ—ক্রিয়ার পর অবস্থা ...	৩
ক্রিয়া ও ক্রিয়ার পরাবস্থা ৫, ৫৭, ৬৫, ৭২, ১৭৬, ১৯৫-৮, ৩১৪, ৩২৮, ৩৩১		পরমাগতি (ইচ্ছারহিত অবস্থা) ৮০, ৮৩, ৮৭	
ক্লেশ—পাঁচটি ...	২৩০	পর্যাক্রান্তি—ব্রহ্মস্বরূপ বা প্রাণ, জীবের যোনি... ১২	
গ		পর্যবৃদ্ধি ...	১১২, ৩১১
গুণাতীত ভাব ...	১৩৫	পুরুষ—কূটস্থ ...	১৩২
চ		পুরুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধ ...	৮
চকুর্ভূৎরূপ, ভগবানের কূটস্থের ভিতর		পুরুষোত্তম রূপ ও অবস্থা ৮, ২০২, ৩০৫	
কিরূপে তাহা বোধব্য হয় ২২৫-৬		পূজা—(প্রাণ দিয়া) ...	২২০
চিত্তশুদ্ধি ...	৬৩, ৬৭, ১২১, ৩৩৮	প্রকৃতি—পর্যাপ্ত ও অপরা ...	১২
চিদাকাশ—বা মূলপ্রকৃতি ২, ৩২৫		প্রতীক উপাসনা ...	৩৭১
চৈতন্য সমাধি ৮৫		প্রাণ ১৪০, ১৭০, ২৮২, ৩০২-৩, ৩১৭, ৩৩০	
জ		প্রাণায়াম ...	১৫২, ২৩১
জগদ্বস্থা—বিধ প্রাণের বিবিধ শক্তি ৩৭১		প্রাণের বিভিন্ন স্থানে স্থিতি ...	৩১১
জগদুয়োনি—প্রাণশক্তি ...	৩৩০	ব	
জীবমুক্ত পুরুষ ১০০-২, ১৩২, ২৩৫, ২৭৫, ৩০৭		বর্ণ—পঞ্চভূতের ...	১০, ২৪৩
জীবের প্রকৃতি ...	৩৪	বিজ্ঞানপদ—ক্রিয়ার পর অবস্থা ৩	
জ্যোতিষ্মতী প্রকৃতি ...	১৪৪, ৩৩৬	বিশেষযুক্তি বা ক্রমযুক্তি ...	১০১
জ্ঞানধারার কূল ...	১৮৬	বিবেক ব্যাতি ...	২৭৪
জ্ঞান পুষ্কিকা ভক্তি ...	৩৩	বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী প্রকৃতি ১৪৪, ৩৩৬	
জ্ঞানী ভক্ত—জীবমুক্ত পুরুষ	২২	বিষয়বস্তী প্রকৃতি ...	১৪৪
ত		বিষয় পরমপদ—ক্রিয়ার পরাবস্থা ...	১১৩, ৩২৮, ৩৩৬
তপস্তা ...	২৫	বৈদ্যানর অগ্নিই প্রাণ—ইনিই আত্মা ৩১	
ত্রিচক্র—কূটস্থ ব্রহ্মের ...	৩৩	ও	
দ		ব্যক্ততাব—ভগবানের রূপময় তিনটি ৩০৩-৪	
দেহোহং বুদ্ধি ...	১৪৭	ব্রহ্মগ্রহি, বিষ্ণুগ্রহি ও রুদ্রগ্রহি ...	১২১
দৈবী ভাব ...	২৪	ব্রহ্মযোনি—চিদমুদ্র-ময়ী প্রকৃতি ...	১৩
দ্বাদশ বিষ্ণু ...	২১১		
ধ			
ধর্ম ও ধর্মতত্ত্ব ...	১১৭-৮, ১৭৩		

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ব্রহ্মবোনি—বিন্দু	... ১৪	মৃত্যু প্রকৃত—দেহে আত্মবোধে	১৭৩
ব্রহ্মব্রহ্ম ভেদ	... ৭৩	য	
ব্রহ্মনাড়ী ও ভক্তগণের চক্রগুলির বিবরণ	১২০-১	“মুক্তবেগী”	... ১২০
ব্রহ্মার্ণব বা স্বরূপস্থিতি	১৬৭, ৩৫৬	যুক্তাবস্থা	... ১২৮
ব্রহ্মের চারি পাশ	... ৩১২	যোগ, মন্ত্র ও যোগসিদ্ধি	৭৭, ১২০, ৩২৫
ভ		যোগের অন্তরায়—নয়টি	১৫৬-৭
ভক্ত	... ২৭-২৯, ৩০২	যোগের সপ্তভূমিকা বা প্রান্তভূমি...	২৭৫
ভক্তি	... ২২, ১১৮	যোগক্ষেম	... ১৫২
ভূতভাবোদ্ভবকর ভাব—খাসের		যোনিমুদ্রা	... ৭৮, ৩৪৫
বহির্গমনা-গমন	৫৪	যোগীর—মৃত্যু	... ৬২, ৭১
ভূতভূমি—লিঙ্গশরীরের শোভন	৬৪, ১২০	শ	
ভ		শব্দগাণ্ডিত	২৫, ২২২, ৩২১
মহাশ্রয় অবস্থা	... ২	শরীর উৎকার স্বরূপ	৫, ১৪২, ১৫৪
মন্ত্রশিখা	... ১২১	শাস্তবী মূদ্রা	২০৩, ২৩৪
মহাকাল—ক্রিয়ার পরাবস্থা	৫৭	“ওরুপূজা”	... ৩১১
মহাকাশ—পর্যাপ্রকৃতি—ব্রহ্মস্বরূপ	১১	শিবভাব বা ব্রহ্মভাব	৫৪
মণ্ডলা	... ৩৩, ১৪০-৪১	বাস বা প্রাণকে কেন আত্মা বলা হয় ?	২০২
মহাবিদ্যা—স্থির প্রাণ	... ১৮২	ঐবিক্রম পরমপদ—মনের স্থিরভাব	২২২
মহাব্রত	... ২৭৭	স	
মহামায়া—চকল প্রাণ	... ২৪, ১৮২	সমাপত্তি	... ৩২৩
মহেশ্বর—স্থির প্রাণ	২৫, ১৬১	সাধু	... ৩২৬, ৩৭৪
মায়া—জগৎসৃষ্টি ও লয়ের নিমিত্ত	কাবণ ১৩০	সাম্প্রায়	... ১২১
“মুক্তবেগী”	... ১২০	সুস্থ	... ৭২, ৮০, ১৪৪
মুক্তি—সালোক্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য	১১০	সিদ্ধি—ইচ্ছারহিত অবস্থা	৩৩৮
মূর্ত্ত ও অনূর্ত্তের উপাসনা	... ৩২৩	স্থিতধীর লক্ষণ	... ২০৩
		সৃষ্টিভূত	... ৭, ১২৩-২৪
		স্ব স্বরূপাবস্থা. স্বরূপস্থিতি	১১৭, ১৪৩, ১৬৭

—ভূতীয়া প্রকৃতি—

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
অ		আত্মস্বরূপে ফিরিবার উপায় ও আত্মস্বরূপে	
অণুই ব্রহ্মবোনি	... ১২০	অবস্থান ৩২৩, ৪১১	
অধ্যাস	... ৬৮, ৬৯	আত্ম সাক্ষাত্কারের উপায়	১০৫-৬, ২২২
অপরা প্রকৃতি ২৫, ২৭, ২৯, ১০০, ১০২, ১০৩		আত্মার আবরণ ও প্রাণের প্রকাশ	২৪
অপরোক্ষমুক্তি	... ২২	আত্মার (সপ্ত) জ্ঞেয় সাধন ও করণ	১২৩-২৪
অবরুদ্ধ রূপ	... ৭২	আলম সিদ্ধির ফল	... ২৪
অবতার	... ৪৩০	ই	
আ		ঈশ্বর—নির্ভরণ পরমাশ্রয় বধন	
আত্মবিনিগ্রহ	... ২৩	লীলাবশতঃ সত্ত্ব হন বা চৈতন্যময়ী	
		পরমাশক্তি	২৫, ৯৮

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ঈশ্বর মায়া প্রতিবিম্বিত চৈতন্য (ভক্ত)		ভ	
ঈশ্বর মায়া প্রতিবিম্বিত চৈতন্য (ভক্ত)	২২, ১০২	তত্ত্ব কাহাকে বলে ?	... ১১৭
ক্রিয়ার পর অবস্থার স্বরূপে যে	১১৪	তত্ত্বজ্ঞান যোগ-সাধন	... ১০৩
হিতরূপ অমৃতত্ব	১১৪	তত্ত্বের (পঞ্চ) বিবিধ বর্ণ	... ২৪৭
উ		তৃত্যাবস্থা	... ১০৮
উত্তম পুরুষ	... ২০৫-৬	ত্রিপুর মেহই উৎকারের রূপ	১২৩, ২০৭, ২৮০
উদ্যান বায়ু	... ১১৩	ভ্যাগ ও সম্যাস	... ২৩৩-২৪, ২৯৮-২৯
উন্নয়নী ভাব	... ২৬, ৫১, ১২০	ভ্যাগীর স্বাভাবিক লক্ষণ	... ২৯২
উপাসনারূপ ব্রত—ক্রিয়ার পর অবস্থায়	৩৮, ৩৯	ধ	
খ		ধর্ম—স্থিরত্ব	... ৬৬
খবি	... ২৫৫	ধ্যানযোগ কি ?	... ১০৬
ক		ন	
কুটস্থ	... ১৫, ৬২, ৯৫	নানাস্ব দর্শন	... ২২
কৈবল্যাবস্থা	... ২০৩, ২৩৭	নাভিস্থ শক্তিই কুটস্থের ভেদ	... ২
ক্রিয়া ও ক্রিয়াযোগ	৭, ১০৬-৭, ১১০, ৩৭৩	নিষ্কল অবস্থা	... ৪৯
ক্রিয়ার পর-অবস্থা	৬৬, ১০৮, ১৭৮	নিষ্কাম কর্ম—একমাত্র প্রাণকর্ম	... ১০৬
ক্রিয়ার পর অবস্থার স্থিতির অবস্থা	৩০, ৩৬, ৪৪, ১৫৪, ২০২, ২১১	নৈকর্ম্য সিদ্ধির অবস্থা	... ৩৮৪
খ		প	
খাতের ত্রিবিধ দোষ	... ২৬৪	পরব্রহ্মের দুইটি বিভাব	... ১২১
খেচরী সিদ্ধির অবস্থা	... ৩৫৬	পরমাশ্রয় (পুরুষোত্তম)	... ২৫
গ		পর্যাপ্রকৃতি	২৫, ২৭, ২৯, ১০০, ১০২, ১০৩
গায়ত্রীর তিনটি পদ	... ১৩	পর্যাবৃত্তি	... ১৮, ১৫৬
গুণ, পঞ্চদশ	... ১০২	পর্যাক্তি, জ্ঞান ও মুক্তি অভেদ	... ৩২১
গুণসঙ্গ	... ৫৮	পর্যাসিদ্ধির অবস্থা	... ১১৭
গাভীত অবস্থার পৌছিবার সাধনাব	ক্রম তাহার ফল ২৫৫	পুরুষ—ক্ষর, অক্ষর ও পুরুষোত্তম	২৮, ২০৫
গুরু বা আত্মার উপাসনা	... ২২	পুরুষোত্তম ভাব	... ২০৬, ২০৭
চ		প্রকৃতি—ব্রহ্মের সপ্ত বা ঈশ্বর ভাব	২৬-২৮, ১০০
“চিংকণ”	... ১২২, ২০২	প্রকৃতি ও পুরুষ	... ২৯
চিদাকাল	... ২৮, ২৯	প্রকৃতি বা মায়া হইতে মুক্তিসাধনের	
জ		উপায়	... ১০২-১২
জগৎ কি ?—সাংখ্য ও গীতা মতে	১০৪	প্রণব	... ২৮১
জীব—অবিভা প্রতিবিম্বিত চৈতন্য (ভক্ত)	১০২	প্রণবরূপ দেহ—সপ্ত চক্র উহার সপ্তাদ	(সপ্ত আশ্রয়) ১২৩
জীবমুক্তি	... ১৬৩	প্রাণ ব্রহ্মের উপাধি	... ৪৬, ৬২
জীবাত্মা—কুটস্থ	... ২৫	প্রাণতত্ত্ব	... ১০৭-৯, ১১৩-১১৪
জানী বা মুক্ত পুরুষের লক্ষণ	... ৪৩	প্রাণায়াম	... ২৫

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
বর্ণাশ্রম ধর্ম ...	৩৭৭-৭৯	মুক্তি ...	৩২৪
বহুদেব বিলোপ সাধন ...	৪৪	মুক্ত্য - নানাবদর্শন ...	২২
বিষ্ণু সন্ন্যাস ...	২২২, ৩০০	যজ্ঞোপবীত ...	৮১, ১০৩
“বিপরীত রতি” ক্রিয়া ...	১২২, ৩২৪	যোগমায়া ...	২৭
বিবাহী সন্ন্যাস ...	২২২, ২৩৩, ৩১৩	যোগাত্ম্যাসের ফল ...	২৩, ১১০
বিষ্ণুর পরমপদ ...	৬৬, ১০৮, ১৮২, ২২২, ৩১৬	ল	
ব্যাস ও শ্রীকৃষ্ণ ...	৪৩০	লিঙ্গ পূজা ...	১৬৩-৬৭
ব্রহ্ম ও প্রাণ ...	৪৬০	ঈ	
ব্রহ্মবিজ্ঞা—প্রাণবায়ুর ক্রিয়া ...	২৪৫	শরণাগতির অবস্থা ...	৩২৫-৬, ৩২৭
ব্রহ্মনাড়ীতে প্রাণের পরিচালনা ...	১০৭-৮	শরীরকে ক্ষেত্র বলা হয় কেন? ...	৩, ৪
ব্রহ্মযোনি ...	১২০, ১২৪, ১২৭, ১৬২	শাস্ত্র ...	২৪৩
ব্রহ্মের লক্ষণ—স্বরূপ ও তটস্থ—	১২, ১০৩, ১০৪, ১০৫	শিব—পরব্যোম—ব্রহ্মস্বরূপ গায়ত্রী ...	৫৭
ব্রহ্মের সঙ্গ অবস্থা ...	৪৭	স	
ভ		সত্ত্ব ও নিষ্ঠুর ভাব ব্রহ্মের—কার্য ও কারণভাব ...	১০০, ১২১
ভগবদ্ দীপন ...	১০১	সত্ত্বতত্ত্ব ও সত্ত্বের বিভিন্ন লক্ষণ ...	২২, ১৩১
ভগবদ্প্রতি চিত্ত ...	৩১১	সত্যপ্রতিষ্ঠা ও ক্রিয়ার-পর-অবস্থায়	
ভগবানের নিকৃপাধিক ও সোপাধিক		বাক্য ৫৭-৮	
ভাব ৭৭		সন্ন্যাস—বিবাহী ও বিষ্ণু ...	২২২
ভগবানের চরণদ্বয়—স্বাসপ্রশ্বাস		“দর্শকর্ষ সমর্পণ” ভগবানে—কি? ...	৬৬
১৭৮, ১৮৪, ১৮৮		সাংখ্যযোগ ...	১০৬
ভূতপ্রকৃতি ও মুক্তিসাধ ...	২৭, ২৭	সাধনা ও তাহার উদ্দেশ্য ...	২০০, ২২৫, ৪১১
ভূততত্ত্ব ...	১১০, ২৮০	সুত্রাত্মা ...	২৫, ১১২, ২০১
ভূতাত্মা ...	২৪, ১১৫, ২০০	সৃষ্টি—চারিপ্রকার ...	২৬, ১২১-১২২
ম		“স্বকর্ম”—ফলাফলজ্ঞাহিত ক্রিয়া ...	৩৭৪
মঙ্গলনির্বাণ পদ ...	২০৬	স্বভাব—চারিবারে সৃষ্টির কারণ ...	৩৬৮
মহাযজ্ঞ—পঞ্চ ...	২১৬-১৭, ২৭২	স্বরূপে অবস্থান ...	৬০২, ১৭-১৯, ২০৯, ৩৩৭, ৬৫১
মায়া ...	৭৭, ১০১-৩	ফ	
মায়াব স্বরূপ—অনাত্ম বা শরীরাদিতে		ক্ষেত্রজ ও ক্ষেত্র—অভিন্ন ...	১০০
আত্মবুদ্ধি ৪০৭		ক্ষেত্রজ পুরুষ—কুটুম্ব ...	১৫৫